বৃহৎ বঙ্গ

[সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

রায় বাহাদুর

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্. (অন্.),

কবিশেখর-প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৪১

বৃহৎ বঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃহৎ বঙ্গ

[সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

রায় বাহাদুর

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্. (অন্),

কবিশেখর-প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৩৪২

পঞ্চদশ অধ্যায়

" Uneasy rests the head that wears the Crown."

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠান-রাজত্ব

নদীয়া জয় করিয়া মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তবকাৎ-ই-নাসিরী-প্রণেতা মিনহাজ তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। নদীয়া-জয়ের সময়ে যে দুইজন সৈনিক মহম্মদ ইবন বক্তিয়ারের সহচর ছিলেন, মিনহাজ তাহাদেরই মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। ইবন বক্তিয়ার নবদ্বীপ বিজয়ের পরে গৌড়ের এদিক্ সেদিক্ লুণ্ঠন করিয়া লক্ষণাবতী ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসী মেচ্‌জাতীয় একজন নায়ককে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহাকে 'আলি' উপাধি দেন। আলি মেচের উপদেশে তিনি দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিব্বত জয়ের জন্য রওনা হন। পথে বর্দ্ধনকোট-সম্মুখে বিশালতোয়া বেগবতী নদী। এই নদীর কূল ধরিয়া তিনি দশদিনের পথ পর্য্যটন করিয়া একটা প্রকাণ্ড সেতুর সাক্ষাৎ পান। এই সেতু ২০টি পাষাণনির্ম্মিত খিলানের উপর স্থিত। ইবন বক্তিয়ার সেই সেতু পার হইয়া চলিলেন। দুইজন সেনাপতিকে সেতুরক্ষার জন্য রাখিয়া গেলেন, ক্রমাগত ১৬ দিন চলিয়া গিয়া একটি দুর্গ-রক্ষিত নগর আক্রমণ করেন, তথায় শুনিতে পান, ২৫ ক্রোশ দূরে একটি স্থানে (করমপত্তনে) ৫০,০০০ তুরঙ্ক সৈন্য বিদ্যমান আছে, তথায় বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন এবং তথায় বৎসরে অনেক সহস্র টাঙ্গন ঘোড়া বিক্রয়ের একটা বাজার বসে। কেহ কেহ মনে করেন, উহা আধুনিক দিনাজপুর জেলার নেক-মর্দ্দনের হাট। মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার ভয় পাইয়া অগ্রসর হইলেন না—ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। খাদ্যের ভয়ানক কষ্ট হইল। শত্রুরা সমস্ত ক্ষেত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। সৈন্যগণ ঘোড়া মারিয়া সেই মাংস খাইতে লাগিল। ইবন বক্তিয়ার কামরূপ ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার রক্ষকগণ ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শত্রুরা বেগমতী নদীর সেই বিশাল পাষাণ নির্ম্মিত সেতুর দুইটি থাম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তিনি নিকটবর্ত্তী এক দেবমন্দির আক্রমণ করেন। সেখানে দুই তিন হাজার মন স্বর্ণনির্ম্মিত দেবপ্রতিমা ছিল। শত্রুবেষ্টিত হইয়া তিনি ঐ মন্দিরে বন্দীর মত হইয়া রহিলেন, বহুকষ্টে তাঁহার সৈন্যগণ প্রাচীরের একদিক্ ভাঙ্গিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তীরভূমি হইতে শত্রুর শর তাহাদের ধ্বংসক্রিয়া সাধন করিতে লাগিল। মুসলমান বীর বহুকষ্টে অতি অল্পসংখ্যক পরিকর লইয়া রক্ষা পাইলেন এবং আলি মেচের সাহায্যে

মঃ ইবন বক্তিয়ার খিলিজির শেষজীবন।

দেবকোটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন মহঃ ইঃ বক্তিয়ারের অধীন নারানকোই স্থানের শাসনকর্ত্তা আলিমর্দ্দন খিলজি সুবিধা পাইয়া রোগশয্যায় তাঁহাকে নিহত করেন। বহুসংখ্যক সৈন্যক্ষয়ের জন্য তাঁহার প্রতি তাঁহার দলের লোকের আর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি নিঃসহায় ও বান্ধবহীন অবস্থায় দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরের দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আলেয়ার আলোর মত যে স্বল্পস্থায়ী যশঃপ্রভা তাঁহাকে গৌরব দান করিয়াছিল তাহার বিনিময়ে তিনি কি লাভ করিলেন?—পার্ব্বত্য প্রদেশে অশেষ বিড়ম্বনা, পরাজয়জনিত লাঞ্ছনা, স্বজনধ্বংস ও অকালমৃত্যু। মহঃ ইঃ বক্তিয়ার দ্বারা সমস্ত বাঙ্গলাদেশ মুসলমানাধিকৃত হয় নাই। এমন কি নবদ্বীপকে ফিরিয়া জয় করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ কেশবসেন (লক্ষ্মণের পুত্র) গৌড় শাসন করিতেছিলেন এবং মুসলমানদের হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতে না পারিয়া পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে স্বর্ণগ্রাম রাজধানী করিয়া সেনবংশীয়েরা আরও এক শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মৃত্যু ১২০৫ খৃঃ।

ইহার কোন সময়ে সেন বংশের এক শাখা লাহোর ও কাশ্মীরে যাইয়া তথায় রাজ্য লাভ করিয়া থাকিবেন। (৪০৯ পৃঃ)

মহঃ ইবন বক্তিয়ার খিলজির প্রিয়পাত্র মহম্মদ শিরান বঙ্গদেশের রাজা বলিয়া নিজেকে প্রচার করেন। এই ব্যক্তি এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন যে, একাই অশ্বারোহণপূর্ব্বক লক্ষণাবতীর নিকট কোন জঙ্গলে ১৮টি হাতী ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত সাহস দেখিয়া তিব্বতে অভিযানের পূর্ব্বে ইবন বক্তিয়ার তাঁহাকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রভুর মৃত্যুর পর সামন্তগণ ও নেতারা একত্র হইয়া মহম্মদ শিরানকে রাজপদ প্রদান করেন। রাজা হইয়া তিনি প্রথমেই প্রভুহত্যায় অভিযুক্ত আলিমর্দ্দনকে পরাস্ত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাধ্যক্ষকে ঘুস দিয়া আলিমর্দ্দন পলাইয়া মুক্তিলাভপূর্ব্বক দিল্লী যাইয়া কুতুবুদ্দিনের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কুতুবুদ্দিন এই সময়ে সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি গড়িবার প্রয়াসী হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা কাএমাজ রোমীকে পূর্ব্বাঞ্চলের যুদ্ধ-বিগ্রহের ভার প্রদান করেন। *গঙ্গোত্রীর শাসনকর্ত্তা সম্রাট্-সৈন্যদের সহযোগিতা করিয়া দেবকোটের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। অপর অপর সেনাপতিরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করিয়া কাএমাজ রোমীর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া কুচবিহারের দিকে পলায়নপর হন। ইহাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হয়, মহম্মদ শিরান এই কলহের ফলে নিহত হন। মহম্মদ শিরান ১২০৫ হইতে ১২০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কুতুবুদ্দিন দিল্লীশ্বর ছিলেন (১২০৫-১২১০ খৃঃ) কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনত্ব স্বীকার করেন নাই।

মহম্মদ শিরান—১২০৫-১২০৮ খৃঃ।

শিরানের মৃত্যুর পর আলিমর্দ্দন খিলজি দিল্লীশ্বরের সনদ লইয়া বঙ্গদেশের মসনদ দখল করেন (১২০৮-১২১১ খৃঃ)।

কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর আলিমর্দ্দন শ্বেতচ্ছত্রধারণপূর্ব্বক নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এইবার তাঁহার কতকটা বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্ত-কর্ম্মা যোদ্ধা এবং রাজনীতিকুশল বুদ্ধিমান্ লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এখন সমস্ত ন্যায়সঙ্গত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার গর্ব্ব আকাশ-স্পর্শী হইল। তিনি প্রকাশ্য দরবারে আপনাকে পারস্য, তুর্কিস্থান এবং দিল্লীর বাদসাহগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং "তাঁহার অধিকার হইতে বহু দূরে অবস্থিত খোরাসান, ইরাক, গজনী, গোর ও ইস্ফাহানের অধিকার প্রত্যার্থিগণকে প্রদান করিতেন।" এই সকল রাজ্য তাঁহার অধিকার-বহির্ভূত,—শুনিলে চটিয়া যাইতেন। একদা পারস্য দেশের এক বণিক্ স্বীয় বহুমূল্য দ্রব্যাদি-বোঝাই জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিকট সাহায্যের প্রার্থী হন। আলাউদ্দিন তাঁহাকে ইসপাহানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে এক ফরমান প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। এই উপহাস-যোগ্য দুর্ব্বুদ্ধির ফল হইতে তাঁহাকে মন্ত্রী বুদ্ধি-কৌশলে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবকে স্বীয় অহঙ্কার বজায় রাখিবার জন্য বণিক্‌কে অনেক অর্থ প্রদান করিতে হইয়াছিল। এই সকল বুদ্ধিহীনতা অবশ্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের বিরক্তিকর হইয়াছিল—তথাপি তাহা উপহাস-যোগ্য মনে করিয়া কেহ কোন প্রতিকূলতা করে নাই। কিন্তু তিনি কিছুদিন পরে অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহার অত্যাচার শুধু আঢ্য ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের উপর সীমাবদ্ধ রহিল না, তিনি অবিচারে খিলিজিবংশীয় অনেক বড় লোককে হত্যা করিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণের চক্রান্তে ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। আলিমর্দ্দনের হত্যার পর হসাম উদ্দিন ইউয়জ নামক ইবন বক্তিয়ারের পারস্যবাসী কোন প্রিয় সেনাপতি "গিয়াসউদ্দিন" উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের মসনদ অধিকার করেন, ইহার পূর্ব্বে তিনি গঙ্গোত্রীর শাসন কর্ত্তা ছিলেন।

আলিমর্দ্দন সুলতান আলাউদ্দিন—১২০৮-১১ খৃঃ।

কথিত আছে পারস্য দেশের দুই দরবেশ ইহার ভাবী সৌভাগ্যসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ইহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কামরূপ, ত্রিহুত ও পুরী জয় করেন। কিন্তু যদিও বীর্য্যবত্তায় ইনি ন্যূন ছিলেন না, ইহার রাজত্বের অধিক সময়ই লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। ইনি গৌড়ে অনেক রম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তথায় অতি মনোজ্ঞ ও বিশাল এক মসজিদ, একটি বড় বিদ্যালয় ও অতিথিশালা প্রস্তুত করিয়া বীরভূম হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। দশ বৎসর কাল ইনি শান্তির সহিত শাসন করিয়াছিলেন এবং ধনী ও দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর প্রতি সমভাবে ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষে ইনি আর দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাইতেন না, দিল্লীশ্বর আলতামাস ক্রুদ্ধ হইয়া বঙ্গে অভিযান করেন। নির্ব্বিবাদে বিহার অধিকার করিয়া যখন তিনি বঙ্গের দিকে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে গিয়াসউদ্দিন গঙ্গার সমস্ত জলযান দখল করিয়া সম্রাটের আসিবার

গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ—১২১১-১২২৩ খৃঃ।

পথ বন্ধ করিয়া ফেলেন। যাহা হউক একটা সন্ধি হইয়া এই কলহের মিটমাট হইয়া গেল। বঙ্গাধিপ দিল্লীশ্বরকে ৩৮টি হাতী এবং বহু লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করেন। আলতামাস মুলক্ আলাউদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু সম্রাট্ যাইতে না যাইতেই গিয়াসউদ্দিন সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া বিহার অধিকার করিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হন। আলতামাসের পুত্র যুবরাজ নাসিরুদ্দিন অযোধ্যা হইতে এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন নিহত হন। গিয়াসউদ্দিন অতি উদারচরিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। এমন কি আলতামাস পর্য্যন্ত বলিতেন, "ইনি প্রকৃতই সুলতান হইবার যোগ্য।" ১২ বৎসর ব্যাপী রাজত্বের পর ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নাসিরুদ্দিন মহম্মদ—১২২৬-১২২৮ খৃঃ।

যুবরাজ নাসিরুদ্দিন বঙ্গের রাজা হইয়া শ্বেতচ্ছত্র ও রাজদণ্ড-ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড চালনা করিয়াছিলেন। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়, তখন খিলিজি সামন্তেরা বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে অরাজকতা আনয়ন করে। আলতামাস পুনরায় স্বয়ং বাঙ্গলাদেশে আসিয়া সেই বিদ্রোহ নিবারণ করেন। বিদ্রোহীর নেতা হাসামুদ্দিন খিলিজি অতি অল্প সময়ের জন্য বঙ্গের মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন। এক বৎসরের জন্য ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন বঙ্গেশ্বর হইয়াছিলেন।

হাসামুদ্দিন খিলিজি—১২২৮ খৃঃ; কয়েক মাস ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন—১২২৮-২৯; আলাউদ্দিন জানি—১২৩০-১২৩১ খৃঃ; সৈফউদ্দীন—১২২৩-১২৩৩ খৃঃ।

আলতামাস মুলক্ আলাউদ্দিনকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, ইনি চার বৎসর রাজত্বের পর পরলোকগত হন। তৎপরে সেক উদ্দিন তুরুক রাজা হইয়া তিন বৎসর রাজ্যশাসনপূর্ব্বক বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন (১২৩৩ খৃঃ)। ইঁহার পরের বঙ্গাধিপ তোগান খাঁ তাতারদেশীয় লোক ছিলেন, ইঁহাকে তরুণবয়স্ক, সুশ্রী ও নানাগুণে ভূষিত দেখিয়া আলতামাস ইঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমতঃ রোহিলখণ্ডে, পরে বিহার এবং সর্ব্বশেষে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন আলতামাস বাদসাহের কন্যা রিজিয়া দিল্লীর মসনদ প্রাপ্ত হন, তখন তোগান খাঁ তাঁহার নিকট অনেক উপঢৌকনসহ একজন বাগ্মী দূত প্রেরণ করেন। রিজিয়া বঙ্গেশ্বরের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া তাঁহাকে ওমরাহগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দান করেন এবং বঙ্গের মসনদে স্থায়িরূপে ইঁহার আসন স্বীকার করেন। রাজত্বের প্রথম দিকে ইনি ত্রিহুত বিজয় করেন, তৎপরে দিল্লীশ্বর মামুদের শাসন বিশৃঙ্খল ও শিথিল দেখিয়া কড়া-মানিকপুর বঙ্গের অধিকারভুক্ত করিলেন।

তোগান খাঁ—১২৩৩—১২৪৪ খৃঃ।

তোগান খাঁর সঙ্গে গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের পুত্র নৃসিংহদেবের প্রথম যুদ্ধ একটি স্মরণীয় ঘটনা। নৃসিংহদেব তোগান খাঁর অনুপস্থিতিতে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়া রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়। প্রতিশোধ লইবার জন্য তোগান খাঁ জাজনগর আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ ও সামন্ত নামক তাঁহার সেনাপতির রণকৌশলে

তোগান খাঁ পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন। এই দুরবস্থায় বঙ্গেশ্বর দিল্লীতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। এখানে বলা উচিত প্রথমতঃ তোগান খাঁ উড়িষ্যার কটাসিন দুর্গ আক্রমণ করেন, প্রতিশোধের জন্ম নৃসিংহদেব লক্ষণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন। (১২৪৩—৪৪ খৃঃ।) দিল্লী হইতে তমুর খাঁ অনেক সৈন্ত লইয়া বঙ্গে আগমন করেন। বঙ্গেশ্বর এই রাজকীয় সৈন্তের সাহায্যে কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া এবারও ব্যর্থকাম হন। পরন্ত তোগান খাঁর উপর তমুর খাঁ জুলুম করিতে আরম্ভ করিয়া নিজেকে লক্ষণাবতীর অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। কোন একদিন প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত লক্ষণাবতীর বক্ষের উপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান সৈন্তের বিবাদ নগরবাসীদের একটা উপভোগ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তোগান খাঁর লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, এবং তমুর খাঁই ক্ষেত্র-নায়ক হন। শেষে একটা সন্ধি হইয়া এই স্থির হইল যে তমুর খাঁ রাজধানীর যত হস্তী, অশ্ব ও রাজভাণ্ডার তাহা লইয়া যাইবেন কিন্তু তোগান খাঁ বঙ্গের অধিপতি থাকিয়া যাইবেন। তাবকাৎ-ইনাসিরী লেখক মিনহাজ এই তোগান খাঁর সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত সন্ধি অনেকটা তাঁহারই চেষ্টায় হইতে পারিয়াছিল। তমুর খাঁ প্রায় দুই বৎসর লক্ষণাবতী শাসন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তোগান খাঁ স্বীয় সৈন্তগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অদৃষ্টচক্রে এই দুই সামন্ত রাজা ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে একই দিনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তোগান খাঁর রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ চেঙ্গিস খাঁ ৩০,০০০ সৈন্ত লইয়া গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাবংশীয় রাজগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া মুসলমানদিগকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রশাসনে প্রথম নৃসিংহদেবের এই বিজয়ের কথা-উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে—"তাঁহার অমিত বিক্রমে রাঢ় ও বরেন্দ্রীয় যবনাঙ্গনাগণের কজ্জলরাগমিশ্রিত অশ্রু-সুধা-ধবল-গঙ্গা-প্রবাহকে কালিন্দীর ন্যায় শ্যামায়মানা করিয়াছিল।"

তোগান খাঁ ও তমুর খাঁ; উভয়ের রাজত্ব—১২৪৩-১২৪৬ খৃঃ।

পরবর্ত্তী রাজা মুলুক যুজবেক সম্রাট্ আলতামাসের একজন তাতার দেশীয় দাস ছিলেন। ইনি দিল্লীর সম্রাট্‌গণের প্রীতিলাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাদের বিপক্ষতা করিয়াছেন। ইনি ষড়যন্ত্রী, অকৃতজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি সম্রাজ্ঞী রিজিয়া ও সম্রাট্ বাইরাম সাহ ইহাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। নানাভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর বঙ্গের মসনদ পাইয়া ইনি সর্ব্বপ্রথমই প্রতিশোধ লইবার জন্ম জাজপুরে অভিযান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে কলিঙ্গ-রাজের পরাজয় হইল। কিন্তু তৃতীয় বারে যুজবেক ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। তাঁহার সমস্ত হস্তী শত্রুহস্তগত হইল। তন্মধ্যে অতি মূল্যবান্ একটি শ্বেত হস্তী ছিল। এই পরাজয়ের পর তিনি দিল্লী হইতে সৈন্ত সাহায্য পাইয়া আর একবার গোপনে কলিঙ্গরাজের রাজধানী আক্রমণ করিয়া ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসিলেন। বিজয়োল্লাসে যুজবেক দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ—এই ত্রিবর্ণের চন্দ্রাতপ

মুলুক যুজবেক (মুঘিস উদ্দীন)- ১২৪৬-১২৫৮ খৃঃ।

ব্যবহার এবং সম্রাট্ মুগীশউদ্দিন উপাধিধারণপূর্ব্বক নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরে তিনি অযোধ্যা-জয়ার্থ অভিযান করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কামরূপ-পতি পরাস্ত হইলে ইনি তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তদবস্থায় কামরূপের রাজা মুগীশ-উদ্দিনের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে বাৎসরিক প্রভূত রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দূত প্রেরণ করেন, পরন্তু বঙ্গেশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রা নিজরাজ্যে চালাইতেও স্বীকৃত হন। কিন্তু বিজয়দৃপ্ত মুগীশউদ্দিন এই সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হিন্দুরা পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া ফেলিল এবং নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের দুর্গম দেশ জলমগ্ন করিয়া ফেলিল। এইবার মুগীশউদ্দিন শত্রুহস্তে পড়িয়া নিতান্ত লাঞ্ছিত হইলেন। হস্তিপৃষ্ঠে পলায়নপর বঙ্গেশ্বরকে সকলেই লক্ষ্য করিতে সুবিধা পাইল; একটি মারাত্মক বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। মুমূর্ষুকালে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জীবিত বা নিহত পুত্রের মুখ দেখিতে চাহিলেন। কামরূপের রাজা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। পুত্র বন্দী হইয়া সমীপবর্ত্তী হইল, অশ্রুসিক্ত চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। (১২৫৮ খৃঃ।)

জালালুদ্দিন—১২৫৮, এক বৎসর; আর্সলন খাঁ—১২৫৮, ১২৬০-১২৬১ খৃঃ।

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের সনদ পাইয়া জালালুদ্দিন মস্তদ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি মাত্র এক বৎসর ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। কড়ার শাসনকর্ত্তা আর্সলন সহসা এক বিপুল বাহিনী লইয়া লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন, জালালুদ্দিন নিহত হন (১২৫৮ খৃঃ)। আর্সলন খাঁ দুই বৎসর মাত্র বঙ্গের গদি দখল করিয়াছিলেন। ১২৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাখালদাসবাবু এই সময়ের মধ্যে ইজুদ্দিন বল্বন নামক আর একজন বঙ্গেশ্বরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

তাতার খাঁ—১২৬১-১২৬৬ খৃঃ।

আর্সলন খাঁর পুত্র মহম্মদ তাতার খাঁ* সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সকলের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট্ বুলবনকে বহুবিধ উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করেন। এই উপঢৌকনের মধ্যে রেশমী কাপড় ও মস্লিন বহু পরিমাণে ছিল, তাহা ছাড়া ৬৩টি হস্তী এবং বহু অর্থ রাজস্বস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। বুলবন তাঁহার রাজত্বের সূচনায় এই সুপ্রচুর ভেট পাইয়া উহা একটা শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং তাতারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তাতার খাঁ ১২৭৭ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

তাতার খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট্ তদীয় বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনুচর তোগ্রেলকে বঙ্গের অধিকার প্রদান করেন। তোগ্রেল সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহাও প্রচার করেন

* রাখালবাবু তাতার খাঁর পরে শের খাঁ ও আমিন খাঁ এই দুই ব্যক্তির নাম এক যোগে ১২৬৬ খৃঃ হইতে ১২৭৮ খৃঃ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের রাজত্বের কাল উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সম্রাট্ বেলিনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখন দিল্লীশ্বর পীড়িত ছিলেন তাঁহার প্রিয়তম অনুচরের এই অকৃতজ্ঞতা ও দুর্ব্যবহারে, একান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি পীড়িত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ না রটে এই জন্য নিজে রাজধানীতে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিতে লাগিলেন এবং তোগ্রেলকে চিঠি লিখিলেন। তোগ্রেল মগীসুদ্দিন খেতাব গ্রহণ করিয়া স্বাধীন নৃপতি হইয়াছেন, তিনি সে চিঠি উপেক্ষা করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে দুইবার দুইজন সেনাপতি পাঠাইলেন, কিন্তু তোগ্রেল (মগীসুদ্দিন) তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং বঙ্গদেশে আসিয়া লক্ষ্মণাবতীর দিকে অভিযান করাতে কতকটা ভয় পাইয়া কতকটা লজ্জায় পড়িয়া, বঙ্গেশ্বর তাঁহার অর্থসম্পদ্ লইয়া যাজনগরে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট্ চলিয়া গেলে পুনরায় গৌড়ে ফিরিবেন এই উদ্দেশ্য ছিল। সম্রাট্ গৌড়ে হিসামউদ্দিন নামক সেনাপতিকে বঙ্গের মসনদে বসাইয়া যাজনগরে মগীসুদ্দিন তোগ্রেলকে আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। তোগ্রেল এমন চতুরতার সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন যে দিল্লীশ্বর কোথায়ও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। তিনি বহু চেষ্টার পর একদল বণিকের মুখে সংবাদ পাইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। দিল্লীশ্বরের এই অভিযানে স্বর্ণগ্রামের দনুজ রায় তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং তোগ্রেলের হস্তী ও ধনসম্পদ্ আত্মসাৎ করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার অন্তঃপুরের মহিলা ও শিশুদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দিনকে কখনও দিলীশ্বরের বিদ্রোহিতা না করেন (যিনিই দিল্লীর রাজতক্তের মালিক হউন না কেন) এই শপথ গ্রহন করাইয়া বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করেন (১২৮০ খৃঃ)।

তোগ্রেল খাঁ মগীসুদ্দিন—১২৭৮-১২৮২ খৃঃ।

নাসিরুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে বৃদ্ধ সম্রাট্ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আসিতে লিখিলেন। তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ ও শোকবিচলিত হইয়াছি, যদিও মহম্মদের পুত্র খসরুই এই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তথাপি সে অতি তরুণবয়স্ক, এত বড় রাজ্যের ভার সে বহন করিতে পারিবে না। আপাততঃ বঙ্গের শাসনের ভার অপর কাহারও উপর দিয়া তুমি কতক দিন এইখানেই থাক। আমি বেশীদিন বাঁচিব না। তুমি একটা ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিও।"

নাসিরুদ্দিন বগড়া খাঁ—১২৮২-১২৯১ খৃঃ।

কিন্তু সম্রাট্ একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিলেন। নাসিরুদ্দিনের আর দিল্লীতে থাকিতে ভাল লাগিল না। রাজ্যের যাহা হয় হইবে, এই মনে স্থির করিয়া, মৃগয়ার ছল করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পুত্রের এই ব্যবহারে সম্রাট্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি মহম্মদের পুত্র খসরুকে আনাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী পদে নির্দ্দিষ্ট করিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকে গমন করিলেন (১২৮৬ খৃঃ)।

খসরু আইনতঃ উত্তরাধিকারী হইলেও, দিল্লীর আমিরেরা তাঁহার দাবী উপেক্ষা করিয়া বঙ্গেশ্বর নসিরুদ্দিনের অষ্টাদশবয়স্ক পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই বালক কুসঙ্গীদের হাতে পড়িয়া বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। নাজিমুদ্দিন নামক মন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা মন্ত্রীর কুপরামর্শে অতি নিষ্ঠুরভাবে খসরু ও কয়েকজন মন্ত্রীকে হত্যা করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নসিরুদ্দিন ও পরবর্ত্তী পাঠান-রাজগণ

পুত্র সম্রাট্ হওয়াতে নসিরুদ্দিন আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, নবীন সম্রাটের চরিত্রের অধঃপতন হইতেছে, তখন তিনি তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ ও মিষ্ট গঞ্জনা দিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন। তিনি দুষ্ট মন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বিদায় করিয়া দিতে পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। সেদিন সম্রাট্ কিলখারী নামক স্থানে এক নবনির্ম্মিত বিলাসাগারে আমোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন; তিনি পিতার চিঠি উপেক্ষা করিলেন। বঙ্গেশ্বর এক বিপুলবাহিনী লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিয়া রাজ্যশাসনের আমূল সংস্কার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে পুত্র কায়কোবাদও পিতৃগঞ্জনায় বিরক্ত হইয়া এবং মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে সৈন্যসামন্ত লইয়া বাঙ্গলার দিকে অভিযান করিলেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পিতা ও পুত্রের সৈন্যেরা অল্প ব্যবধানে প্রায় মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গেশ্বর স্বীয় শিবির সরযূ নদীর তীরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের শিবির ছিল গোগরা নদীর তীরে। এই দুইটি স্থানই বিহারে শারন জেলার অন্তঃপাতী।

নসিরুদ্দিন ও কায়কোবাদ।

নসিরুদ্দিন দেখিলেন তিনি সম্রাটের বিশাল সৈন্যের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু অভিমানাহত পুত্র মন্ত্রীর প্রবর্ত্তনায় সেই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন। তিন দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিন নসিরুদ্দিন নিজ হস্তে সম্রাট্কে এইভাবে একখানি চিঠি লিখিলেন, "প্রাণাধিকেষু, তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিবার একান্ত ইচ্ছা। জেকবের মৃত্যুকালে পুত্র জোসেফকে দেখিবার জন্য তাঁহার যেরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তোমাকে দেখার সাধ আমার তদপেক্ষা কম নহে। আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধটি পালন কর, ইহার পর আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিব না এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিব না।"

এই পত্র পড়িয়া কায়কোবাদ নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি লোকজন না লইয়া একাকী তখনই তাঁহার পিতৃসকাশে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী তাঁহার স্নেহের আধিক্য কমাইয়া দিলেন এবং বুঝাইলেন, তিনি সমস্ত হিন্দুস্থানের সাহেন সা সম্রাট্, তাঁহার পক্ষে নিম্নস্থ এক রাজার কাছে—হউন না কেন তিনি পিতা—এভাবে যাইয়া প্রথমে সাক্ষাৎ করা তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদার যোগ্য হইবে না।

শেষে এই স্থির হইল যে, দুই পক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থলে কোন স্থানে বঙ্গেশ্বর সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্‌কে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। জ্যোতিষীরা শুভ দিন-ক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হইল। সম্রাট্ বহু আড়ম্বরের সঙ্গে সৈন্যসামন্তের ঘটা করিয়া দেহরক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে পিতা সরযূনদী পার হইয়া পুত্রের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সিংহাসন প্রথম দেখিতে পাইলেন, তখন একবার কুর্নিস করিয়া অভিবাদন করিলেন, আরো একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয়বার কুর্নিস ও অভিবাদন করিলেন এবং যখন একেবারে সিংহাসনের পাদদেশে আসিয়া পড়িলেন, তখন তৃতীয়বার কুর্নিস করিতে উদ্যত হইলেন। পিতার এই হীনতা ও দৈন্য দেখিয়া, পুত্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিলেন। এই করুণ দৃশ্যের পরে পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ সেখানে বসিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। পিতাকে সিংহাসনে বসিতে বাধ্য করিলেন এবং নিজে অতি সম্ভ্রমের সহিত সিংহাসনের নিম্নে একটি স্থানে উপবেশন করিলেন। এই ঘটনায় রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত খুব আনন্দোৎসব চলিল, বাজি ও আলোর ঘটায় আকাশ প্রদীপ্ত হইল এবং রাজার সঙ্গে প্রধান প্রধান আমীরগণ দেখা সাক্ষাৎ করিয়া মহাসুখে সময় কাটাইলেন।

পিতাপুত্রের মিলন—১২৮৮ খৃঃ।

ইহার পর উভয় পক্ষের সন্ধি হওয়ার কোন বাধাই রহিল না। নসিরুদ্দিন বঙ্গ ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলির স্বাধীন নৃপতি হইলেন, কিন্তু দিল্লীর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এই সর্ত্ত হইল। ১২৮৮ খৃঃ এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিদায়ের সময়ে নসিরুদ্দিন পুত্রকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে অবিলম্বে বিদায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। পরস্পর আলিঙ্গনাদির পর অতি স্নেহের সহিত বিদায়ের উপসংহার হইল। পিতাপুত্র স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনার পর নসিরুদ্দিন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বন্ধুদিগকে বলিতেন—হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য ও তাঁহার পুত্র উভয়ই তিনি শীঘ্র হারাইবেন। তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল, কারণ এক বৎসর পরে ১২৮৯ খৃঃ কায়কোবাদ খিলিজিবংশীয় এক আমীর কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হইলেন।

ফিরোজসাহা খিলিজি ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হইয়া নসিরুদ্দিনকে বঙ্গের মসনদে বহাল

ফিরোজসাহ ও তাঁহার পুত্রগণ—১২৮৯-১৩৩০ খৃঃ।

রাখিলেন। তৎপরে আলাউদ্দিনের সময়েও কতকদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্রাটের খামখেয়ালির ভাবদর্শনে তিনি আতঙ্কিত হন। তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গের মসনদ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র লক্ষ্মণাবতী অঞ্চল নিজ অধিকারে রাখেন। আলাউদ্দিন পূর্ব্ববঙ্গের জন্ম বাহাদুর খাঁকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সোণারগাঁয়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। মোবারেক সাহ সম্রাট্ হইলে (১৩১৭ খৃঃ) বাহাদুর বিদ্রোহী হন। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ তোগলক বাহাদুরকে দমন করিয়া পুনরায় নাসিরুদ্দিনকে বঙ্গের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন লেখকের মতে দ্বিতীয় বার নাসিরুদ্দিন রাজত্ব করেন নাই, তখন রাজা ছিলেন রুকুনুদ্দিন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নসিরুদ্দিনের পরে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শাসনকেন্দ্র লক্ষ্মণাবতী ও সুবর্ণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাখালবাবু নসিরুদ্দিনের পর এই কয়েকজন নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন—রুকুনুদ্দিন কৈকাউস সাহ (১২৯১-১৩০২ খৃঃ), শমস্উদ্দিন ফিরোজ সাহ (১৩০২-১৩২২ খৃঃ), নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম সাহ (১৩১২-১৩২৫ খৃঃ, ইনি লক্ষ্মণাবতীতে শমস্উদ্দিন ফিরোজ সাহের সমকালেই রাজত্ব করিতেছিলেন), গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর সাহ (১৩১০-১৩৩০ খৃঃ)। শেষোক্ত দুইজন নবাব ফিরোজ সাহের পুত্র। গিয়াসুদ্দিনের উল্লেখ বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায় "প্রভু গিয়াসুদ্দিন সুলতান"। ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে হিন্দুর প্রাচীন একটি পাষাণ মন্দির কতকটা রূপান্তরিত করিয়া সপ্তগ্রাম-বিজয়ী জাফর খাঁ গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে মসজিদ নির্ম্মিত করেন (১৯২৮ খৃঃ)। এই জাফর খাঁর সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তোত্র অনেকেই জানেন। এই পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বহরম খাঁ ও কুদর খাঁ—১৩৩০-১৩৩৮ খৃঃ।

অতঃপর বহরমখাঁন সোণারগাঁয়ের এবং কুদর খাঁ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই ভাবে বঙ্গের শাসন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিল্লীশ্বর উভয়ের ক্ষমতা খর্ব্ব করেন। বহরম খাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ফকীরুদ্দিন নামক তাঁহার এক দেহরক্ষী সেকেন্দর বাদসাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সোণারগাঁয়ের গদী দখল করিয়া স্বাধীন নৃপতির ছত্রদণ্ড ধারণ করিলেন। এদিকে আলাউদ্দিন আদিমসাহ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ফকর-উদ্দিন ও আলাউদ্দিন উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। আলাউদ্দিন ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ফকরউদ্দিনকে নিহত করেন এবং তিনিও ইহার এক বৎসর পাঁচ মাস পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইলিয়াস খাজে কর্ত্তৃক নিহত হন।

আলাউদ্দিন ও ফকর-উদ্দিন—১৩৩৮-১৩৪৩ খৃঃ।

ইলিয়াস খাজে ১০ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার উপাধি ছিল 'সামসুদ্দিন'—ইনি রাজত্বের প্রথমে জাজনগর আক্রমণ করিয়া বিস্তর অর্থ ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া আসেন। দিল্লীশ্বরের কাশী-সমীপবর্ত্তী কোন এক স্থান অধিকার করাতে সম্রাট্ ফিরোজসাহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন।

সামসুদ্দিনের পুত্র পাণ্ডুয়ায় ও তিনি স্বয়ং একডালা দুর্গে সৈন্য-সামন্ত লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে সামসুদ্দিনের পুত্র বন্দী হন, কিন্তু সম্রাট্ কিছুতেই বঙ্গেশ্বরের একডালা দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সামসুদ্দিন সম্রাট্কে কিছু অর্থ ও সামান্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন, তাঁহার পুত্র মুক্তি পাইয়াছিলেন। ইহার পরে ফিরোজসাহ বঙ্গেশ্বরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সামসুদ্দিন ১৬ বৎসর ৫ মাস রাজ্য সুশাসন করিয়া ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ইখতিয়ারউদ্দিন গাজিসাহ—১৩৪৯-১৩৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত স্বর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহ—১৩৩৩-১৩৫৮ খৃঃ।

সামসুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীতে একটা বড় রকমের ভেট পাঠাইলেন। কিন্তু ফিরোজ সাহ এই সূত্রে বাঙ্গলা দেশটা সরকারের অধীন করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি বঙ্গাভিমুখে রওনা হইয়া সেকেন্দর সাহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি তাঁহার ভেট পাইয়া খুসী হইয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলা দেশটা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত এই কথাটা স্বীকার করিলে তিনি খুশী হইয়া সন্ধি করিতে পারেন। বঙ্গেশ্বর স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃত হইলেন, পরন্তু আরও পাঁচটি হাতী ও মূল্যবান্ উপহার পাঠাইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

১ম সেকেন্দর সাহ—১৩৫৮-১৩৮৯ খৃঃ।

যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া সেকেন্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তথায় তাঁহাকে পরাস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া সম্রাট্ ৪৮টি হাতী ও কতক উপহার আর বাৎসরিক কিছু কর দিতে সম্মত করাইয়া সেকেন্দারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার রাজত্বের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন, শেষকালে তাঁহার দুই স্ত্রীকে লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রথমার গর্ভে ১৭টি সন্তান জন্মে। দ্বিতীয়ার মাত্র একটি পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রের নাম গয়েসউদ্দিন। ইনি সর্ব্বজনপ্রিয় ও পিতার আদরের ছিলেন। একদা প্রথমা রাজ্ঞী রাজাকে অনেক শপথ করাইয়া একটি গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা তাঁহাকে বলিতে চাহিলেন, রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়া সেই কথা তাঁহাকে জানাইতে আদেশ করিলেন। আশ্বাস পাইয়া রাজ্ঞী তাঁহার নিকট জ্যেষ্ঠপুত্র গয়েসউদ্দিন সম্বন্ধে কতকগুলি কথা ব্যক্ত করিলেন—গয়েসউদ্দিন তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য দখল করিতে উদ্যত ইত্যাদি। রাজা বলিলেন, "দুর্ম্মুখি, তোমার সপত্নীর একটি মাত্র পুত্র, তাহাও তোমার সহ্য হইতেছে না—তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।"

গয়েসউদ্দিন ভাবে-প্রকারে বিমাতার ষড়যন্ত্র টের পাইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে এ অবস্থায় থাকা আর নিরাপদ্ নহে মনে করিয়া সোণারগাঁয়ে যাইয়া বিদ্রোহী হইলেন। সেকেন্দর তাঁহার বিরুদ্ধে রওনা হইলেন। যুদ্ধকালে গয়েসউদ্দিন তাঁহার সৈন্যদিগকে রাজার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সেকেন্দর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। গয়েসউদ্দিন পিতার চরণধারণপূর্ব্বক বারংবার ক্ষমা

চাহিলেন, সেকেন্দর অল্প দুই এক কথায় তাঁহার শুভ ইচ্ছা জানাইয়া ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন (১৩৬৭ খৃঃ)। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট প্রদত্ত এই তারিখ গ্রাহ্য নহে। কারণ সেকেন্দর সাহের ১৩৮৯ খৃঃ অব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা করিয়া গয়েসউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল, তাঁহার বৈমাত্রের ভাইদের প্রত্যেকের চক্ষু দুটি উপড়াইয়া ফেলিয়া সেগুলি বিমাতাকে উপহার দেওয়া। তিনি আত্মরক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুরতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এই তাঁহার ওজুহাত। সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ইহার পর তিনি সর্ব্বদা ন্যায়পরতার সহিত রাজত্ব করিয়াছেন। একদিন তাঁহার একটি শর অজ্ঞাতসারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া একজন বিধবার পুত্রকে আহত করে। বিধবা কাজীর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, কাজী সিরাজুদ্দিন সম্রাটের উপর শমন জারি করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া শেষে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। যে ব্যক্তির উপর শমন জারি করার ভার ছিল সে ভয় পাইয়া অসময়ে মসজিদে উপাসনার ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। ধর্ম্ম লইয়া কে এই ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সম্রাট্ সেই লোকটাকে সম্মুখে আনিয়া এইরূপ অদ্ভুত কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কাজীর আদেশের কথা বলিয়া কহিল, ভয় পাইয়া সে মহারাজের সকাশে উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই, তজ্জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। রাজা একটা ক্ষুদ্র তরবারি কটিবাসে গোপন করিয়া আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন—বাদসাহকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। সেই বিধবার ছেলেটি তিনি আহত করিয়াছেন কি না প্রশ্ন করিলেন, এবং যখন রাজার অপরাধ প্রমাণিত হইল তখন সেই স্ত্রীলোকটির ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য রাজাকে বহু অর্থদণ্ড করিলেন। রাজা সেই টাকা দিলেন। তখনই কাজী তাঁহার আসন হইতে নামিয়া আসিয়া রাজাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা বলিলেন, "ভাগ্যে আপনি সুবিচার করিয়াছিলেন, নতুবা অসিদ্বারা আমি আপনার শির কর্ত্তন করিয়া ফেলিতাম।" কাজী বলিলেন, "আপনি আদালতে যদি আমার অবাধ্য হইতেন, তবে এই বেত্র দ্বারা আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতাম।" স্বীয় রাজ্যে ধর্ম্মভীরু সৎসাহসযুক্ত এমন সুবিচারক আছেন, এজন্য রাজা সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন এবং কাজীকে পুরস্কৃত করিলেন।

গয়েসউদ্দিন আজিমসাহ— ১৩৮৯-১৩৯৬ খৃঃ।

গয়েসউদ্দিনের ন্যায়পরতা।

এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাজার মনে হইয়াছিল, তিনি আর বাঁচিবেন না, সুতরাং একটা উইল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লিখিত ছিল যে তাঁহার প্রিয়তমা তিনটি অন্তঃপুর-চারিণী—'সাইপ্রাস', 'গোলাপ' এবং 'তুলিপ'—মৃত্যুর পর তাঁহার শব ধুইবার অধিকার

* বিদ্যাপতি যে গিয়াসুদ্দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গেশ্বর কিম্বা এই গয়েসউদ্দিন তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।

পাইবেন। তাঁহাদের প্রতি রাজার এই অনুকম্পাপ্রদর্শনে তাঁহার অপরাপর উপরাজ্ঞীরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও হিংসাভাবাপন্ন হইয়া এই তিনটি মহিলাকে "ঘোষালী" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সাধারণের শব ধৌত করার ব্যবসায় যে ইতরজাতীয় লোকেরা করে তাহাদের উপাধি "ঘোষালী"। রাজা সারিয়া উঠিলেন। সেই রমণীত্রয় বিদ্রূপের কথা রাজাকে জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখিয়া তাহার জোড়া মিলাইতে পারিলেন না। যে ছত্রটি লিখিলেন তাহার অর্থ এই—"হে সুরা-পাত্রধারিণি, তোমরা সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপের প্রশংসা গান কর।" এই কবিতা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার চিঠিতে উক্ত কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথা বলিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কথিত আছে রাজার কবিতার প্রথম চরণ না দেখিয়াই হাফেজ দ্বিতীয় চরণটি লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—"এই সুসংবাদ তিনটি পরমাসুন্দরী ও প্রিয়তমা "ঘোষালী"দিগকে জ্ঞাপন করা হউক।" গয়েসউদ্দিনের পত্রের উত্তরে কবিবর যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিওয়ান নামক কাব্যগ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তাহার প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে "আমার বন্ধু" এই শব্দটি আছে। কবিতাটির শেষ ছত্রের মর্ম্মার্থ এই—"রে হাফেজ! সুলতান গয়েসউদ্দিনকে দেখিবার জন্য তোমার যে তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে তাহা লুকাইবার কারণ কি? তুমি যে যাইতে পারিতেছ না তাহার কারণ, তুমি অনেক দূরে আছ—এ কথা সুলতানের নিকট ব্যক্ত কর।"

'সাইপ্রাস', 'গোলাপ' ও 'তুলিপ'।

প্রসিদ্ধ কবি হাফেজ।

হাফেজ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এতটা দূর তিনি যাইতে সাহস পাইতেছেন না, ইহাই না আসার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক হিসাবে কতকটা উদাসীন ছিলেন।

ছয় বৎসর কয়েক মাস দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়া গয়েসউদ্দিন ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

পরবর্ত্তী রাজা সৈফউদ্দিন গয়েসউদ্দিনের পুত্র। তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। নির্ব্বিবাদে দশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪০৬ খৃঃ তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার রাজত্বের বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায় নাই।

সৈফউদ্দিন হামজা সাহ—১৩৯৬-১৪০৬ খৃঃ।

সৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র 'দ্বিতীয় সামসুদ্দিন' নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তিনি ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ কর্ত্তৃক নিহত হন।

২য় সামসুদ্দিন—১৪০৬-১৪০৯ খৃঃ।

রাজা গণেশ কে?—তাহা লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদেশের অধিকাংশ রাজাকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি

তাঁহার কায়স্থদিগের ইতিহাসের নামই দিয়াছেন—"রাজন্যকাণ্ড"। তাম্র-শাসনাদিতে প্রমাণাভাব হইলেও তাঁহার মতের পোষক কুলজী-গ্রন্থের অভাব হইতেছে না। এই কুলজীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, অনেকের বিশ্বাস নগেন্দ্রবাবু এই সকল কুলজী-লেখকদের দ্বারা বারংবার প্রতারিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে রাখালবাবু এত প্রমাণ দিয়াছেন যে নগেন্দ্রবাবুর উত্তর মুখে যোগাইতেছে না। রাখালবাবু লিখিয়াছেন—"বসুজ মহাশয় সন্দেহজনক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দুই বার সেন-রাজবংশকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই জন্য প্রতিবারেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বসুজ মহাশয় চন্দ্রদ্বীপের ঘটককারিকা অনুসারে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা দনৌজ মাধবকে লক্ষ্মণসেনের পৌত্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণসেনের পৌত্র হইতে পারেন না। ....ইহার পরে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা প্রকাশিত হইলে সেনবংশের সহিত কায়স্থসমাজের নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রয়োজন হইল। তদনুসারে বটুভট্টের দেববংশ নামক কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪, ১৮৮ পৃঃ)। এক একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পর পূর্ব্ববর্ত্তী সদ্যোজাত কুলগ্রন্থ সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইতে না হইতে সেটির সংশোধক ও পরিপূরক হিসাবে অপর একটি কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়। এই নিত্য নব আবিষ্কারের বলে নগেন্দ্রবাবু যে সকল মত দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা রাখালবাবু তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠায় ও সান্যাল মহাশয় তাঁহার সামাজিক ইতিহাসের অনেক স্থলে বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও এই ব্যাপারে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন; রাখালবাবু অতি গম্ভীর বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত মহিমার মধ্যে একটু চাপা রহস্যের ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। নিখিলনাথ রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কায়স্থ লেখকদের অভাব নাই, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা ঐতিহাসিক শাস্ত্রে অনেক বেশী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং ইতিহাসক্ষেত্রে অপূর্ব্ব উদ্যমশীলতা ও অভূতপূর্ব্ব বিদ্যার পরিচয় দিয়াও পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ কুলজীশাস্ত্রকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া এবং ঘটকদিগের কথায় নির্ব্বিচারে প্রত্যয় স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিকগণের শ্রদ্ধা কি তিনি কতকটা হারাইয়া ফেলেন নাই? কায়স্থ-সমাজ অতি বিরাট্। যদি কোন জাতি সর্ব্ববিষয়ে বংশের প্রাধান্যের দাবী করিতে পারেন—তবে কায়স্থ জাতি যতটা পারেন, ততটা আর কোন জাতি পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সোণার উপর রং চড়াইবার প্রয়োজন কি? যাহা স্বভাবতঃই বড়, তাহাকে অধিকতর বড় করিবার চেষ্টা বাতুলতা নহে কি? তাঁহার এই সকল গবেষণার ফলে বঙ্গের বহুমূল্য কুলজীগ্রন্থসম্পদের উপর লোকের কতকটা অনাস্থা জন্মিয়াছে। অথচ খাঁটি কুলজীগ্রন্থগুলি

রাজা গণেশ—১৪০৯-১৪১৪ খৃঃ।

গণেশ কোন্ জাতি?

যে চারণদের গীতির ন্যায় ইতিহাসের বহুমূল্য উপকরণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গণেশকে উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে নগেনবাবু চেষ্টা পাইয়াছেন। দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় নিজে ইচ্ছা করিয়া কিংবা স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি-বলে কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহার শত্রুর মধ্যেও কেহ এ কথা বলিবেন না। তবে হয়ত তিনি ঠাকুরমার ঝুলি হইতে মাঝে মাঝে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি ও প্রবাদের উপর জোর দিয়াছেন, তজ্জন্য স্থানে স্থানে তাঁহার মত ইতিহাসসঙ্গত হয় নাই। তথাপি রাজা গণেশসম্বন্ধে তিনি যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক এত কথা আছে যে, সেই প্রবাদগুলি স্থানে স্থানে ভুল প্রতিপন্ন হইলেও উহা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। কায়স্থকারিকায় গণেশসম্বন্ধে এত কথা, এত প্রবাদের শতাংশের একাংশও নাই—এই প্রবাদগুলি পারিবারিক দীর্ঘকালাগত সংস্কার ও স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। এজন্য আমাদের বিশ্বাস, গণেশ ব্রাহ্মণ-কুলজাত ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমান ঐতিহাসিক "ভাতুড়িয়ার" জমিদার বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "ভাতুড়িয়া" নাম হইতে প্রসিদ্ধ ভাদুড়ী বংশের উদ্ভব হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল সেই স্থানের জমিদার বংশের ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রতিপত্তি ছিল।

কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-সমস্যা।

ভাতুড়িয়ার জমিদার-বংশ—ভাদুড়ীবংশ।

নরসিংহ নাড়িয়াল নামক এক মন্ত্রীর কৌশলে গণেশ মুসলমান বাদসাহকে নিহত করিয়াছিলেন (ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ)—"যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ের বাদসাহকে মারি নিজে হৈল রাজা।" * তাঁহার নামের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বাদশা হইয়া তিনি সম্ভবতঃ মুসলমান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক সময়েই রাজা বা বাদশাহের প্রচলিত নাম রাজকীয় দলিলপত্রে ব্যবহৃত হইত না; যিনি মুসলমানী রাজতক্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার তৎসময়ে সম্মানিত মুসলমানী উপাধি গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। গণেশের রাজত্বকাল ১৩৮৫-১৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়। হয়ত তিনি সাহাবউদ্দিন বায়াজিদ সাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে এই নাম কতকগুলি মুদ্রায় পাওয়া গিয়াছে। গণেশ অতি প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন; তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান সামন্ত ও আমীরগণকে সন্তুষ্ট করিয়া নির্ব্বিবাদে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁহার শব হিন্দুমতে দাহ করা হইবে কিংবা মুসলমানমতে তাঁহার সমাধি দেওয়া হইবে, এই লইয়া দুই শ্রেণীর মধ্যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানদের

* এই 'নাড়িয়াল' বংশোদ্ভূত বলিয়া চৈতন্য প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে 'নাড়া' ও 'নাড়াবুড়া' বলিয়া অভিহিত করিতেন।

প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের প্রতি অকথিত অত্যাচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেখ বদর উল ইসলাম রাজাকে অভিবাদন না করাতে তিনি তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এজন্য তিনি তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। এইগুলি বিশেষ কোন অত্যাচার বলিয়া মনে হয় না। যদি তিনি সাহাব-উদ্দিন বয়াজিদ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার শবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া লইয়া কেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কলহ হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এদিকে যদু যখন মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তখন রাজা গণেশ সুবর্ণধেনুব্রত করাইয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রায় চারিশত বৎসরের দীর্ঘরজনীর পরে হঠাৎ একটু উষার আলোর মত হিন্দুগগনে গণেশের উদয়। যে বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেই ভাদুড়ী বংশ কি তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারে? তাঁহারা এখন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু গণেশের কীর্ত্তিকথা তাঁহাদের কুল-কারিকায় এরূপ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, বাহিরের লোকেরাও তাহা ভুলিতে পারিবে না। সান্ন্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের এই গণেশের অধ্যায়টি পাঠ করুন, তাহা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও এত বিস্তৃত যে এই সকল কথা যে মূলতঃ সত্যমূলক তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যদি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইত, তবে তাঁহার ইতিহাসসম্বন্ধে সেই পরিবারে সোণায় গিল্টী করা চরিতকথা না থাকিলেও শত শত প্রবাদ থাকিত। সেরূপ একটি প্রবাদেরও অস্তিত্ব আমরা জানি না। তবে যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে ঐরূপ প্রবাদসংবলিত পুস্তক অচির-ভবিষ্যতে আবিষ্কার একটা বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। গণেশ নারায়ণের স্ত্রী মহারাজ্ঞী ত্রিপুরা দেবী এবং যদুর স্ত্রী নবকিশোরীর কাহিনী করুণ রসের উৎস, সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের উপর ভাদুড়ীবংশের চোখের জল এখনও শুকায় নাই। ইহা বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলে সুবিদিত, যদুর সহিত নবকিশোরীর এবং নবকিশোরীর সঙ্গে আসমানতারার চিঠিপত্রগুলি সান্ন্যাল মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই চিঠিগুলি সে-কালের রহস্যের মোড়কে আঁটা তপ্ত অশ্রু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত দিনের চিঠিপত্র এগুলি উপকথার মত শোনায়। কিন্তু এই ভাবে চিঠিপত্র রক্ষা করিবার প্রথা ও ধারা আমরা বাঙ্গলার ইতিহাসে আরও কয়েকবার পাইয়াছি। রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত উক্ত রাজার মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে লিখিত। সকলেই জানেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ঐতিহাসিক ও ভাষাবিৎ পণ্ডিত কেরি সাহেবের অনুমোদনে উহা লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন ঐ পুস্তক ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে লইয়া সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে জন কোম্পানির কতকগুলি চিঠিপত্র দেওয়া আছে—তাহাও এই ধরণের। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবগোস্বামীর সঙ্গে কবি গোবিন্দদাসের সংস্কৃত চিঠিপত্রগুলি নরহরিবিরচিত ভক্তি-রত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ভক্তি-রত্নাকর বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং

নবকিশোরী ও আসমান-তারা।

গোবিন্দদাস ও জীব গোস্বামী এই পুস্তক রচনার পূর্ব্বে স্বর্গারোহন করিয়াছিলেন। এই সকল চিঠিপত্রের ভাষা হয়ত কিছু রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাদের মূল ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণ এই ভাবের চিঠিপত্র অনেক রক্ষা করিয়াছেন। এদেশের বাদসাহ আহমেদ শাহ (১৪০৯ খৃঃ) যখন জোয়ানপুরের রাজা ইব্রাহিমকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভয়ে ভীত হইয়া তাইমুরের পুত্র সাহরুকের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হন, তখন তাতার সম্রাট্ জোয়ানপুরের বাদশাহকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে (১৯১০, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২০ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, নবকিশোরী বাদসাহকে (যত্ন) যে কৌটা পাঠাইলেন তন্মধ্যে একটি ভূর্জ্জপত্রে লিখিত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্লোক অবশ্য বাঙ্গলায় এবং সান্যাল মহাশয় তাহার সবগুলি দিতে পারেন নাই। তারকা চিহ্ন দিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি অপ্রাপ্য।" নবকিশোরীর পুত্র অনুপনারায়ণ। যত্ন তাঁহার মাতা ও স্ত্রীর প্রতি যে নির্ম্মমতা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চির অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি নিজে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিলেন, কিন্তু এই সময়ে একটাকিয়ার জমিদারির আয় তিনগুণ বাড়িয়া গেল, এই সকল ঘটনা ভাদুড়ীবংশের চিরস্মরণীয়। সুতরাং মূলতঃ বাদসাদ দিয়া এই সকল কাহিনীর যে অনেক কথাই সত্যমূলক তাহা আমরা বলিতে পারি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাম্রশাসন ও মুদ্রায় যাহা নাই, তাহা যে ইতিহাস নহে, এবং বিজ্ঞানসঙ্গত বলিতে যে শুধু মুদ্রা ও তাম্রশাসন বুঝায় এই অদ্ভুত কথা আমরা আধুনিক কয়েক জন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের মুখেই প্রথম শুনিয়াছি।

একটাকিয়া বংশের প্রতাপ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের মশালের আলো। চলনবিলের স্বচ্ছ তোয়রাশি মুকুরের মত সম্মুখে রাখিয়া যে গভীর গড়খাই-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ এক সময়ে শত্রুর অনধিগম্য ছিল, যে একটাকিয়া বংশের গৌরবের জন্য হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া লড়াই করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে রাজকুলের জয় পাঠান সেনাপতি কামতার খাঁ প্রাণপাত করিয়া সেই সুচিরাগত রাজভক্তির সংস্কার উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছিলেন, যেখানে ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণে উৎসবের শত শত দীপ জ্বলিয়া উঠিত, যেখানে ব্রাহ্মণগণ পুঁথি ফেলিয়া একটু হইলেই তরবারি হস্তে সমরাঙ্গনে নামিতেন, সেই বঙ্গের শেষ গৌরবরশ্মি একটাকিয়া আজ কোন্ অস্তাচলে মিলাইয়া গিয়াছে!

যদুসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, তিনি গণেশের এক মুসলমানী উপপত্নীর গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। কেহ আবার বলেন, তিনি কুতুব উল আলাম নামক কোন মুসলমান সাধুর চর্ব্বিত পান খাওয়াতে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আসমানতারা নামক কোন মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গণেশ কোন পাঠান ওমরাহের সম্পত্তি হরণ করেন নাই, পরন্তু অনেক মুসলমান বিদ্বান্ ও সাধু ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি দান করিতেন, এতৎ সত্ত্বেও কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারী মুসলমানের

যদু কেন মুসলমান হইলেন?

প্রবর্ত্তনায় বিখ্যাত সাধু নুর কুতুব উল্ আলম বিহারের অধিপতি ইব্রাহিম সাহকে গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। গণেশ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া এই শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, কিন্তু নিজে মুসলমান না হইয়া যত্নকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অনুমতি দেন। তৎসম্বন্ধে প্রচলিত নানারূপ উপাখ্যান দৃষ্টে মনে হয়, অসামান্য প্রতিভা ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও রাজা গণেশ খুব শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। চারিদিকে দুর্দ্দান্ত পাঠান বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহ, হিন্দুদিগকে ইহারা বিধর্ম্মী ও কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ইহাদের সকলের শীর্ষস্থানে গণেশ রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ শঙ্কিত ছিলেন। তাঁহার মাথার উপর চিরদিন শানিত খড়্গ ঝুলিতেছিল। রাজনীতি-কৌশল, পরাক্রম, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি নানা গুণে মণ্ডিত হইয়া তিনি তাঁহার রাজত্বের আপৎ কালটা কোনরূপে কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

কথিত আছে রাজা যত্ন বা চেৎমল্ল 'জালালুদ্দিন' উপাধি ধারণ করিয়া হিন্দুদের প্রতি অমানুষী অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে সুবর্ণধেনুব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে তিনি গোমাংস খাওয়াইয়া বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন সুবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেদকে সোণারগাঁ হইতে আনিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মত সমস্ত রাজকার্য্য করিতেন। তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বহু শিল্পকলা-বিশিষ্ট মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচীন গৌড় নগর সুসমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্ন মসজিদ, অতিথিশালা, দিঘী প্রভৃতি "জালালী কীর্ত্তি" বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ বর্ষকাল নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করার পর তিনি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ স্বীয় রাজ্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া ইনিই কবি চণ্ডীদাসকে হস্তীর পৃষ্ঠে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু ষ্টেপলটন সাহেব অনুমান করেন,—উক্ত কবির হত্যাকারী সম্ভবতঃ ইনি নহেন, পরবর্ত্তী বঙ্গেশ্বর।

যত্নু কর্ত্তৃক অত্যাচার।

জালালুদ্দিন—১৪১৪-১৪৩১ খৃঃ।

জালালুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহম্মদ সাহ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইহার রাজত্ব কালে জোনপুরের বাদসাহ ইব্রাহিম বঙ্গদেশে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহাদের আক্রমণে আহম্মদ সাহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাইমুরলেনের পুত্র সাহরুকের নিকট নিজ রাজ্যের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি পাঠান। সাহরুক সুলতান ইব্রাহিমকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা ষ্টুয়ার্ট তাঁহার ইতিহাসে আমূল উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা সেই সময়ে সম্রাটদের প্রতিহিংসার ইচ্ছা যেরূপ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা রোমাঞ্চকর। সেই চিঠির মর্ম্ম এই—"এই জগতের রাজ-চক্রবর্ত্তীর আদেশ পাওয়া মাত্র এক দিনের মধ্যে আপনি বঙ্গদেশের যত লোক বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া

আহম্মদ সাহ—১৪৩১-১৪৪২ খৃঃ।

সাহরুকের পত্র।

দিবেন এবং কাজিদের দস্তখতি চিঠি দ্বারা প্রমাণ করিবেন যে আপনি আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। যদি কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব করেন, তবে প্রথমতঃ আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র কাবুলের শাসনকর্ত্তাকে, তৎপর খোটান, গিজনি ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তাদিগকে আপনাকে শাস্তি দিতে পাঠাইব। ইহারা গেলে যদি আপনার যথেষ্ট শাস্তি না হয়, তবে ক্রমান্বয়ে আমার সেনাপতি ফিরোজ সাহ, তৎপরে আমার প্রিয় পুত্র সামসুদ্দিন মহম্মদকে খোরাসান প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যের সৈন্য সহকারে প্রেরণ করিব।" এই ভাবে তাঁহার আর আর পুত্রগণ এবং তাঁহার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যব্যাপী বিবিধ সেনানিবাসগুলির লক্ষ লক্ষ সৈন্য পাঠাইবেন—তাহার একটা বড় রকমের তালিকা দেওয়া আছে। উপসংহারে লিখিত আছে—"আমার প্রিয় পুত্র উলুক বেগ সুরগণকে তুর্কিস্থানের সমস্ত সৈন্য সহকারে পাঠাইব। তাহার উপর আদেশ থাকিবে যে আপনার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করে, অথবা তাহা এমন জায়গায় ঝুলাইয়া রাখে, যেখান হইতে কাকগুলি মাংস চিরিয়া খাইতে পারে।"

এই ভীতি-প্রদর্শনের ফলে সুলতান ইব্রাহিম, তাইমুরলেনের পুত্রের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া নিস্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং আহম্মদ সাহও নিরুপদ্রবে অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪২ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইহার কোনও সময়ে দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস গণেশ "দনুজমর্দ্দন" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মুসলমান-বিজয়ী হিন্দু রাজাদের ঐরূপ উপাধি আমরা আরও দুই এক স্থানে পাইয়াছি। কিন্তু সন তারিখের গোলযোগ না মিটিলে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি আবিষ্কৃত কুলজীগুলির উপর কোনই আস্থা স্থাপন করা যায় না। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে আমরা ঐ সকল তথাকথিত বংশাবলী একবারে অগ্রাহ্য করি। শ্যামল বর্ম্মা সম্বন্ধেও ঐরূপ বংশাবলী উপস্থিত করা হইয়াছিল। বংশাবলীর প্রমাণ ঠিক ঐতিহাসিক না হইলেও তাহাকে আমরা ইতিহাসের অন্যতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু জাল বংশাবলী ও মেকী টাকা চালাইতে গেলেই তাহা চলে না। রাখালবাবু এই সকল পর্ব্বতপ্রমাণ জাল বংশাবলীর উপর সজোরে দণ্ডোলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব কে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উভয়ের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, দনুজমর্দ্দন ১৩৪০ শকে (১৪১৮ খৃঃ) এবং মহেন্দ্রদেব ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৫ শকে (১৪১৭-১৪২২ খৃঃ) বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেছিলেন।

দাস নাসিরের ৮ দিনের রাজত্ব। নসিরউদ্দীন মহম্মদ সাহ—১৪৪২-১৪৫৯ খৃঃ।

আহম্মদের পুত্র ছিল না। নসির নামক এক দাস প্রবল হইয়া সিংহাসন দখল করেন, কিন্তু তিনি ৮ দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ওমরাগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দিন ভেঙ্গরের এক তরুণ বয়স্ক বংশধর নসির সাহকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইনি অপ্রতিহতপ্রভাবে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন। ইনি গৌড়ে এক বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

বরবক সাহ—১৪৫৯-১৪৭৪ খৃঃ।

নসির সাহের পুত্র বরবক সাহ রাজা হইয়া আফ্রিকার আবিসিনিয়াবাসী নিগ্রোদিগকে তাহার সৈন্যভুক্ত করেন, ৮ হাজার নিগ্রো অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার অনুগমন করিত, তাঁহার দেখাদেখি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাজারাও এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিশ্বাসী ও সাহসী দেখিয়া নিজেদের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন "য়ুরোপীয়দের হাতে পড়িলে যাহারা পশুর মত ব্যবহার পাইত, এই দেশের রাজারা তাহাদিগকে অনুরাগ ও প্রীতি প্রদর্শন করাতে তাহাদের কেহ কেহ বড় সেনাপতি, এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাও হইতে পারিয়াছিলেন।

ইউসফ সাহ—১৪৭৪-১৪৮২ খৃঃ।

নসির সাহের পুত্র ইউসফ সাহ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি সুপণ্ডিত ও ন্যায়পর বাদসাহ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গরীব ও ধনী ইহাদের মধ্যে বিচার কালে কোন তারতম্য করিতেন না। পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট কাজিদিগকে ইনি কঠোর শাস্তি দিতেন। ইহার রাজত্বকালে শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল। ইনি পাণ্ডুয়ার অনেকগুলি সূর্য্য ও বাসুদেবের মন্দির মসজিদে পরিণত করেন। "বাইশ দরজা" নামক গৌড়ের বিশাল মসজিদটি ভগ্ন সূর্য্যমন্দিরের উপাদানে নির্ম্মিত।

জালালুদ্দিন ফতে সাহ—১৪৮২-১৪৮৩ খৃঃ।

ইউসফ সাহের সন্তান হয় নাই। আমির ও মন্ত্রীরা রাজকুলজাত একটি যোগ্য যুবককে রাজপদে মনোনীত করেন। ইনি "ফতে সাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি নবীন বয়সেই পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। নিগ্রো ও খোজারা রাজদরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছে দেখিয়া ইনি খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুতর দোষ প্রচলিত ছিল, তজ্জন্য বাদসাহ তাহাদের কতকগুলি বড় লোককে কঠিন শাস্তি দেন এবং অপর ব্যক্তিদিগকে সাধারণ ভৃত্য অথবা প্রজার শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিলেন। খোজাগণের অন্তঃপুরে গতিবিধির কোন বাধা ছিল না। এই সুবিধা পাইয়া তাহারা ইহাকে রাত্রিকালে শয়নাগারে হত্যা করে। ফতে সাহ ১৪৯০ খৃঃ অব্দে নিহত হন। ইহার রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা—চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম; (১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী)। অন্তঃপুর হইতে রাজা প্রাতে বাহিরে আসিবেন—দেহরক্ষীরা অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় দেখা গেল, বারেক নামক খোজা রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন। তখন প্রধান মন্ত্রী খান-জাহান এবং প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক আণ্ডিল রাজধানী হইতে দূরে ছিলেন এবং অপরাপর সেনাপতিদিগকে ঘুস দিয়া বশীভূত করা হইয়াছিল—সুতরাং

সুলতান সাহাজাদা—আট মাস রাজত্ব।

বারেক খোজা "সুলতান সাহাজাদা" উপাধি লইয়া অনায়াসে সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি খোজা ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চপদ দিতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন সম্ভ্রান্ত লোকেরা সুবিধা পাইলেই তাঁহার প্রতিকূলতা করিবেন। তিনি রাজ্যময় খোজা গুপ্তচর নিযুক্ত করেন; তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কে কি করিতেছে বা কহিতেছে, তাহার বিবরণী

রাজাকে শুনাইত। প্রথমতঃ প্রধান মন্ত্রী খান জাহান ও প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক আণ্ডিলকে তিনি খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সিংহাসনের উপর চিরকাল বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন, এই শপথ গ্রহণ করাতে কতকটা দ্বিধার সহিত তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব কার্য্যে বহাল রাখিলেন। ইঁহারা বাহিরে প্রভুভক্তির ভাণ করিলেও ভিতরে ভিতরে রাজাকে হত্যা করিবার সুবিধা খুঁজিতেছিলেন, অত্যন্ত চতুরতার সহিত উদ্দেশ্য গোপন রাখাতে রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রতি আস্থাবান্ হইলেন। অন্তঃপুর-রাজগৃহরক্ষীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া আণ্ডিল এক রাত্রে সম্রাট্‌কে আক্রমণ করেন। তখন তিনি খোজার স্বভাবানুযায়ী স্ত্রীজনোচিত বস্ত্রাদি পরিয়া মদ খাইয়া সিংহাসনের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। আণ্ডেল তাঁহাকে সিংহাসনস্থিত দেখিয়া মারিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কারণ তিনি সিংহাসনের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন এই শপথ লইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাজা অপর্য্যাপ্ত মদিরা-পানে নেশার ঝোঁকে ঘরের মেজেতে পড়িয়া যান, তখন আণ্ডিল তাঁহাকে খড়্গাঘাত করিলেন। বাদসাহের গায়ে অসুরের জোর ছিল, সেই খড়্গাঘাত খাইয়াও তিনি আণ্ডিলকে ধরিয়া ফেলিয়া ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। আর দুই একটি লোকের সাহায্যে আণ্ডিল রাজাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মরিয়াছেন মনে করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে অন্তঃপুর-রক্ষী প্রধান খোজা তাওয়াচি বাশী ঘরে আসিলে আহত রাজা তাহাকে বিশ্বাসী মনে করিয়া আণ্ডিলের কথা বলিলেন এবং কি কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ দিলেন। খোজা যাইয়া আণ্ডিলকে জানাইলেন, রাজা মরেন নাই। তখন আণ্ডিল রাজগৃহে আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। সাহাজাদা মাত্র ৮ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর অমাত্যেরা ঠিক করিলেন, স্বর্গীয় রাজা ফতেসাহের দুই বৎসর বয়স্ক শিশু কুমারকে রাজা করিবেন। তাঁহারা বিধবা রাণীকে যাইয়া এই কথা বলিলেন, এবং বলিলেন, শিশুর রক্ষকই অভিভাবকস্বরূপ রাজ্য শাসন করিবেন। এখন রাজ্ঞী কাহাকে ঐ পদে মনোনীত করিবেন? রাজ্ঞী এই আপৎসঙ্কুল রাজপদে শিশুটিকে অধিষ্ঠিত করিতে মনে মনে ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি শপথ করিয়াছেন—যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে পারিবে, তাঁহাকে তিনি রাজসিংহাসনের যোগ্য মনে করিবেন। এই অবস্থায় শিশু আর রাজা হইলেন না—খোজা মালেক আণ্ডিল ফিরোজসাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বেই যোগ্যতা ও সৎসাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছেন, রাজা হইয়া তিনি জনপ্রিয় নানা অনুষ্ঠান-দ্বারা সুনাম অর্জ্জন করিলেন। কথিত আছে তিনি একদা একলক্ষ টাকা গরীবদিগকে দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, টাকাগুলি একত্র করিলে কত বড় একটা বৃহৎ স্তূপ হয় ইহা দেখাইয়া রাজাকে এরূপ অপরিমিত দান সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রীরা টাকাগুলি জড় করিয়া রাজার যাইবার পথে রাখিয়া দিয়াছিলেন, রাজা ঐ টাকাগুলি দেখিয়া "এসব কি?" জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন এত অধিক অর্থ তাঁহার

ফিরোজ সাহ—১৪৮৮-১৪৮৯ খৃঃ।

আজ্ঞায় বিতরিত হইবার কথা একজন মন্ত্রী স্মরণ করাইয়া দিলেন। রাজা বলিলেন "এত অল্প!" ইহার দ্বিগুণ দেওয়া হউক। ফিরোজ সাহের নির্ম্মিত মসজিদ, দীঘি ও রমণীয় এক হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ এখনও গৌড়ে দৃষ্ট হয়। ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে ফিরোজ স্বর্গারোহণ করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নামে মাত্র রাজা হইলেন। হোরস খাঁ নামে এক আবিসেনীয় দাস মন্ত্রী হইয়া সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিলেন। ইহার ব্যবহার সকলেরই বিরক্তিকর হইল।

মহম্মদ সাহ—১৪৮৯-১৪৯০ খৃঃ।

আবিসেনীবাসী সিদ্ধিবদ্দর নামক এক ব্যক্তি হোরস খাঁকে গোপনে বধ করিয়া তৎপরে মহম্মদ সাহকে নিধন করিলেন। কেহ কেহ বলেন মহম্মদ সাহ ফিরোজ সাহের পুত্র নহেন। তিনি ফতে সাহের শিশু পুত্র, (যাঁহাকে মন্ত্রীরা একদা রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন)। মহম্মদ সাহের রাজত্বকাল এক বৎসর মাত্র।

সিদ্ধিবদ্দর 'মুজাফর সাহ' উপাধি লইয়া রাজা হন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন। তিনি দরবারের অনেক প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করেন;

মুজাফর সাহ—১৪৯০-১৪৯৩ খৃঃ।

রাজা, আমীর কিংবা জমিদার তাঁহার হাতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি নিজ হস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন। এই ভাবে তিনি স্বয়ং যে সকল লোকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ঐতিহাসিকগণ-প্রদত্ত তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে তাহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। অবশেষে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন বিদ্রোহী হইয়া গৌড় অবরোধ করেন। রাজা ৫,০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী হাবিসী সৈন্য এবং বাঙ্গালী ও পাঠান ২৫,০০০ সৈন্যসহ বহুকাল দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বাহির হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করেন। ২৫,০০০ লোক যুদ্ধে নিহত হয়, স্বয়ং মুজাফর সাহ নিহতদিগের একজন। কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন মুজাফর সাহের পদাতিক সৈন্য-নায়ককে উৎকোচ-দ্বারা হাত করিয়া লইয়া ১৬ জন গুপ্তঘাতকসহ রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

পরবর্ত্তী বাদসাহ হুসেন সাহ বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে

আলাউদ্দিন হুসেন সাহ—১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে চৈতন্য দেব বঙ্গদেশ প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে হইবে।

হুসেন সাহ জীবনের প্রথম সময়টা সুবুদ্ধি রায় নামক গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারীর ভৃত্য ছিলেন। একদা পুষ্করিণী খনন করিতে যাইয়া কার্য্যে শিথিলতার জন্য সুবুদ্ধি রায় তাঁহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে সেই বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেক দিন ছিল।

হুসেন সাহ প্রথমতঃ দুঃস্থ অবস্থায় থাকিলেও তিনি সৈয়দবংশজাত ছিলেন। চাঁদপুরের কাজি এই সংবাদ প্রথম জানিতে পারিয়া তাঁহার দুর্দ্দশা মোচন করিলেন।

এখন যেমন হজরত মহম্মদের বংশধর 'সৈয়দ' বাঙ্গলায় অনেক দেখা যায়, তখন তাহা না
এজন্য এদেশে সেই সময়ে একজন সৈয়দের আবির্ভাব মুসলমান সমাজে খুব বড় কথা ছিল। কাজি সৈয়দ হুসেনকে রাজদরবারে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাঁহার নিজ কন্যাকে এই যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ক্রমে সৈয়দ হুসেন তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইয়া গৌড়ে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং মুজাফর সাহকে হত্যা করিয়া বাঙ্গলার গদি দখল করিয়া লইলেন। তাঁহার বংশগৌরব এবং রাজোচিত নানাগুণে মুগ্ধ হইয়া আমীরগণ এক বাক্যে তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ব্ব নৃপতিকে হত্যা করার পর তিনি যুদ্ধরীতি অনুসারে গৌড় লুণ্ঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে লুণ্ঠন করিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি স্বীয় সৈন্যগণের ১২,০০০ লোককে হত্যা করিয়া লুণ্ঠিত সমস্ত বহুমূল্য সামগ্রী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন।

হুসেন সাহ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খুব আদর করিতেন, পণ্ডিতদিগকে বৃত্তি দিতেন এবং বহু বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার ও অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আসাম, কামরূপ, ও হিমালয়ের উপত্যকা পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়ী সৈন্যসহ অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল পার্ব্বত্য দেশবাসীকে জয় করিয়া তথা হইতে মধ্যে মধ্যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেও তত্তদ্দেশ-গুলি তাঁহার অধিকারভুক্ত করিতে পারেন নাই, বর্ষাগমে তাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত ও তাড়িত করিয়া দিয়াছে। হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় ভুটান দেশ হইতে হুসেন সাহের পুত্র অনেক লাঞ্ছনা পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি পণ্ডিত ও সাধু-ব্যক্তিদিগকে এতদূর সম্মান করিতেন যে সুপ্রসিদ্ধ সাধু কুতব উল আলমের সমাধি দেখিবার জন্য তাঁহার জন্মতিথিতে প্রতি বৎসর পায়ে হাঁটিয়া পাণ্ডুয়ায় যাইতেন।

হুসেন সাহ হাবিসী ও নিগ্রোদিগের ক্ষমতা একেবারে খর্ব্ব করেন, তাঁহারা বাঙ্গলাদেশে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু ইঁহারা প্রায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতেন। হুসেন সাহের দৃষ্টান্তে আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর স্থানের রাজারা ইঁহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন—ইঁহারা পরিশেষে "সিদ্ধি" নামে দাক্ষিণাত্যে আবার প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সৈয়দ হুসেনের দরবারে জৌনপুরের বাদসাহ সাহ হোসেন বেলোললোডি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন। গৌড়েশ্বর এঁই সম্মানিত অতিথিকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করিয়া তাঁহাকে রাজযোগ্য বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত সাহ হোসেন সৈয়দ হুসেনের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গৌড়েশ্বর একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন সুরক্ষিত অবস্থায় গৌড়ে আছে।

রাজা হইবার পরে তাঁহার রাজ্ঞী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারিলেন কে ইহা করিয়াছে। সুবুদ্ধি রায় মোটের উপর হুসেনকে পিতৃস্নেহে পালন করিয়াছিলেন, ভৃত্যকে দুই এক ঘা বেত মারা তখন একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল না। হুসেন সাহ

সুবুদ্ধি রায়কে খুবই ভালবাসিতেন, কিন্তু রাজ্ঞী তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্ররোচিত করেন; রাজা অনেক বুঝাইলেও রাণী কিছুতেই সুবুদ্ধি রায়কে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। হুসেন সাহ অগত্যা তাঁহার মুখে গোমাংস দিয়া তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিলেন। পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা চাহিয়া সুবুদ্ধি রায় জানিতে পারিলেন যে তাঁহার তুষানলে প্রাণত্যাগ করা উচিত। সুবুদ্ধি রায় সম্বন্ধে আমরা শেষে লিখিব। এই বিষয়টি চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে এবং ঘটনাটি ঐ পুস্তক রচনার বেশী পরবর্ত্তী নহে, এজন্য উহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে তরুণ বয়সে এক হিন্দু ভূম্যধিকারীর ভৃত্য ছিলেন একথা অনেক ঐতিহাসিকই লিখিয়াছেন।

পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন হুসেন সাহ অতর্কিতভাবে যাইয়া উড়িষ্যার অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন করেন, প্রতাপ রুদ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড়বিজয়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব বহু লোকক্ষয় ও দেশের দুঃখ বৃদ্ধি হইবে, এই হেতু দেখাইয়া উক্ত সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন—প্রতাপ রুদ্রের বক্ষ লৌহকবাটের ন্যায় দৃঢ় ছিল, এবং প্রসিদ্ধ পাঠান মল্লগণ তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ভয় পাইতেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব মুসলমান লেখকদের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, হুসেন সাহ পুরীর রাজাকে জয় করিয়া তাঁহাকে সামন্ত রাজার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রদত্ত এই বিবরণ অলীক।

দিল্লীশ্বর সেকেন্দর জৈনপুর দখল করিয়া বঙ্গবিজয়ার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু আলাউদ্দিন হুসেন সাহ তৎপুত্র দানিয়ালকে বহু উপঢৌকনসহ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। সেকেন্দর সাহ প্রীত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিতে হুসেন সাহ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকৃত হন। তাঁহার সহিত ত্রিপুরারাজের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল এবং তিনি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাবিজয়ার্থ পরাগল খাঁ নামক সেনাপতিকে ও তৎপুত্র ছুটি খাঁকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি মমারক খাঁকে ত্রিপুরেশ্বর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। ত্রিপুরাপ্রসঙ্গে সে সকল কথা পুনরায় উল্লেখ করা হইবে। ১৫২০ খৃঃ অব্দে (কাহারও কাহারও মতে ১৫১১ খৃঃ), হুসেন সাহের মৃত্যু হয়। গৌড়ে তাঁহার সুচারু কারুলেখাঙ্কিত সমাধি-মন্দিরে সিংহদ্বারের দুই দিক চিরিয়া যে বটবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে, তাহার জটিল, স্থূল ও দীর্ঘ শিকড়গুলি মহাদেবের বক্ষোলম্বিত জটাজুটের মত দেখায়।

হুসেন সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত সাহ পাঠান রাজাদের নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই,—বরঞ্চ তাঁহার ১৭ ভাইয়ের প্রত্যেককে রাজোচিত মর্য্যাদা ও উচ্চ শাসনকার্য্যভার দিয়াছিলেন। নসরত সাহের সময়ে দিল্লীতে অত্যন্ত রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, সুলতান ইব্রাহিম লোডীকে পরাস্ত করিয়া বাবর ১৫২৯ খৃঃ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা মহম্মদ পলাইয়া নসরত সাহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইব্রাহিম লোডির এক কন্যাকে মহম্মদ সাহ লইয়া গিয়াছিলেন। নসরত সাহ এই কন্যাকে জাঁকজমকের সহিত বিবাহ করেন এবং মহম্মদকে রাজোচিত বৃত্তি দিয়া

নাসির উদ্দীন নসরত সাহ—১৫১৯-১৫৩২ খৃঃ।

গৌড়ে থাকিতে সুবিধা করিয়া দেন। বাবর দেখিলেন, বঙ্গদেশকে নসরত সাহ পলায়িত আফগান আমির ও সেনাপতিদের একটা আড্ডায় পরিণত করিয়াছেন, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। নসরত সাহ তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনাদি দিয়া নিরস্ত ও বশীভূত করেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়, তখন মহম্মদ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগলদের হস্ত হইতে জোয়ানপুর রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। সৈয়দ-বংশোদ্ভূত হইলেও নসরত সাহের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ছিল। কোন খোজাকে তিনি গুরুতর শাস্তি প্রদর্শনের ভয় দেখাইয়াছিলেন। একদিন যখন তিনি পিতার সমাধি-মন্দিরে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন, সেই খোজা তাঁহাকে সুবিধা পাইয়া হত্যা করে (১৫৩২-১৫৩৩ খৃঃ)। এই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয়, কারণ ঐ বৎসর চৈতন্যদেবের লীলাবসান হইয়াছিল।

নসরত সাহের হত্যার পর তাঁহার পুত্র ফিরোজ সাহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাঁহার খুল্লতাত (নসরত সাহের ভ্রাতা) মহম্মদ সাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা মকদুম আদম বিদ্রোহী হইয়া শের সাহের সঙ্গে মিলিত হন। শের সাহ উত্তরকালে হিন্দুস্থানের অধিপতি হইয়াছিলেন, এখন হইতেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এদিকে বেহারাধিপতি তরুণবয়স্ক জেলাপ শের সাহের উপর বিরক্ত হইয়া মহম্মদের সহিত মিলিত হয়। শের সাহ বিহারের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জেলাপ এই দুর্গ অবরোধ করেন। এখানে পাঠান ও বাঙ্গালীদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। জেলাপের অধীনে গৌড়সৈন্য শের সাহের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া পরাস্ত হইল (১৫৩৫ খৃঃ)। শের সাহ চুনার অধিকার করিয়া সমস্ত বিহার দেশ দখল করিয়া লইলেন এবং গৌড়ের দিকে অভিযান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড়েশ্বর মহম্মদ বিপদে পড়িয়া হুমায়ুনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তখন বঙ্গদেশ শের সাহের হস্তগত।

আলাউদ্দিন ফিরোজ-সাহ—তিন মাস মাত্র, গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহ—১৫৩২-১৫৩৮ খঃ।

চুনার দুর্গ দখল করিয়া হুমায়ুন বঙ্গদেশটা শের সাহের হাত হইতে উদ্ধার করিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার গতি ও কার্য্যনীতি অতি মন্থর ছিল, সুবিধাগুলি হারাইয়া তিনি বঙ্গে উপস্থিত হইলেন। শের সাহ প্রাচীর তুলিয়া নিজের বাসস্থান শত্রুর অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। মোগল-সৈন্য বাঙ্গলার আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। তিনমাস কালের মধ্যে কোন যুদ্ধবিগ্রহাদি হইল না। হুমায়ুনের মোগল-সৈন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। শের সাহ একটা সন্ধির উদ্যোগ করিলেন, হুমায়ুন এই সুযোগ ভগবানের দান মনে করিয়া খুসী হইলেন। মোগল-সৈন্যদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শের সাহের গুরু দরবেশ খিলিলের যত্নে ও চেষ্টায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। হুমায়ুন শের সাহকে বঙ্গ ও বিহারের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার

করিয়া লইলেন। হুমায়ুনের রাজ্যে শের সাহ উৎপাত করিবেন না এবং সম্রাটের গতিবিধির বিঘ্ন ঘটাইবেন না, এই সর্ত্তে কোরান স্পর্শ করিয়া শের সাহ অঙ্গীকার করিলেন। রাত্রি-ভোর মোগল-সৈন্তের আনন্দোৎসব চলিল। কিন্তু শেষ রাত্রে শের সাহ কোরানের অবমাননা করিয়া ও সন্ধি-লঙ্ঘনপূর্ব্বক অতর্কিতভাবে হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করিয়া আট হাজার মোগল-সৈন্ত হত্যা করিলেন। হুমায়ুন স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। এই ঘটনা ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল।

শের সাহ কর্ত্তৃক হুমায়ুনের পরাজয়—১৫৩৯ খৃঃ।

শের সাহের পিতার নাম হুসেন স্থর। জোয়ানপুরের শাসনকর্ত্তা যুবক হুসেনকে স্থদক্ষ ও পরিশ্রমী দেখিয়া সাসারাম ও তাণ্ড্রাতে কতকটা জমিদারী প্রদান করেন। হুসেনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, ফরিদ এবং নিজাম। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলেন, তাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল। ফরিদ জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

শের সাহ—১৫০২-১৫৫৩ খৃঃ।

হুসেন তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, তজ্জন্য প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ফরিদ জ্যেষ্ঠ হইলেও তাহার প্রতি স্বাভাবিক স্নেহের কতকটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। জোয়ানপুরের শাসনকর্ত্তা জেমালের অনুগ্রহে ফরিদ ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তরুণ বয়সেই তিনি সাদির সমস্ত কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তৎকাল-প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত হইয়াছিলেন; ইতিহাস ও কবিতার দিকেই তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। এই ফরিদ একদা একক এক ব্যাঘ্র স্বহস্তে বিনাশ করিয়া 'শের সাহ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শের সাহ কতক কাল জোয়ানপুরে আসিয়া তাঁহার পিতার জায়গীর শাসন-সংরক্ষণ করেন। হুসেন দেখিলেন, পুত্রের অসাধারণ প্রতিভায় কাজ অতি স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। তিনি উঁহাকে ঐ কার্য্যেই বাহাল করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী, তাঁহার দুই পুত্র সোলেমান ও আহাম্মদের জন্য স্বামী কিছুই করিলেন না, এই আক্ষেপ-বাণী তাঁহার কর্ণে অবিরত গুঞ্জরণ করিতে লাগিলেন। সোলেমান এখন বড় হইয়াছে, তাহাকেই পরগনার শাসন কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হউক, তিনি এই আব্দার করিয়া হুসেনের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। শের অতি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছিলেন, স্থতরাং তাঁহার পিতা প্রিয়তমার অনুরোধ লইয়া সত্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শের সাহ দেখিলেন, অবস্থা বড় জটিল হইয়া তাঁহাদের গার্হস্থ্য স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি নষ্ট হইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তখন তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় ঐ পদ ছাড়িয়া দিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়া দৌলত নামক ইব্রাহিম লোভির এক প্রধান ওমরাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ব্যক্তি শের সাহের কার্য্যদক্ষতা ও নানা গুণে মুগ্ধ হইয়া সম্রাটের সঙ্গে শেরের আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিলেন। দৌলতের মারফত শের তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিয়া এক আবেদন

বাল্য ও কৈশোর।

দরবারে পেশ করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার পিতার পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যাহাতে জীবনযাপন করিতে পারেন তদুচিত ব্যবস্থা তিনি করিবেন। উত্তরে সম্রাট্ বলিলেন, শের ভাল লোক নহেন, যেহেতু তিনি পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই শেরের পিতৃবিয়োগ হইল এবং শের পৈতৃক বিষয়ের অধিকার-প্রাপ্ত হইলেন।

শেরের বহুদর্শিতা।

বিষয়সম্পত্তির অধিকার লইয়া শেরের সঙ্গে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতার কলহ চলিতে লাগিল—এসম্বন্ধে বেহারের অধিপতি সুলতান মহম্মদের মধ্যস্থতায় কোন ফলোদয় হয় নাই। সুলতান মহম্মদ বিরক্ত হইয়া সাদি নামক এক সেনাপতিকে সৈন্যসহ যাইয়া শেরের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া সোলেমানকে দিতে আদেশ করিলেন। সের সাহ সহসা আক্রান্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনার পর শের সাহ কুড়া ও মাণিকপুরের শাসনকর্ত্তা জুনৈদ্ বর্লাসের নিকট বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্যলাভে সমর্থ হইলেন। বর্লাস নূতন মোগল বাদসাহ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে তিনি সুলতান মহম্মদকে পরাস্ত করিলেন এবং আগ্রা যাইয়া সম্রাটের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। বাবর শেরের দক্ষতাসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও তাঁহার অকপটতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একদিন ওমরাহদের সঙ্গে শেরকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একটা শক্ত মাংসখণ্ড শেরের পাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের গোপনীয় আদেশ অনুসারে তাঁহাকে একখানি মাত্র চামচ দেওয়া হইয়াছিল, ছুরি দেওয়া হয় নাই। মাংসখণ্ড শের আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া ভৃত্যদিগের নিকট একখানি ছুরি চাহিলেন, কিন্তু সম্রাটের গুপ্ত আদেশে তাহারা ছুরি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শের বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া তাহা দিয়া অনায়াসে মাংস কাটিয়া খাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ আমির খলিফা নামক এক মন্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"এই শের খাঁ আফগান তুচ্ছ করিবার মত লোক নহেন। ইনি কালে বড়লোক হইবেন।"

খড়্গদ্বারা কাটিয়া মাংস-ভক্ষণ।

কিন্তু শের খাঁ বুঝিলেন, সম্রাট্-দরবারে থাকা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ্ নহে। তিনি জোয়ানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হওয়াতে তিনি তরুণ রাজকুমার জেলালের অভিভাবক স্বরূপ সেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। জেলাল বড় হইয়া শেরকে আর পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না; এক সময় তিনি শের সাহের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন শেরের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ক্ষমতায় আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার হত্যা পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল, জেলাল পলাইয়া গৌড়ে যাইয়া মহম্মদ সাহর নিকট সেরকে পিতৃরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

জেলালের পলায়নের পর শের সমস্ত বিহার দখল করিয়া ফেলিলেন, এই সময় চুনারের শাসনকর্ত্তা তাজি অতি পরাক্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী লোদি মেলিকি পরমা সুন্দরী

ও গুণবতী রমণী ছিলেন, তাজি ইঁহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। ইঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সপত্নীগণের অনেক পুত্র ছিল। তাহারা বিমাতার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একদা তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রাঘাত করে;—আঘাত গুরুতর হয় নাই; কিন্তু তাঁহার চীৎকারে তাজি উপস্থিত হইয়া পুত্রদের কার্য্য ধরিয়া ফেলিলেন। পুত্রেরা এই অবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। লোদি মেল্লিকি এই বিপদে শের সাহের আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন। শের চুনারে আসিয়া সেই তরুণ ছেলেদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহারা সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শাসন কার্য্যের অযোগ্য ছিল। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতাই শের সাহের হস্তগত হইল। লোদি মেল্লিকি শের সাহকে বিবাহ করিয়া যেটুকু বাকী ছিল তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিহারের ন্যায় চুনারও শের সাহের অধিকার ভুক্ত হইয়া গেল।

বেহার অধিকার।

লোদি মেল্লিকি।

এদিকে গৌড়েশ্বর মহম্মদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বঙ্গ বিজয়ে হুমায়ুন আসিতে ছিলেন। হুমায়ুন চুনার অধিকার ছাড়িয়া দিতে শের সাহকে আদেশ করিলেন, কিন্তু শের কাকুতি মিনতি করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন সন্ধিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু হুমায়ুন পূর্ব্বাঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর শের সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিলেন।

শের এখন শাশারামে ফিরিয়া রোটাস দুর্গের মালিক রাজা বকিসের সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি ছিল এই দুর্গ অধিকার করা, কিন্তু বাহিরে তিনি সৌহার্দ্দ্য দেখাইয়া রাজা বকিসকে হস্ত গত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা সেই সকল মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। শের সাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া দূত-দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "মোগল সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে, এমতাবস্থায় তাঁহার ধনরাশি ও পরিবারের মহিলা-দিগকে রক্ষার উপায় কি? সুতরাং যদি তিনি দয়া করিয়া তাঁহার মহিলাবর্গকে ও ধনগুলি রোটাস দুর্গে স্থান দেন তবে শের নিশ্চিন্ত হইয়া মোগলদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তথাপি মোগলের হাতে তাঁহার পরিবারবর্গ ও ভাণ্ডার পড়ার অপেক্ষা রোটাস রাজের হাতে তাহা দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয় মনে করেন, যেহেতু রাজা অতি উদার ও মোগলেরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা বাহাদুর লোভে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তিনি শের সাহের ভাণ্ডার সহজে করায়ত্ত করিবার সুবিধা পাইয়া অতি দ্রুত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শের সাহ কতকগুলি চৌদলায় কতিপয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী কয়েকটি সৈন্য এবং অপর কতকগুলি চৌদলায় বহু অস্ত্রধারী সৈন্য—এই ভাবে বাহকের সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া সিসার গুলিতে বহু বস্তা ভর্ত্তি করিয়া সেগুলিও দোলায় চড়াইয়া দিয়া বাহকের সঙ্গে পাঠাইলেন। দ্বাররক্ষীরা প্রথম দুই একটি দোলা খুলিয়া বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ও শেষের বস্তাটি খুব শক্ত ধাতব পদার্থ শক্তরূপে আবদ্ধ দেখিয়া আর কোন সন্দেহ করিল না। রোটাস রাজা যখন গোঁফে চাড়া দিয়া এই আগন্তুক সারিবন্দী মহিলা ও ধন ভাণ্ডার দেখিতে ছিলেন,

রোটাস দুর্গ দখল।

তখন তাঁহার সৃক্বণী ও লেলিহান জিহ্বা হয়ত জলার্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যখন বস্তাগুলি নামানো হইল, তখন তাহা চিরিয়া ফেলিয়া গুলি বাহির করিয়া দোলার সৈনিকগণ গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল—অকস্মাৎ মহিলা-বেশী শত শত যোদ্ধা ঘোমটা খুলিয়া শাণিত খড়্গ লইয়া ব্যাঘ্রবৎ রোটাস দুর্গের প্রহরীদিগকে বধ করিতে লাগিল—তখন রোটাস-রাজ পলাইতে পথ পাইলেন না। বঙ্গ ব্যাঘ্র শেরের সৈন্যগণের হস্তে ধনলুব্ধ রাজা নিহত হইলেন।

রোটাস দুর্গের মত এরূপ অজেয় দুর্গ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। একটি পাহাড়ের উচ্চ চুড়ায় এই দুর্গ নির্ম্মিত, অতি বন্ধুর ও দুরারোহ দুই মাইল ব্যাপী এক সরু পথ বাহিয়া এই দুর্গের প্রথম তোরণে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ তিনটি—একটির বহু উর্দ্ধে আর একটি—এই ভাবে স্থিত। প্রত্যেকটি তোরণ অনেকগুলি কামান ও বড় বড় প্রস্তর খণ্ড কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। সর্ব্বোর্দ্ধে দুর্গের চতুষ্কোণ সীমারেখা দশ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপক—তন্মধ্যে নগর, গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র আছে, কয়েক ফুট নিচেই সুনির্ম্মল জলধারা। এক দিকে দুরারোহ উচ্চনীচ বন্ধুর একটা দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের উপান্তে শোণ নদী,—অপর দিকেও অপর একটি নদী—এই দুই নদী সুদীর্ঘ পথ অবতরণ করিয়া নিম্নের দিকে সুগভীর উপত্যকা ভূমিতে মিলিত হইয়াছে। এই ভূমি এরূপ ঘন তরুসঙ্কুল অরণ্যপরিপূরিত যে উহাতে কোন ব্যক্তির প্রবেশ অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

এই একান্ত নিরাপদ্ নিভৃত স্থানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি সুরক্ষিত করিয়া শের সাহ কর্ম্মনাশা তীরে হুমায়ুনের সঙ্গে কোরান স্পর্শ করিয়া যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা একটা খেলনার ন্যায় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অতর্কিত ভাবে সম্রাট্‌কে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

সকল দিক্ হইতে দেখিলে শের সাহের তুল্য প্রতিভা-সম্পন্ন কর্ম্মবীর এবং যোদ্ধা ভারতবর্ষে তখনকার দিনে আর ছিল না। তাঁহার কথার কোন মূল্য ছিল না—তাঁহার সন্ধি ভাবী কোন চক্রান্তের অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। তাঁহার কোরান স্পর্শ কতক গুলি কাগজ ছোঁয়া অপেক্ষা গুরুতর কিছু ছিল না। তথাপি তিনি হুমায়ুনকে দিল্লী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করার পর যে ন্যায়পরতা, ক্ষমা, ও শাসন-দক্ষতা দেখাইয়া ছিলেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। শের সাহের ন্যায়-পরতা ও বিবিধ গুণরাশি সার্ব্বভৌম রাজপদ পাইবার পর হইতে আরব্ধ হইয়াছিল।

সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে ও পরে।

দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া শের সাহ বাঙ্গলার মসনদে খিজির খাঁ নামক শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর মহম্মদ সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন, তিনি খুব রাজকীয় ভাবে চলাফেরা করিতে লাগিলেন, এবং মহম্মদ সাহের আত্মীয় ও ওমরাহগণকে বশীভূত করিলেন। লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল যে ইহার অভিসন্ধি ভাল নহে। শের সাহ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতি ছিলেন, তিনি সংবাদ পাইয়া বাঙ্গলায় চলিয়া আসিলেন।

খিজির খাঁ।

খিজির খাঁ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি শের সাহ খাস ভুক্ত করিলেন।

খিজির খাঁর হাত হইতে শের সাহ শাসন ভার কাড়িয়া লইয়া বাঙ্গলা দেশকে দ্বাদশ মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া ইহাদের সকলের উপর কাজি ফজলৎ নামক এক বিজ্ঞ, রাজনীতি-কুশল ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। দ্বাদশটি শাসনকর্ত্তার অধিকার সাম্য থাকে এবং কেহ কাহারও উপর মাথা ডিঙ্গাইয়া না উঠেন,—এই সকল পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। শের সাহের উপর তাঁহাদের কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় কি না অথবা কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া তাঁহারা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করেন কি না ইত্যাদি সম্বন্ধে কাজি সাহেবকে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইতে হইত। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া শের সাহ বাঙ্গলা দেশে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিলেন, তথায় আর পাঁচ বৎসর কোন গোলযোগ হয় নাই। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন, তথায় বোমাতে আগুন লাগায় তিনি নিহত হন।

শের সাহ অনেক মসজিদ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি সোণার গাঁ হইতে পাঞ্জাবের নীলাভ নামক সিন্ধুর এক শাখা পর্য্যন্ত ১,৫০০ ক্রোশ-ব্যাপী একটি রাস্তা প্রস্তত করা। এই রাস্তার প্রতি ক্রোশ পরে পরেই পান্থশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং পথিকের শ্রমাপনোদনের জন্য দুই ধারে বৃক্ষ পঙ্‌ক্তি রোপিত ও কূপ খাত হইয়াছিল। তিনি ঘোড়ার ডাক সর্ব্ব প্রথম প্রচলিত করেন এবং **রাজ্যের পরিমাণ-নির্ণয় ও রাজস্ব-নির্দ্ধারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তোডরমল্ল সেই ভিত্তির উপর তাঁহার বহু বিস্তৃত জরিপ কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন।**

মহম্মদ সাহ—১৫৫২-১৫৫৫ খৃঃ।

শের সাহের দ্বিতীয় পুত্র সেলিম সাহ দিল্লীর তক্তে আরোহণ করিয়া মহম্মদ সাহ সুর নামক এক আত্মীয়কে বাঙ্গলার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। সেলিম সাহ মহম্মদ আদিল কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মহম্মদ সাহ সুর বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতি বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং জোয়ানপুর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হিমুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া বঙ্গেশ্বর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপরঘাট নামক স্থানে নিহত হন।

বাহাদুর সাহ—১৫৫৫-১৫৬০ খৃঃ।

মহম্মদ সাহ সুরের পুত্র খিজির খাঁ 'বাহাদুর সাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অধিপতি হইলেন। কিন্তু ইনি প্রবাসে সম্রাট্‌সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার সময় সাহ বন্ন নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গলার গদী দখল করিয়াছিলেন। বাহাদুর তাঁহাকে নিহত করিয়া অচিরে সম্রাট্ মহম্মদ আদিলের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিযান করিলেন। মুঙ্গেরের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সম্রাট্ এই যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং বাহাদুর বঙ্গদেশ ছাড়া জোয়ানপুরও স্বাধীকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। বাহাদুর সাহ ১৫৬১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাহাদুরের সন্তান ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা জালাল সাহ রাজা হইলেন কিন্তু তিনি তিন বৎসর পরে গৌড়ে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার তরুণ বয়স্ক পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন। গিয়াসুদ্দিন নামক এক হত্যাকারীর হস্তে এই পুত্র নিহত হইলেন। অতি অল্প সময়ের জন্য হত্যাকারী গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়, যাঁহার সম্বন্ধে দেশময় নানারূপ কিংবদন্তী আছে, তিনি জালাল সাহের সময় বিদ্যমান ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে সেই কিংবদন্তীর কতকগুলির উল্লেখ করিব। দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয় তারিখ-ই খাঁজেহান, তারিখ-ই শেরসাহী প্রভৃতি পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবদন্তী অবলম্বনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

জালাল সাহ—১২৬০–১২৬৩। জালালের এবং তৎপুত্রের হন্তা গিয়াসুদ্দিন—১২৬৩ খৃঃ।

তাঁহার লেখা অনুসারে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাঁদ রায়। তাঁহার বাল্যকালে সকলে তাঁহাকে 'রাজু' বলিয়া ডাকিত। রাজসাহীর অন্তর্গত বীরজাওন গ্রামে (থানা মান্দা) তাঁহার বাড়ী ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার-বংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উপাধি ভাদুড়ী এবং ইনি জগদানন্দ রায়ের বংশে জাত ("জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুঙর" —কৃত্তিবাস)। কালাপাহাড়ের পিতা নয়নচাঁদ রায় গৌড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চ কাজ করিতেন, এবং তাঁহার উপাধি ছিল "ভুঁইয়া।" কালাপাহাড়ের মাতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন এবং তিনিও অল্প বয়সে হরিভক্ত ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে মাতামহই তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। শ্রীপুর গ্রামবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

কালাপাহাড়।

কালাপাহাড় বলিষ্ঠ, সুদর্শন এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশের রীতি অনুসারে তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অশ্বচালনা ও অস্ত্রব্যবহার প্রভৃতি বীরোচিত গুণেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তখন নাসের সাহের পুত্র বরাবক সাহ গৌড়ের বাদসাহ। কালাপাহাড় তাঁহার বিবিধ সদ্গুণ-দ্বারা শীঘ্রই বাদসাহের দরবারে উচ্চ চাকুরী পাইলেন এবং গৌড়ে বাদসাহের প্রাসাদের অতি নিকটে উচ্চ হিন্দু আমলাদের সহযোগে রাজকর্ম্মচারীদের জন্য নিয়োজিত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় রোজ অতি প্রত্যূষে মহানন্দায় স্নান করিতে যাইতেন। নবাব-কুমারী দুলারী বিবি তখন সপ্তদশ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী। তিনি প্রত্যহ প্রাতে এই রূপবান্ যুবককে স্নানান্তে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে দেখিতেন। একদিন তিনি সহচরীদিগকে বলিলেন, 'এই যুবক ছাড়া আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।' অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ অনুচিত, সহচরীরা এই কথা বলিলে রাজকুমারী উত্তরে বলিলেন 'উহার গলায় পৈতা—উনি ব্রাহ্মণ, ইহার পশ্চাৎ ছাতা-বরদার এবং হাতে সোণার কোষা সুতরাং ইনি ধনী,—ইনি সুকণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে

দুলারী বিবির প্রেম।

থান সুতরাং মূর্খ নহেন। তারপর ইঁহার মনভুলানো রূপ,—তাহার সাক্ষী—আমার দুটি চক্ষু, আর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।'

বাদসাহ ও বেগম উভয়েই রাজকুমারীর মনোভাব জানিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, ইনি একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশজাত। এই বংশের অনেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান বাদসাহেরা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, তাহা গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ রহিল না। বাদসাহ কালাপাহাড়কে ডাকাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য জেদ করিলেন, কালাপাহাড় তেজের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহ কালাপাহাড়কে শূলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। যখন সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, তখন অকস্মাৎ ভূতলে পতিত একটি বিদ্যুতের ন্যায় দুলারী বিবি রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাতককে আদেশ করিলেন, "আগে আমায় হত্যা করিয়া, তারপরে ইঁহার অঙ্গ স্পর্শ কর।" রাজকুমারীর অসামান্য রূপ এবং অপূর্ব্ব অনুরাগ দেখিয়া কালাপাহাড়ের গোঁড়ামি ভাঙ্গিয়া গেল, ফুলশরের আঘাতে ধর্ম্মবেদী বিদীর্ণ হইল। কালাপাহাড় বিবাহে সম্মত হইলেন, কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না। তিনি বহু অনুনয় বিনয় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। জগন্নাথে যাইয়া এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, প্রত্যাদেশের জন্য সাত দিন অনাহারে ধন্না দিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন আদেশ পাইলেন না; পরন্তু পাণ্ডারা অত্যন্ত অপমান করিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্দির হইতে তাড়াইয়া দিল।

বিবাহ ও হিন্দু-বিদ্বেষ।

ইহার পরে প্রতিশোধের পালা। সে প্রতিশোধ যে কি ভয়ানক, তাহা সমস্ত পূর্ব্বভারত হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া বাদসাহের সৈন্যের সাহায্যে তিনি হিন্দুধর্ম্ম জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার পর তাঁহার নাম হইল "মহম্মদ ফর্ম্মুলি", কিন্তু তাঁহার 'কালাপাহাড়' নামই দেশবিশ্রুত। এই নাম অবশ্য হিন্দুরা দিয়াছিলেন; তাঁহার নাম কালাচাঁদ রায় হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উদ্ভব। এই নাম হিন্দুর দেবতা ভগ্নকারীদের পক্ষে যোগরূঢ় হইয়া গিয়াছে, কবিরাজ বলিতে যেরূপ বৈদ্যকেই শুধু বুঝায়, কালাপাহাড় বলিতেও সেইরূপ দেবদ্রোহীকে বুঝায়।

প্রতিশোধ।

উড়িষ্যার পাণ্ডাদের কৃত অপমান তিনি ভুলিতে পারেন নাই, সুতরাং প্রথমেই বাদসাহের সৈন্য লইয়া উৎকলবিজয়ার্থ অভিযান করিলেন। কালাপাহাড় উৎকল-পতিকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন কালে তিনি শত শত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবমূর্ত্তিসমূহ অপবিত্র স্থানে ফেলিয়া বহু লোককে অত্যাচার পূর্ব্বক ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যে অশ্রুতপূর্ব্বক কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এখনও ভারতীয় চিত্রশালাগুলিতে ক্ষতবিক্ষত দেব-অঙ্গে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ মন্দির-স্তম্ভে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া কালাপাহাড়

ভাহড়িয়া, সাঁতোড় ও পূর্ব্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাহড়িয়ার রাজা কালাপাহাড়ের মাতা ও তাঁহার দুই পত্নীকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসাতে অগত্যা তিনি তাঁহার অভিযানের মুখ ফিরাইয়া কামরূপ, আসাম, দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবেহারের কতকাংশে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন ; কথিত আছে তাঁহার নিষ্ঠুরতা দর্শনে অনেক মুসলমানও ব্যথিত হইয়া পলায়নপর হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে আসীন, তিনি জোয়ানপুরের নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। জোয়ানপুরাধিপতি কালাপাহাড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কালাপাহাড় যুদ্ধে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন যে

কাশী ধ্বংস।

এই সংবাদ পাইয়া বেলোল লোদি চক্রান্তপূর্ব্বক সৈয়দ নামক এক রাজনীতি-কুশল কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে কৌশলক্রমে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসেন। বিলোল লোদির সেনাপতি হইয়া এবার কালাপাহাড় জোয়ানপুরের বাদসাহের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চলিলেন। ২৪ বৎসর যাবৎ দিল্লীশ্বরের সঙ্গে জোয়ানপুরের যুদ্ধ চলিয়াছিল, কালাপাহাড় এই যুদ্ধের সমাপ্তিবাক্য উচ্চারণ করিলেন। জোয়ানপুরাধিপ পরাস্ত ও নিহত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য সম্রাটের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। জোয়ানপুর হইতে আসিবার মুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেবতা ও দেবমন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন। কাশীধামে এক কেদারেশ্বর-লিঙ্গ ভিন্ন প্রাচীন দেবতা আর একটিও রহিল না। পাণ্ডারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িল, এবার সেই ডাক মালিকের সিংহাসনের নিকট পৌঁছিল।

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাসিনী ছিলেন। কালাপাহাড়ের দুরাচার সৈন্যেরা তাঁহাকে ধর্ষণ করিল। কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া তিনি কাঁদিয়া সমস্ত কথা বলিয়া

অনুশোচনা।

তৎসাক্ষাতেই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কালাপাহাড় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং সেই দিন সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করিয়া দিলেন, ফলে কেদারেশ্বর-লিঙ্গ রক্ষা পাইলেন।

সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাঁহাকে দেখা গেল না। কেহ বলেন, তিনি মনের

নিরুদ্দেশ।

অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিলেন, কাহারও মতে কাশীর পাণ্ডারা তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় হরণ করিয়া হত্যাপূর্ব্বক শব মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল, কেহ কেহ বলেন বেলোল লোদি তাঁহার ক্ষমতাবৃদ্ধি দর্শনে গোপনে গুপ্তচর-দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার একথাও বলেন যে তিনি বিনাশরূপী রুদ্রের অংশে জন্মিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছিলেন,—সার কথা এই যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবসে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ বর্ষ হিন্দুধর্ম্ম-নাশে ব্রতী ছিলেন। বরাবক সাহের কন্যা দুলারীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল—উহার নাম 'ফতেমা'।

কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বিবরণের সহিত রাজসাহীতে প্রচলিত কিংবদন্তীর কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এই অনৈক্য রাজাদের নাম সম্বন্ধে হওয়া স্বাভাবিক,—ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন জনসাধারণ এক রাজার কথা মাঝে মাঝে অন্য এক রাজার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং দুর্গাচরণ সান্ন্যাল উভয়েই কাল-সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া দুইজন কালাপাহাড় পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় উক্ত দুই গ্রন্থকারই এসম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন। কালাপাহাড় বাঙ্গলায় একজন মাত্র ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন নাই। সোলেমান খাঁ ও দাউদ খাঁর রাজত্বকালেই কালাপাহাড়ের সমস্ত সামরিক অভিযান হইয়াছিল। সোলেমান খাঁর রাজত্বকালে (১৫৬৪-১৫৭২ খৃঃ) কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেব ও তাঁহার বিদ্রোহী সামন্তরাজ রঘুভঞ্জ ছোট রায় উভয়কেই পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন ঐ ঘটনা ১৫৬৮ খৃঃ হইয়াছিল (রাখালদাসবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ—১৩২৪ বাং ৩৬৭ পৃঃ)। তখন সোলেমান কররানী বঙ্গের বাদসাহ। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কালাপাহাড় কোচবেহার-রাজভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ চিলারায় (শুক্লধ্বজকেও) পরাস্ত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাকশালদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তখন দাউদ খাঁ বঙ্গেশ্বর। সুতরাং আমরা কালাপাহাড়ের প্রায় সমস্ত সামরিক বিজয় এই দুই নৃপতির রাজত্ব কালে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু যদি বরাবক খাঁর কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন এবং বেলোল লোদির পক্ষ হইয়া জোয়ানপুরের নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে তাঁহার কালের একটা সামঞ্জস্য করা কঠিন হয়। ঐ ঘটনাগুলি সমস্তই ১৫৬৮ হইতে ১৫৭৫—এই সাত বৎসর কাল ব্যাপক। এদিকে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে ১৪৫১ খৃঃ হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বরাবক সাহার বঙ্গের রাজত্ব কাল ১৪৫৯-৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত। উড়িষ্যা ও কোচবেহার রাজ-ঘটিত ব্যাপার এই দুই বাদসাহের রাজত্বের এক শতাধিক কাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এদিকে আবার সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে কালাপাহাড় ৩৪ বৎসর বয়সে নিরুদ্দেশ হন, তখন দুলারী বিবির গর্ভে তাঁহার একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দুরূহ দেখিয়া লেখকগণ দুইজন কালাপাহাড়ের প্রবাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সান্ন্যাল মহাশয় দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ খুঁজিয়া পান নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা একই কথায় পুনরুক্তির মত শোনায়। দুই ভিন্ন স্থানে একই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে যেটুক প্রভেদ থাকিতে পারে এই পার্থক্য প্রায় সেইরূপ। তিনি লিখিয়াছেন "দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাঁহার পূর্ব্ব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জানা যায় নাই" (সামাজিক ইতিহাস ১১৩ পৃঃ)। "দ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রথম কালাপাহাড়ের ন্যায় সুন্দরাকৃতি ও বলবান্ পুরুষ ছিলেন। উভয়েই ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং মুসলমান হইয়া মুসলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই

ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন" (সামাজিক ইতিহাস, ১১৫ পৃঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালের গোলমাল দূর করিতে অসমর্থ হইয়া লেখকেরা দ্বিতীয় কালাপাহাড় নামক এক ব্যক্তির কল্পনাপূর্ব্বক গোঁজামিল দিয়াছেন। কিন্তু অন্য এক স্থান হইতে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসে এই গোলযোগের সমাধান হইয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের একখানি ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছিল। জেমস্ ওয়াইজ সাহেব তখন ঢাকার সিভিল সার্জ্জান, তিনি তৎকালের জঙ্গল-বাড়ীর দেওয়ান শোভান দাদ খাঁকে এতদর্থে অনুরোধ করেন। দেওয়ান সাহেব মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষের উপর এই কার্য্যের ভার দেন। মুন্সী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সহিত এই কার্য্য আরম্ভ করেন। জঙ্গলবাড়ীর দপ্তরের দলিল, কাগজ-পত্র, স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ এজন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। মুন্সী মহাশয় কালীকুমার চক্রবর্ত্তী নামক জঙ্গলবাড়ী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, এবং ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী ইদ্রিস খাঁর বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ২০ বৎসর জঙ্গলবাড়ীতে ছিলেন এবং অনেক বিষয় অপর সকল ব্যক্তি হইতে বেশী জানিতেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই কার্য্য আরব্ধ হইলেও শোভান দাদ দেওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুতে এই কার্য্য কিছু কাল স্থগিত ছিল। কিন্তু নূতন দেওয়ান আজিম দাদ খাঁ স্বয়ং এই কার্য্যে উদ্যোগী হওয়াতে এই ইতিহাস সঙ্কলনে সমস্ত বিঘ্ন দূর হইল। এদিকে ঢাকা ডিভিসনের কমিসনার লাউস সাহেব এবং প্রখ্যাতনামা (তখন তরুণবয়স্ক) রমেশচন্দ্র দত্ত মৈমনসিংহের এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়দের পুনঃ পুনঃ তাগিদে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইল। এই পুস্তক একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। বইখানি যে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না, তবে ইহার অধিকাংশ ভুল স্বেচ্ছাকৃত। ঈসা খাঁকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া লেখকগণ দেওয়ান বংশের রাজকীয় রক্ত ঘোষণা করিবার জন্য যে ঐতিহাসিক গোঁজামিল দিয়াছেন, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণের চক্ষে সহজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দেওয়ানদের বংশ-গৌরব বৃদ্ধির জন্য লেখক যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহারা প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব বিশ্বাস-যোগ্য। এই ইতিহাসে লিখিত আছে, কালাপাহাড় বাদসাহ জালাল সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষ প্রামাণিক ঐতিহাসিক সংবাদ পাইয়াই একথা লিখিয়াছিলেন, যেহেতু দেওয়ান বংশের গৌরবের সঙ্গে এই কথার কোন সংস্রব নাই।

এখন যদি বাদসাহ জালালের কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন—তবে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সম্বন্ধে সমস্ত গোল চুকিয়া যায়। জালাল সাহের রাজত্ব কাল ১৫৬০-৬৩ খৃঃ অব্দ। কালাপাহাড়ের কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস যাহা প্রামাণিক ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, তাহা ১৫৬৮ হইতে ১৫৭৫ পর্য্যন্ত। বেলোল লোদির নাম সম্বন্ধে ও জনশ্রুতিতে এই

ভাবের কোন গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণের পর আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কালাপাহাড় মাত্র একজন ছিলেন এবং তাঁহার বিবাহ ১৫৬০ হইতে ১৫৬৩ এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময় হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার ধ্বংসলীলা সমাধা করিয়া অনুমান ৩৪ বৎসরে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে যদি তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে যদি তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার বয়স তখন ৩০ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে ছিল।

জালালের পুত্র এবং তাঁহার হন্তা গিয়াসুদ্দিন—১২৬৩ খৃঃ।

কেরানী (বা কররানী) বংশ শের সাহ ও তৎপুত্র সেলিম সাহ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া অনেক স্থানের শাসন কর্ত্তৃত্ব করিয়া ছিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ আদিলের আনুগত্য ইহারা করেন নাই। বরাবর শের সাহের উত্তরাধিকারীদের আনুগত্য করিয়া আসিয়াছিলেন।

তাজ খাঁ কররানী—১২৬৩-৬৪ খৃঃ; সোলেমান কররানী—১৫৬৪-১৫৭২ খৃঃ।

গিয়াসুদ্দিনের বঙ্গ দখলের সংবাদ শুনিয়া সোলেমান কররানীর ভ্রাতা তাজ খাঁ কররানী অনায়াসে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইহার পরে এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সোলেমান তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৫৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি গৌড়ের নিকটবর্ত্তী তাণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া সম্রাট্ আকবরকে বহু উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া প্রীত করেন। ইনি ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা বিজয় করেন, ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কোচবিহার অধিকার করেন; ইনি পুনঃ পুনঃ সম্রাট্ আকবরকে ভেট পাঠাইয়া প্রসন্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব মোটের উপর নির্ব্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ ছিল। সোলেমান কররানী ১৫৭২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তখন কবিকঙ্কন মুকুন্দ রাম আড়ারা ব্রাহ্মণ-ভূমিতে থাকিয়া তাঁহার চণ্ডী-কাব্য শেষ করিয়াছিলেন।

দাউদ সাহ—১৫৭২-১৫৭৬ খৃঃ।

সোলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ সাহ সিংহাসন আরোহণ করেন (১৫৭২ খৃঃ অব্দে)। কিন্তু আফগান ওমরাহগণ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইনি রাজা হইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার রাজ-ভাণ্ডার অপরিমিত, তাঁহার সৈন্য নিবাসে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ১,৪০,০০০ পদাতিক সৈন্য, নানা শ্রেণীর ২০,০০০ কামান, বহুশত যুদ্ধ-জাহাজ এবং ৩,৬০০ হস্তী মজুত। তিনি মনে করিলেন, এই প্রবল শক্তির সহায়ে তিনি দুনিয়ার মালিক হইতে পারেন। সুতরাং তিনি শ্বেতচ্ছত্র, রাজদণ্ড, এবং অপরাপর রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের কোন কোন স্থান আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। দাউদ প্রথমতঃ জেমিনিয়া দুর্গ (পদ্মার দক্ষিণ পারে, গাজীপুরের কিছু উত্তরে অবস্থিত) আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আকবর সেনাপতি মনিয়মকে দাউদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। দাউদের প্রধান মন্ত্রী লোডিখাঁয়ের সঙ্গে মনিয়ম পাটনার

নিকটে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইলেন, কিন্তু এই সময়ে লোডিখাঁয়ের সঙ্গে মনিয়মের একটা সন্ধি হইয়া যায়। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে বঙ্গেশ্বর সম্রাট্‌কে নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার যোগ্য রেশমের কাপড় ও মসলিনাদি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনিয়মও বিহার হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, স্থির হইল। সন্ধির কথা শুনিয়া দাউদ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া—"লোডিখাঁ তাঁহার মস্তক হেঁট করিয়া দিয়াছেন" এই অভিযোগ করত তাঁহার মৃত্যুদণ্ড করিয়া তদীয় সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। এদিকে আকবরও মনিয়মের সন্ধি সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক হয় নাই—এই ভাবিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং দশ হাজার সৈন্য সহ তোডরমল্লকে বেহারে মনিয়মের উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া বেহারে প্রেরণ করেন।

প্রথম সন্ধি।

এদিকে দাউদ সন্ধিতে স্বীকৃত হন নাই এবং লোডিখাঁকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া মনিয়ম পাটনায় অভিযান করিয়া উপস্থিত হন। দাউদের নিযুক্ত হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ অত্যন্ত সাহসিকতা ও কৌশলের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং মোগলদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিবার মধ্যে আনিয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই অবরোধ ও যুদ্ধের ব্যাপার লক্ষ্য করিতে ছিলেন, তিনি মোগল সৈন্যের এই ধ্বংস দেখিয়া বহুসৈন্যপূর্ণ তিনটি জাহাজ পাঠাইয়া দেন। মোগলেরা এই সাহায্য পাইয়া উৎসাহের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গস্বামী পরাস্ত হন। ফতে খাঁ ও তাঁহার বহু সৈন্যসামন্তের কর্ত্তিত মস্তক এক নৌকা বোঝাই করিয়া সম্রাট্ আকবর দাউদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানান যে অচিরে তাঁহারও এই অনুচরদের গতি হইবে। দাউদ ভয় পাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া তেরিয়াগড়িতে উপস্থিত হন। এদিকে মোগলেরা হাজিপুরে আফগানদের উপর যে অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার সংবাদ পাইয়া দাউদের সৈন্যেরা তেরিয়াগড়িতে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। সুতরাং তেরিয়াগড়ির দুর্গম গিরিপথে থাকিয়া মোগলদিগকে বাধা দেওয়ার আশা তাঁহার বিফল হইল। তিনি ধনসম্পত্তির সহিত পুনরায় পলায়নপর হইলেন, এদিকে বঙ্গ-প্রবেশের একমাত্র দ্বার তেরিয়াগড়ি অনায়াসে মনিয়ম খাঁর হাতে পড়িল।

অঙ্গীকার।

তেরিয়াগড়িতে পলায়ন।

দাউদ পলাইয়া উড়িষ্যার পথে চলিলেন। এদিকে রাজা তোডরমল্ল গৌড় এবং তাণ্ডা অনায়াসে দখল করিয়া পলাতক দাউদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দাউদ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবার ও অর্থাদি লইয়া পলাইতে লাগিলেন। মাঝ পথে দুই এক স্থানে দাউদের সৈন্য কর্ত্তৃক মোগলেরা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অবশেষে দাউদ কটকে যাইয়া "মারি কি মরি" এই সঙ্কল্প করিয়া একেবারে মরিয়া হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন। মনিয়ম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে কতকগুলি ভীষণ কামান গাড়ীতে বহাইয়া আনিয়াছিলেন। দাউদেরও ২০০ অতি দুর্দান্ত বন্য হস্তী সঙ্গে ছিল। দুই পক্ষের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় তুল্য ছিল। এই যুদ্ধে আফগানগণ যেরূপ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল,

মোগলেরা সেরূপ বাধা আর এদেশে কখনও পায় নাই। এই মহামারিতে মোগল সেনাপতি গুরুতরভাবে আহত এবং দাউদের প্রধান সামন্তগণ হতাহত হইয়াছিলেন। দাউদ যদিও শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন নাই, তথাপি মোগলেরাও বহু ধ্বংসের পর জয়লাভ করিয়াও কোন উৎসাহ বোধ করিতে পারে নাই। দাউদ কটকে উপস্থিত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দাউদের দূতের অসামান্য বিজ্ঞতা ছিল। তিনি যখন এক ধর্ম্মাবলম্বী দুই দলের পরস্পরের এরূপ বিরোধ ও হত্যা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, দাউদ আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাঁহার এবং তাঁহার অনুচরবর্গের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যদি সম্রাট্ কিছু স্থান ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা তাঁহার চিরানুগত সেবক হইয়া থাকিবেন ইত্যাদি কথা করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন তখন মনিয়ম খাঁর হৃদয় প্রকৃতই আর্দ্র হইল। তিনি বলিলেন, যদি দাউদ স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা বলেন, তবে তিনি সম্রাটের নিকট তাঁহাদের হইয়া বিশেষ অনুরোধ করিবেন।

মনিয়াম খাঁর দরবারে দাউদ।

কয়েক জন ওমরাহ পরিবৃত হইয়া দাউদ মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মোগলেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা করিল। দুই দিকে সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে রাজকীয়ভাবে অভিবাদন করিল এবং শিবিরে উপবিষ্ট মোগল ওমরাহগণ তাঁহার প্রবেশ মাত্র সকলেই সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া মনিয়ম খাঁয়ের নিকট লইয়া আসিলেন। মনিয়ম স্বয়ং কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দাউদ খাঁ কটিতট হইতে তরবারি বাহির করিয়া মনিয়ম খাঁয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই অসি-দ্বারা আপনার মত বন্ধুর শরীরে আমি অস্ত্রাঘাত করিয়াছি, ইহা ধারণ করিবার আমি যোগ্য নহি, আমি এখন হইতে যোদ্ধার নাম গ্রহণের আর উপযুক্ত নহি, আপনি এই অস্ত্রটি গ্রহণ করুন।" মনিয়ম খাঁ হস্তে ধরিয়া দাউদকে সম্মানিত স্থানে বসাইলেন। দাউদ কোরান এবং অপর সমস্ত পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন—"সম্রাট্ যদি দয়া করিয়া আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন, তবে আমি চিরদিনের জন্য তাঁহার বিশ্বস্ত সেবক হইয়া থাকিব, তাঁহার কোন শত্রুর সঙ্গে যোগদান করিব না।" এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইল এবং দাউদ সেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। মনিয়ম খাঁ তাঁহাকে একখানি বহুমূল্য তরবারি রাজকীয় উপহার স্বরূপ দিয়া বলিলেন—"আজ আপনি আমাদের মহিমান্বিত সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনাকে এই তরবারিখানি উপহার দিতেছি। আশা করি আপনি ইহা সম্রাটের পক্ষে এবং তাঁহার শত্রুগণের বিপক্ষে আজীবন ধারণ করিবেন। আমি আমার মহামান্য সম্রাটের নামে সমস্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকার আপনাকে দিতেছি, আমি অণুমাত্র সন্দেহ করি না, যে আপনি চিরকাল সম্রাটের অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রজা স্বরূপ সাম্রাজ্যের সহায়তা করিবেন।"

মনিয়ম খাঁ তাণ্ডার প্রবেশ করিয়া সমারোহের সহিত বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলেন। গৌড় নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত হর্ম্ম্য, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি

দেখিয়া তিনি এতই আনন্দ লাভ করিলেন যে তিনি তাণ্ডা হইতে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তথাকার ভিজামাটী হইতে বিষাক্ত বায়ু বহির্গত হইয়াই হউক অথবা জল বা আবহাওয়ার দোষেই হউক, তথায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক মহামারী দেখা দিল। সহস্র সহস্র লোক মরিয়া পথে পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া বা দাহ করিবার লোক রহিল না। লোকে সেই মহামারীতে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া পলাইতে সুরু করিল। স্বয়ং মনিয়ম খাঁ এই নিদারুণ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, (১৫৭৫ খৃঃ)।

মনিয়ম খাঁর মৃত্যুর পর বাঙ্গলায় আফগানেরা আবার তাহাদের নষ্ট ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং গৌড়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা সাহেম খাঁ জেলিয়ারকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া, কোরান স্পর্শ করিয়া এত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও দুর্ভাগ্য দাউদ এই বিদ্রোহীর দলে যোগদান করিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হরি রায়, যাঁহাকে দাউদ বিক্রমাদিত্য উপাধি দিয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনরায় সম্রাট্‌দ্রোহী হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা হাতে পাইয়া দাউদ ধরাকে সরা জ্ঞান করিলেন। সম্রাটের সেনাপতি হুসেন কুলি খাঁ (উপাধি খাঁ জাহান) দাউদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি রাজমহলে আসিয়া দাউদের সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। প্রথম প্রথম দাউদের পরাক্রান্ত দলবল বিজয়ী হওয়ার ভরসা করিয়াছিল, কিন্তু যখন মোগল সেনাপতির সাহায্যের জন্য পাটনা, ত্রিহুত এবং অপরাপর স্থান হইতে অগণ্য সৈন্য আসিতে লাগিল, তখন আফগানদের ভরসার স্থল জোনিয়েদ কররানী (দাউদের ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং অপরাপর প্রধান সেনাপতিরা মোগলদের কামানের বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহাদের অনেকেই রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। দাউদ ধৃত হইয়া মোগল দরবারে আনিত হইলেন। তৎকৃত কৃতঘ্নতার ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের উত্তরে তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজদ্রোহীর দণ্ড তাঁহাকে দেওয়া হইল, তাঁহার ছিন্নমস্তক একজন বিশেষ দূত সহ আগ্রায় প্রেরিত হইল (১৫৭৬ খৃঃ)। প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে যে পাঠান প্রাধান্য ছিল, দাউদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা এ দেশে বিলুপ্ত হইল।

পুনরায় সন্ধি-লঙ্ঘন।

দাউদের মৃত্যু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠান রাজত্বসম্বন্ধে নানা কথা

মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজির সময় হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গে আফগানদের প্রাধান্ত ছিল। এই কিঞ্চিদূন চারিশত বৎসর বঙ্গদেশটাকে সুন্দর বনের মধ্যবর্ত্তী ব্যাঘ্র-বাস বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—বিশেষ বঙ্গের সিংহাসন। এরূপ মাথার উপর ঝুলান খড়্গ লইয়া সিংহাসনে বসার সুখ কেনই বা বঙ্গেশ্বরগণ খুঁজিয়াছিলেন? ইবন বক্তিয়ার হইতে দাউদ পর্য্যন্ত ৪৩ জন ভূপতি সিংহাসনে ক্ষণিকের জন্ত বসিবার সুখ লাভ করিয়াছিলেন।

পাঠান সম্রাটগণের অপমৃত্যু।

মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার কামরূপের রাজার হাতে লাঞ্ছিত হইয়া এবং সর্ব্ব সৈন্ত ক্ষয় করিয়া যখন গৌড়ের নিকট উপস্থিত, তখন তিনি উৎকট রোগশয্যাশায়ী, কিন্তু ভগবান্ মরিবার সময়ও তাঁহাকে শান্তি দিলেন না, প্রিয় সেনাপতি আলিমর্দ্দন তাঁহার পীড়িত অবস্থায় খড়্গাঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেন (১৩০৮ খৃঃ)। এই ঘটনার মাত্র দুই বৎসর পরে ইবন বক্তিয়ারের প্রিয় মন্ত্রী বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শিরান নিজের দলের একজন লোক কর্ত্তৃক নিহত হন (১৩১০ খৃঃ)। এবার বক্তিয়ারের হত্যাকারী আলিমর্দ্দন খিলজির পালা, তিনি স্বীয় বংশের একজন ষড়যন্ত্রকারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন (১২১১ খৃঃ)। বঙ্গের মসনদ পূর্ণ করিলেন গিয়াসুদ্দিন, কিন্তু তিনিও কয়েক বৎসর পরে যুদ্ধে নিহত হইলেন (১২২৭ খৃঃ)। এই চারিটি হতভাগ্য নৃপতির পর নাসিরুদ্দিন বাদসাহের কপাল ভাল, তিনি হেকিম ও কবিরাজদের চিকিৎসাধীন থাকিয়া মরিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা তোগন খাঁ ও তমুর খাঁ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ে ১২৪৬ খৃঃ অব্দের একই দিনে প্রাণত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে বসিয়া তোগন খাঁ বোধ হয় একটি রাত্রিও শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন নাই। সুলতান মগীসুদ্দিন (সপ্তম বাদসাহ) ১২৫৮ খৃঃ কামরূপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, মরিবার সময় তিনি তাঁহার বিজয়ী শত্রুর নিকট গলদশ্রুনেত্রে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রের মুখখানি জীবনে শেষবার দেখিতে। পরবর্ত্তী বাদসাহ জালালুদ্দিন কড়ার শাসনকর্ত্তা আর্সলান খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। একটা অভিসন্ধির ফলে মগীসুদ্দিন (মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজি হইতে একাদশ) বাদসাহের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। কাইকোবাদকে খিলজি বংশীয় এক আমীর নিহত করেন (১২৮৯ খৃঃ)। তৎপরবর্ত্তী নবাব ফকরুদ্দিনকে তাঁহার খুল্লতাত হত্যা করেন। সেকেন্দর বাদসাহকে তাঁহার পুত্র গয়াসুদ্দিন যুদ্ধে নিহত করেন (১৩৬৮ খৃঃ)। দ্বিতীয় সামসুদ্দিন বাদসাহকে নৃসিংহ ওঝার বুদ্ধিবলে রাজা গণেশ হত্যা করিয়াছিলেন। হতভাগ্য নসিরুদ্দিন (যদুর পৌত্র) মাত্র ৮ দিন রাজতক্তে বসিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। নবমদিনে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করিল। ফতে সাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে খোজা

বারেক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। সাহাজাদা অন্তঃপুরে আমোদ করিতেছিলেন; তিনি ছিলেন খোজা, শুইবার সময় স্ত্রীজনোচিত (খোজাদের অভ্যস্ত) পরিচ্ছদ পরিয়া মদ খাইয়া আমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় হাবিসী মন্ত্রিপ্রবর তাঁহার বুকে অসি বসাইয়া দিল, তাঁহার গায়ে ছিল অসুরের বল, খড়্গাঘাত সহ্য করিয়া তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে খুব কতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত হইয়া যখন মড়ার মতন পড়িয়া ছিলেন, তখন হাব্সি মন্ত্রী তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই সময় বাদসাহের এক খোজা চাকর তথায় উপস্থিত হইল; তিনি মরেন নাই, তাহাকে দেখিয়া যেন পুনর্জ্জীবন পাইয়া তাহার নিকট মন্ত্রীর কাণ্ডটা বলিতে লাগিলেন। বিনয়ের ভাণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বিশ্বস্ত চাকর বাহিরে লোকজন ডাকিতে চলিয়া গেল, কিন্তু সে লইয়া আসিল সেই হাবিসী মন্ত্রিপ্রবরকে। রাজা তখনও মরেন নাই দেখিয়া মন্ত্রী ও বাদসাহের 'বিশ্বস্ত' খোজা চাকর বাকী কাজটুকু সারিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

অতঃপর ফিরোজসাহ মাত্র একটি বৎসর রাজত্বের পর সিদ্ধিবন্দরের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। সিদ্ধিবন্দর (মুজাফর সাহ) সৈয়দ হুসেনের দ্বারা নিহত হন। হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ তাঁহার পিতার সমাধি-মন্দিরে ভজন করিতেছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি এক খোজাকে গুরুতর অপরাধের জন্য উচিত দণ্ড দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে দণ্ড আর দিতে হইল না, খোজাই উপাসনা-মন্দিরে তাঁহাকে একা মুদ্রিতনেত্র দেখিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল (১৫৩২ খৃঃ)। মৃত বাদসাহের পুত্র ফিরোজ সাহ তিনটি মাস মাত্র রাজতক্তে বসিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার খুল্লতাত মহম্মদ সাহ এই অভিশপ্ত বঙ্গ-সিংহাসনের লোভে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। মহম্মদ সাহের পরবর্ত্তী বাদসাহ সুপ্রসিদ্ধ সের সাহ বঙ্গের মসনদ তাঁহার এক মন্ত্রীকে দিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে যাইয়া একটা বোমা ফাটায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাঝে এক রাজা স্বাভাবিক কারণে মরিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী বাদসাহ মহম্মদ সাহ ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। জেলালুদ্দিন বাদসাহের পুত্র অল্পস্থায়ী রাজত্বের পর গায়েসুদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হন। গায়েসুদ্দিনের হত্যাকারক তাজ খাঁ, তাজ খাঁর পুত্র বয়েজাদ আমিরদিগের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। পরবর্ত্তী রাজা দাউদ এই দুর্ভাগ্য নৃপকুলের শেষ আহুতিস্বরূপ মোগল সম্রাট্ আকবরের সঙ্গে বহু যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়া স্বীয় জীবন সেই সমরানলে প্রদান করেন (১৫৭৬ খৃঃ)।

পাঠান রাজগণের অপমৃত্যু।

সুতরাং এই রাজগণের অধিকাংশই সিংহাসন দখল করিবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে, কেহ বা তিন মাস, কেহ বা এক বৎসর পরেই নিহত হন; এক সম্রাট্ তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, কেহ বা উপাসনা-মন্দিরে প্রার্থনায় বসিয়া অপরাধী ভৃত্যের হস্তে, কেহ বা রাত্রিকালে শয়নাগারে বিশ্বস্ত মন্ত্রীর

প্রতিশ্রুতির মূল্য।

খড়্গাঘাতে, কেহবা স্বীয় স্নেহশীল খুল্লতাতকর্তৃক যমমন্দিরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এই ভাবে অপঘাতে মরেন নাই, তাঁহারাও দিবারাত্র মৃত্যুর ছায়া চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া হীরকখচিত রাজতক্তে বসিয়াছেন। হতভাগ্য দাউদের মৃত্যুকাহিনী পড়িলে চক্ষু সজল হয়। এই আফগান রাজগণের অনেকেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না—কেবল যেমন করিয়া হউক বঙ্গের মসনদে বসিতে পারিলেই হয়। শের সাহ হুমায়ুন বাদসাহের সঙ্গে কোরান ছুঁইয়া শপথ করিলেন, যাহা কিছু পবিত্র সকলের নাম করিয়া শপথ করিলেন, পরক্ষণেই সেই সন্ধি ছেলের হাতের মাটীর পুতুলের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি হুমায়ুনের নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত শিবির আক্রমণ করিলেন। দাউদ খাঁ মনিয়ম খাঁর নিকট যে প্রতিশ্রুতি-সহকারে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে পবিত্রতর দলিল কেহ কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু বঙ্গের তক্তে বসিলে মানুষের বুদ্ধি বিকৃত হয়, এই প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়া তিনি সম্রাট্‌দ্রোহী হইলেন।

অবশ্য রাজপদের মত লোভনীয় কি আছে? কিন্তু মৌর্য্য, গুপ্ত, পাল ও সেনদের রাজত্বকালেও যুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না, তাঁহারাও স্বগণদের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন। কিন্তু এই পাঠানদের মত নৃশংসতা হিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল। ক্ষাত্র প্রতিশ্রুতি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল—অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডবদের পুত্রগণের হত্যা মহাভারতের কলঙ্কস্বরূপ, কিন্তু তাহাতেও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের উদাহরণ বড় দেখা যায় না। সত্যরক্ষা, প্রতিশ্রুতি-পালন, রাজভক্তি প্রভৃতি গুণের উদাহরণ-স্বরূপ হিন্দুসাহিত্যে যে কত কাহিনী বর্ণিত আছে তাহার অবধি নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে লাউসেনের অনুগত ভৃত্য ও সেনাপতি কালুডোম সত্যরক্ষার্থ নিজের প্রাণ দিয়াছিল। ধর্ম্মাধিকরণে একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলিলে হরিহর বাইতি বহু পুরস্কার পাইত—সত্য বলিলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, কিন্তু দ্বিধাকম্পিতচিত্তে হরিহর মিথ্যা বলিতে অঙ্গীকার করিয়াও সাক্ষীর কাঠাসনে দাঁড়াইয়া মিথ্যা বলিতে পারিল না। তাহার পল্লীর সরল প্রাণ মিথ্যা বলিতে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, জিহ্বায় ভাষা ঠেকিয়া গেল। এই সকল কথা উপাখ্যান মাত্র, কিন্তু হিন্দুর সত্যবাদিতাসম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীরা যে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই সকল গল্প পড়িলে মনে হইবে, উপাখ্যানগুলিতে জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এবং উহা সত্য হইতে দূরবর্ত্তী নহে। এই ধর্ম্মভীরু জাতি রণকুশল সাম্রাজ্যলোভী পাঠানগণের সংস্পর্শে আসিয়া নিতান্ত আতঙ্কিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে পশু-যুদ্ধের রূপক স্থলে হিন্দু রাজা ও জমিদারবর্গের এই ভয় বর্ণিত হইয়াছে।

দিল্লীবিদ্রোহী দুর্দান্ত 'বঙ্গ-ব্যাঘ্র।'

এই যুগের বঙ্গেশ্বরগণের ইতিহাসে দেখা যায় ইহারা স্বাধীনতার জন্য অসাধ্যসাধন-চেষ্টা করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটি বাদসাহই দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হয়ত দায়ে পড়িয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন—আবার সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইয়াছেন। ইহারা প্রকৃতই বঙ্গের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজব্যাঘ্র (Royal Tiger)। এই ব্যাঘ্রকে দিল্লীশ্বরগণ

কিছুতেই পোষ মানাইতে পারেন নাই। শের সাহকে দমাইতে যাইয়া হুমায়ুন দিল্লীর তক্ত্ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; সর্ব্ব-শেষ পাঠানব্যাঘ্র দাউদের বিয়োগান্ত জীবন-নাট্য ! কি ভীষণ তাঁহার অধ্যবসায় ! কতবার হারিয়াছেন, সন্ধিপত্রে দস্তখত করিয়াছেন, সেগুলি তিনি সুবিধা পাইলেই তৃণবৎ নগণ্য মনে করিয়া কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পিতা সোলেমান খাঁ আকবরের নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া গেলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়া একটিবার মাথা নোয়াইলেই তদপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্যে স্থায়িভাবে অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্ব্বিঘ্নে জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এই পাঠান-ব্যাঘ্র জীবনে সুখ-শান্তি চান নাই। পুনঃ পুনঃ হারিয়া গিয়া পুনঃ পুনঃ লড়াই করিয়াছেন। প্রায় জীবনব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়াও যুদ্ধক্লান্তি হয় নাই ; শেষে যে সন্ধি হইল তাহাতে সমস্ত উড়িষ্যার সাম্রাজ্যটা হাতে পাইলেন, হয়ত বা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলে আরও অধিকার বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সে সকল সুবিধা ও ব্যবস্থা লইয়া তিনি সুখী হন নাই। পবিত্র কোরাণ অমান্য করিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। এই আফগানদের প্রত্যেকের রক্তে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ ছিল, এই বীজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্ বাসুদেব, নরক ও সমুদ্র সেন প্রভৃতি হইতে আসিয়াছে—বাঙ্গলাদেশের রাজারা চির-বিদ্রোহী। পাঠান সময়ে আমরা এই সত্য যতটা দেখিতে পাই, এতটা আর কখনও নহে—ইন্দ্রপ্রস্থের অতুল বিজয়পতাকা, মথুরার সমৃদ্ধি, রৈবতকের অভ্রভেদী দুর্গ এবং সর্ব্বশেষে মুস্লিম অধিকৃত দিল্লী—বঙ্গের ব্যাঘ্রদিগকে স্ববশে আনিতে পারে নাই।

বাঙ্গালী-চরিত্রের এক দিকে বিরাগ অপরদিকে রাগ। বিরাগে সে বিদ্রোহী কিন্তু অনুরাগে সে অবহেলায় মৃত্যু বরণ করিয়া লয়। বাঙ্গালীর রাজ-ভক্তি অপূর্ব্ব। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম, তৎপত্নী লক্ষা ও শাকা-শুকা পুত্র-দ্বয়ের যে রাজভক্তির কথা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে, তাহার তুলনা নাই। লক্ষা তাঁহার দুই পুত্রকে গভীর নিদ্রা হইতে জাগাইয়া রাজার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ যুগেও বাঙ্গালী-পুলিশ অনেক সময় স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও রাজার জন্য কথায় কথায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে।

যদিও আমরা মঃ ইঃ বক্তিয়ারের আগমন হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময়টা 'পাঠান-যুগ' নামে মুলতঃ পরিচিত করিয়াছি, তথাপি এই যুগের রাজগণের মধ্যে সকলেই আফগান ছিলেন না, কেহবা আরব দেশের, কেহবা খোজা, কেহবা হাবসী, এবং কেহবা হিন্দু ছিলেন। মোটামুটি এই সময়টাকে 'পাঠান-প্রাধান্যের যুগ' বলা যাইতে পারে। এই সকল রাজাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে হিন্দুরক্ত বহমান ছিল। সুলতান গায়েসুদ্দিনের বিমাতা, সমসুদ্দিনের নিকা-সূত্রের স্ত্রী, ফুলমতী বেগম—এক সময়ে নুরজাহান দিল্লীতে যাহা করিয়াছিলেন—বঙ্গদেশের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। ফুলমতী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর

হিন্দুর সহিত রক্তসম্বন্ধ।

পরগনার সুবিখ্যাত বজ্রযোগিনী গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা; সমসুদ্দিন সুবর্ণগ্রাম যাওয়ার পথে নদীর ঘাটে এই অসামান্য রূপসী ষোড়শীকে দর্শন করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় অন্দরমহলে লইয়া আসেন; সমসুদ্দিনের নিকট তথাকার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও অপরাপর শ্রেণীর বিশুদ্ধ হিন্দুরা উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। বাদসাহ বলিলেন. "আচ্ছা বেশ! ফুলমতীকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি, ইহার সমান ঘরের কোন সৎব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করুন,—নতুবা গণিকা-বৃত্তি করিবার জন্য এবং সমাজচ্যুত হইয়া নিরাশ্রয়া হইয়া থাকিবার জন্য আমি এমন সুন্দরী মহিলাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব না।" বাদসাহের কথায় কেহ অবশ্য রাজী হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং তাঁহাকে নিকা করিলেন। এই রমণী যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন, তেমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন, তৎসময়ের আফগান-দরবারে আসিয়া তিনি বিলাসকলা ও কূটনীতি শিখিয়াছিলেন। সমসুদ্দিনের উপর ফুলমতী বিবির প্রভূত ক্ষমতা ছিল, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পর কংসরাম, জুনা খাঁ প্রভৃতি রাজ-দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণকে তিনি নিকা করিবেন সেই লোভ দেখাইয়া ক্রীড়াপুত্তলীর মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ হিন্দুপ্রভাবের কোন উল্লেখই করেন নাই—কিন্তু ফুলমতী বেগম যে কতটা শক্তির সহিত বাদসাহের দরবারে শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলজীগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন—গায়েসুদ্দিনের মৃত্যুর পর ফুলমতীর পুত্র মইজুদ্দিন গৌড়ের বাদসাহ হন। মধু খাঁ ও ফুলমতী—নিতান্ত অলস, বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য মইজুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত শাসনকার্য্য তাঁহারাই সম্পাদন করিতেন। কিন্তু মইজুদ্দিন বাদসাহের অস্তিত্ব অন্য কোন সূত্রে এখনও প্রমাণিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে রাজসাহীর একটাকিয়া ও সাঁতড়ার রাজারা বাদসাহের অনুগ্রহে খুব প্রবল হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহারা যে ঐ সময়ে প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘটককারিকা ও প্রবাদবাক্যের ভিত্তি অনেক সময়ই সত্যমূলক, কিন্তু সময়ে সময়ে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়িয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নানারূপ ভ্রম, প্রমাদ ঘটিয়া থাকিলেও ফুলমতী বিবির অস্তিত্ব ও বাদসাহ-দরবারে তাঁহার প্রভাব কখনই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না, দেশব্যাপী জনরব ও প্রবাদের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই সত্য নিহিত আছে।

ফুলমতী বেগম।

ফুলমতীর প্রভাবেই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এই বাদসাহদের সময়ে হিন্দুরা যে রাজসভায় অতি প্রধান ছিলেন—তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহার পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখাইব, মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ "সিন্ধকী" লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দুললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন—তাহাদিগকে নিকা করিয়া বহু সন্তান উৎপন্ন করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপে যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে। কোন

এক রাজার কন্যাকে বঙ্গের মুসলমান বাদসাহ বিবাহ করিতে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে যে অনর্থ ঘটিয়াছিল তদ্বিবরণ ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডে রূপবতী নামক আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বাধ্য হইয়া নায়ক, নায়িকা, রাজা ও বাদসাহের নাম রূপান্তর করিয়া ছাপাইয়াছি। কিন্তু ঘটনাটি সত্য। পূর্ব্ব হইতে দেশে যে আবহাওয়া বহিতেছিল, হুসেন সাহ সেই দিকে পাল খাটাইয়া বঙ্গের বাদসাহের অন্তঃপুরে হিন্দুপ্রভাবের অনুকূল গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ। এ দেশে তখন কুল-গৌরব অত্যধিক ছিল। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এই কুলগৌরবই তাঁহাকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে মহোন্নতির সোপানে আরূঢ় করাইয়াছিল। ইনি নিজের কন্যাদিগকে পাঠানদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে ভাদুড়ীবংশ কুলমর্য্যাদায় অগ্রগণ্য—তাঁহাদেরই একজন বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুদর্শন এবং গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদা একটাকিয়ার রাজা মদন খাঁ তাঁহার দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেবকে লইয়া হুসেন সাহের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের সুগঠিত গৌরদেহ এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে কৃতিত্ব দেখিয়া তিনি মদন খাঁর নিকট ইহাদের সহিত তাঁহার দুই কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, "আমি আপনার দুই পুত্রের ধর্ম্ম নষ্ট করিব না, আপনি যদি গ্রহণ করেন আমার কন্যারা হিন্দু হইবে।" যাহা হইবার নহে, তাহা আর কি করিয়া হইবে? মদন খাঁর দুই পুত্র বাদসাহের কন্যা বিবাহ করিয়া অগত্যা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর বাদসাহ মদন খাঁর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বসমেত ১১ জনকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াইলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্ত ভিষক্‌দিগকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া বলাইলেন যে তিনি রাত্রে চোখে দেখেন না, সুতরাং তিনি একটাকিয়ার রাজবংশের ঘৃতের সলিতাটির মত একাকী সেই পরিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। বাদসাহ রতিকান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বুঝেছ বেহাই! যে অন্ধ সে হিন্দু থাকুক, যাহার চক্ষু আছে তাহার মুসল- মান হওয়াই উচিত।" সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন—"ইহার পর অনেক নবাব ও বাদসাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।" ঘটকদের পুস্তক হইতে জানা যায়, "২৯ জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন (১০২ পৃঃ)।" ময়মনসিংহ গীতিকায় কালাপাহাড়ের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা মুসলমানের লেখা, মুসলমান রাজদুহিতা যে কি অদ্ভুত কৌশলে ব্রাহ্মণযুবককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা এই গীতিকায় আছে (পৃঃ ৬৪০-৬৪২)।

ঘটককারিকায় ব্রাহ্মণবংশের আখ্যায়িকায় এইরূপ উল্লেখ কখনই কল্পনাসম্ভূত হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেদের বংশাবলীতে এই কলঙ্কের ছাপ নিজেরা কেন দিতে যাইবেন? পারসীক, যবন (গ্রীক), শক, হুন প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিরা হিন্দুসমাজের উচ্চ গণ্ডীতে স্থান পাইবার জন্য চিরদিন লালায়িত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু

মুসলমানেরা নব আভিজাত্যের ফলে অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা করিয়াও হিন্দুর ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। এখনও একজন ব্রাহ্মণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে তাঁহারা বিশেষ গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

হিন্দু ও পাঠান প্রভৃতি মুসলমান শ্রেণীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ একটা প্রবাদ-বাক্য নহে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহুল। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাজপুতের রক্ত-সংস্রবের পথ দেখাইয়া দুই জাতিকে মিলনের দিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। পল্লীগীতিকায় এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

মুসলমান বাদসাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি দেখাইতেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মুসলমান ঐতিহাসিকগণই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গাধিপ ইলাইস খাঁ (সামসুদ্দিন—১৩৫৩ খৃঃ) তখন দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। ফিরোজ পাণ্ডুয়া হইতে একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন। সামসুদ্দিন সেই দুর্গে ছিলেন। এই একডালা দুর্গের সন্নিকটে ভবানী নামক এক হিন্দু সাধু ছিলেন, সামসুদ্দিন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত। তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ হইয়াছে, তখন সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া তিনি ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে একাকী বাহির হইয়া সাধুর মৃত দেহের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হন। পথে সম্রাটের শিবির। সামসুদ্দিন তাঁহার গুরুদেবের শবের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইয়া সেই ছদ্মবেশেই ফিরোজ সার দরবারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন, তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সম্রাট্ যখন শুনিলেন তাঁহার প্রবল শত্রু, যাঁহাকে ধরিবার জন্য তিনি ২২ দিবস যাবৎ একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি ফাঁকি দিয়া তাঁহার মৃত গুরু দর্শন করিয়া, এমন কি তাঁহার শিবিরে ঢুকিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া গেলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তিনি সামসুদ্দিনের দুর্দ্দান্ত সাহসিকতা এবং অচলা গুরুভক্তির প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায় মুসলমান গায়কগণ যে সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি কি করিয়া এই দুই জাতি, মত ও ধর্ম্মের এতটা পার্থক্য থাকা সত্বেও, শতাব্দীর পর শতাব্দী পরস্পরের চালে চালে ঠেকাঠেকি করিয়া বাস করিতেছেন। পীর বাতাসীর মুসলমান গায়েন স্বীয় গুরু জিন্দাগাজীর নিকট বর প্রার্থনাপূর্ব্বক "মক্কা মদিনা বন্দুলাম কাশী গয়াধান" ইত্যাদি বন্দনা-গীতে হিন্দুর তীর্থগুলির প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৪১-৩৪২)। নেজাম ডাকাইতের গীতিকার মুসলমান কবি তদ্দেশীয় (চট্টগ্রামের) সমস্ত গ্রাম্য দেবতাকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিয়া গীতি আরম্ভ করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি "সীতা শক্তি (সতী) মাকে মানি, রঘুনাথ গোঁসাই" প্রভৃতি পদ গাহিয়া "দুনিয়ার সার" পিতামাতার চরণ

হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি।

বন্দনা করিয়াছেন (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩২৫)। চৌধুরীর লড়াই গীতিকায় মুসলমান গায়েন পশ্চিমে মক্কা মূল স্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া 'জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ। ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। চণ্ডালে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়। এমন সুধন্ত দেশ জাত নাহি যায়। ভাত লইয়া তারা মুণ্ডে মুছে ভাত। সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ" (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১০)। শেষের দুইটি ছত্র পড়িয়া পরবর্ত্তী ভারতচন্দ্রের—"চল ভাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাহিব কুতূহলে।" প্রভৃতি কবিতার কথা সহজেই মনে হয়। আর একজন মুসলমান পল্লীকবি লিখিয়াছেন—"হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি—কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি।"

আফগান-প্রাধান্যের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, দুই জাতির মধ্যে আত্মীয়তা হইলে যদিও হিন্দুগণ সমাজ-বহির্ভূত হইয়া পড়িতেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ বিস্মৃত হইতেন না। হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ মহাভারত কাব্যের বাঙ্গলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন, উক্ত বাদসাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন; সঙ্কলয়িতার নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ (চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা) শ্রীকরণ নন্দী নামক কবি দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামসুদ্দিন ইউসাফ গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী বসুবংশীয় মালাধর নামক কবির (কুলীনগ্রামবাসী) দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি "প্রভু গায়েসউদ্দিন সুলতান"কে প্রশংসাসূচক এই পদাংশ উপহার দিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সুলতানের উৎসাহ পাইয়াছিলেন। এই গায়েসুদ্দিন কবি হাফেজকে পারস্য দেশ হইতে বাঙ্গলায় লইয়া আসিতে লালায়িত ছিলেন। মিথিলার রাজসভার দীর্ঘায়ু কবি একাধিক গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—"সে যে নসিরা সাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে, চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভানে।" যশোরাজ খাঁ নামক কবি হুসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সাহ হুসেন জগতভূষণ, ভনে যশোরাজ খানে।" সুদূর চট্টগ্রাম হইতে এই সুরে সুর মিলাইয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন সাহকে কলিযুগের কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ উদাহরণ অসংখ্য। আমার এ সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে বাদসাহের পরিবারে হিন্দুললনার আমদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বাঙ্গলা ভাষা আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিন্দুরাজত্ব থাকিলে এটি ঘটিতে পারিত না। বিদ্যার অর্ণবযানসদৃশ, দেব-ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান্ টুলো পণ্ডিতগণের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুন আমাদের দেশের ভাষা যে কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান-

বঙ্গভাষার আদর।

প্রাধান্যকালে বাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্রও অনেক সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গলা অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে। ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুররাজ্যের তাম্রশাসনগুলি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ হইত; সে সময়ে মুসলমানেরাই বাঙ্গলার এই বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গলা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জ্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুর গান ও উৎসবাদি মুসলমান বাদসাহের দরবারে অবিরত উৎসাহ পাইত। এইভাবে কীর্ত্তন শুনিবার স্পৃহাবশতঃ গৌড়ের কোন সম্রাট্ আমাদের কবিসম্রাট্ চণ্ডীদাসের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন।

রাজরাজড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিরবধি যুদ্ধবিগ্রহাদি—উত্থানপতন প্রভৃতি রাজকীয় পতাকার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অবস্থান্তর পল্লীসমাজকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্মণ তাঁহার খড়ো ঘরের মেজেয় মাদুর পাতিয়া খাগের কলম দিয়া তেরেট বা তালপত্রের উপর বেদবেদাঙ্গের ব্যাখ্যা লিখিয়া যাইতেন; বৈয়াকরণ, তার্কিক, ও নৈয়ায়িক যখন স্বীয় স্বীয় গ্রন্থের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন তাঁহারা মুক্তকচ্ছ হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন। বিলাস তাঁহাদের বাড়ীরত্রি সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের খড়ো ঘরের চালার উপর অলাবুলতা দুলিয়া তাঁহাদের একান্ত উপেক্ষিত দারিদ্র্য ও সাংসারিক নিস্পৃহতা প্রমাণ করিত। কোন কোন সময় এক একটা রাজনৈতিক ঝড় বহিয়া যাইত সত্য, কিন্তু তাহার ফল বেশীদিন থাকিত না। দেশের বাণিজ্যাদির উপরও বাদসাহেরা কোনরূপ হাত দিতেন না। পাঠানেরা তরবারি লইয়া এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি তাঁহারা একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা বাদসাহের বা তৎপ্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রয়োজনের জন্য শরীরে বর্ম্মচর্ম্ম আটিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যই উদ্যত হইয়া থাকিতেন; ইঁহারা কৃষির কোন ধার ধারিতেন না। সুতরাং ধনশালী হিন্দুরাই তখন কৃষিপ্রধান বাঙ্গলার একরূপ মালিক ছিলেন; শুধু কৃষি নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে ছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান্ হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন; গৃহসুখ তাঁহাদের কপালে বড় থাকিত না, কারণ প্রায়ই তাঁহাদের নেতাদের আহ্বানে তাঁহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত, বিশেষ ইঁহাদের বাণিজ্যাদি কার্য্যের প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইঁহারাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালা ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯১০ খৃঃ, পৃঃ ১৯০।) এই সকল কারণে বঙ্গদেশে কোন স্বর্ণখনি না থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্য এদেশ "সোণার বাঙ্গলা" উপাধি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৪৮৯ খৃঃ অব্দের এবং তৎসন্নিহিত সময়ের

পাঠান-রাজত্বকালে হিন্দুদের বাণিজ্য ও অর্থাগম।

বঙ্গদেশসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই সময়ে বাঙ্গলার প্রধান ব্যক্তিরা খাওয়ার সময়ে স্বর্ণপাত্রের একটা জমকালো ঘটা দেখাইতেন, ইহা তাঁহাদের একটী রীতিতে দাঁড়াইয়াছিল। নিমন্ত্রণকালে কাহার এরূপ সোণার সরঞ্জাম বেশী তাহা লইয়া একটা গৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত" (১৩৪ পৃঃ)। এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বাঙ্গলাদেশ কত যুগ ধরিয়া বাণিজ্য ও কৃষিতে জগতে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া এই বিপুল স্বর্ণাগম করিয়াছিল তাহার পরিচয় পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় পাঠকেরা পাইবেন। এই গীতিকাগুলি তাম্রশাসন, শিলালেখ বা মুদ্রার ন্যায় 'ইতিহাস' নামে বাচ্য হইবার অধিকারী নহে, তথাপি সমাজের যে প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িয়াছে তাহা নিখুঁত। এই গীতিকবিতার ভাণ্ডারে কত অলঙ্কারের উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়া গৃহ ও নৌযানসজ্জায় যে প্রভূত স্বর্ণ ও মুক্তা ব্যবহৃত হইত তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভোজন ও পানীয়ের জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে স্বর্ণের পাত্র ব্যবহৃত হইত। বণিক্‌বধূরা সর্ব্বদাই সোণার জলের কলসী লইয়া দীঘি, পুষ্করিণী বা নদীর পাড়ে জল আনিতে যাইতেন; অর্ণবযানগুলির মাস্তল স্বর্ণমণ্ডিত, এবং মণিখচিত জলটুঙ্গি, চৌচালা, আটচালা ঘরে প্রকাণ্ড আয়নার কপাট ও সোণা-রূপার রুয়া প্রযুক্ত হইত।

এ দেশের বাঁশের 'বারদুয়ারী' ঘর যে ঠিক একখানা সাজানো প্রতিমার ন্যায় হইত, তাহা ফরিদপুর জেলার সায়ওয়ারজান মিঞার বাঙ্গালা ঘরখানি-সম্বন্ধীয় দীর্ঘ বর্ণনায় সবিস্তারে বলা হইয়াছে। সে সময়ের যত ইষ্টকালয় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত, কিন্তু সেইরূপ কয়েকখানি ঘর কতকটা গৌরব বিচ্যুত হইয়াও কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হয়ত কোন কোন স্থানে এখনও টিঁকিয়া আছে। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় দেখা যায় এক বণিক্-শ্রেষ্ঠের এইরূপ ঘরে হীরামণির ঝালর শোভা পাইত এবং রুয়া ও থাম সোণারূপায় ঝলমল করিত, সোণার পাত দিয়া চাল ছাওয়া হইত। ময়ূরপুচ্ছ ও মাছরাঙ্গা পাখীর পাখা দিয়া অনেক সময়ে চালের নীচের দিক্‌টা সাজানো হইত। "ভেলুয়া" নামক গীতিতে বণিক্‌রাজ মুরাইএর বাড়ীর কথায় লিখিত আছে—"বড় বড় ঘর, তার আটচালা চৌচালা—আর সোণা দিয়া মুড়াইছে মাথারে। রূপাতে দিয়াছে ঠুনি, সোণার পাতে দিছে ছানি, টুয়ের মধ্যে স্বচ্ছ অলঙ্কার, হাজার বাণিজ্য নায় সাগর বহিয়া যায়—দেখিতে অতি চমৎকার রে।" * (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৪১-৪২ পৃঃ।) আমরা মনে করিয়াছিলাম এই বর্ণনার সকলই উপকথা, কিন্তু যখন ফরিদপুরের এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে কতকটা এইরূপ ঘর দেখিতেছি, তখন মনে হয় না যে কবি সত্যের উপর খুব জোরসে তুলি চালাইয়া রং অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যখন অজন্তা গুহার পাথরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের গ্রন্থিস্থলে হস্তিগ্রাসকারী সিংহ, পরস্পরবদ্ধ নরহস্ত ও বিবিধ ফুল-লতায় একটা পরম ঐক্য দেখাইতেছে এবং যখন আমরাও কলাশিল্পজাত নানারূপ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি—(বিশেষতঃ মুকুলবাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, অজন্তার কর্ম্মিগণের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন) তখন এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক যে সেই

গুপ্তযুগের অপূর্ব্ব শিল্পী ও কর্ম্মিগণের বংশধরেরা অবস্থার নিদারুণ বিপর্য্যয় সত্ত্বেও তাঁহাদের কারুকার্য্যের পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিয়া যান নাই।

এই শিল্পিকুল দেশের আদিম অধিবাসীরা। তাহারা দ্রাবিড়ী হউক বা দস্যুই হউক,—যাহাদের বহুসংখ্যক ব্যক্তি আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া সমাজের নিম্ন গণ্ডীতে স্থান করিয়াছিল, যাহারা খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ শতাব্দীতে মহেঞ্জদোরো আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তাহারাই কি ভারতীয় লিপিমালার আদিপ্রবর্ত্তক এবং এই যে নমঃশূদ্রেরা "চাষা নাগরী" জানিত তাহারা কি সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর এবং বহুযুগ-পূর্ব্বকার শিল্প-সংস্কার বহন করিয়া আসিয়াছে? নতুবা মহা মহা পণ্ডিতগণ যে ভাষা বুঝিতে অক্ষম তাহা বুঝিতে নমঃশূদ্রের নিকট শরণ লইবার হেতু কি? (৩৩-৩৪ পৃঃ।)

শিল্পীরা অনার্য্য।

ইহাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা যে কাষ্ঠশিল্পী, সোণারু, কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পী, যাহারা দেবমন্দির, দেববিগ্রহ ইত্যাদি রচনা করে, তাহাদের অনেকের জল হিন্দুসমাজের আচরণীয় নহে, অথচ তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নীচকার্য্য করে, যথা কাহার, নাপিত—ইহাদের জল আচরণীয়। এত গুণবত্তা থাকা সত্ত্বেও আদিম অধিবাসিগণ আর্য্যগণ্ডীতে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য ধুরন্ধর শিল্পীদিগের পরিচয় রাক্ষস, দানব প্রভৃতি। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় আর্য্যদের সঙ্গে অনার্য্যদের যখন সংঘর্ষ হয়, তখনও সেই সুদূর অতীতকালে এদেশের অধিবাসী অনার্য্যদের বড় বড় প্রস্তর-গৃহ ও দুর্গাদি ছিল। বাৎস্যায়নের মতে সমস্ত কলাশাস্ত্রের মধ্যে চিত্রবিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ: এবংবিধ চিত্র-বিদ্যা আমরা নিম্নশ্রেণীর হস্তেই পাইতেছি। সখ্ করিয়া বড়লোকেরা চিত্র ও স্থাপত্য-বিদ্যার অনুশীলন না করিতেন, এমন নহে, কিন্তু কলাবিদ্যার মধ্যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা নিম্নশ্রেণীদেরই একচেটিয়া ছিল।* শুধু চিত্র ও স্থাপত্য নহে—লেখকের বৃত্তিটাও কতক পরিমাণে নিম্নশ্রেণীদেরই হাতে ছিল, যদিও গণদেবতার উপরে এককালে এই বৃত্তি আরোপ করা হইয়াছিল।

পাঠানদের সময়ে শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে হিন্দুদিগেরই প্রধানতঃ অধিকার ছিল, যেহেতু আফগানগণ নিরবধি রণক্ষেত্রে ও পরদেশ আক্রমণে ব্যস্ত থাকিতেন। দুই একজন ব্যতীত এই যুগের মুসলমান সম্রাট্গণ দেশের শিল্প বা স্থাপত্যের বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই। যে সকল মুসলমান পশ্চিম হইতে এদেশে আসিতেন, তাঁহারা স্বীয় ভুজবলে খড়্গহস্তে ভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিতে আসিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আফগান, তাহা ছাড়া, হাবসী, নিগ্রো, খোজা, আরবি প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয় লোকেরাও এদেশে অনেক আসিয়া পড়িয়াছিলেন। শের সাহ, হুসেন সাহ এবং অপর দুই এক জন বাদসাহ ছাড়া ইহাদের মধ্যে কেহই শিল্পচর্চ্চার সুযোগ পান নাই। পদ্মপত্রের জলের ন্যায় ইহাদের সিংহাসন ভাগ্য-বারিধির

পাঠান রাজারা শিল্পচর্চ্চার তাদৃশ সুযোগ পান নাই।

* ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ব্যাসদেব-কৃত বিশ্বকর্ম্মার প্রতি অভিশাপ এই যে তাঁহার পুত্রক শিল্পিকুল না খাইয়া মরিবে।

উপর টলমল করিত, এই সকল আবুহোসেন শিল্প ও স্থাপত্যর চিন্তা কখন করিবেন? বরঞ্চ সেই যুগে গুপ্তগৃহ, গুপ্তদ্বার, অনতিদীর্ঘ অল্প প্রশস্ত গৃহ ও অন্দর, কোন কোন স্থানে হঠাৎ পর-আক্রমণকালে পলাইবার উপায়স্বরূপ জলনালী (Tunnel) প্রভৃতি রাজ-প্রাসাদের অঙ্গীয় হইয়াছিল। এমন কি হিন্দুরাও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ের অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরেই প্রবেশদ্বার অতি সঙ্কীর্ণ, ত্রিপুরার সপ্তরত্ন মন্দিরের (কুমিল্লার অদূরবর্ত্তী) উর্দ্ধে উঠিলে পথিক নীচে নামিতে পারিবেন না। এই উচ্চ মন্দিরের আগম ও নির্গম পথ একটা দুরন্ত হেঁয়ালী। বহুদিন যাতায়াত না করিলে সেই রহস্যের সমাধান হয় না। এইরূপ মন্দির পাঠানাধিকারের সময়ে বহু হইয়াছিল. গৌড়ের "লুকোচুরী" তোরণ দুর্গ, মুসলমানদের কৃত, উহা এইরূপ একটা রহস্য। উহার উর্দ্ধস্তরের স্থাপত্য ছত্রপুরের সুবিখ্যাত "রাজগড়" দুর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল মন্তব্য লিখিয়া আমরা বলিতে বাধ্য এখনও এদেশে পাঠান-যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের বহু নিদর্শন রহিয়াছে। গুপ্ত, পাল ও সেন-যুগের কথা মনে হইলে পাঠান-যুগের শিল্পের স্বল্পতা তুলনায় শ্রীহীন মনে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে।

মসজিদ-রচনায় হিন্দু শিল্পী।

ইহা নিশ্চয় যে পূর্ব্বকালের দেশীয় স্থপতি ও শিল্পবিশারদগণই গৌড়ের রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন। বঙ্গের চিরপ্রসিদ্ধ "বারদুয়ারী ঘর," যাহার কথা পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় আমরা বহুবার পাইয়াছি, বঙ্গের দোচালা ঘরের মত ছাদবিশিষ্ট বাঙ্গালা ঘর—যাহা বঙ্গীয় মস্তিষ্ককর্ত্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল,—গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার নবাবদের কীর্ত্তির মধ্যে তাহারই নমুনা বেশী পাওয়া যায়। গৌড়ের সোণা মসজিদ এখনও বারদুয়ারী মসজিদ নামটি রক্ষা করিয়াছে। ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব স্থাপত্য। ইহা ছাড়া রাজসাহীর "বাঘার মসজিদ," গৌড়ের "হুসেন সাহের মসজিদ" এবং "চাঁদ দরওজা", তথাকার "জানজান মিঞার মসজিদ", সাসারামের ইসলাম সাহের সমাধিস্থান প্রভৃতি মসজিদগুলিতে উৎকীর্ণ আরব লিপি ভিন্ন বঙ্গে বিদেশীয় স্থাপত্য-প্রভাব খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। গৌড়ের "কদম রসুল" বা "কদম শরীফ"টি ঠিক হিন্দু মন্দিরের মতই, উর্দ্ধে একটি গম্বুজ রচনা করিয়া উহাকে মুসলিম ছাপ দেওয়া হইয়াছে। লোটন বা নোটন মসজিদটি গৌড়ের একখানি বাঙ্গালা ঘরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত। গৌড়ের ভাস্কর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ কলিকাতার চিত্রশালায় যে প্রস্তরখণ্ডের রাখালদাসবাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় স্থান দিয়াছেন তাহার ফুল-পল্লবের সুচারু কার্য্যও বোধ হয় অমরাবতীর শিল্পীদের বংশধরগণ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোটের নূতন হাটের মসজিদটি হিন্দুর প্রাচীন মন্দিরাদির লক্ষণাক্রান্ত। ত্রিবেণীর জফর খাঁর সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ এখনও একটা দর্শনীয় সামগ্রী, এই মসজিদ একটি হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া রচিত হইয়াছিল। দেব-দেবীর চিত্র পশ্চাৎদিগের আস্তর খুলিলেই ধরা পড়ে। এই মসজিদের কোন কোন স্থলে হিন্দু মন্দিরের প্রাচীন অংশ পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই, যেমনটি ছিল সেই ভাবেই রক্ষিত আছে।
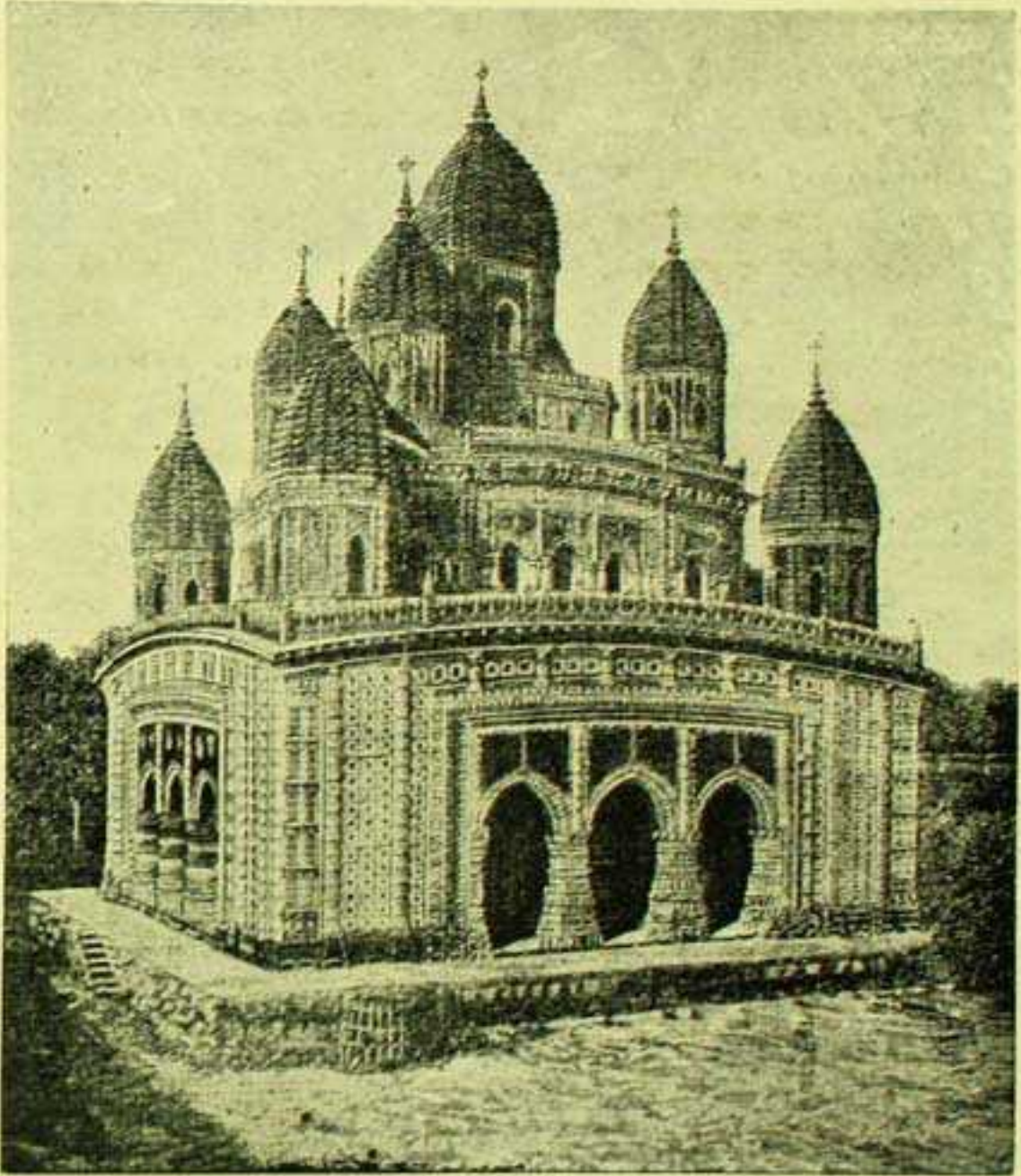
কান্ত নগরের মন্দির (দিনাজপুর)। এই মন্দিরের নবরত্নের মত নয়টি চূড়া বাঙ্গলার অনেক মন্দিরে দৃষ্ট হয়। নবরত্নের নিম্নের ছাদের ঈষৎ গোলাকৃতি ঢল এবং খিলানগুলি বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির, বারিগদের মন্দির, মহানাদ, শান্তিপুরের মন্দির এবং গৌড়ের কদম-রসুলের মসজিদ প্রভৃতির প্রণালীতে নির্মিত। এই মন্দির (১৭০৪-১৭২২ খৃঃ) দিনাজপুর সহর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে পোড়া ইটে যে সকল মূর্ত্তি ও ঘটনা উৎকীর্ণ আছে, তাহা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজের জীবন্ত আলেখ্যের ন্যায়; ফার্গুসনের ইতিহাস, (জন মারে কোং হইতে গৃহীত)।
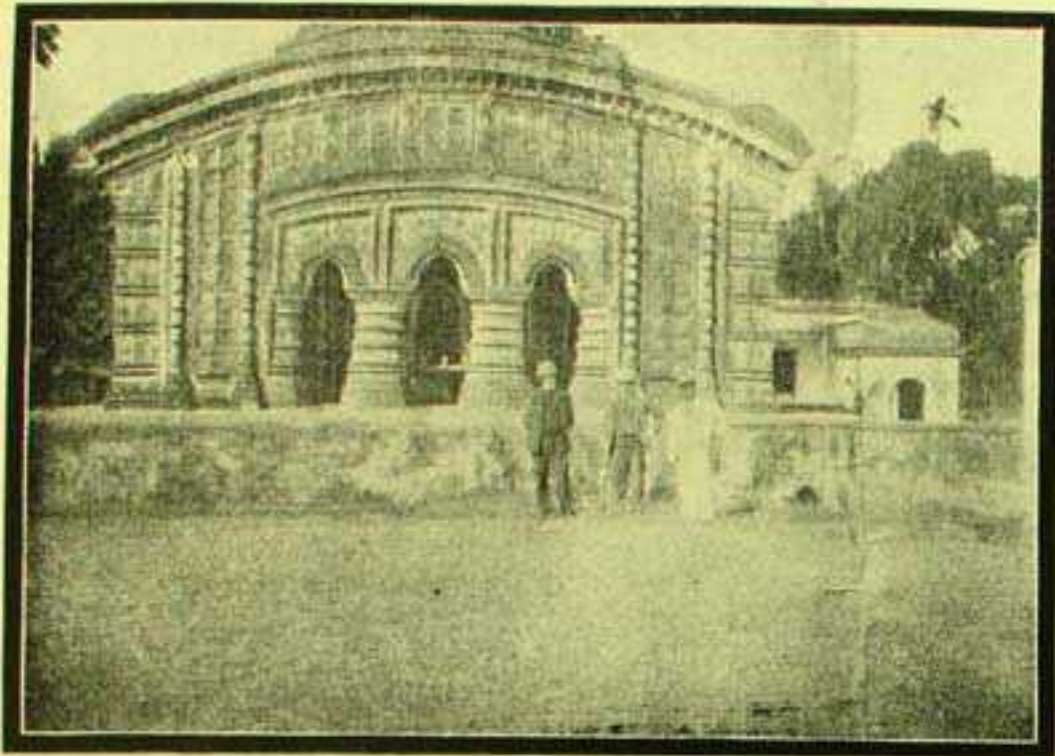
বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির। রাজা রামেশ্বর কর্তৃক (১৬৭৯ খৃঃ) নির্ম্মিত।

রাধা-কৃষ্ণ মন্দির—মহানাদ।

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির। (১৭৩৬ শক, ১৮৪১ খৃঃ)

মতানামের এই দোচালা ঘরের মত মন্দির বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। কানিংহাম, ফার্গুসন প্রভৃতি স্থাপত্য-সমালোচকগণের মতে বাঙ্গলা হইতে এই আকৃতির ইষ্টক-গৃহ জগতের সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার ধবাপুর গ্রামের বর্ত্তমানকালে ভগ্ন রাধা-কান্ত মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তৎস্থলে এই দোচালা ঘরের মত মন্দির ছিল এবং বঙ্গের বহুস্থানে এই ধরনের মন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, বারিপদ (ময়ূরভঞ্জ) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

জটার দেউল—৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তচন্দ্র নামক নৃপতি কর্ত্তৃক সুন্দরবনের মথুরাপুরে (১১৬ নং লাটে) এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহা ১০০ ফুট উচ্চ। বর্ত্তমানে গভর্নমেণ্ট ইহার সংস্কার করিয়াছেন। শ্যামে আযুথিয়া-মঠের আকৃতি ঠিক এইরূপ।

সের সাহের সমাধি।

বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া মুসলমানগণ এইভাবে মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল মসজিদ তো হিন্দু মন্দিরের মালমশলা দিয়াই রচিত হইয়াছিল; পরন্তু সম্ভবতঃ দেশীয় যে সকল শিল্পিগণ ঐ সকল প্রাচীন মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ অনেক স্থলে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অথবা কোন কোন স্থলে স্বধর্ম্মে থাকিয়াও সেই সকল মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন, মোগলেরা পারস্ত হইতে যে শিল্পপ্রভাব আনিয়াছিলেন, তাহা তখনও বাঙ্গলায় প্রবেশ করে নাই। ১৫৭৬ খৃঃ অব্দের পরে সেই হাওয়া কিছু কিছু এদেশে ঢুকিয়াছিল, তাহা পরে উল্লেখ করিব। হাভেল সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন—ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এসিয়ার চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের গুরু। পারস্তের শিল্প ও বিদেশী মসজিদগুলির সূক্ষ্ম কাজ ও গঠনপ্রণালী সমস্তই মুসলমানগণ বৌদ্ধশিল্পীর নিকট পাইয়াছেন। আর্য্য বর্ত্তে এই শিল্প ও স্থাপত্য যেরূপ বিকাশ পাইয়াছে, খাস পারস্ত দেশে তাহা হইতে পারে নাই। বৌদ্ধগণের পদ্ম-চিহ্ন লোপ করিয়া মুসলমানেরা যে গম্বুজ রচনা করিয়াছেন, তাহাও এদেশেরই স্থাপত্য হইতে নেওয়া। ভারতবর্ষের বহু শিল্প ও স্থাপত্য-বিশারদ মুসলমানদের বিজিত দাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান হইতেন। তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের তুলি ও বাটালি হিন্দু শিল্পের কুশলতা-বিচ্যুত হয় নাই।

পাঠান-প্রাধান্ত যুগের মুসলমানী মসজিদ ও প্রাসাদাবলীর মধ্যে শের সাহের সমাধি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শের সাহের বাল্যলীলা-ক্ষেত্র সাসারামে এই সমাধিটি উত্থিত হইয়াছিল। এই সমাধির ঊর্দ্ধ গম্বুজটি ছাড়িয়া দিলে ইহার অনেকটা একটি হিন্দু রথের অনুকৃতি, তফাৎ এই যে ইহা রথের মত বেমানান দীর্ঘ হইয়া উঠে নাই। দুই দিকে সমতা-সহকারে প্রসারিত করিয়া ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের এমনই একটি সুসামঞ্জস্ত রক্ষা করা হইয়াছে যে উহা উত্তর কালে শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পরিণতির আদর্শ তাজমহল-পরিকল্পনার পূর্ব্বাভাস দেখাইতেছে। এই মন্দিরের চারিদিকে কৃত্রিম হ্রদের বিস্তৃত জলরাশি এক মাইল ব্যাপক, তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর কয়েকটি সমাধি-মন্দির আছে। সেই বিস্তৃত জলরাশির উপর প্রবমান জলযানের মত দূরবর্ত্তী স্বল্পায়তন সমাধিমন্দিরের ঊর্দ্ধে শ্যামতরুরাজির অবকাশে এই সুবৃহৎ মন্দিরটি তাহার একক রাজত্বের মহিমা দেখাইতেছে। ইহা দেখিয়া একজন ইংরাজ কবি মুগ্ধ হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন (Asiatic Miscellany) তাহার অনুবাদ আমি নিম্নে দিলাম—

স্বচ্ছ নীর হতে ঊর্দ্ধে মহিমা-প্রকাশ
সুবিশাল গৃহচূড় ছুঁইছে আকাশ;
উপকূল বেড়া ছোট সমাধি-মন্দিরে
বিশ্বস্ত সৈনিক যেন ঘিরে আছে বীরে।
সম্রাট্ একক, তাঁর অখণ্ড বৈভব
মৃত্যুতেও হারায়নি স্বাতন্ত্র্য-গৌরব।

মুসলমান নবাবদের অনেকেই খামখেয়ালী ছিলেন। বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা দিল্লীর অঞ্চলে সময়ে সময়ে দৌরাত্ম্যটা খুব প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ আলাউদ্দিন দুরন্ত পাগল ছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে কত যে নূতন নূতন আইন-কানুন উদ্ভাবিত হইত, তাহা কবির কল্পনায়ও আসে না। "সুলতান" তাঁহার রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করিতে পারিতেন না, পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে সভাসমিতি করিতে দেওয়া হইত না। রাজার অনুমতি ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে কোন বিবাহ হইতে পারিত না। তাঁহারা স্বগৃহে কোন বিদেশী লোককে স্থান দিতে পারিতেন না। চারিদিকে এত গুপ্তচর ছিল যে তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে ভয় পাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের কোন সুযোগ ছিল না। যদি তাঁহারা কোন হোটেলে বা সরাইতে একত্র হইতেন, সেখানে তাঁহাদের মুখব্যাদান করিবার ক্ষমতা ছিল না, পরস্পরের দুঃখের কথা বলা অসম্ভব ছিল (তারিকি ফিরোজ সাহী)। যেখানে মুসলমান আমিরদের উপরই এইরূপ আইন জারি হইত, সেখানে হিন্দুরা যে কি কষ্টে ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। "হিন্দুরা বাড়ীতে ঘোড়া রাখিতে পারিত না, তাহাদের ভাল কাপড় পরিতে দেওয়া হইত না—কোন বিলাস সম্ভোগ করিতে পারিত না। কোন হিন্দু মাথা উঁচু করিয়া রাস্তায় হাঁটিতে পারিত না—তাহাদের গৃহে সোণা-রূপার কোন সামগ্রী রাখিতে দেওয়া হইত না।" সুলতান মহম্মদ টোগলকের দৌরাত্ম্য একরূপ অকথ্য। এক সময়ে (১৩৪২ খৃঃ) তিনি আদেশ করিলেন—"তিন দিনের মধ্যে সমস্ত দিল্লীবাসীকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হইবে। অবশ্য অনেকেই সম্রাটের ভয়ে দিল্লী ছাড়িয়া দৌলতাবাদে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু কয়েকজন রহিয়া গেলেন—তাঁহারা লুকাইয়া গৃহ-মধ্যে রহিলেন। সম্রাট্ অতি কঠোরভাবে তাঁহাদের সন্ধান লইতে লাগিলেন। সম্রাটের চরেরা একটি পঙ্গু ও একটি অন্ধকে রাস্তায় পাইয়া কুড়াইয়া আনিল। সম্রাট্ সেই পঙ্গুটাকে প্রাসাদশিখর হইতে গুলি করিয়া মারিলেন এবং অন্ধকে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে টানাইয়া আনিলেন। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ ৪০ দিনের পথ। এই সমস্ত রাস্তাটা অন্ধকে টানিয়া আনার ফলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাস্তায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে পড়িতে চলিল। যখন দৌলতাবাদে এই লোকটার অবশিষ্ট অংশ আনা হইল, তখন দেখা গেল হতভাগ্যের মাত্র একটি পা সেই নগরে পৌঁছিয়াছে। (ইবন বতুতুর ভ্রমণ)। তাইমুর দিল্লীতে হিন্দুদের উপর যেরূপ হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা লোমহর্ষণ। "তিনি আদেশ করিলেন, যে মুসলমান যতগুলি হিন্দু বন্দী করিয়াছে, সেই সকল বন্দীর সকলটিকে সে আদেশমাত্র হত্যা করিবে, নতুবা তাহাকে হত্যা করা হইবে। ইসলামের বীরপুরুষেরা এই আদেশ শ্রবণমাত্র তাহাদের খড়্গ কোষ হইতে বাহির করিয়া সমস্ত বন্দীদের নির্ম্মূল করিল, একদিনে একলক্ষ কাফের নিহত হইয়াছিল। একটি আমির রাজসভায় তাঁহার পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও দয়াদাক্ষিণ্য-গুণে সকলের আদৃত ছিলেন, তিনি জীবনে

খামখেয়ালী সম্রাটগণের অত্যাচার।

একটি চড়ুই পাখীও মারেন নাই, সেই স্মরণীয় দিবসে তিনিও স্বহস্তে ১৫টি হিন্দু বন্দীর শির কর্ত্তন করিয়াছিলেন (তাইমুরের আত্মবিবরণী)। ভননেয়ারার আকবরের জীবনচরিতে উল্লেখিত আছে, যখন মুসলমান রাজকর্ম্মচারী হিন্দু প্রজার নিকট কর আদায় করিতে যাইতেন তখন সেই কাফেরকে হাঁ করিতে হইত, কারণ রাজকর্ম্মচারীটি যেন তাহার মুখে থুতু নিক্ষেপ করিতে পারেন, এই ছিল আইন; ইহার উদ্দেশ্য "ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি এবং আশ্রিত কাফেরগণের বশ্যতার পরীক্ষা করা।" দিল্লীর বাদসাহগণের যে কতরূপ খামখেয়ালী ছিল তাহার অবধি নাই। একজন (সেকেন্দর লোডি—১৪৮৮-১৫১৮ খৃঃ) তাঁহার আমির বা অতিথিদিগকে কি কি দ্রব্য খাইতে দিতেন, তাহার ফর্দ্দ নিজে করিয়া দিতেন, একবার যাহা করিলেন তাহা যেন পাথরের দাগ হইত—"হাকিম নড়ে, তো হুকুম নড়ে না।" গ্রীষ্মকালে জোয়ানপুর হইতে এক সম্ভ্রান্ত অতিথি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা অতি দারুণ গ্রীষ্ম এবং লোকজন সারাদিন তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সুলতান সেই অতিথির সমস্ত খাদ্যের ব্যবস্থা ও বরাদ্দ করিয়া শেষে তাঁহার জন্য ছয় জালা সরবৎ মঞ্জুর করিলেন। তারপর সেই অতিথি শীতকালে আবার আসিলেন, তখনও দেখিলেন তাঁহার জন্য সেই ছয় জালা সরবতের ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে (তারিকই দাউদি)।

দিল্লীশ্বরগণের এই খামখেয়ালী ও অত্যাচারের হাওয়াটা বাঙ্গলায়ও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিশেষতঃ পাঠান জাতিরা স্বভাবতঃই নির্ম্মম ছিলেন। আমাদের কোন ইতিহাস নাই, সুতরাং সেই সময়ের অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে মাঝে মাঝে এই অভিশপ্ত দেশের অবস্থার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। যাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া পুস্তক লিখিতেন, তাঁহারাও স্পষ্ট করিয়া এসকল কথা লিখিতে সাহসী হইতেন না। প্রবল শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারের কথা সেই দেশের লোকেরা লিখিতে স্বভাবতঃই ভয় পাইয়া থাকে। ভয় পাইয়াই বোধ হয় বৈষ্ণবগণ আইন করিলেন, কোন নিতান্ত কষ্টকর কথা লিখিতে নাই।

বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের শেষকাল ও মোগলদের আবির্ভাব—এই সময়টায় প্রজারা কাজীদের হাতে অত্যন্ত বিড়ম্বিত হইত। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে কবি চন্দ্রাবতী যথাযথ চিত্র দিয়াছেন—

> "টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পুঁতিয়া।
> ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া॥
> ডাকাত দেশের রাজা পাতসায় না মানে।
> উজাড় হইল রাজ্য কাজীর শাসনে॥
> দোছুক পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
> ধনেপ্রাণে মরে লোক চন্দ্রাবতী কয়॥"

কাজীদের সঙ্গে সহযোগে ডাকাতেরা দেশ লুটতরাজ করিত। কেনারাম এবং নেজামত প্রভৃতি দস্যুদের যে চিত্র পল্লী-কবিদের হাতে ফুটিয়াছে, তাহা পড়িলে প্রাণ আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরাজত্বের অবসানে ও গাজিদের প্রথম অভ্যুদয়ে দেশে এইরূপ অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছিল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে তাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে। "যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ। কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যথা। চড়চাপড় মারে আর ঘাড়ে গোতা॥"—"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিঁড়ে কারো থুথু দেয় মুখে।" "ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়।" "বাছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যার কাঁধে। পেয়াদাগণ লাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে।" হুসেন সাহ একটা ভবিষ্যৎ বাণী শুনিলেন যে, "নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ আবার রাজা হইবে।" মন্ত্রীরা বলিলেন—পুরাণে ও গন্ধর্ব্বশাস্ত্রে এরূপ কথা লিখিত আছে বটে; বিশেষ নবদ্বীপের লোকেরা বলশালী ও ধনু চালনায় পারদর্শী।" তখন হুসেন সাহ নবদ্বীপ ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন। "পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। বিষম পিরুল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে" ইত্যাদি। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, মুসলমানেরা বাদসাহের আদেশ পাইয়া নবদ্বীপে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। "কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে। ঘরদ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে।" অত্যাচারীরা অশ্বত্থ ও মনসা গাছের মূলচ্ছেদ করিয়া ফেলিল ও তুলসী গাছ মূলশুদ্ধ উপাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। যে ঘরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, সে ঘরে যাইয়া উৎপাত সুরু করিত। গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ হইল, দেবালয়গুলি চূর্ণ করিল,—পণ্ডিতগুলিকে ধরিয়া জোর করিয়া মুসলমান করা হইতে লাগিল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম পলাইয়া পুরীতে আসিলেন, তথায় রাজা প্রতাপ-রুদ্র তাঁহাকে স্বীয় সভায় রত্নসিংহাসনে বসাইয়া সম্মান করিলেন। তাঁহার পিতা বিশারদ কাশীবাসী হইলেন। বাসুদেবের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় গৌড়দেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই। হুসেন সাহ বুঝিলেন, এরূপ ভবিষ্যৎ বাণীর কোন মূল্য নাই, তখন সেই অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। বিদ্যাবিরিঞ্চি, বিদ্যারণ্য এবং ভট্টাচার্য্য, শিরোমণি ও অপরাপর মহাজনেরা যাঁহারা নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা নবদ্বীপে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। খামখেয়ালী নবাবগণের ঔদার্য্যও নিষ্ঠুরতার মতই অত্যধিক ছিল। হুসেন সাহ যে সকল হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাহা রাজকোষের অর্থদ্বারা পুনরায় সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

যখন বাঙ্গলাদেশ প্রথম পাঠানদিগের অধিকৃত হয়, তখন এই ভাবে অত্যাচার কতক দিন চলিয়াছিল। তারপর রাজাদের মধ্যে যাঁহারা খামখেয়ালী তাঁহারাও মাঝে মাঝে এই অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শের সাহের জবরদস্ত শাসনে কতক দিনের জন্য এই অত্যাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু মোগলরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যাচার সুরু

হইয়াছিল। দামুন্তার কবি মুকুন্দ ডিহিদার মামুদ সরিফের যে অত্যাচারের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে গ্রামগুলি উচ্ছন্ন যাইবার মধ্যে আসিয়াছিল। হিন্দু আমলে রাজকর্ম্মচারীরাও যে এরূপ না করিতেন তাহা নহে। রাজা মাণিকচন্দ্রের বাঙ্গালী মন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ ও ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার প্রায় এক শ্রেণীর। খিলভূমি আবাদি বলিয়া লিখিত হইল, তাহার উপর রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। কৃষকেরা, একদিকে বাজারে জিনিষের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাওয়াতে এবং প্রত্যেক টাকার মূল্য ৵১০ আনা হওয়াতে, দুই দিক্ দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। জিনিষের দাম তঙ্কাপ্রতি ।৵০ কমিয়া গেল। প্রজারা বীজ ধান ও গরু বিক্রয় করিয়া ডিহিদারের দাবী মিটাইতে পারিল না। এদিকে গ্রাম হইতে পালাইয়া যাইবার উপায় নাই। পথে পথে কোটালগণ রাস্তা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল এবং প্রত্যেক বিঘা পাঁচ কাঠা কম করিয়া হিসাব করা হইতে লাগিল। যাহার দশ বিঘা জমি ছিল তাহার হইয়া গেল সাড়ে সাত বিঘা; বাকী রাজ-সরকারে জমা হইল। মুকুন্দরামের এই চিত্রের সঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীর মৈমনসিংহ ("ভাটি")-বাসী বাঙ্গালী মন্ত্রীর অত্যাচারের কাহিনী মিলাইয়া পড়ুন। উভয়ের কার্য্যকলাপের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাইবেন।

মুসলমানেরা বিলাস-ক্ষেত্রে এবং রাজপ্রাসাদ-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুদের সেই মহাপাত্র, নিশাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদের পদবী উঠিয়া গিয়া উজির, নাজির, সেরেস্তাদার, কাজি, ওমরাহ, জমানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রভৃতি নানা পারসী ও আরবী-সম্ভূত নাম রাজসভায় প্রচলিত হইল। গৌড়েশ্বরগণের সভায় সেই অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি, বিবিধবিদ্যা-বিচার-বৃহস্পতি, আর্য্যকুল-কমলভাস্কর, সোম বা সূর্য্যবংশপ্রদীপ, প্রতিপন্ন-কর্ণ, সত্যব্রত গাঙ্গেয়, শরণাগতবজ্রপঞ্জর, পরমেশ্বর-পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি সংস্কৃতাত্মক কোন উপাধির চিহ্নমাত্র রহিল না। এমারত, ঝাড়, দেয়ালগিরি, ফানুস, আতর প্রভৃতি বিদেশী শব্দ সমাজের উচ্চস্তরের বিলাসীদের ভাষা হইল। সহরে হিন্দুর ভাষা ধীরে ধীরে মুসলমানী ছাপ গ্রহণ করিয়া পরাধিকারের প্রভাব সপ্রমাণ করিল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে হিন্দুদের অবাধ রাজত্ব,—সেখানে আবৃতির মেটে প্রদীপটি হইতে তুলসীতলা, চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, আকাশ-ঘেরা কুটিরটি পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই বাঙ্গলা রহিয়া গেল। পাঠান আমলে হিন্দু সহর ছাড়িয়া দিয়া এই পল্লীতে রাজত্ব করিয়াছে। পল্লীতে বসিয়া পণ্ডিতেরা মেটে প্রদীপের সাহায্যে বড় বড় ন্যায়দর্শনের টীকা করিয়াছেন। পটুয়ারা অজন্তার শেষ চিহ্ন বজায় রাখিয়াছে, মেয়েরা তাঁহাদের আলপনা ও কাঁথার মধ্যে যে সকল কলা আঁকিয়াছেন তাহা অমরাবতীর চিত্রশিল্পের শেষ নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পুঁথিতে শিল্পিগণ বিচিত্র ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন, কাঠের মলাটে গালা দিয়া লাল রংএর জমি তৈরী করিয়া তাঁহারা নিপুণভাবে দেবতাদিগের পৌরাণিক লীলা অঙ্কন করিয়াছেন। ছুতোরেরা তাহাদের কর্ম্মে অজন্তা, সাঁচি, অমরাবতী ও মগধের সমস্ত শিল্পের শেষ নমুনা

রাজদরবারে ও বিলাসের কক্ষে বিদেশী ভাষার প্রভাব।

রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে এবং মন্দির-নির্ম্মাণকারীরা পোড়া ইটের গায় যে সমস্ত জীবজন্তু, নরনারী ও ফুললতার চিত্র উৎকীর্ণ করিয়াছে, তাহাতে শিল্পলক্ষ্মীর অভয়বাণী শোনা যায়। তিনি যেন বলিতেছেন—"বাঙ্গলার নগর সহর হইয়া গিয়াছে—সেখানে আমার স্থান নাই; কেবল অর্থের ছড়াছড়ি, অর্থে আমাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গলার পল্লীতে এখনও তপস্যা চলিতেছে—আমি সেই তপস্বীদিগকে এখনও ছাড়িতে পারি নাই।" ফুললতার কল্কার বাহাদুরী বাঙ্গলার প্রত্যেক মন্দিরে পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই মোগলাধিকারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের। পাঠান আমলের শেষ দিকে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন পল্লীতে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিগ্রহ বড় বেশী পাওয়া যায় না। বিগ্রহের নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত, লিঙ্গ ভাঙ্গিতে তাহাদের ততটা উৎসাহ ছিল না। এই জন্য অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল মন্দিরে দেবলীলা এবং নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু ইহাদের বাহার ছিল কল্কায়। প্রত্যেকটি মন্দিরে বিভিন্নরূপ কল্কা, এক মন্দিরেই সূক্ষ্ম ও স্থূল বিবিধ প্রকারের কল্কা। এই কল্কার কত আদর্শ যে কারিগরদের মাথায় ছিল, তাহা বলা যায় না। এই অফুরন্ত কল্কার আদর্শ যেমন আমরা মেয়েদের কাঁথায় পাই, তেমনি মন্দিরগাত্রে পাই। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, মন্দির সাজাইবার ভার সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে এমন কি দাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালী শিল্পীরা জোগাইত। এই বাঙ্গালী শিল্পীরাই মগধের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের বংশধর। মাগধ-গৌরব নষ্ট হওয়ার পরে গৌড়ের প্রভুত্বকালে সেই শিল্পীরা বাঙ্গলায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। তিন চারি শত বৎসর হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার শত শত মন্দিরগাত্রে যে কল্কার অপূর্ব্ব মৌলিক শোভার ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বসোরা যেরূপ গোলাপের জন্মস্থান—বাঙ্গলাদেশ তেমনই চারুশিল্পকলার জন্মস্থান—এখানেই কলালক্ষ্মীর সিংহাসন ছিল। আপনারা মাটী খুঁড়িয়া অশোকস্তম্ভ ও তাহার রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, বাঙ্গলার শিল্পলক্ষ্মীর রাজধানী খুঁজিতে আপনাদের মাটী খুঁড়িতে হইবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের পদ্মহস্তে সেই পদ্মাসনার করকমলের সুরভি পাইবেন, প্রত্যেক মন্দির-রচকের বাটালী ও ক্ষুদ্র যন্ত্রিকার অগ্রে তাঁহার চরণকমলের ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, নতুবা এত পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে কিরূপে। আমি উৎকৃষ্ট কল্কাগুলির ফটোগ্রাফ পাইলাম না, তাহারা অনেক স্থলেই দূরে অবস্থিত। আমি বৃদ্ধ—সঙ্গতিহীন, চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি পাইবার উপায় করিতে পারিলাম না। আমার প্রিয়তম দেশবাসীদিগের এ বিষয়ে কৌতূহল উদ্বোধন করিয়া আমি বেহালা, বড়িষা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানের কয়েকটি মন্দিরগাত্র হইতে কল্কার নমুনা দিতেছি। য়ুরোপীয় শিল্পকারের মত আমাদের দেশের শিল্পকারেরা নকলবাজ নহেন। ঠিক একটি ফুল দেখিয়া ফুল আঁকা;—অল্প কিছু শিল্পবিদ্যার বর্ণপরিচয় জানিলেই এই নকল কার্য্যটি অতি সহজে শেখা যায়। কিন্তু যে শিল্পী সমস্ত পুষ্পজগৎকে হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে

পল্লী শ্রীর ভাব বজায় রাখিয়াছে

মন্দিরগাত্রে চারুশিল্প।

পারিয়াছেন, তিনি ভগবানের সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার দক্ষতা লাভ করেন, তখন জগতের বিবিধ বর্ণশোভা তাঁহাকে বর্ণ আঁকিয়া শেখায়, জগতের যাবতীয় ফুল-লতা তাঁহার নবসৃষ্ট ফুল-লতার মধ্যে অপরূপ মাধুরী ঢালিতে শক্তি দেয়। এই মৌলিক সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি লইয়া ভারতীয় শিল্পী অবাধে আঁকিয়া যান। তিনি যে পদ্ম আঁকেন, তাহা জগতের পদ্ম নহে, তাঁহার আঁকা লতা জগতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা তাঁহার হাতে অবাধ গতি প্রদান করে, বর্ণের বিন্যাস দিয়া কাঁথার শোভা চিত্ত হরণ করে। হয়ত ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিলে তেমন কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমগ্রভাবে এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিলে মনে হইবে,—একি আশ্চর্য্য রংমহাল, ইহাতে রঙ্গএর বিচিত্র বিন্যাস, কলালক্ষ্মীর কি অপূর্ব্ব ও গৌরবান্বিত মহিমাই না এই অপার্থিব ফুল-লতায় প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে। ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয়, শিল্পীর যে সহিষ্ণুতা, তাহার উদাহরণ অন্য কোথাও নাই। এই জন্য বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আঁকে, মূর্ত্তি গঠন করে—এ বলিলে কথাটা ঠিক বোঝা যাইবে না, বলা উচিত বাটালি, ছুঁচ বা পিঠালী এই সকল সামান্য উপকরণ দিয়া তাহারা তপস্যা করে। প্রত্যেকটি মন্দিরের কারুকার্য্য, প্রত্যেকটি কাঁথা দেখিলেই তপস্যা কথাটাই জিহ্বাগ্রে আসিবে। কারণ এ সকল ঢালাই করা কার্য্য নহে, ইহার প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম কাজ, হাতের কাজ।

এই পল্লীলক্ষ্মী বিদ্যা-ধর্ম্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী ; এখানে চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন এবং এই পাঠান আমলেই কত ভক্ত, কত তান্ত্রিক, কত নৈয়ায়িক, কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। সত্য বটে মুসলমান-বিজয়ের পর আর কোন রাজকবি পবনদূত বা গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া মহারাজাধিরাজ-রাজচক্রবর্ত্তীর মনোরঞ্জন করেন নাই। কিন্তু পল্লীকবিদের সুস্বরলহরী তো থামে নাই, সময়ে সময়ে কোন ক্ষুদ্র জমিদারের নিকট "সাত আড়া" ধান মাপিয়া লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত কোন কবিচূড়ামণি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মোটের মাথায় বাঙ্গলার বিদ্বান্, বাঙ্গলার ভক্ত, বাঙ্গলার শিল্পী এবং বাঙ্গলার ধার্ম্মিক আর রাজানুগ্রহের প্রত্যাশা করে নাই। বাঙ্গলার সভ্যতা পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়া গণতন্ত্রতার একটা রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে রাজার কোন স্থান ছিল না,—সমস্ত দেশ পাঠানের অধিকারে থাকিলেও তাহার অধ্যাত্মসাম্রাজ্য বজায় রাখিয়াছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার পল্লীর প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের ইঙ্গিতে সমস্ত সমাজ চলিত। ব্রাহ্মণের পর ঐ সময়ে আর এক দল প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—বৈষ্ণব। ইহারা নূতন আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়া দেশের একাংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে কুলীনেরা একেবারে দৃঢ়রূপে স্বপ্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের কুলীনদিগকে সমাজে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই সুদৃঢ় হিন্দুব্যূহের মধ্যে বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না, তবে মাঝে মাঝে সুন্দরী হিন্দু ললনাদিগের খোঁজ করিবার জন্য "সিদ্দুকী"রা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইত। পল্লীবাসিনী

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব।

রমণীরা অবরোধ কি জানিতেন না। কিন্তু মুসলমান, মগ, পর্ত্তুগীজ, হার্ম্মাদ প্রভৃতি বিদেশী দস্যুদের ভয়ে মোগল রাজত্বের শেষভাগে এদেশে অবরোধ-প্রথা কতক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হয়। "নৃত্যগীতানুরক্তি" হিন্দুললনাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণের পরিচায়ক ছিল—পদ্মিনী-শ্রেণীর রমণীর লক্ষণের মধ্যে এই "নৃত্যগীতে অনুরক্তি" উল্লিখিত আছে। এদেশের রাজকুমারীরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা শিখিতেন, বৃহন্নলাই শুধু একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। চিত্রলেখার সময় হইতে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী মেয়েরা চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেন। বিদেশীয়দের অত্যাচারে তাঁহারা এই সকল বিদ্যার অনুশীলন ছাড়িয়া দিলেন। ইচ্ছাবর (স্বয়ংবর)-প্রথা এদেশে এখন লুপ্ত; কিন্তু পালরাজগণের সময়েও কতকটা পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচলিত ছিল। "পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা"য় এই ইচ্ছাবর-প্রথার অজস্র প্রশংসা কৃষক কবি গাহিয়াছেন। স্বকীয় মনোনয়নে যে রমণী স্বামী লাভ করিতে পারেন তাঁহার মত সৌভাগ্য জগতের কাহারও নাই, এই কথা কবি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন।

কিন্তু ষোড়শী কুমারীর বিবাহ হইবে, তিনি স্বয়ংবর মনোনয়ন করিবেন, কিংবা কোন রমণী সুগায়িকা, নৃত্যকলায় পারদর্শিনী, কিংবা চিত্রবিদ্যায় নিপুণা এই সকল সংবাদ সিন্ধুকীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহারা বাঘের ন্যায় গুণবতী ও সুন্দরী মহিলাদের খোঁজে পাড়ায় পাড়ায় ওৎ পাতিয়া থাকিত, সুতরাং বাঙ্গলাদেশ হইতে এই সকল গুণ রমণীসমাজে লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এখনও কোন কোন পল্লীতে প্রাচীন রীতির শেষ চিহ্ন আছে। ফরিদপুর অঞ্চলের মেয়েরা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য করিতেন। শ্রীহট্টের কোন কোন পল্লীতে বিশ বৎসর পূর্ব্বেও পাকস্পর্শের পূর্ব্বে লাল-চেলী-পরিহিতা কন্যা গুরুজনসমক্ষে নৃত্য করিতেন। যাঁহারা এই ভাবে নৃত্য করিতেন তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন।

মেয়েদের নৃত্যগীত।

এখনও ঢাকা ও মৈমনসিংহের মেয়েরা বিবাহ উপলক্ষে গান গাহিয়া থাকেন। বঙ্গের কোন কোন দেশ হইতে এই রীতি লুপ্ত হইয়া থাকিলেও কোথাও কোথাও তাহা এখনও প্রচলিত আছে।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও যে সকল রীতি প্রচলিত আছে তাহাতে বাঙ্গালীর গৃহ যে কিরূপ অনাবিল আনন্দনিলয় ছিল তাহার কতকটা ধারণা পাওয়া যায়। কন্যা জন্মিলে মাতা একখানি কাঁথা শেলাই করিতে আরম্ভ করিতেন—খুকুমণির বরের জন্য। সেই একখানি কাঁথা গৃহকর্ম্মের অবসরে প্রত্যহ শেলাই করিয়া তিনি ৮।১০ বৎসরে সমাধা করিতেন, তখন বর তাহা পাইতেন। এত স্নেহের, এত যত্নের শিল্পসামগ্রী জগতে কোন মহারাজাধিরাজও পান নাই। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে "পীড়িচিত্র" আরম্ভ হইত, সেই চিত্রিত পীড়ির উপর পাতিবার জন্য নানা কারুকার্য্যমণ্ডিত কাগজের ফুল-লতা অঙ্কিত হইত। তাহার দুই একটা নমুনা আমরা দেখিয়াছি। শান্তির জল রাখিবার জন্য ঘট ও বরণডালা ছয়মাস ধরিয়া চিত্রিত হইত। কত হাসি কত গল্প ও আনন্দের মধ্যে মেয়েরা এই সকল চিত্রকলা

সম্পাদন করিতেন, তাহা এখনকার মহিলারা বুঝিবেন না—কারণ এখন বিলাতী চক্কানাদে কর্ম্মকর্ত্তা ও গৃহিণীর আত্মা শুকাইয়া যায়—হয়ত মেয়ের বিবাহের সরঞ্জামের জন্য ভিটাটি বাঁধা পড়িয়াছে। যে আঙ্গিনায় বরকন্যার "সাতপাক" অর্থাৎ সপ্তবার প্রদক্ষিণ এবং "মুখচন্দ্রিকা" অর্থাৎ মুখদর্শন হইবে তাহার উপর ৪।৫ জন লোক কন্যা ও বরকে লইয়া ঘুরিতে পারে তদুপযোগী আর একখানি আসন মেয়েরাই চিত্রিত করিতেন। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাতদিন পরে 'সাদিনা', দশদিন পরে 'দশা' এবং ত্রিশ দিন পরে 'ত্রিশা' প্রভৃতি নানা উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাসম্প্রদান এবং এয়ো-কর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য মেয়েরা সম্পাদন করিতেন। বাহিরের কোন শিল্পী বা কারিগরের এই অন্তঃপুরের কলাসদনে প্রবেশ নিষেধ। কেবল যখন মেয়েরা নাচিতেন, তখন নিম্নশ্রেণীর ঢুলিরা আস্তে আস্তে ঢোল বাজাইয়া নৃত্যের তাল রক্ষা করিত।

মেয়েদের হাতের কাজ।

পল্লীর বিগ্রহই পল্লীর প্রকৃত রাজা ছিলেন, তাঁহার ভোগের জন্য রাত্রিদিন খাটিয়া চাষারা অতি সুগন্ধ সরু গোপালভোগ, কৃষ্ণভোগ প্রভৃতি চাউল প্রস্তুত করিত। যাহার বাড়ীতে যে ফলটি জন্মিত, তাহা গৃহস্থ আগে মন্দিরে আনিয়া দিয়া যাইত, কত মালী বাগান হইতে রাশি রাশি ফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিত, কত শিল্পী বিগ্রহের অঙ্গরাগ করিত। প্রতি উৎসবে মন্দিরবাড়ীতে যে ধূমধাম হইত রাজার বাড়ীর উৎসব হইতে তাহা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সূত্রধরগণ সারা বৎসর ভরিয়া দেবতার জন্য রথ তৈরী করিত। বঙ্গের পল্লীগুলি এই ভাবে পল্লীবিগ্রহের অধিকারে বাস করিত, তাহারই আঙ্গিনায় কীর্ত্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী নিত্য নূতন আনন্দ পাইত। এমন সুখের রাজ্য, এমন শান্তির রাজ্য কোন রাজা কখনও শাসন করে নাই। সুতরাং বঙ্গপল্লী পাঠান আমলেও হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ বিঘ্ন করে নাই।

তবে মধ্যে মধ্যে অত্যাচারের স্রোত বহিয়া যাইত, তাহার ফল কি দাঁড়াইত তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। যশোহরে পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি বাসুদেব-বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার চারিদিক্ অর্দ্ধছিন্ন নরকঙ্কাল-বেষ্টিত—যশোহরের ইতিহাস-লেখক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাকে ইহা জানাইয়াছিলেন। সহজেই অনুমিত হয়, ঐ সকল কঙ্কাল সেই বিগ্রহের ভক্ত কিংবা পাণ্ডাদের, তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। উঁহাদের কেহ মন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে বিগ্রহটি লইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, অপর সকলের কর্ত্তিত দেহ সেই দীঘিতেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন কোন গৃহস্থ মুসলমান নবাবের ছাড়পত্র পাইতেন, সেই চিহ্ন থাকিলে মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইত না। একখণ্ড লৌহের উপর নবাবের পাঞ্জা মার্কা থাকিত, এই মন্দির কিরূপ তাহারও ইঙ্গিত থাকিত। আমার নিকট সেইরূপ একটি পাঞ্জা আছে। উহা নারিকেলডাঙ্গার এক ভদ্রলোক আমাকে দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই লৌহখণ্ডটি মিরজাফরের আমলের, উহার একদিকে ত্রিশূলচিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে উহা কোন শিবমন্দিরের গায়ে সংলগ্ন ছিল। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় তারিখ দেওয়া

আছে, পলাশীর যুদ্ধের পর এই ছাড় চিহ্নটি দেওয়া হইয়াছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরেও একটি ছাড়পত্র বা চিহ্ন ছিল।

পল্লীবাসীরা সময়ে সময়ে মুসলমান নবাবের ক্রোধে পড়িতেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ইতিহাসে সেই সকল অপ্রিয় কথা লিখেন নাই। যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ গোস্বামিগণের বিধিসম্মত হইত, তাহাতে নিতান্ত দুঃসংবাদ তাঁহারা প্রকাশ করিতেন না। হয়ত বা নবাব বা অপরাপর শাসনকর্ত্তাদের কোপে পড়িবার ভয়েও রাজনৈতিক দুঃসংবাদগুলি তাঁহারা চাপিয়া যাইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ সহজেই সাংসারিক দুঃখ ও বিপদের বিষয় সাহিত্যে প্রবেশ করাইতে অনিচ্ছুক ছিল। এজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক লেখার নিয়ম ছিল না, এবং এজন্যই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সমস্ত কীর্ত্তনাদিতে বিরহ, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি নায়িকার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া 'যুগলমিলন' দিয়া গানের উপসংহার করিতে হইত। যে সকল কষ্ট শুধুই কষ্ট—মর্ম্মান্তিক বেদনার সৃষ্টি করে অথচ যাহার বর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত মনের কোন স্থায়ী উপকার হয় না—সে সকল প্রসঙ্গ সংস্কৃত কবিরা লিখিতেন না। কিন্তু যে দুঃখ আমাদের আত্মার সম্পদ্—যাহার পাবনী শক্তি মানুষের কলুষ নষ্ট করে এবং হৃদয়ের ভাবগুলি উন্নতির পথে লইয়া যায়, যাহার ফল মহৎ ও হিতকারী—সেই সকল দুঃখ তাঁহারা বর্ণনা করিতেন, যথা রামের বনবাস সত্যরক্ষাকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে, পাণ্ডবদিগের বনবাস, চৈতন্যসন্ন্যাস, এই সমস্ত মহাদুঃখময় ব্যাপার মহাশিক্ষার বিষয়। কিন্তু ডেসডেমনার শোচনীয় মৃত্যু, জনের নিযুক্ত ঘাতককর্ত্তৃক আরথারের চক্ষু উৎপাটন, হ্যামলেট-কর্ত্তৃক নাটকের শেষ অধ্যায়ে হত্যাকাণ্ড—এই সকল দুঃখবর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে, গ্রীক-রীতি-অনুমোদিত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য এই উত্তেজনাটুকু উপভোগ করাইবার জন্য বিয়োগান্ত নাটকের পক্ষপাতী। হিন্দুগণ অনাবশ্যকভাবে পাঠকের মনে পীড়া দেওয়ার বিরোধী, কতক এই কারণে—কতক রাজনৈতিক আতঙ্কে বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে দুঃসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। বৃন্দাবনের বড় গোস্বামীদের অনুমোদিত প্রধান গ্রন্থ—চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবত এই বিধি পালন করিয়াছে, এই জন্য চৈতন্যের তিরোধানের সম্বন্ধে তাঁহারা নীরব। কিন্তু এই গোস্বামিগণের বিধি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে কয়েকজন লেখক গণ্ডীর বাহিরে স্বেচ্ছাকৃত সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জয়ানন্দ একজন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং যদিও গোঁড়া বৈষ্ণবেরা গোস্বামিগণের বিধিবহির্ভূত কথা লিপিবদ্ধ করার দরুন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে তেমন আদর করেন না, তথাপি এই পুস্তকে কতকগুলি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য আছে—যাহার জন্য আমরা এ পুস্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী। ইনি চৈতন্যদেবের তিরোধানসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য এবং ইতিহাসসঙ্গত, নতুবা লৌকিক প্রবাদ অনুসারে মহাপ্রভুর গোপীনাথ অথবা জগন্নাথবিগ্রহের মধ্যে লীন হইয়া যাওয়ার কথাটা আজকালকার দিনে কতজনে

দুঃখান্ত দৃশ্য উদ্ঘাটন করিতে নাই।

বিশ্বাস করিবে? জয়ানন্দ লিখিয়াছেন নৃত্য করিবার সময়ে একটা ইট তাঁহার পদতলে বিদ্ধ হয়, এবং তাহার তাড়সে জ্বর হইয়া তিনি নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। পুত্রের এইরূপ আঘাত পাওয়ার ভয় শচীদেবীর চিরকাল ছিল, তিনি কতবার অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন—"তোমরা ইহাকে দেখ, নৃত্যকালে ইহার জ্ঞান থাকে না, কোথায় পড়িয়া চোট লাগিয়া মরিবে তাহার ঠিকানা নাই, আমার হরিবোলা পাগল বেহুঁস হইয়া নাচে-গায়।" শচীর সেই আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল।

যাহা হউক শুধু চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা নহে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আরও কতকগুলি বিষাদান্ত কথা আছে—যাহা বৈষ্ণবসাহিত্যের অপর কোথায়ও নাই। চৈতন্যমঙ্গল গোস্বামিগণের বিধিবহির্ভূত হইলেও এক কালে ইহার প্রচার খুব বেশী ছিল, আমরা এই পুস্তকের অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি ও দেখিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

কাজীদের অত্যাচার।

সেই সকল বিয়োগান্ত কথার মধ্যে মুসলমান কাজীদের অত্যাচারের কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবতী যে সময়কার কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষভাগের কথা (যখন রাজনৈতিক অবস্থা কতকটা অরাজকতায় দাঁড়াইয়াছিল), জয়ানন্দও সেই সময়কার কথা লিখিয়াছেন, উহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর প্রিয় সখা গদাধর দাস কাজীর সহিত ঝগড়ার ফলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। অপরাপর বৈষ্ণব লেখকেরা একথা চাপিয়া গিয়াছেন। কি বিষয় লইয়া এই নিদারুণ ঝগড়া হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কাজীগণের একজন ত হরিদাসকে কতই লাঞ্ছনা করিয়াছিল, বাইসটি বাজারের প্রত্যেকটি বাজারে তাঁহাকে লইয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছিল। পেয়াদারা ত "যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত, হাতে গলে বাঁধি লয় কাজীর সাক্ষাৎ।" নবদ্বীপের গোড়াই কাজী ত মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিল, সুতরাং বৈষ্ণবেরা যে অনেক সময়ে কাজীগণের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষ্ণবেরা সে কথা বলেন নাই। সনাতন মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—"আপনি রামকেলী ছাড়িয়া যাউন, যদিও হুসেন সাহ এখন পর্য্যন্তও আপনার প্রতি বিপক্ষতা করেন নাই, উঁহাকে বিশ্বাস করিবেন না, কখন কি অত্যাচার করিয়া বসিবেন, তাহার ঠিকানা নাই।" গদাধরকে হয়ত গোমাংসাদি জোর করিয়া খাওয়াইয়া থাকিবে, তখন হয়ত মহাপ্রভুর তিরোধান হইয়াছে—কে তাঁহাকে বাঁচাইবে? তদ্রূপ অবস্থায় তিনি সুবুদ্ধি রায়কে রক্ষা করিয়াছিলেন। গদাধর অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিবেন। শুধু গদাধর নহে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আরও দুইজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের উপর অত্যাচারের কথা উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে একজন গৌরীদাস পণ্ডিত, ইঁহার নাম গৌরীদাস সরখেল। ইঁহার ভ্রাতা সূর্য্যদাসের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন, বাড়ী কালনায়। এই গৌরীদাস চৈতন্যের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর ছিলেন। কাটোয়ায় ইঁহারই স্থাপিত চৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি অতি

প্রসিদ্ধ, এই বিগ্রহসম্বন্ধে একটা অলৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এখানে বলিবার দরকার নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"কাজী সনে বাদ করি প্রেমে উন্মাদে, সাতদিন গৌরীদাস ছিলা গঙ্গাহ্রদে।" গৌরীদাস পণ্ডিত কি কারণে কোন্ কাজীর ক্রোধের ভাজন হইয়া গঙ্গার কোন্ নিভৃত কোণে দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্য্যোধনের ন্যায় লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু সেই অরাজকতার সময়ে কাজীদের ক্রোধের খুব গুরুতর কারণ থাকার দরকার ছিল না, অবাধে অত্যাচার চলিয়াছিল; এ সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণী সমভাবে অত্যাচার সহ্য করিতেন। মলুয়া গীতিকায় দেখা যায় এক দিকে কাজী যেরূপ নিরপরাধ চাঁদ বিনোদের উপর মারাত্মক অত্যাচার করিতেছেন, অপর দিকে বিচারের প্রতীক্ষা না করিয়াই দেওয়ান জাহাঙ্গীর কাজীকে শূলে দেওয়ার আদেশ প্রচার করিতেছেন। এই সকল গীতি কাল্পনিক হইলেও অনেক সময়ে উহাদের ভিত্তি সত্যঘটনামূলক হইত। গদাধর দাস এবং গৌরীদাস পণ্ডিত ছাড়া এই অত্যাচারিতদের দলে আর এক জনের কথা জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, পুরুষোত্তম দাসকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিক ভাবে কবি এই ভাবের কতকগুলি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যুগের অরাজকতা প্রমাণ করিতেছে।

নবাবদের খেয়ালের অন্ত ছিল না। চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া কোন্ গৌড়াধিপ নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ তিনি জালালুদ্দিন বা যদুনারায়ণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন রাজা গণেশ যে বাদসাহকে হত্যা করেন সেই দ্বিতীয় সামসুদ্দিনই চণ্ডীদাসের হত্যাকারী।

চণ্ডীদাসের মৃত্যু।

তিনি নিতান্ত অযোগ্য, অত্যাচারী ও বিলাসাসক্ত ছিলেন এবং মাত্র দুইটি বৎসর রাজত্বের পর ১৩৮৪ খৃঃ অব্দে নিহত হন। এই সময়ে বাদসাহদের অন্তঃপুর মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিতা বহু হিন্দু-ললনায় পূর্ণ ছিল। যদুর প্রথমা স্ত্রী নবকিশোরী তাঁহার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন আসমানতারা। কিন্তু তৎকালে কোন বাদসাহেরই এক স্ত্রী ছিল না, তাঁহাদের অনেক বেগম থাকিত। রাধাকৃষ্ণের সঙ্গীত হিন্দু বেগমদেরই বেশী ভাল লাগিবার কথা। যদুর খুব সম্ভব অনেক হিন্দু বেগম ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও চণ্ডীদাসের গুণানুরাগিণী হওয়ার বেশী সম্ভব। অবশ্য সামসুদ্দিনের অন্তঃপুরেও যে সেরূপ হিন্দু বেগম ছিল না—তাহা বলা যায় না। এদিকে এই সকল বাদসাহ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তা-নিবন্ধন ইরান, তুরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্বন্ধত্যাগ এবং স্থায়িভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলায় বাস করিবার ফলে তাঁহারা একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলায় পুস্তক রচনা করাইয়া দরবারে তাহা শুনিতেন। মুসলমান কবিরাও অনেকে রাধাকৃষ্ণের গান এবং পল্লীগীতিকা বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় চণ্ডীদাসের গুণানুরাগিণী মুসলমান কোন রাজ্ঞী হইতে পারেন, কিন্তু অধিক সম্ভব যে রাজ্ঞী কোন হিন্দু-ললনা ছিলেন। হাতীর দ্বারা কোন দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ নাশ করা এই যুগের ইতিহাসে একটি সচরাচর সংঘটিত ব্যাপার।

যাহা হউক, মুসলমান নবাব ও কাজীদের অত্যাচারে যে অনেক বৈষ্ণব বিশেষভাবে নিপীড়িত হইয়া তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রমাণিত হইবে। যে দেশে রাজতক্ত্ ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন লোক অধিকার করিয়াছেন, সে দেশের লোকের ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে, নিরাপদ্ও নহে। প্রশংসা ও অপ্রশংসা উভয়রূপ লেখারই বিপদ্ ছিল। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সামাজিক ইতিহাস অনেক লিখিয়াছেন, ঘটক-কারিকার বংশাবলী এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে বোধ হয় জগতের অন্য কোন দেশে এরূপ বিস্তৃত পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অথচ রাজনৈতিক ইতিহাস কেহ লিখিতে সাহসী হন নাই।

বৌদ্ধ-যুগের অবসানে উচ্চশ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা ব্যবচ্ছেদ-রেখা টানা হইল। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে যে ব্যবধানের অনুশাসন মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রক্ষিপ্ত কিনা—তাহা বিবেচনার যোগ্য। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের সময়ে শাস্ত্রগুলি ফিরিয়া লেখা হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণকে দেবতাদের তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চে আসন দেওয়া হইয়াছিল; এই সময়ে প্রাচীন স্মৃতিকারদিগের উপর অবাধভাবে হাত চালাইয়া ব্রাহ্মণদের গৌরবান্বিত করা হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল সাহেব তাঁহার 'ঠাকুর-ল লেকচারে' ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের নিষেধ-বিধি-সত্ত্বেও প্রতিলোম-বিবাহের এত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং মাঝে মাঝে দুই একটি স্থলে শূদ্রান্নের নিন্দা থাকিলেও ভোজনাদি-ব্যাপারে এত শিথিলতার দৃষ্টান্ত আছে যে, মনে হয়, পরবর্ত্তী কালে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ফিরিয়া, কতকাংশ বাদ দিয়া এবং কতক কথা সংযোগ করিয়া, লেখা হইয়াছিল এবং ব্যাসদেবের উপর একালের নীতি বহুল পরিমাণে আরোপ করা হইয়াছিল; ইহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া অপরাপর শ্রেণী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশের কিছুদিন পূর্ব্বে উপাধি ছিল 'কর'। ধরবংশীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও চট্টগ্রামে আছেন, তাঁহারা উপাধি পরিবর্ত্তন করেন নাই।

নবসৃষ্ট সমাজে শূদ্রশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। আচরণীয় এবং অনাচরণীয়—এই দুই থাক করা হইল। বড় থাক, যথা—নমঃশূদ্র, জেলে-কৈবর্ত্ত, পোদ প্রভৃতি পতিত হইল। দ্বিতীয় থাকে কতকগুলি জাতিকে দয়া করিয়া আচরণীয় বলিয়া স্বীকার করা হইল—ইহাদের নাম হইল নবশাখ—অর্থাৎ নব শাখা। কিন্তু শূদ্রমাত্রেরই উচ্চশ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণের সম্পূর্ণ বশ্যতা পাইবার জন্যই জনসাধারণকে এই ভাবে উচ্চ-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে হিন্দুজাতির সুবৃহৎ অংশ—এই জনসাধারণ—অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া রহিল। ইহাদেরই রক্তসম্বন্ধ গৌরবান্বিত করিয়া এক কালে ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকামাদি

জন্মিয়াছিলেন এই ঋষিদের জন্ম হীন-কুলে। নবব্রাহ্মণ্য এক সহস্র বৎসর যাবৎ বাঙ্গলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে যদি শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিত তবে জন-সাধারণের মধ্য হইতে কত মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব বাড়াইয়া দিতেন! ব্রাহ্মণ্যস্বতন্ত্রতায় আমাদের জাতীয় সম্পদের উপর কত বড় হানা পড়িয়াছে! লোক-সংখ্যাই জাতির প্রধান সম্পত্তি, এই সম্পত্তির সুবৃহৎ অংশের প্রতিভা আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। মূর্খতা-নিবন্ধন অত্যাচার, কুসংস্কার ও উচ্চজাতির নিগ্রহের জন্য ইহারা যে সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হইয়া ভিন্নধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্ষীণকায় হিন্দু জাতিকে আরও সংখ্যালঘিষ্ঠ করিয়া দিতেছে—তজ্জন্য অপরাধী কে? এত প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দাদূ (চর্ম্মকার), কবীর (জোলা, তাঁতি), আসামের শঙ্করদেব (শূদ্র) প্রভৃতি মহাপুরুষ ইহাদের মধ্যে জন্মিয়াছেন,—এই বৃহৎ জনসংখ্যা আজ ফুলফলে পল্লবিত হইয়া উঠিত, নানাদিক্ দিয়া ইহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়া আমাদের আধুনিক শাস্ত্রকারেরা হিন্দু জাতিকে একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন।

গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ এই ভাবে আমাদের সমাজের ক্ষতি করিয়াছেন সত্য—কিন্তু অপর একদিক্ হইতে দেখিলে তাঁহারা তাঁহাদের গণ্ডীর মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্মকে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য দিয়াছেন। বিশাল ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে গোঁড়ামীর গণ্ডীর বাহিরে যে অপূর্ব্ব উদারতা, সৎসাহস, নিষ্ঠা ও প্রেম ছিল তাহার ফলে আমরা চৈতন্যকে পাইয়াছি। এই অনিষ্টকর গোঁড়ামীর অচলায়তন ভাঙ্গিতে যে সকল বিশালবাহু সংস্কারক জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের পুণ্যকর্ম্ম, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার পাবনী ধারায় বঙ্গদেশের অনেক আবর্জ্জনা ভাসিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের মত উপবাস কে করিবে? ব্রাহ্মণের মত ভোগবঞ্চিত কোন্ জাতি? ব্রাহ্মণের মত নিঃস্পৃহ কে? ব্রাহ্মণের মত দারিদ্র্য-দুঃখ বরণ করিবে কোন্ জাতি? এই সকল গুণ থাকার দরুনই তাঁহারা সমাজে শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। জগতের যখন সর্ব্বত্র জড়বাদে তমসাচ্ছন্ন, তখন একমাত্র ব্রাহ্মণই নিবৃত্তির হোমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন—ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ না থাকিলে জড়বাদী জগতে সেই সুরটি নীরব হইয়া যাইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

এইবার আমরা বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস-সম্বন্ধে লিখিব। বাঙ্গলাদেশে পাঠান-প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দু-স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী

কাগজে অঙ্কিত (২'৬" × ২ ফুট) অপূর্ব্ব ছবি। শ্রীযুক্ত বলাইলাল মল্লিক মহাশয়ের কোন পূর্ব্বপুরুষকে তাঁহার গুরুদেব উপহার দিয়াছিলেন। একসময়ে ছবিখানি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধরগণের গৃহে ছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ছবিখানি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের। এখন ছবিখানি দক্ষিণেশ্বরের অদূরবর্ত্তী এঁড়েদহে মল্লিক মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে আছে। পরমহংসদেব এই ছবিখানি দেখিতে প্রায়ই এঁড়েদহে যাইতেন ও করযোড়ে দাঁড়াইয়া অশ্রুচক্ষে ছবিখানি দেখিতেন।

শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে উহা কতকগুলি বীভৎস তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধাধিকারে ধর্ম্ম সঙ্ঘের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পৌরোহিত্যের ভার লওয়ায় নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বিহারগুলি হীন বিলাসের ক্ষেত্র হইয়াছিল। এমন কি বুদ্ধ কে ছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন যেমন হিন্দুরা বেদপন্থী বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন কিন্তু বেদ কি জনসাধারণে তাহার কিছুই বিদিত নহে—বৈদিক আচার কতিপয় ব্রাহ্মণের পুঁথিগত বিদ্যার অঙ্গীয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ কিছুই না বুঝিয়া না শুনিয়া শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে কতকগুলি দুর্ব্বোধ মন্ত্র আওড়াইয়া যায়, দূর্ব্বাদলের গ্রন্থি তৈরী করিয়া করাঙ্গুলীতে পরে এবং হস্তের নানারূপ ভঙ্গিমা করিয়া কখনও গালে কখনও অঙ্গের অন্যান্য স্থান স্পর্শ করিয়া যোগের কসরৎ করে, বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনই কতকগুলি দুর্ব্বোধ এবং বাহ্য অনুষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছিল। শূন্য-পুরাণ ও ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি জনসাধারণের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের কতকগুলি দুর্ব্বোধ ভেল্কি,—বুদ্ধের সরল নীতিমার্গের বিকৃত পরিণতি।

শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি।

ধর্ম্মজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে নৃতত্ত্ববিদের নিকট এই দুই পুস্তকের একটা স্থান হইতে পারে। কোন বিলুপ্ত পশুর কঙ্কাল হইতে পণ্ডিতগণ যুগবিশেষের জীবতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, এই দুই পুস্তকও তদ্রূপ মনুষ্য-সমাজের প্রাচীন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জীর্ণ কঙ্কাল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" কিংবা "সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজের বহুত সম্মান" প্রভৃতি দুই একটি বচন দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে এই পুস্তকগুলির লক্ষ্য ভুবনপাবন বৌদ্ধ ধর্ম্ম। পাঠান-নেতা দ্বারা কাশীরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাঁহার দেহ ও মুখমণ্ডল এরূপভাবে বিকৃত হইয়াছিল যে তাঁহাকে চিনিবার কোনই উপায় ছিল না, শুধু তাঁহার সোণাবাঁধা দাঁত কয়েকটি তাঁহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল; শূন্যপুরাণের বিহারগুলিতেও তেমনই দ্বার-পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে দুই একটি পদমাহাত্ম্য এবং সঙ্ঘের উদ্ভট বিকৃতি "শঙ্খের" উল্লেখে এই পুরাণকে সাবেকী বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, নতুবা বৌদ্ধধর্ম্মের কোন নীতি বা জ্ঞান এই দুইখানি পুস্তকে পাওয়া যায় না। এই দুই পুস্তক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে "ধর্ম্মতলায়" কচ্ছপরূপী ধর্ম্মঠাকুরের খুব জোরে ঢাক পিটিয়া পূজা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির যাহা সার কথা তাহা হিন্দু শাস্ত্র সমস্তই আত্মস্থ করিয়া ঐ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল, জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম্ম শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই উভয়ের প্রতীকস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল তাহা 'নাথধর্ম্ম'—তাহা উদ্ভট রকমের সিদ্ধপুরুষ ও নারীদিগের অলৌকিক লীলা ও আজগুবী গল্পপূর্ণ। এই আকারে বঙ্গদেশের নাথধর্ম্মও জনসাধারণের উন্নতির জন্য কিছু দিয়া যায় নাই। শুধু বুদ্ধের সংযমের ভাবটা গোরক্ষ যোগীর চরিত্রে আভাসে পাওয়া যায় ও ত্যাগের আদর্শটা গীতিকথাগুলির মধ্যে পূর্ণভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই গীতিকথাগুলিই বৌদ্ধযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। মালঞ্চমালার মত একটি

গল্পে যে মহানীতি ও স্বর্গীয় ত্যাগ প্রেম-মহিমায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা বহু ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যাইবার নহে।

কিন্তু মোটের উপর ব্যভিচারী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর এমন কোন গুণই ছিল না, যাহাতে সমাজ আর তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। এদিকে রাজশাসন সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইল, ফলে সংস্কৃতের প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া গেল। বিলাসের দিকে পতনোন্মুখ সেন-রাজারা যে রুচি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল। মুসলমান সম্রাট্ ও বাদসাহেরা আসিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দ্বারাই সংস্কৃত শাস্ত্র অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে সেই ভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে কেরি সাহেব এই যুগের বাঙ্গলায় গদ্য লেখার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাদের অন্তরের বিদ্বেষ ও ঘৃণা চাপিয়া রাখিয়া বাঙ্গলা পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি যে ধর্ম্মঠাকুরের আঙ্গিনা মাড়াইলে পাপ হইত, তাঁহার সম্বন্ধে এক মহাকাব্য ব্রাহ্মণ-কুলজাত মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়া ফেলিলেন। স্বপ্নে তিনি ধর্ম্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "পারিব না"—"জাতি যায় যদি প্রভু ইহা করি গান।" কিন্তু বাস্তবিক স্বপ্নের প্রত্যাদেশবশতঃই হউক অথবা অর্থলোভেই হউক গাঙ্গুলী মহাশয়কে ডোম ও 'যোগী'-পূজিত এই কচ্ছপ দেবতার প্রশংসাসূচক কাব্য রচনা করিতে হইয়াছিল।

মুসলমানগণের সঙ্গে মিলনের ফলে প্রশ্ন।

এদিকে মুসলমান-আগমনে প্রশ্ন উঠিল, এই যে দেবদেবী আমরা পূজা করি, এগুলি কি ভুল? শিব কি ভুল? দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ ইঁহারা কি ভুল? ব্রাহ্মণ-শূদ্র কি ভুল? ডোমের হাতে ভাত খাইলে কি পরকাল নষ্ট হয়? সকলেই কি একখানে বসিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে পারে? ঈশ্বর তো আমাদের নিজের মধ্যেই আছেন তবে আর ডাকিব কাহাকে? (চৈ. ভা.) 'সোঽহম্' বাদ কি ভুল? সত্যই কি ঈশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে—কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষকে সহায়তা করেন? আমরা পাপপুণ্য দ্বারা কি সত্যই শাস্তি ও পুরস্কার অর্জ্জন করি? স্বকর্ম্মের দ্বারা কি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়? সত্যই কি নিজ কর্ম্ম ব্যতীত আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আর কেহ আছেন?

এই সকল প্রশ্ন বেদ-বেদান্তের সময় হইতে এ দেশের পণ্ডিতগণের মাথায় আসিয়াছে। তারপর মহাযান-পন্থী বৌদ্ধগণও এই সকল প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। সহজিয়ারা গুরু-শিষ্য-সংবাদে এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতামত আশ্চর্য্য স্বাধীনতা ও মৌলিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড—ভূমিকা)।

কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের মনে এ সকল প্রশ্ন উদিত হয় নাই। সেন-রাজত্ব-কাল হইতে তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুশাসন একান্ত মূর্খতার সহিত মানিয়া আসিয়াছে; যে যাহা সংস্কৃত অক্ষরে লিখিয়াছে তাহাই বেদ ও ঈশ্বরবাক্য হইয়া গিয়াছে। মাঘে মূলা খাইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে। বাসুকীর মাথা নাড়ায় ভূমিকম্প,

দিক্‌-হস্তীর কাঁধে পৃথিবী, আকাশে চাঁদ বুড়ী চরকা কাটিতেছে, এ সকল মহাসত্য সম্বন্ধে তাঁহারা প্রশ্ন করিতে সাহসী হন নাই। এমন কি যে মহা হিন্দু জ্যোতির্বিগণ আকাশে গ্রহনক্ষত্রের সূক্ষ্মতম গতি এবং বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই হিন্দুর বংশধরেরা—রাহু-রাক্ষস বিষ্ণু-চক্র-দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া চাঁদকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পায়,—এই সকল কথা পরম ভক্তিসহকারে বিশ্বাস করিতেছিল। য়ুরোপে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইলে সে দেশের প্রত্যেক নরনারী সেই সত্য শিখিয়া ফেলে কিন্তু আমাদের দেশে সেন-রাজত্বের সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ্ডী ও সংস্কৃতের ব্যূহভেদ করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক সত্য সমাজের নিম্নস্তরে যাইতে পারে নাই; তাঁহাদের রন্ধনের হাঁড়ির মত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জ্ঞানের ভাণ্ড অন্যের স্পর্শের অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সেন-রাজত্বে ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক বিদ্যাকে স্বীয় শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করা।

কিন্তু এই পাঠান-যুগে সর্ব্বপ্রথম হিন্দু-সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা গরুড় পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট কড়জোড়ে থাকিতে দ্বিধা বোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রচার করিলেন, তাঁহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন, এই অনুবাদকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদ ও শ্রোতাদিগের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন। "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" এদিকে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার, এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নব ভাবে জাগ্রৎ হইল।

জনসাধারণের জাগরণের দুইটি কারণ।

শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা-জগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। এই পাঠান-প্রাধান্যযুগে চিন্তা-জগতে সর্ব্বত্র অভূতপূর্ব্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল। এই স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই। শুষ্ক জ্ঞান-যুগ তখন অবসানপ্রায়, সেই সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার ন্যায় মাধবেন্দ্র পুরীর অভ্যুদয় হইল। তিনি অদ্বৈত প্রভু ও ঈশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রী পর্ব্বতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে।

মাধবেন্দ্র পুরী।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বেই দেশে প্রচারিত ছিল। নারদ, শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব-শিরোমণিগণ ইতিহাসপূর্ব্ব যুগে বিষ্ণু-ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে রামানুজ (জন্ম ১০৭০ খৃঃ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চেঙ্গলাট পরগনায় পেরামবুদরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম

রামানুজ—১০৭০ খৃঃ।

কেশব, মাতার নাম কান্তিমতী দেবী। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। একাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ প্রচার ছাড়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের আরো দুইটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, একটি শঙ্করের মায়াবাদ-নিরসন এবং দ্বিতীয় শৈব ধর্ম্মকে দলন করা। রামানুজের শিষ্য গোবিন্দ শৈব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইয়া নিম্নলিখিত ভাবের শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—

"হে বিষ্ণু! আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পাপ হইতে ত্রাণ কর, আমি বৈকুণ্ঠনাথকে ত্যাগ করিয়া বিষকণ্ঠকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। আমি পুণ্ডরীকাক্ষকে ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষকে ভজনা করিয়াছি। আমি পীতাম্বরকে ছাড়িয়া দিগম্বরের পিছনে পিছনে ঘুরিয়াছি। আমি স্বগায় তুলসী-কানন ত্যাগ করিয়া হরীতকীর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিলাম।"

শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ঝগড়ার রেশটা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র ব্যাসদেবের বৈষ্ণবসাধনা ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম-গ্রহণ উপলক্ষে এই দ্বন্দ্বের আভাস দিয়াছেন—"ব্যাস হরিমন্দির-তিলক কপাল হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন আঁকিলেন, গলা হইতে তুলসীমালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রুদ্রাক্ষমালা পরিলেন। তুলসীপত্র ফেলিয়া দিয়া বিল্বপত্র লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শালগ্রাম টানিয়া ফেলিয়া দিয়া শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিলেন।" (ভারতচন্দ্রের ব্যাসের—শিবনিন্দা, গদ্যানুবাদ)। এখনও বঙ্গদেশে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আছেন।

শ্রীসম্প্রদায় ছাড়া সনক, রুদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবও চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে নানা স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। সনক-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি নিম্বাদিত্য। ইহার নাম ভাস্করাচার্য্য, কথিত আছে সূর্য্যদেব নিম্বগাছের আড়াল হইতে ইহাকে দর্শন দিয়া ইহার প্রায়োপবেশনের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, তদবধি ইহার উপাধি "নিম্বাচার্য্য" হইয়াছিল। এই সনক-সম্প্রদায়ের মতামত-সম্বন্ধে মথুরার ইতিহাসলেখক গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন,—"সনক-সম্প্রদায়ের অনেকে অতি সরল ও সাধুচরিত্র, তাঁহাদের জীবন ও মতামত আলোচনা করিলে ধারণা হয় যে যদিও ইহারা খৃষ্টীয় দীক্ষা পান নাই, তথাপি তাঁহাদের চরিত্রে সেই দীক্ষার ফল ফলিয়াছে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষের দরুন তাঁহারা ঈশ্বরের চক্ষে প্রকৃত খৃষ্টান বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য" (অনুবাদ)। কথিত আছে—আরঙ্গজেব সনক-সম্প্রদায়ের বহু সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রুদ্র-সম্প্রদায়ের বিষ্ণুস্বামী অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার শিষ্য বল্লভাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন একখানি টীকা করিয়া তাহা পুরীতে চৈতন্যদেবকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই টীকা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রতিকূল হওয়াতে চৈতন্য বিরক্ত হইয়া তাহা শুনিতে চান না, বরং মিষ্ট কথায় এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য্য নাছোড়বান্দা হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনার টীকা স্বামি-পরিত্যাগিনী, সুতরাং

সনক-সম্প্রদায়—নিম্বাচার্য্য।

রুদ্রসম্প্রদায়—বিষ্ণুস্বামী, বল্লভাচার্য্য ও চৈতন্য।

ভ্রষ্টা।" চৈতন্য-চরিতামৃতে বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কথিত আছে বল্লভাচার্য্য চৈতন্যের পার্ষচর জগদানন্দ, স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতি পণ্ডিতের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য চৈতন্যদেবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আজ আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। মহাশয়, জগতে আপনার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, কারণ আপনার দর্শন পাওয়া মাত্রই অন্তঃকরণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।" চৈতন্যদেব বলিলেন, "মহাশয়, আমার যে সকল প্রশংসা করিলেন, আমি তাহার একান্তই অযোগ্য। যদি আপনার প্রশংসার কণামাত্রেরও উপর আমার কিঞ্চিৎ দাবী থাকে তবে সেই দাবীর কণিকা-প্রসাদ আমি পাইয়াছি অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; আর পাইয়াছি এই নিত্যানন্দের নিকট যিনি ষড়্‌দর্শনে ব্যুৎপন্ন এবং যাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে নাই; আমার যদি কিঞ্চিৎ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে তবে ইঁহারই স্বর্গীয় অতি পবিত্র সংসর্গের দরুন। ইঁহাদের ছাড়া আমি পণ্ডিত গদাধর, বক্রেশ্বর ও জগদানন্দ প্রভৃতি সুধী মহাজনের নিকট অনেক শিখিয়াছি এবং আরও শিখিব এরূপ আশা করি। যদি আপনি শাস্ত্রালোচনা করিতে চান, তবে ইঁহাদের সহিত করুন।" জগদানন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করার ফলে বল্লভাচার্য্যকে তাঁহার অনেক মত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল (চৈঃ চঃ, অন্ত্য খণ্ড, ৭ম অঃ)। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যের দল এখন আর্য্যাবর্ত্তে বিশেষ পুষ্ট। বৃন্দাবনে ইঁহারা "গোকুল গোঁসাই" নামে পরিচিত। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রি-প্রণীত রামানুজচরিতে ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তাহার কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা জানি না, তবে ইঁহাদের মধ্যে গুরুভক্তি অতীব প্রবল। গুরুকে দেখার অধিকার পাইতে হইলে না কি শিষ্যকে ২৲ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, তাঁহাকে স্পর্শ করার অধিকারের জন্য ২০৲ টাকা, তাঁহার পা ছুঁইতে হইলে ৩৫৲ টাকা, তাহার পদাঘাতের মূল্য ১১৲ টাকা, তাঁহার নিকট বেত্রাঘাত পাইবার অধিকারের জন্য ১৩৲ টাকা এবং তাঁহার সঙ্গে একাসনে বসিতে হইলে ৬০৲ টাকা দিতে হয়। শিষ্যেরা এইভাবে গুরু-প্রণামী স্বেচ্ছায় দেয় কিংবা এ বিষয়ে অপরিহার্য্য নিয়ম আছে, তাহা জানি না। এই সকল কথা শরৎবাবুর পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, কত দূর সত্য বলিতে পারি না।

বল্লভী সম্প্রদায়ের গুরুভক্তি।

কথিত আছে চৈতন্যদেব মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী ইঁহারাই বঙ্গে ভক্তির প্রবাহ প্রথম আনয়ন করেন এবং ইঁহারা মাধ্বী-সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু চৈতন্যদেবের মতামত ঠিক মাধ্বী-সম্প্রদায়ের অনুকূল নহে, তাঁহার ধর্ম্ম কতকটা তাঁহারই নিজের, এজন্য তিনি বার বার তাঁহার শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ দামোদরের নিকট তাড়া খাইতেন। অনেকের মতে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমতের সঙ্গে মাধ্বী-মতের ঐক্য নাই, তথাপি বঙ্গের বৈষ্ণব-জগতের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা তাঁহাকে মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। মাধ্বাচার্য্য ১১৯১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি মধ্যগেহ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র।

মাধ্বাচার্য্য—১১৯১ খৃঃ।

ইহাদের নিবাস দাক্ষিণাত্যে তুলভ পরগনায় উদিপী নগরের নিকটবর্ত্তী তাজিকক্ষেত্র নামক গ্রামে। মাধ্বাচার্য্যের শৈশবে নাম ছিল বাসুদেব, ৯ বৎসর বয়সে ইহাকে অচ্যুতপ্রচ্য নামক এক সন্ন্যাসী শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া আনন্দতীর্থ উপাধি দেন। দাক্ষিণাত্যের অনন্তেশ্বর মন্দিরে ইহার প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা হয়। মাধ্বাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রের টীকা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছাড়া "পুরাণপ্রজ্ঞা-দর্শন" নামক একখানি পুস্তকে তিনি বৈষ্ণব দর্শনের উচ্চাঙ্গের মত প্রচার করেন। মাধ্বাচার্য্য হইতে পঞ্চমস্থানীয় জয়তীর্থ বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। জয়তীর্থ অল্প বয়সে ১২৪৫ খৃঃ অব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার রচিত তত্ত্বপ্রকাশিকা, উপাধিখণ্ডন, ন্যায়দীপিকা, উপাধিখণ্ডন টীকা, তত্ত্বনির্ণয়-টীকা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক মাধ্বীশ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের তালিকায় দৃষ্ট হয়। মাধ্বী সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্য্যের নাম ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাতে মাধ্বাচার্য্য হইতে চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকলের নামই আছে। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের মত দার্শনিক চরিতগ্রন্থেও মাধ্বী সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমন কি কেশব ভারতী কিংবা ঈশ্বর পুরী যে ঐ শ্রেণীভুক্ত তাহাও উল্লিখিত হয় নাই।

বৈষ্ণবদিগের এই বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে ভাবের অনুশীলনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। যদিও প্রাচীন শাস্ত্রে 'রাগানুগা' ভক্তির উল্লেখ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় তথাপি চৈতন্যের পূর্ব্বে এই ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আর কোথাও ছিল না। বহু যুগ ধরিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যের গণ্ডী এড়াইতে পারে নাই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা—এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। চৈতন্য ভগবানের বিভূতির দিকে লক্ষ্য করেন নাই। উপনিষদের "আনন্দস্বরূপ" ভগবান্ই তাঁহার আরাধনীয় ছিলেন। তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে চান নাই, অথচ চৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি সমস্ত চরিত-লেখকই তাঁহার জীবনে ঐশ্বর্য্যের লীলা দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। কেহ তাঁহার ষড়্ভুজ, কেহ তাঁহার বরাহমূর্ত্তি, কেহ তাঁহার দামোদরত্ব পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার জীবনে ঐশ্বরিক বিভূতি আরোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবত তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রমাণ করিবার জন্য কখনও তাঁহাকে কচ্ছপরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কখনও তাঁহাকে বরাহরূপী করিয়া তাঁহার মুখে ভীষণ গর্জ্জন করাইয়াছেন; কখনও বা অতি-শৈশবে তাঁহাকে অনন্তশায়ী নারায়ণ পরিকল্পনা করিয়া এক ভীষণ সর্পের উপর শায়িত করিয়াছেন; কেহ কেহ বা তাঁহাকে রামের অবতার প্রমাণ করিবার জন্য লঙ্কা হইতে অমর বিভীষণকে আনাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ও সংবর্দ্ধনাদি করাইয়াছেন; কেহ বা তাঁহার ভক্ত মুরারি গুপ্তকে হনুমানের অবতার বানাইয়া তাঁহার দেহ হইতে একটি দীর্ঘ লাঙ্গুল বাহির করাইয়াছেন। প্রেমের সম্পূর্ণ জটিলতাশূন্য অনাবিল পবিত্র দেবচরিত্রকে লইয়া গোঁড়া শ্রেণীর চরিতকারগণ বৈষ্ণব-বিভূতির ছাই ভালরূপে মাখাইয়া তাঁহাকে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই বিকৃত রূপ এখনকার দিনে গ্রাহ্য হইবার নহে। শুধু তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের অবতার পরিকল্পনা করিয়াই তাঁহারা

ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ণ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা ভগবানের পার্ষদর হিসাবে নিজেরাও যে সেই ঐশ্বর্য্যের অংশীদার তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য "গৌরগণোদ্দেশ" নামক অসংখ্য পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় তাহার এক রাশ পুস্তিকা বিদ্যমান, তাহাতে চৈতন্যের পার্ষদরের মধ্যে কে কাহার অবতার তাহার একটা পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈত মহাদেবের, হরিদাস ব্রহ্মার, নিত্যানন্দ অনন্তদেবের অবতার তো আছেনই, তাহা ছাড়া কেহ হনুমানের, কেহ অঙ্গদের, কেহ রাধিকার সখী বিশাখা, ললিতা, বা মধুমতীর অবতার এইরূপ পরিকল্পিত হইয়াছেন। এই গৌরগণোদ্দেশের এতগুলি পুঁথি পাওয়া যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় প্রত্যেক বৈষ্ণব বালককে ইহা মুখস্থ করিতে হইত। বৈষ্ণব গুরুগণ এইভাবে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের দেবতা বা দেবতাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শিষ্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গুরুতর স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রব থাকায় এই সকল পুস্তকের কোন একটা পঙ্‌ক্তির সত্যতাসম্বন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তবে সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজে যে ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহাতে সমালোচক দগ্ধ হইয়া যাইবার পথে দাঁড়ান। যখন গোবিন্দ দাসের করচার আমি একটা সংস্করণ প্রকাশ করি, তখন এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব গোস্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতের অলৌকিক অংশ গ্রহণ করুন, আমরা তাহা হইলে গোবিন্দদাসের করচার প্রতিকূলতা করিতে বিরত হইব।" চৈতন্যের এই সকল চরিত-কথা নানা দিক্ দিয়া অতি মূল্যবান্। ইহারা চৈতন্যেতিহাসের প্রধান অবলম্বন, বিদ্যাবত্তা, সাধুতা ও সহিষ্ণুতা, শ্রম ও জীবনব্যাপী তপস্যার ফলস্বরূপ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু কোথায় বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের গরুর রাখাল, কিংবা মধু-মুর-নরক-বিনাশী কালীয়, বক, পুতনা, তৃণাবর্ত্ত, কংস প্রভৃতি দানবধ্বংসকারী মহাবীর আর কোথায় নবদ্বীপের টোলের শাস্ত্রাযোদী শেষে ভক্তিপ্রেমের অবতার নিরীহ টুলো তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক—ইহাদিগকে এক পঙ্‌ক্তিতে আনিয়া এক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৃন্দাবন দাস এতদর্থে না করিয়াছেন এমন কার্য্য নাই। টোলে বসিয়া চৈতন্য শিষ্যদিগকে পড়াইতেছেন ইহার বর্ণনা উপলক্ষে বদরিকাশ্রমে কিংবা নৈমিষারণ্যে কৃষ্ণ ঋষিদিগকে উপদেশ দিতেছেন—সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিয়াছেন কৃষ্ণ গর্গমুনির নিবেদিত অন্ন খাইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন এখানেও অতিথি ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন শিশু-চৈতন্য খাইয়া লুকাইয়া পড়িতেছেন। পাঁচ বৎসরের শিশু চৈতন্য গঙ্গার তীরে ক্রীড়া-লীলা, অতি শিশু মেয়েদের সঙ্গে খেলা ও কলহ করিতেছেন, এখানেও বৃন্দাবন দাস "পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। তেমনই দেখিয়ে তোমার পুত্রের ব্যবহার" লিখিয়া কৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, চৈতন্যের বাল্যকালের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনি মুনির সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। এই সকল চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি চৈতন্য-ভাগবতে দৃষ্ট হয় যে, চৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার তাহা বৃন্দাবন দাস যেমন প্রমাণ করিয়াছেন এমন আর কেহ পারেন নাই—এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পরম পরিতোষসহকারে বৃন্দাবনের

চৈতন্য-ভাগবতাদি পুস্তকে চৈতন্যকে কৃষ্ণ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা।

গোস্বামীরা চৈতন্যমঙ্গল নাম কাটিয়া ঐ পুস্তকের চৈতন্য-ভাগবত নাম দিয়াছিলেন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্য-ভাগবতের চৈতন্যলীলা একই বস্তু, ইহাই দেখাইবার জন্য এই নাম।

অথচ যে ব্যক্তিকে লইয়া এই দেবব্যূহ পরিকল্পিত হইয়াছিল তিনি দীনের দীন ছিলেন, কেহ তাঁহার পা ছুঁইতে গেলে তিনি বিরক্ত হইতেন। পুরীতে পাছে কেহ তাঁহার পাদোদক পান করে এই ভয়ে তিনি একটি বৃক্ষের তলে অতি সঙ্গোপনে স্নানের একটা যায়গা করিয়া লইয়াছিলেন। একবার 'কৃষ্ণজয়' স্থানে 'চৈতন্যজয়' বলিয়া কোন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহারই নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে তাহা থামাইয়া দিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী-প্রত্যাগমনের পর বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সার্ব্বভৌমকে এজন্য গঞ্জনা করিয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যাইবে।

চৈতন্যের বিনয়।

সুতরাং এখন এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন ক্ষুদ্র গোঁড়া বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য-জীবনীগুলির ঐতিহাসিকতা আলোচনা করিয়া গ্রহণ ও বর্জ্জননীতি অবলম্বন করিতে হইবে। গোঁসাইদের ভ্রূকুটির ভয় করিলে চলিবে না। এই ভাবে সত্যের ভিত্তির উপর চৈতন্যচরিত দাঁড় করাইলে তাহার স্বরূপ দেখিবার ও দেখাইবার সুবিধা হইবে। নিজের বাড়ীটি লোকের প্রিয় হইলেও তথাকার আবর্জ্জনা কোন্‌গুলি তাহা দেখাইলে গৃহের মহিমা বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। এখন উহারা চৈতন্যগণ্ডীর বাহিরে কতকটা অবিশ্বাস্য হইয়া আছে। উপযুক্ত ভূমিকায় ঐতিহাসিক কারণ দেখাইয়া সেই আবর্জ্জনা কিভাবে আসিল তাহা বুঝাইয়া দিলে পুস্তকগুলির দর কমিবে না, বরঞ্চ ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে। মধ্য-যুগের জগতের সর্ব্বত্রই সাধু পুরুষদের চরিতাখ্যানগুলি এইরূপ অলৌকিক গল্পময়, অথচ তাহারা সর্ব্বত্র সম্মান পাইতেছে। তাহার কারণ এই যে সেই পুস্তকগুলির গুণাগুণ বিচারের দিগ্‌দর্শনীর আলোতে দেখান হইতেছে না। বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাসে উদ্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায় মাত্র। ভক্তদের নিজ ভক্তি অতি দুর্লভ সামগ্রী, কিন্তু ঐতিহাসিকদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে।

চৈতন্যদেব ভারতীয় ধর্ম্মের কি উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমাদের বিবেচ্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রধানতঃ ভাবমূলক। চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যও তাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উহার নাম দিয়াছেন "মহাভাব", এই মহাভাবই এদেশের বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ এবং চৈতন্যদেব 'মহাভাবের' জীবন্ত প্রতীক।

"মহাভাব"।

এই ভাব কি?—মহাভাব তো দূরের কথা—অপর দেশের লোকেরা এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমি চৈতন্যদেবকে বুদ্ধ হইতে কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বলাতে ডাঃ সিল্‌ভান লেভি মহাশয় আমাকে অনুযোগ দিয়াছিলেন (মৎকৃত Chaitanya and

his age" পুস্তকের Dr. Sylvan Levia ভূমিকা)। ভগবানের অস্তিত্ব খৃষ্টান প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও বিশ্বাস করেন। যদি তাঁহার সত্তা স্বীকৃত হয়, তবে তাঁহাকে ভালবাসা যায়—এ কথাটা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অনেক দেশের সাধু ও মহাজনেরা ভগবানের প্রত্যাদেশের কথা বিশ্বাস করেন, কারণ জগতের বড় বড় ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনেকগুলিই এই প্রত্যাদেশের উপর স্থাপিত। যাঁহার প্রত্যাদেশ শোনা যায়, তাঁহার রূপদর্শন কেনই বা অসম্ভব হইবে? একমাত্র চৈতন্যদেব তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার রূপদর্শন সম্ভবপর। ঋষিরা কখনও কখনও তাঁহাকে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত আভাসে মাত্র দেখিয়া থাকেন; যে মুহূর্ত্তে সেই আভাসে দর্শন লাভ হয় সেই মুহূর্ত্তে ধ্যানীর ধ্যানের সার্থকতা। শুক, প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের ভগবদ্দর্শন এত উপগল্পে জড়িত যে তাহা ঐতিহাসিক যুগের প্রামাণিক কথা বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। কিন্তু জীবনে এই দর্শনটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এবং ইহার ফল তাঁহার জীবনব্যাপী হইয়াছিল। গয়ায় যাইয়া তিনি কিছু দেখিয়াছিলেন; কি দেখিয়াছিলেন, তাহা অনেকবার বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। সেই অবধি "অবাঙ্মানসগোচরে"র কথা বলিতে যাইয়া তিনি একবার গদাধর আর একবার শ্রীমান্ পণ্ডিতের কাঁধে ঢলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বত্র তাঁহার রূপ করে ঝলমল। সে দেখিতে পারে যার আঁখি নিরমল।" (গোবিন্দদাসের করচা)। তিনি কি দেখিয়াছেন বলিতে পারেন নাই, বলিতে গেলে আনন্দাধিক্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহাই দেখুন না কেন, তাহার ফলসম্বন্ধে দ্বিধার কোন কারণ নাই। এই দেখার ফলে তিনি কৃষ্ণকেলী ধুতি ছাড়িলেন; আমলকী দিয়া যে দীর্ঘ বক্রান্ত সুকেশ মার্জ্জনাপূর্ব্বক ফুলমালায় জড়াইয়া রাখিতেন, সে কেশসজ্জা দূর হইল; পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমিশয্যা লইয়াছিলেন, তাঁহার যে শরীর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী দ্বারা সুবাসিত হইত, তাহা ধূলায় ধূসর হইল। সে কণ্ঠে আর সুবর্ণ মাদুলী স্থান পাইল না, এমন কি তিনি সন্ধ্যা, আহ্নিক, শালগ্রাম-সেবা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সকলই ছাড়িয়া দিলেন। কোন শব্দ শুনিলে 'কে এল, কে এল' বলিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেন, চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা; একবার ঘরে আর একবার বাহিরে যাতায়াত করেন—"পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পন্থ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলহ একান্ত।" মাথার চুল আলুলায়িত, শ্লথ বসনে শচী দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন, কিন্তু মাতার দিকে আর তাঁহার দৃষ্টি নাই। "না করে স্নান গোরা না করে ভোজন, না করে শ্রী অঙ্গে বেশ তৈল উদ্বর্ত্তন।" যিনি জীবন-মরণের সখা, জীবের অনন্তশরণ, যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকা-প্রসাদ পাইয়া জগৎ সুন্দর—তাঁহার প্রথম রূপদর্শনে চৈতন্যদেবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাব ক্ষণিক নহে—ইহা তাঁহার জীবনব্যাপী ছিল। চণ্ডীদাস চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে তাঁহার আগমনী গাহিয়াছিলেন—শ্রেষ্ঠ কবিদের চিত্ত মুকুর-স্বরূপ, তাহাতে আগন্তুক দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়। এ সকল কি গূঢ় আধ্যাত্মিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে, তাহা কে বলিবে? তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখি না কেন?

রূপদর্শন।

সে কথা পরে হইবে—কিন্তু এই যে তিনি রূপ দেখিয়াছিলেন, সে দেখাটা ত ঠিক,—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ সেই দর্শনের ফলে তাঁহার জীবনের রূপ উল্টাইয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের রাধার মত "বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা"—ভাব তাঁহার হইয়াছিল; তিনিও মেঘের মধ্যে সেই লুকানো রূপ দেখিয়া ধ্যানীর মত নিশ্চল চক্ষে উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া থাকিতেন, "সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।"

তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আর কেহ দেখে না কেন? আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলির অতীত সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় আছে—এ সম্বন্ধে আমি কোন জটিল দার্শনিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। গবাদি পশুকে ফুলবনে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়—সৌন্দর্য্য দেখিবার যে চক্ষু, যাহা মানুষের আছে—তাহা তাহাদের নাই। যাহা আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া পরম তৃপ্তি উপভোগ করি, তাহারা সেইগুলি তখনই খাইয়া ফেলে। ক্ষুধার তাড়নায় সৌন্দর্য্যদর্শনাক্ষম চক্ষুর উপর তাহাদের একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে—তাহাদের সেই দৃষ্টি ফোটে নাই। আমরাও বহিরিন্দ্রিয়তাড়নায় আসক্তিবশতঃ জগতের সূক্ষ্ম তত্বগুলি অনুভব করিবার শক্তি তেমনই হারাইয়াছি, কিংবা আমাদের সেই স্বর্গীয় দৃষ্টির এখনও উন্মেষ হয় নাই।

রূপদর্শনের ফল পূর্ব্বরাগ—জগতে সৌন্দর্য্যের জন্য মানুষ পাগল, এই উন্মত্ততার মত সুখকর আর কিছু নাই, এই রূপদর্শনজাত অনুরাগের ভিত্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য দাঁড়াইয়া। নায়ক-নায়িকার প্রেম শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান। প্রত্যেকে যদি অকপটে তাঁহার মনের কথা বলেন তবে অবশ্যই স্বীকার করিবেন—জীবনে প্রথম যে ভালবাসা আস্বাদন করিয়াছিলেন, অনাবিল স্বার্থশূন্য ত্যাগ-পূর্ণ হৃদয়ের আবেগে প্রথম যে ভালবাসা হইয়াছিল, তদপেক্ষা বড় সুখ তিনি পান নাই।

যদি ঈশ্বরসৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানুষ এরূপ অপূর্ব্ব সুখের আস্বাদন পায়, তবে যিনি সৌন্দর্য্যের শেখর, আত্মার একমাত্র কাম্য,—রূপের উৎস, তাঁহাকে দেখা যদি সম্ভবপর হয় তবে মানুষের মনের অবস্থা কি হইতে পারে, চৈতন্যের জীবন তাহাই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে। আর কোন সাধু মহাজন জগতে তাহা পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। স্ত্রী, পুত্র, প্রণয়ী, প্রণয়িনীর জন্য যেরূপ কেহ কাঁদিয়া মরে, পাগল হয়, কাব্য লেখে, গান গায়, কত কি করে, চৈতন্য ভগবানের জন্য তদপেক্ষা শতগুণ উন্মাদনা দেখাইয়াছেন। ভগবানের প্রেম যে সত্য বস্তু, তাহা কাল্পনিক নহে, তাহা মানুষ লাভ করিতে পারে, তাহা চৈতন্য যেরূপ দেখিয়াছেন অপর কেহ তেমন পারে নাই।

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে কোন বড়লোকের বাড়ীতে যাইয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসা কত কঠিন, আর যিনি রাজাধিরাজ তাঁহার দর্শন লাভ কি সহজ? কত যুগের তপস্যা থাকিলে তবে এই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে!

ভারতবর্ষ এই তপস্যার মধ্য দিয়া যুগ-যুগান্তর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছিল। যিশুর শিক্ষা মনুষ্যের সঙ্গে সৌভ্রাত্র-স্থাপন—"তুমি মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া আইস কাহারও সঙ্গে তোমার কলহ আছে কিনা, যদি থাকে, তবে মিটাইয়া এস—নতুবা তোমার নৈবেদ্য গৃহীত হইবে না। যে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, তাহার নিকট পুনরায় যাও প্রস্তুত হইতে; যে তোমাকে এক ক্রোশ বেগার খাটাইয়াছে, তাহার দুই ক্রোশের বেগার খাটিয়া আইস; যে তোমার জামা লইয়াছে, তাহাকে তোমার কাপড়খানিও দিয়া আইস।"—এই ক্ষমাশীল ভ্রাতৃভাব যিশু শিখাইয়াছিলেন, তোমার মনে কলুষলেশ থাকিলে তুমি রাজার দ্বারে ঢুকিতে পারিবে না। তীর্থঙ্করগণ ও বুদ্ধ জীবে দয়া শিখাইয়াছিলেন। শুধু মানুষ নহে একটি সামান্ত পশু ও পাখীর জন্ত প্রাণ দিয়া ঐ সার্ব্বজনীন প্রেম দেওয়ার শিক্ষা তাঁহারা দিয়াছিলেন। গল্পে কথিত আছে, এক জন্মে বুদ্ধ একটি ব্যাঘ্রীর জীবনরক্ষার জন্ত নিজ প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই জাতকটির কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

যখন এইভাবে মানুষের সঙ্গে এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে সৌভ্রাত্র ও দয়ার সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইল—তখন ভগবৎপ্রেমলাভের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। বহু যুগ যাবৎ ভারতবর্ষ হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া পুনরায় তাহা নির্ব্বাণ করিয়া অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, চৈতন্তদেবই সেই সিদ্ধি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম।

অপরাপর সাধুদের জীবনে তপস্যা আছে—কিন্তু চৈতন্ত সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধি, অতি সহজ, বাল্মীকির কাব্য, চণ্ডীদাসের গান, রবীন্দ্রের গীতাবলী যেমন সহজ—ইহা তেমনই সহজ। শ্রমজাত একটি বিন্দুও তাহার নাই, ধর্ম্মজগতের সম্যক্‌ বিকশিত পদ্ম, ইহা সৃষ্টি করিতে যে জাতীয় কত যুগের তপস্যার দরকার হইয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। তিনি খুব কমই উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কঠিন পন্থা দেখান নাই—তাঁহাকে দেখা মাত্র লোকে ভুলিয়াছে। কোন সুন্দরীকে দেখিলে যেরূপ নায়ক ভুলিয়া যায়—তাঁহার মুখে প্রেমের বক্তৃতা না শুনিয়াও সে তাঁহাকে পাগলের মত ভালবাসিয়া ফেলে, চৈতন্তকে লোকেরা তেমনই সহজে ভালবাসিয়াছিল, কারণ তিনি যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপের ছাপ তাঁহার মুখে আঁকা ছিল—তাঁহার সে অপূর্ব্ব রূপ যাহার উদ্দেশে শত শত কবি গানের উৎস বহাইয়াছেন, শত শত বীণাবাদক বীণার সুরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া দিয়াছেন, সেই রূপ তিনি ভগবদ্রূপ-দর্শনের ফলে পাইয়াছিলেন, রাজার মোহরাঙ্কিত সে রূপ-আকর্ষণ কে এড়াইবে? চণ্ডীদাসের রাধিকার মুখে এই তত্ত্বটি একটি ছত্রে লিখিত হইয়াছে—"তোমার গরবে, গরবিণী হাম—রূপসী তোমার রূপে।"

তাঁহার ধর্ম্মের পঞ্চ শাখা—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ছাড়া আর কাহারও শাস্ত্রে নাই, রাম রায় তাহা চৈতন্তের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

প্রথম শান্তভাব—বুদ্ধদেব যাহার উপর জোর দিয়াছেন, সমস্ত কামনা দূর করিতে

হইবে। এই কামনা নির্ব্বাপিত করা দরকার—তাহা না হইলে অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তির উপায় নাই। বুদ্ধদেব ছন্দককে বলিয়াছিলেন—"আমাকে অগ্নি-শলাকা-দ্বারা দগ্ধ কর—অতল জলে নিমজ্জিত কর,—কিছুতেই আমি দুঃখের সংসারে প্রবেশ করিব না।" এই জগতের ত্রিবিধ তাপে যখন মানুষ আর্ত্ত হইয়া 'ত্রাহি, ত্রাহি' রব করিতে থাকে, তখন তাহা হইতে পলাইয়া সে অরণ্য আশ্রয় করে, বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ এইভাবে বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধ অমৃতের সন্ধানে বনবাসী হন নাই—তিনি দুঃখ হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার উপায়ের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। জপের দ্বারা শান্তভাব পাওয়া যায়। যিনি জপের পথে প্রথম ব্রতী, তিনি বুঝিবেন এ পথ কত কষ্টকর। ভগবানের নামই হউক, রূপই হউক বা বৌদ্ধযুগের মহাযান-সম্প্রদায়ের মতানুসারে শূন্য বা মহাশূন্যই হউক, একটা কেন্দ্র মনে আবদ্ধ করিয়া জপ শুরু করিলে দেখা যায় পৃথিবী সাধনার পথের পথিককে কিরূপ শত বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। জপের সময়ে পুনঃ পুনঃ সাংসারিক বিষয়ে মন প্রধাবিত হইবে। যাহা প্রথমতঃ অতি সহজ মনে হইয়াছিল, জপের ব্রতী দেখিবেন তাহা কত কঠিন, পদ্মপত্রে জলের মতন মন টলটলায়মান, কিছুতেই তাহাকে কেন্দ্রে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু কয়েক বৎসরের দৃঢ়সঙ্কল্পিত অমোঘ চেষ্টার ফলে মনকে বশীভূত করা যায়। তখন সংসারের যত বিপদই আসুক না কেন, মনকে তাহাদের ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া সেই কেন্দ্রটিতে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। জপে যখন এইভাবে মনে শান্তি আইসে তখন বুঝিতে হইবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে—উহাতে আগাছা বা আবর্জ্জনা নাই। তখনকার প্রশ্ন—আমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখন ভগবানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধের বীজ বপন করিতে হইবে।

শ্রাবণকক।

শান্তভাব।

প্রথম সম্বন্ধ তুমি প্রভু—আমি দাস। তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার কর্ত্তব্য। এই স্থানে নীতিবাদ শুরু হইল। দাস্যভাবটা নৈতিক রাজ্য। কি ভাল কি মন্দ মনের মধ্যে বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। দাস্যভাবের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ড জড়িত। সর্ব্বদা কর্ম্ম করা—ভগবানের নিয়ম বুঝিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা—ইহাই দাস্যের লক্ষণ। অধুনা য়ুরোপ-প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্ম্ম—এই দাস্য,—নীতিজ্ঞান ইহার ভিত্তি।

দাস্য।

কিন্তু কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। নীতিজ্ঞান নীরস ও শুষ্ক। তাহাতে ভগবানের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ নাই। সারাজীবন বিবেক-সম্মতভাবে অহোরাত্র কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মী দেখিলেন, কি পাপ কি পুণ্য তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এক শ্রেণীর জীবের ধ্বংসের উপর অন্য শ্রেণীর আহার চলিতেছে, যাহা কিছু শুভ, আলোর পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ অশুভ আছে। জগতের একদিকে হিতসাধন করিলে, অন্যদিক্ আহত হয়। পাপ-পুণ্যের কথা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তখন

সখ্য।

ভক্ত ক্রমে ক্রমে নীতির সীমার ঊর্দ্ধে লীলার জগৎ পাইয়া রসের সন্ধান পাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমার এই খেলায় আমাকে টানিয়া লও। এই স্থানে সখ্য। দাস্যের মধ্যে শান্তভাব আছে—কারণ প্রথমতঃ মন স্থির করা দরকার—মন স্থির না করিলে ভগবানের প্রত্যাদেশ শোনা যাইবে না। ঘোলা জলে সূর্য্যকিরণ বিম্বিত হয় না। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অনাসক্ত মন প্রস্তুত হইলে তাহাতে কি প্রেয়ঃ কি শ্রেয়ঃ, তাঁহার কি আদেশ তাহা বুঝা যায়। আর সখ্যের মধ্যে শান্ত ত আছেই, দাস্যও আছে—সখ্য দাস্য হইতে আর একটু অগ্রসর। জগৎ লীলাময়ের লীলা, আমি তাঁহার সঙ্গী, সহচর ও খেলার সাথী। যাহা কিছু করি সর্ব্বদা তিনি আছেন, আমি তাঁহারই সঙ্গে আছি, আমি তাঁহাকে ছাড়া কিছু জানি না। বিপদে পড়িলে বক, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দানবের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরি, তিনি আমাকে রক্ষা করেন। এই সখ্যের মধ্যে দাস্যভাব আছে, কৃষ্ণ-সখারা দিনরাত্র তাঁহার সেবা করিতেছে, তাঁহার জন্য ফল কুড়াইতেছে; যে ফলটি মিষ্ট লাগিল তাহা তাঁহার মুখে আনিয়া দিল, তাঁহাকে কাঁধে করিল, তাঁহার কাঁধে চড়িল; এখানে উচ্ছিষ্টজ্ঞান নাই, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ নাই, তথাপি রাখালেরা কৃষ্ণকে বলিতেছে—"বিনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি।" এখানে ভক্ত কৃষ্ণের বাহির আঙ্গিনা ছাড়িয়া—দাস্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—তাঁহার গৃহের ভিতরে ক্রীড়াক্ষেত্রে ঢুকিয়াছে। এখানে কর্ত্তব্যজ্ঞান, নৈতিক বিচার নাই, এত ঘণ্টা খাটিতে হইবে, এত ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে হইবে, ঘড়ি ধরিয়া কর্ত্তব্যের সেরূপ কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা নাই। বৃন্দাবনে সখাদের নিত্যলীলা চলিতেছে। সখ্য হইতে ভগবানের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ—আনন্দের সম্বন্ধ।

বাৎসল্য।

তদূর্দ্ধে আনন্দ ঘনীভূত হইয়াছে। প্রত্যেক নবসৃষ্ট জীবের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। নতুবা কালো কুৎসিত ছেলেটা তাহার মায়ের কাছে রূপের ডালি বলিয়া বোধ হইত না। রাত্রি জাগিয়া দীপ উস্কাইয়া মাতা ছেলের অধরপ্রান্তে হাসিটুকু ফুটিতে দেখেন এবং আনন্দে আত্মহারা হন। প্রত্যেক জননীকে ভগবান্ শিশুরূপে দেখা দেন। নতুবা কুৎসিত ছেলেটার মধ্যে তিনি অনন্তরূপ আবিষ্কার করিবেন কিরূপে? প্রত্যেক মায়ের ধারণা তাঁহার ছেলের মত এমন সুন্দর কেহ হাত-পা নাড়িতে জানে না, এমন সুন্দর আধ-আধ বুলি কেহ বলিতে পারে না। এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য কালো ছেলেটার মধ্যে প্রকাশ পায় কিরূপে? বাৎসল্যের মধ্যে শান্তভাব আছে, দাস্য আছে—কারণ মাতার মত অক্লান্ত কর্ম্মী দাসী আর কে আছে? এখানে দাস্য কর্ত্তব্য-জ্ঞানমূলক নহে, এ দাস্য অনুরাগের। এখানে কর্ম্ম কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। সেই অসীম অনন্ত রূপের উৎস ক্ষুদ্র শিশুটিকে অবলম্বন করিয়া মাতৃবক্ষে ধরা দিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ, অযাচিত, অজস্র করুণা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ করে। বাৎসল্যে সখ্য আছে, সমানে সমানে না হইলে সখ্য হয় না। মাতা শিশুর সঙ্গে যখন খেলা করেন, তখন শিশুর সঙ্গে শিশু হইয়া যান।

প্রচলিত ভাষায় তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন না, এজন্ত ছেলে-ভুলানো ছড়ার মত অর্থহীন কাকলীর সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার সঙ্গে কথা বলেন। একদা রোমের সিনেট-সভাপতির নিকট বিদেশী এক রাজদূত আসিয়াছিলেন, ভুলক্রমে তিনি তাঁহার একটা গোপন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রোমের এত বড় সভাপতি ঘোটক সাজিয়াছেন ও তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার পিঠে চাপিয়া তাঁহাকে চাবুক মারিয়া চালাইতেছে। সভাপতি মাঝে মাঝে চিঁহিঁ রব করিতেছেন। বস্তুতঃ বাৎসল্যে শান্ত, দাস্ত ও সখ্য আছে—তার উপর আরো কিছু আছে। অত তন্ময় হইয়া কি সখা অনুরাগী হইতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদাম তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ঘুমাইলেও স্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করিতেন—শ্রীদাম বলিতেছে—"আমরা মায়ের কোলে ঘুমায়া থাকি। স্বপনে তোর চাঁদ মুখখানি দেখি।" সুতরাং সখ্য বড় কি বাৎসল্য বড় তাহা লইয়া তর্ক আছে। সখার নিকট যাহা বলা যায়, তাহা মায়ের নিকট বলা যায় না। শিশু একটু বড় হইলেই মাতৃস্নেহ তাহাকে সম্যক্ রূপে ধরিতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না, পেটের ক্ষুধা হইতে হৃদয়ের ক্ষুধা বড়, মাতা তাহা বুঝিতে পারেন না। এই হিসাবে সখ্য বড় হইতে পারে, যেহেতু সখার নিকট মনের সকল কথা ব্যক্ত করা চলে। শ্রীকৃষ্ণের সুবল-সখার নিকট তিনি মনের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেন। সুতরাং সখ্য হইতে যে বাৎসল্য বড় এ কথা শ্রীকৃষ্ণ-সখারা স্বীকার করিতেন না—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন "কি করিব ওরে সুবল, করিব আমি কি? চূড়া বাঁধি ধড়া পরি ব'সে রয়েছি। মায়ে না বলিয়া আমি যাই রে গোঠে, মরিবে আমার মা, পড়িব সঙ্কটে॥ একদিন নবনীত খেয়ে ছিলেম লুকাইয়া। মরিতে গেছিলেন মা, আমায় না দেখিয়া॥" উত্তরে সুবল বলিতেছে, "জানি যে তোর মায়ের প্রেম—কত ভালবাসে। সামান্ত ননীর তরে বেঁধেছিল গাছে॥ যমল অর্জ্জুন যেদিন পড়েছিল গায়। সেদিন তোর মা নন্দরাণী আছিলা কোথায়?"

যে পুত্র মরিয়া যায়, সন্তান-শোকে বিধুরা মাতা অপর একটিকে ক্রোড়ে পাইয়া তাহাকে ভুলিয়া যান। কিন্তু মাধুর্য্য, একনিষ্ঠ প্রেম,—ইহা আনন্দের নিত্য প্রস্রবণ, কৃষ্ণ কাছে থাকুন বা না থাকুন—রাধার মন সর্ব্বদা কৃষ্ণময়—"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি সদা ছলছল আঁখি। পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।" (চণ্ডীদাস) প্রতি পত্রমর্ম্মরে কৃষ্ণ-পদধ্বনি, প্রতি বায়ুহিল্লোলে বাঁশীর তান, রাধিকার আর কোন জ্ঞান নাই। চোখে কৃষ্ণরূপের অঞ্জন, কর্ণে অমৃতময় বেণু-শ্রবণ; এই প্রেম রাগানুরাগা। ইন্দ্রিয় তখন অন্তর্মুখী, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে তাড়াইয়া অন্তদিকে চালাইতে চাহিলে তাহারা বাগ মানে না। রাধিকা বলিতেছেন—"যত নিবারিয়ে তায়, নিবার না যায়, আন পথে ধাই, তবু কানুপথে ধায়"—মনকে যত নিবারণ করিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি না, আমি অন্ত পথে যাইতে চাই, কিন্তু পদ আমার অতর্কিতে কানুর পথেই চলিয়া যায়। "এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম। যার নাম নাহি লব, লয় তার

নাম। এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ। তবু তো দারুন নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥ সে কথা না শুনিব করি অনুমান। পরসঙ্গে শুনিয়ে আপনি যায় কাণ॥ ধিক্ রহু আমার ইন্দ্রিয় আদি সব। সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥" কখনও কখনও রাধা সেই বিশ্বসুন্দর পরম দেবতার আদরের কথা বলিতে যাইয়া আত্মহারা হইতেছেন :— "এ কথা কহিবে সই—এ কথা কহিবে। অবলা এমন তপ করিয়াছে কবে॥ পুরুষ পরশমণি নন্দের কুমার। কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥" তিনি ত স্পর্শমণিতুল্য, তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই সোণা হইয়া যায়—তবে, আমার নিকট কি ধন চান যে আমার পা ধরিয়া বসিয়া থাকেন? "আমি যাই যাই যাই—বলে তিন বোল। কত না চুম্বন দেয়, কত দেহি কোল॥" যাইতে চাহিয়াও যাইতে পা উঠে না। চিবুক ধরিয়া "আমি যাই, যাই, যাই" বলিয়া বারংবার সজলচোখে বিদায় গ্রহণ করেন। কত চুম্বন ও নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় লওয়ার পালার পরিসমাপ্তি। কিন্তু এত করিয়াও পালা শেষ হয় না। "পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া। বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥ করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে। পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥" এক পা যাইয়া আবার ফিরিয়া কত কাতরভাবে আমার মুখখানি দেখেন, এবং আমার হাতে নিজ হাত দিয়া বলেন, "আমার শপথ, আবার যেন দেখা পাই।" পুনরায় দর্শনের জন্য কত মিষ্ট কথা বলেন, কত খোসামুদি করেন। এহেন কৃষ্ণের প্রসঙ্গ যেখানে হয়, সেখানেই তিনি পুলকে আত্মহারা হইয়া যান—"দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে,—পুলকে পুরয় তনু শ্যাম পরসঙ্গে।" কৃষ্ণের প্রসঙ্গে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরের সেই আনন্দ ঢাকিতে গেলে "পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার। নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥" সে কথা শুনিলেই চক্ষে পুলকাশ্রু দেখা দেয়। যাহা কিছু করি, যত দূরেই যাই না কেন—তাঁহার মুখের হাসিটি মনে জাগে, তখন সর্ব্বজ্বালার অবসান হয়। "যথা তথা যাই আমি—যত দুর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই॥"

আমরা এই রাগানুগ প্রেমের কথা পুনরায় উত্থাপন করিব। বুদ্ধদেব মানুষের সঙ্গে—সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে একমাত্র করুণার সম্বন্ধ রাখিয়া অপর সমস্ত সম্পর্ক বাদ দিয়াছিলেন।

দুঃখবাদ ও আনন্দ।

তাঁহার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র, একক—তিনি জীবের সঙ্গে যে পারিবারিক বন্ধন তাহা অস্বীকার করিয়া সমস্ত কামনার ঊর্দ্ধে আসন লইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মমতের ভিত্তি দুঃখবাদ। কিন্তু মহাপ্রভু মানুষের সমস্তগুলি সম্বন্ধ গরীয়ান্ করিয়া উহা আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধের প্রতীক স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধগুলির দ্বারা আমরা পরিবারে আবদ্ধ—ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে ভগবদারাধনার উপাদান আছে। দারা, পুত্র, পরিবার মিথ্যা নহে—ইহাদের পশ্চাৎ সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন,—যিনি বেদান্তের কথায় বলিতে গেলে "আমাদের পিতা, ধাতা ও পিতামহ।" এই সম্বন্ধগুলিকে তুচ্ছ করিলে—আনন্দস্বরূপের দ্বারে পৌঁছান সহজ হয় না।

সুতরাং মহাপ্রভু মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধগুলির উপর ভগবৎপ্রেমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন দেবাদিদেবের প্রেমের ইঙ্গিত আমরা গৃহে পাইতেছি—বনবাসী তাহা পাইতে পারে না। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গৃহী না হইয়াও গৃহী, কারণ গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা দিয়া তিনি তাঁহার উদ্দিষ্ট দেবতার পূজোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন।

পারিবারিক সম্বন্ধ।

এই পঞ্চরস—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলকথা। বৈষ্ণবেরা নীতিশাস্ত্র, জ্ঞান ও কর্ম্ম মানেন না। তাঁহারা বলেন রসই সর্ব্বপ্রধান—যাঁহার চিত্তে সেই অনুরাগ জন্মিয়াছে তাঁহার চিত্তে নীতিকথা স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানে যাঁহার প্রেম জন্মিয়াছে, তিনি নীতিবিগর্হিত কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে তাহা অসম্ভব—সুতরাং নীতিকথা নীচেকার কথা। ইহা কি কখনও কেহ মনে করিতে পারে যে চৈতন্যদেব মিথ্যা কথা বলিবেন,—পরের অপকার করিবেন? বৈষ্ণবধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের রস-শাস্ত্রের নিকট নৈতিক ধারাপাতের বুলি আওড়ান বাতুলতামাত্র।

নীতিশাস্ত্র

চৈতন্যদেব ঈশ্বরপ্রেমের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়,—"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" ঈশ্বরের সত্তা, তাঁহার প্রতি অনুরাগ—কল্পনার বস্তু নহে। এই অলৌকিক রস আস্বাদনযোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে—ইহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমে আজ বাঙ্গলা দেশ ভরপূর। বাঙ্গলার দূরদূরান্তরে, নগরে ও পল্লীতে ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গের নাম কীর্তিত। চাষা লাঙ্গল ফেলিয়া, কামার হাতুড়ী ছাড়িয়া, তাঁতি বস্ত্রবয়ন রাখিয়া সন্ধ্যায় মাদল লইয়া বসে, বাঙ্গলায় এমন পল্লী নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যেখানে গৌরাঙ্গের নাম কীর্তিত হয় না। সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার তিনি মালিক। তিনি খুব বড় পণ্ডিত বা তার্কিক ছিলেন, কিংবা কোন অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, চাষাদের গানে তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি তাঁহার দিগ্বিজয়ী জয় কি ষড়্ভুজদর্শন প্রভৃতির কথা একবারও তাহারা বলে নাই। তাহারা যে নিত্য সন্ধ্যায় তাঁহার জন্ম ভক্তিফুলের মালার অর্ঘ্য সাজায়—তাহা সহজ সরল কথার সুরভিমাখা। "আমার গোরা জাতের বিচার মানে নারে—দেখ্‌বি যদি আয় সকলে।" "দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা, তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর পেলাম না। সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হয়ে—মরমে জ্বলছে আগুন আর নিবে না, আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না।" যিনি আমাদের অন্তরঙ্গ হইতে অন্তরঙ্গ চিরসুহৃদ, একমাত্র অবলম্বন, দুঃখের দিনের অবসানে যাঁহার চরণকমল পাইব বলিয়াই জীবন-ধারণ, সেই পরম আশ্রয়, রূপেশ্বর প্রিয়বন্ধুর যিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোণার মানুষটির জন্ম জাতীয় ব্যাকুলতা বাঙ্গলার শত শত চাষার গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে ইহারা কত ভালবাসে এই দুইটি চরণ, যাহা বাঙ্গলার হাটে মাঠে শোনা যায়, তাহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে—"ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গের নাম। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেজন

গানে গানে চৈতন্যের ইতিহাস-রচনা।

গোবর্দ্ধন-ধারণ, খাঁটি বাঙ্গালী ছবি। স্বর্গীয় সাতকড়ি মিত্রের বাড়ীর মূল ছবি ৮½ × ৩½ ফুট, (মৎসংগৃহীত) ১২৫ বৎসরের প্রাচীন।
(চিত্রকরের নাম শশী কয়াল (চাষা-ধোপা পাড়া, কলিকাতা।)

আমার প্রাণ।" শত শত গানে এই ভাবটি আছে,—"দেখ এসে এক সোণার মানুষ পতিতের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছেন।" গৌরাঙ্গদেব জাতীয় গানের যত উপহার পাইয়াছেন, বোধ হয় জগতে আর কেহ তেমন পান নাই। তাঁহার নিজের জীবনটি ছিল একটি গানেরই মত। এই রূঢ় জগতের কোন জটিল কথা তাহাতে ছিল না। দুইটি অশ্রময় পদ্মচক্ষু, "ঢল ঢল অঙ্গের লাবণী", কৃষ্ণপ্রেমে শীর্ণদেহ—এই ছিল তাঁহার সম্বল। জনম ভরিয়া এই রূপের কথা বলিয়া বঙ্গীয় জনসাধারণের তৃষ্ণা মিটে নাই। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় যে এক সহস্র গৌরাঙ্গপদ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের অতি নগণ্য অংশ। তাঁহার যে সমস্ত বড় বড় জীবন-চরিত লেখা হইয়াছে—তাহার মধ্যে চৈতন্যকে যত না পাওয়া যায়, এই সকল গানের মধ্যে তাঁহার জীবন্ত রূপ তদধিক পাওয়া যায়—সুরধুনীর তীরে তাঁহার কীর্ত্তনের যে খোল বাজিয়া উঠিয়াছিল, অদ্যাবধি সেই সুরতরঙ্গ এখানে আকাশে-বাতাসে খেলিতেছে। গৌরাঙ্গের বিশিষ্টদ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাহাতে নাই, কিন্তু তিনি পতিতকে কোল দিয়াছিলেন, তিনি যে শ্রবণামৃত কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছিলেন—কত ভঙ্গীতে কত ছন্দে কত সুস্বররূপে বাঙ্গলার জনসাধারণ তাহাই গাইয়া আসিতেছে। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তন মনোহরসাই, গড়নহাটি, রেনেটি প্রভৃতি সুরে—ভাবের মদিরা ঢালিয়া বাঙ্গালী-কুটিরের সর্ব্বদুঃখের জ্বালা ভুলাইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন করিয়া কোন সমগ্র জাতি জগতে গুণের পূজা করে নাই। গৌরাঙ্গ প্রকৃতই বাঙ্গালীর চোখের অঞ্জন, কণ্ঠের আভরণ, হস্তের দর্পণ, মুখের তাম্বূল, হৃদয়সর্ব্বস্ব, গৃহের সার। তিনি ভগবানের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ 'রূপাভিসার' গাহিয়া সেই স্মৃতি এখনও উপভোগ করিতেছে। নব-বিবাহিতা বধূ পিত্রালয়ে গেলে যেমন নূতন বধূটি ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্বশুরালয় হইতে আগত কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে ভালবাসে—সেই প্রাণের মানুষটি যে স্বর্গলোক তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন সেই স্বর্গের স্মৃতি সম্বল করিয়া বাঙ্গালীচিত্ত তেমনি মহাজন-পদাবলী বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহা শুনিতে এত ভালবাসে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কীর্ত্তনকে 'মহাজন'-পদাবলী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বাঙ্গালী আর কোন জাতীয় গানকে এইরূপ সম্মান দেখায় নাই। রামপ্রসাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সঙ্গীত, রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত, ফকির ও বাউলদের গান এবং আগমনী গান—ইহারা সত্যসত্যই ধর্ম্মের কথা শুনাইতেছে, কিন্তু ইহার কোনটিই 'মহাজনপদ' নহে। চৈতন্যের পরিকরগণ কিংবা চৈতন্য যাঁহাদের নিকট প্রেমের প্রেরণা পাইয়াছেন এবং চৈতন্যের পরবর্ত্তী একটি নির্দ্দিষ্ট কবির দল, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—তাঁহারাই 'মহাজন'; চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত একটি নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব কবির দল—'মহাজন'। রূপজীবীরাও কীর্ত্তন গাহিয়া থাকে, তাহারা রামপ্রসাদের গান,

কীর্ত্তনের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধ।

মহাজনী গান।

আগমনী গান, কিংবা শাক্ত-সঙ্গীত, ব্রাহ্ম গান, ফকিরের দেহতত্ত্বের গান—এ সমস্তই গাহিয়া থাকে—কিন্তু কীর্ত্তন গাহিতে হইলে তাহাদের ভাব অন্য প্রকার হইয়া যায়, তখন তাহারা বলিবে "মহাশয়, বাসি কাপড়ে, হাত মুখ না ধুইয়া কীর্ত্তন গান করিব কিরূপে?" অথচ এই কীর্ত্তনের মধ্যে শ্লীলতার হানিকর অনেক আপত্তিজনক বিষয় আছে। তথাপি কীর্ত্তনগানও অপরাপর গান এক পাঙ্‌ক্তেয় নহে। কীর্ত্তনগান চৈতন্যের ছাপ মারা—মোহরাঙ্কিত। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন তাঁহার সঙ্গী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এমন অমৃতবর্ষী সুরতো কখনও শুনি নাই, শুধু সুরেই যে প্রাণ কাড়িয়া লইল, এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত, এই আশ্চর্য্য সুর কাহার সৃষ্টি?" সঙ্গী বলিলেন, "এই কীর্ত্তন-সুর ঠাকুর চৈতন্যের সৃষ্টি (চৈ. চ. অন্ত্য)। মোট কথা সুরুচি-কুরুচির কথা ছাড়িয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে কীর্ত্তনের আসরটি দেখা উচিত। যাঁহার বৈষ্ণব ভক্তির দীক্ষা নাই, যিনি চৈতন্যের জীবনী সূক্ষ্মরূপে পড়েন নাই তিনি যেন বটতলা-প্রকাশিত পুস্তকগুলি হইতে কীর্ত্তনের পদ না পড়েন। চালি ও কাঠামো বাদ দিয়া অসুর-সিংহ-কার্ত্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী ও ঊর্দ্ধদিকে শম্ভু এই সমস্ত আসবাব ছাড়িয়া দিয়া যদি দুর্গা ঠাকরুণকে নামাইয়া আনা যায়, তবে দুর্গা প্রতিমার সে মহিমান্বিত রূপ আর থাকে কি? সেইরূপ যাঁহারা কীর্ত্তন বুঝিতে চাহিবেন তাঁহারা ভাল কীর্ত্তনিয়ার মুখে আসরে আসিয়া একবার কীর্ত্তন শুনুন। দেখিবেন খণ্ডিতার কলুষ কাটিয়া গিয়াছে, বিপ্রলব্ধার উদ্দাম ভাব আর নাই—কলহান্তরিতার মান—এ সমস্তই অনাবিল, অপাপবিদ্ধ। যে সম্ভোগ-মিলন শুধু পুস্তকে পড়িলে বিদ্যাসুন্দরী তোটকের মতই শুনাইবে—আসরে ভাই-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে একত্র বসিয়া শুনিয়া বুঝিবেন—সম্ভোগ-মিলনে ভোগের লেশ নাই—যে ভোগ আছে তাহা দেবভোগ। অধিকাংশ বৈষ্ণবপদই চৈতন্যের চরিত্র স্মরণ করিয়া লেখা হইয়াছে, তাহা পার্থিব মোড়কে আঁটা একখানি স্বর্গের চিঠি। কীর্ত্তনীয়া সেই পৃথিবীর মোড়কটি ভাঙ্গিয়া যে সংবাদটি দিবেন, তাহা স্বর্গের। এজন্য প্রথমেই "তৎকালোচিত গৌরচন্দ্রিকা" দিয়া গান সুরু হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি যে বিষয়ই লইয়া গান হইবে, তাহার পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের তদ্রূপ অবস্থাসূচক একটি গান গাহিয়া নেওয়া হয়—ইহাই 'গৌরচন্দ্রিকা।' যেমন ধরুন, পূর্ব্বরাগের পদ গাওয়া হইবে, তাহার পূর্ব্বে রাধামোহন ঠাকুরের গৌরাঙ্গলীলার এই পদটি গাওয়া হইল, "আজু হাম কি পেখিলু নবদ্বীপচন্দ্র। করতলে করই বয়ান অবলম্ব। পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পথ। খণে খণে ফুলবনে চলই একান্ত। ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ। পুলক মুকুল-বর ভরু সব দেহ। রাধামোহন কছু না পাওল থেহ" (পদকল্পতরু, প্রথম অ:, ৬৪ পদ)।

পার্থিব মোড়কে আঁটা স্বর্গের চিঠি।

খুব জোরে মৃদঙ্গ বাজাইয়া খোল-করতালের সুরে, তাণ্ডব নৃত্যে দূর দূরান্তরের পল্লীগুলিকে যেন আসরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া গায়কেরা এই "গৌরচন্দ্রিকা" (গৌরবিষয়ক গান বা মুখবন্ধ) গাহিল। এই ডঙ্কানিনাদ ও

গৌরচন্দ্রিকা।

চীৎকারের মধ্যে বড় একটা পটে চৈতন্যদেবের ভুবনপূজ্য মূর্ত্তিখানি আঁকা হইল—তাহা প্রথম অনুরাগের। তিনি করতলে বদন অবলম্বন করিয়া কি ভাবে বিভোর হইয়া ধ্যান করিতেছেন? হঠাৎ উঠিয়া একবার বাহিরে একবার ঘরে যাতায়াত করিতেছেন। কখনও বা ফুলবনের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল ফুলদাম দেখিয়া কাহাকে মনে পড়াতে তাঁহার পদ্মচক্ষু বারংবার সজল হইতেছে এবং কি এক আনন্দে শরীর পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—রাধামোহন তাঁহার এই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল ভাবগুলির তাৎপর্য্য ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। চৈতন্যের এই মূর্ত্তি প্রথমে পটে আঁকা হইল, তাহা শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া—রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের অবতারণা করা হইবে। এইভাবে মহাপ্রভুর লীলার ভিত্তির উপর রাধাকৃষ্ণের লীলা দাঁড় করান হইল। চৈতন্যলীলার এই গানের পরেই পূর্ব্বরাগ। প্রথম গানটি হয়ত চণ্ডীদাসের "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়। রাই এমন কেনেই বা হৈল? গুরু দুরুজন ভয় নাই মনে কোথা বা কি দেব পাইল। সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।" এই গান কীর্ত্তনীয়া "আখর" দিয়া আসরে বুঝাইয়া যান। শ্রোতার মনের তার যাহাতে সর্ব্বোচ্চ গ্রামে আঁটা থাকিতে পারে, ভূতলের পঙ্কে নামিয়া না পড়ে—এই জন্য কীর্ত্তনীয়া 'গৌরচন্দ্রিকা'র সঙ্গে সুর মিশাইয়া ভাবের পবিত্রতা বজায় রাখেন, "কোথাবা কি দেব পাইল।" গাহিয়া কোন্ দেবতা রাধিকাকে পাইয়াছে—তাহার আধ্যাত্মিক সন্ধান অনুলীসঙ্কেতে প্রদান করেন। আগাগোড়া "আখর" দিয়া গায়ক কীর্ত্তন গানের মহিমা অব্যাহত রাখেন। এমন কি খণ্ডিতার মত ভাবদুষ্ট গান আমি কীর্ত্তনীয়ার মুখে ব্রাহ্মিকাগণের সঙ্গে বসিয়া শুনিয়াছি; কীর্ত্তনীয়া এমনই উচ্চগ্রামে শ্রোতার মনকে লইয়া গিয়াছেন যাহাতে কোন দোষের কথা দূরে থাকুক, অনাবিল শুভ্র পবিত্রতায় চিত্ত ভরপূর হইয়া গিয়াছে। ভাল গায়ক না হইলে "আখর" দিতে পারে না, অমনরের কীর্ত্তনীয়া "আখর" দিতে চেষ্টা করিলে কীর্ত্তন মাটী হইয়া যায়, আসর ভাঙ্গিয়া যায়। সুকণ্ঠ বা সুগায়ক হইলেই যে কীর্ত্তন জমিবে তাহা নহে, কীর্ত্তনীয়া ভগবৎ-রসের রসিক হওয়া চাই, শুধু তাহাই নহে, শ্রোতা-দিগেরও আসরে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া বসিতে হইবে। কিরূপে যে নিতান্ত পার্থিব বিষয়গুলি স্বর্গের উপাদানে পরিণত করা হয় তাহা কতকটা আশ্চর্য্য। অভিসার গানে রাধিকা গোপনে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতেছেন। জয়দেব ঠাকুর রাধিকাকে উপদেশ দিতেছেন—"মুখর মঞ্জীর ত্যাগ কর, নীলশাড়ী পর।" যেহেতু পথে নূপুরের শব্দ হইতে পারে,—অন্য রঙ্গের শাড়ী আঁধারেও দেখা যাইতে পারে। যথাসাধ্য গোপন রাখার ব্যবস্থা,—ইহাই ত অভিসারের কথা। আলঙ্কারিকেরা ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কবিরা রূপাভিসার বলিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গৌরের যাত্রা, অর্থাৎ তাঁহার সংকীর্ত্তনের অভিযান বুঝিতেন। তাঁহারা রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিতেছেন। যিনি রূপেশ্বরের নিকট রূপের সন্ধানে যাইতেছেন, তাঁহার মত রূপ কাহার? তাঁহার "পিঠে দোলে

হেমচাঁপা, রঙ্গিয়া পাটের থোপা",—"একে সে তরুণ ইন্দু, মলয়জ বিন্দু বিন্দু, তদুপরি কস্তুরি তিলক", তাঁহার গতি "অতি সুলাবনী", তিনি সখীর স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন। "কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী।" রাজনন্দিনীর দ্রুত হাঁটিবার অভ্যাস নাই, "রাই যাইতে যাইতে পুছে, কেলিকুঞ্জবন, কদম্বকানন, আর কতদূরে আছে?" এইভাবে রাধিকা যাইতেছেন—ইনি জয়দেবের অভিসারিকা নহেন, ইনি সগর্ব্বে বলিয়াছেন—"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।" ইনি কুল শীল জাতি সমস্ত 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া তাঁহার পদে সমর্পণ করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন "ননদিনী বল্ গিয়ে নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক-সাগরে।" কানে কানে কথা বলিয়া চাপা সুরে নিন্দা প্রচার করিবার দরকার নাই। বল্ গিয়ে নগরে—অর্থাৎ ঢাক বাজাইয়া প্রচার কর্ আমি নিখিলভয়হরণের পায়ে শরণ লইয়াছি—আজ আমি নির্ভয়। কবি অনন্তদাস মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন বা অভিসারযাত্রা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি সুন্দরী রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিলেন এবং লিখিলেন—"কঙ্কণ রণরনি, বঙ্ক-রাজধ্বনি, চলইতে সুমধুর বাজে। চৌদিকে রমণী সাজে, ডম্ফ রবাব বাজে;" শুধু কঙ্কণের রুনু রুনু বা বাঁকমলের সুমধুর ধ্বনি নহে, উচ্চৈঃস্বরে মধ্যে মধ্যে ভেঁপু বাজিয়া উঠিতেছে—ডম্ফ ও রবাবের শব্দ শুনিয়া অভিসারিকাকে দেখিবার জন্য রাজপথে ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ইহা অভিসারের নামে সংকীর্ত্তন। চৈতন্যদেব যে এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা গানের প্রাণ, তাহা কি এখনও বলিতে হইবে? অথচ এই সকল গানের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতগুলি কবিদিগের অপূর্ব্ব কবিত্বের হানিকর হয় নাই। এই পদটিতেই আছে, রাধিকা চলিতেছেন, তাঁহার পায়ের আলতার ছোপ মাটিতে পড়িয়া রাঙ্গা দাগ রাখিয়া যাইতেছে। তাঁহার অঙ্গ-গন্ধে ভ্রমরেরা অন্ধের মত তাঁহার পায়ে পায়ে চলিতেছে এবং যেখানে যেখানে তাঁহার রাঙ্গাচরণচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহাই পদ্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া চুম্বন করিতেছে—"চলইতে চরণের—সঙ্গে চলে মধুকর—মকরন্দ পান কি লোভে। সৌরভে উনমত, ধরণী চুম্বয়ে কত, যাহা যাহা পদচিহ্ন শোভে।"

শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণই এই শিক্ষা, ইহা অতি কঠিন। সুকুমার জীবনে অভ্যস্ত, চিরস্নেহে পালিত তরুণকে তপস্যার ব্রত করিতে হইবে। রাধিকা বলিতেছেন—"নিজের আঙ্গিনায় কাঁটা পুঁতিয়া—কলসী কলসী জল ঢালিয়া তাহা পিছল করিয়াছি। তদুপরি রাত্রি জাগিয়া আঙ্গুল চাপিয়া যাতায়াত করিয়াছি—যেহেতু "আমায় যেতে যে হবে গো, রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী, বঁধুর লাগি পিছল পথে" অন্ধকারে বন-জঙ্গলে ঘুরিতে হইবে এজন্য "করযুগ মুদি চলু ভামিনী, তিমির পয়ান কি আশে।" তিমিরে প্রয়াণ করিবার আশায় ভামিনী হাতের দ্বারা চক্ষু চাপিয়া রাখিয়া যাতায়াত করা শিখিতেছেন। আর পথে পথে হয়ত বিষাক্ত সাপ এজন্য "মণিকঙ্কণপণ, ফণিমুখবন্ধন, শিখয়ে ভুজগ-গুরু পাশে।" মণি-নির্ম্মিত কঙ্কণপণ (পুরস্কার) স্বরূপ দিয়া 'ভুজগ-গুরুর' (সাপের রোজার) নিকট ফণি-

সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

দস্যু কর্ত্তৃক রমণী-হরণ, ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র (পুথির মলাট) হইতে, বাঁকুড়া।

রাইমানিনী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, বর্দ্ধমান। বীণাবাদিনীর ছদ্মবেশে কৃষ্ণ।

হাঙ্গরমুখো রথে কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা। বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা এক সময়ে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, রথও তাহারা নৌকার ছন্দে নির্ম্মাণ করিত। সপ্তদশ শতাব্দী, বীরভূম।

রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, ২৪পরগনা।

কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা, বাঁকুড়া, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

চারটি গোপী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, বাঁকুড়া। পোষাক-পরিচ্ছদ, অজন্তার ধরণে।

মুখবন্ধন, (সাপের মুখ কি উপায়ে বন্ধ করা যায়) তাহা শিখিয়াছি। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে গুরুজনের গঞ্জনা শুনিতে হইবে—পরিজনেরা বাধা দিয়া উপদেশ দিবেন—তজ্জন্ত এখন হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন, "গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন। পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ।" গুরুজনের কথা শুনিলে বধির হওয়ার ভান করেন—এক কথা শুনিয়া আর কথার উত্তর দেন। পরিজনের কথা শুনিলে মুগ্ধার (পাগলের) ন্যায় হাসেন—গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী। বর্ষার অভিসারের গোবিন্দদাসের কি বর্ণনা! শব্দের ললিত ঝঙ্কার ও ভাবের গুরুত্বে তাহাদের তুলনা নাই। পঙ্কিল বাট (কর্দ্দমাক্ত পথ), মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাহার উপর দুরন্তর আকাশ বাহিয়া বাদলের ধারা আসিতেছে, হে সুন্দরি, তোমার একখানি নীল শাড়ীর আঁচল দিয়া কি এই দুর্য্যোগ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? আবার পরক্ষণেই বিদ্যুৎ যেরূপ এক মুহূর্ত্ত চমক দিয়া মর্ত্ত্যবাসীকে স্বর্গ দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ একটি মাত্র পূর্ণ সঙ্কেতে কবি আধ্যাত্মিক রাজ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন "হরিরহ মানস সুরধুনী পার। সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার?" কি ভাবে এই দুর্য্যোগে অভিসারে যাইবে, হরি মন-গঙ্গার অপর পারে—ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে। এই যে সৌন্দর্য্য, এই যে দুশ্চর তপস্যার কথা—এ সমস্তেরই প্রেরণা দিয়াছিলেন চৈতন্তদেব। তাঁহার জীবনের অলৌকিক প্রেমের লীলা, অশ্রুর একটি সুরধুনীর ন্যায়, কিন্তু সে বেগশালী স্রোত দুশ্চর তপস্যার শৈলভেদ করিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার জীবনের কৃচ্ছ্র ঢাকা পড়িয়াছিল, তাঁহার দুইটি বিকশিত—শতদলপ্রভ সজল চক্ষুর অন্তরালে; লোকে তাহাই দেখিয়া ভুলিয়াছে। কিন্তু শতদলের নীচে ভুজঙ্গশয্যা-পঙ্কের ভিত, তাহা কে দেখিয়াছে? কত উপবাস, কত অনিদ্রা, কত দুর্গম ভ্রমণ, কত বিপদ্—সেগুলি তাঁহার জীবনে রসের উৎস ও প্রফুল্লতার হানি করিতে পারে নাই।

এই পদাবলী ও কীর্ত্তন-সাহিত্য একটি খরস্রোতা নদীর ন্যায় ছুটিয়াছে। ইহার দুইকূলে কত উপবন, কত লোকালয়, কত মধুর প্রাকৃতিক দৃশ্য,—কিন্তু ইহা যেখানে যাইয়া পড়িয়াছে—সেখানে আর কলরব নাই, তরঙ্গের তান নাই—সে নিশ্চল প্রশান্ত চিররহস্তময় মহাসমুদ্র। ইহার প্রত্যেক তরঙ্গ সেই আধ্যাত্মিক অভিযানের ইঙ্গিত দিয়া ছুটিয়াছে—ইহাতে যদি কিছু মলিনতা থাকে, তাহা ইহার চির-অমল প্রেমের উৎসের ঘূর্ণপাকে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার ঠিকানা নাই। বিদ্যাপতির রাধা বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি। তোমাকে ভিন্ন আমি মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি না। কত উপমায় কত সুন্দর সুন্দর কথায় এই আত্মসমর্পণের কথা বলিয়া শেষে কবি বলিয়াছেন "মাধব তুহু কৈছে কহবি মোয়"—আমি সর্ব্বস্ব দিয়াছি সত্য, কিন্তু কাহাকে দিয়াছি তাহা জানি না। তুমি কেমন তাহা আমাকে বল। সাধনার এই দুশ্চর তপস্যার পর একি প্রশ্ন? ব্রহ্মের স্বরূপ-জিজ্ঞাসা। বিদ্যাপতির ভাব-সম্মেলনের পদে কৃষ্ণ আর দেহী নহেন, তিনি চিন্ময়, রাধিকা তাঁহাকে

প্রেমের সাগর-সঙ্গম।

মঙ্গলাচরণ করিয়া আনিতেছেন। সেই মঙ্গল-উপচারও সমস্ত মনের, বাহিরের উপকরণ তাহাতে কিছুই নাই।

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে,
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে,
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে,
ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে,
আলিপন দেওব মোতিম-হার
মঙ্গল-কলস করব কুচভার।"

যখন তিনি আসিবেন, তখন আমার দেহ দিয়াই সমস্ত মঙ্গল-আচরণ করিব। আমার অঙ্গই বেদী হইবে এবং আমর সুদীর্ঘ কুন্তলের দ্বারা ঝাঁটা তৈরী করিয়া তাহা পরিষ্কার করিব। আমার বক্ষের লম্বিত মণিমালা আলিপনার কার্য্য করিবে এবং আমার পীনবক্ষ মঙ্গল-কলসী স্বরূপ হইবে।

মনুষ্যদেহই ভগবৎ-মন্দির। ইহাই এই পদের অর্থ। সুতরাং চৈতন্যের জীবন-চ্ছটায় এই পদাবলীর অর্থ ফুটিয়াছে এবং তাঁহার প্রসাদে সমস্ত বাঙ্গলার জনসাধারণ এই পদাবলীর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার যোগ্য হইয়াছে।

এখন আমরা তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইব। ৮।১০ বৎসর হইল গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যেন বঙ্গীয় নিকুঞ্জবনের শত শত কোকিলকণ্ঠ থামিয়া গিয়াছে। তাঁহার গোষ্ঠ ও মাথুর যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তম্বুর ও নারদকে স্মরণ করাইত; তাঁহার ব্যাখ্যার কাছে ভাগবতের শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য ম্লান হইত। এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকটির ভিতরে দেবী ভারতী যে প্রেরণা দিয়াছিলেন, তাহাতে গৌরীদাসের কণ্ঠে যেন দেবীর বীণাই বাজিতে থাকিত। পৃথিবীতে থাকিয়া তিনি স্বর্গের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, কোন ধর্ম্ম-মন্দির বা বেদী হইতে সেরূপ সংবাদ আমরা শুনি নাই। আজ গৌরীদাস নাই, তাঁহার অগ্রজ আসর-বিজয়ী রসিক নাই, আজ শিবুও পরলোকগত, এখন গণেশ দাসের বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু উক্ত কীর্ত্তনীয়াদের কূলপ্লাবী ভক্তিবন্যার আসর যদিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি নূতনভাবে ভাবিত, নবমন্ত্রে দীক্ষিত খগেন্দ্রনাথ ও অপর্ণা দেবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য যে আসর বাঁধিতেছেন তাহা কালে দুর্জ্জয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

পদাবলীর অশ্লীলতা-সম্বন্ধে যাঁহারা বিদ্রূপ করেন, তাঁহারা গঙ্গার একগ্রাস ঘোলা জল দেখিয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বিশ্ববন্দিত প্রবাহের শুভ্রতা ও পবিত্রতা অনুমান করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই।

চৈতন্য, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্কিত রঞ্জিত চিত্রপট হইতে, (২৪শ পরগণা)।
মূল ছবি কলিকাতার বনোয়ারীলাল মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীর।

[চৈতন্য, আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বের রঞ্জিত চিত্রপট হইতে সংগৃহীত (২৪শ পরগণা)।

মহাপ্রভু, প্রতাপরুদ্র ও রঘুনাথ পণ্ডিত। মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার মহারাজ নন্দকুমারের গৃহের চিত্র। ছবি মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়া কথিত।

মহাপ্রভু, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ দারু-মূর্ত্তির ছবি। ইহা ঠিক মূলের অনুরূপ হয় নাই। কথিত আছে, ঐ মূল মূর্ত্তি চৈতন্য প্রভুর সময়ের।
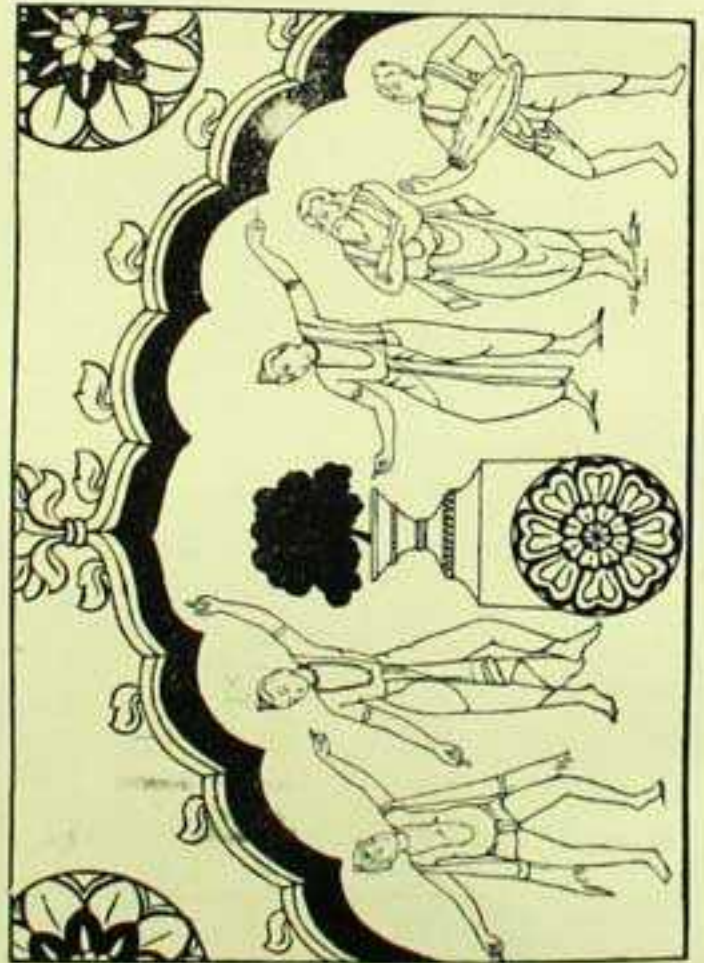
বহড়ু গ্রামের (২৪শ পরগণা) রায় সাহেব দেবেন্দ্র বসুর মন্দির গাত্রের ছবি, দুর্গারাম ভাস্কর কর্ত্তৃক ১৮১৪ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাস

দান-লীলা, হুগলী জেলার পটিদারের অঙ্কিত (ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে)
কৃষ্ণলীলা চিত্রের একাংশ, (ভূমিকা ৮/০ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীনিবাসের মূর্চ্ছা বীরভূম হইতে মৎ সংগৃহীত মলাটের ছবি, সপ্তদশ শতাব্দী, ১০৭ পৃঃ।

বীরহাম্বির, রাণী সুলক্ষণা ও শ্রীনিবাস আচার্য্য—সপ্তদশ শতাব্দীতে
বাঁকুড়ার পুঁথির মলাটের ছবি, মৎসংগৃহীত, ১০৫ পৃঃ।

চৈতন্য ও রাজা প্রতাপরুদ্র, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত পুথির কাঠের মলাটে অঙ্কিত ছবি (বীরভূম হইতে মৎ সংগৃহীত), ১০৮ পৃঃ।

হরিদাস ও অদ্বৈত, ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাগবাজারের পটুয়া অঙ্কিত এবং মৎসংগৃহীত, ১১০ পৃঃ।

হরিদাস, ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত বনবিষ্ণুপুরের পুথির কাঠের মলাটের ছবি হইতে গৃহীত, মৎসংগৃহীত, ১১৪ পৃঃ।

ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ—বহুর গ্রামের (২৪শ পরগণা) রায় সাহেব দেবেন্দ্র বসুর মন্দির গাত্রের ছবি, দুর্গারাম ভাস্কর কর্ত্তৃক ১৮১৫ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত।

অদ্বৈত, সপ্তদশ শতাব্দীর ছবি হইতে গৃহীত।
(২৪শ পরগণা।)

নিত্যানন্দ, ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র (২৪শ পরগণার) হইতে মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত।

অদ্বৈত, বৃদ্ধাবস্থা—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র। (২৪শ পরগণা) হইতে মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত।

হরিদাস—সপ্তদশ শতাব্দীর ছবি হইতে গৃহীত। (২৪শ পরগণা)।

রূপ গোস্বামী—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা), ৭১৭ পৃঃ।

গদাধর—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎ কর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা, ৭০৩ পৃঃ)।

রায় রামানন্দ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত। (২৪শ পরগণা ৭২৫ পৃঃ)।

শ্রীগোবিন্দ—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎ-কর্তৃক সংগৃহীত। (২৪শ পরগণা)

সনাতন—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা, ৭১৭-১৮ পৃঃ)।

রাজা প্রতাপ রুদ্র ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা, ৭৩৪ পৃঃ)।

জীব গোস্বামী—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত, (২৪শ পরগণা ৭৫২ পৃঃ।)

রঘুনাথ দাস—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২০শ পরগণা ৭৫৭-৫২ পৃঃ।)

গোপাল ভট্ট—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪ পরগণা,৭৫৭ পৃঃ।)

রঘুনাথ ভট্ট—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২০শ পরগণা)।

স্বরূপ দামোদর ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২০শ পরগণা)।

শ্রীজগদানন্দ—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা) ৭৩৩ পৃঃ।

গদাধর পণ্ডিত, সপ্তদশ শতাব্দীর ২৪শ পরগণার চিত্র হইতে ৭০২ পৃঃ।

শুক্লাম্বর—সপ্তদশ শতাব্দীর রঞ্জিত চিত্র হইতে (২৪শ পরগণা) ৭০৪ পৃঃ।

উদ্ধরণ দত্ত,—২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বের ভগ্ন কাষ্ঠ-মূর্ত্তি হইতে মৎসংগৃহীত ৭৩৬ পৃঃ।

শ্রীবাস, ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে ৭১২ পৃঃ।

রামচন্দ্র কবিরাজ। পুঁথির রঞ্জিত মলাট, সপ্তদশ শতাব্দী ৭৬০ পৃঃ।

মূর্চ্ছাপন্ন শ্রীনিবাস ও কবিরাজ। পুঁথির রঞ্জিত মলাট, সপ্তদশ শতাব্দী ৭৫৭ পৃঃ।

হে বজ্র। ভূমিকা ৩,—৩/০।

বীর হাম্বীর। (রাজ বেশে) ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথির মলাট হইতে। ৭৫০-৬০ পৃঃ।
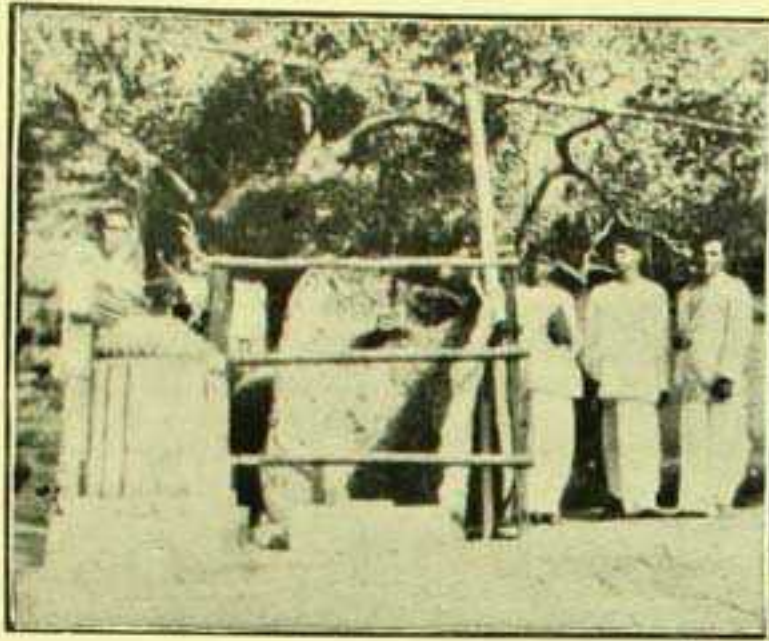
হরিদাসের আশ্রম, পুরী। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বকুল গাছ, ৫০০ বৎসরের উর্দ্ধকালের গাছ, মূল কাণ্ডটি নাই, গাছটি একটি বাকলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। আশ্রম স্বামী দীন বলভদ্রের আনুকূল্যে।

চৈতন্য-সংকীর্ত্তন। ইহার রঞ্জিত প্রতিলিপির (৩৭৫ পৃঃ) পাদটীকা দেখুন

বাসুদেব সার্বভৌম,—পুরীর বাসুদেব-বাটীর দেয়ালে অঙ্কিত
সুপ্রাচীন ছবি হইতে ৭২৬ পৃঃ।

মহারাজা প্রতাপরুদ্র। ৭৩৪ পৃঃ।

খঞ্জন আচার্য্য—সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্র হইতে।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ। বনবিষ্ণুপুরের রাধাশ্যাম মন্দির গাত্রে
পোড়া ইটের উপর অঙ্কিত চিত্র। (১৭৫৮ খৃঃ) ৭৪৭-৪৯ পৃঃ।
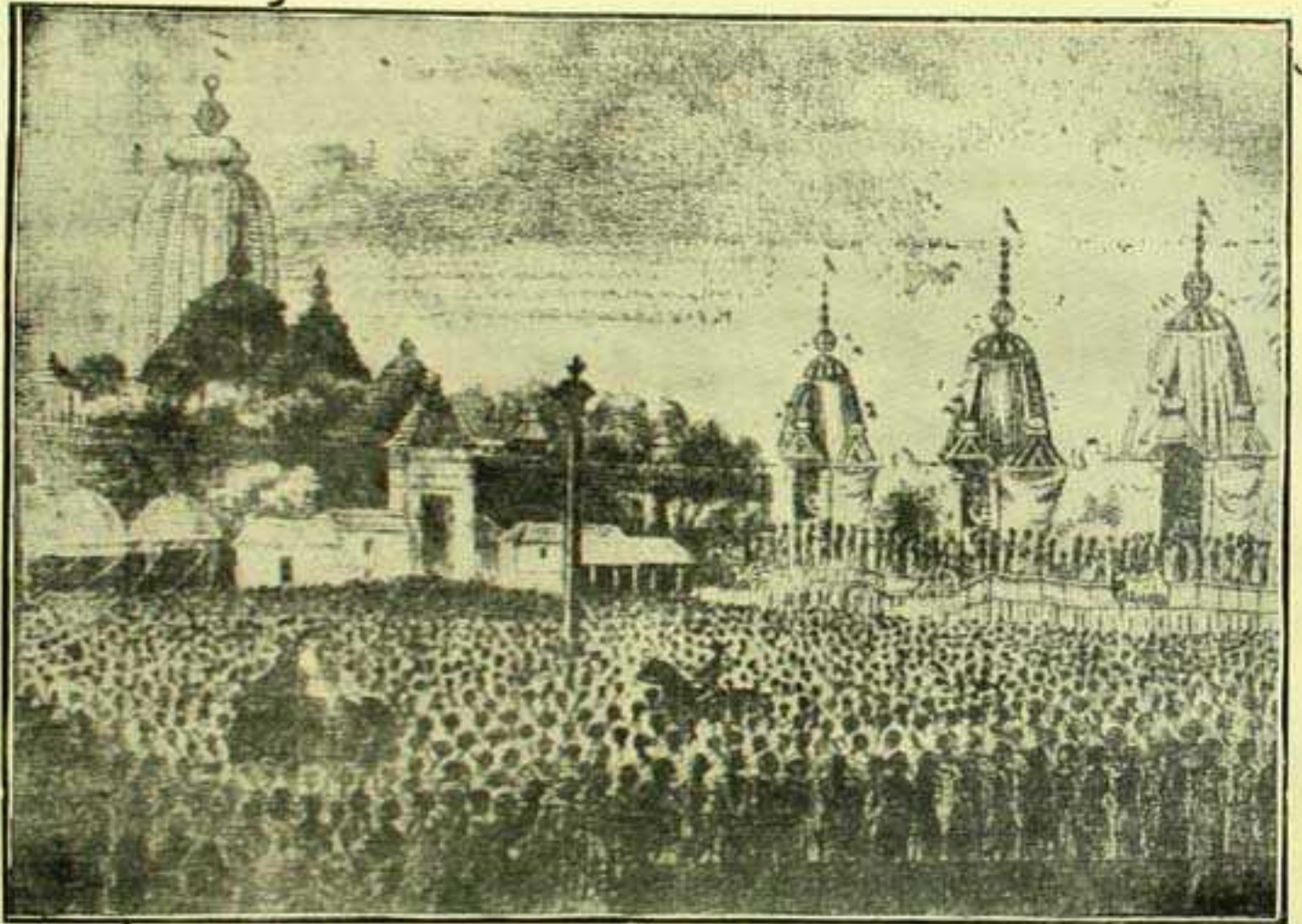
এক শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার রথের মিছিল (সাময়িক পত্রিকা হইতে) 'আনন্দবাজার' হইতে প্রাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে হুসেন সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া "নবদ্বীপে পুনরায় ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন," এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়াছিলেন। নবদ্বীপের প্রজারা শস্ত্র চালনায় সুদক্ষ ছিল। এই প্রবল জনশ্রুতিতে আতঙ্কিত হইয়া তিনি নবদ্বীপ উৎসন্ন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। নবদ্বীপের অনতিদূরে পিরুল্যা গ্রামে শিবিরস্থাপনপূর্ব্বক মুসলমানেরা নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, (জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, কালী তাঁহাকে স্বপ্নে ভীতি প্রদর্শন করেন) রাজার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন রাজদরবারেও সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত সভাসদ্ ছিলেন; আর এদিকে তখন নবদ্বীপের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী ছিল, মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের প্রতিপত্তি-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের নাম ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়াছিল। বোধ হয় বিদ্যোৎসাহী হুসেন সাহ তাঁহার সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুরোধে এই অত্যাচার শেষে থামাইয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, টুলো বামুন-পণ্ডিতেরা নিতান্ত নিরীহ, ইহাদিগকে নিপীড়ন করা ভাল নহে। চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে, হুসেন সাহ অনুতপ্ত হইয়া নবদ্বীপের ভগ্ন দেবালয়গুলির পুনঃসংস্কারের আদেশ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। এই শুভ সংবাদে নবদ্বীপত্যাগী বহু ব্রাহ্মণ আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যখন দেশের অবস্থা এইরূপ, তখন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচারে যাজপুর হইতে পলাইয়া শ্রীহট্টে বাস করেন। কপিলেন্দ্রদেবের উপাধি ছিল "ভ্রমরবর," মধুকর মিশ্রের পিতার নাম বিশুদ্ধ মিশ্র—ইহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—বাৎস্যায়নগোত্রীয়। মধুকরের ৪ পুত্র:—উপেন্দ্র, রঙ্গনাথ, কীর্ত্তিনাথ, কৃত্তিবাস। উপেন্দ্র মিশ্রের স্ত্রীর নাম কমলাবতী, তাঁহাদের ৭ পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ। জগন্নাথ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন।

বংশাবলী।

যখন জগন্নাথ মিশ্র তরুণবয়স্ক, তখন শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ ও ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল। জগন্নাথ নবদ্বীপে শিক্ষাসমাপ্তির জন্য আসিয়াছিলেন, সেইখানেই রহিয়া গেলেন, আর ঢাকা-দক্ষিণেই এই পরিবার বংশপরম্পরায় বাস করিয়াছেন। শ্রীহট্টের আর একটি পল্লীও এইরূপ দাবী উত্থাপন করিয়াছেন—কিন্তু তাহা গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা শ্রীহট্ট হইতে এই বিপৎকালে নবদ্বীপে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী (অপর একজন বৈদিক) ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের বেলপুকুরিয়া গ্রামে বাসস্থাপন করেন।

জগন্নাথ মিশ্র বল্লাল রাজার বাড়ীর নিকট বাস করিয়াছিলেন—ইহা তখন নবদ্বীপের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল, এবং এই স্থানটি সম্ভবতঃ নগরের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল "মেঞাপুর," কারণ অনেক মুসলমান এখানে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মস্থানটিকে মুসলমানী নামে অভিহিত করিতে ভক্তচরিতকারেরা স্বভাবতঃই কুণ্ঠাবোধ করিতেন। সুতরাং বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি আদি-লেখকেরা পল্লীর নাম উল্লেখ না করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান শুধু নবদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকেরা (তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য) "মেঞাপুর" শব্দটি হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া উহাকে "মায়াপুর" নাম দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন মুসলমানদের দলিলপত্রে এবং চলিতকথায় মিঞাপুর বা মেঞাপুর নাম এখনও প্রচলিত দেখা যায়। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে হিন্দুরা উহাকে মায়াপুর নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। নবদ্বীপে দ্বিতীয় মায়াপুর নাই। যেখানে বহু শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে রামচন্দ্রের পূজা হইত এবং রামের রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইত সেখানে বাঙ্গলার কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি রামচন্দ্রের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ঠিকই করিয়াছিলেন, যেহেতু ঐ স্থানটি রামের লীলার একটি প্রাচীন তীর্থ ছিল। সেই মন্দির এখন নদীগর্ভে কিন্তু, সেই রামচন্দ্রের মন্দির কখনই চৈতন্যমন্দির হইতে পারে না, এবং সে স্থানের নামও মায়াপুর নহে। জোর করিয়া কেহ কেহ নিজেরা উহার নাম 'মায়াপুর' দিয়াছেন।

জগন্নাথ মিশ্র সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার হাতের লেখা একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্ব এখনও পণ্ডিত ৺ মহামহোপাধ্যায় অজিত ন্যায়রত্নের বাড়ীতে আছে, উহা ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের লেখা। একটি বর্ণাশুদ্ধি নাই, হাতের অক্ষর মুক্তার ন্যায়। এই মহাভারতের পুঁথিখানি অতিযত্নে রাখা উচিত। আমি উহা দেখিয়াছি। এই পুঁথি লেখার ১৭ বৎসর পরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্রকে তাঁহার পত্নী শচীদেবী অর্থাগমের জন্য মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবপূজার পৌরোহিত্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, "তুমি পণ্ডিত অথচ তোমার চিরদারিদ্র্য।" এই অনুযোগ দেওয়াতে জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ আকাশের পাখীগুলি; উহাদিগকে কে খাইতে দেয়? আমরা সত্যপথে থাকিব, তুচ্ছ অর্থের জন্য অনুচিত আগ্রহ আমার নাই।" (চৈতন্য-ভাগবত)

জগন্নাথ মিশ্র।

জগন্নাথ মিশ্রের আটটি মেয়ে হইয়াছিল, তাহারা আঁতুড়ে অথবা অপোগণ্ড বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তৎপরে বিশ্বরূপ নামক পুত্র জন্মে এবং বিশ্বরূপ জন্মিবার ১১ বৎসর পরে একদিন অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় (১৪০৭ শকে, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) যখন সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে পূর্ণচন্দ্র সবেমাত্র মুক্ত হইয়া আকাশে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছেন, সেই শুভক্ষণে সমস্ত নবদ্বীপবাসী গঙ্গাস্নানান্তে "হরিবোল" শব্দে আকাশ মুখরিত করিতেছিলেন—ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব মায়াপুরে একটি নিম্বগাছের নীচে

আঁতুড়ঘরে ভূমিষ্ঠ হইলেন, এ জন্য চৈতন্যকে 'নিমাই' নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র হইতেও তিনি প্রিয়দর্শন, এজন্য লোকে তাঁহাকে নবদ্বীপচন্দ্র নাম দিয়াও সুখী হন নাই, কবি গাহিয়াছেন—"চাঁদে যে কলঙ্ক আছে, ছি ছি চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে।"

বিশ্বরূপ ও নিমাই উভয়েই বড় সুদর্শন ছিলেন,—বিশেষ নিমাই, যাঁহার রূপের কথা লিখিতে যাইয়া কত লেখক কবি হইয়া গিয়াছেন। বিশ্বরূপ যখন ষোড়শবর্ষবয়স্ক এবং নিমাই সবে পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি অদ্বৈতের কাছে পড়িতে যাইতেন এবং আহারের সময় হইলে কনিষ্ঠ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিত। দুইটি ভাই হাত ধরাধরি করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, নিমাইয়ের মুখখানি ফুল্লপদ্মের ন্যায়, তন্মধ্যে বিন্দু বিন্দু কালি, কারণ তিনি বিশ্বরূপের দোয়াত ও কলম লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়াছেন, সেই কালির বিন্দুতে তাঁহার মুখ ভ্রমরবেষ্টিত শতদলের মত ঢলঢল করিত, পায়ে নূপুর বাজিত, কত মধুর কথা বলিতে বলিতে দুইটি ভাই শচীদেবীর কাছে আসিতেন। বিশ্বরূপের বিবাহ স্থির হইল—তখন তাঁহার ১৬ বর্ষ বয়স—কিন্তু বিশ্বরূপ বিবাহ করিয়া সংসারী হইবেন না, অথচ যদি প্রতিবাদ করেন তবে "জননী দুঃখ পাবে বিপরীত।" এ দিকে নহবৎ বাজিতেছিল, পুরনারীরা শুভ বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন এক প্রদোষে বিশ্বরূপ আলাময় সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সাঁতারিয়া গঙ্গা পার হইলেন। কোথায় গেলেন কে জানে? সে কথা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে—এইটুকু জানা গিয়াছিল যে কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তরুণ যোগী "শঙ্করারণ্য পুরী" নাম লইয়া বনবাসী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শচীদেবীর অভিযোগ "অদ্বৈত আচার্য্যই তাঁহার পুত্রকে সন্ন্যাস-বুদ্ধি দিয়াছিলেন।" ইহার পরে যখন নিমাই বড় হইয়া অদ্বৈতের নিকট যাতায়াত করিতেন, শচীদেবীর তাহা ভাল লাগিত না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "কে বলে এই বুড়র নাম অদ্বৈত, ইনি একটি দৈত্য। আমার চাঁদের মত ছেলেটাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কণিকা-প্রসাদের মত এই শিশুটির কাণে আবার কি মন্ত্রণা দিতেছেন, কে জানে?" শচীদেবী অদ্বৈতকে দৈত্য নামেই অভিহিত করিতেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর জগন্নাথ মিশ্র পঞ্চবর্ষ বয়স্ক নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ "এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে লভিবেক জ্ঞান। ছাড়িয়া সংসারসুখ করিবে প্রয়াণ॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই। মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাই॥"

বিশ্বরূপ ও নিমাই।

কিন্তু ছেলেটি বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। তাঁহার পায়ে নূপুর, পরনে নীল ধুতি, মাথায় চুল বেণী করিয়া বাঁধা, তাহাতে সোণার ঝাঁপা, কটিতে কিঙ্কিণী—মূর্ত্তি অতি সুন্দর, কিন্তু কাজগুলি আদৌ সেরূপ সুন্দর নহে। সন্ধ্যাকালে বালক কোন দেবমন্দিরে ঢুকিয়া বিগ্রহের নিকটবর্ত্তী আরতির পঞ্চপ্রদীপ নিবাইয়া আসিত; কখনও কোনও ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে চক্ষু বুজিয়া গীতাখানি সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করিতেছেন, নিমাই গীতাটি লইয়া ছুটিয়া পলাইত; কোন ব্রাহ্মণ স্নানার্থ গঙ্গায়

দুরন্তপনা।

নামিয়াছেন, তাঁহার উত্তরীয় ও শিবলিঙ্গ চুরি করিত; কখনও জলে ডুবিয়া কাহারও একটা পা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত; কখনও কোন বালকের কাণে জল প্রবেশ করাইয়া তাহার বিপদে আনন্দ অনুভব করিত; কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ভয় দেখাইত (তখন বালকের বয়স পঞ্চবর্ষমাত্র); অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর খেলার মধ্যে—গঙ্গার বালুচরে বকের পিছনে ছোটা কিংবা কোন বালকের উপর চড়িয়া শিব হইয়া নাচা। হয়ত কাহারও কলাবনে ঢুকিয়া নিমাই গায়ে কৃষ্ণ কম্বল দিয়া বৃষ সাজিয়াছে, তার পরে সেই কদলী চুরি করিয়া পলায়ন। এই সকল উৎপাতে নবদ্বীপের লোকদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলাতে গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা জগন্নাথ মিশ্রকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন; বাধ্য হইয়া কয়েকমাস পাঠ-বন্ধের পরে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে পুনরায় টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

নিমাই বিষ্ণুদাস, সুদর্শন এবং গঙ্গাদাস—এই তিনজন পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে গঙ্গাদাস খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। যে আগ্রহে তিনি বালকোচিত দুরন্তপনা করিতেছিলেন সেই আগ্রহে পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন।

অধ্যয়ন।

তিনি সতীর্থদের একজনকে প্রতিপক্ষ করিয়া বিচার করিতেন এবং তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তাঁহারই পূর্ব্বকার মতের পক্ষে বিচার করিতে নিযুক্ত করিতেন, এবারও তাঁহার জয় হইত। বিদ্যোৎসাহী বালক নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের পথ আগলাইয়া তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। মুরারি গুপ্তের মত প্রাচীন পণ্ডিতকে "মুক্তির" লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে একদিন ঘাল করিয়া শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, "প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগ দূর কর।" তাঁহার এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে পণ্ডিতেরা মনে মনে খুব চটিয়া থাকিতেন; তথাপি তাঁহার তরুণ সুদর্শন মূর্ত্তি ও নবোন্মেষিত প্রতিভার জ্যোতিতে সকলে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তাঁহার দুরন্তপনার তখনও বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। অবকাশ পাইলেই যার তার উপর দৌরাত্ম্য করিতেন। শ্রীহট্টবাসিগণের ভাষা লইয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষেপাইতেন, তাহারা সহজেই চটিয়া যাইত, এবং বলিত "তুমি কত দিনের নদেবাসী হে? তোমার পিতামাতা সকলের জন্মস্থানই ত শ্রীহট্টে—এ কথাটি কি ভুলিয়াছ?" কিন্তু কে সেই তর্ক করিতে যায়, তিনি এরূপ তীব্র ব্যঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেন যে তাহাদের কেহ কেহ লগুড় লইয়া তাঁহাকে মারিতে যাইত, কেহ বা কাজির কাছে নালিশ পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইত।

বল্লভাচার্য্যের মেয়ে লক্ষ্মী বড় সুন্দরী ছিলেন, তিনি গঙ্গার ঘাটে যাইতেন, নিমাই তাঁহাকে দেখিতেন এবং তিনিও তাঁহাকে তরুণ হৃদয়ের স্নেহঢালা দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতেন। একদিন নিমাই বনমালী ঘটককে বিবাহের প্রস্তাব করিতে

বিবাহ ও পত্নীবিয়োগ।

অনুরোধ করিলেন। তখন জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গগত, এবং নিমাই গঙ্গাতীরে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ীতে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লভও আনন্দের সহিত

প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। নিমাই বনমালী ঘটককে তাঁহার মাতা শচীদেবীর নিকট পাঠাইলেন, শচীদেবী ঘোর আপত্তি করিলেন—"এতটুকু ছেলে লেখাপড়া করিতেছে, এখনই বিবাহের কথা কেন?" এই কথা শুনিয়া ঘটক মহাশয় ফিরিয়া যাইতেছিলেন—পথে তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া নিমাই মাকে যাইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিয়াছ যাহাতে ঘটক মহাশয় এত দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন? তোমার এরূপ করা ভাল হয় নাই, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহাই কর।" (চৈ. ভা.) এখন শচীদেবী বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রই এই ঘটককে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তখনই তিনি বিবাহে সম্মতি দান করিলেন। এই বিবাহ বর ও কন্যার পরস্পরের মনোনয়নের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। যখন নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ গিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার পৈতা ও পাদুকা স্মরণচিহ্নস্বরূপ লক্ষ্মীকে দিয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী অতি নিপুণ চিত্রকরী ছিলেন, তিনি স্বহস্তে তাঁহার স্বামীর মূর্ত্তি আঁকিয়াছিলেন। যখন সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন সেই চিত্র ও পাদুকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধ্বী মৃত্যুর জ্বালা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এদিকে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভাল নাম ছিল "বিশ্বম্ভর মিশ্র।" তিনি ব্যাকরণের একখানি টীকা করিয়াছিলেন। উহা পূর্ব্ববঙ্গের টোলগুলিতে অধীত হইত, এই টীকার নামও ছিল "বিদ্যাসাগর-টিপ্পনী"। ক্রমে তাঁহার অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত-বিদায় হিসাবে বহু অর্থ লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন; গঙ্গার উপরে পাঁচখানি সুন্দর বড় ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেখানে এই নিরামিশ-ভোজী বৈষ্ণব পরিবার অতি সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন। শচীদেবী নিজ হস্তে পরমান্ন, পিষ্টক, বেতো শাক, করলা ভাজা প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিতেন। শচীদেবীর মূর্ত্তি শান্ত ছিল কিন্তু তিনি অতি খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। "শান্ত মূর্ত্তি শচীদেবী অতি ক্ষুদ্রকায়" (গোবিন্দদাসের করচা)।

এই সময়ে কেশব কাশ্মীরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর্য্যাবর্ত্তের বহু স্থানের পণ্ডিতদিগকে জয় করিয়া নবদ্বীপ পরাজয় করিতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা ভাবিলেন, "এই দুষ্ট ছেলেটা কেবলই 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া তর্ক করিবার জন্য লালায়িত। প্রবীণদের টিকি ধরিয়া টানিতে চায়—আমরা বয়স্ক, ইহার উপরই দিগ্বিজয়ীকে লেলিয়া দেওয়া যাক্।" সুতরাং তাঁহারা বলিলেন, গঙ্গাতীরে অতি অল্পবয়স্ক একটি মহাপণ্ডিত আছেন, আপনি তাঁহার সহিত বিচার করুন। চৈতন্য-ভাগবতে সবিস্তারে এই বিচারের কথা বর্ণিত আছে—দিগ্বিজয়ী হারিয়া গেলেন। সেদিন "নবদ্বীপের মুখ রক্ষা হইল"—এই বলিয়া সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া এক সভা করিলেন এবং নিমাইকে উপাধি দিলেন "বাদিসিংহ", সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের পুরো নাম হইল "শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর বাদিসিংহ।"

ব্যঙ্গ করাই ছিল নিমাইয়ের রীতি ও স্বভাব, যৌবনের প্রারম্ভেও এই বৃত্তি হ্রাস পায় নাই। কেবল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি একটি বিষয়ে সতর্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কৈশোরে

পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতেন, "সবে মাত্র পরস্ত্রী প্রতি নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি প্রভু হন এক পাশ।" ঈশ্বর পুরীর বাড়ী ছিল হালিসহর, তিনি বয়স্ক সন্ন্যাসী, ভক্তিপন্থী, সুপণ্ডিত, মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসিতেন। তাঁহাকে দেখিতে নবদ্বীপের লোকের ভিড় হইত। নিমাইয়ের সতীর্থ পরম পণ্ডিত গদাধরের চিরকালই ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক ছিল, তিনি ঈশ্বর পুরীর বড় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপর কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে শুনিলে নিমাইয়ের হিংসা হইত। ঈশ্বর পুরী কেন গদাধরকে ভালবাসেন, এজন্য নিমাই মাঝে মাঝে তাঁহার আশ্রমে যাইয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। ঈশ্বর পুরী এই সুলক্ষণ বালকটীকে দেখিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিতেন এবং স্বপ্রণীত ধর্ম্মপুস্তক হইতে শ্লোক তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু একদিন যখন পুরী গোঁসাই সোৎসাহে একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন নিমাই বলিয়া উঠিলেন—"এ ধাতু আত্মনেপদী নহে।" ঈশ্বর-পুরীর ধর্ম্মের আগ্রহ জুড়াইয়া গেল, এ বালককে বাগে আনা তাঁহার কর্ম্ম নহে, তিনি বুঝিতে পারিলেন।

নিমাই ও ঈশ্বর পুরী।

পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণের পর যখন নিমাই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তখনই তাঁহার ভাবান্তর হইল। পথে গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি সহচরের সঙ্গে দেখা, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা ব্যঙ্গ করিয়া নিমাই হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিলেন—কিন্তু সহচরেরা সেই ব্যঙ্গের সায় দিলেন না। মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিমাই বুঝিলেন, লক্ষ্মী নাই,—যে লক্ষ্মীকে তিনি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, যিনি গুণশীলা ও সাধ্বী—এবং কৈশোর-সঙ্গিনী, নবযৌবনের নব অনুরাগ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জন্মিয়াছিল, সেই লক্ষ্মীর অভাবে তাঁহার যে ভাবান্তর হইল তাহা পরবর্ত্তী জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বলা যায় না। এদিকে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে—তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য নবদ্বীপের ধনশালী রাজসভা-পণ্ডিত সনাতন মিশ্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শচী পুত্রের ইচ্ছা না জানিয়াই বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের দিন নিমাই শুনিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। তিনি বিরক্ত হইলেন, বিবাহ করিবেন না, বলিলেন। অগত্যা শচী সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চৈতন্য বুঝিলেন এরূপ করিলে তাঁহার মায়ের মুখখানি ছোট হইয়া যায়—সনাতন মিশ্র অনেক আয়োজন করিয়াছেন—তাহা পণ্ড হইয়া যায়, সুতরাং অনিচ্ছাক্রমে শেষে স্বীকৃত হইলেন; বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর নিমাই পিতৃপিণ্ড প্রদান করিতে গয়ায় যাত্রা করিলেন। পথে কুমারহট্টে তিনি ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর পুরীকে দেখিতে ছুটিলেন, আজ তাঁহার চক্ষু ছল ছল—আজ ঈশ্বর পুরীকে তাঁহার এত ভাল লাগিল কেন? সাধুসঙ্গে মুহুর্মুহুঃ চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল, মনে হইল ঈশ্বর পুরীর দেবচরিত্র, তাঁহার মত অন্তরঙ্গ তাঁহার কেহ নাই। ঈশ্বর পুরী বলিলেন, "তুমি গয়ায় যাও, আমিও সেখানে যাব—তথায় আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।" ঈশ্বর পুরীকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার আজ বড় কষ্ট হইল। কুমারহট্টের কতকগুলি ধূলি

তিনি কোঁচার খুঁটে বাঁধিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান, এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ," উন্মত্তের মত সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং কুমারহট্টকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া "প্রভু কহে কুমারহট্টের নমস্কার, শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার।"

সঙ্গীরা দেখিল সে নিমাই আর নাই। সে ব্যঙ্গপ্রিয় সততরহস্যময় নিত্যপ্রফুল্ল তরুণ নিমাই,—দিগ্বিজয়ী জয়দর্পিত পণ্ডিত নিমাইয়ের জীবনের চাঞ্চল্যপূর্ণ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তিনি কেন কাঁদিতেছেন, কেন সজল চক্ষে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া আছেন, কেন মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর পিণ্ড দেওয়ার পালা। শ্রীপাদপদ্মে দাঁড়াইয়া নিমাই দেখিলেন, পাদপদ্মের উপর পাহাড় সমান উচ্চ ফুলরাশি পড়িতেছে! কত বস্ত্র-অলঙ্কার, চারিদিক্ হইতে পুষ্পস্তবকের সঙ্গে সঙ্গে কত নয়নাশ্রু! পাণ্ডারা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিতেছে "সংসারের দুঃখী তাপী জীব, তোমরা এই পাদপদ্ম দেখ,—যোগী ঋষি মহর্ষিরা এই পাদপদ্ম ধ্যান করেন, এই পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়াছেন, ইহা যোগেশ্বর শিব ধ্যান করেন, ত্রিতাপদগ্ধ মানুষ—তোমাদের আর গতি নাই, এই পাদপদ্ম আশ্রয় কর।" নিমাই কি শুনিলেন, কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন, পাদপদ্মের উদ্দেশে তাঁহার পদ্মচক্ষে যে ধারা ছুটিল, তাহার শেষ নাই, বিরাম নাই! সেই বহুপদ্মের মধ্যে তাঁহার মুখপদ্ম অশ্রু-গঙ্গার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—দেখিতে দেখিতে সেই পাদপদ্মের কাছে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পাদপদ্ম।

সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া কোনোরূপে বাসায় লইয়া আসিল—তখন ঈশ্বর পুরী আসিয়াছেন। নিমাইয়ের জ্ঞান নাই, কেবল অশ্রু, ঊর্দ্ধে তাকাইয়া কি দেখেন, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কোনও প্রকারে তাঁহাকে সহচরেরা বাড়ী ফিরাইয়া আনিল—কিন্তু পথে পথে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার বাড়ী নাই, আমার বাড়ী বৃন্দাবন, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে বৃন্দাবন চলিলাম।" কতকটা বলপূর্ব্বকই সঙ্গীরা তাঁহাকে বাড়ীতে আনিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর কাহারও সঙ্গে কথা নাই, চুপটি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, আর কাঁদিতে থাকেন। প্রিয় গদাধর আসিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আমি গয়ায় কি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমায় বলিব," কিন্তু বলিতে যাইয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষু ও গদ্গদকণ্ঠ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কি দেখিয়াছেন আর বলা হইল না। শচী দেবীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়, প্রতিবেশিনীরা বলিলেন—"পাগল হইয়াছে, এর আর কথা কি? চিকিৎসা করাও।" ভিষক্ শিবাদিঘৃতের ব্যবস্থা করিয়া গেল? কোথায় গেল সেই কুঙ্কুমকেলী সৌখীন ধুতি, সেই চন্দন, অগুরু, গন্ধদ্রব্য, সেই সখের পুষ্পমাল্য। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইয়া আনিয়া শচীদেবী পুত্রের নিকট বসাইয়া রাখেন। কিন্তু "দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ, দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।"

পূর্ব্বরাগ।

শ্রীরাম পণ্ডিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দফুলের গাছ দিল—তথায় দিবারাত্র ফুল ফুটিত। প্রাতে ব্রাহ্মণেরা ফুল তুলিবার জন্ম বেতের সাজি লইয়া তথায় যাইতেন এবং পল্লীর সমস্ত কথার আলোচনা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন শুক্লাম্বর, গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি, শ্রীবাস তো অবশ্যই ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন, জগতে ভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন। তাঁহারা নিমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন "সে পাগল নয়, এ যে কি তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না;—এত জলও মানুষের চোখে থাকে! কৃষ্ণনাম বলিলেই উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায়—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়ে।" শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিলেন, "আজ আমার বাড়ী নিমাই আসিয়াছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমার কি হইয়াছে?' সে বলিল আমি তোমার বাড়ী যাইয়া আমার কথা শুনাইব। আজই তার আমার এখানে আসার কথা।" সকলেই এ সম্বন্ধে কুতূহলী হইলেন। এই সময়ে একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া শ্রীবাসকে বলিল, "চলুন, শচী দেবী বড় বিপন্ন, নিমাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শচী ঠাকুরাণী বিপদে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছেন।" শ্রীবাস চলিয়া গেলেন, শচী দেবী বলিলেন "আপনারা আমার ছেলের একটা উপায় করিয়া দিন, আমি কি করিব? নিমাই যে আমার সর্ব্বস্ব, আমার সর্ব্বস্ব যাইবার পথে।" যে ঘরে নিমাই ছিলেন, শচী শ্রীবাসকে সেই ঘর দেখাইয়া দিলেন। শ্রীবাস যাইয়া সেই ঘরে খিল দিলেন। তারপর প্রায় চারি দণ্ড পরে শ্রীবাস বাহির হইলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লুত। তিনি শচীকে বলিলেন, "মা তোমার ছেলে পাগল হয় নাই। উহাকে বিরক্ত করিও না। ধ্রুব, শুক, প্রহ্লাদের কথা আমরা শুনিয়াছিলাম, আমাদের ভাগ্যবশে তেমনই একজন নবদ্বীপে আসিয়াছেন! এই সময়টুকুর মধ্যে নিমাই আমাকে পাগল করিয়া ফেলিয়াছে, অচিরে সমস্ত দেশটা পাগল করিবে।"

এইবার শচী আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে দিনের বেলায় নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে যান, সেখানে কাহারও বস্ত্র ধুইয়া নিঙড়াইয়া শুকাইতেছেন, কাহারও ধুতি প্রভৃতি কাঁধে করিয়া বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেন, কাহারও পা ধোয়াইয়া দেন। লোকে আপত্তি করিলে তিনি বিনীতভাবে বলেন—"তোমাদের সেবা করিলে আমি কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ-ভক্তি পাই, এই সেবা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।" রাত্রে শ্রীবাসের ইতিহাস-বিশ্রুত আঙ্গিনায় সংকীর্ত্তন। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি লোকের সঙ্গে এই সংকীর্ত্তন। দলের প্রধান ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্য "পক্ক কেশ পক্ক দাড়ি বড় মোহনীয়। দাড়ি পড়িয়াছে, তার হৃদয় ছাইয়া;" এইদলে শ্রীবাস স্বয়ং, গদাধর, শুক্লাম্বর, শ্রীমান্ পণ্ডিত, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন। এই দলে ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত, "প্রভুর মতন যার নর্ত্তন সুন্দর।" সারারাত্রি কি ভাবে কাটিয়া যাইত তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এই ৫০০ বৎসর যাবৎ কীর্ত্তনে গোটা বাঙ্গলা দেশটা মাতাইয়া রাখিয়াছে। এখনও ভাল কীর্ত্তন শুনিলে লোক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা সমস্ত ভুলিয়া যায়—আর যিনি কীর্ত্তনানন্দের হরিদ্বার, যাঁহার শ্রীমুখে এই সুর প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল,

পূর্ব্বরাগের আবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেমে আত্মহারা প্রেমিক পাগলের সেই নৃত্য— সেই গান যে কি প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? পৃথিবীর অন্যান্য দেবকল্প ব্যক্তিরা ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ধর্ম্মজীবনের উজ্জ্বল আদর্শ ও নীতির শুভ্রতা দ্বারা জগতে পূজ্য হইয়া আছেন—কিন্তু ভগবৎপ্রেম লোকচক্ষে এরূপ সুস্পষ্ট করিয়া আর কে দেখাইয়াছেন? সেই যে মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহার বোল এখনও নীরব হয় নাই, সেই শতকণ্ঠ-উচ্চারিত বাণী, যাহা শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রথম আকাশে উঠিয়াছিল—তাহা এখনও আমাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে। যে রাত্রে নিমাই রুক্মিণী সাজিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল—"ইনি কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি? ইনি কি ভূতলে আবির্ভূতা পদ্মাসনা কমলা, না মানবদেহধারিণী ভারতী,—রাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী?" স্বয়ং সেদিন রুক্মিণী কৃষ্ণকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা সত্যিকার কৃষ্ণ-প্রেমের অশ্রুতে মাখা; রঙ্গমঞ্চে এমন সত্যিকার অভিনয় জগতে কেহ কখনও দেখে নাই। সেদিন নবদ্বীপে স্বয়ং কৃষ্ণভক্তি আসরে নামিয়া আসিয়া মানুষকে ভগবৎপ্রেম শিখাইয়া দিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইল, দর্শকমণ্ডলী বলিল "এমন রাত্রিও প্রভাত হয়!"

ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে আসিলে নিমাই আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে পড়িয়া থাকিতেন। একদিন শচী দেবী নির্জ্জনে নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, আমাকে অভয় দাও, আমার বুকটা বড় অস্থির হইয়াছে।" নিমাই বলিলেন, "মা, সে কি কথা? তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব। কি হইয়াছে বল।" তখন শচী দেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী পাইলে এত খুসী হও কেন? মনে হয় যেন তোমার কোন প্রাণের অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তোমার আহার-নিদ্রা-জ্ঞান থাকে না, আমাদিগকে ভুলিয়া যাও। নিমাই, আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর, তুমি সন্ন্যাসী হইবে না। বিশ্বরূপ প্রাণে বড় দাগা দিয়া গিয়াছে, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।" নিমাই মাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। শচী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার নিকট বড় অপরাধ করিয়াছি, তুমি বল আমাকে ক্ষমা করিবে।" নিমাই বলিলেন—"কি করিয়াছ? তুমি মা, ছেলের কাছে মা কি কোন অপরাধ করিতে পারে? ওরূপ বলিলে যে মা আমি অপরাধী হই।" শচী দেবী বলিলেন—"বিশ্বরূপ নিজহাতে একখানি বই লিখিয়াছিল, সে তাহা আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিয়াছিল—নিমাই বড় হইলে এই বই পড়িবে। আমি সেই বই ছিঁড়িয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি, পাছে সেই বই পড়িয়া তুমি সন্ন্যাসী হও।" নিমাই বলিলেন—"দাদার চিহ্ন নষ্ট করিয়া ভাল কর নাই, কিন্তু আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া তোমার সঙ্গত নহে—আমি যে তোমার একান্ত স্নেহের অনুগত ছেলে—এরূপ ক্ষমা চাহিলে আমার অকল্যাণ করা হয়।" পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই আমি চৈতন্য-ভাগবত এবং অপরাপর প্রামাণ্য পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

ঈশ্বর পুরী সম্বন্ধে শচী-দেবীর ভয়।

এদিকে টোল বন্ধ হইয়া গেল, হরিকথা ভিন্ন নিমাই আর কিছু বলেন না, ব্যাকরণের সূত্র পড়াইতে যাইয়া হরিভক্তির ব্যাখ্যা করেন; ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়া শোনে—কারণ নিমাইয়ের মুখে হরিকথা—সে যে অমৃত হইতেও অমৃত। কিন্তু তাহারা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের (নিমাইয়ের শিক্ষক) কাছে যাইয়া নালিশ করিল, "নিমাই পণ্ডিত আর পড়ান না, কেবল কৃষ্ণকথা বলেন আর কাঁদিতে থাকেন।" গঙ্গাদাস যাইয়া বলিলেন, "দেখ নিমাই, তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ইঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ধার্ম্মিক ও ভক্তিপরায়ণ বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তুমি হরিভক্তি প্রচার কর, ভাল,—কিন্তু ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ করা কি ঠিক?" নিমাই বলিলেন, সেদিন হইতে তিনি পড়াইবেন। নিমাই টোলে গেলেন, খানিকটা মনোযোগের সহিত পড়াইলেন, তখন ভৃগর্ভ জয়দেবের গান করিতেছিলেন, গঙ্গাতীরে তাঁহার মধুর স্বরলহরী কাঁপিয়া নাচিয়া আকাশে উঠিতেছিল—নিমাই সেই গান শুনিয়া পাগল হইয়া গেলেন। "আবার গাও" "আবার গাও" বলিয়া ভৃগর্ভের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, দুই চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হইল, সেদিন আর পড়ান হইল না। তিনি বুঝিলেন, আর পড়াইতে পারিবেন না। তখন পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ভাইসব! তোমরা দেখিতেছ, আমি কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না, আমার মন তাঁহার পাদপদ্মে বিলাইয়াছি, তিনি যে সর্ব্বক্ষণ আমার সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার ভুবনভুলানো হাসি হাসিতেছেন, আমি কি করিয়া পড়াইব?—আজ হইতে আমি আর পড়াইতে পারিব না, আমার শত শত অপরাধ তোমরা ক্ষমা করিও। আমি জীবনে যদি কোন ভালকাজ করিয়া থাকি সেই পুণ্যের ফল তোমাদিগকে দিলাম, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।" অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া আসিল; এইভাবে তিনি পুঁথিতে ডুরি বাঁধিলেন। নদের চাঁদের টোল এইখানে সমাপ্ত হইল।

টোল-ত্যাগ।

এদিকে নবদ্বীপে মাঝে মাঝে চৈতন্যের দল সংকীর্ত্তন করিতে বাহির হন; দলের লোক কম নয়। তাঁহারা যেন প্রেমাশ্রুর হার গাঁথিয়া পরেন, কৃষ্ণ-প্রেম-গর্ব্বের ধ্বজা তুলিয়া উচ্চরবে নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলেন। নদীয়ার ভট্টাচার্য্যদের এই সকল অশ্রু, উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌কে ডাকা, ভাল লাগিত না। তাঁহারা কেহ বলিলেন, "খাসা ছেলেটা ছিল, একেবারে মাটী হইল। ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এমনই বিদ্যা যে একদিন অভ্যাস না থাকিলে সূত্রগুলি ভুলিয়া যাইতে হয়—নিমাইয়ের কি আর বিদ্যাবুদ্ধি কিছু থাকিবে?" একজন বলিলেন, "আমরাও তো ভাই ভাগবত পড়িয়াছি, এরূপ হরিনাম লইয়া নর্ত্তনকুর্দ্দনের কথাতো কোথাও দেখি নাই, ভগবান্‌কে চীৎকার করিয়া না ডাকিলে বুঝি তিনি শুনিতে পান না!" অপর একজন বলিলেন, "আমিই তো ঈশ্বর; জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ কি? তবে কে কাহাকে ডাকিবে?" অনেকে বলিলেন—"রাত্রে ইহাদের চীৎকারে ঘুম হয় না, বাদসাহ এসকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই সৈন্য পাঠাইয়া নবদ্বীপ উৎসন্ন করিবেন।"

ভট্টাচার্য্যের দল ও গোরাই কাজির আদেশ।

আবার কেহ বলিল, "শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায় ইহারা নিশ্চয়ই মধুমতী-পরী সাধনা করে" (চৈ. ভা.)। ইহারা যাইয়া নবদ্বীপের গোরাই কাজির কাছে আরজী করিয়া রাজপথে সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেইদিন নবদ্বীপের একটী স্মরণীয় দিন। কাজির আদেশ-প্রচারের সংবাদ শুনিয়া নিমাই বলিলেন, "আজ আমরা সকলে প্রকাশ্যভাবে সংকীর্ত্তন করিব। এতদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আমাদের কীর্ত্তন আবদ্ধ ছিল, মাঝে মাঝে দুই একটি মাত্র দল রাজপথে কীর্ত্তন করিত, আজ আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা রাত্রে রাজপথে একত্র হইয়া বাহির হউন।" সেদিন দেখা গেল, নিমাইয়ের বিরুদ্ধ দল কত নগণ্য! নিমাই রাজপথে বাহির হইবেন, বিদ্যুতের মত এই সংবাদ প্রচারিত হইল। শত শত, সহস্র সহস্র নরনারী সে রাত্রে রাজপথে বাহির হইল; নানাবর্ণ-রচিত পতাকায় এবং সুগন্ধ তৈল-নিষেবিত সহস্র মশালের আলোকে মনে হইল নবদ্বীপে সে রাত্রে কোন রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা হইবে। জন-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের পরডাঙ্গা, গড়িগাছা প্রভৃতি পাড়াগুলি তাঁহারা পরিক্রমণ করিয়া কাজির বাড়ীর কাছে আসিলেন; যে যে পথ দিয়া এই সংকীর্ত্তনের দল চলিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ চৈতন্য-ভাগবত, ভক্তি-রত্নাকর ও প্রেম-বিলাসে পাওয়া যাইবে। গোরাই কাজি এত বড় বিপুল জনতা প্রত্যাশা করেন নাই, বিশেষ জনতা নেহাৎ ভাল মানুষ হইয়া থাকে নাই, কিছু কিছু আক্রমণের ভাবও দেখাইতেছিল। কতকটা ভয়ে, কতকটা নিমাইয়ের মূর্ত্তিদর্শনে কাজির ভাবান্তর হইল। তিনি দেখিলেন—লোকে লোকারণ্য, তাহারা নিমাইকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত বন্যার মত ছুটিয়াছে—তাহাদের আনন্দধ্বনিতে বোধ হয় স্বর্গ হইতে দেবতারা সাড়া দিতেছেন, কুলবধূরা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছেন—নিষেধ করিবার কেহ নাই, নিষেধ-বিধি মানিবার কেহ নাই। মশালের আলোকে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে, কপোলে সকলেরই অশ্রু টল টল করিতেছে, এই বৃহৎ জনতা শুধু অশ্রু উপহারে কৃষ্ণের পূজা করিতেছে। যে দিকে বিভোর হইয়া পরম সুন্দর কুঞ্চিত-কেশদামপূর্ণ মস্তক দোলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোরা হরিনাম গাহিয়া চলিতেছেন, শত শত মশাল তাঁহার রূপদর্শনেচ্ছু শত শত ভ্রমরপঙ্ক্তির ন্যায় সেই দিক্ উজ্জ্বল করিয়া চলিয়াছে, কি অপূর্ব্ব রূপ! কাজি মুগ্ধ হইলেন, তিনি গৃহ হইতে নামিয়া আসিয়া নিমাইকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন।

মহাসংকীর্ত্তন।

কাজির প্রীতি।

এই সময়ে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে আর একটি সম্মানিত অতিথি উপস্থিত হইলেন। ইহার নাম **নিত্যানন্দ**, ইনি হড়াই ওঝার পুত্র—বাড়ী বীরভূম, একচাকা গ্রাম। ইনি নিমাই হইতে নয় বৎসরের বড়, সুতরাং ইনি ১৪৭৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়স হইতেই ইহার কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াছিল। বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পূতনাবধ, কালীয়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণের নানারূপ লীলার অভিনয় করিয়া বাল্যসঙ্গীদের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দ্বাদশ বৎসরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বতীর্থ ঘুরিয়া বেড়ান। কথিত

নিতাইয়ের আবির্ভাব।

আছে শ্রীপর্ব্বতে ইঁহার সঙ্গে **মাধবেন্দ্র পুরীর** সাক্ষাৎ হয়। এই মাধবেন্দ্র পুরীই বঙ্গদেশে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। নানাকারণে মনে হয় **পুরী** বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি অযাচক-বৃত্তি সন্ন্যাসী ছিলেন, কেহ কিছু স্বেচ্ছায় দিলে খাইতেন—নতুবা উপবাসী থাকিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, ইনি একদা বৃন্দাবনে যাইয়া গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতদর্শনে কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া তথায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। তিন দিন কিছু খাওয়া হয় নাই, তথাপি দৈহিক কোন কষ্ট হয় নাই, শতদলের মত মুখখানি প্রেমে ঢলঢল করিতেছে। সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণ পরম সুন্দর একটি কিশোরবয়স্ক বালক এক ভাঁড় দুধ মাথায় করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি এই দুগ্ধ পান করিয়া তৃপ্ত হউন। সম্মুখে ঐ ঝরনার জল—উহাতে ভাণ্ডটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিবেন,—আমি ক্ষণিক পরে আসিয়া লইয়া যাইব।" মাধবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে তোমাকে এই দুধ দিয়া পাঠাইয়াছে?" বালক বলিল, "ব্রজমায়েরা তোমার উপবাসের কথা জানেন, তাঁহারাই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, এখানে যত সাধুসন্ন্যাসী আসেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের কাছে আহার্য্য ভিক্ষা করেন, কেহ যব, ছাতু, দুগ্ধ, রুটি, কেহ বা ফল-মূল ভিক্ষা করেন, কিন্তু তুমি তাঁহাদের কাছে কিছুই চাও নাই। তাঁহারাই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যিনি কাহারও কাছে কিছু চান না, আমিই তাঁহার খাবার যোগাইয়া থাকি।" এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল, তাহার পরমসুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং সুন্দর রূপ সন্ন্যাসীর মন মুগ্ধ করিল।

মাধবেন্দ্র পুরী।

মাধব সেই দুগ্ধ পান করিলেন, তাহা অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু, ভাণ্ডটি ধুইয়া মুছিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় তপস্যায় বসিলেন। কৃষ্ণের করুণা-স্মরণে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। শেষরাত্রে তন্দ্রার অবস্থায় ধ্যানের বশে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই তরুণবয়স্ক বালক তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া, বড় মধুর তাঁহার মূর্ত্তি, কিন্তু বড় বিষণ্ণ! গদ্‌গদকণ্ঠে বালক যেন বলিতেছে, "মাধব! আমি বহুদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছি, মৃত্তিকার নীচে শীতাতপে আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে, এই প্রত্যাশায় আমি কত বর্ষ কাটাইয়া দিয়াছি—**কারণ জগতে তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, এরূপ কেহ আমাকে ভালবাসে না।**" এই বলিয়া স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া বালক অন্তর্হিত হইল। তখন গোবর্দ্ধনের শৃঙ্গে রাঙ্গা মাণিকের মত সূর্য্যকিরণের প্রথম ঝলক ঝিকিমিকি করিতেছিল—সন্ন্যাসী সাশ্রুনেত্রে বৃন্দাবনের পল্লীতে ছুটিলেন। বহু লোক কোদাল ও শাবল লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গোবর্দ্ধন পাহাড়ে ছুটিল। নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িয়া তাঁহারা এক বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি পাইলেন, এই গোপালমূর্ত্তি মাধবাচার্য্য বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করিলেন, তিনি বাঙ্গালী পুরোহিত আনিয়া সেই মূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই বালক তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন—"মাধব! বহুদিন ভূনিম্নে থাকিয়া আমার শরীরের তাপ দূর হয় নাই—উড়িষ্যাতে খুব উৎকৃষ্ট চন্দন আছে, তুমি যদি

তাহা আমার অঙ্গে লেপন কর, তবে এই জ্বালা জুড়াইবে। মাধব উড়িষ্যার অভিমুখে চলিলেন, তখন পথে রাজায় রাজায় বিরোধ, পথ অতি দুর্গম ও বিপদ্‌সঙ্কুল। মাধবের মাত্র কটিবাস সম্বল, বিপদ্ সম্পদ্ তাঁহার জ্ঞান নাই—তিনি রেমুনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ-বিগ্রহ দর্শন করিলেন, এই বিগ্রহকে ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়—গোপীনাথের ক্ষীরভোগ অতি প্রসিদ্ধ। মাধব ভাবিলেন, "যদি এই ক্ষীরের একটু আস্বাদ পাইতাম তবে আমি বৃন্দাবনে যাইয়া গোপালকে এইরূপ ক্ষীরভোগ দিতে পারিতাম।" কিন্তু পরক্ষণেই মনে বিরাগ উপস্থিত হইল, "ছিঃ, আমার ক্ষীর খাইবার জন্য জিহ্বার লালসা হইয়াছে!" অনুতপ্ত হইয়া তিনি বাজারের অনতিদূরে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি।"

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। গোপীনাথ-মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা দেবতাকে ভোগ দেওয়ার পর আহারাদি সমাপ্ত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এবং দ্রুতগতিতে মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন—গোপীনাথের পৃষ্ঠে তাঁহার উত্তরীয়ের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বাঁধা আছে। তখন পাণ্ডার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "গোপীনাথ আমায় বলিতেছেন, 'আজ আমি ভোগ খাই নাই, আমা ভিন্ন যে জানে না সেই মাধব না খাইয়া বাজারে উপবাসী হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার জন্য আঁচলে কতকটা ক্ষীর রাখিয়াছি, মাধবকে ক্ষীর খাওয়াইয়া এস, তবে আমি ভোগ পাইব।'" সেই ক্ষীরখণ্ড হাতে করিয়া পাগলের মত পাণ্ডা বাজারে ছুটিলেন, "এমন ভাগ্যবান্ কে যাহার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনের পুণ্য কবে পাইব? কোন্ সন্ন্যাসীর নাম মাধব?" এই চীৎকারে মাধবের ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি ধরা দিলেন। ইহার মধ্যেই সমুদ্র-তরঙ্গের মত বিপুল জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমস্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে ক্ষীরপ্রসাদ পাইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সমস্ত রেমুনাবাসী লোক নৃত্য করিতে লাগিল—তাহারা তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। কিন্তু প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবদের চক্ষে অতি ঘৃণার বিষয়, এই প্রতিষ্ঠায় ভয় পাইয়া সন্ন্যাসী রেমুনা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন; রাত্রে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া বহুদূরে চলিয়া গেলেন।—এখনও বৃন্দাবনের পাণ্ডারা বাঙ্গলায় রচিত এই দুইটি চরণ আবৃত্তি করিয়া থাকে—"ধন্য ধন্য মহাভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী। যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি।" এই চুরির অখ্যাতি উক্ত বিগ্রহের এখনও যায় নাই—এখনও রেমুনার গোপীনাথ "ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ" নামে পরিচিত। পুরী হইতে চন্দন লইয়া মাধবেন্দ্র বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীপর্ব্বতে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রের ভক্তি অসাধারণ—আকাশে মেঘোদয় হইলেই তিনি কৃষ্ণভ্রমে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। "মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘদরশনমাত্র হয় অচেতন।" এই মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত শ্লোকগুলি চৈতন্য আগ্রহসহকারে আবৃত্তি করিতেন।

তন্মধ্যে একটি শ্লোক—"অয়ি দীন-দয়ার্দ্র-নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্"—চৈতন্যের অতি প্রিয় ছিল; তিনি বলিতেন, "এই শ্লোকচন্দ্র জগৎ আলোকিত করিতেছে, ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ বাড়ে, এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলোচনা করিলে ইহার উৎকর্ষ তেমনই উপলব্ধ হয়। রত্নগণমধ্যে শোভে কৌস্তুভমণি। রসকাব্যমধ্যে এই শ্লোক গণি।" (চৈ. চ. মধ্য, ৪র্থ পঃ।) এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সাশ্রুনেত্রে গদ্গদকণ্ঠে শুধু "অয়ি দীন, অয়ি দীন" বলিতে বলিতে আর বলিতে পারেন নাই, পুনরায় সংজ্ঞাহারা হইয়াছেন। নিত্যানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণের পর মাধবেন্দ্রের উদ্দাম ভক্তিদর্শনে বলিয়াছিলেন, "যত তীর্থ দর্শন করিয়াছি—তাহার সর্ব্বপ্রধান এই মাধবেন্দ্র-পুরী-সঙ্গমস্থান, তুমি সর্ব্বতীর্থের সার, যেহেতু তোমার মধ্যে যেরূপ আর কোথাও এরূপ কৃষ্ণভক্তির বিকাশ দেখিতে পাই না। তীর্থগুলি পড়িয়া আছে—সিংহাসন শূন্য, কোথাও ঠাকুরকে পাইলাম না।" তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন—কেহ বলিতেছেন, "তুমি গৌড়ে ফিরিয়া যাও, সেইখানে কৃষ্ণের দর্শন পাইবে, নবদ্বীপে তাঁহার লীলা দেখিবে।" এই বাণী কোন দুর্জ্ঞেয় অলক্ষ্য শক্তিতে তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে টানিয়া আনিল।

মাধবেন্দ্র পুরীই ভক্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—ইঁহার উপাধি ছিল "ভক্তিচন্দ্রোদয়।" ইঁহার স্থাপিত গোপালের অদৃষ্ট নানারূপ বিপদ্জালে জড়িত। বজ্রনামক কোন ব্যক্তি এই বিগ্রহ গোবর্দ্ধনে স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা উঁহাকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছে, এই সংবাদে ইঁহার মন্দিরের পরবর্ত্তী এক মালিক ইঁহাকে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া পালাইয়া যান, তথা হইতে মাধবেন্দ্র ইঁহাকে উদ্ধার করিয়া দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে ইঁহার সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান। সেখানে পুনরায় মুসলমানেরা হানা দেয়, তথায় একমাস কাল ইনি বিট্ঠলেশ্বরের গৃহে বাস করেন, তৎপরে বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর ইনি এখন জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মাধবেন্দ্র পুরী মহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্ব্বে বা পরে স্বর্গগত হন, অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন—ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, কেশবভারতী ও ঈশ্বর পুরী প্রধান। এই বৈষ্ণবচক্র শেষে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াছিল।

চৈতন্যের নামের সঙ্গে নিত্যানন্দের ন্যায় আর একজনের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, ইনি **অদ্বৈতাচার্য্য**। ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর নগরে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্য হইতে ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন। রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়াল ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। (যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা, গৌড়ের বাৎসাহে মারি নিজে হৈল রাজা—অদ্বৈতপ্রকাশ।) লাউয়ের রাজা কৃষ্ণদাসের সভায় অদ্বৈতের পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন মন্ত্রী ছিলেন। উত্তরকালে এই কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা লইয়া "বাল্যলীলাসূত্র" নামক একখানি অদ্বৈতজীবন সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। কথিত আছে অদ্বৈত লোকের নাস্তিকতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত অন্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, সেই প্রার্থনার ফলে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। শান্তিপুরের শান্ত্যাচার্য্য নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিতের

নিকট পাঠ সমাপন করিয়া ইনি শান্তিপুরেই উপনিবিষ্ট হন। ইনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে ইহার রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকার নাম ছিল "উপকারিকা।" মুসলমান হরিদাসের সঙ্গে ইহার একান্ত অন্তরঙ্গতা ছিল; ইহার দুই স্ত্রী সীতা ও শ্রী বৈষ্ণব-সমাজে সুবিদিতা। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্য একবার শান্তিপুরে ইহার বাড়ীতে যাইয়া "উপকারিকায়," দশদিন আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন,—যখন তিনি শান্তিপুর ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "তুমি নিজেই যদি এরূপ ব্যাকুল হও, তবে আমার বৃদ্ধ মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?" কথিত আছে একদা জ্ঞানের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়াতে ভক্তিবাদীরা পুরীতে চৈতন্যের নিকট ইহার কুৎসা করিয়াছিলেন। চৈতন্য চিঠি লিখিয়া উত্তর আনাইয়া দেখাইলেন—ইনি যে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন, শুষ্ক জ্ঞানবাদ গ্রহণ করেন নাই। অদ্বৈতের টোলে বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের নানাস্থল হইতে ছাত্র পড়িতে আসিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে, তাঁহার প্রেমের ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এক মহারাষ্ট্রীয় শিষ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান। "অদ্বৈতাচার্য্য" তাঁহার উপাধি,—নাম ছিল—কমলাকর ভট্টাচার্য্য। শান্তিপুরে অদ্বৈতের বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে ইহার জন্ম এবং প্রেমবিলাসের মতে ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু। ঈশান নাগরকৃত অদ্বৈত-প্রকাশে ইহার মৃত্যু ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

চৈতন্যের সহচর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ ছাড়া আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা অল্পসংখ্যক কয়েকজনের উল্লেখ করিব—শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, শ্রীবাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, হরিদাস, প্রতাপরুদ্র, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, বাসু ঘোষ, লোকনাথ, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, রামানন্দ রায় এবং উদ্ধরণ দত্ত।

নরহরি সরকার।

নরহরি সরকার শ্রীখণ্ড গ্রামের পদ্মদাসবংশীয়। পদ্মদাস বল্লালসেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ইহার আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী বালিনছি গ্রামে; উত্তরকালে ইহারা শ্রীখণ্ড, মৌড়েশ্বর ও অপরাপর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের এক প্রধান শাখা—নীলাম্বর, দিগম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার অনুমান ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের এক বিস্তৃত স্থানের অধিকার পাইয়া ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে বাস করেন। অধ্যাপক ডাঃ তমোনাশ দাশ-গুপ্ত এই বংশের বংশধর। নরহরির পিতার নাম নারায়ণ, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ হুসেন সাহার গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নরহরি ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যদেবের গণ্ডীতে পা দিবার পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লিখিয়া কবিযশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার একটি পদ এইরূপ—"আঙ্গিনায় রহিল আমার এই হিয়ার হেম হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার। রোপিনু মল্লিকা নিজকরে, গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে···। এ বনে আসিতে তারে কইও। নরহরি ক'র এই কাম, সে সময়ে কাণে শুনাও কৃষ্ণনাম।" ইহা দশম দশা অর্থাৎ অন্তিম অবস্থায়

রাধার উক্তি। চৈতন্যের প্রতি অনুরাগ হওয়ার পরে, তিনি আর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করেন নাই, সমস্ত পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ে রচনা করিয়াছেন। এই সকল পদে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়া সহচরদিগকে গোপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; এই গোপীভাবের ভজনা চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের ভাল লাগে নাই—সে কথা তিনি নরহরির নাম উল্লেখ না করিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। কিন্তু নরহরি আর একটি কাজ করিয়াছেন, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিল—ইনি শাস্ত্রবিধিমতে চৈতন্যপূজার মন্ত্র রচনা করিয়াছেন—সেই বিধি সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। নরহরিরচিত গৌরাঙ্গলীলার বহু পদ আছে—তন্মধ্যে জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার গৌরলীলাতরঙ্গিণীতে প্রায় একশত গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরির বংশধরেরা শ্রীখণ্ডে "বৈষ্ণব গোঁসাই" বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর মধ্যে বহু শিষ্য আছে। নরহরি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। চৈতন্য নরহরিকে এত ভালবাসিতেন যে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সময়ে প্রলাপের মধ্যে পর্য্যন্ত তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। "কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। হরিনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি।" নরহরি-কৃত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে।

শ্রীবাস।

শ্রীবাস চৈতন্য হইতে অন্ততঃ ৪০ বৎসরের বড় ছিলেন, ইঁহার মাতা মালিনী দেবী শচীর বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, অদ্বৈত এবং শ্রীবাস একত্র হইয়া মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন, শ্রীনিধি (শ্রীকণ্ঠ), শ্রীরাম এবং শ্রীপতি। এই ব্রাহ্মণপরিবার সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণেরা সেলাই কাপড়—অর্থাৎ জামা প্রভৃতি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু সে সময়েও শ্রীবাসের বাড়ীতে একজন মুসলমান দরজি বারমাস নিযুক্ত ছিল। ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীবাস উদ্দামপ্রকৃতি ছিলেন—কুসঙ্গে মিশিতেন এবং উচ্ছৃঙ্খল হইবার পথে আসিয়াছিলেন। সেই বৎসর এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস, তুমি কি করিতেছ? তোমার আয়ু আর একবৎসর মাত্র আছে।" প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শ্রীবাস দেখিলেন স্বপ্নে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন এবং তিনিও তাঁহাকে সেই সতর্কতাসূচক উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তদবধি শ্রীবাসের সমস্ত আনন্দ ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান হইল। এমন সময়ে তিনি পথে এক টুকরা কাগজ কুড়াইয়া পাইলেন, তাহাতে বৃহন্নারদীয়পুরাণোক্ত এই শ্লোকটি লিখিত ছিল—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেরূপ একটি তৃণ পাইলেও তাহা আঁকড়াইয়া ধরে, তিনি ঐ শ্লোকটি সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর নাম জপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমশঃ তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার হইল। তাঁহার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল, যখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া তিনি ভক্তির আবেগে নাম কীর্ত্তন করিতেন, তখন তথায় ভিড় জমিয়া যাইত। দেবানন্দ পণ্ডিতের বাড়ী রোজ শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, শ্রীবাস ভক্তির উচ্ছ্বাসে চীৎকার

করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। এই অপরাধে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে একদিন সভা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; পণ্ডিত-সমাজে এই উচ্ছ্বাস ও ভাবুকতা, অনুমোদিত হয় নাই। যেদিন সর্ব্বপ্রথম শচী দেবীর গৃহে যাইয়া তিনি চৈতন্যের ভক্তি দেখিলেন, সেইদিন তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ইহার বহুপূর্ব্বে একদিন তিনি যথারীতি দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেইদিন সন্ন্যাসীর নির্দ্দিষ্ট একবৎসরের শেষ দিন, হঠাৎ তিনি মূর্চ্ছিত ও নিষ্পন্দ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সকলে তাঁহাকে বাহিরে লইয়া আসিল, এমন সময়ে কোথা হইতে সেই সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস উঠ, জগতে তোমার আরও অনেক কাজ করিবার আছে—তুমি নব জন্ম পাইলে।"

চৈতন্যের ভক্তি-লীলা প্রকাশ হইবার পরেই শ্রীবাসের বিস্তৃত কুন্দ-কুসুমাকীর্ণ আঙ্গিনায় রাত্রিকালে প্রত্যহ একটি বিশিষ্ট ভক্তদল লইয়া কীর্ত্তন হইত। গঙ্গাদাস পণ্ডিত বাহির দ্বারে পাহারা দিতেন, আর কোন লোক ঢুকিতে পারিতেন না। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আঙ্গিনায় যে লীলা হইত, তাহা দেবলীলা। সে লীলার কথা এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই। সেই আঙ্গিনা এখন গঙ্গাগর্ভে, কিন্তু অদূরবর্ত্তী একটা স্থানকে "শ্রীবাসের আঙ্গিনা" নাম দিয়া গোস্বামীরা এখনও সেই পবিত্র স্মৃতি বজায় রাখিয়াছেন। এই আঙ্গিনায় একদিন কীর্ত্তন হইতেছিল, তখন শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মারা যায়। কিন্তু শ্রীবাসের বাড়ীর মেয়েরা ফুকরিয়া কাঁদেন নাই। শ্রীবাস যথারীতি কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে, গলার স্বরে এবং ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। সংকীর্ত্তনের শেষে মৃত শিশুকে পোড়াইবার জন্য বাহির করা হইল, তখন চৈতন্য এবং তাঁহার সহচরগণ সেই দুর্ঘটনার কথা প্রথম জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন, "পুত্রশোক না জানিল যে আমার প্রেমে। হেন তব সঙ্গ মুই ত্যজিব কেমনে" (চৈ. ভা. মধ্য, ২৫ অ)। একদা পুরীতে চৈতন্য-সংকীর্ত্তনে শ্রীবাস মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গা ঠেলিয়া চৈতন্যের দিকে যাইতেছিলেন, তাহাতে রাজমন্ত্রী হরিচন্দন তাঁহাকে ভৎ্সনা করাতে তিনি মন্ত্রীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, মন্ত্রী ক্রুদ্ধ হওয়াতে রাজা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি রাগ করিও না, প্রভুর প্রতি উঁহার ভক্তির কণিকা প্রসাদ পাইলে আমরা ধন্য হইতাম।"

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইত; তিনি হরিদাস (মুসলমান) ও জাতিচ্যুত নিত্যানন্দকে দুইবৎসরকাল তাঁহার বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। এই কারণে ভট্টাচার্য্যগণ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করিতেন। হুসেন সাহার নৌসৈন্য আসিয়া যাহাতে শ্রীবাসের আঙ্গিনা ও গৃহাদি ধ্বংস করিয়া ফেলে, এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রও তাঁহারা করিতেছিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার পরিবারবর্গ চৈতন্যগতপ্রাণ ছিলেন, তাঁহারা ঐসকল কথা গ্রাহ্য করিতেন না। চৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন, "সপরিবারে করে তারা চৈতন্যের সেবা। শ্রীচৈতন্য বিনা নাহি মানে দেবীসেবা।" নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীবাসের কুমারহট্টে এক বিশাল প্রাসাদ ছিল,

তথায় ভগ্ন অট্টালিকা এখনও আছে। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীকেও যদি ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইতে হয়, তথাপি শ্রীবাসের সন্তানেরা দরিদ্র হইবেন না।" যখন চৈতন্য শিশু ছিলেন, তখন শ্রীবাস প্রবীণবয়স্ক, তিনি শিশু চৈতন্যকে প্রায়ই একাজ সেকাজ করিতে ফরমাইস দিতেন, একদিন চৈতন্যের হাত ধরিয়া তিনি ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন, "কোথায় চলেছ উদ্ধতের শিরোমণি।" চৈতন্য অবশ্য কোন অন্যায় কার্য্যের দিকে অভিযান করিতেছিলেন। শ্রীবাস অনুমান ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য নবদ্বীপে যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীবাস নারদ সাজিয়া তাঁহার স্বরলহরীতে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়াছিলেন।

হরিদাসকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের পুত্র প্রমাণ করিতে চাহিয়া তাঁহার পিতামাতার নাম-ধাম সমস্ত কল্পনা করিয়াছেন, তিনি মুসলমানের গৃহে পালিত এইজন্য "যবন হরিদাস" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, এই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। এমন কি প্রাচীন লেখক জয়ানন্দও এই মত প্রচার করিয়াছেন। পরিণামে হরিদাস ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হন, এমন কি বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হন। মহাপ্রভুর বিয়োগের পর হিন্দুয়ানী ও জাতিভেদ আবার উদার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই জন্যই এই গল্পের উৎপত্তি, আমরা এই দেশের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আরো অনেক জানি। যখনই কোন মুসলমান বা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ক্ষমতাশালী হইয়া উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, তখনই এই সকল গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে। কুচবেহার, বনবিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এইরূপ প্রচেষ্টার উদাহরণ আছে। সুতরাং হরিদাস এ বিষয়ে একা নহেন। বৈষ্ণব ইতিহাসে অলৌকিক অংশ বাদ দিলে চৈতন্যভাগবতের তুল্য বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক আর নাই। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুস্তক-খানিও নিত্যানন্দের প্রেরণা ও তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশাদির ফলে রচিত হইয়াছিল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুইজন একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বহুদিন একগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় চৈতন্যভাগবতের প্রমাণই সর্ব্বথা গ্রাহ্য। চৈতন্যভাগবত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, কাজি হরিদাসকে বলিতেছেন, "তুমি বহুভাগ্যে মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার পক্ষে কাফেরদের সঙ্গে মেশার মত অপরাধ আর নাই।" তিনি যদি ব্রাহ্মণের পুত্র হইতেন, তাহা হইলে কাজি এবং অপরাপর মুসলমানের তাঁহার প্রতি এরূপ জাতক্রোধ হইতে পারিত না। চৈতন্য-ভাগবত কিংবা চৈতন্য-চরিতামৃত এই দুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হরিদাসের ব্রাহ্মণকুলে জন্মিবার গল্প নাই। হরিদাসের পিতার নাম মলয় কাজি, অম্বরা অঞ্চলে ইঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল। যশোহর জেলার বনগ্রামের নিকট বূঢ়ন পল্লীতে হরিদাসের জন্ম হয়। ১৪৬৪ খৃঃ অব্দে শান্তিপুরে আসিয়া ইনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন এবং অদ্বৈত কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। একজন মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদে ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং ফুলিয়া গ্রামের গোরাই কাজি এবং আরও বার জন কাজি একত্র হইয়া হরিদাসের বিচার করেন। যদি হরিনাম ত্যাগ না করেন

"হরিদাস।"

তরে তাঁহাকে এক একটি করিয়া ২২ বাজারে দাঁড় করাইয়া বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এই আদেশ প্রচারিত হয়; উদ্দেশ্য—যেন এই শাস্তির ভীষণতা মুসলমানসমাজে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়। এই বেত্রাঘাতের ফলে হরিদাস মৃতপ্রায় হইলে তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বেনেপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ মুসলমানদিগের শিক্ষামত ইহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। যে গুম্ফায় বসিয়া হরিদাস তপস্যা করিতেন, সেইখানে তিনি এক পরমা সুন্দরী গণিকাকে পাঠাইয়া দেন। হরিদাসের নিকট গণিকা উপযাচিকা হইয়া প্রণয় প্রার্থনা করে। তিনি উত্তরে বলেন, "বেশ, আমি জপ শেষ করিয়া লই, শেষে তোমার কথা শুনিব।" সন্ধ্যা হইতে জপ সুরু করিয়া সেই জপ প্রভাতে শেষ হয়। কারণ তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। প্রভাত হওয়ার পরে তিনি গণিকাকে বলিলেন, "কাল আসিও।" কারণ প্রাতঃকাল হইতে বহু ভক্ত তাঁহার দর্শনকামী হইয়া আসিয়া গুম্ফায় ভিড় করিয়াছিল। পরদিন এবং তার পরদিনও সেইরূপ;—জপ সাঙ্গ হইতে সারারাত্রি কাটিয়া যায়—গণিকা কোন সুবিধা পাইল না। তাহার চক্ষে আর একটি জগৎ প্রকাশিত হইল, সেই ভক্তিরাজ্যের দেবোপম ইন্দ্রিয়জয়ী সংযমী পুরুষের হরিনামের প্রতি অনুরাগ, গলদশ্রু চক্ষু এবং সমাধির প্রশান্তি দেখিয়া সেই রমণী দৈহিক সৌন্দর্য্য একান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। হরিদাসের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

পুরীতে যথাকালে চৈতন্যদেব প্রত্যহ হরিদাসকে দেখিতে তাঁহার নিভৃত আশ্রমে যাইতেন। ·এই আশ্রমে কতকদিন সনাতন বাস করিয়াছিলেন। সনাতন হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, "এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা সে পথে চলেন না, আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিয়া নিজেরা ধ্যান-ধারণায় প্রমত্ত আছেন, কিন্তু এমন লোকতো তোমার মত দেখিলাম না, যিনি ধর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং স্বয়ং ধর্ম্মের পথে অটল, যিনি একাধারে সন্ন্যাসী ও জগতের হিতে রত।" (চৈ. চ. অন্ত্য, ৪র্থ অ.) চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, "তোমার চিন্তাগুলি গঙ্গাধারার ন্যায় পবিত্র, তোমার আত্মা নিয়ত তাহাতে অবগাহন করে। ধর্ম্মের যে সকল শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান সকলে করিয়া থাকে, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্যই তদ্রূপ পবিত্র। তোমার নিত্য আচরিত আদর্শ বেদপাঠের পুণ্যময়। জগতে তোমার মত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব?"

হরিদাস একদা চৈতন্যদেবকে বলিলেন—"আমার এ কি হইল? আমি নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করিয়া থাকি, কিন্তু এখন দেহে ক্লান্তি আসিয়াছে, সংকল্পিত নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" উত্তরে চৈতন্যদেব বলিলেন, "এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, এত নাম জপ করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজে পাবন, নামজপে তোমার পাবনী শক্তি আর কি বাড়াইবে!" ১৫১০-১১ খৃষ্টাব্দে হরিদাস দেহত্যাগ করেন। তখন চৈতন্যদেব তাঁহার সম্মুখে ছিলেন, তিনি তাঁহার সমস্ত উচ্চ ব্রাহ্মণকুলজাত সহচরদিগকে মুমূর্ষু হরিদাসের পাদোদক সেবন করাইলেন এবং তাঁহার সমাধির জন্য নিজ হস্তে প্রথম মাটী খুঁড়িলেন। পুরীতে সেই

সমাধিস্থানটি আছে, তথায় যে বকুলবৃক্ষনিম্নে বসিয়া হরিদাস জপ করিতেন, সেই বৃক্ষটি এখনও আছে, উহার কাণ্ড নাই, স্থূল ত্বকের উপর গাছটি দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় ৪৫০ বৎসরের বৃক্ষটি দেখিলেই তাহার প্রাচীনত্ব প্রতীয়মান হইবে। আমি এমন গাছ আর দেখি নাই।

হরিদাস বৈষ্ণব-সমাজে যে আদর, শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। এই মুসলমান সাধু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিতেন, এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিদায় প্রাপ্ত হইতেন। মৃত্যুকালে হরিদাসের বয়স কিঞ্চিন্ন্যূন ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

লোকনাথ গোস্বামী।

লোকনাথ গোস্বামী চৈতন্যের সতীর্থ ছিলেন। ইঁহার পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী যশোর জেলায় তালগড়িয়া গ্রামের অধিবাসী, ইঁহার মাতার নাম সীতা। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যখন চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন ইনি চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্য ইঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দাবনতীর্থ লুপ্তগৌরব হইয়া একটা অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, এই তীর্থকে পুনরায় পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চৈতন্য অত্যন্ত প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তদনুসারে রূপ, সনাতন, ভূগর্ভ ও লোকনাথকে তিনি বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। যাত্রাকালে লোকনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমার মুখদর্শনের ন্যায় তোমার সঙ্গলাভের ন্যায়—সুখ আমার নাই—তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া তুমি আমাকে এখানে পাঠাইলে" (প্রেমবিলাস); চৈতন্যদেব বলিলেন—"তোমার ও আমার ভাগ্যে বিধাতা সংসারের সুখ লেখেন নাই।" যখন লোকনাথ বৃন্দাবন গমন করেন, তখন পথ অতীব বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বাদসাহদের লড়াই চলিতেছিল। ভূগর্ভ ও লোকনাথ তাজপুরের পথ ধরিয়া পূর্ণিয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে লক্ষ্ণৌ দিয়া নবদ্বীপ হইতে ২৩ দিন ভ্রমণের পর তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন। লোকনাথ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে যাত্রা শুনিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, পথে শুনিলেন তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন; বৃন্দাবনে গিয়া শুনিলেন, তিনি তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আর লোকনাথের দেখা হয় নাই; বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় তাঁহার আসা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, কারণ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকনাথের মত নীরব কর্ম্মী এবং নির্লোভ সাধু বৈষ্ণব ইতিহাসে খুব বেশী নাই। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যচরিতামৃত লেখায় অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিরাজকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার পুস্তকে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে পারিবেন না। তিনি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, এজন্য কোন শিষ্য গ্রহণ করেন নাই। শেষকালে নরোত্তমের গভীর অনুরাগ, দৈন্য ও মিনতি এড়াইতে না পারিয়া সেই একটি মাত্র লোককে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। লোকনাথ দীর্ঘজীবন বৃন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার স্মৃতি এখনও বিশেষভাবে পূজিত।

দাক্ষিণাত্যের কোন রাজকুলে **রূপ, সনাতন ও অনুপম** (অপর নাম বল্লভ)

এই তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের অবস্থার অবনতি হওয়াতে ইহারা ইহাদের পিতৃবন্ধু বাঙ্গলার পাঠান নৃপতিদিগের সভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। সনাতন ছিলেন পরম পণ্ডিত, সংস্কৃত, পারসী ও আরবীতে তাঁহার মত সুপণ্ডিত সেকালে দুর্লভ ছিল। রূপের অসামান্য কবিত্বশক্তি ছিল এবং তিনিও নানাশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। অধিকন্তু রূপের হাতের লেখা ঠিক মুক্তার মত ছিল। চৈতন্য কতবার তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির প্রশংসা করিয়া বলিতেন, "রূপের আখর যেন মুকুতার পাঁতি।" দুই ভ্রাতাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেও কতকটা মুসলমান-ধর্ম্মানুরাগী এবং আচার-ব্যবহারে ঠিক মুসলমানের মত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা হিন্দু নাম ত্যাগ করিয়া মুসলমান উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী, এবং রূপ সম্রাটের লেখা-পড়ার দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। সনাতনের উপাধি ছিল "সাকর মল্লিক" এবং রূপ "দবির খাস" নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাদের হিন্দু নাম ছিল অমর ও সন্তোষ। তৃতীয় ভ্রাতা অনুপম একটি মাত্র পুত্র (জীব গোস্বামী) রাখিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলী নগরে উপস্থিত হন, তখন রূপ ও সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয় ভ্রাতারই জীবনে এই স্মরণীয় দিনে যে মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের একটা গুরুতর ঘটনা। চৈতন্য সনাতনের সঙ্গে আলাপ করিয়া মুগ্ধ হন, যদিও সেই দিনই সনাতন তাঁহাকে মনুষ্য-দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এদিকে রামকেলীতে চৈতন্যদর্শনের জন্য লক্ষাধিক লোকের ভিড় হওয়াতে হুসেন সাহ কেশব ক্ষেত্রী নামক এক রাজকর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। একজন তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য এত লোক জমিয়াছে কেন—এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ জানিবার ভার কেশবের উপর ছিল। কেশব ফিরিয়া গেলে হুসেন সাহ তাঁহাকে চৈতন্যসম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট্ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে চৈতন্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সনাতন চৈতন্যকে বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, তীর্থদর্শনে যাইবেন, অথচ সহস্র সহস্র লোক উৎসবানন্দ করিয়া আপনার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে—মনে হইতেছে যেন কোন রাজাধিরাজ সমারোহপূর্ব্বক যাইতেছেন, ইহা আপনার যোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ হুসেন সাহ অতি খামখেয়ালী সম্রাট্, সেদিনও উড়িস্যায় কতকগুলি দেবমন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। যদিও এখন আপনার উপর তাঁহার ভাল ভাব—কিন্তু ইহার ভাবান্তর হইতে এক মুহূর্ত্ত লাগে না। এত সমারোহ যদি তিনি প্রীতির চক্ষে না দেখেন এবং কেহ যদি কুপরামর্শ দেয়, তবে আপনার প্রতি অত্যাচার হইতে পারে—সুতরাং আপনি ফিরিয়া যাউন।" চৈতন্যের সঙ্গে যে লক্ষাধিক লোক চলিয়াছিল, কীর্ত্তনানন্দে যে দিঙ্মণ্ডল নিরবধি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—চৈতন্যের সে দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না, অনেক সময়েই তিনি এ রাজ্যে থাকিয়াও অপররাজ্যে বাস করিতেন। সনাতনের কথায় তাঁহার এদিকে দৃষ্টি পড়িল, তিনি পুরী ফিরিয়া চলিলেন।

সনাতন ও রূপ।

যাইবার পূর্ব্বে তিনি সনাতনের "সাকর মল্লিক" নাম ঘুচাইয়া তাঁহার "সনাতন" নাম দিয়া গেলেন এবং "দবির খাস"কেও "রূপ" নামে পরিচিত করাইলেন। চৈতন্য বলিয়া গেলেন, যেন পুরীতে ইঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৌড়ে ফিরিয়া সেই রাত্রে রূপ রাজকার্য্যাবসানে স্বগৃহে শয়ন করিয়াছেন। মধ্যরাত্রে তাঁহার পায়ে একটা বিষাক্ত কীট দংশন করে। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে জাগাইয়া একটা আলো জ্বালিতে বলেন; ব্যস্তভাবে স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারে মোমবাতি হাতের কাছে না পাইয়া রূপের বহুমূল্য একটা পরিচ্ছদের মধ্যে আগুন ধরাইয়া ফেলেন। রূপ বলিলেন, "তুমি আমার এত দামের পোষাকটা নষ্ট করিলে?" স্ত্রী বলিলেন, "তোমার ইষ্ট ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা যেখানে, সেখানে এই ঘরবাড়ী, বহুমূল্য পোষাক আমার কাছে অতি তুচ্ছ কথা।" রূপ মনে ভাবিলেন, "ইহার প্রভুর সেবা ত এ সর্ব্বস্ব দিয়া করিতে প্রস্তুত! আমার প্রভুর সেবার জন্য আমি কি করিয়াছি বা করিতেছি? আমি তো ঘরবাড়ী-বিষয় লইয়াই আছি।" চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর তাঁহার হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে যে স্বর্গীয় প্রেমের চিঠি লিখিত হইয়াছিল, এই তুচ্ছ ঘটনায় তাহার বার্ত্তা উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার মনে পৌঁছিল। তিনি সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিপুল বিষয়ের এক-চতুর্থাংশ ব্রাহ্মণদিগকে, এক-চতুর্থাংশ দুঃখিদরিদ্রদিগকে, অপর দুই অংশের একাংশ পরিবারবর্গকে এবং অপরাংশ সনাতনকে লিখিয়া দিলেন; সঙ্গে একটুকরা কাগজে একটি শ্লোক সনাতনকে লিখিয়া গেলেন তাহা সর্ব্বত্র পরিচিত; প্রথম ছত্রটি এইরূপ " যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

রূপ পুরী আসিয়া চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিলেন—রূপ সংস্কৃতে যে দুইখানি নাটক লিখিতেছিলেন, তাহার সম্বন্ধে চৈতন্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। রূপ একই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও মথুরার কাহিনী লিখিতেছিলেন। চৈতন্য ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্য জড়াইতে নিষেধ করিয়া রূপের পরিকল্পিত উপাদানে দুইখানি নাটক লিখিতে উপদেশ দিলেন। তাহার ফলে আমরা বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব—মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যের কোহিনুরসদৃশ এই দুইখানি নাটক পাইয়াছি। ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্য বিচ্যুত হইবার পর হইতে কৃষ্ণলীলার এক নবভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথায়ও সেই রস প্রগাঢ়ভাবে আস্বাদিত হয় নাই।

রূপ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন, তন্মধ্যে দানকেলীকৌমুদী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনে ইনি যে ভাবে জীবনযাপন করেন, তাহা সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবন।

সনাতন রূপের চিঠিটুকু লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহারও মন হইতে বিষয়তৃষ্ণা দূর হইয়াছিল। চৈতন্যের দর্শনাবধি তিনিও বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় কোন সুযোগের সন্ধান লইয়া রাজসভায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে মন নাই, ক্রমে কয়েক দিন রাজসভায় উপস্থিত হন না। রাজার মনে সন্দেহ হইল, হয়ত রূপের মত ইনিও পালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার সঙ্গে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন; সনাতন স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "আপনি হয়ত কোন দেবমন্দির ভাঙ্গিবেন—হিন্দুর ধর্ম্মে হানা দিবেন, এমন কার্য্যের জন্য আমার সহায়তা চাহিবেন না।

আপনার অনেক মুসলমান মন্ত্রী আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও লইয়া যাউন।" হুসেন সাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। এদিকে সনাতনও রাজসভার কাজ প্রায়ই উপেক্ষা করেন, এবং সভায় উপস্থিত হন না। সম্রাট্ রাজবৈদ্য পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন, সত্যসত্য সনাতনের কোন অসুখ হইয়াছে কি না। ভিষক্ জানাইলেন, সনাতন দিব্য সুস্থ দেহে আছেন। হুসেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে এবার কারাগারে পাঠাইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গৌড় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ৭০০০৲ টাকা ঘুষ দিয়া সনাতনের আত্মীয়েরা কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলের নিকট হইতে সনাতনের মুক্তিলাভ করাইলেন। বন্দীরা গঙ্গায় স্নানার্থ মাঝে মাঝে নীত হইতেন। সেই সুযোগে সনাতন পলাইলেন, তাঁহার জন্য নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে মীর হাবুলও খুব সতর্ক অনুসন্ধানের একটা বাহ্যাড়ম্বর করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। ঈশান নামক একটি ভৃত্যের সঙ্গে সনাতন সন্ন্যাসীর বেশে গৌড় ছাড়িয়া পলাইলেন। ঈশান গোপনে ১৫টি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়াছিল। গঙ্গা পার হইয়া সনাতন পাত্র নামক একটি ছোট পাহাড়ের নিকট এক পল্লীতে জনৈক "ভূঁইয়ার" বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই ভূঁইয়ার অতিরিক্ত আপ্যায়ন ও ভদ্রতায় সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সঙ্গে কোন অর্থ আছে কিনা। ঈশান সেই ১৫টি মোহর তাঁহার হাতে দিল। তিনি উহা ভূঁইয়াকে দিলেন। ভূঁইয়া অকপটে বলিল, "ইহা দিয়া ভালই করিয়াছেন, নতুবা আজ রাত্রেই আমরা আপনাদিগকে হত্যা করিতাম।" দয়ার শিরোমণি ভূঁইয়া ঐ অর্থ হইতে একটি মোহর পথখরচের জন্য সনাতনকে ফিরাইয়া দিল। সনাতন উহা ঈশানকে দিয়া তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। সমগ্র বাঙ্গলা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কৌপীন পরিয়া একক ছুটিয়াছেন। পথে এক ময়দানে তিনি কতকগুলি মাটির ডেলা দিয়া শিয়রের বালিশ ও পাশবালিশ প্রস্তুত করিয়া শুইয়াছিলেন। জলের ঘাটের যাত্রী কোন মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, "সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিন্তু ভোগের অভ্যাস যায় নাই।" সনাতন বুঝিলেন, বহুদিনের অভ্যাস হইতে মুক্ত হওয়া অতি কঠিন। তিনি সেই মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিলেন। হাজিপুরে একটা খড়ের গাদার নীচে শীতের রাত্রে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী একটা বড় বাড়ী সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকণ্ঠ ভাড়া লইয়াছিলেন। হুসেন সাহ তাঁহাকে সেখান হইতে ঘোড়া কিনিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সনাতনের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন গৌড় রাজ্যের সামন্ত রাজারা যাঁহার নিত্য দ্বারস্থ থাকিতেন, সেই রাজচক্রবর্ত্তিসদৃশ মহামন্ত্রীর কটিতে কৌপীন-বাস।

পৌষমাসের শীতে তাঁহার ক্ষীণদেহ কাঁপিতেছে—নগ্নদেহ, অথচ মুখখানি প্রেমসরোবরের শতদলের মত আনন্দে ঢলঢল। শ্রীকণ্ঠ তাঁহাকে ফিরাইতে বহু চেষ্টা করিলেন, পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই দারুণ শীত নিবারণের জন্য শালদোশালা দিতে চাহিলেন, কিন্তু কুসুম হইতেও মৃদু এবং বজ্র হইতেও কঠোর এই লোকোত্তরগণের চরিত্র।

শ্রীকণ্ঠের বহু অনুনয়ে বাধ্য হইয়া তিনি তিনটাকা মূল্যের একখানি ভোট কম্বল গায়ে পরিতে স্বীকৃত হইলেন। সনাতন কাশীতে যাইয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শীতকাল, তবু সকল সন্ন্যাসীরই নগ্নদেহ, শীতবাত উপেক্ষা করিয়া লতাটির গায়ে শত শত ফুল ফোটে—চৈতন্য সেইরূপ ভক্তি-সরোবরের সরস পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া আছেন। সনাতনের লজ্জা বোধ হইল, কারণ "ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বার বার।" কম্বলখানি এক ভিক্ষুককে দিয়া সনাতন লজ্জার হাত এড়াইলেন। কাশীতে সনাতন চৈতন্যদেবকে বলিলেন, "আমার এই দেহ-মন আপনাকে সমর্পণ করিলাম।" কাশী হইতে রূপের সঙ্গে দেখা করিতে সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন, তথা হইতে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় পুনরায় পুরীর দিকে রওনা হইলেন। পথে ঝারিখণ্ডের বন, ছোট নাগপুর। জঙ্গলের পথে নিতান্ত অপরিষ্কার ডোবার জলে স্নান করার ফলে সনাতনের সোণার কান্তি ম্লান হইল। গা-ভরিয়া ফোড়া হইল—এই অবস্থায় পুরীতে আসিয়া তিনি হরিদাসের আশ্রমে অতিথি হইলেন। গা-ময় ফোড়া, তিনি চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু চৈতন্য তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া টানিয়া আনিয়া বাহির করিলেন এবং ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের শরীরের রক্ত-পুঁযে চৈতন্যের শরীর আপ্লুত হইল। সনাতন লজ্জিত হইলেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আষাঢ় মাসে জগন্নাথের রথযাত্রার সময়ে তিনি রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন—কারণ তিনি বিধর্ম্মী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীর ব্যাধিদুষ্ট। একদিন চৈতন্যের নিত্যসহচর জগদানন্দকে সনাতন তাঁহার কলঙ্কিত দেহস্পর্শে চৈতন্যের দেহের গ্লানি হইতেছে, এই কথা অতি দুঃখিত ভাবে বলিলেন। চৈতন্য যে সনাতনকে আলিঙ্গন করেন ইহা জগদানন্দের ভাল লাগিত না। জগদানন্দ বলিলেন, "আপনার মথুরায় যাওয়াই উচিত।"

সেদিন মহাপ্রভু সনাতনকে আবার টানিয়া আনিয়া আলিঙ্গন করাতে সনাতনের মুখ শুকাইয়া গেল। চৈতন্য বলিলেন, "তুমি জগন্নাথের রথের নীচে প্রাণত্যাগ করিবে? আত্মহত্যার পাপসঙ্কল্প করিয়াছ? তুমি তো কাশীতে তোমার দেহ-মন আমাকে দিয়াছ, এই দেহের উপর তোমার কোন অধিকার নাই।" এই বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করায় চৈতন্যের দেহ রক্তাক্ত হইল। সনাতন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। চৈতন্য বলিলেন, "তোমার দেহ মন্দির, উহার স্পর্শে আমার পাপ দূর হইল।" সনাতনকে মথুরা যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিনি জগদানন্দকে ভর্ৎসনা করিলেন। আর একদিন রাজপথ দিয়া না যাইয়া চৈতন্যের আহ্বানে সনাতন উত্তপ্ত বালুকার পথ দিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার পায়ে ফোস্‌কা পড়িয়াছিল। চৈতন্য বলিলেন, "রাজপথ দিয়া আস নাই কেন?" সনাতন বলিলেন, "ব্রাহ্মণদের হয়ত আপত্তি হইতে পারে।" চৈতন্য বলিলেন, "তোমার স্পর্শে দেবতারাও পবিত্র হইতে পারেন, তথাপি তুমি মন্দিরের আচার-ব্যবহারের প্রতি এরূপ সতর্ক, তোমার দৈন্য জগতে অতুল্য।" সনাতন চৈতন্যের উপদেশ লইয়া "হরিভক্তি-বিলাস" নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, ইহা এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির রচিত এই পুস্তক পাছে সমাজে গৃহীত না হয়, এজন্য এই পুস্তক সনাতনের ইচ্ছাক্রমে

গোপাল ভট্টের নামে চলিয়াছিল। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক এবং জীব গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থে এই পুস্তকের রচনাসম্বন্ধে সকল কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন। সনাতন বৃন্দাবনের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা। রূপ ও সনাতনের দুশ্চর তপস্যা সে অঞ্চলে সর্ব্বজনবিদিত, ভক্তমাল গ্রন্থে তাহা উল্লিখিত আছে। সম্রাট্ আকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং মহারাজ মানসিংহ বহুব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর যে মন্দির স্থাপন করেন, তৎসংলগ্ন প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ভক্ত রাজা তাঁহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে ঐ মন্দির রচনা করেন। রামদাস কাপুরি নামক বণিকের জাহাজ নদীর চড়ায় আটকাইয়া যায়, তিনি সনাতনের বিগ্রহ মদনমোহনের নিকট মানত করেন—জাহাজের উদ্ধার হইলে তিনি একলক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে উক্ত বিগ্রহের মন্দির স্থাপন করিবেন। বণিকের প্রতিশ্রুত অর্থে বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুইজন নগ্নদেহ সন্ন্যাসীর কৃপায় বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার হয় এবং উহা শত সৌধমালায় বিভূষিত হয়। চৈতন্য-চরিতামৃত-কার লিখিয়াছেন, দুই ভ্রাতার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। পাছে কোন স্থান-বিশেষের প্রতি আসক্তি জন্মে, এইজন্য "একৈক বৃক্ষের নীচে" এক রাত্রি শয়ন করিতেন, কৌপীন ও কম্বলমাত্র সম্বল ছিল, মুষ্টিভিক্ষা যথেষ্ট ছিল এবং দিনরাত্র কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও তৎসঙ্গে নর্ত্তন করিতেন। সনাতনরচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। রাজপুতনার অনেক রাজা সনাতনের শিষ্য হইয়াছিলেন, সে অঞ্চলে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। ভক্তমালে লিখিত আছে তিনি একটা পরশপাথর পাইয়া তাহা অস্পৃশ্য বলিয়া যমুনার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সম্রাট্ আকবর যমুনার জলে হাতী নামাইয়া তাহার খোঁজ করিয়াছিলেন (গ্রাউসের মথুরার ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। উত্তরকালে রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র **জীব গোস্বামী** বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ দাস।

ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অতি প্রাচীন কালেও ইহার খ্যাতি য়ুরোপ পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল। রোমানদিগের "গ্যাঙ্গা রিজিয়া" বোধ হয় এই সপ্তগ্রাম-অঞ্চল, সরস্বতী নদী শুকাইয়া যাওয়াতে এই নগর ধ্বংস পাইয়াছে। পুরাকালে কনোজের কোন রাজার সাত পুত্রের নামে এই গ্রামের নাম সপ্তগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। গৌড়ের পাঠান রাজার অধীন এক শাসনকর্ত্তা সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন। কিন্তু এই বাণিজ্যকেন্দ্রের বিপুল আয় থাকার দরুন শাসনকর্ত্তারা প্রায়ই প্রবল হইয়া গৌড়ের বিদ্রোহী হইতেন। এইজন্য বাদশাহ শাসনকর্ত্তা উঠাইয়া দিয়া সপ্তগ্রাম জমিদারীর মত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামক দুই ভ্রাতাকে ইজারা দিয়াছিলেন। দুই ভ্রাতাকে গৌড়ে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত, ইহা ছাড়াও এই সম্পত্তির আয় অতি বিপুল ছিল। জাহাজের উপর যে কর স্থাপিত হইত তাহাও একটা বড় রকমের আয়ের পথ হইয়াছিল। রাজস্ব ছাড়াও দুই ভ্রাতা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বৎসরে নিজেরা পাইতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বারলক্ষ টাকা একটা সামান্য কথা ছিল না। হিরণ্যের কোন সন্তান ছিল না, গোবর্দ্ধনের পুত্র **রঘুনাথই** এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র

উত্তরাধিকারী ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উভয়েই সংস্কৃত, আরবী ও পার্শীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। গোবর্দ্ধনের মত দাতা এদেশে কেহ ছিল না এরূপ প্রবাদ আছে,—"মর্ত্তে গোবর্দ্ধন দাতা" (সংগীত-মাধব)। বলদেব আচার্য্য নামক এক শিক্ষকের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। বলদেব "যবন হরিদাসে"র প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং সর্ব্বদা চৈতন্যের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতেন। এই সময় হইতেই বালক রঘুনাথের মনে চৈতন্যের মূর্ত্তি একখানি দেবমূর্ত্তির ন্যায় অঙ্কিত হইয়া যায়। ১৫১০ খৃঃ অব্দে চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই বার্ত্তা তড়িদ্‌গতিতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজসভায় চৈতন্যের কথা প্রায়ই হইত, বালক রঘুনাথ গৃহের এককোণে বসিয়া সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া অশ্রুপাত করিতেন, তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে একান্ত উন্মনা হইয়া গেলেন, রাজপ্রাসাদ তাঁহার ভাল লাগিত না, একাকী নির্জ্জনে থাকিতেন। পিতা ও খুল্লতাত আশঙ্কা করিলেন, ছেলেটি পাছে চৈতন্যের মত পাগল হইয়া সংসার ত্যাগ করে,—এইজন্য তাঁহারা কয়েকটি সৈনিক ও দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কাছে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিলেন। ব্রাহ্মণেরা গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যনীতি তাঁহাকে ভাল করিয়া শিখাইবেন—এই ভার তাঁহাদের উপর ছিল। চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর রঘু পিতাকে বলিলেন, তিনি চৈতন্যদেবকে দেখিতে যাইবেন। বাড়ীর সকলে প্রমাদ গণিলেন, এইবার বুঝি পাখী শিকল কাটিয়া বাহির হয়। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সহজে সম্মতি দিলেন না। কিন্তু রঘুনাথ বলিলেন, চৈতন্যকে দেখিতে না পাইলে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। ইঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন—উহা ভীতি-প্রদর্শন নহে, বালক সত্যসত্যই ঐরূপ কিছু করিতে পারে,—কারণ চৈতন্যের নাম শুনিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয় এবং তিনি স্নান-ভোজন একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য ও অপরাপর লোকজন সহ গোবর্দ্ধন রঘুনাথকে চৈতন্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; চৈতন্য তীব্রভাষায় তাঁহাকে গঞ্জনা দিয়া বলিলেন, "তুমি অকালে এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে না—আগে সংসারের কর্ত্তব্য অনাসক্ত হইয়া সম্পাদন কর—তবে সন্ন্যাসের যোগ্যতা জন্মিবে। এখন যে বৈরাগ্য দেখাইতেছ, তাহা মর্কট-বৈরাগ্য, তুমি গৃহে চলিয়া যাও এবং সমস্ত কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন কর।" রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গলার প্রতি পল্লী তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধানপূর্ব্বক পরমা সুন্দরী এক কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। পিতা ও পিতৃব্য দেখিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি সুবোধ ও শান্ত ছেলেটির মত সর্ব্বদা তাঁহাদের অধীন হইয়া বিষয়কর্ম্ম করিতেছেন। এই সময়ে সপ্তগ্রামের ভূতপূর্ব্ব মুসলমান শাসনকর্ত্তা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বাদশাহের হুজুরে জানাইল। বাদশাহ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া আনিবার জন্য ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা বাড়ী ছিলেন না—ফৌজগণ রঘুনাথকে ধরিয়া লইয়া গেল। বাদশাহ বলিলেন, "তোমার পিতা ও খুড়া সপ্তগ্রাম হইতে বহু অর্থ অর্জ্জন করে এবং আমাকে ফাঁকি দেয়। তুমি তাঁহারা কোথায় আছেন বলিয়া দেও, নতুবা ভীষণ শাস্তি পাইবে।" রঘুনাথের মুখে চোখে অপর এক রাজ্যের জ্যোতি, তাঁহার কণ্ঠস্বরে স্বর্গের মাধুর্য্য, কথায় অপূর্ব্ব

লালিত্য, চোখে বিশ্বপ্রেম—তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে বাদশাহের মন স্নেহরসে আর্দ্র হইল, তাঁহার দাড়ি বহিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল। কতকগুলি সামান্য সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই যে কঠোর কর্ম্মীর বেশ—ইহাতো রঘুনাথের নিতান্ত ছদ্মবেশ ছিল, ভিতরে ভিতরে তিনি অনাসক্ত যোগীর মত থাকিয়া চৈতন্যের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছিলেন। এই সময়ে রঘুনাথ পানিহাটী গ্রামে আসিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তিনমাসব্যাপী কীর্ত্তনানন্দে পানিহাটীর আকাশ নারদের বীণাভিনন্দিত বৈকুণ্ঠের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল। রঘুনাথ বুঝিলেন—রাজপ্রাসাদ তাঁহার স্থান নহে, ইহাই তাঁহার প্রকৃত নিকেতন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "চোরা তোকে এবার ধরে ফেলেছি। তোকে দণ্ড দিব।" সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়াও আসক্তির ভান দেখাইতেছিলেন, এই মিথ্যাচরণের জন্য তিনি 'চোরা' উপাধি পাইয়াছিলেন। যাহা হউক রঘুনাথ দণ্ডগ্রহণ করিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন, এই উপলক্ষে তাঁহার বহু ব্যয় হইয়াছিল। তৃপ্তির সহিত ভোজন ছাড়া প্রধান বৈষ্ণবেরা সকলেই যথাযোগ্য দক্ষিণা পাইয়াছিলেন,—নিত্যানন্দের জন্য সাত তোলা সোণা এবং একশত টাকা প্রণামীর ব্যবস্থা হইল। নিত্যানন্দ রাঘবপণ্ডিতের গৃহে ছিলেন, তিনি পাইলেন একশত টাকা প্রণামী ও দুইতোলা সোণা, ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবকে তিনি ২০৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। এই উৎসবের নাম "দণ্ড-মহোৎসব।" অদ্যাবধি প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতার সন্নিহিত পানিহাটী গ্রামে এই উৎসব হইয়া থাকে।

এবার গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ পুনরায় ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন, তিনি অন্তঃপুরে শোওয়া ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার আহার ও নিদ্রা একেবারে গেল। বহুসৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপ্রাসাদে তিনি বন্দীর মত হইয়া রহিলেন। তাঁহার মাতা একদিন গোবর্দ্ধনকে বলিয়াছিলেন, "ইহাকে একটা থামের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখ, তবে পলাইতে পারিবে না।" গোবর্দ্ধন বলিলেন, "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম, এসকল বাঁধিতে নারিল যার মন,—দড়ির বাঁধনে তাঁরে বাঁধিব কেমনে?" সতর্ক পাহারার চোখ এড়াইয়া কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য্যকে ফাঁকি দিয়া ১৯ বৎসর বয়সে রঘুনাথ গৃহ ত্যাগ করিলেন, তিনি একদিনে শুধু-পায়ে ত্রিশ মাইল হাঁটিয়া রাত্রে একটা পরিত্যক্ত গরুর গোয়ালে কাটাইলেন। তারপরে যাত্রাভোগ হইয়া শারণে আসিলেন। পুরীতে আসিতে তাঁহার ১২ দিন লাগিয়াছিল। তখন কাশী মিত্রের বাড়ীতে চৈতন্য ছিলেন। মুকুন্দ দত্ত অঙ্গুলিদ্বারা রঘুনাথকে দেখাইয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন, "ঐ দেখুন, আমাদের রঘু আসিয়াছে, আহা! কত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে!" চৈতন্য স্বরূপ-দামোদরের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার দিলেন। তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত দশজন অশ্বারোহী সৈন্য ও অন্যান্য লোকজন পাঠাইয়া শিবানন্দ সেনের নিকট সন্ধান লইয়া গিয়াছিলেন। তখনও শিবানন্দের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ হয় নাই। অবশেষে দুঃখিত অন্তঃকরণে পুরীতে আছেন জানিয়া দুর্ভাগ্য বালকের হাত-খরচের জন্য তাঁহারা সামান্য ৪০০৲

টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে পাছে ব্যথা লাগে, এইজন্য তিনি সেই টাকা ফিরাইয়া না দিয়া তাহা হইতে মাসিক ৵০ আনা গ্রহণ করিয়া সেই ব্যয়ে বৎসরে একদিন চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। দুই বৎসর এইরূপে চালাইয়া সেই অর্থ হইতে আর কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। চৈতন্য তারপর একদিন স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করেন, "রঘু আর আমাকে নিমন্ত্রণ করে না কেন?" স্বরূপ বলিলেন, "রঘু বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করা পাপ মনে করে।" চৈতন্য এই কথায় মহাসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রঘুনাথ যে কৃচ্ছ্র করিতেন তাহা অসাধারণ। পুরীর মন্দিরের দ্বারে দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া এক একটি তণ্ডুল ভিক্ষা-স্বরূপ এক এক জনের কাছে গ্রহণপূর্ব্বক যে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, তাহাই একবার রাঁধিয়া খাইতেন। অবশেষে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। মন্দিরের বাহিরে যে সমস্ত পচা প্রসাদ পাণ্ডারা ফেলিয়া দিত, গাভীগণ তাহা খাইয়া গেলে— তাহারই এক মুষ্টি বারংবার পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া তিনি দিনান্তে একবার খাইতেন, প্রায় সবদিনই উপবাসে যাইত। উপবাস এবং অল্পাহারে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম প্রবল হয়—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই বিনয়নম্র মধুরপ্রকৃতি সুন্দর কুমার চৈতন্যদেবের কাছে আসিতে লজ্জিত ও ভীত হইতেন। একদিন তবু স্বরূপ-দামোদরকে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি চৈতন্যের শ্রীমুখের উপদেশ শুনিতে চান। চৈতন্য তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ খবর জানি না। নিজ খেয়ালে চলি, এসকল বিষয়ে স্বরূপ-দামোদরই বিশেষ প্রাজ্ঞ, সেই তোমাকে শিক্ষা দিতেছে—তথাপি যদি আমার কথা শুনিতে চাও, 'গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'" ১৯ বৎসর বয়সে রঘুনাথ পুরীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার যখন ৩৫ বৎসর বয়স তখন মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। একদিন রঘুনাথ চৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "আর কোন্ ঠাকুরের কথা আমাকে বলিতেছেন? আপনি ছাড়া আমার আর ঠাকুর নাই।" ইহার পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া দীর্ঘকাল তথায় যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে। মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা একটি কবিতায় তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি জীবাত্মার কৃষ্ণাভিসারে যাত্রার গুণরাশি ব্রজনায়িকাতে আরোপ করিয়াছেন,—"রাধা তারুণ্যামৃতে স্নান করিয়া লাবণ্যামৃতের তিলক পরিয়াছেন, তাঁহার সলজ্জভঙ্গিমা নীলবাসের ন্যায় অঙ্গে ঔজ্জ্বল্য সাধন করিতেছে, তাঁহার প্রিয়ের উপর একান্ত-নির্ভরতা এবং সহচরীদের প্রেম অঙ্গের সুরভির কার্য্য করিতেছে, তাঁহার একাগ্রতা দীপস্বরূপ অভিসারের পথ দেখাইতেছে।" ইত্যাদিরূপ ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের খোসা ও বহিরাবরণ বাদ দিয়া তিনি প্রেমের আধ্যাত্মিক রসটি গ্রহণ করিয়াছেন। (মৎকৃত "Chaitanya and his Companions" পুস্তক দ্রষ্টব্য।) তাঁহার সব পুস্তকগুলিই ভক্তির ব্যাখ্যা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান তিনি দিয়াছিলেন। জন্ম ১৪৯৮ খৃঃ, মৃত্যু ৮৬ বৎসরে, ১৫৮৪ খৃঃ।

চৈতন্যের পরিকরদের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, **রামানন্দ রায়।** ইনি উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ইহার উপাধি ছিল 'রাজা'। ইহার পিতার নাম ভবানন্দ রায় এবং চারি ভ্রাতার নাম গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ। ইহাদের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে বিদ্যানগরে। ইনি "জগন্নাথবল্লভ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের লেখক। যে কয়েকখানি পুস্তকের শ্লোক চৈতন্যদেব দিনরাত গান করিতেন—তন্মধ্যে 'রায়ের নাটকগীতি' একখানি। গোদাবরীতীরে চৈতন্য ইহাকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া তথাকার ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া বলিতেছিলেন, "এই না ব্রাহ্মণ তেজে দেখি সূর্য্যসম। শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।" বিদ্যানগরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দের দশদিন-ব্যাপক যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা বিবৃত হইয়াছিল। চৈতন্যের অনুজ্ঞাক্রমে রামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথাগুলি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ সাধ্য ভক্তি, বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক এই ব্যাখ্যার প্রমাণ। সাধকের এতদপেক্ষা উন্নত পথ গীতার নবম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকের প্রমাণ-দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। তৎপরের অবস্থায় প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১৩শ স্কন্ধ, ৩২শ শ্লোক এবং গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোক, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোক-দ্বারা প্রমাণিত। তৎপরের অবস্থা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে প্রমাণিত এই অবস্থায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলভিত্তি পঞ্চতত্ত্বের কথা—প্রথম দাস্য (প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক)। তৎপরে সখ্য (ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক), ইহার পর বাৎসল্য (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ১৮শ অঃ, ৩৭শ শ্লোক)। তৎপরে গোপীদের মাধুর্য্য (গোবিন্দ-লীলামৃত, ১০ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক এবং ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ৩৭শ অঃ, ৫৪শ শ্লোক এবং ভাঃ ৩৭শ অঃ, ১৯শ শ্লোক এবং ৪০শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক। রামানন্দকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চৈতন্যদেব সর্ব্বশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক অবশেষে স্বয়ং রাধিকার মহাভাব প্রমাণ করিবার জন্য ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৫শ অঃ, ৯ম শ্লোক এবং ১১শ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, কোন ব্যক্তি একটা হারানো পয়সা খুঁজিতে যাইয়া যেরূপ মাটী খুঁড়িয়া হীরামুক্তার ভাণ্ডার আবিষ্কার করে, চৈতন্যের সঙ্গে সাধারণ ভক্তির সম্বন্ধে আলাপ করিতে যাইয়া রামানন্দ সেইরূপ "রাগানুগা"র উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ সেদিন চৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রেমাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণবজগতে সুবিদিত "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেলা। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল। না সে রমণ না হাম রমণী, এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী, কানু ঠাম কহবি বিছুরিব জানি। না খোজল দূতি, না খুঁজল আন, দুহুঁক মিলন মাঝহি পাঁচ বাণ। অবসই বিরাগ তুহু ভেল দূতি। সুপুরুখ প্রেম ঐছন রীতি।"

রামানন্দ রায়।

এই কয়েকটি পরিকর ছাড়া **কর্ম্মকার গোবিন্দদাস**, যিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে

দুইবৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে ঘুরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন এবং খুব সম্ভব যিনি "শ্রীগোবিন্দ" নামে উত্তরকালে চৈতন্যের রাত্রিদিনের সঙ্গী হইয়া পুরীতে দিন যাপন করিয়াছেন; ইঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার স্ত্রীর নাম শশিমুখী ছিল এবং তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বীয় আবাসপল্লী কাঞ্চননগর পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চৈতন্যের চিরসাথী হইয়াছিলেন।

কাঁচড়াপাড়ার মহা ধনাঢ্য ও পণ্ডিত **শিবানন্দ সেনকে** মহাপ্রভু পিতার ন্যায় মান্য করিতেন, তাঁহার পুত্র বিখ্যাত **পরমানন্দ সেন,** যিনি "কবিকর্ণপুর" নামে বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত এবং যাঁহার রচিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, চৈতন্য-চরিতামৃত কাব্য চৈতন্যসম্বন্ধে আদি গ্রন্থসমূহের অন্যতম। **মুরারিগুপ্ত**—যাঁহার আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট—এবং যাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য এক সময়ে নবদ্বীপের গৌরব ছিল। ইঁহার রচিত চৈতন্যের জীবনীতে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে। কবিকর্ণপুর ও মুরারিগুপ্ত উভয়েই সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, মুরারিগুপ্তের কতকগুলি বাঙ্গলা পদ আছে। চট্টগ্রামবাসী **পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি**—ইঁনি ভোগের বাহ্যাবরণের আড়ালে নিবিড় কৃষ্ণানুরাগ এবং সংসারের প্রতি বিরাগ বহন করিতেন। চৈতন্য ইঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেন। **বাসুদেব সার্ব্বভৌম**—যিনি পণ্ডিতদের শিরোমণি ছিলেন,—পুরীতে যেদিন চৈতন্যের নিকট ইঁহার বিচারে পরাজয় হয় সেদিন বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তরুণ চৈতন্যের নিকট বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যে সার্ব্বভৌম অল্পবয়স্ক চৈতন্যকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি সন্ন্যাসের যোগ্য নহ, আমার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুন, তারপর তুমি তোমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বুঝিবে,"—সেদিন তিনি কি জানিতেন এই তরুণবয়স্ক যুবক জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য চৈতন্যের ভক্তিব্যাখ্যায় ও কৃষ্ণানন্দে বিহ্বলতা-দর্শনে পরাস্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া স্তোত্ররচনাপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতিপাঠ করিবেন? প্রবাদ চৈতন্য তাঁহাকে ষড়্‌ভুজ দেখাইয়াছিলেন। দুই হস্তে রামজন্মের ধনুর্ব্বাণ, অপর এক হস্তে কৃষ্ণজন্মের বাঁশী, এবং অপর দুইহস্তে বর্ত্তমান জন্মের করঙ্গ ও কমণ্ডলু। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চৈতন্যের এতটা অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িতেন—"শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়, প্রভুর বিরহ-বাণ সহা নাহি যায়।" কাশীর **প্রকাশানন্দ সরস্বতী** এই ভাবেই চৈতন্যের ভক্তদের খাতায় তাঁহার নাম লিখাইয়াছিলেন, ইনি ছিলেন কাশীর দণ্ডিসন্ন্যাসীদের নেতা। প্রথমতঃ চৈতন্যের ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি কতই না ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছিলেন! তাহার শাস্ত্রজ্ঞান কি থাকিতে পারে—সে এক তরুণ যুবক! চৈতন্য এই সকল গালাগালি শুনিয়া প্রথমবার চলিয়া গেলেন কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার বিচার হইল।

এই ভক্তি-ধর্ম্ম সে যুগের পরম বিস্ময়ের কথা। তখন একদিকে মুসলমানেরা হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহাদি ভঙ্গ করিতেছিল, অপরদিকে পল্লীর ছায়ায় বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বেদবেদান্তের চর্চ্চা করিতেছিলেন,—এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রকে অতি সূক্ষ্মবিচার-পারদর্শী পণ্ডিত-গণের বোধগম্য করিয়া চিন্তা-শীলতার এরূপ উত্তুঙ্গ সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহাতে সমস্ত

পণ্ডিত বিস্ময়ে নবদ্বীপের টোলের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন ;—এই সময়ে নবদ্বীপের **রঘুনন্দন** সংস্কৃত সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে স্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাদেশে এখনও কোটী কোটী হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন ;—এই সময়ে **আগমবাগীশ** তান্ত্রিক ধর্ম্মের

পাণ্ডিত্যের যুগে ভাবের লীলা।

সমুন্নত ব্যাখ্যাদ্বারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলির গূঢ়মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দিয়া তন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বাসুদেব সার্ব্বভৌম উড়িষ্যায় বসিয়া, প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীর বিদ্যাকেন্দ্রের নায়ক এবং সন্ন্যাসীদিগের নেতৃস্বরূপ এবং দাক্ষিণাত্যে **ভারতী গোঁসাই**—চিন্তাজগতের কর্ণধারস্বরূপ সমস্ত হিন্দুস্থানের পূজা পাইতেছিলেন ; এই সময়ে একদিকে নবদ্বীপ অপরদিকে পুণ্যনগরে (পুণায়) সংস্কৃত বিদ্যার যে অনুশীলন হইতেছিল তাহার একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার বিষয় বটে ; তখন মিথিলার দীপ নির্ব্বাপিত, এবং নবদ্বীপের বালকেরাও অদ্বৈতবাদের গূঢ় মর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিত—"বালকেহ ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে" (চৈ. ভা. আদি),—এই অদ্ভুত বিদ্যা ও চিন্তার অভাবনীয় প্রভাবের দিনে কেবল নাচিয়া গাহিয়া, কেবল ঢল ঢল শতদল-প্রভ আনন্দাশ্রুপূর্ণ একখানি সুন্দর মুখ দেখাইয়া এক তরুণ যুবক সমস্ত ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিলেন, এমন কি আকবর বাদশাহ পর্য্যন্ত তাঁহার স্তুতিব্যঞ্জক পদ রচনা করিলেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ? মোটকথা চৈতন্য পণ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন। কিন্তু তিনি টোলে যাইয়া আজীবন শাস্ত্রচর্চ্চা করেন নাই, ভগবদ্দত্ত অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি শাস্ত্র পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রগাঢ়, গভীর ও গ্রন্থ-কীটদিগের বিদ্যা হইতে অনেক বেশী। তিনি ভাবে মাতিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান, সতর্কতা ও দূরদর্শন এরূপ ছিল যাহা বড় বড় সমাজ- ও ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের ছিল না। সনাতনকে দিয়া যখন তিনি হরিভক্তিবিলাস লিখাইয়াছিলেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন যে প্রত্যেক অনুশাসনের জন্য যেন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হয়। বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিজে কহিয়া দিয়াছিলেন (চৈ. চ. সনাতন শিক্ষা)। বস্তুতঃ ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে যিনি পণ্ডিতের শিরোমণি ছিলেন, যিনি মেঘ দেখিলে মূর্চ্ছিত হইতেন, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তরুণ তমালকে নির্জ্জনে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতেন—"বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল,"—এবং যাঁহার চক্ষের জল দ্বিতীয় হরিদ্বারের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিভৃত প্রেমের উৎস হইতে অবিরত উছলিয়া পড়িত, তিনি শাস্ত্র-বিচারের সময়ে একটিও ভাবের কথা বলিতেন না। বাণী যেন স্বয়ং জিহ্বাগ্রে বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখে সর্ব্বশাস্ত্র হইতে অবিরত প্রমাণ জোগাইত। যাঁহারা আজীবন কোন এক বিশেষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেন, ঠিক সেই শাস্ত্রে চৈতন্যের অন্তর্দৃষ্টি গভীরতর ও সূক্ষ্মতর ; সেই শাস্ত্রের মর্ম্ম তিনিই বুঝিয়াছিলেন, আজীবন খাটিয়াও তাঁহারা সেই জ্ঞানের সীমান্তে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন জনসাধারণ শাস্ত্রকে ত্যাগ করিয়া কোন কথা স্থায়ী ভাবে বিশ্বাস করিবে না। এজন্য তিনি তাঁহাদের হৃদয় চোখের জলে ও

মধুর হরিনামে আর্দ্র করিয়াও "হরিভক্তি-বিলাসে"র সর্ব্বাংশে শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভিন্ন অন্য কেহ এই অসাধারণ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না, তিনি ছিলেন একদিকে চিন্তাজগতের অপরদিকে চোখের জলের রাজা—তিনি ১৩।১৪টি ভাষা জানিতেন। অল্পবয়সে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রাকৃত ও পালিভাষা পড়িয়াছিলেন (গৌড়পদ-তরঙ্গিণী), দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে ইহার অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের উল্লেখ আছে, পালিভাষা স্বয়ং শিখিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মাভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। উড়িষ্যায় ১৮ বৎসর থাকিয়া ইনি সেই ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন, তিনি উড়িয়া ভাষায় বৈষ্ণবপদ প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন, "জগন্নাথ প্রভু পরিমুণ্ডাহ্"—প্রভৃতি উড়িয়া পদ তিনি সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন; অনেক উড়িয়া কবি তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। তেলেগু ও মালায়ালাম ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। নারোজি দস্যুর ভাষা ছিল—মালায়ালাম, তাঁহার অনুচরেরা চৈতন্যদেবের সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, এসম্বন্ধে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন :—"একজন লোক আসি কাই মাই করি। কি কহিল আমি বুঝিতে না পারি॥ তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়ে। কাই মাই বলি তারে দিলেন বুঝায়ে।" তামিল সম্বন্ধে এই উল্লেখ আছে—"কখনও তামিল বুলি বলে গোরা রায়। কভু বা সংস্কৃত বলি লোকেরে বুঝায়॥"—এই ব্যাপারে কোন অলৌকিকত্বের অবকাশ গোবিন্দদাস রাখেন নাই; তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল।" তাঁহার সময়ে বিদ্যাপতির মৈথিল পদের উপর বাঙ্গলার প্রভাব পড়ে নাই—বিদ্যাপতির পদ তখন খাস্ মৈথিলী ছিল। চৈতন্য দিনরাত্র চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ গান করিতেন। (চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপরামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শোনে পরম আনন্দ॥" (চৈ. চ.)। বৃন্দাবনে তিনি ছয়টি বৎসর ছিলেন, হিন্দী তখনকার দিনের আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বজন-বিদিত ভাষা ছিল। সেই হিন্দীর অন্যতম কেন্দ্র মথুরা ও বৃন্দাবনে ক্রমাগত ছয় বৎসর থাকিয়া তিনি অবশ্য হিন্দী ভাষা জানিতেন। পাঠান বিজলী খাঁয়ের সঙ্গে চৈতন্যের মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, বিজলী খাঁ আরব ও পারস্য দেশীয় শাস্ত্রে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যের মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে যে বিচারের আভাস আছে, তাহাতে মনে হয় পারশী ও আরবী ভাষার মোটামুটি জ্ঞান তাঁহার ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতন্য আরবী, পারশী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, উড়িয়া, মৈথিল, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম—অন্ততঃ এই সকল ভাষা ভালরূপ জানিতেন। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহাদের পরিবারের নিবাসভূমিতে যাতায়াত করিতেন। আসামী ভাষার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় থাকিবার কথা। নানা প্রদেশে হরিনাম ও প্রেমধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে এই সকল ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। ভাষা-শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

শুধু সংস্কৃতে নহে, এতগুলি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার দরুন তিনি জনসাধারণকে সর্ব্বত্র উপদেশ দিতে পারিতেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে সহজে তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। "আমি মূর্খ সন্ন্যাসী, কি বিচার করিব?" এইরূপ পরম দৈন্যোক্তি-দ্বারা বিচার-সভা এড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু যখন তিনি "কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেন, হঠাৎ শত সহস্র লোক সেই নামামৃত পান করিবার জন্য লালায়িত হইত, অকস্মাৎ যেন সেখানে পদ্মগন্ধ ছুটিত—শ্রোতৃবর্গ অসংখ্য নরনারী মুগ্ধ হইত, তাহাদের দেহ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত ও চক্ষু সজল হইত, "পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া, শত শত নারীগণ আছে দাঁড়াইয়া। নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে," এবং "অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া।" মহারাষ্ট্র দেশে শুধু এরূপ দৃশ্য সংঘটিত হয় নাই, যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই এইরূপ। কৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভোলা মহেশ্বর অবধি যেরূপ শত শত দেবতারা অজ্ঞান হইয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলেন, পরমা সুন্দরী কোন ষোড়শী রমণী রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইলে যেমন শত শত চক্ষু নির্নিমেষে তাহার প্রতি আবদ্ধ হয়—চৈতন্যের অশ্রুপ্লাবিত দুইটি চক্ষু ও কণ্ঠস্বরের অপার্থিব মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য, সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই মন সেইভাবে—রূপ সাগরের পাড়ে টানিয়া লইয়া যাইত। এত বিদ্যাবুদ্ধি, এত পাণ্ডিত্য ও এত ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। সেই শুষ্ক চিন্তাশীলতার যুগে পাণ্ডিত্য না থাকিলে কেহ আদর পাইত না।

নবদ্বীপে জগাই মাধাইএর জীবন-সংশোধন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুভানন্দ রায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে অতিশয় ধনাঢ্য ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুসেন সাহের সঙ্গে ইহার অন্তরঙ্গতা ছিল এবং ইনি সম্রাটের নিকট হইতে রাজা খেতাব পাইয়াছিলেন। শুভানন্দের দুই পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দ্দন; সুপ্রসিদ্ধ **জগাই** বা জগন্নাথ রঘুনাথের পুত্র এবং মাধব বা **মাধাই**—জনার্দ্দনের পুত্র, এই দুই যুবক নবদ্বীপে অসুর-কল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জগাই ও মাধাই।

জগতে এমন কোন পাপ নাই—যাহা ইহারা না করিত। দিবারাত্র মদ্যপান করিয়া বিভোর থাকিত—"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ, ডাকা চুরি গৃহদাহ করে অনুক্ষণ" (চৈ. ভা.); চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উপর ইহাদের আক্রোশ ছিল, এই দিনরাত্র হরিবোলের হট্টগোল ইহাদের অসহ্য হইয়াছিল;—ইহারা একদিন দুই তরুণ সাধুকে পথে পাইয়া তাহাদের মদ্যের ভাঁড়টা ছুঁড়িয়া মারিল; নিত্যানন্দের কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাপি প্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন—"আমাকে মারিয়াছ দোষ নাই, কিন্তু একবার তোমার শ্রীমুখে হরিনাম কর—আমার ব্যথার জ্বালা জুড়াইবে।" এই কথার পরেও মাধাই আর একবার তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তরুণ সাধুদ্বয়ের ক্ষমাশীল ভক্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া জগাইএর নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, সে মাধাইকে বারণ করিল। কি মধুর কণ্ঠ—স্নেহার্দ্র ও দয়াশীল! চৈতন্য কেবল বলিলেন,—"মাধাই, তুমি উহাকে না মারিয়া আমাকে মারিলেই

পারিতে!" দুই ভ্রাতা বাড়ী ফিরিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের অনুতাপে রাত্রে ঘুম হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে তাহারা চৈতন্যের শয্যাগৃহের দ্বারে আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, "আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।" চৈতন্য বলিলেন, "আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু তোমাদের অপরাধ তো আমার কাছে নহে, তোমরা নিতাইয়ের কাছে যাও।" নিতাই বলিলেন; "শিশু যদি পিতামাতার কাছে অপরাধ করে, তবে কি তাঁহারা তাহা গণ্য করেন—আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, পরন্তু আমি যদি জীবনে কোন পুণ্য করিয়া থাকি তবে তাহার ফল যেন তোমরা পাও—ইহাই আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।" নিতাইয়ের চোখে অশ্রু ও মুখে হরিনাম এবং বাহুদ্বয় আলিঙ্গনের জন্য প্রসারিত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের দুই দেবমূর্ত্তি ভ্রাতৃযুগলের মনে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল। কতক দিন পরে ইহারা নিত্যানন্দের নিকট আবার উপস্থিত হইল। মাধাই কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, তুমিত আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছ, কিন্তু তোমার মত সাধুর গায়ে হাত দেওয়ার জন্য হৃদয়ের জ্বালা কিছুতেই কমিতেছে না—কত শত লোকের উপর যে আমরা অত্যাচার করিয়াছি তাহার অবধি নাই। অনুতাপের বৃশ্চিক-জ্বালা যে কিছুতেই কমিতেছে না, তুমি আমার পাপের বোঝা গ্রহণ কর।" নিত্যানন্দ তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, "গঙ্গার ঘাটে যেসকল লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছ, পায়ে পড়িয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" মাধাই কাহার উপর অত্যাচার করে নাই! মাতাল হইয়া করিয়াছে, তাহা কি তাহার মনে আছে? একখানি কোদাল হাতে সে মাটী কাটিয়া একটি ঘাট প্রস্তুত করিল এবং যে সকল লোক স্নানার্থ তথায় আসিত, করজোড়ে সাশ্রুনেত্রে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিত। এইভাবে দুশ্চর সেবাবৃত্তি ও সাধুজীবনের দ্বারা তাহারা তাহাদের অসাধু জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে নরহরি তাঁহার ভক্তিরত্নাকর রচনা করেন, তখনও "মাধাইয়ের ঘাট" বিদ্যমান ছিল, এই ঘাট কোন দেশবিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নহে,—অপরাধ-ভঞ্জন প্রায়শ্চিত্তের চিরস্মরণীয় স্তম্ভ। স্বর্গীয় অজিতনাথ মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি এই ঘাটের সামান্য অংশ তাঁহার বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন। এখন আর উহার কোন চিহ্ন নাই।

এই জগাই-মাধাইয়ের জীবনের পরিবর্ত্তনসম্বন্ধীয় যে কত গান পল্লী-কুসুমের মত বাঙ্গলার তরুচ্ছায়ায় শীতল বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অবধি নাই। একটিতে জগাই-মাধাই যাহা বলিতেছে, তাহার ভাবার্থ এই:—ঘারে,—জগাই-মাধাই তুই শুনে আয়, গঙ্গাতীরে ঐ মধুর হরিনাম কার শ্রীকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, পূর্ব্বেতো ঐ নাম বজ্রের মত কঠোর লাগিত, আজ নাম শুনিয়া কেন ঘন ঘন চোখের জল পড়িতেছে?

ইহার পর চৈতন্য সন্ন্যাসী হইলেন—ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহাকে প্রহার করিবেন, ভয় দেখাইয়াছিলেন। চৈতন্য মুকুন্দকে বলিলেন—আমি গৃহী, এইজন্য আমার মুখে ইহারা নাম গ্রহণ করিবেন না। যাঁহারা আমাকে মারিতে চাহিতেছেন, কাল যাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া

তাঁহাদের পায়ে পড়িয়া হরিনাম দিব—তখন তাঁহারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।

"চণ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী।
নামে মত্ত হইয়া দাণ্ডাইবে সারি সারি॥
বালক বলিবে হরি বালিকা বলিবে।
পাষণ্ড অঘোর-পন্থী নামে মত্ত হবে।
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে
রাজা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি যাবে॥"

চৈতন্যের সন্ন্যাস।

চৈতন্যের সন্ন্যাসে দেশময় যে শোক হইয়াছিল, তাহা শত শত গানে বঙ্গের ঘরে ঘরে এখনও কারুণ্য জাগাইয়া থাকে। শচী ১২ দিন উপবাস করিয়াছিলেন—"দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন" (চৈ. ভা.)। তাঁহার অনুমতি না লইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ অসম্ভব। তিনি যে ভাবে অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহা অতি করুণ। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমার উপর—তোমার এই তরুণ-বয়স্কা স্ত্রীর উপর কি তোমার কোন কর্ত্তব্যই নাই? এখানে থাকিয়া কি ভগবান্‌কে ডাকা চলে না? আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করাই কি তোমার ধর্ম্ম? তুমি ধর্ম্মাবতার, তোমার মাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কি ধর্ম্ম করিবে?—আমাকে বুঝাইয়া যাও।" চৈতন্য বলিলেন, "মা, তুমি কি জান না কি ভাবে কৌশল্যা রামকে বনে যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন। দেবহুতি অসহ্য বাৎসল্য-বিরহ সহ্য করিয়াও তাঁহার পুত্রকে বৈরাগ্যের পথ হইতে নিবৃত্ত করেন নাই। তুমিতো সেই দেশেরই রমণী! আমি জগতে হরিনাম বিলাইব, মা, তুমি আমার সাধুপথে বাধা দিও না, এই পরিবারে আবদ্ধ থাকিয়া আমি তাহা পারিব না। তোমার ছেলে সকলকে ভগবানের প্রেম দিতে যাইতেছে,—তুমি ভারতের পূজ্যা—নারীকুলে জন্মিয়া আমার হোমানল নিবাইও না।" শোকে মৃতপ্রায়া শচী অনুমতি দিয়াছিলেন, কারণ ধর্ম্মের আহ্বানকে তিনি প্রাণ দিয়াও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা ঈশান-নাগর অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিয়াছেন—সে উৎকট তপস্যা চৈতন্যের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত। নবদ্বীপ অশ্রুর বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, ভট্টাচার্য্যগণ অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন, বাজারে দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ ছিল, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে নাই, চৈতন্য ছাড়া আলাপের অন্য প্রসঙ্গ ছিল না, সে আলাপ অশ্রুময়—চৈতন্যগুণ-স্মারক। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শচী অনিদ্ররজনী ধূলায় পড়িয়া কাটাইয়া দিতেন। শ্রীবাস হরিপূজার জন্য কুন্দ ফুল তুলিতে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যাইতেন, কখনও বা 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া গৃহদেবতাকে পূজা করিতে যাইয়া 'চৈতন্যায় নমঃ' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। এখনও নবদ্বীপবাসীরা মাথুর গাহিতে দেন না—মাথুর অর্থ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-

যাত্রা—কিন্তু তাঁহাদের কাছে উহা চৈতন্যের সন্ন্যাসের স্মারক। তাঁহারা চৈতন্যের সন্ন্যাসমূর্ত্তি আঁকিবেন না, বা মূর্ত্তিতে গড়িবেন না—সন্ন্যাসের পর যাহা কিছু হইয়াছে তাঁহারা এখনও তাহা শুনিতে চান না—তাঁহাদের সেখানে সর্ব্বদাই "নবদ্বীপ-লীলা"স্মারক গান ও কীর্ত্তন। নবদ্বীপ পরিত্যাগ করার পরের কথা তাঁহারা শুনিতে চান না।

নবদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া ২৩ বৎসর বয়স্ক চৈতন্য কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৫০৮)। যে সুন্দর চাঁচর কেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব রূপের শ্রী বাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই কেশ-মুণ্ডনের উপলক্ষে কাটোয়ার নরনারী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সমাজের নেতা—চৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পিতা চাখন্দীনিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ ও কেশমুণ্ডনের সংবাদে এতটা অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি কতকদিনের জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন—তরুণ নিমাই বাঙ্গলার এতই স্নেহের দুলাল ছিলেন! তাঁহার নাম ছিল "বিশ্বম্ভর মিশ্র, বিদ্যাসাগর বাদী-সিংহ", এখন সন্ন্যাসগ্রহণের পর যে নাম হইল তাহাও কম উদ্ভট নহে, সন্ন্যাসীর নাম কেশবভারতী দিলেন "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য," কিন্তু বাঙ্গালী জন সাধারণ এ সকল আভিধানিক নামে তুষ্ট হয় নাই, তাহারা তাঁহাকে "গোরা," "প্রাণের গোরা," "গোরা চাঁদ," "নদের চাঁদ" ইত্যাদি নামে ডাকিয়া থাকে।

দিন কয়েক শান্তিপুর থাকিয়া চৈতন্য পুরী গেলেন। তদবধি তাঁহার জীবনের গতি অন্যরূপ হইল। কিরূপে তাৎকালিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম তরুণ সন্ন্যাসীকে অল্পবয়সে প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য গঞ্জনা দিয়া শেষে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাতদিন বাসুদেব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন, অগাধ প্রেমের তরুণ তাপস মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিলেন—একটি কথাও বলেন নাই। বাসুদেব বলিলেন, "বালক, তোমার প্রতিভার কথা সকলের মুখে শুনি। কিন্তু আমার এই দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ব্যাখ্যার সময় তুমিতো একটিও কথা বলিলে না। কত লোক কত প্রশ্ন করিয়াছে—তুমি মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছ। তুমি কি আমার ব্যাখ্যা শোন নাই।" চৈতন্য বলিলেন, "আপনার মত প্রবীণ পণ্ডিতের কাছে আমি কি বলিব,—তবে আমি অন্যরূপ বুঝিয়াছি।" স্পর্দ্ধা তো কম নয়! বৃদ্ধ বাসুদেব সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নীলাম্বর পণ্ডিতের দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের তরুণ পুত্র তাহা হইতে অন্যরূপ বুঝিয়াছে! কিন্তু সত্যসত্যই যখন চৈতন্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধ বাসুদেব দেখিলেন, প্রবীণতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভার নিকট দাঁড়ায় না, ক্ষুদ্র গিরিনদী যেরূপ বিশাল শাল-শাল্মলী অনায়াসে খরবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়, চৈতন্য সার্ব্বভৌমের যুক্তিতর্ক তেমনি অনায়াসে ঠেলিয়া ফেলিলেন এবং ভক্তিবাদ সুদৃঢ় করিলেন। উপসংহারে চৈতন্য পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ছাড়িয়া ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে হরিনামের সুধা বর্ষণ করিলেন। পরাজয়ের আহত অভিমানে বাসুদেবের হৃদয়ে যে জ্বালা হইয়াছিল,

এবার তাহা জুড়াইয়া গেল। বৃদ্ধ পণ্ডিত চৈতন্তের দেবমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া শ্লোকচ্ছন্দে তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কাশীর প্রকাশানন্দ চৈতন্তের কতই নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন চৈতন্তের অপূর্ব্ব ভক্তিব্যাখ্যা শুনিয়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দণ্ডীদের নেতা সন্ন্যাসী বাঙ্গালী বালককে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন কাশীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ চুণ্ডীরাম তীর্থ, ভারতী গোঁসাই প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের দশাও একই রূপ হইল। কিরূপে তিনি গুজরাটে গোগাগ্রামে নটী-শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বারমুখীকে সৎপথে আনিয়াছিলেন, তাহা ভক্তমালে আভাসে বর্ণিত আছে, কিন্তু গোবিন্দ কর্ম্মকার তাহার এমন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, যে তাহা একটি দৃশ্যপটের ন্যায় মনোহর হইয়াছে।

খাণ্ডবা গ্রামে সেবাদাসী ইন্দিরা বাই, নারোজী দস্যু, ভিল পান্থ প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তি-গণের কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাঁহার শ্রীকণ্ঠে হরিনাম শোনার পর। তাঁহার মুখে চোখে যে অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম শক্তি ফুটিয়াছিল,—গলদশ্রু শতদলপ্রভ চোখে যে স্বর্গীয় প্রেমের কথা লিখিত ছিল, তাহাতেই ঐ সকল অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি উপদেশ অতি অল্পই দিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে এরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না—যিনি উপদেশ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা প্রভৃতি চির-ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার না করিয়া শুধু নাম-বলে লোকের চিত্ত এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। যে মহাধনী তীর্থরাম যুবক দুইটি বেশ্যা লইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে আসিয়াছিল—সে তাঁহার মুখে শুধু হরিনাম শুনিয়া স্বয়ং দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে লইয়া সন্ন্যাসী সাজিল, তাঁহার নিযুক্ত সত্যবাই ও লক্ষীবাইনামক বেশ্যাদ্বয় রূপের গর্ব্বে ফাটিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা এই প্রেমোন্মাদের ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া কাঁদিয়া পায়ে পড়িল। ষাট বৎসরের ব্রাহ্মণ দস্যু নারোজি—চৈতন্তের প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া পাগল হইয়া গেল, সে তাহার অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত চিরতরে ফেলিয়া দিয়া সেই দিন হইতে চৈতন্তের যে সঙ্গ লইল, মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাহা ছাড়ে নাই। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি, উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্তের পিছনে পিছনে অনুগত সেবকের ন্যায় চলিতেন। যে প্রতাপরুদ্রের কবাট-তুল্য বিশাল বক্ষের মর্দ্দনে প্রধান প্রধান পাঠান মল্লগণ নিষ্পেষিত হইতেন, কবিকর্ণপূর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন—এই মহাবীর রাজরাজেশ্বর চৈতন্যকে দেখিলে নবনীতের ন্যায় কোমল হইয়া তাঁহার দাসানুদাস হইতেন কোন্ গুণে? এই প্রতাপরুদ্র হুসেন সাহের হাত হইতে গৌড়দেশ কাড়িয়া লইবার জন্য একবার সমরোদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশ জয় করিয়া সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ইঁহার আদেশে চৈতন্তের যে ছবি আঁকা হইয়াছিল, তাঁহার পাদপীঠে—সর্ব্বাঙ্গপ্রণতির ভঙ্গীতে রাজার ভূলুণ্ঠিত মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইনিই চৈতন্তের সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া গোপীনাথ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ কোন্ রাগিণী? অর্থবোধ না হইলেও যেমন কোকিল-কাকলী, এ যে তেমনই মিষ্ট, এরূপ মধুর রাগিণী ত আমি শুনি নাই, ইহা কে উদ্ভাবন করিয়াছেন?" গোপীনাথ মিশ্র বলিলেন—"ইহা মনোহর-সাই কীর্ত্তন, ইহার স্রষ্টা স্বয়ং চৈতন্যদেব।" প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুষোত্তম দেবের

একমাত্র পুত্র ছিলেন। পরমা সুন্দরী পদ্মিনী কাঞ্জিভরম রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন। প্রতাপ-রুদ্রের পিতা ইহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া রাজার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। রাজা উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "যে সামান্য ঝাড়ুদারের কাজ করে—তাঁহার হাতে আমার কন্যা দিতে পারিব না।" বৎসরে একদিন উড়িষ্যার রাজারা সোণার ঝাঁটা হস্তে পুরীর মন্দির সাফ্ করেন, ইহা চিরাগত রীতি ছিল, রাজা ইহাই লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া পুরুষোত্তমকে ঝাড়ুদার বলিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধে কাঞ্জিভরম আক্রমণ করেন এবং রাজাকে পরাস্ত করিয়া পদ্মিনীকে পুরীতে লইয়া আসেন এবং সভাসমক্ষে সংকল্প করিয়া বলেন, "এই বন্দী রাজকুমারীকে আমি সত্যসত্যই এক ঝাড়ু-দারের হস্তে দিব।" মন্ত্রীরা দুঃখিত হইয়া একটা ষড়যন্ত্র করিলেন।

আপনিই সেই ঝাড়ুদার।

এবারও বৎসরের সেই দিন আসিল—যেদিন রাজা স্বর্ণ ঝাঁটা হস্তে পুরীর মন্দির পরিষ্কার করিতে গেলেন। এই সুযোগে প্রধান মন্ত্রী বন্দী রাজকুমারীকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাকে কোন ঝাড়ুদারের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, আপনিই সেই ঝাড়ুদার, ইহাকে গ্রহণ করুন।" রাজার মন আর্দ্র হইয়াছিল, তিনি এই অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, পদ্মিনীকে বিবাহ করিলেন। কাঞ্চী-কাবেরী নামক উড়িয়া-কাব্যে এই কৌতূহলজনক ঘটনা লিখিত আছে। আমাদের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় লইয়া একখানি সুন্দর বাঙ্গলা কাব্য লিখিয়াছেন।* প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুষোত্তম ও রাণী পদ্মিনীর পুত্র। চৈতন্যের তিরোধানের পর প্রতাপরুদ্র যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন শোকে মৃতপ্রায় ছিলেন। একদা কবিকর্ণপুরকে (পরমানন্দ সেনকে) তিনি বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ রথযাত্রার সময় উপস্থিত, নীলাদ্রিনাথ রূপের ছটায় ঝলমল করিতেছেন, একদিকে নীল সিন্ধু-জলের অস্ফুট গর্জ্জন, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দ-কোলাহলে পুরী যেন নবজীবন পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চৈতন্য বিহনে এই উৎসবে আমার কণিকাপ্রমাণও আনন্দ হইতেছে না, তুমি তাঁহারই লীলা বর্ণনা করিয়া আমাকে শুনাও।" এই আদেশের ফল—সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক।

চৈতন্য একবার পুরী হইতে পালাইয়াছিলেন। পার্থিব স্নেহ-মমতার সম্পূর্ণ খপ্পরে পড়িলে নির্ম্মল সার্ব্বজনীন প্রেম ও সত্যদৃষ্টির বাধা পড়ে। পুরীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও নদীয়ার মত তাঁহার দ্বিতীয় একটা সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। জগদানন্দ তাঁহার প্রতি মাতার অধিক যত্ন করেন—এবং তাঁহার স্নান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি লইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন,—নানারূপের উপহারের খাদ্যদ্রব্য আনিয়া তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন,—তিনি না খাইলে হয় নিজে উপবাসী থাকেন, না হয়

পুরীত্যাগের সঙ্কল্প।

অভিমান করিয়া তিন দিন চৈতন্যের সঙ্গে কথা বলেন না। একদিন ইনি চৈতন্যের জন্য একটি তুলার বালিশ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, তরুণ সন্ন্যাসী অতি

* প্রতাপরুদ্র স্বর্ণঝাড়ু লইয়া যে জগন্নাথ মন্দির বৎসরে একদিন সাফ্ করিতেন, তাহার উল্লেখ চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ১৪শ অধ্যায়ে আছে।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শুধু মেঝের পাথরের উপর শুইয়া থাকিতেন, জগদানন্দের তাহা সহ্য হয় নাই। সেই তুলার বালিশ দেখিয়া চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "জগদানন্দ, বিলাসের আর আর আসবাব বাকি রাখিলে কেন? এখন একটা খাট লইয়া এস এবং আমাকে দিয়া বিষয় ভোগ করাইবার অন্যান্য যোগাড় কর।" আর একদিন এক ভক্ত চৈতন্যকে এক হাঁড়ী সুগন্ধ তৈল উপহার দিয়াছিলেন, চৈতন্য বলিলেন, "ইহা মন্দিরে লইয়া যাও এবং জগন্নাথের আরতির সময়ে জ্বালাইও।" এই কথায় জগদানন্দ রাগিয়া গিয়া সেই তৈলের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরিব্রজ্যার নিয়ম পালন করিয়া চৈতন্য শীর্ণদেহে মাঘের নিদারুণ শৈত্য অগ্রাহ্য করিয়া শেষরাত্রে স্নান করিতেন। মুকুন্দের ইহা সহ্য হইত না। চৈতন্য বলিলেন, "মুকুন্দ, জগদানন্দের মত রাগ করে না; কিন্তু অতি দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহাতে আমার অধিকতর কষ্ট হয়।" এদিকে স্বরূপ-দামোদর চৈতন্যের উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরিয়া ছিলেন। চৈতন্য শাস্ত্র-নিয়মের ধার ধারিতেন না, উচ্ছ্বসিত প্রেমের আবেগে কোন বিধি পালন করিতেন না। কিন্তু স্বরূপ-দামোদর "ইহা করা উচিত নহে, সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা উচিত নহে" ইত্যাদিরূপ অনুশাসন দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন।

চৈতন্য দেখিলেন,—ইহারা তাঁহার জন্য পুনরায় স্নেহ ও শাসনের গৃহের মতই একটা কারাগার সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরীর এই স্নেহের বন্ধনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একবার ছুটিয়া পালাইবার মুখে তিনি সনাতনের বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহের বরের ন্যায় এক বিপরীত মিছিল সঙ্গে তিনি যে চলিয়াছিলেন, একথা তাঁহার খেয়াল ছিল না। সনাতনের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। পুরীতে ফিরিয়া তথায় আর কিছুকাল থাকিয়া এবার প্রকৃতই পলাতক আসামীর ন্যায় গোপনে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে কালাকৃষ্ণ দাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একমাত্র গোবিন্দ কর্ম্মকার বিশ্বস্ত কুকুরের ন্যায় দীর্ঘপথ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমণের যে সবিস্তার বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন তাহা দৃশ্যপটের ন্যায় সুস্পষ্ট। গোবিন্দ কর্ম্মকারের বাড়ী ছিল—বৰ্দ্ধমান, কাঞ্চন নগর; তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্যামাদাস এবং মাতার নাম মাধবী, গোবিন্দ তাঁহার স্ত্রী শশিমুখীর সহিত ঝগড়া করিয়া চিরদিনের জন্য চৈতন্যের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উত্তর কালে ইনিই "শ্রীগোবিন্দ" নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এই করচা-লেখক সম্বন্ধে সমস্ত কাহিনী মৎসম্পাদিত "গোবিন্দ দাসের করচা"র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগত হন। সুতরাং এক বৎসর আট মাস ছাব্বিশ দিনে এই ভ্রমণ শেষ হয়, পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্য বলদেব ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে ছয় বৎসর ভ্রমণ করেন। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ কাল পুরীতে ছিলেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন বেলা ৩টার সময়ে তিনি পুরীর গুণ্ডিচা গৃহে দেহ-রক্ষা করেন।

বৈষ্ণব-সমাজের উপর —সমস্ত বাঙ্গলা দেশটার উপর—চৈতন্যের যে প্রভাব তাহার তুলনা নাই। নিত্যানন্দ পুরীতে আসিলেই চৈতন্য সঙ্গোপনে এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাঁহাকে সমাজ-সংশোধনের উপদেশ দিতেন. (চৈ. ভা.)। তিনি জানিতেন—নিত্যানন্দের ন্যায় সর্ব্বজাতির প্রতি সমদর্শী, উদারহৃদয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সমাজে আর দ্বিতীয়টি নাই। এই জন্য জাতিভেদের উৎকট বৈষম্য দূর করিয়া উদার বৈষ্ণব-সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করিবার ভার তিনি নিত্যানন্দের উপর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও তাঁহার পুত্র বীরভদ্র খড়দহে বসিয়া পতিতদিগকে যে স্নেহ-মধুর আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ১২০০ নেড়া (মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুক) ও ১৩০০ নেড়ী (উক্তরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী) সাগ্রহে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল। এইভাবে রামকলী নগরে আর এক বৃহৎ নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় ভেকাশ্রিত হইয়া বৈষ্ণব বৈরাগী সাজিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের প্রসারিত-ভুজাশ্রিত হইয়া বৌদ্ধ-জনসাধারণ সাধারণ বৈষ্ণব-মত অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডীতে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধ-আখড়ায় বিবাহপ্রথা ছিল না। ব্যভিচার-দুষ্ট নেড়ানেড়ীসমাজ তাহাদের নেতৃদলের সঙ্গে পথভ্রষ্ট হইয়া বিলাসের স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের সন্তান-সন্ততি নাম-গোত্রহীন হইয়া অতি হেয় অবস্থায় ছিল,—নিত্যানন্দ ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলন করিয়া সমাজে ইহাদের একটা স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। বৈরাগীরা কখনই ভেকাশ্রয়ের পূর্ব্বে তাহারা কোন্ জাতীয় ছিল তাহা বলিবে না। এই ভাবে তাহাদের পূর্ব্বজীবনের কলঙ্কিত অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা লোক চক্ষে শুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বাউলদের মধ্যে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে গ্রহণ করার পরও বৌদ্ধধর্ম্মের দেহতত্ত্ব এখনও চলিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব ধর্ম্মের সংস্কার বাউলদের সহজিয়া গানে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। একদিন এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "তুমি চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ পূজা কর কি না?" সে বলিল, "ইহাদের কি বিগ্রহ আছে? চৈতন্য হচ্ছেন 'শূন্য মূর্ত্তি।'" এই উক্তি মহাযান বৌদ্ধগণের "ধ্যায়েৎ শূন্যমূর্ত্তিম্" ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত শূন্য-বাদের প্রতিধ্বনি করে। নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল "জাতনাশা"। তিনি সুবর্ণ-বণিক্-শিরোমণি—সপ্তগ্রামের ধনকুবের—সদ্ব্যবসায়ী উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন। অথচ সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা "বসুধা" ও "জাহ্নবী"কে বিবাহ করিয়া নিত্যানন্দ দস্তরমত গৃহী সাজিয়াছিলেন। চৈতন্যের আদেশে তিনি অবধূতের ব্রত ভঙ্গ করিয়া সংসারাশ্রমী হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত নিম্ন-জাতীয় হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব গোস্বামীদের পূজাদি করিবার ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরা ইতিপূর্ব্বে যাহাদের বাড়ীর দ্বারে পদার্পণ করাও মহাপাপ মনে করিতেন, বৈষ্ণব গোস্বামীরা তাহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বাড়ীতে ভোজনাদি ও দেবপূজা অবাধে করিতে লাগিলেন। এজন্যই নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল "পতিত-পাবন।" ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী চৈতন্য; তিনি ভাবে বিভোর থাকিতেন, কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেন—নিত্যানন্দ।

চৈতন্যের প্রভাব।

চৈতন্যের অনুজ্ঞাক্রমে বৈষ্ণব-সমাজে সমস্ত নীচজাতির প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ তাহাদিগকে অশেষরূপ সামাজিক দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের শ্রদ্ধায় নিত্যানন্দের নাম চৈতন্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি গানে এই কথা সুব্যক্ত আছে। "হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হৈল শ্রীচৈতন্য" প্রভৃতি গানে নিত্যানন্দ রাজা এবং চৈতন্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছেন। নিত্যানন্দ এই মহৎ কার্য্য না করিলে আজ পতিত জাতির অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিত। চৈতন্যদেব পুরীতে তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারসম্বন্ধে কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়,—দ্বার বন্ধ করিয়া এক প্রকোষ্ঠে অতি গোপনীয়ভাবে সেই উপদেশ দিতেন।

চৈতন্য স্বয়ং ভগবৎপ্রেমে বিভোর থাকিয়াও বাঙ্গলার নবগঠিত বৈষ্ণব-সমাজকে সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সনাতনকে দিয়া তিনি এই সমাজের জন্য বিধিব্যবস্থা সংকলন করাইয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য সনাতন অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। সনাতন বাঙ্গলার সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ব্যবহার-শাস্ত্র তাঁহার নখাগ্রে ছিল, তিনি হিন্দুদের দর্শন, কাব্য ও পুরাণ উৎকৃষ্টরূপে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু স্মৃতিই ছিল তাঁহার বিশেষভাবে পঠিতব্য বিষয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, নবদ্বীপের তরুণ পাগল দেবতাটি ভাবে বিভোর থাকিয়াও সংসারের প্রয়োজন এবং স্মৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বসম্বন্ধে সনাতনের মত পণ্ডিতকে কলের পুতুলের ন্যায় পরিচালিত করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষা শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একদিকে সমাজ-সংস্কার, অপরদিকে উহা পরিচালিত করিবার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কে জানিত হরিপ্রেমে উন্মাদ এই তরুণ যুবকের এরূপ অসাধারণ সমাজ-সংগঠনী শক্তি ও প্রতিভা ছিল?

তাঁহার "মহা-ভাব" অতুলনীয়—সমুদ্রের মত অপ্রমেয়। সেই মহাভাবের সৌন্দর্য্যে বৈষ্ণব-পদসাহিত্য ভরপুর; চণ্ডীদাস তাহার আভাস পাইয়া তাঁহার আগমনী গাহিয়াছিলেন, বাসুঘোষ নরহরি তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমলীলায় আত্মহারা হইয়া শত শত পদ রচনা করিয়াছেন। হরিনাম করিতে করিতে যখন তিনি কাঁদিতেন, তখন নারদের বীণাধ্বনিবৎ তাঁহার সুকণ্ঠ-উচ্চারিত হরিলীলা যেন শ্রোতৃবর্গের প্রত্যক্ষ হইত। এই মনোহর কণ্ঠের ধ্বনিতে নূতন নূতন সুরের মূর্চ্ছনা জাগিয়া উঠিত। শুধু মনোহর শাহী, রেনেটি বা গরাণ-হাটীর কীর্ত্তন নহে,—একদিন এমনই করুণ-মধুর কণ্ঠে তিনি সাশ্রুনেত্রে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন যে তাহাতে "মায়ূর" নামক এক নবরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গেল। তাঁহার প্রেম-বিহ্বল চোখের মধুরিমা মুহূর্তে মুহূর্তে নানাভাবে নানা মধুর বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে বহন করিয়া আনিত। একদিন তাঁহার চোখে অভিমানের অরুণিমা খেলিতেছিল, অতিশয় অভিমান ও লজ্জাজনিত ক্ষোভ দুইটি অশ্রুতে সুব্যক্ত হইয়াছিল, তাঁহার চোখে কি কথা ফুটিতে চাহিয়া যেন ফুটিতে পারিতেছিল না, দেহলতা অতিশয় আবেগে দুলিতেছিল। রূপ-গোস্বামী মুগ্ধনেত্রে এই মহাভাবের পাগলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অমনি সেই দৃশ্য তাঁহাকে কল্পনার স্বর্গলোকে লইয়া গেল,

তিনি রাধিকার একটি ভাব উহাতে আরোপ করিয়া দানকেলী-কৌমুদী নামক নাটকের মুখবন্ধে "অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা।" ইত্যাদি শ্লোকটি রচনা করিলেন, তাহাতে সাতটি ভাবের সমাবেশ আছে; আলঙ্কারিকগণ উহাকে "কিলকিঞ্চিৎ" ভাব সংজ্ঞা দিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস এবং রাই উন্মাদিনী প্রভৃতি পুস্তক রাধিকার নামে চৈতন্য-লীলা;—বিশেষ রাই উন্মাদিনী গ্রন্থখানি চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ছানিয়া, তাহাদের সারাংশ কবিত্বমণ্ডিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এমন একটি কথা নাই, যাহা চৈতন্য-জীবন হইতে সংগৃহীত হয় নাই। অথচ এই পরিপূর্ণ অধ্যাত্মতত্ত্ব বা ভক্তি-সংবাদ এমনই করুণভাবে লিখিত হইয়াছে যে রাধিকার এই রূপ ও চরিত্র—মহা করুণার প্রস্রবণস্বরূপ হইয়াছে। কে বলিবে এই কাব্যের উৎস মর্ত্য-বাহিনী ভাগীরথী—স্বর্গ-গামিনী মন্দাকিনী নহে? উহা সংসারের বেশ ধরিয়া আসিয়াছে সত্য কিন্তু উহার উৎপত্তিস্থান স্বর্গে। চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি যদি অতি স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে চান, ভাল গায়কের মুখে 'রাই উন্মাদিনী' যাত্রাখানি শুনুন। গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পদে বর্ণিত আছে যে সময়ে সময়ে রাধিকা কৃষ্ণের ক্রোড়ে থাকিয়াও 'কোথা কৃষ্ণ' 'কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। যিনি দিনরাত্র কৃষ্ণের সঙ্গবিচ্যুত হইতেন না, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বিরহীর মত কাঁদিতেন—রাধাতে আরোপিত এই ভাব সেই লীলার দ্যোতক।

চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বহু দেববিগ্রহ ও মন্দির মুসলমান অত্যাচারীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তখন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কষ্টিপাথর-নির্ম্মিত বাসুদেব-বিগ্রহের পূজা হইত। এই সকল বিগ্রহ ভক্তদের প্রাণের ন্যায় প্রিয় ছিল। যাঁহার কাছে বসিয়া রাত্রিদিন জপ চলিয়াছে,—নিত্য শত শত কুলবধূ যাঁহার জন্য নৈবেদ্য ও পুষ্পপত্র রচনা করিতেন,—যাঁহার ভোগ কত যত্নের সহিত রান্না হইত,—যাঁহার আরতির জন্য কত মালী বাগানের ফুল সংগ্রহ করিয়া মাল্য প্রস্তুত করিত এবং যাঁহার মন্দির-ধূপ অন্তরের সমস্ত কলুষ দূর করিত, এবং গঙ্গাস্নাত, পট্টবাস-পরিহিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধদেহ ও শুদ্ধান্তঃকরণে যাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতেন, সেই সকল প্রাণাধিক বিগ্রহের ধ্বংসের পর ভগ্নদেবমন্দির শূন্য হইয়া পড়িল। কত পুরোহিত ও পাণ্ডা হয়ত স্বীয় প্রাণ বিধর্ম্মীর খড়্গাঘাতে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীবিগ্রহ-রক্ষার বিফল প্রয়াস পাইয়াছিলেন—সেই সকল বিগ্রহ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু ভক্তের মানসপটে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই চন্দনাম্বররঞ্জিত কষ্টিপাথরের কৃষ্ণবর্ণ রূপ তাঁহাদের বুকে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। কালো কিছু দেখিলেই সেই কালো রূপের কথা মনে হইত। বঙ্গের প্রাচীন এবং আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যে কালোরূপের প্রেম-স্নিগ্ধ উল্লেখ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়; এজন্য রাধিকা কাজল পরিতেন না, কালো শাড়ী দেখিলে চমকিত হইতেন। তিনি সখীকে বলিতেছেন, "কালো কুসুমকরে, পরশ না করি ডরে, এ বড় মনের মনোব্যথা" (চণ্ডীদাস)। এজন্যই তিনি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখিলে নিশ্চল ও মুগ্ধ চক্ষুদুটি সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, "সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা;" এজন্যই তিনি মালতী মালা খুলিয়া কালো

চুলের রাশি হাতে লইয়া মুগ্ধ চোখে চাহিয়া থাকিতেন, এবং ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের উজ্জ্বল নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া উন্মত্ত হইতেন। কালো রঙের বিগ্রহ সম্মুখ হইতে অপসারিত হওয়ায় সেই বর্ণ আরও প্রিয় এবং ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এজন্যই মাধবেন্দ্র পুরী মেঘদর্শনে অজ্ঞান হইতেন এবং চৈতন্য দেব দাক্ষিণাত্যে চণ্ডপুর গ্রামে এক তমালতরু দেখিয়া তাহাকে সাশ্রুনেত্রে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন—কখনও যে-কোনও নদীকে কালিন্দী মনে করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। এক পদকর্ত্তা রাধিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বিজনে আলিঙ্গয়ে তরুণ তমাল।" এবং বহু বৈষ্ণব কবি রাধার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা—মরণান্তে তমাল-ডালে তাঁহার তনু বাঁধিয়া রাখিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদারাধনায় এই কৃষ্ণবর্ণটি ক্রমশঃ একটি স্মারক চিহ্নস্বরূপ হইয়া বৈষ্ণব কবিতায় এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিল। এই কালো বর্ণ বৈষ্ণবের চক্ষে ধ্যানলোকের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং যাঁহাকে মন্দির হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, সেই বিগ্রহ স্থান লইলেন ভক্তের চক্ষে ও মনে—বিশ্বের সর্ব্বত্র—সমুদ্রের নীললহরীতে, সুশ্যাম তমালতরুতে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ও ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের বর্ণে। কবিরা এখনও গান বাঁধিয়া বলেন, "কালো কি হয় না ভালো-রে" চৈতন্যের মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা এবং ভগবানের সঙ্গে আনন্দমিলন অনেক সময়ে এই কৃষ্ণবর্ণকে সমাশ্রয় করিয়া হইত। কৃষ্ণের বর্ণ অবশ্যই কালো, **কিন্তু ভারতবর্ষে কালো রঙের উপর এত দরদ বাঙ্গালীদের মত আর কেহ দেখায় নাই।**

কালোর উপরে দরদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ

১৫৩৩ অব্দে চৈতন্যের তিরোধান হয়। এই তিরোধান কিরূপে হইয়াছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে, এই সূত্রে সমুদ্রের জলে তাঁহার তিরোধান হয়—এই যে সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কোন আস্থা দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথায়ও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথবা গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার দেহ ছিল চিন্ময়, সুতরাং রক্তমাংসের দেহের ধ্বংসের মত তাহার বিলয় হইতে পারে না, এই সংস্কার-বশতঃ প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে "মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে" এই ছত্রটি আছে। ইহা গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহার মিশিয়া

তিরোধান-সম্বন্ধে নানা মত।

যাইবার ইঙ্গিত-বাণী কিনা জানি না। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্ত-মঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধানের যে কাহিনী দিয়াছেন, তাহাই এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও যুক্তিসঙ্গত কথা। রথযাত্রার সময়ে কীর্ত্তনানন্দে চৈতন্ত উছট্ খাইয়া পড়িয়া যান এবং তাহাতে পায়ে ভয়ানক চোট লাগে। অনতিকাল-পরে গুণ্ডিচা গৃহে তাঁহাকে আনা হয়, এবং তথায় তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। জয়ানন্দ বলেন, আষাঢ় মাসের রবিবার সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃঃ) বেলা তিনটার সময়ে তিনি স্বর্গধামে গমন করেন, কিন্তু লোচনদাস বলেন রাত্রি আটটায় তাঁহার বিয়োগ হয়। সেদিন অপরাপর দিনের ন্তায় বেলা তিনটার পর গুণ্ডিচা বাটীর দরজা খোলা হয় নাই। চৈতন্তের পার্শ্বচরগণ মন্দিরের দ্বারে ভিড় করিয়া ছিলেন। কিন্তু আটটা রাত্রিতে দরজা খুলিয়া পাণ্ডারা বলেন—মহাপ্রভু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার দেহের আর কোন চিহ্ন নাই। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সেই গৃহে পাণ্ডারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন? পূর্ব্বোক্ত দুই পুস্তকের কথা এবং ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অনুমান হয়, বেলা ৩টার সময়ে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন বৃহৎ মণ্ডপের এককোণে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। প্রতাপরুদ্রের অনুমতি লইয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ করা হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত পুস্তকের একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমাল্য সেই মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া তখন লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধিকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপের পাথরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সমাধির চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। যাঁহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন—তাঁহারা তিরোধান বেলা ৩টায় হইয়াছিল এরূপ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের দেবপ্রকোষ্ঠের একটি নিকটস্থ কোণে গৌরাঙ্গের প্রস্তর-নির্ম্মিত পদচিহ্ন আছে। ঐ মন্দিরে চৈতন্তের সেই পদচিহ্ন থাকার কোন কারণ নাই। জগন্নাথ মন্দির ও গোপীনাথ মন্দির এই দুইটি চৈতন্তের প্রধান লীলা-স্থল। গুণ্ডিচা মন্দিরের সেই পদচিহ্ন কি লুক্কায়িত সমাধির নিদর্শন? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা লিখিব না। আমি আমার অনুমান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা বিগ্রহের অঙ্গে তাঁহার চিন্ময় দেহ মিশিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসে আমি 'ঘা' দিতে ইচ্ছা করি না। পুরীর পাণ্ডাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রবাদ প্রচলিত আছে—তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও চৈতন্তের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া মান্ত করিতেন, যাঁহার তিরোধানের পর রাজার ঘোর বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারই রাজধানীতে কি এরূপ একটা ঘটনা ঘটিতে পারে? উড়িষ্যার রাজপঞ্জী সন্ধান করিলে হয়ত সত্য ঘটনা ব্যক্ত হইতে পারে।

চৈতন্তের তিরোধান-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি সকলেই নীরব। যে কয়েকখানি পুস্তকে একটু ইঙ্গিত আছে, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বজনাদৃত গ্রন্থ নহে। শুধু লোচনদাস

একশ্রেণীর বৈষ্ণবদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহার পুত্রকেও এ সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি কথা আছে।

চৈতন্যের তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজের অবস্থা।

যে কারণেই হউক, এই নীরবতা দুঃসহ শোকজ্ঞাপক। ভগবান্ ধুতি চাদর পরিয়া বাঙ্গালী সাজিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে লীলা করিয়া গিয়াছেন, এত বড় গৌরবে এদেশের লোকেরা গৌরবান্বিত ছিল, চৈতন্যের তিরোধানে সেই জাতীয় গৌরব-কিরীট শিরশ্চ্যুত হইল। জাহাজ ডুবিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে যেরূপ তাহার ভগ্ন অংশগুলি অর্ণবে ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়—এই মহাবিপদের দিনে বৈষ্ণব-সমাজ তেমনই বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। গঙ্গাতীরে যে মহাকীর্ত্তনের দল মন্দিরা, করতাল, ডম্ফ ও মৃদঙ্গনিনাদে আকাশ দিবারাত্র প্রতিশব্দিত করিত, হঠাৎ সেই আনন্দোৎসব থামিয়া গেল। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও নরহরি ধীরে ধীরে শোকসন্তপ্ত হইয়া অব্যক্ত দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শচী তাঁহার পুত্রের সন্ন্যাসের পর প্রতিবৎসর প্রাণের নিমাইয়ের সংবাদ পাইতেন,—শেষবার চৈতন্য পুরী হইতে জগদানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়া দিয়াছিলেন, "মা, আমি তোমার বৃদ্ধ বয়সে সেবা করিতে পারি নাই। আমার ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হইল না,—আমি পাগল হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি, আমি তোমার চিরস্নেহের ছেলে, আমার শত অপরাধও তোমার নিকট মার্জ্জনীয়—মা, তোমার স্নেহের নিমাইকে মাপ করিও।" একবার শান্তিপুরে শোকাকুলা মাকে সান্ত্বনা দিয়া চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "মা, আমি তোমারই রান্নাঘরে ও শ্রীবাসের আঙ্গিনায় অশরীরিভাবে সর্ব্বদা থাকিব; তুমি যেদিন কোন ভাল জিনিষ রান্না করিবে,—জানিও, আমার আত্মা তোমার ঘরে সেই সময়ে বিরাজ করিবে, আমার দেহ অন্যত্র থাকিলেও প্রাণ-মন নদীয়ায় তোমার ঘরে থাকিবে।" এই সকল সংবাদ পাইয়া শচীর শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ জুড়াইত; কিন্তু আজ তিনি কি করিবেন? চিরবিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান আজ তাঁহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন? চির-ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর নিয়মপালনে কঙ্কালসার তন্বঙ্গী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হইল, জানা নাই। নিত্যানন্দ দাস খেতুরীর মহোৎসব এবং গৌরাঙ্গ-বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সেই বিষণ্ণ, ভগবৎপরায়ণার অপূর্ব্ব সাধ্বীমূর্ত্তি আভাসে দেখাইয়াছিলেন, তারপর তৎসম্বন্ধে কোন লেখক কিছু বলেন নাই।

এদিকে বৃন্দাবন নূতন নগর হইয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্য তাঁহার প্রিয় ভক্তদিগকে সেখানে পাঠাইয়া তীর্থগুলির উদ্ধার করার পর সমস্ত ভারতবর্ষের চক্ষু বৃন্দাবনের দিকে পড়িয়াছিল। দলে দলে তীর্থদর্শনকারীরা তথায় ভিড় করিয়াছিল। লোকনাথ, রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বরেণ্য সাধুগণের অলৌকিক ভক্তি-দর্শনে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিল,—তথায় শত শত মঠ মন্দির উত্থিত হইল। গ্রাউজ সাহেবের মথুরার ইতিহাস ও নাভাজি-কৃত ভক্তমালে তথাকার সমৃদ্ধি ও ভক্তিধর্ম্মের সাফল্যের কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যে সনাতনের ভক্তিদর্শনে সম্রাট্ আকবর বিস্মিত হইয়াছিলেন, রাজা মানসিংহ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিষয়বিরাগীর নির্দ্দেশানুসারে ১৫১২ খৃষ্টাব্দে

আকাশস্পর্শী মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, সেই সনাতন এবং তাঁহার ভারতপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা রূপ গোস্বামী চৈতন্যের তিরোধান শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বজনবন্দিত চরণ ধ্যান করিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কাজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী বন্ধ ছিল। মহাশোকে মতিচ্ছন্ন চৈতন্যের অনুচরগণ যেন বজ্রাঘাতে চেষ্টাহীন ও নীরব হইয়াছিলেন—কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পরে আবার ধীরে ধীরে নবজীবনের আলোকচ্ছটায় দিগ্বলয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই তিনজন প্রথম অধ্যায়ের নেতা ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিনজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আবার তেমন করিয়া খোল বাজিয়া উঠিল—যেমন করিয়া চৈতন্যের সময়ে বাজিত, আবার সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চরোলে, রামসিঙ্গার চীৎকারে ভক্তিধর্ম্ম শুধু বঙ্গ-উড়িষ্যায় নহে, মথুরা, বৃন্দাবন ও রাজপুতনায় বিজয়ী হইল। বাঙ্গালী কবিরা বাঙ্গলা-ভাষা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া ব্রজবুলীতে পদ রচনা করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহাদের অপূর্ব্বপদগুলি এখন আর শুধু বাঙ্গালীর জন্য নহে—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে তাহা গীত হইবে। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, দামোদরের দৌহিত্র বুধরী-গ্রামবাসী সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়া এই ব্রজবুলি ছন্দে যে রস বিলাইয়া দিলেন, তাহা বৃন্দাবনবাসীরা পর্য্যন্ত উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন। বাঙ্গালী কবির পদ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইল। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকরে জীব গোস্বামী ও গোবিন্দদাসের যে সকল সংস্কৃত-পত্র উদ্ধৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গালী কবিরা ব্রজবুলি ছন্দ অবলম্বন করিয়া কিভাবে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় করিয়াছিলেন।

অর্দ্ধশতাব্দী পরে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পর পর তিনটি কেন্দ্র হইয়াছিল। প্রথম কেন্দ্র নবদ্বীপে, যেখানে সর্ব্বপ্রথম বাসুদেব ঘোষের দুই ভ্রাতার হাতে খোল বাজিত এবং মুকুন্দ ও শ্রীবাস মধুর কণ্ঠে হরিনাম গাইতেন আর বক্রেশ্বর তাঁহার স্বর্গীয় নৃত্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। এই কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন চৈতন্য।

তিনটি কেন্দ্র।

চৈতন্য পুরীতে গেলে নবদ্বীপ হতশ্রী হইল। এবার খোল বাজিয়া উঠিল পুরীতে। বর্ষাকালে বাঙ্গালী ভক্তেরা শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে পুরীতে চলিয়া আসিতেন, তখন শ্রীবাসের কণ্ঠের স্বরলহরী ফিরিয়া আসিত; মুকুন্দ আবার গাইতেন,—বক্রেশ্বরের নৃত্যে, নিত্যানন্দ-সমাগমে, স্বরূপ-দামোদর, রামরায় এবং রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের প্রেমোচ্ছ্বাসে ভক্ত জনসাধারণ নীলাদ্রিনাথের পথ ভুলিয়া বাঙ্গালী ভগবানের কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। মহাপ্রভুর লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

তৃতীয় কেন্দ্র—বৃন্দাবন। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর বৃন্দাবন কতকদিন শোকে সমাচ্ছন্ন ছিল। এখানে শুধু ভক্তি ও প্রেমের চর্চ্চা হয় নাই, অশেষ দৈন্য—ব্রহ্মচর্য্যের অশেষ কঠোরতা, ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদিগের অশেষ পাণ্ডিত্য—এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া ইহাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে সনাতনের হরিভক্তিবিলাস, রূপের ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত

হইয়াছিল। এখানে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ও অশেষ পাণ্ডিত্য ও সাধুতার অমৃতফলস্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত অপূর্ব্ব চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; এখানেই নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার অসামান্য অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। উত্তরকালে জীব গোস্বামী এই বৃন্দাবন কেন্দ্রের নেতা হইয়াছিলেন। এখানে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব ও গোপাল ভট্ট—এই ছয়জন গোস্বামী বাস করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে যে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে লিখিত হইত, তাহা এই গোস্বামীদের নিকট প্রেরিত হইত। যে সকল গ্রন্থ ইঁহারা অনুমোদন করিতেন, তাহাই বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইত। যাহাতে ইঁহাদের শিলমোহর থাকিত না, তাহা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইতে পারিত না। ইঁহারা বৈষ্ণব-সমাজের বিধানকর্ত্তা ও নিয়ন্তা ছিলেন। বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিয়া ইঁহাদের অনুমোদনের জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, গোস্বামীরা ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাজ্ঞাপক ভাগবতের সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ইহার নাম 'চৈতন্যভাগবত' রাখিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী ছিলেন রূপ ও সনাতনের সহোদর অনুপমের পুত্র। জীব অতি সুদর্শন ছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা চৈতন্যের পাগল—এই সমস্ত কথা বাল্যে যখন তাঁহার মাতা বলিতেন, তখন বালকের গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িত। অল্পবয়সে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন। কিন্তু ভক্তির আকর্ষণে তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন। এই সংসার তাঁহার নিকট অল্পবয়সেই অসার বোধ হইত—পিতৃব্যদের পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্য, কৈশোরাতিক্রান্তে তাঁহার অতুল্য রূপ ও স্বাস্থ্যস্বাচ্ছন্দ্য—এসকলের আকর্ষণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। যাহাকে চৈতন্য আকর্ষণ করিতেন—তাঁহাকে কে রোধ করিবে? একদিন ষোড়শবর্ষীয় বালক জীব তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সন্ন্যাসী হয় কেমন করিয়া?" মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাস লওয়ার পদ্ধতি বলিতে লাগিলেন, কারণ—শুধু তাঁহার স্বামীর ভ্রাতারা নহেন, তাঁহার স্বামীও মৃত্যুর অনতিকালপূর্ব্বে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাশ্রুনেত্রে মাতা কিরূপে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়, কিরূপে দীক্ষা লইতে হয়, কিরূপে গৈরিক বস্ত্র পরিতে ও দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়—এই সকল কথা বলিলেন। বালক বলিল, "আমার পিতৃব্যেরা অতুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাস লইয়া জঙ্গলের বৃক্ষপত্রে শয়ন করিয়া ও তথাকার কদর্য্য ফল খাইয়া কিরূপে থাকেন?" মাতা বলিলেন, "ধর্ম্মে বিশ্বাস ও চৈতন্যের প্রতি ভালবাসার দরুন তাঁহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না।" পরদিন জীব দণ্ডহস্তে ও গৈরিক পরিয়া মাতার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মা, আমায় কি সন্ন্যাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে আমাকে প্রণাম করিবে—আমি একজন সাধু।" সুন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মাতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এমন সুন্দর চাঁচর কেশ মাথায় করিয়া কি কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে?" বালক ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, কাল দেখিবে।"

পরদিন মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিকপরিহিত কিশোর জীব মাতাকে বলিল, "মা, প্রণাম, তোমার স্নেহের দুলালকে চিরদিনের জন্য বিদায় দাও, আমি ব্রাহ্মণ, আমার পিতা ও পিতৃব্যদের যে গতি, আমারও তাহাই। আমি বিষয়ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। মা, আমি চলিলাম, তোমার স্নেহের ছেলেটিকে আর দেখিতে পাইবে না।" জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতাকে প্রণাম করিল। বজ্রাহতের ন্যায় মাতা জ্ঞানহারা হইয়া রহিলেন। রূপ-সনাতনের পরিবারবর্গ ফতেয়াবাদে বাস করিতেছিলেন, তথা হইতে জীব সন্ন্যাস লইয়া প্রথমতঃ নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

বৃন্দাবন—বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি।

শ্রীবাসের আঙ্গিনা চৈতন্যের পদরজে পবিত্র হইয়াছিল। বালক সন্ন্যাসী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই আঙ্গিনায় গড়াইয়া পড়িলেন। নবদ্বীপ হইতে কাশী যাইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট তিনি কয়েক বৎসর উপনিষদের শিক্ষালাভ করিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া স্বীয় পিতৃব্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অচিরে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইল। রূপ ও সনাতনের পরে বৈষ্ণব-সমাজে তেমন প্রতিষ্ঠা আর কাহারও হয় নাই। তিনি ২৫ খানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি। এই পুস্তকগুলির মধ্যে ষট্সন্দর্ভই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উত্তরকালে জীব গোস্বামীই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র কর্ণধার হইয়াছিলেন। কোন পণ্ডিত বা সামাজিকের শাস্ত্র-বিষয়ে দ্বিধা উপস্থিত হইলে তাঁহারা জীব গোস্বামীর নিকটে বৃন্দাবনে পত্র লিখিতেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য হইত। নাভাজি ভক্তমালে লিখিয়াছেন, "শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল শ্রীজীব গোঁসাই সব গম্ভীর। বেলা ভজন সুপক্ক রসায়ন কবহু ন অভিলাষী। বৃন্দাবন দৃঢ়বাস যুগলচরণ অনুরাগী। সন্দেহ গ্রন্থচ্ছেদন সমর্থ রসবাসী উপাসক পরম বীর। শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীজীব গোসাই সব গম্ভীর।" গ্রাউজ সাহেব তাঁহার মথুরার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "এই সময়ে বৃন্দাবনের সর্ব্বাপেক্ষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বৈষ্ণব-সমাজের নেতা ছিলেন রূপ ও সনাতন। ইঁহাদের সহিত তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর নাম করাও কর্ত্তব্য। মানসিংহ গোবিন্দজীর যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ হয়—"মহারাজ পৃথ্বীরাজের বংশোদ্ভব মহারাজ শ্রীভগবান্ দাসের পুত্র, মহারাজ মানসিংহকর্ত্তৃক এই মন্দির তাঁহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে সম্রাট্ আকবরের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে নির্ম্মিত হয়। গ্রাউজ্ সাহেব বলেন, "It is the most impressive religious edifice that the Hindu art has ever produced at least in Upper India. It is not a little strange that of all architects who have described this famous building, not one has noticed its most characteristic feature—the harmonious combination of dome and spire which is still noted as the great crux of modern art, though nearly 300 years ago ; the difficulty was solved by the Hindus with characteristic grace and ingenuity." [ভারতবর্ষে অন্ততঃ আর্য্যাবর্ত্তে এই ধর্ম্মমন্দির

স্থাপত্য হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুরা যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন—এই মন্দির তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যত স্থপতিবিশারদ এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই ইহার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই। গম্বুজ ও চূড়ার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য এই মন্দিরে যাহা দৃষ্ট হয়—তাহা শুধু সম্প্রতি য়ুরোপের স্থপতিবর্গ কলাকৌশলের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা তাঁহাদের অভ্যস্ত বৈশিষ্ট্য, মনোহারিত্ব ও কৌশল সহকারে এই সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান করিয়াছিলেন]। গ্রাউজ এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। এই মন্দির স্থপতিবিদ্যাবিশারদ কল্যাণ দাস, স্থপতি গোবিন্দ দাস এবং মানিকচাঁদ চোপরের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাদ্বারা তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

রূপনারায়ণ।

এককালে কামরূপের রাজধানী এগারসিন্দুরের নিকটবর্ত্তী ভাটাদিয়া গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামক এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নীর নাম কমলা দেবী। ইহাদের একমাত্র সুদর্শন পুত্র ছিলেন রূপনারায়ণ। অল্পবয়সে তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও দুর্‌বৃত্ত ছিলেন। সংশোধনের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীকে আদেশ করিলেন, বালককে অঙ্গার খাইতে দিতে। সাধ্বী কমলা দেবী স্বামীর আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া ভাতের থালার এক পার্শ্বে একটুক্‌রা কয়লা থুইয়া তাহা পুত্রকে পরিবেষণ করিলেন। কিন্তু রূপনারায়ণের দৃষ্টি সেই কয়লাটুকুর দিকেই সর্ব্বাগ্রে পড়িল। মাতার নিকটে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া কারণ জানিতে পারিলেন এবং তদ্দণ্ডে অন্নের থালা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রথম পঞ্চবটী নামক এক গ্রামের টোলে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তারপর নবদ্বীপে আসিয়া তথাকার টোলে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে অনুমান ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু উদ্ধত যুবক ভক্তির সেই প্রবল বন্যার পাশ কাটাইয়া কাশীতে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র আরও বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করেন। সর্ব্বশেষে রূপনারায়ণ বোম্বাইয়ের পুণা নগরীতে যাইয়া পাঠসমাপ্তিপূর্ব্বক "সরস্বতী" উপাধি লাভ করেন।

তেজস্বী উদ্ধত যুবক এখন পণ্ডিত-শিরোমণি হইলেও তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। তিনি আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আমি দিগ্বিজয়ী, যদি কোন পণ্ডিতের গৌরব থাকে, তবে সেই গৌরব পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাথর আমি। আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন।" বহু পণ্ডিতকে ঘাল করিয়া এক বোঝা জয়পত্র সঙ্গে লইয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, রূপ ও সনাতনের মত পণ্ডিত তখন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দৈন্যের অবতার ভ্রাতৃদ্বয় রূপনারায়ণের গর্ব্বিত আক্রমণের উত্তরে বলিলেন, "ভাই, তুমি ভুল শুনিয়াছ, লোকে আমাদের সামান্য গুণ বাড়াইয়া তোমাকে

বলিয়াছে। আমরা দীনহীন কৃষ্ণকৃপাপিপাসু, তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।" দাম্ভিক পণ্ডিত বলিলেন, "সে হইলে ছাড়িব না। তর্কে না পার, আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দাও।" সদাশয়তার আতিশয্যে এবং বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা উঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন, কারণ বৈষ্ণবের নীতি "অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" এই জয়পত্র হাতে করিয়া রূপ সরস্বতী মনে করিলেন—তিনি ভারতের বিদ্যারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্। কিন্তু কে যেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই দুই ভ্রাতার এক পাণ্ডিত্যাভিমানী ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন, তিনিও বড় কম নহেন। রূপনারায়ণ অমনি যাইয়া জীব-গোস্বামীর কুটিরে উপস্থিত। তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়ের স্বাক্ষরিত জয়পত্র দেখিয়া যুবক জীব-গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখনই সরস্বতীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন পর্য্যন্ত বিচারে সমকক্ষতা চলিল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জীবের নিকট রূপনারায়ণ পরাস্ত হইলেন,—সপ্তম দিনে উপনিষৎ এবং অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীব গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। রূপনারায়ণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নূতন। সপ্তমদিনের ব্যাখ্যায় পাথর গলিয়া জল হইয়া গেল—অহঙ্কার ও দর্প রসাতলে গেল। অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া রূপনারায়ণ রূপ-সনাতনের নিকট যাইয়া তাঁহার অকৃত্রিম দৈন্য ও অনুতাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তারপর তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহের সভাপণ্ডিত হইলেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। রূপনারায়ণ সঙ্গীত-শাস্ত্রেও কৃতী ছিলেন, রাজসভায় তাহারও আলোচনা চলিল।

রূপ-সনাতনের দৈন্য।

এদিকে জীবকে রূপ গোস্বামী বলিলেন, "তোমার বিচারজয়ের প্রবৃত্তি এখনও দূর হয় নাই—তুমি বৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য নও; সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কার বিলুপ্ত না হইলে বৃন্দাবনবাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বৃন্দাবনের সীমানার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।" পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জীব বৃন্দাবন ছাড়িয়া যমুনা-তীরে এক কুটিরে বাস করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া এক বৎসর কাটাইলেন। একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, "বলতো ভাই, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান গুণ কি? রূপ বলিলেন, "জীবে দয়া।" সনাতন বলিলেন, "তবে তুমি জীবের প্রতি এত নিষ্ঠুর কেন?" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রূপ জীব গোস্বামীকে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর রূপ ও সনাতনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। গ্রাউজ সাহেব লিখিয়াছেন, এই দর্শনের ফলে সম্রাট্ এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত হিন্দুরাজাদিগকে বৃন্দাবনে বড় বড় মন্দির-নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন! স্বয়ং চৈতন্যের বহু গুণকীর্ত্তন শুনিয়া তিনি চৈতন্যসম্বন্ধে একটা হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের 'গৌরলীলা-তরঙ্গিণী'তে দ্রষ্টব্য। কথিত আছে অদ্বৈত সর্ব্বপ্রথম মদনমোহন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, তিনি উহা মথুরা চৌবে নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, উক্ত চৌবে উহা সনাতনকে দিয়াছিলেন। রামদাস কাপুরী নামক একজন ক্ষেত্রী নদীতে তাঁহার

বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্যসহ জাহাজ আটকাইয়া যাওয়াতে মদনমোহন-বিগ্রহের নিকট মানত করেন, জাহাজ উদ্ধার পাইলে তিনি সেই বৎসরের সমস্ত আয় দিয়া উক্ত বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন। মদনমোহনের বিশাল মন্দির এই মানতের ফলে প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্রাউজ সাহেবের ইতিহাস, চৈতন্যচরিতামৃত, নাভাজিকৃত ভক্তমাল ও লক্ষ্মণদাসপ্রণীত ভক্তি-সিন্ধু পুস্তকে এই বিগ্রহ-সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। উত্তরকালে এই বিগ্রহ জয়পুরের রাজা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি উহা তাঁহার ভ্রাতা কারাউলির রাজা গোপাল সিংহকে প্রদান করেন, তিনি ইহার জন্য তথায় একটি নূতন মন্দির তৈরী করিয়া পূজার ভার রামকিশোর গোঁসাই নামক মুর্সিদাবাদের এক ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত করেন। এই ভাবে চৈতন্যের প্রভাবে তাঁহার ভক্তগণকর্ত্তৃক যে নব বৃন্দাবন স্থাপিত হয়, তাহা ক্রমে এরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিয়ন্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের স্থলে আর তিনজন নেতৃস্থপদে অভিষিক্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ক্ষেত্র অশেষরূপে বাড়াইয়া দেন। ইহাদের ভক্তিপূর্ণ জীবন বহু সুপ্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, বংশী-শিক্ষা, অনুরাগবল্লী, কর্ণামৃত প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। এই তিনজনের মধ্যে প্রথম নাম **শ্রীনিবাস আচার্য্যের**।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

কথিত আছে চৈতন্যদেব ইঁহার আবির্ভাবসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চাখন্দিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। বর্দ্ধমান যাজিগ্রাম ছিল ইঁহার মাতুলালয়। ইঁহার মূর্ত্তি অতি সুন্দর ছিল; বৈষ্ণব-সমাজে ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া পরিচিত। ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাসের নিকট ইনি শৈশবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কিন্তু ইঁহার পিতা ছিলেন চৈতন্যের অনুরাগী। সেই অনুরাগ পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল। শৈশবে গঙ্গাধর নবদ্বীপে ইঁহাকে লইয়া যাইয়া চৈতন্যলীলার সমস্ত স্থান দেখাইতেন ও সেই মধুরাদপি মধুর লীলাকাহিনী শুনাইতেন। বক্তা ও শ্রোতা—পিতাপুত্র—দুই জনেই কাঁদিয়া আকুল হইতেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইনি নবদ্বীপে শচী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তৎপরে পুরীতে গদাধরের নিকট ভাগবত পড়িতে যান। গদাধরের একখানি মাত্র ভাগবতের পুঁথি ছিল, তাহার অক্ষর মহাপ্রভুর অশ্রুতে মুছিয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে একখানি বিশুদ্ধ পুঁথি আনিলে তিনি পড়াইবেন—

শ্রীনিবাস।

স্বীকার করিলেন। তৎকালে যাতায়াত সহজ ছিল না। কয়েক মাস পরে শ্রীনিবাস ভাগবতের পুঁথি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, গদাধর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তখন ফিরিয়া বাঙ্গলায় আসিয়া নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবী গোস্বামিনীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনে রওনা হন, উদ্দেশ্য রূপ-সনাতনের নিকট ভক্তিশাস্ত্রপাঠ। যাজিগ্রাম হইতে পাঁচদিনে রাজমহল আসিয়া তথা হইতে গৌড়দ্বার হইয়া পাটনায় আসিলেন। কাশীতে যাইয়া চৈতন্যের লীলাক্ষেত্রগুলি, বিশেষতঃ চন্দ্রশেখরের বাড়ীর তুলসীতলা, যেখানে মুসলমান দরবেশবেশী হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, সেই সকল দেখিয়া তাঁহার মনে প্রেম ও শোকের বন্যা বহিয়া গেল। চৈতন্য-প্রেমে তিনি প্রায়ই উপবাস করিতেন, তাঁহার জীবনের কথা বলিতে বলিতে গদ্গদকণ্ঠ হইয়া আর কথা বলিতে পারিতেন না,—প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হইত চোখের জলে। যে এই সুদর্শন বালককে দেখিত সেই ইহাকে প্রাণের দুলাল ও অন্তরঙ্গ ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে চাহিত। তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিলেন সরস্বতী করুণ রসের ভাণ্ডার লইয়া। বৃন্দাবনের পথে শুনিলেন, রূপ ও সনাতন উভয়েই অল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; বৃন্দাবন তাঁহাদের শোকে অন্ধকার।

নিরাশ বালক বহু পরিতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জীব গোস্বামী ইঁহার ভক্তি ও প্রতিভাদর্শনে ইঁহাকে আশ্রয় দিয়া ভক্তিশাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে শিখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অপর দুই জন প্রসিদ্ধ যুবকের সঙ্গে ইঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজসাহী জেলার খেতুরী নামক নগরীর রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র **নরোত্তম দত্ত**। খেতুরী বেয়ালিয়া হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং পদ্মার তীরস্থ প্রেমতলী গ্রামের এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। কৃষ্ণানন্দের বহুদিন কোন সন্তান জন্মে নাই। নরোত্তম সেই রাজবাড়ীর চোখের মণিস্বরূপ ছিলেন। শ্রীনিবাসের ন্যায় নরোত্তমও অতি প্রিয়দর্শন। শৈশব হইতেই তাঁহাকেও চৈতন্যপ্রেম পাইয়া বসিয়াছিল। একদিন পদ্মার তীরে বালক সেই সমুদ্রতুল্য অসীম জলরাশি দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি দেখিলেন এক গৌরাঙ্গ পুরুষ ঊর্দ্ধলোক হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "নরোত্তম, তুমি তো বিষয়ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই—তুমি যে আমার। আমার কাছে এস।" সেই পরম অন্তরঙ্গের স্বর যেন তিনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া নদীতীরে পড়িয়া গেলেন। রাজবাড়ী হইতে বহু সন্ধানে তাঁহার খোঁজ মিলিল। চিকিৎসকেরা শিবাদিঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু নরোত্তম বলিলেন, "যদি আমার জন্য শিবা হত্যা করা হয় তবে আমি না খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।" কিন্তু রাজা দেখিলেন—যেমন দেখিয়াছিলেন কপিলাবস্তুর শুদ্ধোদন,—যেমন দেখিয়াছিলেন সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাস—ভরা যে ডুবি হয়। চৈতন্যের নাম করিতে সদ্যোবিকশিত সরসিজের ন্যায় বালকের শ্রীমুখ অশ্রুতে ভাসিয়া যায়। গৌড়েশ্বর সম্রাট্ কৃষ্ণানন্দ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ তাঁহার ইজারাদার ছিলেন। তিনি রাজার বিপদ্ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "নরোত্তমকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, আমি তাহার রোগ সারাইয়া দিব।" বহু অশ্বারোহী সৈন্য-পরিবেষ্টিত করিয়া ষোড়শবর্ষবয়স্ক

নরোত্তমকে গৌড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু তরুণ নরোত্তম সম্রাটের ফাঁদে পা দিলেন না।

ঊর্দ্ধ হইতে সেই বাণী যে তিনি সর্ব্বদা শুনিতেছিলেন। তারপর সিদ্ধার্থ যাহা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ দাস যাহা করিয়াছিলেন, রূপ-সনাতনের জীবনে যে বিরাগ দেখা দিয়াছিল সেইরূপ বিরাগের বশবর্ত্তী হইয়া বালক-নরোত্তম পালাইয়া গেলেন। প্রহরীরা জাগিয়া দেখিল—পিঞ্জর খালি, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বালক পালাইতেছেন, সংসারকে বিভীষিকা ভাবিয়া—বিলাসকে নরকের বাগুরা মনে করিয়া বিশ্ব-হিতের আহ্বানে সে কি উন্মত্তভাবে ছুটিয়াছেন! ক্ষুদ্র গিরিনদী যেরূপ শৈলখণ্ড ভাসাইয়া লইয়া যায়, দুর্দ্দমনীয় ভক্তি তাঁহাকে সেইরূপ তাড়াইয়া লইয়া চলিল। কয়েক দিন পরে দুর্গম জঙ্গলের অজ্ঞাত পথ ভাঙ্গিয়া বালক কাশীর নিকট রাজঘাটে উপস্থিত হইলেন—তখন তাঁহার সুন্দর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। দুই দিনের উপবাসী, পদ্মপ্রভ মুখখানি ম্লান, ভ্রমণে অনভ্যস্ত দুইটি পদতল কণ্টকবিদ্ধ হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এক বৃক্ষতলে পড়িয়া তিনি আর উঠিতে পারিলেন না—আবার সুস্পষ্ট স্বর শুনিলেন, "তুমি আমার জন্য এত সহিয়াছ, তরুণ জীবনে সমস্ত সুখভোগের আশা বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, উঠ খাও।" তাঁহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখনই কোন ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে এক বাটী দুগ্ধ দিয়া গেল। তিনি উহা পান করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিলেন এবং তৃপ্ত হইলেন। বৃন্দাবনের নিকট কয়েক জন তীর্থগামী সঙ্গী জুটিল। চৈতন্যের কথা বলিতে গেলে বালকের প্রেমে কণ্ঠরোধ হয়, আনন্দাশ্রুতে গণ্ড প্লাবিত হয়। সঙ্গীদেরও চোখ হইতে জল পড়ে এবং ঘনঘন রোমাঞ্চ হয়—তাহারা ভাবিল "এ দেববালক কে?"

বৃন্দাবনে আসিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত, নিঃসঙ্গ বালক পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, অনাহারে শরীর কৃশ, কিন্তু কোন স্বাধীন নৃপতি যদি কারাগার হইতে মুক্তি পান, হাত-পায়ের লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তবে তাঁহার সেই মুক্তির আনন্দই যেরূপ সকল জ্বালা জুড়াইয়া দেয়—নরোত্তমেরও সেইরূপ হইল। তাঁহার মুখ অলৌকিক প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল। এই অবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর আশ্রমে শেষরাত্রে ঢুকিয়া নিত্য নিত্য তাহার আবর্জ্জনা মুক্ত করিয়া ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আসেন। সেই অদ্ভুতকর্ম্মা, বিষয়নিঃস্পৃহ, সম্পূর্ণ অনাসক্ত, অপ্রতিগ্রাহী সন্ন্যাসী দেখিলেন, কে যেন তাঁহার আশ্রম ও আঙ্গিনা ফিটফাট করিয়া রাখিয়াছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন তিনি বিস্ময়সহকারে এই অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া এক রাত্রি জাগিয়া রহিলেন—চোরকে ধরিবার জন্য। হঠাৎ সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশীথে তিনি দেখিতে পাইলেন, দেবতার মত সুন্দর এক কুমার ঝাঁটা হস্তে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া। তাঁহার চক্ষু দুটি পদ্মদলের মত জলে ছলছল করিতেছে, কখনও ঝাঁট দিতেছেন এবং কখনও বা ঝাঁটাটি বুকে রাখিয়া অজস্র চক্ষুজলে গণ্ড প্লাবিত করিতেছেন। লোকনাথ পরম স্নেহভরে পিছন দিক্ হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"চোর! তুমি কে? আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।" লজ্জিত ও বিস্মিত বালক লজ্জাবতী তরুণীর

ন্যায় আর কথা বলিতে পারিলেন না, ভাঙ্গা স্বরে অল্প কথায় বলিলেন, "যদি ছাড়িবেন না, তবে আমাকে শিষ্য করুন।"—যে যোগিবর পাছে মনে অহঙ্কারের উদয় হয় এজন্য কখনও শিষ্য গ্রহণ করেন নাই, যিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার গ্রন্থের বহু উপকরণ দিয়া নিজের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, যিনি চৈতন্যের বাল্যসখা এবং তাঁহারই আদেশে বুকভরা ব্যথা লইয়া—চৈতন্যের শ্রীমুখদর্শনে চিরজীবন বঞ্চিত হইয়া—বৃন্দাবনের এককোণে দুশ্চর প্রেম-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই বিষয়বিরাগী, কৃষ্ণে সমর্পিতজীবন প্রেমের সন্ন্যাসীর অটল সঙ্কল্প আজ টলিল। বিশাল বিটপিশাখা যেরূপ বনলতাকে আশ্রয় দেয়, তিনি সেই ভাবে নরোত্তমকে দীক্ষা দিয়া তাঁহার নিকট রাখিলেন। ক্রমে বালকের পাণ্ডিত্য, অসীম ভক্তি ও পদগৌরব বৃন্দাবনে বিদিত হইল, জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের সঙ্গে তাঁহারও শিক্ষার ভার লইলেন।

তৃতীয় ব্যক্তির নাম **শ্যামানন্দ**। ইনি নিম্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার দণ্ডকেশ্বর পরগনার ধারেন্দা বাহাদুরপুরবাসী ছিলেন। কিন্তু এই পরিবার শেষে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের নাম ছিল দুঃখী। অল্পবয়সেই ইঁহার বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি কালনায় আসিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের চৈতন্যমন্দিরে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন। এখানকার পুরোহিত হৃদয়চৈতন্য দয়া করিয়া ইঁহাকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইঁহার দুঃখী নাম ঘুচাইয়া কৃষ্ণদাস নাম দিয়াছিলেন। কালনা হইতে ইনি যাত্রা করিয়া ভারতের যাবৎ তীর্থস্থান দর্শন করেন। "রসিকমঙ্গল" নামক পুস্তকে ইঁহার বিস্তৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দেওয়া আছে। ইংরেজেরা যাহাকে mystic বলেন, ভারতের সাধু-সম্প্রদায়ের সকলেই সেই শ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা যে সকল রূপ বা দৃশ্য দর্শন করেন, তাহা সাধারণ লোকেরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায় না। নরোত্তম তাঁহার মানস গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসও কত কি দেখিয়া সমাধির দশা প্রাপ্ত হইতেন, "কর্ণানন্দ" প্রভৃতি পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায় মৃতকল্প হইয়া থাকিতেন, আত্মীয় ও ভক্তগণ তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করিয়া বিষণ্ণ হইতেন। মহাপ্রভুর তো কথাই নাই, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে ছিল তাঁহার জীবন। সেই আশ্চর্য্য কবিত্বময় স্বপ্নগুলি সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগতের দৃশ্যের ন্যায়—তাহা ধরা-ছোঁয়া যাইত না। ক্যাথারিন অব সিয়েনা (১৩৪৭ খৃঃ জন্ম) ছয় বৎসর বয়সে এক গির্জ্জা-ঘরের উপরে খৃষ্টের মূর্ত্তি দেখিতেন, তাঁহার জীবনই এই স্বপ্নঘোরে কাটিয়াছিল। জীবনে কতবার যে এই মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার ঠিকানা নাই। সেন্ট টেরেসা (১০৯১-১১৪৩ খৃঃ) খৃষ্টমূর্ত্তি এতবার দেখিয়াছেন যে তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রেমের আবেগে মনে হইয়াছে যে তিনি ও খৃষ্ট এক। জয়দেবের রাধার সম্বন্ধে "মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা", বিদ্যাপতির "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই" এবং ভাগবতের গোপীদের "অনুক্ষণ কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা নিজেই কৃষ্ণ এই ভাবিতে লাগিলেন" প্রভৃতি কাহিনীর সঙ্গে এই সকল ক্যাথলিক সাধুজীবনের অনুভূতির অনেকটা ঐক্য আছে। আণ্ডার হিলের 'মিষ্টিসিজম' পাঠ করিলে পাঠক

শ্যামানন্দ।

এ সম্বন্ধে বহু কথা জ্ঞাত হইবেন। মুসলমানদের মধ্যে জেলালুদ্দিন (১২০৭-১২৭৩ খৃঃ), হাফিজ (১৩০০-১৩৮৮ খৃঃ), এবং জামি (১৪১৪-১৪৯৩ খৃঃ) প্রভৃতি সুফী কবি ও সাধুদিগের আধ্যাত্মিক অনুভূতি এইরূপ হইয়াছিল। শ্যামানন্দ একদিন বৃন্দাবনে এক মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, আরতি হইয়া গিয়াছে, পাণ্ডারা চলিয়া গিয়াছেন—এমন সময়ে স্বয়ং রাধিকা তথায় আসিয়া কৃষ্ণকে পরিক্রমা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সে কি স্বর্গীয় ভঙ্গী! কি আনন্দ কি 'গতি অতি সুলবনী'! শ্যামানন্দ অপলক হইয়া দেখিতে লাগিলেন, দেবনৃত্যের বিরাম নাই। সমস্ত রাত্রি নিমেষের মত চলিয়া গেল। পাখীরা কাকলী করিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া রাধিকা তাঁহার এক পায়ের স্বর্ণনূপুর ফেলিয়া গিয়াছেন। সমস্তটাই একটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত, কিন্তু স্বর্ণনূপুরটিতো একটা খাঁটি সামগ্রী, তাহা কি করিয়া সেখানে আসিল? সেই নূপুরটি হাতে করিয়া যখন শ্যামানন্দ সাশ্রুনেত্রে জীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এই অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াছিলেন, অনেক পুস্তকে এই কাহিনীটি বর্ণিত আছে। নিম্ন-কুলজাত হইলেও জীব গোস্বামী বিশেষ যত্নের সহিত শ্যামানন্দকে ভক্তিশাস্ত্র পড়াইয়া-ছিলেন। যুবকের অসামান্য মেধা ও ধারণাশক্তি-দর্শনে জীব গোস্বামী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া গুরু তাঁহার শিষ্যের নিকট হইতে এরূপ সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী না হইয়া পারেন নাই। বৈধী ভক্তি, রাগানুগা, স্বকীয়া ও পরকীয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্যামানন্দকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বশেষ উপদেশ ছিল :—"তুমি তোমার উপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে ভাল করিয়া বুঝিবে, তোমার শ্রোতা জড়বাদী কিনা, যদি তাহা হয়—তবে তাহাকে কিছুই বলিবে না, তোমার সমধর্মী ও চিত্তবৃত্তির অনুকূল ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবে।"

ইহার প্রথম নাম ছিল "দুঃখী", দ্বিতীয় নাম "কৃষ্ণদাস", তৃতীয় নাম জীব গোস্বামীর দেওয়া "শ্যামানন্দ", এই নামই উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদে ইনি 'দুঃখী' 'দুঃখিনী' অথবা "দুঃখী কৃষ্ণদাস" এইরূপ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের একখানি পদ্যানুবাদ রচনা করেন, তাহার এক মাত্র পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।

এই যে তিন ব্যক্তির কথা বলা হইল, ইহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান পাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ এই তিন ব্যক্তির কীর্তিপ্রদীপে উজ্জ্বল। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। জনসাধারণের উপর ইহাদের যে প্রভাব হইয়াছিল, তাহার তুলনা বঙ্গদেশে বিরল।

জীব গোস্বামী কৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাসের উপাধি দিলেন 'শ্যামানন্দ,' শ্রীনিবাসের উপাধি হইল 'আচার্য্য' এবং নরোত্তমের উপাধি হইল 'ঠাকুর মহাশয়'। বৈষ্ণব-সমাজে আচার্য্য প্রভু বলিতে একমাত্র শ্রীনিবাসকে ও ঠাকুর মহাশয় বলিতে শুধু নরোত্তমকে বুঝাইবে। এই তিন জনেই জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। তিনি

আদেশ করিলেন—"আমাদের এই ভক্তিগ্রন্থগুলি লইয়া তোমরা গৌড়দেশে যাও, নতুবা শুধু বই পাঠাইলে কি হইবে—ইহাদের ব্যাখ্যা করিবে কে ?"

শ্রীনিবাস বলিলেন—"আমরা সন্ন্যাসী, কি করিয়া আমরা গৃহে যাইব, আপনাকে ছাড়াই বা আমরা থাকিব কিরূপে ? আপনার সঙ্গ ছাড়া স্বর্গও সুখকর নহে। জীব উত্তর করিলেন, "সত্য নিজে পাইয়া অপরকে বিতরণ করা ইহাই মুখ্য কর্ত্তব্য। আমি তোমাদের গুরু। আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, দ্বিরুক্তি করিও না।"

বঙ্গদেশে রাজদস্যুর খপ্পরে

১২১খানি ভক্তিগ্রন্থ—তন্মধ্যে সনাতনের হরিভক্তিবিলাস, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু, চৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বল-নীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান রত্নভাণ্ডার ছিল। একটি কাঠের বাক্সে মোমজমার আবরণে সুরক্ষিত করিয়া তাহা বড় একটা শকটে উত্তোলিত হইল। চারিটী বিশালকায় বৃষচালিত শকট ও তৎপরিচালক ১০ জন সশস্ত্র ব্রজবাসীর সহিত যুবক সন্ন্যাসিত্রয় জয়পুর রাজের নিকট হইতে অনুমতিপত্র লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ছোটনাগপুরের বিশাল অরণ্য—ঝারিখণ্ড। ইহারা তথায় কোকিল-কলরব-মুখরিত বনশোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং চৈতন্য একদা ঐ বনে ভক্তির আবেশে বৃক্ষ ও লতাপল্লবকে কৃষ্ণ ভাবিয়া প্রিয়সম্বোধন-পূর্ব্বক ছুটিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই প্রেমের পাগল দেবতার কথা সর্ব্বত্র মনে করিয়া ইহারা কখনও তাঁহার পদরজের স্পর্শের আশায় সেই ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেন। বামে মগধের প্রান্তভূমি, তাঁহারা আগ্রা হইয়া ইটা নামক স্থানে একটা প্রশস্ত পথ দিয়া চলিলেন।

এই সময়ে বনবিষ্ণুপুরের রাজা **বীরহাম্বির** অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দস্যু-বৃত্তি করিয়া স্বরাজ্যের বাহিরে নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। সময়টা ছিল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত, পাঠান ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল। গৌড়েশ্বর প্রবল বহিঃশত্রুকে দমন করিতে ব্যস্ত, সমস্ত নৃপতিরা দেশ লুটপাট করিতেন, রাজস্ব দিতেন না, কিন্তু গৌড়ের বাদশাহের মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করার সময়ে, গৃহকলহ বাড়াইবার ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না ; এইজন্য দেশে একরূপ অরাজকতা চলিয়াছিল। বীরহাম্বির কতকটা স্বাধীন হইয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেন। সম্ভবতঃ কতলু খাঁ নবাবের নিকট তিনি উত্তরকালে ১,৩৭,০০০৲ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখনও তিনি ঐরূপ কোন সন্ধি করেন নাই। তাঁহার নিজের ১৫টি প্রধান দুর্গ ছিল এবং তাঁহার অধীন ১২ জন সামন্ত রাজার আরও ১২টি দুর্গ ছিল। যদিও শেষে রাজস্ব দেওয়ার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুরসিদ্ কুলিখাঁএর রাজত্বের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বনবিষ্ণুপুরের রাজারা একরূপ স্বাধীন ছিলেন।

একটা শকটের পিছনে গেরুয়াধারী তিনজন সন্ন্যাসী এবং ১০ জন সশস্ত্র ব্রজবাসীকে দেখিয়া বীরহাম্বিরের গুপ্তচরেরা মনে করল—নিশ্চয়ই এই শকট বহু ধনরত্নে বোঝাই। তারপর যখন সন্ন্যাসিগণের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ইহার মধ্যে কি আছে ? তখন তিনি শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে নিশ্চিন্তমনে বলিয়া ফেলিলেন—

"রত্ন",—গ্রন্থ কথাটা মনের ভিতর উহ্য রহিল। চরেরা এখন ঠিক বুঝিল ইহা মণিমাণিক্য না হইয়া যায় না। বীরহাম্বিরের রাজসভায় জ্যোতিষিপ্রবর গণিয়া বলিলেন—ঐ শকটের বাক্সে ধনরত্ন আছে। গুপ্তচরেরা শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সঙ্গে বীরহাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুদল। তামর নামক একস্থানে আসিয়া দস্যুরা কালীপূজা করিয়া লইল এবং সেই গ্রামেই তাহারা শকটটি আক্রমণ করিবে প্রথমতঃ এরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে সুবিধা হইল না। তারপর রঘুনাথপুর হইয়া শকট ধীরগতিতে পঞ্চবটী নামক স্থানের দিকে আসিল, এই গ্রামের দক্ষিণে মালিয়ারা গ্রামে সন্ন্যাসিত্রয় এক সদাশয় জমিদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাত্রিবাস করিলেন, পরদিন ইঁহারা গোপালপুর পল্লীতে আসিয়া পৌছিলেন,—ঐ সময়ে রাত্রিকালে দুইশত দস্যু রাহাজানি করিয়া শকটসহ বৃহৎ কাষ্ঠাধার লইয়া চম্পট দিল।

বীরহাম্বির প্রচুর ধন-লোভের আশায় সেই রাত্রে ঘুমান নাই। সেই রাত্রেই বাক্স আসিয়া তাঁহার রাজপ্রাসাদে পৌছিল। তিনি উহা পাইয়া এত হৃষ্ট হইয়াছিলেন যে বাক্স খুলিবার পূর্ব্বেই দস্যুদিগকে পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

তিনি ভাণ্ডারে যাইয়া বাক্স খুলিলেন। কিন্তু একি, প্রথমেই একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। "রূপের আখর যেন মুকুতার পাঁতি", মহাপ্রভু বলিতেন। সেই মুক্তাসম অক্ষরগুলি দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, সমস্তই পুস্তক—ধর্ম্মগ্রন্থ, রত্নের নামগন্ধ নাই। বীরহাম্বির সভার জ্যোতিষী পণ্ডিতকে বলিলেন, "তোমার ভবিষ্যদ্‌বাণী এইরূপ!" জ্যোতিষী লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। রাজা বলিলেন, "রত্ন বই কি? যে জহরত চিনে, তাহার নিকট এগুলি রত্নই বটে!" গুপ্তচরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সাধু—কোন্ পণ্ডিতের আজীবন সাধনার ফল তোমরা লইয়া আসিয়াছ? তাঁহাদের উপর তো অত্যাচার হয় নাই? তাঁহাদের নিঃশ্বাসে আমার রাজপ্রাসাদ দগ্ধ হইয়া যাইবে।" গুপ্তচরেরা বলিল, "মহারাজের নিষেধ আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, যেখানে বিনা অত্যাচারে কার্য্যসিদ্ধি হয়—সেখানে আমরা কোন আঘাত করি না, এক্ষেত্রে নিরীহ সাধুদিগের প্রতি কোনই অত্যাচার হয় নাই। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে মৌন হইয়া রহিলেন। রাণী সুদক্ষিণা আসিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

এদিকে তিন সাধু-যুবকের মনে যে শোক হইল—তাহা বর্ণনীয় নহে। সাধু-মহন্তদের আজীবন তপস্যার ফল তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত ছিল, সেই পবিত্র মহামূল্যবান্ ন্যাস অপহৃত হইল। তাহাদের আর নকল ছিল না, বঙ্গদেশ হইতে গ্রন্থগুলি নকল করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রেরিত হইবে—এই ছিল ব্যবস্থা। হরি-ভক্তিবিলাস ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মহারত্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। ধৈর্য্যহারা না হইয়া শ্রীনিবাস গ্রামবাসী একজনের নিকট হইতে কাগজ-কলম লইয়া জীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের তখন বৃদ্ধ বয়স, এই শোকসংবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, সেইখানেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং তখনই বা তাহার অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

অপরদিকে শ্রীনিবাস তাঁহার দুই বন্ধুকে গৌড়মণ্ডলে পাঠাইয়া দিলেন, নরোত্তমের

হাতে শ্যামানন্দকে সঁপিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যাবৎ এই হৃতরত্নের সন্ধান করিতে না পারি তাবৎ আমি এখানেই থাকিব। এই গ্রন্থগুলির উদ্ধার-চেষ্টায় আমার প্রাণ গেলে তাহাও মঙ্গল।" নয়দিন পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের সমীপবর্ত্তী স্থানগুলি ঘুরিয়া শ্রীনিবাস জানিলেন, সে দেশের রাজা স্বয়ং একজন দস্যু সুতরাং অপহৃত পুস্তকগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোন সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। দশমদিনে তিনি দেওয়ালি নামক গ্রামে পৌঁছিলেন—এই গ্রাম বিষ্ণুপুর হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত এবং যশোদা নদীর তীরবর্ত্তী। সেইখানে কৃষ্ণবল্লভনামক এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়; ব্রাহ্মণ বটু ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুঝিলেন, ইঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ। যুবক তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেখানে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িতে একটু সাহায্য করেন, তবে তিনি চিরকৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইবেন। স্বপাকে শুধু সিদ্ধ তরকারী দিয়া একবেলা দুটি ভাত খাইতেন, পরণে ছোট একখানি কটিবাস, শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে পড়াইতে লাগিলেন। চুম্বক-পাথর যেরূপ ইস্পাতকে আকর্ষণ করে, শ্রীনিবাসের বিষণ্ণ ও করুণ মূর্ত্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণবল্লভকে সেইরূপ আকর্ষণ করিল। কৃষ্ণবল্লভ রাজসভায় ব্যাসাচার্য্যের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে যাইতেন। হিন্দু রাজগণ সম্ভবতঃ সেনবংশের সময় হইতেই অপরাহ্ণে ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিতেন, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মপাল প্রভৃতি রাজাও ঐ ভাবে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন; তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলের এই উক্তি বিশ্বাস্য নহে। পরবর্ত্তী হিন্দু রাজারা ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতেন। গ্রাম্য কবি প্রাচীন সংস্কারগুলির মধ্যে এই গোলযোগ ঘটাইয়া থাকিবেন।

বীরহাম্বির দস্যুপতি দুর্দ্দান্ত রাজা হইলেও তাঁহার সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যের নিকট সেই দেশের চিরাগত রীতি অনুসারে অপরাহ্ণে শাস্ত্রপাঠ শুনিতেন। উৎসুক হইয়া শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাগবত-পাঠ কেমন শুনিলে?" কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন, "আমার মন আপনার পাদপদ্মে পড়িয়াছিল, আপনার সঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি।" শ্রীনিবাসকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণবল্লভ সেই শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে তাঁহাকে পরদিন রাজসভায় লইয়া গেলেন। প্রথম দিন শ্রীনিবাস নির্ব্বাক্ হইয়া সেই ব্যাখ্যা শুনিলেন। দ্বিতীয় দিন আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "আপনি প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন!" ব্যাসাচার্য্য একথার কোন উত্তর করিলেন না, তৃতীয় দিনও শ্রীনিবাস বলিলেন, "আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ শ্রীধরকে ত্যাগ করিয়া নিজের মত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। শ্রীধরের টীকা ছাড়িয়া আপনি রাসপঞ্চাধ্যায় বুঝিতেই পারিতেছেন না।" এ কথার উত্তর না দিয়া ব্যাসাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সভাপণ্ডিতকে বলিলেন, "এই ব্রাহ্মণ আপনার ব্যাখ্যায় তুষ্ট নহেন, আপনি কি ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন?" বিরক্তির স্বরে ব্যাসাচার্য্য বলিলেন, "এই গৈরিকধারী যুবকের আস্পর্দ্ধা দেখুন, আমার ব্যাখ্যায় ভুল ধরিতে পারে এমন পণ্ডিত এদেশে কে আছে?" শ্রীনিবাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আসুন, আপনি ভাগবত

ব্যাখ্যা করুন, দেখি আপনি কত বড় পণ্ডিত!" এই বলিয়া তিনি বেদী ছাড়িয়া উঠিলেন, অকুণ্ঠিতভাবে শ্রীনিবাস তাহাতে আসীন হইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সে কি কণ্ঠ, সে কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য! তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা অসীম ভক্তিতে যেন উছলিয়া উঠিতেছে। সেই ব্যাখ্যা যেন নৈবেদ্যের মত, অশ্রুর ডালির মত তাঁহার প্রাণের দেবতাকে উৎসর্গ করিতেছেন, যেন সপ্ততন্ত্রী বীণা নারদের অঙ্গুলীস্পর্শে বাজিতেছে! রাজা ও অপরাপর শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এমন কি ব্যাসাচার্য্যও বুঝিলেন যে সত্য সত্যই সেদিন বনবিষ্ণুপুরের রাজ্যের প্রকৃত গুরু আসিয়াছেন। পর দিন শীঘ্র শীঘ্র যার যার কাজ সারিয়া শত শত লোক আবার শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিতে রাজবাড়ীতে ভিড় করিল, বিপুল হরিধ্বনির সঙ্গে শ্রীনিবাস ভাগবতের ডুরি খুলিলেন। সেদিনের ব্যাখ্যায় পাষাণ গলিয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুর তুফান বহিয়া গেল—অশ্রুচক্ষে সকলে দেখিল শ্রীনিবাস মানুষ নহেন,—দেবতা। রাজা সভাভঙ্গের পর অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। রাজবাড়ীর এক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে তাঁহার স্থান করিয়া দিয়া নানারূপ উপাদেয় ভোজ্যের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস নিজে ভাতেভাত রাঁধিয়া এক বেলা মাত্র আহার করিলেন। সেই সন্ধ্যাকালে রাজা তাঁহাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি কে? কেন আসিয়াছেন? শুনিয়াছি কোন বিপদে পড়িয়া আপনি এ রাজ্যে আসিয়াছেন, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন সাহায্য হয় তবে অকুণ্ঠিতচিত্তে আমায় বলুন।" শ্রীনিবাসের বুকের ব্যথা উথলিয়া উঠিল। তিনি গদ্‌গদ-কণ্ঠে সকল কথা বলিলেন। উপসংহারে বলিলেন, "গোস্বামিগণের এই অমূল্য রত্নভাণ্ডার আমার হাতে ন্যস্ত ছিল, এগুলি না উদ্ধার করিতে পারিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, আমার সঙ্গী এক রাজকুমার ও অপর এক তরুণ সাধু শোকান্বিত হইয়া বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছেন।"

হাম্বিরের অনুতাপ।

তখন রাজা ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"আমার মত নরপিশাচ আর নাই, আপনারা যে দস্যুকে খুঁজিতেছেন, আমিই সেই দস্যু—আমার মত অপরাধী এত বড় রাজ্যে দ্বিতীয় নাই। আপনার সেই গ্রন্থগুলি যেমন ছিল তেমনই আছে, আপনি আশ্বস্ত হউন। আমার রাজ্যের নরহত্যাকারীর যে সাজা তাহাই আমাকে দিন।" এই বলিয়া নতজানু হইয়া রাজা সাশ্রুনেত্রে শ্রীনিবাসের পায়ে পড়িলেন, তাঁহার রাজবেশ ধুলায় লুণ্ঠিত হইল। সমসাময়িক প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভক্তিরত্নাকর ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরের লেখা। তাহার কাহিনীও প্রায় এইরূপ; দুই একটি জায়গায় সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্নাকরের সময়ে শ্রীনিবাস দেবতাস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি যেদিন প্রথম বীরহাম্বিরের রাজসভায় প্রবেশ করেন—সেই দিন তাঁহার উজ্জ্বলচ্ছটামণ্ডিত স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত ভাগবত-পাঠ শেষ না হইবে, তাবৎ বসিয়া শোনা আমার রীতি নহে।" ইহা ছাড়া প্রেমবিলাসের মতে রাজসভায় রাস-পঞ্চাধ্যায় প্রথম দিন পঠিত হইতেছিল, কিন্তু ভক্তি-রত্নাকরের

বর্ণনায় "ভ্রমর-গীতা"র কথা লিখিত হইয়াছে। মোটামুটি কাহিনীটি একরূপ, তবে পরবর্ত্তী ভক্তি-রত্নাকরের অতিরঞ্জিত ভক্তির বর্ণনা হইতে প্রেমবিলাসের সরল স্বাভাবিক বর্ণনা আমাদের কাছে অধিকতর প্রামাণিক মনে হয়।

এই ঘটনার পর রাজা স্বয়ং, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য, রাণী সুদক্ষিণা প্রভৃতি সকলেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার রাজ্যশাসনের ভার শ্রীনিবাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গৈরিকবসনপরিহিত সাধুর রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করা এই নূতন নহে; মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের উপর এইরূপ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, দেবপাল তদীয় মন্ত্রী দর্ভপাণির উপর সমস্ত বিষয়ে নির্ভর করিতেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরেশ্বর ঈশান মাণিক্য তাঁহার গুরুদেব বিপিনবিহারীর হস্তে ঋণজালজড়িত ত্রিপুররাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ ও সংকীর্ত্তনীয়ারা বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও বৰ্দ্ধমান অঞ্চলের লোক। গোবিন্দ দাসের বাড়ী ছিল শ্রীখণ্ড (বৰ্দ্ধমান)। ইনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের একান্ত অন্তরঙ্গ, রামচন্দ্র কবিরাজের সহোদর; জ্ঞান দাসের বাড়ী কাঁদরা, লোচন দাসের বাড়ী কোগ্রাম, আর আর প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব কবিই বৰ্দ্ধমান ও বীরভূমনিবাসী।

বীরহাম্বিরের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের ফলে দেশে স্থাপত্যশিল্প বিশেষরূপে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। বনবিষ্ণুপুরে বহু বৈষ্ণবমন্দির গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্য ও কারুকার্য্য বঙ্গদেশে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কলাচর্চ্চার নিদর্শনস্বরূপ। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে পুঁথির মলাটে, প্রাচীরের গায়, কাষ্ঠফলকে, কাগজে ও কাপড়ে এই সময়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক সহস্র সহস্র চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীনিবাস ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য খুব বিস্তৃত ভাবে চালাইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজাদের সাহায্যে শুধু বীরভূম, বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল নহে, ত্রিপুরা, মণিপুর, ময়নামতী-পাহাড় এবং কুকী প্রভৃতি উলঙ্গ পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। পার্ব্বত্য ত্রিপুররাজ্যের পাহাড়িয়া লোকদিগকে আমি কুমিল্লায় নিম্ন সমতলভূমে প্রায়ই দেখিয়াছি। তাহারা স্ত্রীপুরুষে কাঠ বিক্রয় করিবার জন্য কুমিল্লায় অবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ফিরিবার মুখে দোকান হইতে চৈতন্য-চরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা টিপ্রা ভাষায় কথা বলে—সে ভাষা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ, কিন্তু কিছু কিছু ভাঙ্গা বাঙ্গলা বলিতে পারে, অথচ চৈতন্য-চরিতামৃতের মত কঠিন পুস্তক তাহারা লইয়া যায়। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রচারকগণ ও তাঁহাদের বংশধরেরা যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহায় ছিল—বনবিষ্ণুপুর ও খেতুরীর রাজভাণ্ডার। এদিকে শ্যামানন্দ সমস্ত উড়িষ্যাদেশবাসী রাজন্যবর্গকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান শিষ্য রাজা রসিকানন্দের রাজভাণ্ডার এই প্রচারকার্য্যের সহায় ছিল। চৈতন্য দীর্ঘকাল উড়িষ্যায় ছিলেন। তথাকার বহু পল্লীতে গৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে,

খাস্ বাঙ্গলা দেশে যত গৌরাঙ্গবিগ্রহ তদপেক্ষা অনেক বেশী বিগ্রহ উড়িষ্যার পল্লীতে পল্লীতে পূজা পাইয়া থাকেন। এই প্রচারের উদ্যমশীলতা শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা সুরধুনীর তীরের কীর্ত্তন সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশে প্রচলন করিয়াছেন। সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী এবং গোপাল ভট্টের চেষ্টায় মধ্যভারত ও রাজপুতনায় প্রচার চলিয়াছিল, শেষোক্ত স্থানে কতকগুলি ষ্টেট গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। মধ্য ভারতের ছতরপুরের রাজা ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাসমারোহের সহিত গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি শান্তিপুরবাসী অদ্বৈত প্রভুর এক বংশধরের শিষ্য। দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে চৈতন্য প্রভুর ধর্ম্মে দীক্ষিত দল আছেন। ত্রিবাঙ্কুরের সন্নিহিত কোন স্থানে ঐরূপ একটি দল থাকার কথা আমরা শুনিয়াছিলাম। এমন কি একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুখে আমি শুনিয়াছি, আফগানিস্থানবাসীদের মধ্যে চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত লোক আছেন। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র কবি ও সাধু তুকারামের চৈতন্যসম্বন্ধে একটি 'অভঙ্গ' আছে, তাহাতে তুকারাম তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি গৌরাঙ্গকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার আর. ডি. ভাণ্ডারকরের নিকট এই অভঙ্গটি আছে। আকবর বাদশাহ যে গৌরাঙ্গসম্বন্ধে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন,—সেই হিন্দি গানটি ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

সুতরাং দেখা যায়—অনুসন্ধান করিলে সমস্ত ভারতবর্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকাশ এবং বিস্তারসম্বন্ধে একখানি ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, তাঁহারা এক হইতে পারেন। গোস্বামিগণ তো সে চেষ্টা করিবেনই না। সাহেবেরা যখন অগ্রণী হইয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কোন্ সাহসে সেরূপ মৌলিক ব্যাপারে হাত দিবেন? অথচ ব্যাপারটি গুরুতর হইলেও খুব কঠিন নহে; খড়দহ ও শান্তিপুরের গোস্বামিগণের শিষ্যতালিকা এবং শ্রীনিবাসের বংশধরগণের শিষ্যতালিকা খুঁজিলে বিস্তর উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। মণিপুর, ত্রিপুরা, মধ্য-ভারতের ছতরপুর এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি রাজগণের পুঁথিশালায় এবং বংশতালিকায় এসম্বন্ধে অবশ্য অনেক তথ্য আছে। কোন শিক্ষিত ও কর্ম্মী যুবক যদি এসম্বন্ধে উদ্যোগী হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত একটা উপকার হয়। বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ দেখাইবার জন্য নবদ্বীপের ধুলটে একবৎসর একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, এমন শুনিয়াছি। কিন্তু এই ইতিহাস-লেখার কার্য্যে উৎসাহ কে দিবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যিনি বাহিরের কোন উৎসাহের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় প্রাণের অনুরাগে কাজ করিবেন, রিক্তহস্ত হইলেও ভগবান্ তাঁহার ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতকার্য্য হইবেন

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দ্বার উদ্ঘাটন।

হিন্দুরা নবব্রাহ্মণ্যের যুগে তাঁহাদের ধর্ম্ম অন্যের অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন—বৈষ্ণবেরা এই যুগে সর্ব্বপ্রথম সেই অচলায়তনের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর হইতে খেতুরীতে (রাজসাহী জেলা) নরোত্তমের নিকট গ্রন্থগুলির উদ্ধার ও রাজার দীক্ষাদিসম্বন্ধে সমস্ত কথা জানাইয়া চিঠি পাঠাইলেন। নরোত্তম ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু নরোত্তম রাজপ্রাসাদে গেলেন না, তিনি তথাকার কৃষ্ণমন্দিরে রহিয়া গেলেন এবং পিতামাতাকে জানাইলেন, তিনি যে সন্ন্যাসী সেই সন্ন্যাসী থাকিবেন, গেরুয়া ছাড়িবেন না, এবং কৃষ্ণমন্দিরের যে নির্দ্দিষ্ট ভোগ আছে, তাহা হইতে প্রসাদ পাইবেন। খাওয়া-দাওয়া কিংবা অন্য কোন সম্বন্ধে অনুরোধের বাড়াবাড়ি করিলে তিনি খেতুরী ছাড়িয়া পালাইবেন। তাঁহার স্থানে তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত রাজা হইয়াছিলেন। নূতন রাজা ও বৃদ্ধ কৃষ্ণানন্দ দত্ত ভয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ ভিন্ন অপর সকলে নরোত্তমের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন, তাঁহার রাজপরিচ্ছদ নাই, শিরোভূষণ নাই, রাজদণ্ড নাই, শুধু গেরুয়া, মুণ্ডিত মস্তক ও দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া যেন একখানি দেবমূর্ত্তি ঝলমল করিতেছে। সেই মূর্ত্তিতে এমন একটা গৌরবের ঘটা ছিল যে স্বয়ং পিতা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গ্রন্থোদ্ধারের সংবাদ খেতুরী রাজধানীতে ঢাকঢোল এবং অপরাপর বাদ্যযন্ত্রের উচ্চতানে এবং রজনীতে শত শত দীপের আলোকে বিঘোষিত হইয়াছিল। নরোত্তম মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, খেতুরীতে গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেই ইচ্ছার কথা আভাসে জানিতে পারিয়া সন্তোষ দত্ত তাঁহার সমস্ত রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিলেন, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এই উৎসব সম্পন্ন করিবেন—ইহাই সঙ্কল্প করিলেন। সম্ভবতঃ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে এই স্মরণীয় উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। এত ঘটা বৈষ্ণব-সমাজে আর হয় নাই; পাণিহাটির দণ্ডমহোৎসবের (১৫০৯ খৃঃ) পর এই উৎসব বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে আসিয়াছিলেন; নিমন্ত্রণ-পত্রিকা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছিল; তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"আমরা সকলের নাম জানি না, জানা সম্ভবপরও নহে। যিনি এই উৎসবে যোগ দিয়া আমাদের উৎসব সফল করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই দয়া করিয়া আমাদের এখানে আসিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। রবাহূত ও আহূতের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা রাখিব না।" এইরূপ সার্ব্বজনীন নিমন্ত্রণ আর কোথায়ও কখনও হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। এই উৎসব বৈষ্ণবদিগের "মহোৎসবের" মতই উদার এবং সর্ব্বব্যাপী। সন্তোষ দত্ত উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পাথেয় দিয়াছিলেন; সেই শত সহস্র অভ্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়াছিল, শতবর্ষবয়স্কা, অতি শীর্ণা, উপবাসকৃশা, তপঃপ্রভায় উজ্জ্বলকান্তি, বিশ্বজননীকল্পা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার স্বামীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য খেতুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন মন্দিরে স্বামীর বিগ্রহের দিকে যুক্ত করে চাহিতে চাহিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিয়া পড়িতেছিল তখন শত শত লোকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। ভৃত্য ঈশানের মুখে সন্তোষ দত্ত জানিতে পারিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া শেষ দশায় বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা পোষণ করেন, জানিয়া তদর্থে গোপনে তরুণ রাজা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাথেয় এবং ১৫০৲ টাকা

প্রদান করেন। শ্রীনিবাস, বীরহাম্বির, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। সন্তোষ দত্ত শ্রীনিবাসকে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা এবং বহুমূল্য গহনের এক জোড়, ব্যাসাচার্য্যকে একখানি রেশমী বস্ত্র এবং ৫৲ টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন। সকলেরই পাণ্ডের এবং পদগৌরব অনুসারে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। এই বিরাট্ উৎসবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিরা উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব্ববর্ণিত প্রসিদ্ধ রূপনারায়ণ পণ্ডিত, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেকের নামই এই উপলক্ষে প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে। এই সকল ঘটনা প্রেমবিলাস-প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের চাক্ষুষ বিষয়, সুতরাং তাহাতে বর্ণনার সমস্ত খুঁটিনাটিই পাওয়া যায়। শ্যামানন্দ স্বয়ং যে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানটি রচনা করিয়াছিলেন, সেই "শুনলো পরাণ সই, মরম কথা তোরে কই"—আদ্য পদটি উৎসবে যখন গাওয়া হয়, তখন লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল নরোত্তমের উপর, রাধার কথা ভুলিয়া তাঁহারা তখন তাঁহাদের সন্ন্যাসী রাজকুমারের কথাই ভাবিতেছিলেন। "আমার ধৈর্য্যশালা হেমাগার, গুরু গৌরব সিংহদ্বার,—আমার সকলই ত ছিল সই—বংশীরব বজ্রাঘাত প'ড়ে গেল অকস্মাৎ" ইত্যাদি কথায় যিনি কৃষ্ণের আহ্বানে রাজকুলের গৌরব—হৈম প্রাসাদ ছাড়িয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার ছাড়িয়া নিরহঙ্কার, দীনাতিদীন হইয়াছেন—তাঁহারই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই উৎসবে দেবীদাস ও গোকুলদাস দুই প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার সুমধুর পদকীর্ত্তনে—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি মহাজনের পদরসাস্বাদনে উপস্থিত জনমণ্ডলী যেরূপ তৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে খেতুরী কয়েক দিনের জন্য বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। উৎসবের পূর্ণবৃত্তান্ত, নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর, নিত্যানন্দের প্রেমবিলাস, শিশিরকুমার ঘোষের নরোত্তম-চরিত প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। এই স্থানটিকে কি একটা প্রস্তর-লিপিদ্বারা স্মরণীয় করিয়া রাখা যায় না?

নরোত্তম বঙ্গীয় সমাজে আর একটি বিপ্লব উপস্থিত করিলেন, তিনি কায়স্থ কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি ব্রাহ্মণ শিষ্য হইয়াছিল। এই সকল ব্রাহ্মণ আবার পণ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন। ভগবান্ যাঁহার ললাটে সাধুত্বের তিলক আঁকিয়াছেন তাঁহার প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নরোত্তমের সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিলেন বলরাম মিশ্র। একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নরোত্তমের শিষ্য হইয়াছেন, এ সংবাদে সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এই উত্তেজিত দলের নেতা হইলেন পদ্মার তীরে গাম্ভিলা-গ্রাম-নিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ধনশালী লোক ছিলেন। ইঁহার বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহাতে পাঁচ শত ছাত্রের ব্যয়ভার ইনি বহন করিতেন। "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তেঁহো পণ্ডিত প্রধান। পাঁচ শত পড়ুয়ার নিত্য অন্নদান"(—প্রেমবিলাস, বিংশ তরঙ্গ)। এই সময়ে বলরাম মিশ্র ছাড়া আরও দুইটি ব্রাহ্মণ নরোত্তমের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন—ইঁহাদের নাম রামকৃষ্ণ ও হরিনারায়ণ। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও উত্তেজিত হইয়া ইঁহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। তবে তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি ও শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ভাবিয়াছিলেন, নিম্নজাতিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করার প্রমাণ কোন শাস্ত্রে

কায়স্থ গুরুর ব্রাহ্মণ শিষ্য।

পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে ইনি নরোত্তমের ফাঁদে পা দিলেন। বহু তর্ক ও আলোচনার পর তিনি দেখিলেন, ইঁহারা দেবদূতের ন্যায় দেশে যে নূতন সংবাদ আনিয়াছেন তাহা গ্রহণ না করিলে বাঙ্গালীর উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা নাই। পরাভূত এবং সম্যগ্‌রূপ নূতন ভাবে প্রণোদিত হইয়া পণ্ডিত ও দুর্দান্ত গঙ্গানারায়ণ স্বয়ং নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু নরোত্তমের প্রধান সংস্কারকার্য্য গৌড়দ্বারে হইয়াছিল। গৌড়দ্বার রাজমহলের নিকটবর্ত্তী। তথাকার রাজা রাঘবেন্দ্র অতি প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায়। ইঁহারা অতি প্রবলপরাক্রান্ত দস্যু হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠান বাদশাহ মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, সুতরাং এই রাজারা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন বাদশাহ ইঁহাদিগকে ঘাঁটাইতে ইচ্ছা করেন নাই। মোগলদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য দাউদ খাঁ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত নৃপতিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বলক্ষয় করা সময়োচিত মনে করেন নাই। কয়েকবার বাদশাহের কর্ম্মচারীরা রাজস্ব আদায় করিতে গৌড়দ্বারে গিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদ রায় তাঁহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

চাঁদ রায়ের পীড়া।

একটি নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে হত্যা করার পর চাঁদ রায় বায়ুরোগগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইত, এবং তিনি প্রলাপ বকিতেন। এতবড় দুর্দান্ত রাজা একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চাঁদ রায় এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, কেহ যেন বলিতেছে—"খেতুরীর সন্ন্যাসী রাজ-কুমারের শরণ লইলে তাঁহার রোগ আরোগ্য হইবে।" কিন্তু অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ রাজা—একটা কায়স্থের শরণ লওয়ার কথা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। বৃথা কল্পনাজাত স্বপ্ন মনে করিয়া তিনি কথাটা উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—সেই নির্দ্দোষ হত ব্রাহ্মণের ভূত চাঁদ রায়ের কাঁধে চাপিয়াছে। ভিষক্‌দের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল, চাঁদ রায়ের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইল।

এ অবস্থায় সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া বৃদ্ধ রাজা রাঘবেন্দ্র রায় নরোত্তমকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নরোত্তম আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যাদুবিদ্যা জানেন না, তাঁহার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই। তিনি চাঁদ রায়ের দুঃসাধ্য রোগ সারাইবেন কিরূপে? কিন্তু এবার অনুতপ্ত চাঁদ রায় প্রাণের দায়ে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া স্বয়ং চিঠি লিখিলেন—রোগও যদি না সারে, তবে তাঁহার মুখে মৃত্যুকালে হরিনাম শুনিলেও একটা গতি হইবে। এবার নরোত্তম থাকিতে পারিলেন না, কারণ পাপী আর্ত্ত হইয়া ডাকিয়াছে। তিনি তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বুধুরির সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ভিষক্‌ এবং কবিকুলচূড়ামণি গোবিন্দদাসের সহোদর রামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া গৌড়দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রাজধানীতে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত হইলেন। চাঁদ রায়ের ব্যাধি ছিল মানসিক। কতকটা নরোত্তমের প্রাণ-জুড়ানো উপদেশে কতকটা বা রামচন্দ্র কবিরাজের চিকিৎসার ফলে তাঁহার মনের উপর বৈষ্ণব-প্রভাব খুব হিতকর হইল। চাঁদ রায় অল্পদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন। তখন নরোত্তমের উপর তাঁহার অচলা

ভক্তি হইল। তাঁহারা ছিলেন ঘোর শাক্ত; শরৎকালে রাজবাড়ীতে বহু আড়ম্বরপূর্ণ যে দুর্গাপূজা হইত, তাহাতে শতসহস্র মেষ ও মহিষ বলি দেওয়া হইত। কিন্তু এই সম্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের মনে যে পরিবর্তন হইল, তাহার ফলে বৃদ্ধ রাঘবেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজবাড়ীর সকলেই কায়স্থ নরোত্তমের নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই ঘটনা এরূপ বিস্ময়কর হইয়াছিল যে, লোকে সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে চায় নাই।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই চাঁদ রায় পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মগুলির জন্য বহু অনুতাপ করিয়া গৌড়ের বাদশাহকে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন, এবার বাদশাহের কর্ম্মচারী আসিলেই তিনি বাকী রাজস্ব সমস্ত পাঠাইয়া দিবেন। পাঠান-রাজসভায় এই চিঠি লইয়া অনেক আলোচনা হইল, অধিকাংশ রাজমন্ত্রী এই চিঠির উপর নির্ভর করা অবিবেচনার কার্য্য মনে করিলেন—মহা ধূর্ত চাঁদ রায় কি গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। যুদ্ধবিগ্রহাদি না করিয়া এই ফন্দির জালে পা দিতে কোন রাজকর্ম্মচারী স্বীকৃত হইলেন না

চাঁদ রায় গেরুয়া পরেন, সংসারে ঔদাসীন্য, নিজে দুই বেলা কৃষ্ণপূজা করেন। গুরু নরোত্তম দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁদ রায় খেতুরীর দেবমন্দিরে অগণিত মণি-মাণিক্য ও বস্ত্রালঙ্কার উপঢৌকন পাঠাইলেন, নরোত্তম স্বয়ং এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। নরোত্তমের যাওয়ার পর একদা চাঁদ রায় মাত্র ১০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ পদাতিক সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে গৌড়দ্বার হইতে গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিলেন। গুপ্তচরেরা গৌড়ের বাদশাহকে জানাইল—চাঁদ রায় অরক্ষিত অবস্থায় দূর পথে যাইতেছেন। এই সুযোগ পাইয়া গৌড়েশ্বর বহু সৈন্য পাঠাইয়া চাঁদ রায়কে বন্দী করিয়া লইয়া আসিলেন। লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, অসামান্য দৈহিক বলসম্পন্ন চাঁদ রায়কে সম্বোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, তোমার এত বড় বুকের পাটা যে তুমি বহুকাল যাবৎ আমার রাজ্য লুট করিয়া খাইতেছ?" চাঁদ রায় রাজোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বৈষ্ণব-দৈন্যের সঙ্গে বলিলেন, "আমি হুজুরে পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলাম—পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য আমি অনুতপ্ত, আমাকে উচিত শাস্তি প্রদান করুন।" বাদশাহ তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও সরলতা-দর্শনে কতকটা মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। "ইহার বিচার পরে হইবে" এই বলিয়া একটা অন্ধকার কারাগারে ইহাকে পাঠাইয়া দিলেন মাটীর নীচে কারাগার, আলোর প্রবেশপথ নাই; দাঁড়াইলে ছাদে মাথা ঠেকে—দিনান্তে অতি তুচ্ছ খাদ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু সংসারের কোলাহল হইতে এই গুহায় ঢুকিয়া—ইনি ইহাকে আশ্রমের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি সেই নিভৃত নিকেতনে সারাদিন কৃষ্ণধ্যানে রত থাকিতেন। কোন সময়ে ভাবিতেন তিনি কৃষ্ণের জন্য চন্দন ঘসিতেছেন এবং অতি যত্নে তাহার টিপ বিগ্রহের মাথায় পরাইয়া দিতেছেন। কখনও ভাবিতেন, তিনি তাঁহার আরতি করিতেছেন, পঞ্চপ্রদীপের আলোতে বিগ্রহ ঝলমল করিতেছে; কখনও মনে করিতেছেন, তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, অথবা নৈবেদ্য সাজাইতেছেন। কখনও মনে

হইত, বনে বনে ঘুরিয়া তিনি কৃষ্ণের জন্য সদ্যঃপ্রস্ফুট ফুল চয়ন করিতেছেন, অথবা তাহার দ্বারা মাল্য রচনা করিতেছেন। এই ভাবে দিনযামিনী কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা তিনি জানিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ে যখন এই সহজ আনন্দ শতদলের মত ফুটিয়া উঠে, তখন বাসস্থান কর্দ্দমাক্ত বা নিবিড় বন্ধনযুক্ত কারাগৃহ—তাহা ভাবিবার অবকাশ কোথায় থাকে?

চাঁদ রায়ের পিতা রাঘবেন্দ্র রায় কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ পাঠাইয়া তাঁহার আহারের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আর একজন লোক পাঠাইয়া এমন একটা সুযোগ করিয়াছিলেন, যাহাতে অনায়াসে চাঁদ রায় মুক্তি পাইতে পারিতেন। সেই লোক অতি গোপনে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "আপনি কালীবিগ্রহকে ফুল-বেলপাতা দিয়া পূজা করুন; তারপর আমি আপনার বাহির হইবার ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কালীবিগ্রহ উপস্থিত করিলেন। চাঁদ রায় বলিলেন, "কৃষ্ণ ভিন্ন আমার উপাস্য আর কেহ নাই, এখানে মরি তাহাও ভাল—কিন্তু আমি অন্য কোন দেবের পায়ে ফুল দিব না। আমার সকল ফুল, সকল নৈবেদ্য, আমার দেহমন তাঁহার পায়ে বিলাইয়া দিয়াছি; অপর কাহাকেও দিবার মত আমার কিছুই নাই। আমার পিতাকে বলিও, আমি ভাল আছি, রাজপ্রাসাদে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা অনেক ভাল আছি, আমি মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়া দেহমনে পরম পবিত্রতা ও অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতেছি, আমি চুরি করিয়া পলাইয়া যাইতে চাহি না।" পিতার নিযুক্ত দূত দেখিলেন, কালীপূজা না করিলে এসম্বন্ধে কিছু করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি ফিরিয়া গেলেন।

যথা সময়ে দরবারে চাঁদ রায়ের ডাক পড়িল। বাদশাহ বিচার করিয়া "হস্তিপদদলিত করিয়া হত্যা করা হউক"—এই আদেশ দিলেন। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত এশিয়াতে বন্দী ও শত্রুদিগকে হস্তিদ্বারা হত্যা করার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

চাঁদ রায়ের শক্তি ছিল অসীম। একটা বৃহৎ হস্তীকে তাঁহার দিকে ধাওয়াইয়া দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার হস্তদ্বারা হাতীর শুঁড় ধরিয়া এমনই জোরে মোচড় দিলেন যে, হাতীটা চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। এই অমানুষিক বল দেখিয়া বাদশাহ বিস্মিত হইয়া চাঁদ রায়কে বলিলেন, "তুমি বহুদিন যাবৎ অতি তুচ্ছ খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ অনশনে আছ, এ অবস্থায় তোমার এরূপ অদ্ভুত বল হইল কি প্রকারে?"

চাঁদ রায় প্রথমে কারাধ্যক্ষের জন্য অভয় চাহিয়া বলিলেন, "আমি কারাগারে উত্তম খাদ্য খাইয়াছি। কারাগারে আমি খুব ভাল ছিলাম—আমি সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে কৃষ্ণসেবা করিতে পারিয়াছি। আমার পিতা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীপূজা করিবার কথা থাকাতে আমি তাহাতে রাজী হই নাই। হুজুর আমার মৃত্যুদণ্ড বা যে কোন দণ্ড দিবেন, আমার তাহাতে ক্ষোভ নাই। আমি কৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়াছি।" বলিতে বলিতে চাঁদ রায়ের চক্ষু সজল হইল। বাদশাহ তাঁহার কথা শুনিয়া এত প্রীত হইলেন যে, তখনই তাঁহার মুক্তির আদেশ দিয়া যে সকল স্থান চাঁদ রায় বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকারও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

চাঁদ রায় গৌড়দ্বারে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বাদশাহ তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং অতি প্রীতির সহিত বলিলেন, "সেবার আমি তোমাকে শুধু তোমার পৈত্রিক ও বাহুবলার্জ্জিত সম্পত্তির অধিকার দিয়াছি, আজ তোমাকে একটা পুরস্কার দিব।" বাদশাহের আদেশ-অনুসারে চাঁদ রায়কে একটি ফারমান দেওয়া হইল, তাহাতে তিনি আহেদি পরগনার অধিকার পাইলেন।

চাঁদ রায়ের দলে যে সকল ব্রাহ্মণ দস্যু ছিলেন তাঁহারা অনেকেই নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ বাড়ুয্যে, কালিদাস চট্টো, নিরায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামজয় চক্রবর্ত্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী এবং শিব চক্রবর্ত্তীর নাম নরোত্তম-বিলাস ও অপরাপর পুস্তকে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

মহাপ্রভুর জীবনে ভক্তির মাধুর্য্যই বেশী ছিল, তাহা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত। নিত্যানন্দ পতিত জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব গোঁসাইদের পৌরোহিত্য চালাইয়াছিলেন, সমাজ তাঁহাকে প্রথম বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে কন্যার পরিণয় সম্পাদন করার জন্য সূর্য্যদাস সরখেল ব্রাহ্মণ-সমাজে খুব বেশী বেগ পাইয়াছিলেন। অদ্বৈত হরিদাসকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শান্তিপুরে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ইহারা বুঝিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ করিলে সমাজে অচল হইয়া পড়িবেন—তাহা হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা সফল হইতে পারিবে না। নিত্যানন্দের বংশধর ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামিকৃত "নিত্যানন্দ বংশাবলী ও সাধনা" পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বংশধরেরা বহু চেষ্টায় এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলীন-সমাজে আদানপ্রদান-সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি বিনীত হইয়া সমস্ত দাবী-দাওয়া মিটাইয়া কুলীন-সমাজকে হস্তগত না করিতেন, আজ খড়দহ ও শান্তিপুর একেবারে সমাজ-বহির্ভূত হইয়া থাকিত।

কিন্তু নরোত্তম সমাজের কাছে একটুও অবনতি স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ বৈষ্ণবেরা জনসাধারণের এক বিশাল সভা আহ্বান করিয়া নরোত্তমকে খাঁটী ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র দান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। এখন আর শুধু বলরাম মিশ্র কিংবা গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী নহেন, চাঁদ রায়-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের ক্রোধ সকল সীমা অতিক্রম করিল, তাঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন।

কলিকাতার নিকট পক্বপল্লী (আধুনিক পাইক্‌পাড়া) তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তথাকার রাজা নৃসিংহ রায় একজন ব্রাহ্মণভক্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। এই রাজপরিবার কায়স্থ হইলেও সমাজে ইহাদের খুব প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া সমাজসংস্কারের একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা ছয়জন প্রতিনিধি নৃসিংহ রাজার নিকট পাঠাইলেন। এই ছয় জনের নাম যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, শিবচরণ বিদ্যাবাগীশ এবং দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন। ইহারা পক্বপল্লীর

রাজাকে বলিলেন, "আপনি ধর্ম্মের রক্ষক, সনাতন ধর্ম্ম যে ঘোর কলিতে রসাতলে যাইতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, ইহা হইতে কি বীভৎস ব্যাপার হইতে পারে? আপনি দেশ রক্ষা করুন।" অনেক আলোচনার পর এই ঠিক হইল যে রাজা নৃসিংহ পণ্ডিতগণসঙ্গে খেতুরী যাইয়া নরোত্তমকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিবেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন, "যদি সেই কায়স্থ-গুরু এই সকল অনাচার শাস্ত্রদ্বারা সমর্থন করিতে পারেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিকট মাথা মুড়াইব, নতুবা তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।"

তর্কযুদ্ধে আহ্বান ও পরাজয়।

পণ্ডিতেরা চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পড়ুয়ারাও চলিলেন, বহুশকট বোঝাই পুঁথি চলিল। রাজা নৃসিংহের সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণ মধ্যস্থতা করিবার জন্য সহযাত্রী হইলেন। এই ভাবে রাজা একটা মস্ত বড় দল লইয়া খেতুরীর অভিমুখে রওনা হইলেন। এই অভিযানের সংবাদ খেতুরীতে পৌঁছিল। নরোত্তমের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, অন্তরঙ্গ সুহৃৎ রামচন্দ্র কবিরাজ ও তৎসহোদর কবিচূড়ামণি গোবিন্দদাস এই রাজকীয় দলের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের জগন্মান্য আচার্য্য নরোত্তমকে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতরণ করাইতে সম্মত হইলেন না। "আমরা তাহাদিগকে বুঝিয়া লইব, আপনি খেতুরীতে বসিয়া থাকুন"—এই অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহারা তিনজন অগ্রসর হইলেন। খেতুরী আসিবার পথে কামারপুর গ্রাম। নৃসিংহ রাজা তথায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেই গঙ্গানারায়ণ, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ সেই গ্রামে তিনখানি ছোট দোকান খুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। গঙ্গা-নারায়ণের তেলের দোকান, রামচন্দ্রের মুদিখানা এবং গোবিন্দ একখানি পানের দোকানের মালিক হইলেন। নৃসিংহ রাজার সঙ্গী পণ্ডিতদের পড়ুয়ারা জিনিষ কিনিতে যাইয়া দেখে তেলী, মুদী ও পানওয়ালা সকলেই সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলে। আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ছদ্মবেশীরা বলিলেন, "আমরা খেতুরীর লোক, সেখানে ঠাকুর মহাশয়ের কাছে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়, খেতুরীর লোকেরা সকলেই অল্প-বিস্তর সংস্কৃত জানে।" কিন্তু এতো অল্প বিদ্যা নহে! পড়ুয়ারা শাস্ত্রের যে কথা পাড়িল, তাহাতেই তাহারা পরাস্ত হইল। সুতরাং অতি বিস্ময়ে তাহারা যাইয়া তাহাদের অধ্যাপকদিগকে এই বৃত্তান্ত অবগত করাইল। সেই ক্ষুদ্র তিনটি দোকানের কাছে রাজকীয় দলের অসম্ভব ভিড় হইল। ছয়জন পণ্ডিত তাঁহাদের বহু পড়ুয়া ও কয়েক শকট পুঁথি একদিকে, অপরদিকে তেলী, মুদি ও পানওয়ালা। রাজা স্বয়ং সভা জাঁকাইয়া বসিয়া গেলেন, মধ্যস্থ স্বয়ং পণ্ডিতরাজ রূপনারায়ণ সরস্বতী। পণ্ডিতদল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, প্রতিপক্ষ তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী পণ্ডিত—উপরন্তু ভক্তিশাস্ত্রে, যাহাতে তাঁহাদের প্রবেশমাত্র নাই, তাঁহারা সেই নব অমোঘ অস্ত্রের নিপুণ সন্ধানী। সনাতনকৃত হরিভক্তিবিলাসের "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" প্রভৃতি শ্লোক ও অনিবার্য্য যুক্তির ব্যূহে পড়িয়া পণ্ডিতেরা একান্তরূপে অসমর্থ হইলেন। তাঁহাদের মনোহারী কথা, ভক্তির আবেগ ও পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করিল। রাজা নৃসিংহ এবং সতীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলী নরোত্তমের

শরণ লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা নৃসিংহ ও রাজ্ঞী রূপমালা একত্র দীক্ষিত হইলেন। (বিস্তারিত বিবরণ নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে দ্রষ্টব্য।)

নরোত্তম আরও অনেক লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দস্যুতস্কর ছিল। সদ্গোপ-কুলজাত শ্যামানন্দ পুনরায় দেশে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদিনিবাস ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে উপস্থিত হন (পরগনা দণ্ডকেশ্বর, উড়িষ্যা)। এখানে তিনি অদ্বৈতবাদী দামোদরকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শের খাঁ নামক এক মুসলমান দস্যু তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এতই ভক্তিভাবাপন্ন হন যে, তিনি শ্যামানন্দের নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদাস নামে পরিচিত হন। এই চৈতন্যদাস একজন পদকর্ত্তা। ভক্তিরত্নাকরের ১৫শ তরঙ্গে ইঁহার সংস্কারকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। রাধাকৃষ্ণ-গানে ইনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন (প্রেমবিলাস দ্রষ্টব্য)।

রয়নি থানার নিকটবর্ত্তী ভারজিৎ নগরে তৎকালে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, ইঁহার নাম অচ্যুত। ইঁহার অধিকার মল্লভূমির অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। ভারজিৎ নগরের একদিকে দোলঙ্গা নদী। এই নদীর তীরদেশ অতি রমণীয়, তথায় একটি বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা অচ্যুত তাঁহার রাজ্ঞী ভবানীর সহিত অনেক সময়ে এই মন্দিরের নিকটে বাস করিতেন। অচ্যুতের জ্যেষ্ঠপুত্র রসিকমুরারি পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও অনেক সময়ে দোলঙ্গা-নদীতীরে বাস করিতেন। শান্তশীলা নামক স্থানে রসিকমুরারি শ্যামানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সেই সাক্ষাতের পর রসিকমুরারি ভক্তি-সুধার রসাস্বাদ পাইলেন—তাঁহার মনের ভাব ও জীবনের গতি ফিরিল। তিনি মানুষ চিনিলেন, জাতের খোসাটা তাঁহার নিকট অসার বোধ হইল। ক্ষত্রিয় রাজা রসিকমুরারি তাঁহার দুই রাজ্ঞী ঈশানী ও মালতীর সহিত সদ্গোপ শ্যামানন্দের শিষ্য হইলেন। উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত রাজারাই এই রসিকমুরারির শিষ্য। সুতরাং ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি উড়িষ্যার অন্তর্গত যাবতীয় রাজ্যের অধীশ্বরদের গুরুর গুরু শ্যামানন্দ। ভক্তিরত্নাকরে শ্যামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে উদ্ধব, অক্রুর, মধুবন, গোবিন্দ, জগন্নাথ, আনন্দানন্দ এবং রাধামোহনের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য রসিকমুরারি। সমস্ত উড়িষ্যাদেশে শ্যামানন্দ চৈতন্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। ইঁহারা জাতিভেদ একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একান্ত অন্ত্যজ বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগকে বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে স্থান দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা পতিতের উদ্ধারকারী ছিলেন, শাস্ত্রানুশাসিত জটিলতাগ্রস্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ হিন্দুসমাজকে একেবারে ইঁহারা জাগরণমন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। নব-জীবনের স্ফূর্ত্তিতে বৈষ্ণবগণ মণিপুর হইতে মধ্যভারতের ছতরপুর, উড়িষ্যা হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র, পাহাড়িয়াদের মধ্যে কুকী, ত্রিপুরবাসী প্রভৃতি নানা জাতি ও দেশবাসীকে

চৈতন্যের প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তনের খোল ও মন্দিরা বঙ্গদেশের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনও থামে নাই। ইহারা ভিন্ন ধর্ম্মের গ্রাস হইতে জনসাধারণকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে এই ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার সমস্তই চৈতন্যের প্রেরণা-জাত। তিনি ভাবের পাগল, ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার ইঙ্গিত ছিল। সেই ইঙ্গিত ক্ষুদ্র গিরিনির্ঝরের মত কালে বিশালতোয়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছিল। জাতিভেদসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সুস্পষ্ট, "মোর জাতি—মোর সেবকের জাতি নাই" (চৈ ভা. অন্ত্য ১১)। "সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্ব্বনাশ। নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্ম্মের প্রকাশ" (চৈ. চ. অন্ত্য)। রঘুনাথ-দাসের জ্ঞাতি কালিদাস ঝড়ু ভূঞমালীর উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন, চৈতন্য এজন্য তাঁহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন। যবন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈতন্য সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে তাঁহার পাদোদক পান করাইয়াছিলেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তিনি হরিদাসকে সদ্‌ব্রাহ্মণদের তুল্য আদর ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। জাতি-নির্ব্বিশেষে তাঁহার প্রেম ও উদার ব্যবহার গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজে নিবিদ্ধ, এজন্য কীর্ত্তনীয়ারা গাহিয়া থাকে,— "সব অ-বিধি, নদের বিধি" (অর্থাৎ যত অনাচার—তাহাই নদীয়ার ধর্ম্ম)। শাক্ত কবি চৈতন্যের এই উদারনীতিকে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "গৌর ব'লে আনন্দে মেতে, একত্রে ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্‌দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।"

পরবর্ত্তী কালে হিন্দুবিধি অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবেরা যে প্রচারকার্য্য চালাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সেই প্রচারকার্য্যের প্রস্রবণ চৈতন্য হইতে নির্গত হইয়াছিল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই বিপুল উদ্যম শ্লথ হইয়া পড়ে। বীরহাম্বির বন-বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, অবশ্য তথাকার শিল্প ও স্থাপত্য বৈষ্ণবপ্রভাবে অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। বহু দুর্লভ বৈষ্ণব পুস্তক রাজার পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তিনি সাধারণ রাজধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে তিনি প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করার জন্য প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। লিখিত আছে, কোন কোন লোক রাত্রি জাগিয়া নাম জপ করিত, পাছে ঘুমাইয়া পড়িয়া নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করিতে অক্ষম হয়, সেই ভয়ে তাহারা নিজেদের টীকি ঘরের টুয়া বা আড়ার সঙ্গে সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। বসিয়া বসিয়া জপ করিবার সময়ে যদি তন্দ্রাবশে ঝিমাইতে থাকিত, তবে টীকিতে টান পড়িত। তখন জাগ্রৎ হইয়া পুনরায় জপে মনোযোগী হইত। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব গোঁসাইগণ প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা লাভ করিয়া আভিজাত্যদর্পী ও কতকটা ধর্ম্মের বিকৃত অর্থবাদী হইয়া পড়েন। আমরা বলিতে বাধ্য, চৈতন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার গোস্বামিগণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আর সেরূপ নাই। চৈতন্যের অশেষ দৈন্য ছিল, তাঁহাকে যদি কেহ ভগবানের অবতার বলিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর তাঁহার সম্বন্ধে বহু আজগুবী গল্পের

সৃষ্ট হইল, তদ্দ্বারা তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিতে। তিনি বরাহ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, ভীষণ এক সর্পের উপর শুইয়া অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর অভিনয় করিলেন, বহুলোকের খাদ্য একা খাইয়া দামোদর হইলেন, চতুর্ভুজ ও ষড়্ভুজ মূর্ত্তিতে ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিলেন, একদিনে আম্রবীজ বপন করিয়া সেইদিনই গাছে ফল উৎপন্ন করিলেন, জামীরের গাছে কদম্ব ফুটাইলেন, কখনও নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন (চৈ. ভা. মধ্য ২য়, মধ্য ৩য়, চৈ. চ. মধ্য, ১৭ প., ১২-১৩ শ্লোক, চৈ. চ. মধ্য, ৩য় প. ৪৯ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। লোচন দাস লিখিয়াছেন, তিনি পুরীতে আছেন শুনিয়া লঙ্কা হইতে বিভীষণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, এ সকল কথা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ চৈতন্য-বিরহখিন্ন নবদ্বীপবাসীদের মধ্যে যে-কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই আদৃত হইয়াছে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 'অলৌকিক গল্পে যে বিশ্বাস না করিবে—তাহার মস্তকে তিনি পদাঘাত করিবেন।' চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়—চৈতন্যের পূর্ব্বলীলাতেই যত অলৌকিক ব্যাপার, রূপ গোস্বামীরা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাতে অলৌকিক অংশ খুব অল্প। এই পূর্ব্বলীলার বর্ণনা নবদ্বীপবাসীরা করিয়াছিলেন। যাঁহাকে তাঁহারা ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভাগবত-লীলা আরোপ করা তাঁহারা দোষাবহ মনে করেন নাই, বরঞ্চ উহা অবিশ্বাস করা তাঁহারা পাপ মনে করিয়াছেন। এজন্য মুরারি গুপ্তের মত প্রবীণ পণ্ডিতও অনেক আজগুবী কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন। শুধু গোবিন্দদাসের করচা এই দোষ হইতে মুক্ত। একথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে চৈতন্য নবদ্বীপে থাকিলে ভক্তির ক্ষেত্রে ঐ সকল আগাছা জন্মাইতে পারিত না। তিনি এসকল অলৌকিক কথার কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি শতবার এই সকল ভক্তির আতিশয্য নিরস্ত করিয়াছিলেন, এমন কি সার্ব্বভৌমের মত পূজাপাদ প্রবীণ পণ্ডিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলাতে তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন, "প্রভু কহে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ। আতাল পাথাল কথা কেন বা বলহ।" তাঁহার অনুপস্থিতিতে গৌড়দেশে ভক্তির রাজ্যের পথঘাট, ঘরের আঙ্গিনা উপগল্পের আগাছায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

চৈতন্যদেবকে ভগবান্ রূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীরা নিজেরাও তাঁহার দেবত্বের অংশীদার হইতে দাবী করিলেন। চৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু, নিত্যানন্দ বলরাম এবং অদ্বৈতকে সদাশিব করা হইয়াছে। কেশব ভারতী—শ্রীকৃষ্ণ-গুরু সান্দীপনি মুনি, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বৃষভানু, নরহরি দাস—মধুমতী, রামানন্দ—বিশাখা, রূপ—শ্রীরূপমঞ্জরী, গদাধর—রাধিকা, রাঘব—চম্পকলতা, সনাতন—লবঙ্গমঞ্জরী, গদাধরভট্ট—সুদেবী, রঘুনাথ দাস—রূপমঞ্জরী, মুকুন্দ—বৃন্দাদেবী, দেবানন্দ—গর্গমুনি, কাশীশ্বর—ইন্দুরেখা, ভূগর্ভ—প্রেমমঞ্জরী, এইরূপ প্রত্যেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত দ্বাপর যুগের কোন সঙ্গীর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। গোস্বামিগণ এইভাবে মনুষ্যজগতের ঊর্দ্ধে সিংহাসন স্থাপন করিয়া দেবকল্প হইলেন এবং জনসাধারণের নিকট পূজার দাবী দৃঢ়

করিলেন। চৈতন্যের "না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার", "নিরবধি দাস্তপ্রেমে প্রভুর বিহার, মুই কৃষ্ণদাস বই না বলায় আর। হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে তাহানে। ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে" (চৈ. ভা. অন্ত্য ১০), "ত্রিরাত্র চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়। বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রুধারা। শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা।" "ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ" (করচা) "ধূলামাখা জটাবাঁধা অঙ্গ কথা নাই। পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই।" "অনাহারে শীর্ণদেহ চলিতে না পারে। তবু প্রভু হরি নাম দেন ঘরে ঘরে।" (করচা) এই প্রেমার্দ্র চৈতন্য-মূর্ত্তি আর বৈষ্ণব-সমাজে নাই। কৃষ্ণনগরের কুমারেরা তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করে, তাহাতে চৈতন্যদেব গোঁসাইদের মত নধরকান্তি, ভুঁড়িটি অগ্রগণ্য, তৈলে ঘৃতে মাখনে পুষ্ট দেহ। গোস্বামিগণ এই ভাবে নিজেরা অংশ-অবতাররূপে লোকবিশ্বাসে স্থান অধিকার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান সূত্র দৈন্য ও আর্ত্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।"—তাঁহাকে তরুর মত হইতে বলিয়াছিলেন—তরু ঝড়বৃষ্টি রৌদ্র বিদ্যুৎ স্বয়ং মাথা পাতিয়া লয়—কিন্তু পরকে ছায়া দান করে, যে কুঠারাঘাতে তাহাকে কর্ত্তন করে, তাহাকেও স্বীয় অমৃতফল ও সুগন্ধ পুষ্প প্রদান করে; ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরিয়া গেলেও কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করে না। নিজকে রিক্ত করিয়া তাহার তপস্তার্জ্জিত পুণ্যফল—পুষ্পরস ও ফল অপরকে বিনামূল্যে প্রদান করে। জগতে তরুর মত সহিষ্ণুতার আদর্শ, দৈন্যের, দানের, অযাচক বৃত্তির আদর্শ—আর কোথায় আছে? এইজন্য চৈতন্য রঘুনাথ দাসকে তরুর মত হইতে বলিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার তরুর গুণ ব্যাখ্যা করিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর ধর্ম্মের ত্রিরূপ ব্যাখ্যা।

এই জগতে নিত্য ধ্বংসলীলা চলিতেছে, প্রস্ফুট ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, কত পল্লব, কত পত্র, কত সৌন্দর্য্য, কত সুরভির ধ্বংসের মধ্যে জগৎ প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতেছে, তথাপি এই ধ্বংসলীলার মধ্যে পরমানন্দ। সেই আনন্দময়ের হাসির বিরাম নাই। নিত্য বিহঙ্গের আগমনী গান, নিত্য নবকুসুম-সম্ভার, নিত্য নির্ঝরের কুলুকুলু, উষার সুবেশ; এই অস্থায়ী চিরচঞ্চল জগতের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের রূপ আছে—সেই রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিলে মানুষ আনন্দনিকেতনে পৌঁছিতে পারে—"আনন্দং ব্রহ্মণো বেত্তি ন বিভেতি কদাচন।" চৈতন্য সেই আনন্দময়ের দেখা পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম—আনন্দের ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম দুঃখের ধর্ম্ম। সেই আনন্দময় পুরুষবরকে দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ আত্মা নিজসত্তা ভুলিয়া আনন্দসাগরে ডুবিয়া যায়, যেমন নদী সমুদ্রে পড়িয়া নিজকে হারাইয়া ফেলে—এই অবস্থার নাম "বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতবাদ," এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া জয়দেব বলিয়াছেন—"মুহুরবলোকিত-মণ্ডনলীলা মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা" ভাগবতও তাহার আভাস দিয়াছেন। চৈতন্যদেব ভগবানের সেই অপূর্ব্ব হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশস্বরূপ। তিনি শুধু তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তিপ্রবুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সুনির্ম্মল মূর্ত্তি দেখাইয়া সর্ব্বলোককে পাগল করেন নাই, তাঁহার প্রেমে

রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, উদ্ধরণ দত্ত, নরোত্তম, বীরহাম্বির, চাঁদ রায় প্রভৃতি রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিরা তাঁহাদের অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকটি এক এক জন বুদ্ধের ন্যায়। এই বাঙ্গলাদেশে গোপীচন্দ্র, দীপঙ্কর হইতে লালাবাবু ও চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত যত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকল্প ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন জগতের এত স্বল্প-পরিসর কোন দেশে বোধ হয় সেরূপ-সংখ্যক রাজর্ষিদের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু এই রাজর্ষিদের দেশেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের প্রভাবে যতজন রাজতুল্য ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য বৈভব পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত আর কোন যুগে হয় নাই। এই দেশ খুব বড় আদর্শ ও খুব বড় ত্যাগের দেশ। এ হাটে ক্ষুদ্রকথা বিকায় না, এখানে জীবন-মরণ পায়ের ভৃত্য—কিন্তু ধ্বংসের জন্য নহে, অনুরাগ ও প্রেমের জন্য। এদেশে অশ্রুর যে বল, অন্যত্র গোলাগুলি ও বারুদের সে বল নাই। চৈতন্য আনন্দাশ্রুর উপর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জগৎ কতকাল পরে তাঁহার এই উচ্চ আদর্শকে বুঝিতে পারিবে, জানি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুরুবাদ ও পরকীয়া

আমরা দেখাইয়াছি, মহাপ্রভুকে ভগবান্ কল্পনা করিয়া সেই কেন্দ্রের পরিধিতে যে সকল নরদেবতার মণ্ডলী পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা কখনই চৈতন্যের অনুমোদিত হইত না। চৈতন্যের অবতার-বাদ এই কল্পনার ভিত্তি। ইহা কখনই তিনি গ্রহণ করিতেন না, বরঞ্চ তিনি সর্ব্বদা ইহার বিরোধী ছিলেন।

রামরায় তাঁহার সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা বলেন, এবং যে সকল গান ও নাটক রচনা করেন, তাহা চৈতন্যের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। বস্তুতঃ যে কয়েকখানি পুস্তক তিনি নিত্য আবৃত্তি করিতেন, তন্মধ্যে "রায়ের নাটকগীতি"-খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামানন্দের প্রসিদ্ধ "সো নহ রমণ হাম নহ রমণী" গানটি চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গুরুবাদ।

ইহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, জীব ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ভগবানের অনুরাগমূলক। "পহিলহি প্রেম নয়নভঙ্গে ভেল"—তাঁহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে আমার প্রেম প্রথম উদ্ভূত হইল, দিনে দিনে তাহা বাড়িয়া চলিল, তাহার অবধি হইল না। এই প্রেমের মধ্যে আর কেহ ছিল না, দূতী বা অন্য তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। "না মিলল দূতী, না মিলল আন, দুহুঁক মাঝে শুধু পাঁচবান" এই কথায় গুরুবাদকে স্পষ্ট অস্বীকার করা হইয়াছে। চৈতন্যের নিজ উক্তি "ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বরে আনিয়া মিলায়"

সেই বিশ্বাস অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না। শুভ মুহূর্ত্তে তিনি স্বয়ং তাঁহার অযাচিত করুণা কোন ভাগ্যবান্‌কে দিয়া যান।

কিন্তু বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গুরুবাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে। গোস্বামিগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—"বৃন্দাবন-লীলার সখীরাই মহাপ্রভুর (স্বয়ং কৃষ্ণের) সহচর হইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজরস আস্বাদন করিবার আর উপায় নাই, গোপীগণের হাতেই সেই রসের চাবি। গোস্বামিগণের বংশধরদিগের শরণ না লইলে বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার কাহারও হইতে পারে না। গৌরগণোদ্দেশের শ্লোক মুখস্থ করাইয়া বৈষ্ণব-শিশুদিগের মনে গোস্বামিগণের দেবত্বে বিশ্বাস সমাজে দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছিল। এই ভাবের বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ধর্ম্মমত চৈতন্যের ধর্ম্ম সমাশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয় নাই। তাহাতে কুল-শীলের—বংশের কোন মর্য্যাদা নাই। "কহে চণ্ডীদাস, কানুর পীরীতি—জাতিকুলশীল ছাড়া।" এক এক গোস্বামীর শিষ্যগণ হইলেন—তাঁহার পরিবার। ইঁহারা গ্রন্থাদি লিখিতে গিয়া নিজ পিতামাতা কিংবা পূর্ব্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার গুরু ও গুরুভ্রাতাদের পরিচয়ার্থ দীর্ঘ বন্দনাসূচক কবিতা লিখিয়া মুখবন্ধ করিয়াছেন। নিজের জাতি-বংশ, গোষ্ঠী বা পারিবারিক অপরাপর সমস্ত বন্ধন ছাটিয়া ফেলিয়া ইঁহারা গুরুপদে মাথা বিকাইয়াছেন ও তৎসমর্পিতকর্ম্মা হইয়াছেন। এরূপ গুরুবাদ বৈষ্ণবেরা পাইলেন কোথা হইতে? বৌদ্ধগণের মধ্যে গুরুবাদ অত্যন্ত প্রবল ছিল—"শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই"—চণ্ডীদাসের এই মানুষ কে তাহা জানি না, কিন্তু বৌদ্ধগণের যে গুরুই সর্ব্বশক্তিমান্—অনন্তসাধারণ, একমাত্র পূজার্হ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপালে হিন্দুদিগকে "দেভাজু" ও বৌদ্ধদিগকে "গুভাজু" বলা হয়। দেভাজু অর্থ "দেবতা-ভজনশীল" ও "গুভাজু" অর্থাৎ "গুরুকে ভজনশীল"। নাথধর্ম্মেও গুরুর প্রতি অসামান্য ভক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ তাঁহার গুরুর জন্য কি অসামান্য কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছিলেন! চৈতন্য দেব-মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন—সুতরাং তাঁহাকে "দেভাজু" বলা যাইতে পারে। গুরুর প্রতি এই অসাধারণ ভক্তির লীলা তিনি কোথায়ও দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এই গুরুবাদ বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুতন্ত্র উভয় তন্ত্র হইতেই বৈষ্ণবগণ লইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে চৈতন্যের কোন প্রেরণা ছিল না। এই গুরু-বাদের দ্বারা গোস্বামিগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ মত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোকের ধর্ম্মমহামাত্রের পদে গোস্বামিগণ নিজেরা অধিষ্ঠিত হইয়া পুরস্কার ও নিগ্রহ বিতরণ করিতেন। অনেক বৈষ্ণববাড়ীর গৃহে জেল ছিল। শিষ্যদের অপরাধের বিচার গোস্বামীরা স্বয়ং করিতেন, এবং তাঁহাদের জেলে অপরাধীরা দণ্ড পাইত। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, খড়দহে তাঁহাদের জেল ছিল,—নিত্যানন্দের বংশধর-গণ বিচার করিয়া তাঁহাদের শিষ্যদিগকে শাস্তি দিতেন। দুই হাজার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ প্রিয়দর্শী যে ধর্ম্মমহামাত্রপদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এতকাল পরে সেই পদে

গোস্বামীদিগকে সমাসীন দেখিয়া মনে হয়—ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও নষ্ট হয় নাই। নব ভারতের পল্লী খুঁজিলে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায়—সেই সকল পত্র এখনও পাওয়া যায়। মহারাজ প্রিয়দর্শী শুধু "ধর্ম্মমহামাত্র" পদের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ধর্ম্মের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষিতা চরিত্রবতী মহিলাদিগকেও সেই ভাবে নিযুক্ত করিতেন। এই স্ত্রীধর্ম্মমহামাত্রগণের ধারাটিও গোস্বামিনীগণ বজায় রাখিয়াছেন। ইঁহারা ভদ্রপরিবারে যাতায়াত করিয়া ধর্ম্মের অনুশাসন ও তত্ত্ব প্রচার করিতেন। চলিত ভাষায় ইঁহাদের নাম ছিল "মা গোঁসাই।"

বৌদ্ধধর্ম্ম শেষকালটা দেহতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিল, আমরা পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে (১৪ অঃ, ৫ম পঃ; ৫৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায়) তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। মহাপ্রভুর ভাবপ্রবণ ভক্তি-ধর্ম্মে এই দেহতত্ত্ব একটা স্থান জুড়িয়া বসিল। গোরক্ষবিজয়ে দেখিতে পাই, ছদ্মবেশী গোরক্ষ মৃদঙ্গের বোলে "কায় সাধ—কায়া সাধ" এই ধ্বনি তুলিয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন করিতেছেন। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" এই উক্তির সঙ্গে বঙ্গের জনসাধারণ বিশেষভাবে পরিচিত। অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া নহে—আত্মসাৎ করিয়া পরবর্ত্তী ধর্ম্ম শির উত্তোলন করিয়া থাকে। মহাপ্রভুর নাম করিয়া অনেক কথা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র হইতে গৃহীত। চণ্ডীদাস স্বয়ং তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে "এড়িয়া টানিরে শ্বাস" প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত শ্বাসনিয়ামক প্রাণায়ামের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সহজিয়া পুস্তকমাত্রেই হরিভক্তি ও হরিপ্রেমসম্বন্ধে বিশেষ কোন উপদেশ নাই।

দেহতত্ত্ব।

মহাপ্রভুর অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার অথবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মাধুর্য্য এই পঞ্চ অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ সহজিয়া-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে কেবলই দেহতত্ত্বের কথা। অমৃত-রত্নাবলীর প্রথম ও শেষ কথা "সকলের সার হয় আপন শরীর। নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে স্থির।" (৩ পৃঃ) চণ্ডীদাসের উক্তিতেও সেই একই কথা—"নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে, সহজ ভজন বলিব তারে।" সহজিয়া-সাহিত্যে ভক্তি বা প্রেমবাদ অত্যল্প—সর্ব্বত্র দেহতত্ত্বের কথা। ইহা সেই সুপ্রাচীন তান্ত্রিক ধারা। সহজিয়ারা হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে যোগ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রই তাঁহাদের ভিত্তি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুসী-বিশ্বাসী, রাম-বল্লভী, সাহেবধনী, দরবেশী, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, পাঁচ ফকিরী প্রভৃতি যে সকল শ্রেণী আছে, তাঁহারা হিন্দুগণের প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন; কোন কোন স্থানে মুসলমান গুরু এবং ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য; হিন্দুদের মধ্যেও গোমাংস কোন কোন শ্রেণীর নিষিদ্ধ নহে।

স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে এই সহজিয়াদের যে সকল মত আছে তাহা একেবারে সামাজিক আদর্শকে উলট্‌পালট্‌ করিয়া দিয়াছে। ইঁহাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী নহেন, সহজিয়াদের মতে তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাঁহাদের সর্ব্বস্ব স্বামীর পদে বিকাইয়া দেন নাই। হিন্দুসমাজ পতিব্রতার স্থান যতটা উচ্চ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাতিব্রত্যের জন্য প্রচুর তৈলবটের ব্যবস্থা

আছে—তাহাতে ইহকালে ইষ্টবন্ধুজাতির উচ্চতান-প্রশংসা এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গ। ইহাদের কোন্‌টির লোভ অলক্ষিতভাবে সীতা-সাবিত্রীদের মনের উপর বেশী কার্য্য করিয়াছিল—ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। অন্ততঃ সহজিয়াদের আদর্শ ইহারা হইতেই পারেন না। পরকীয়া-প্রেমে যে রমণী আত্মসমর্পণ করিল, সেই মুহূর্ত্তে সে লোকচক্ষুর বালাই হইল। নিজের পিতামাতা তাহার জন্ম চিরতরে গৃহের অর্গল রুদ্ধ করিলেন, স্বামিগৃহে সে অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, অপাংক্তেয়। বন্ধু ও স্বগণেরা তাহাকে অস্বীকার করিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে নিম্নতম নরক দেখাইলেন। সুতরাং পরকীয়ার প্রথম অবস্থা হইতে সে পার্থিব যাহা কিছু কাম্য তাহা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া—পরকালের সমস্ত ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া পথে দাঁড়াইল। সুতরাং ত্যাগ-সম্বন্ধে সে যে উচ্চতম আদর্শে পৌঁছাইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পরকীয়া।

স্ত্রীলোক লইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা বা প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন করা এক সময়ে য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। মধ্য যুগের "নাইট-এরাণ্ট্রী" বেশী দিনের কথা নহে। কিন্তু খৃষ্টের পূর্ব্বেও অনেক শ্রেণী এই রমণীদের লইয়া ব্যভিচারকে ধর্ম্মের অঙ্গীয় মনে করিতেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে স্ত্রীলোকের গণিকাবৃত্তি অতি সাধুকার্য্য এবং প্রশংসনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। পুরাকালে উর্ব্বশী-তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গের গণিকারা লোকমতে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনাই সেই নাটকের সর্ব্বগুণসম্পন্না প্রধান নায়িকা। গণিকাদের নৃত্য, গীত এবং সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইত। উদ্দালক মুনির পুত্র-কর্ত্তৃক বিবাহপ্রথা আর্য্য-সমাজে প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদের বহুনায়কের সহিত সম্বন্ধ প্রশংসনীয় ছিল। যে রমণী বহুনায়ককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন, সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইত। যিনি পুরুষের নিবেদন অগ্রাহ্য করিতেন, তিনি সমাজে নিন্দিতা হইতেন, তাঁহাকে সমাজ "কর্কশা" নাম দিয়া তাঁহাদের প্রতিকূলভাব দেখাইতেন। (দুর্গাচরণ সান্যালের সামাজিক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।) যদিও বুদ্ধদেব ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মিলনসম্বন্ধে বহু কঠোর নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি কালে সংঘের মধ্যে নরনারীর অবাধ মিলন হইতে লাগিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও যে একাভিপ্রায়ীর দল বিদ্যমান ছিল তাহা পূর্ব্বেই (৩২১ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই নব নব সংস্করণ এখনও পল্লীতে পল্লীতে উৎপন্ন হইয়া সেই অক্ষয়-বটের অবিনাশী বংশধারা বজায় রাখিয়াছে। ঘোষপাড়ার মত শত শত গ্রামে রজনীর অন্ধকারে অর্গলবদ্ধ গৃহে নরনারীর অবাধ ধর্ম্মানুশীলন এখনও চলিতেছে। আমরা পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর-প্রণীত চারুদর্শন নামক পুস্তক হইতে এই নরনারী-মিলনের একটা দৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

'কিশোরী-ভজনের মেলায় যাইয়া হাকিম চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন প্রায় পাঁচশত লোক উপস্থিত। সেই লোকের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বার আনা। সেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই দশ আনা। সেই বিধবাদের মধ্যে যুবতীর সংখ্যা আট আনা। কোন স্ত্রীলোকের কোলেই শিশু নাই। বৃদ্ধের সংখ্যাও বড় কম, যুবতী ও যুবকদের সংখ্যাই পনের

আনা। ....পদে পদে এত ত্রুটি দেখিলেও তিনি একটী প্রধান বিষয়ে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সন্তুষ্টি উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজেও জন্মিতে পারে নাই। ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইলেও সভায় বসিবার কালে একত্র মিলিয়া মিশিয়া বসেন না। .... কিন্তু এখানে তাদৃশ সঙ্কীর্ণতা নাই। স্ত্রীপুরুষ যার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া বসিয়াছে। কাজেই ঈদৃশ স্ত্রীস্বাধীনতা-দর্শনে হাকিমবাবু সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। হাকিমের এই চিন্তা শেষ হইতে না হইতেই ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

কিশোরী-ভজনের মেলা।

সেই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত বৈষ্ণবীগণ ও কৃষ্ণপুরের কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী হাকিমবাবুর অতি নিকটে আসিয়া গান ধরিল—"এই পাগলের দলে—এই দলে কেউ এসনা রে ভাই। কেউ এসনা, বস'না, কেউ যে'ষ না গায়। এই দলেতে এলে পরে—জাতের বিচার নাই। এক পাগল উড়িষ্যাতে জগন্নাথ গোঁসাই, চণ্ডালেতে আনে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়। এক পাগল চিতলাইতে শম্ভু চাঁদ গোঁসাই। সে যে হিন্দুর গুরু, ব্রাহ্মণের শিব, মোসলমানের সাঁই।" উক্ত গান-সমাপনের পর কমলদাস আসিয়া ঘোষণা করিল—"সেবানন্দে প্রেমানন্দ বাধে" অর্থাৎ ক্ষুধানিবৃত্তি না করিতে পারিলে ভগবানের প্রেমানন্দ লাভ ঘটে না। .... কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অন্নব্যঞ্জনের পাত্র সভার মধ্যস্থলে বিছানার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষগণ সেই পাত্রের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল, এবং এক এক জনের মুখের অন্ন টানাটানি ও হাসাহাসি করিয়া অন্তে অন্তে খাইতে লাগিল। এই দৃশ্যে হাকিমবাবু মহাসন্তুষ্ট হইলেন। এত বিভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলিত মেলার মধ্যস্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্নব্যঞ্জন আসিতে পারে, তাহা হাকিমবাবু স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তদুপরি আবার এক-থালার খাদ্য টানাটানি করিয়া সকলে খাইতে পারে, ইহা অসম্ভব হইতেও মহা অসম্ভব।.........সুতরাং ঈদৃশ জাতিভেদবিরোধী আচরণ হিন্দুজাতির মধ্যে পাইয়া হাকিমবাবু আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। তাঁহার 'জাতিভেদ' নামক পুস্তকখানিতে যে নূতন অধ্যায় লিখিত হইবে তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আশাও জাগিয়া উঠিল। সেই আশা হঠাৎ বর্দ্ধিত হওয়াতে হাকিমবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, "হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ—আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে আমি দণ্ডায়মান হই নাই। এই মেলায় জাতিভেদ-নাশক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা দেখিয়া এত আনন্দিত হইয়াছি যে, তাহা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না.........এই জাতিভেদ-নিবারক ভোজনক্রিয়া-নির্ব্বাহকালে সদর দরজা খুলিয়া সকলকে দেখান উচিত। নতুবা এই মহাসত্য-প্রচারের সুবিধা হইবে না। ব্রাহ্ম-সমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা প্রকাশ্য দিবালোকে। তাই এই মহাসত্য-প্রচারের মহাসুযোগ ঘটিতেছে। আপনাদের স্ত্রীস্বাধীনতা রাত্রিতে অতীব গোপনে পাপকার্য্যের মত সভয়ে সম্পন্ন হয় কেন? আপনারা যখন ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্, তখন আর ভয় করেন কাকে?......

"হিন্দুজাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ অবরোধপ্রথা। ঈদৃশ বর্ব্বরতা কোন সুসভ্য জাতির মধ্যে নাই। দেশ জাগাইতে হইলে স্ত্রীস্বাধীনতার আবশ্যক। দেখুন বৃক্ষের অর্দ্ধাংশে সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া যদি বাকী অর্দ্ধাংশ উহা না পায়, তবে সেই বৃক্ষ রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না।—এই জন্যই চিন্তাশীল কবি বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন, 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'……আপনাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সুশিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজের বেশ মিল আছে। তাই আপনাদিগকে আগামী রবিবার সেই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে অনুরোধ করি। তথায় আমি থাকিয়া বহু উন্নতির পথ দেখাইয়া দিব।………আমি স্বয়ং কয়েকখানি গাড়ীসহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার ১২টায় আসিতে প্রস্তুত আছি। আমার সঙ্গে আপনারা গেলে ব্রাহ্ম-সমাজ ধন্য হইবেন।"

হাকিমবাবুর এই বক্তৃতার মর্ম্ম কেহ বুঝিলেন না। তাঁহাদের পক্ষে যে তাহা বুঝিবার কোন আবশ্যকতা আছে তাহাও তাঁহারা মনে করেন না। শ্রীগুরুর শ্রীমুখের উপর যে হাকিমের মুখ বা অন্যের মুখ থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা নিভুর্ল এবং বাকী সমস্তই ভুল, ইহাই তাঁহাদের মজ্জাগত দৃঢ় ধারণা। তাঁহারা বিদ্যা ও বুদ্ধিকে কুপথের সহায় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বেদ বা শাস্ত্রকে ঐহিকের খেলা বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বৃথা মনুষ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক নিয়মকে তুচ্ছ মনে করেন। গুরু, পুরোহিত, স্বামী ও গুরুজনকে তত গ্রাহ্য করেন না। দেবপূজা, উপবাস, শঙ্খ, ঘণ্টা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রভৃতিকে অসার মনে করেন, আনন্দময়-মেলার আনন্দময় ভজনকেই জীবনের সারাংশ মনে করেন। তাই হাকিমের বক্তৃতার উত্তরে এই মেলার সাধু ও সাধুনীরা নিম্নোক্ত গান ধরিল :—"মন বাদুড় সন্ধ্যার সময় উড়িস্ না,—কাল কাক পেলে তোরে ছেড়ে দিবে না। শোন বলি মূর্খ বাদুড়, দিনে থেকো দিন-কানার মত, রাত্রে হইও চতুর। উপর দিকে দিয়ে লেঙ্গুর, ঝুলন স্বভাব গেল না।……" এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া আচমনের সময় আসিল। তাই দশ বারো জন স্ত্রীলোক—হাকিমবাবুর মুখ ধোওয়া জল খাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কাজেই এবার বিষম হুড়াহুড়ি বাধিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমবাবুকে রাত্রি দশটার সময়ে স্নান করিতে বাধ্য হইতে হইল। এমন সময়ে কমলদাস মনে মনে স্থির করিল, হাকিম-বাবু অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিভেদে যে বৈষম্য ঘটে, তাহা সে জানিত না। যে উপাদানে অশিক্ষিত নীচলোকের আনন্দ জন্মে, সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধর্ম্ম-প্রাণ লোকের তাহাতে আনন্দ না জন্মিবারই সম্ভাবনা বেশী। বরঞ্চ স্ত্রীলোকের এত নির্লজ্জতা ও অসভ্যতায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছিল। তাই তিনি স্নানের পর কাহাকেও গাত্র মোছাইবার অধিকার দিলেন না। কমলদাস এই আমোদকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রমাণের প্রত্যাশায় হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন :—"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ" অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, নিন্দা ও আসক্তিকে অষ্টপাশ (আট প্রকার বন্ধন) বলে। সাধনবলে সেই

পাশমুক্ত হইতে হইবে। পাশমুক্ত না হইলে জীব বালকের ন্যায় সরল হয় না। সরল না হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না।" হাকিমবাবু স্ত্রীলোকদের নির্লজ্জতা ও কমলদাসের উক্তি মিলাইতে গিয়াও মিলাইতে পারিলেন না। এমন সময়ে কমলদাস আবার ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। যথা—ধর্ম্মজগতের দেশ চারি প্রকার—(ক) স্থূল, (খ) প্রবর্ত্তক, (গ) সাধক, (ঘ) সিদ্ধ। প্রত্যেক দেশের জন্য ছয়টি শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, যথা—(১) দেশ, (২) কাল, (৩) আশ্রয়, (৪) পাত্র, (৫) আলম্বন (৬) উদ্দীপক................দেশের অর্থ ও গানের অর্থ হাকিমবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তজ্জন্য হাসাহাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না, বলিয়া অনেকের মুখে হাসি জাগিল.........তাই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। যাতায়াত কালে যাহা চক্ষে দেখিলেন বা অনুমান করিলেন তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে' (১৪০-১৪২ পৃষ্ঠা)।

ইহা একটি ব্যঙ্গদৃশ্য হইলেও এই বর্ণনার ভিতর যে কতকটা সত্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ছবির আর একটা দিক্ আছে। উন্নত সহজধর্ম্মীর আদর্শ—সংস্কারের ঊর্দ্ধে।

নরনারীর প্রেমসম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা খুব উচ্চ। তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-অঙ্গ পায় না সে।" যাহাকে প্রেম দিয়াছ, তাহা হইতে সে প্রেম আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না—সে ব্যভিচারী হউক বা ব্যভিচারিণী হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না; সাংসারিক সুখ হয়ত হইল না, হয়ত প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পুনরায় নির্ব্বাচন করিলে ঘরকন্না সুখের হইত। কিন্তু সহজিয়া সে সুখ চায় না। ফুল যেরূপ তাহার সৌরভ বিতরণ করিয়া তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারে না, ভালবাসিয়া প্রকৃত প্রেমিক তাহা নষ্ট করিতে পারে না। দান-ধর্ম্ম ইহা নহে, দান করিয়া তুমি নিঃস্ব হইতে পার দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের মত;—কিন্তু প্রেমকে যিনি সাধনার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দুঃখসুখের অতীত হইয়া গিয়াছেন। দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া তাঁহাকে সাধনার পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে—প্রেম আদান-প্রদানের—কারবারের বা বিনিময়ের সামগ্রী নহে। যিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না—তিনি সাধন-অঙ্গ পাইবেন না। সহজিয়া-প্রেমে "তলাকনামা" অগ্রাহ্য। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে "সহজ প্রেমের" নেশায় যুবক-যুবতীরা উন্মত্ত ছিল। কিন্তু এ সাধনা বড় শক্ত। কবি বলিয়াছেন, যোগ্য ব্যক্তি "কোটিকে গোটিক হয়", এক কোটী সাধনপন্থীর মধ্যে একজন হয়। সে ব্যক্তি কেমন, তৎসম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—যিনি "সুমেরু পর্ব্বতকে সূতা-তন্তু দিয়া বাঁধিয়া আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, যিনি বিষধরের কবলে ভেককে পাঠাইয়া তথায় তাহাকে নৃত্য করাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারেন—তিনি যোগ্য। অর্থাৎ যিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই যোগ্য। "অন্ধাবন্ধু" গীতিকায় (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ) এইরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম উপদেশ নিজদেহকে "কাষ্ঠ-লোষ্ট্রসম" করিতে হইবে। অর্থাৎ উহাতে ইন্দ্রিয়াসক্তির লেশ মাত্র থাকিবে না। দৈহিক উত্তেজনার লেশ থাকিলে

সহজিয়াদের আদর্শ-প্রেম।

দেবতারা সে প্রেমের স্বর্গ হইতে সাধককে তাড়াইয়া দিবেন। "মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা। কাজ নাই সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা। আমার বাহির দুয়ারে, কপাট লেগেছে—ভিতর দুয়ার খোলা।" যাঁহারা শাস্ত্র লইয়া ব্যাখ্যা করেন—মর্ম্মী নহেন—তাঁহারা দূরে থাকুন,—বহিরিন্দ্রিয়ের লেশ যাহার আছে—তাহার অধিকার নাই। "চৌকি রয়েছে সেথা"—প্রহরী আছে, দৈহিক কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখিলে তাহারা তাড়াইয়া দিবে—"সে দেশের কথা, এদেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা।" সে দেশের সুখদুঃখ—এদেশের সুখদুঃখ নহে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন—"ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী, তুমি হও পিতৃমাতৃ।" ইত্যাদি কথায় কবি যে স্বর্গলোকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার পথঘাট প্রাচীন কবি তরণীরমণ তাঁহার চণ্ডীদাস-জীবনীতে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহার মূল পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহা ছাপাইয়াছেন। ইহাতে আছে—প্রণয়ী ও প্রণয়িনী পরস্পরকে নির্ব্বাচন করার পর পরস্পরের নিকট হইতে দূরে,—পুরুষ সুন্দরী রমণীর মধ্যে, ও নারী সুন্দর যুবকগণের মধ্যে,—বাস করিবেন। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি শত প্রলোভনসত্ত্বেও তাঁহাদের একনিষ্ঠ প্রেমের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তাঁহাদের প্রথম পরীক্ষা হইয়া গেল। দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহারা একগৃহে বাস করিবেন, তখন স্বীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বভাব লইয়া তাঁহারা কি কি স্তর অতিক্রম করিবেন তাহা তরণীরমণ রামীর মুখে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"চারিমাস আগে তার চরণ সেবিয়া। পদতলে পড়ি রবে স্বভাব লইয়া। পুনঃ আর চারিমাস চরণ সেবিয়া। বামভাগে শুতি রবে স্বভাব লইয়া॥ পুনরূপি চারিমাস সর্ব্বাঙ্গ সেবিয়া। ছন্দ-বন্দে শুতি রবে স্বভাব লইয়া। আর চারিমাস তার চরণ ধরিয়া—হৃদয়ে রাখিবে তাকে স্বভাব লইয়া।" প্রত্যেক পদের পশ্চাতে "স্বভাব লইয়া" কথাটি আছে—অর্থাৎ স্বীয় সংযমের ও দৈহিক পবিত্রতার আদর্শটি বজায় রাখিয়া শুদ্ধভাবে এইরূপে সেই মানস প্রেমপাত্রের মানসী-পূজা করিতে হইবে। এত বড় কষ্টিপাথর কে কবে কল্পনা করিতে পারিয়াছে?

পুনঃ পুনঃ বেদকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের এই বাণী সুপরিচিত। পরকীয়ার ধর্ম্ম এই "লোক বেদধর্ম্ম পাপ-পুণ্য যে নাহি মানয়। মন নিষ্ঠে অন্য কান্তে করয় প্রণয়।" ইহাই পরকীয়ার ধর্ম্ম—লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, পাপপুণ্যে ভেদজ্ঞান—এই সমস্ত পরিত্যাজ্য। এই তান্ত্রিক মতের ধ্বনি আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। উজ্জ্বলচন্দ্রিকা নামক সহজিয়া-পুঁথিতে পাই "লোকশাস্ত্র করে যারে অনেক বারণ" তাহাই পরকীয়ার শ্রেষ্ঠ বিধান। স্বকীয়া অগ্রাহ্য, "পরকীয়ারূপ অতি রসের উল্লাস। তাহাতে পরম রতি মন্মথের হয়।" এই পরকীয়া-ধর্ম্ম কিরূপ উচ্চ এবং তাহা যে শুধু একটা ধর্ম্মমত নহে, তাহা অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্য এবং এখনও হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি-প্রণীত 'সাধুচরিতে'র আখ্যায়িকা এখানে অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে :—

রসসার।

শ্রীহট্ট জেলার ইটা পরগনায় ক্ষেমসহস্র গ্রামে দুর্গাপ্রসাদ কর (পিতার নাম হরিবল্লভ কর

এবং মাতার নাম শান্তা দাসী) নামক একজন কায়স্থ ১৮৫১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি তরুণ যৌবনেই একান্ত ধর্ম্মানুরাগী এবং সাধুচরিত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইনি শৈশব হইতে মনোমোহিনী নাম্নী তাঁহার এক দূর আত্মীয়াকে ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা অর্থ মানসিক পূজা। ইহা দুর্গাপ্রসাদের মনের নিভৃতে থাকিয়া তাঁহাকে সমস্ত সাধুকার্য্যে প্রেরণা দিত। ইহা এত গুপ্ত ছিল যে বহুদিন পর্য্যন্ত মনোমোহিনী নিজেও ইহার অস্তিত্ব জানিতেন না। তাঁহার ২৪ বৎসর বয়সে তিনি মনোমোহিনীর নিকট প্রত্যহ তিনবার যাইতেন—প্রত্যেকবার অতি অল্প সময় থাকিতেন, সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেন। কিন্তু মধ্যাহ্নে একখানি থালা-হাতে তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইলে মনোমোহিনী তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জন দিতেন, তাহার কিছু তিনি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে দুর্গাপ্রসাদ তাহা গৃহে আনিয়া খাইতেন। এই সময়ে দুর্গাপ্রসাদ মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহার সাধু নিষ্কলঙ্ক জীবনদর্শনে প্রথম প্রথম লোকে কিছু বলিত না এবং মনোমোহিনীও এই অদ্ভুত খেয়ালী লোকটির আবদার প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণই ছিল না—কিন্তু তথাপি লোকেরা বলাবলি করিত, "মনোমোহিনীই বা কিরূপ?" সে উহাকে প্রণাম করিতে দেয় কেন এবং তাহার উচ্ছিষ্টই বা খাইতে দেয় কেন?" হিন্দুরমণীর সম্ভ্রমে ঘা পড়িল। পরদিন থালাহস্তে দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সেদিন ভ্রাতৃবর্গের বহু অনুরোধ ও উপরোধসত্ত্বেও দুর্গাপ্রসাদ কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। দুর্গাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র ২৪ বৎসর। ক্রমাগত উপবাস চলিল, আত্মীয়বন্ধুগণ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইলেন, দুর্গাপ্রসাদের উপবাসব্রত ভাঙ্গিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা মনো-মোহিনীকে তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া খাদ্য উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বিরক্তির স্বরে মনোমোহিনী বলিলেন, "কেউ খেল বা না খেল তাহাতে আমার কি? আমাকে তোমরা আর ঐ লোকটার জন্য জ্বালাইয়া মারিও না।" আরও দুই তিন দিন গেল, তাঁহার ভ্রাতারা নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের এক নিকট আত্মীয়ার বাড়ী গেলেন। সেই আত্মীয়াকে দুর্গাপ্রসাদ অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। রাস্তায় বহুবার তাঁহারা উঁহাকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যেদিন তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া সেই আত্মীয়ার বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন সেদিন ধরিয়া পুরো দশদিন দুর্গাপ্রসাদ উপবাসী। কিন্তু সেই আত্মীয়া অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া কিছুতেই দুর্গাপ্রসাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ টলাইতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন চতুর্দ্দশ দিবস সাধু-যুবক নিরম্বু উপবাসী, তিনি কঙ্কালসার ও শয্যাশায়ী। যাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও সাধুত্বের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র প্রচারিত, এমন নির্ম্মলচরিত্র যুবক না খাইয়া মরিতে বসিয়াছেন—এজন্য প্রতিবাসীদের মন বিগলিত হইল। তাঁহারা সকলে যাইয়া মনোমোহিনীকে দয়া করিয়া উঁহাকে উচ্ছিষ্টান্ন দিতে অনুরোধ করিলেন।

সহজিয়া আদর্শ।

সাধু দুর্গাপ্রসাদ।

মনোমোহিনীর মন গোপনে তীব্র জ্বালা বোধ করিতেছিল—কেবল লোকলজ্জায় তিনি নির্ম্মমতা দেখাইতেছিলেন। এখন লোকানুরোধে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ-সহকারে দুর্গাপ্রসাদের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৫ দিন পরে তিনি আহার করিলেন। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন—যাঁহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত। জীবনের এক সময়ে দুর্গাপ্রসাদ প্রত্যেক মানুষের আদেশ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কালীচরণ তরফদার নামক একব্যক্তি তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার গোশালায় লইয়া গেলেন, সেখানে গোবরের স্তূপ এত বেশী ছিল যে দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, তাহারই এক কোণে কোন রকমে দুর্গাপ্রসাদকে ঠেলিয়া দিয়া কালীচরণ আদেশ করিলেন, "এইখানে দাঁড়াইয়া থাক।" সে রাত্রে ঘোর বিদ্যুৎ, ঝড় ও মেঘবৃষ্টি, গোয়ালের চাল জরাজীর্ণ, অনর্গল বৃষ্টি পড়িয়া দুর্গাপ্রসাদের দেহ সিক্ত করিতেছে, এদিকে সহস্র সহস্র মশক তাঁহার রক্ত চুষিয়া খাইতেছে,—অপরদিকে পচা গোময়ের অসহ্য দুর্গন্ধ। কিন্তু নির্ব্বিকার মহাপুরুষ প্রস্তরবিগ্রহের ন্যায় অনড় অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ৬।৭ ঘণ্টা পরে রাত্রি একটার সময়ে কালীচরণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া মুক্তি দিয়া বলিলেন, "এখন ঘরে যাও।"

এইরূপ তপস্যার কথা য়ুরোপ কি কখনও শুনিয়াছেন? তাঁহারা জানেন অস্ত্র তৈরী করার তপস্যা—পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের উপর আধিপত্য-স্থাপনের তপস্যা। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জগতের তপস্যা তাঁহারা বর্ব্বরোচিত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অনায়ত্ত এবং ইহাই আমাদের সম্পদ্। প্রতীচীকে যদি জয় করিতে হয় তবে প্রাচ্যের এই নির্ব্বিকার, নির্ব্বিরোধ, ইন্দ্রিয়জয়ী, দেহতুচ্ছকারী, অসীমসহিষ্ণু—অনন্ত বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমের তপস্যা দ্বারা তাহা করিতে হইবে, যাহাদ্বারা প্রাচ্যের বুদ্ধ অর্দ্ধেক জগৎ জয় করিয়াছিলেন—প্রাচ্যের যীশু প্রতীচ্য জয় করিয়াছিলেন—এ সেই শ্রেণীর তপস্যা, পথ ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনই এই তপস্যার মূল লক্ষ্য।

প্রেমের জন্য অসাধ্যসাধন—সহজপন্থীরা দেখাইয়াছেন। ভূমাই আনন্দের কারণ, ভূমা না হইলে তৃপ্তি হয় না—উপনিষদের এই মহাবাণী, প্রেম-জগতে বাঙ্গালীরা যাহা দেখাইয়াছেন অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। চিন্তার এই স্বাধীনতার পথে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া কোন বাধা না মানিয়া ভূমাকে লক্ষ্য করা, ইন্দ্রিয়-সংযমের শেষচেষ্টা—ত্যাগের শেষ দৃষ্টান্ত, ইহাই সহজিয়া-মত। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বলসেভিক্ এবং অধ্যাত্মজগতে সহজিয়া—ইহারা প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ নির্ভীক বীরত্ব জগতে বিরল। ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া স্বাধীনমতের ধ্বজা তুলিয়া সীতাসাবিত্রীর আদর্শ প্রেমের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিয়া—তাহা হইতে উচ্চতর আদর্শের পরিকল্পনা ইহারা করিয়াছেন; ইহাদের বুকের পাটা কত বড় প্রশস্ত! "অন্ধাবন্ধ"তে স্বামীকে বলিয়া কহিয়া প্রণয়ীর সঙ্গে যাওয়ার দুর্দ্দান্ত স্বাধীনতা বাঙ্গালী ভিন্ন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছে? কোথায় শাস্ত্র, কোথায় পুরাণকার—কতটা পেছনে ফেলিয়া ইহারা অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রাচ্য তপস্যা।

সহজিয়ারা বলেন কাঠ-পাথরের বিগ্রহ সহজে তুষ্ট করা যায়—কয়েকটি ফুলবেলপাতা পায়ে ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের মন জোগান বড় উৎকট তপস্যার কাজ, তিনি যাহা করিবেন আমি তাহাই দেবতার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিব, তাঁহার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা একেবারে ডুবাইয়া দিব; উপবাসী আমি, আরাধ্য ব্যক্তি আমার হাত হইতে থালা ফেলিয়া দিয়া আমার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাস্তু—তথাপি তিনি ভগবান্, দুর্গাপ্রসাদের এই দুশ্চর তপস্যার মহিমা ভূলোক হইতে দ্যুলোক স্পর্শ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "আমি নিজ সুখদুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি"—অতি সরল সহজ দুটি কথা—কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে হইলে বড় শক্ত। শত্রুবৎ যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে শুধু ক্ষমা নহে—সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসা এবং তাঁহার হাতের শূল ফুল বলিয়া গ্রহণ করা।

চণ্ডীদাস সহজিয়ার তান্ত্রিক অংশের উপর জোর দেন নাই, তিনি অনুরাগের দিক্‌টায় বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। আর একটি নূতনত্ব তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই :—নরনারীর প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের পথ চিনাইয়া দেয়। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন সহজিয়া একথাটা বলেন নাই। "ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না জানয়ে তারে। প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে", এই পার্থিব প্রেমের সিঁড়ি বহিয়া স্বর্গলোকে যাইতে হয়, এবং এই নরনারীর প্রেমই গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার একমাত্র উপায়—তথায় পৌঁছিলে এই প্রেমের আর প্রয়োজন হয় না। কবি এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দিয়া বলিয়াছেন, যদি দীপহস্তে কেহ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় কি আছে তাহা জানিতে চাহে, তবে সেই ভাবে সমস্ত জানিয়া লইলে তখন দীপের আর কোন প্রয়োজন হয় না।" (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১৬৬৩-১৬৬৫ পৃঃ।)

৩০৯ পৃষ্ঠায় তিব্বতপ্রসঙ্গে আমরা যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় বঙ্গের বাউল ও সহজিয়াদের সঙ্গে কোন কোন বৌদ্ধ শ্রেণীর মতের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। একসময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের নরনারীর অবাধ মিলন ও ব্যভিচারে উত্যক্ত হইয়া তিব্বতের রাজা বঙ্গদেশ হইতে দীপঙ্করকে লইয়া যাওয়ার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের অবাধ মিলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর কাছে ভিক্ষা চাহিবার অপরাধে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।" হরিদাস প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও চৈতন্যের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে ত্রিবেণীতে যাইয়া জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে কথিত আছে, সহচরদের সঙ্গে কোন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে চৈতন্য সমুদ্রতীরে যাইয়া আকাশে এক মধুর ও করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং চৈতন্য "ক্ষমা করিলাম" বলিয়াছিলেন। তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, "হরিদাসের আত্মা আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছে।" সে পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ কেহ জানিতেন না। পার্ষদগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চূড়াধারী মাধব যখন মেয়েদের দলবল লইয়া পুরীতে আসিয়াছিল, তখন চৈতন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার

পার্ষদগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। শৈশবের পর চৈতন্য মেয়েদের সম্বন্ধে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, "সবে পরস্ত্রী মাত্র নহে উপহাস, স্ত্রী দেখি প্রভু হন একপাশ।" সহজিয়াদের অবলম্বিত স্ত্রীসাধনপদ্ধতি তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেবা, প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা? অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে। তখন প্রেমের তত্ত্ব উদিত হইবে।"

সুতরাং এই সহজিয়া-ধর্ম্ম চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। চৈতন্য মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। সহজিয়াদের মধ্যে একদল বাউল বিগ্রহপূজা মানে না, কৃষ্ণের রূপ অগ্রাহ্য করে। একখানি সহজিয়া-পুস্তকে কৃষ্ণবিগ্রহপূজা, কৃষ্ণের বর্ণ এবং রূপ,—এমন কি বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগ, ভূমিকা।)

কৃষ্ণের রূপ কল্পনা করা পাপ। এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসও ইহাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল! সুতরাং নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ যে সহজিয়া নাম গ্রহণপূর্ব্বক বীরচন্দ্রের কৃপায় বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ পাইয়া বৌদ্ধ-চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দু তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের কতকটা যোগস্থাপন-পূর্ব্বক "জয় চৈতন্য, নিত্যানন্দ" দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সহজিয়াদের নৈশমিলন যে একাভিপ্রায়ী দলের মিলনের ধারা চালাইয়া রাখিয়াছে—তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি (৩২১ পৃঃ), দুই একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ-মতের প্রকাশ্যভাবে দোহাই আছে। "লোকশাস্ত্র করে যারে আনক বারণ। তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়। মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয়।" (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য, মণীন্দ্রনাথ বসু-কৃত পোষ্ট-চৈতন্য বৈষ্ণব-সাহিত্য দেখুন)। এই 'মহামুনি' বুদ্ধ ছাড়া আর কে? চট্টগ্রামে এখনও 'মহামুনির' মেলা হয়।

বাঙ্গালীর মত বর্ত্তমান জগতে আর একটি জাতি আছে কিনা জানি না, যাঁহারা কোন বিষয়েই চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়েন না। যাঁহারা ক্ষুদ্রে সন্তুষ্ট নহেন, বৈষয়িকের গণ্ডী, লোকাচার, ধর্ম্মের অনুশাসন, পারিবারিক বন্ধন যাঁহারা নিমেষের মধ্যে ছিন্ন করিয়া ভূমার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া যান। দানের আতিশয্য দেখাইবার জন্য দাতাকর্ণের কল্পনা। অতিথি গৃহে আসিয়াছেন তাঁহার একমাত্র পুত্রকে কাটিয়া সেই মাংস দিয়া অতিথির সৎকার করিতে হইবে। পিতা ও মাতা রাজকুমারকে করাত দিয়া কাটিবেন—অতিথির এই অদ্ভুত আবদার। পুত্রকে কাটিবার সময়ে মাতার এক ফোঁটা জল গণ্ড বাহিয়া পড়িলে আতিথ্য নষ্ট হইবে, মাতা স্বয়ং পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন। জাতক-গ্রন্থে মাঝে মাঝে এইরূপ উপাখ্যান আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাঙ্গলার শত শত লোক বসিয়া এই দানের কথা লিখিয়াছে ও সহস্র সহস্র লোক ইহা শুনিয়াছে। কেহ বলে নাই—এই গল্পে বড় বেশী রকমের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, কেহ বলে নাই—অতিথির এই আবদার দুঃসহ। বঙ্গবাসীর চক্ষু তখন এই গল্পের সাংসারিক দিক্‌টার উপর পড়ে নাই। তাহারা এই গল্পে ভূমার আনন্দ লাভ করিয়াছে, দানের অতুলনীয় মাহাত্ম্যে তাহাদের মন ভরিয়া গিয়াছে। এই দানের আতিশয্য তাহাদের

চোখে পড়ে নাই, অতিথির স্পর্দ্ধার কথা, রাজার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা, তাহারা ভাবে নাই। যদি ভাবিতে পারিত, তবে বঙ্গমহিলা সুস্থ—সবলদেহে মৃত স্বামীর পাশে শুইয়া হরিনাম করিতে করিতে পরমানন্দে পুড়িয়া ছাই হইতে পারিত না। কাঞ্চনমালা যে স্বামীর ভালবাসার জন্ম সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল, সেই স্বামীকে সহজে এই কড়ারে সপত্নীকে দিয়া গেল যে, সে তাঁহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইবে না। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, যদি তোমার একফোঁটা অশ্রু পড়ে তবে তোমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। অন্ধ স্বামী চক্ষু ফিরিয়া পাইবেন, এই আনন্দে সে যে আজ দীন ভিখারিণী অপেক্ষাও হীন হইয়া সর্ব্বস্বহারা হইল—"অন্ধাবন্ধুর" জন্ম স্বামীকে ছাড়িয়া রাজকন্যা ভিখারিণী হইল। স্বামীর কাছে সে নিজেকে ভিক্ষাস্বরূপ চাহিয়া লইল। এই সমস্তই আতিশয্য—কল্পনা এই সকল স্থানে পৃথিবী ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গিয়াছে—বাঙ্গালী সীতা-সাবিত্রীর সাধনা তুচ্ছ করিয়া উচ্চতর সাধনার ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছে। একদিকে কৃত্রিমতার একশেষ, অন্ধসংস্কারের কূপ, আটবৎসর-বয়স্কা রাসমণি দুইহস্ত-পরিমিত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহার স্বামীর বাড়ীর ঘোটকটিকে দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইতেছে (রাসমণির আত্মচরিত দ্রষ্টব্য)—অপরদিকে অভিসারিকা বলিতেছে—নগরে ঢাক পিটিয়া ঘোষণা কর যে, আমি প্রণয়ীর প্রেমকলঙ্কসাগরে ডুবিয়াছি, ভালবাসা আমাকে ভয়শূন্য করিয়াছে, আমি তাঁহার নামের কুণ্ডল কানে পরিব; তাঁহার অনুরাগের রক্ত-তিলক ভালে পরিব, তাঁহার কলঙ্ক হার করিয়া গলায় পরিব; "কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ, সফল করিল বিধি", জন্ম জন্ম আমি এই কলঙ্কের জন্ম তপস্যা করিয়াছিলাম, আজ বিধাতা আমার মনের সাধ মিটাইয়াছেন। এদেশের একদিকে স্বামীর নাম লইতে ফুলের কুঁড়ির মত লজ্জাশীলার মুখ মুদিত হইয়া পড়ে, অপরদিকে কালী স্বামীর বুকের উপর নৃত্য করিতেছেন এবং রাধা শ্যাম-অঙ্গে পা দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, "নিন্দ যায় চাঁদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা।" একদিকে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা—গোরা তাঁহার পাগলামীর লীলাস্রোতে জগৎ ভাসাইয়া দিতেছেন, অপরদিকে রঘুনাথ শিরোমণি সূক্ষ্ম ন্যায়ের যে জাল প্রস্তুত করিতেছেন—সেই কূটবুদ্ধির বাগুরায় পড়িয়া জগতের বুদ্ধিমানের শিরোমণিগণ নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বাঙ্গালীর চিন্তাধারা এই স্বাধীনতা, এই কেন্দ্রবহির্মুখ এবং কেন্দ্রাভিমুখ গতি উভয়েরই ভূমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। উভয়ের গতি অবাধ, উভয়েই লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সাধনার পথে গিয়াছে। এ যেন ঘড়ির পেণ্ডুলম্ দুলিতেছে। ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গালী যে ক্ষেত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছে—সেই ক্ষেত্রের কোন গণ্ডীর সীমা সে মানে নাই। উচ্চে উঠিতে তাহার নরদৃষ্টি দেবদৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অবতরণ করিতে সে কূপ হইতে গভীরতম কূপে নিপতিত হইয়াছে। তাহার ভক্তের পা ধরিয়া বসিয়া তাহার ঈশ্বর মানভঞ্জন করিতেছেন। ধর্ম্মজগতে এরূপ দুঃসাহস কোন জাতি করে নাই, তথাপি এই পরিকল্পনায় অসত্যের লেশ নাই। পুত্ররূপে, পত্নীরূপে, সখারূপে ভগবান্ তো সর্ব্বদাই আমাদের পা ধরিয়া বসিয়া মান ভাঙ্গাইতেছেন। এই জন্ম চণ্ডীদাস বলিতেছেন—আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী জগতে কে আছে—যিনি

স্পর্শমণিস্বরূপ, যাহা স্পর্শ করেন তাহাই সোনা হয়—তিনি—সেই পুরুষের মধ্যে স্পর্শমণিস্বরূপ—"নন্দের কুমার, কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার।" বাঙ্গালী মানুষ চিনিয়া ভগবান্‌কে চিনিয়াছে—পৃথিবীর ফাঁক দিয়া সে স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছে, এজন্য সে ভগবান্‌কে দিয়া ভক্তের পায় ধরাইবার পরিকল্পনা করিতে সাহস করিয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে সহজিয়াদের লিখিত পুস্তক অসংখ্য। তন্মধ্যে অমৃতরসাবলী, আগমসার, আনন্দভৈরব, অমৃতরত্নাবলী—এই চারিখানি পুস্তক বিশেষ আদৃত। 'বিবর্ত্তবিলাস' মুকুন্দ নামক এক লেখকের রচিত। ইনি নিজেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের (চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রণেতা) শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সহজিয়াদের "সদানন্দগ্রাম" নামক আনন্দসদন—কখনও "সহজপুর" বলিয়া পরিচিত। উহা হিন্দুর বৈকুণ্ঠ, বৌদ্ধের সুখাবতী এবং মুসলমানের বেহেস্তের ন্যায় পরিকল্পিত। এই সদানন্দগ্রাম কেবল সাধকদেরই গম্য, নরনারীর মিলনানন্দে উহাকে অধ্যাত্মরাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে সহজিয়ারা তাঁহাদের স্বর্গপরিকল্পনার আশ্চর্য্যরূপ মিল রাখিয়াছেন।

সহজিয়া-সাহিত্য।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠান-বিদ্রোহ

মোগল-পাঠান—"যেন ভুজঙ্গ-নকুল।"

এইবার আমরা মোগল অধ্যায়ের সন্নিহিত হইলাম। দাউদখাঁর পরেও পাঠানেরা তাহাদের দাবি ছাড়ে নাই, সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যায় বিদ্রোহী হইয়াছিল,—মোগল সৈন্যেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সম্যক্ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি ১৫৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার নবাব সাহাবাজ খাঁ কতলু খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধিতে কতলু খাঁ বঙ্গদেশের উপর কোন হাত দিতে পারিবেন না, উড়িষ্যার অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, এই কথা ছিল। আকবর সাহাবাজ খাঁ-কৃত সন্ধিতে সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস হইল, খাঁ সাহেব উৎকোচ-গ্রহণপূর্ব্বক বিদ্রোহীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন,—সুতরাং সম্রাট্ তাঁহাকে বাঙ্গলার মসনদ হইতে বিচ্যুত করিয়া উজির খাঁ হেরেবীকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন; এই শাস্তিই প্রচুর হইল না, বহু অর্থ উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহে সাহাবাজ তিন বৎসর কাল বন্দী হইয়াছিলেন।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বঙ্গের মসনদ পাইয়া কতলু খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে উড়িষ্যা ছাড়াইয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কতলু খাঁ নিজে উড়িষ্যায় থাকিয়া তাঁহার এক প্রবল দল ধেরপুর (জাহানাবাদ হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী) নামক গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। মানসিংহের তরুণ পুত্র জগৎসিংহ তখন কতলু খাঁকে বশীভূত করিবার ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। পাঠানেরা ধূর্ত্ততা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিল—তাহারা যুবরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে এই সন্ধির কথা লইয়া মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। কিন্তু ইহা একটি ষড়যন্ত্রমাত্র। কোন প্রকারে দেরী করিয়া স্বদলের পুষ্টি ও শৃঙ্খলাসাধন ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য। যুবরাজ সন্ধির কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অবস্থায় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনায় পাঠানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং মানসিংহের পরিতাপ ও

মনঃকষ্টের সীমা-পরিসীমা রহিল না, কারণ একথাও জনরব হইয়াছিল যে তাহারা জগৎ-সিংহকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু মোগলদের বরাং ভাল। কতলু খাঁ কিছু দিন হইতে অসুস্থ ছিলেন, হঠাৎ (১৫৯০ খৃঃ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্রেরা নাবালক ছিল, এবং সৈন্যদিগকে প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন নেতা ছিলেন না। পাঠানেরা ভয় পাইয়া জগৎসিংহকে মুক্তি দিল, মানসিংহকে বহু অর্থ ও ১৫০ শত হস্তী উপঢৌকন দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল—উড়িষ্যা তাহাদের থাকিবে কিন্তু তাহারা সম্রাটের অধীন হইয়া থাকিবে। উড়িষ্যায় আকবর বাদশাহের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইবে, এতদ্ব্যতীত তাহারা মানসিংহকে পুরীর অধিকার ছাড়িয়া দিল। সন্ধির শেষোক্ত দফায় "বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ" মানসিংহ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

আকবর এই সন্ধিতে বিশেষ সন্তুষ্ট না হইলেও তিনি ইহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতে পাঠানদের প্রধান মন্ত্রী খাজে ইস্‌সার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তি বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পবিত্র জগন্নাথ মন্দির অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিল। মানসিংহ পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মোগলেরা একটা যুদ্ধের পরই পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিল। এবারও তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিল, সন্ধিতে উড়িষ্যা পুনরায় মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। পাঠান-নেতৃগণ কতক জায়গীর পাইলেন, কিন্তু উড়িষ্যার রাজস্ব মোগল সম্রাটের প্রাপ্য হইল (১৫৯২ খৃঃ), কিন্তু পরবৎসরই পাঠান জায়গীরদারগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে লুটপাট চালাইতে লাগিল। তাহারা রাজার প্রধান বন্দর লুণ্ঠন করিল। পুনরায় মানসিংহ তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহারা অতিশয় দৈন্যের সহিত বশ্যতা স্বীকার করিল। রাজা তাহাদিগকে একেবারে নিরাশ করা অবিবেচনার কাজ মনে করিয়া জায়গীরগুলির অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন।

কতলু খাঁ ও ওসমান।

কিন্তু মানসিংহ বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর, কতলু খাঁর পুত্র ওসমান বিদ্রোহী হইলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন, মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ নামক মোগল পক্ষের সেনানায়কদ্বয় ঘোর যুদ্ধ করিয়া ওসমান খাঁর হস্তে যেওারক নামক স্থানে পরাস্ত হন। মোগলরাজ-ভাণ্ডারের প্রধান আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষক আব্দুল রজ্জককে পাঠানেরা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনায় বঙ্গদেশ কিছুকালের জন্য ওসমান খাঁর অধিকারে আসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬০০ খৃঃ)।

সুতরাং রাজা মানসিংহকে সম্রাটের আদেশে পুনরায় বঙ্গদেশে পাঠান-দলন-কার্য্যের ভার লইয়া আসিতে হয়। শ্রীপুর অন্তয় নামক স্থানে পাঠানেরা বিপুল ক্ষতির সহিত পরাভূত হয়। আব্দুল রজ্জককে তাহারা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে হাতীর পিঠে ছিলেন, তথায় এক দুর্দান্ত ভীষণদর্শন পাঠান মুক্তকৃপাণ-সহ তাঁহার রক্ষকের কাজ

আব্দুল রজ্জকের মুক্তি।

করতেছিল, তাহার উপর আদেশ ছিল, মোগলেরা জয়ী হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলে। কিন্তু দৈবক্রমে মোগলদের এক গোলা আসিয়া রক্ষকের শরীরে পড়ে, সে তখনই নিহত হয়। মোগলেরা শৃঙ্খলিত রক্ষককে মানসিংহের হস্তে অর্পণ করেন, তিনি তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।

এই ঘটনার পর পাঠানদের সকল আশা প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গেল—তাহারা পালাইয়া উড়িষ্যায় যাইয়া আর কোন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু ইসলাম খাঁ যখন বাঙ্গলার নবাব হন, তখন পাঠানেরা পুনরায় মাথা তুলিয়া বিদ্রোহী হইল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ওসমান খাঁ বহুকষ্টে ২০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজেকে খুব প্রবল ব্যক্তি মনে করিলেন। ৩০০ বৎসর যাবৎ পাঠানেরা ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, আগন্তুক মোগল-শাসন তাঁহাদের নিকট দুঃসহ বোধ হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের আভাস পাইয়া নবাব ইসলাম খাঁ পাঠান-নেতা ওসমানের নিকট দূত পাঠাইয়া অনেক মিষ্ট ও হিতকর বাক্যদ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কোন জাতি হইলে হয়ত তাঁহার এই শুভার্থক চেষ্টা সফল হইত, কিন্তু পাঠান বড় দুর্দ্দান্ত জাতি, তাহারা লেখনী বা দাঁড়িপাল্লা অথবা লাঙ্গল, ইহার কোনটিই ধরিতে প্রস্তুত নহে,—তাহাদের একমাত্র অবলম্বন মুক্ত তরবারি। ওসমান সন্ধির প্রস্তাবে কাণ দিলেন না। নবাব ইসলাম খাঁ, সুজাত খাঁকে ওসমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সুবর্ণরেখার তীরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ওসমানের অপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্ব মোগলদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল। বহু মোগল সেনাপতি ও ওমরা এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া গোলাগুলির মত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে পাঠান নবাব-পুত্র মোগলদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এক সময়ে মোগলসেনাপতি সুজাত খাঁর প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু পরিণামে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার বরপুত্র আকবরের পক্ষপাতী হইলেন; অপরিমিত স্থূলদেহ ওসমানের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিবার পর সেই রাত্রিতেই তাঁহার বীরদেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল, আর মুক্ত আত্মা তাঁহার কাম্য স্বাধীন রাজ্যে মহাপ্রয়াণ করিল (১৬১২ খৃঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পর ওয়ালি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুমরিজ সুজাত খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিল, তাহাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি—৪৯টি হাতী এবং কিছু মণিমাণিক্য—সকলই মোগল সেনাপতির নিকট উপস্থিত করা হইল এবং মোগল সম্রাটের অধীন হইয়া তাহারা তাঁহারই উপর জীবিকানির্ব্বাহের ভার দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ওসমানের অপূর্ব্ব সাহস ও মৃত্যু, ১৬১২ খৃঃ।

বঙ্গদেশে এই ১৬১২ খৃষ্টাব্দ স্মরণীয়—এই বৎসরে পাঠান-শক্তির শেষ আশা নির্মূল হইয়া গেল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ

কিন্তু পাঠান নবাব ও তাঁহার বংশধরেরাই শুধু মোগল সম্রাটের বিদ্রোহিতা করে নাই। বঙ্গদেশ পাঠানযুগে একরূপ স্বাধীন ছিল, বাঙ্গলার নৃপতিরা কেহবা শুধু মুখে, কেহবা নামমাত্র, পাঠান বাদশাহের বশ্যতা জানাইলে—তাঁহারা স্বাধীন থাকিতেন। তাঁহারা নিজের নিজের রাজ্যে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা থাকিতেন। পাঠান আমলে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হত্যাকাণ্ড ও কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে দেশটা অনেক পরিমাণে হিন্দুর হাতেই পড়িয়াছিল। অবশ্য এক এক সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় দেশে বইয়া যাইত, তখন দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গার ধুম পড়িয়া যাইত, এবং যাহারা ঝড়ের মুখে পড়িত, তাহারা মরিত। কিন্তু মোগল সম্রাট্ সমস্ত দেশটি আত্মসাৎ করিতে চাহিলেন, তোদরমল্লকে পাঠাইয়া সমস্ত দেশ জরিপ করিয়া রাজস্বের হার স্থির করিয়া দিলেন, পাঠানদের ও অনেক হিন্দুর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন, এমন কি পাঠানদের হাত হইতে যে সকল জায়গীর দখল করিয়া মোগলদিগকে দিলেন, তাঁহাদিগকে তাহা নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে দিলেন না,—তাঁহাদিগকে রীতিমত রাজস্ব দিতে হইত এবং অন্যান্য কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সেই জায়গীর ভোগ করিতে হইত। কোথায় জঙ্গল-বাড়ীতে ক্ষুদ্র ভৌমিক ঈশা খাঁ, শ্রীপুরে কেদার রায়, যশোহরে প্রতাপাদিত্য—কে কি করিতেছে, আকবর তাহার সন্ধান লইতেন। পাঠান শক্তি প্রবল ঝড়ের ন্যায় উচ্চ বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া চলিত, কিন্তু মোগল সম্রাটের চক্ষুতে যেরূপ পাহাড়-পর্ব্বত পড়িত, দূর্ব্বাঘাস ও তৃণগুচ্ছও সেইরূপ তাঁহার শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইত না। পাঠান রাজাদের দৃষ্টি ছিল ক্ষুদ্র বাঙ্গলার মসনদের উপর, দিল্লীশ্বরগণের অনেকেই দুর্ব্বল ছিলেন, সুতরাং বাঙ্গলার বাদশাহের ক্ষমতা তাঁহারা প্রায়ই লোপ করিতেন না। কিন্তু এবার বাঙ্গলায় প্রকৃত স্বাধীনতার সময় আরম্ভ হইল। বৃহত্তর বাঙ্গলার সঙ্গে দিল্লীর লড়াই নূতন কথা নহে। চিরকাল বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে। সেই ইতিহাস-পূর্ব্বযুগে জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, ভগদত্ত, বাণ, মুর, নরক প্রভৃতির সময় হইতে বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব সহ্য করিতে পারে নাই। নন্দবংশের সময় হইতে বৃহত্তর বাঙ্গলা জয়ী হইল—ইন্দ্রপ্রস্থ আড়ালে পড়িল। যুগ যুগ ধরিয়া মগধ ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিল। তারপর গুপ্তগণ পূর্ব্বাঞ্চলের সমৃদ্ধি নানাদিকে বাড়াইয়া দিলেন, গুপ্তদের শেষকালে রাজলক্ষ্মী মগধ ছাড়িয়া খাস গৌড়ে আসিলেন। পালেরা খাস বাঙ্গলার রাজা। তখন ইন্দ্রপ্রস্থ নিবিয়া গিয়াছে, তথাপি পশ্চিম-ভারতের সহিত বাঙ্গলার বিরোধ থামে নাই, বঙ্গরাজকে প্রতারণা করিয়া কাশ্মীরাধিপতি নিধন করিলেন, বঙ্গসৈন্য পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাঙ্গিবার জন্য যে অদম্য সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখাইয়াছিল তাহা কলহন কবি নানা উপমাখচিত করিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

পাঠান ও মোগল রাজত্ব।

বাঙ্গলার রাজা শশাঙ্ক কনোজাধিপ রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রতারণা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—এই দুর্নাম আছে। প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশগুলির সংঘর্ষ নূতন নহে। বাঙ্গলাদেশ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করে নাই, রৈবতকে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। বৃহত্তর বাঙ্গলার জরাসন্ধের ভয়ে তিনি স্বদেশত্যাগী হইয়া সমুদ্রের তীরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর রাজকীয় রক্তে দিল্লীর বিদ্বেষ নিহিত ছিল। পাঠানদের সময়ে যে স্বাধীনতা তাঁহাদের লুপ্ত হয় নাই, এবার মোগলদের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির আওতায় তাহা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল।

এই বিদ্রোহীদের প্রথম নাম করিব—ইশা খাঁ মসনদ আলির।

অযোধ্যাতে বাইশওয়ার পরগনায় ভগীরথ নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ইনি দিল্লীশ্বরের সামন্ত রাজা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভগীরথ বঙ্গদেশে তীর্থদর্শনে আসিয়া সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং অবশেষে সুলতানের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে থাকিয়া যান। ভগীরথের বংশে কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি অতি পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ ও প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে প্রত্যহই ইনি একটি ছোট সোণার হাতী নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ভাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। এজন্য তিনি "কালিদাস গজদানী" নামে খ্যাত হন। কাহারও কাহারও মতে সুলতান জালালউদ্দিনের তৃতীয় কন্যা মমিনা খাতুন,—কাহারও মতে হুসেন সাহের এক কন্যা—কালিদাসের গঙ্গাস্নাত সুন্দর গৌর বপু ও সুদর্শন মুখচোখ দেখিয়া যাচিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কালিদাস সুলতানের কন্যার কাছে যে উত্তর লিখেন, তাহাতে অনেক সদুপদেশ ছিল—এবং তাহার শেষ কথা ছিল—কুমারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ ও অবমানিত হইয়া রাজকুমারী কৌশল-ক্রমে তাঁহাকে গোমাংস খাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করেন। অনন্যোপায় হইয়া কালিদাস গজদানী ইসলামধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক মমিনা খাতুনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। ইহার মুসলমানী নাম হইল—সোলেমান খাঁ। কয়েকজন মুসলমান পল্লীগীতিকার এই ভালবাসার ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে মুসলমান মমিনগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেওয়ান পরিবারের ইতিহাসে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে। আইন-ই-আকবরীর মতে সোলেমানের দুই পুত্র ইসমাইল ও ইশা খাঁ,—সোলেমান তাজ খাঁ এবং সালিম খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার পর—দাসবৎ পারস্যদেশে প্রেরিত হন। তাঁহারা তাঁহাদের এক খুল্লতাতকর্ত্তৃক পুনরায় বঙ্গদেশে আনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাটী অঞ্চলের অধিপতি হন। ইশা খাঁ তরুণ যৌবনে ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের সেনাপতিগণের তালিকাভুক্ত হইয়া শ্রীহট্টের (তরপের) রাজা ফতে খাঁর বিরুদ্ধে যুবরাজ রাজধরের সঙ্গে অভিযান করেন। ত্রিপুরেশ্বরকে সহায়তা করিয়া ইনি মোগল সেনাপতি সাহবাজ খাঁকে পরাস্ত করেন। তখন ত্রিপুরায় সরাইল পরগনার মালিক হইয়া ইনি অমর মাণিক্যের রাজ্ঞীকে মাতৃসম্বোধন

করিয়া রাজপরিবারে প্রতিষ্ঠা ও আদর লাভ করেন। যখন অমর মাণিক্য চৌদ্দগ্রামে বিখ্যাত অমরসাগর দীঘি কাটাইতেছিলেন, তখন (১৫৮২ খৃঃ) ইশা খাঁ তাঁহাকে সরাইল হইতে এক হাজার মজুর পাঠাইয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমার রাজাধরের সরাইল পরগনায় শিকারযোগ্য পশুপক্ষি-বহুল অরণ্য দেখিয়া ঐ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। এদিকে সাহবাজ খাঁ পরাস্ত হইয়া প্রতিশোধে কৃতসঙ্কল্প হন—তখন সরাইল পরগনায় থাকিতে না পারিয়া সাহবাজের বিরুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহাদি ও যুদ্ধোদ্যোগ করিবার জন্য ইশা খাঁ কোন নিভৃত অরণ্য-সংরক্ষিত স্থান খুঁজিতে থাকেন। অমর মাণিক্য তাঁহার রাজ্ঞীর অনুরোধে ইশা খাঁকে 'মসনদ আলি' উপাধি এবং ৫০,০০০ সৈন্য দিয়াছিলেন। উপাধিটি দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত নহে—আবুল ফজল ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। রাজমালায় ইহার উল্লেখ আছে। ইশা খাঁ সহসা একরাত্রে একটা তুফানের মত ময়মনসিংহে কিশোর গঞ্জের অন্তর্গত কোচ রাজাদের রাজধানী জঙ্গলবাড়ীতে হানা দেন (১৫৮৫ খৃঃ)। উক্ত স্থানে লক্ষণ হাজরা ও রাম হাজরা ভ্রাতৃদ্বয় রাজত্ব করিতেছিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে পলায়নপর হন। তদবধি জঙ্গলবাড়ী ইশা খাঁর অধিকৃত হয়। ইশা খাঁ জঙ্গলবাড়ী দখল করিয়া ক্রমে ক্রমে ২২টি পরগনা (সেরপুর, জোয়ানসাহী, আলপসিংহ, জোয়ানসাই, নসির-উ-জিয়াল, হুসেন সাহ, ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, কটরার, কুড়িখাই, সিন্দ, হাজরাদি, দরজিবাবু, গোদের ও হুসেনপুর প্রভৃতি) অধিকার করেন ও নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে দিল্লীশ্বরের বিদ্রোহিতা করেন। তিনি রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এগার সিন্দুরের দুর্গ ইহার অজেয় নিরাপদ্ নিবাস ছিল। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, ইনি সমস্ত ভাটি অঞ্চলের রাজা হইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে ইনি ঘোড়াঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে সাহবাজ খাঁ ইশা খাঁর বক্তিয়ারপুরের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ইশা খাঁ মানসিংহের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া কতকগুলি কামান প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে ৩টি পাওয়া গিয়াছে। তাহার একটিতে "সরকার শ্রীযুত ইশা খাঁ, মসনদালি ১০০২" উৎকীর্ণ আছে। ১০০২ বাং সনে অর্থাৎ ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে মানসিংহ আসিয়া ইশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। যদিও ইশা খাঁ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, তথাপি সম্রাট্-বাহিনীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া প্রথমতঃ বুকাই নগরে পরাস্ত হইয়া সেরপুর গড়জরিপা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেরপুর হইতে দেওয়ানবাগ—তথা হইতে মুড়াপাড়া এইরূপে এক দুর্গ হইতে ক্রমাগত তাড়িত হইয়া দুর্গান্তরে উপস্থিত হন। এখানে পরিশেষে মানসিংহ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার বিক্রম ও সাহসে, তদধিক আত্মসমর্পণে প্রীত হইয়া তাঁহার সমুচিত আতিথ্য করেন, এবং সম্মানিত করিয়া তাঁহাকে রাজধানী জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরণ করেন। এই আখ্যায়িকা বহু প্রাচীন পল্লীগীতিকায় স্থান পাইয়াছে। ইশা খাঁর বংশধরেরা দেওয়ান ভগীরথ—তৎপরে দেওয়ান কালিদাস

১৫৮২ খৃঃ।

১৫৮৫ খৃঃ জঙ্গলবাড়ী।

গঙ্গদানীর উপাধি-অনুসারে জঙ্গলবাড়ীর 'দেওয়ান পরিবার' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীপুরের ভূঞা কেদার রায়ের ভগিনী সোণামণি (অপর নাম স্বভদ্রা) স্বেচ্ছায় ইশা খাঁকে আত্মদান করিয়া শ্রীপুর হইতে পলায়ন করিয়া ইশা খাঁর অঙ্কশায়িনী হন। বঙ্গবিশ্রুত এই ঘটনাসম্বন্ধে অনেক পল্লীগাথা আছে। মৎসম্পাদিত পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা ইশা খাঁ, তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ, প্রণয়কাহিনী, সোণামণির দুই পুত্র আরাম-বিরামের কথা—ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। করিমুল্লার হস্তে কেদার রায়ের মৃত্যু ও শ্রীপুর-ধ্বংসের বৃত্তান্তও তথায় বিবৃত হইয়াছে। ইশা খাঁর বংশধর বলিয়া যাঁহারা দাবী করিয়া থাকেন—তাঁহাদের সংখ্যা অগণ্য। কথিত আছে হয়বৎপুরের দেওয়ানেরা সোণামণির সন্তানের কুলোদ্ভব। এই দেওয়ান পরিবারেরা সোলেমানকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিয়া বঙ্গের নবাবের সঙ্গে তাঁহাদের রক্তসম্বন্ধ প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা পাইয়াছেন, ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় বিদ্রোহী যশোরের প্রতাপাদিত্য। ইহার পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায় পাঠান বাদশাহ দাউদ খাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনসংক্রান্ত ও রাজস্বের হিসাবপত্রের সমস্ত কাগজপত্র ইহাদের হস্তে ছিল। সুতরাং দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গাধিপ রাজা তোদরমল্ল ইহাদিগের অনুসন্ধান করেন। ইহারা মোগল-দিগের বশ্যতা স্বীকার করায় তোদরমল্ল ইহাদিগকে বিস্তৃত ভূমির অধিকার প্রদান করিয়া বিক্রমাদিত্যকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। যশোরে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণের পর রাজজ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইনি পিতৃহন্তা হইবেন।" বিক্রমাদিত্য এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কিন্তু খুল্লতাত বসন্ত রায় শিশুর প্রতি কোন অত্যাচার হইতে দেন নাই। তিনিই পিতার অধিক বাৎসল্য দেখাইয়া প্রতাপাদিত্যকে লালনপালন করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় স্বয়ং সুদক্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার 'গঙ্গাজল' নামক এক সুবৃহৎ খড়্গ ছিল। তিনি বালক প্রতাপাদিত্যের রণশিক্ষার গুরু। কৈশোর অতিক্রম করিয়া প্রতাপাদিত্য দুই বৎসর কাল আগ্রায় অতিবাহিত করেন, তথায় তিনি মোগল সম্রাটের সভা, রাজনীতি, সৈন্যব্যূহ—এ সকল দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যৌবনে তিনি নাগবংশীয়া শরৎকুমারী নাম্নী এক

প্রতাপাদিত্য।

পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যের দশ আনা প্রতাপাদিত্যকে ও ছয় আনা বসন্ত রায়কে ও তাঁহার পুত্রগণকে প্রদান করিয়া যান। প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা-লিপ্সা ও দুর্দ্দান্ত চরিত্র স্মরণ করিয়া বসন্ত রায় এই অসম রাজ্যবিভাগে বরং সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপাদিত্য কতলু খাঁর পক্ষ হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিংহ বঙ্গাধিপ হইয়া আসিলে তিনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত সৈন্যবৃদ্ধি ও দুর্গাদি রচনা করিয়া উত্তরকালে

মোগলশক্তি নির্মূল করিয়া সমস্ত বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল—ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন সাগর-দ্বীপ, কেহ বলেন ঈশ্বরপুরের নিকটে, কেহ বা বলেন চ্যাণ্ডিকানে। কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনেক অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ধুমঘাটেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। পর্ত্তুগীজগণ যাহাকে চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা সাগরদ্বীপের সন্নিহিত স্থানগুলির প্রাচীন নাম—চণ্ডিকানগর—হইতে পারে। প্রতাপাদিত্যের বহু দুর্গের মধ্যে ১৪টি প্রধান দুর্গ ছিল—(১) যশোর দুর্গ, (২) ধুমঘাট দুর্গ, (৩) রায়গড় দুর্গ, (৪) কমলপুর দুর্গ, (৫) বেদকাশী দুর্গ, (৬) শিবসাহ দুর্গ, (৭) প্রতাপনগরের দুর্গ, (৮) শালিখা দুর্গ, (৯) মাতলা দুর্গ, (১০) হায়দার গড়, (১১) আড়াইকাকী দুর্গ, (১২) মণিদুর্গ, (১৩) রামমঙ্গল দুর্গ, (১৪) চকশ্রী বা চাকশ্রী দুর্গ। কথিত আছে বর্ত্তমান কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের ৭টি দুর্গ ছিল—যথা, মাতলা, রায়গড়, টালা, বেহালা, শালখিয়া, চিৎপুর, মূলাজোড়। প্রতাপাদিত্য জাহাজনির্ম্মাণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার নৌবহরের জন্য সুন্দরী কাঠের অনেক জাহাজ ও রণতরী নির্ম্মিত হইত। কোন কোন নৌকার ৬৪টি বা তদধিক দাঁড় ছিল এবং অনেক তরীতেই কামান থাকিত। তাঁহার নৌকা, রণতরী ও জাহাজের অনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কতক নাম বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে। যশোরে প্রতাপাদিত্যের নৌবহরে 'পিয়ারা', 'মহলগিরি', 'ঘুরাব', 'পাল', 'মাচোয়া', 'পশত', 'ডিঙ্গি,' 'গছাড়ি', 'বালাম', 'পলওয়ার', 'কোচা' প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর তরী ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোরের কারিগরেরা জাহাজ-নির্ম্মাণে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে সায়েস্তা খাঁ অনেক জাহাজ যশোর হইতে প্রস্তত করাইয়া লইয়াছিলেন। (যশোর-খুলনার ইতিহাস, ২১১ পৃষ্ঠা।) প্রতাপের উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা ১০,০০০-এর উপরে ছিল এবং অন্যান্য পোতের সংখ্যাও দ্বিসহস্র কিংবা তদধিক ছিল। জাহাজঘাটা এখনও নামে মাত্র বর্ত্তমান। আবদুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়—"প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের উপকরণ শত শত তরীতে বোঝাই থাকিত।" এই রণতরীগুলি প্রথম বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর অধীন ছিল, কিন্তু পরে পর্ত্তুগীজ ফ্রেডারিক ডুডলীই এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপের সৈন্য (১) ঢালী, (২) অশ্বারোহী, (৩) তীরন্দাজ, (৪) গোলন্দাজ, (৫) নৌসৈন্য, (৬) গুপ্তসৈন্য, (৭) রক্ষিসৈন্য, (৮) হস্তিসৈন্য—এই আট বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঢালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন কালিদাস রায় মদন মল্ল ("যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী"—ভারতচন্দ্র)। অশ্বারোহী সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতাপসিংহ দত্ত, সহকারী মহিউদ্দিন ও নুরউল্লা। তীরন্দাজের অধ্যক্ষ সুন্দর ও খুলিয়ান বেগ। নৌবহরের অধ্যক্ষ অগষ্টাস্ পেড্রো। বিপক্ষদের গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ লইবার জন্য যে গুপ্তসৈন্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ ছিল 'সুখা' নামক এক অসমসাহসী বীর ("গুপ্তসেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীম-বিক্রমঃ"—ঘটককারিকা)। কুকীসেনাদের অধ্যক্ষের নাম রঘু। "ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতী, বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী"—প্রতাপাদিত্যের সৈন্যসংখ্যার এই নির্দ্দেশ ভারতচন্দ্র

করিয়াছেন। পূর্ত্তবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎসহায় দত্ত। প্রতাপাদিত্যের বহু কামান ও গোলার নিদর্শন এখনও যশোরে দৃষ্ট হয়। চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুন্দরবনের সমৃদ্ধিশালী বহু নগর ও পল্লী এবং পূর্ব্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে অসন্তুষ্ট ও পরাজিত পাঠান সৈন্য, পর্ত্তুগীজ ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার কুকী সৈন্য বিস্তর ছিল; বাঙ্গালী রায়-বেঁশে ও ঢালী সৈন্যগণ অতীব দুর্দ্ধর্ষ ছিল। কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ তাঁহার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

মানসিংহের সময়ে হিন্দু রাজার অমায়িক ব্যবহারে প্রতাপাদিত্য কিছুকাল পোষ মানিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি ইস্‌লাম খাঁর শাসনকালে পুনঃ পুনঃ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে লাগিলেন। মুল কথা তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্ত্তী এবং মহাবলশালী সূর্য্যকান্ত গুহ (সূর্য্যকান্তো মহাশূরো গুহকুলস্য ভূষণম্) এই দুইজনে মিলিয়া পাঠানাধিকারের পরে দেশে হিন্দুরাজত্ব ফিরাইয়া আনিতে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যবল এবং প্রতাপ ছিল—এবং তিনি নিজে যেরূপ বীরবিক্রম ছিলেন, তাহাতে এইরূপ আশা করা অসম্ভব ছিল না। কমল (সম্ভবতঃ কামাল) নামক এক বিশ্বস্ত অতি দুর্দান্ত রণদক্ষ খোজা তাঁহার এই আশার এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং তৎসঙ্গে বাঙ্গালী চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে কেন যে তিনি হারিয়া গেলেন তাহা বুঝা যাইবে।

বসন্ত রায়ের হত্যা।

তিনি তান্ত্রিকভাবে শক্তির উপাসনা করিতেন, এজন্য মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। তিনি খুল্লতাত বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। যে ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহাতে তাঁহার খুব দোষ দেওয়া যায় না। বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি তীর বর্ষণ করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খড়্গাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। শ্রাদ্ধকার্য্যে উপবিষ্ট বসন্ত রায় ভৃত্যকে "গঙ্গাজল" আনিতে বলেন; প্রতাপ বুঝিলেন, পুত্রহত্যার প্রতিশোধার্থ বসন্ত রায় তাঁহার প্রসিদ্ধ 'গঙ্গাজল' নামক খড়্গ আনিতে আদেশ করিলেন। তখনই পিতা হইতে অধিক স্নেহে যিনি তাঁহাকে লালনপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে বধ করিলেন (১৫৯৫ খৃঃ)। ক্রোধের সময়ে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার সদ্যোবিবাহিত জামাতা বাক্‌লার অধিপতি তরুণবয়স্ক রামচন্দ্রকে তিনি হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে 'রামাই ঢঙ্গী' নামক এক ভাঁড় আসিয়াছিল। বিবাহ-উৎসবে সে তাহার ভাঁড়ামী দেখাইয়া খুব 'বাহবা' পাইয়াছিল। কিন্তু সে স্ত্রীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমণীমহলে ভাঁড়ামী করিতে থাকে। কিন্তু অবিলম্বে তাহার রমণীর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে এবং মহারাণী শরৎকুমারী একথা প্রতাপাদিত্যকে জানান। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতাপাদিত্য রামাই ঢঙ্গী এবং তৎসঙ্গে জামাইকে কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। হয়ত মুহূর্ত্ত পরে ক্রোধ থামিয়া যাইত এবং জামাইকে তিনি

নির্দ্দোষ জানিয়া লজ্জিত হইতেন, কিন্তু ভীত হইয়া বাড়ীর সকলের পরামর্শে সেই রাত্রেই রামচন্দ্র ৬৪ দাঁড়যুক্ত এবং কামান দ্বারা সুরক্ষিত নৌকাযোগে পলায়ন করেন। রাজকুমারী পরমা সাধ্বী বিমলা অবশ্য শেষে বাক্‌লার অন্তঃপুরে তাঁহার স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বশুর-জামাই যেন 'ভুজঙ্গ-নকুল' হইয়া চিরকাল শত্রু হইয়া রহিলেন। বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রের নিধন এবং স্বীয় জামাতার প্রতি ঈদৃশ ব্যবহারে তিনি জনসমাজের শ্রদ্ধা হারাইলেন। এই সকল পাপ ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনামূলক, সুতরাং ক্ষমাই হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যেভাবে সন্দীপের অধিপতি কার্ভালোকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আরাকানের রাজাকে তাঁহার চিরশত্রু কার্ভালোর মুণ্ড উপহার দিতে পারিলে মগরাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হইবে এবং মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার আনুকূল্য পাইবেন, এই ছিল তাঁহার অভিসন্ধি। আরাকানাধিপের সঙ্গে ষড়যন্ত্র দৃঢ়ীভূত করিয়া তিনি অতিশয় অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার বাহ্য সরল ব্যবহারে ও মৈত্রীর প্রস্তাবে পর্ত্তুগীজ বীরকে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। ডুজারিকের বিবরণীতে এই ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ আছে। আত্মীয়ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ আতিথ্য বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ক একবার কান্তকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রতাপাদিত্য এই কলঙ্ক প্রক্ষেপ করিলেন। ইহা ছাড়া অতিশয় ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী "হ'রে শুঁড়ি" নামক আর এক বণিক্‌কে তিনি নির্ম্মমভাবে হত্যা করেন, তাঁহার পরিবারবর্গ প্রতাপাদিত্যের ব্যবহারে এত ভীত হইয়াছিল যে তাহারা রাজভয়ে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল। যমুনা হইতে চলুন্দিয়া মোহনার কাছে এখনও লোকে "হ'রে শুঁড়ির দহ" দেখাইয়া থাকে। এই 'হ'রে শুঁড়ি' গোবরডাঙ্গার নিকট একটি অতি বৃহৎ রাস্তা করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও "হ'রে শুঁড়ির রাস্তা"র অনেকটা বিদ্যমান আছে।

কথিত আছে, একদা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর স্তন কাটিয়া ফেলেন। এদিকে তাঁহার সদ্‌গুণরাশিরও শেষ ছিল না। তাঁহার উদারতার খ্যাতি সমস্ত যশোরবাসীর মুখে এখনও শুনা যায়। তিনি আশার অতীত অর্থ প্রার্থীকে দিতেন। এমন কি, কথিত আছে, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া কল্পতরু হইয়াছিলেন—তখন একজন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী শরৎকুমারীকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। ইহা শুধু পরীক্ষার জন্য। কল্পতরু হওয়ার প্রথা রঘুবংশীয় রাজা দিলীপের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে; কালিদাস তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই রীতি বৌদ্ধযুগেই বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হিউনসাঙ্গ হর্ষবর্দ্ধনের এই কল্পতরু হওয়ার ব্যাপার সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কান্তকুব্জরাজ সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে লজ্জা-নিবারণার্থ একখানি বস্ত্র চাহিয়া লইয়াছিলেন। দিলীপ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস কালিদাসের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "অন্ন ভক্ষ্য মহারাজা নাহি রাখে ঘরে। মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাজা জলপান করে।" কিন্তু হিন্দুরাজত্বকালে এ প্রথা ছিল কি না সন্দেহস্থল। বাল্মীকির

রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ ও ত্যাগের আদর্শে যে বৌদ্ধরাজগণ ইহার অনুসরণ করিতেন, তাহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা রাজ্যে সেদিন পর্য্যন্ত এ প্রথা নামে মাত্র অনুষ্ঠিত হইত। রাজা কল্পতরু হওয়ার পর মহারাণী সর্ব্বপ্রথম তাঁহার রাজত্ব ও সর্ব্বস্ব চাহিয়া লইতেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া কল্পতরুব্রত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়া ছিনিমিনি খেলার লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ শরৎকুমারীকে পাইলেন, শরৎকুমারীও রাজার ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিলেন না। এইস্থানে শরৎকুমারী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর বৃত্তি করিবেন—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু গ্রহীতা পরস্ত্রীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন, তিনি শুধু রাজার দানবল পরীক্ষা করিবার জন্য এইভাবে রাণীমাকে যাজ্ঞা করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাকে বিধিমত প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বিনিময়ে রাজ্ঞীর ওজনমত স্বর্ণ পাইলেন। প্রতাপাদিত্যের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রাজ্যের এরূপ সুশৃঙ্খলা করিয়াছিলেন যে সকলে রামরাজ্যে বাস করিত। তাঁহার অপূর্ব্ব দানশক্তি ও উদারতাসম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, —রামরাম বসু ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দুর্দান্ত পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যের লোকেরা বহিঃশত্রুর আক্রমণসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য ও পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ—কুলীন এবং পণ্ডিতগণ যশোরে আমন্ত্রিত হইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল—প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ভগ্নাবশেষ তথায় দুর্লভ নহে। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পাইয়া তাহা অতি আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল এবং এই জন্যই ভারতচন্দ্র তাঁহাকে "বরপুত্র ভবানীর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যখন বসন্ত রায়ের আত্মীয় কূটবুদ্ধি রূপরাম বসু কচু রায়কে লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে তাঁহার হত্যার কথা জানাইল, সেই স্মরণীয় দিনে বাঙ্গলার স্বাধীনতার শেষ আশা-রশ্মি অস্তমিত হইল। মানসিংহ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, তিনি প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি তরবারি ও একটি বেড়ী (শৃঙ্খল) পাঠাইলেন। বেড়ী অধীনত্বের চিহ্ন—এবং তরবারি যুদ্ধের। কেশবভট্ট নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"এই বেড়ী যেন মানসিংহ তাঁহার প্রভু জাহাঙ্গীরের পায়ে পরাইয়া দেন"—"বেড়ি দিও আপনার মনিবের পায়ে" (ভারতচন্দ্র)। সাদরে তিনি তরবারিটা গ্রহণ করিয়া বেড়ী ফিরাইয়া দিলেন, তৎসঙ্গে রাজা মানসিংহ মোগলের আত্মীয়তা করিয়া যে জাতিচ্যুত ও কুলচ্যুত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না।

মানসিংহ আকবরের নিকট যুদ্ধনীতি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, পথে পথে

বঙ্গের যে সকল জমিদার ও রাজা প্রতাপাদিত্যের ("ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ") দরবারে গরুড় পক্ষীর ন্যায় থাকিতেন, তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রতাপের নিজ সেনাপতিদের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। বাঙ্গালীসমাজ তখনও প্রায় এখনকার সমাজের মতই ছিল। কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না। কেহ কেহ প্রতাপাদিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন; কেহবা মোগলের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন, কেহবা প্রতাপাদিত্য-কৃত পিতৃব্য ও তৎপুত্রের হত্যা, কার্ভালোর হত্যা, স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ইত্যাদি দুর্নীতি ও পাপ খুব বাড়াইয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি যে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কোন হিন্দুরাজা তাহা বুঝিলেন না, তাঁহার দানশীলতা ও উদারতার কথা কেহ বলিলেন না, তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে পারিলেই তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল মনে করিলেন। সুতরাং রূপরাম ও কচু রায়কে সঙ্গে করিয়া ২২ লস্কর সঙ্গে যে দিন মানসিংহ বঙ্গে পদার্পণ করিলেন—সেদিন বাঙ্গলাদেশে তিনি সহায়তার অভাব অনুভব করিলেন; যদিও কিছু ঐক্যের গুঁড়া বঙ্গদেশে তখনও ছিল, তাহা মানসিংহের ন্যায় রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের ভেদনীতিতে সম্যক্ বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

(১) কৃষ্ণনগরের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য করেন। ঝড়বৃষ্টি ও বন্যার প্রকোপে যখন মানসিংহের সৈন্যদল মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল—তখন তিনি রসদ জোগাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দেন। তাঁহার গৃহদেবতা গোবিন্দ ও লক্ষীর মহাসমারোহে বিবাহ দিবার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই উপকরণে মোগল সেনাদের মহা-বিপদ্ ঘুচিল। ভবানন্দ মজুমদার নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি বহুদিন যশোরে প্রতাপাদিত্যের অনুগৃহীত হইয়া ছিলেন।

(২) চাচড়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়ের বংশধর মহাতাব রায় বা মুকুট রায় যশোর রাজ্যের উত্তর সীমান্তের প্রধান কিল্লাদার এবং প্রতাপাদিত্যের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি মানসিংহকে গোপনে রসদ ও সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন।

(৩) নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রণবীর খাঁ এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্ত-বাগীশ উভয়ে মানসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মানসিংহের দরবারে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

(৪) কামদেব ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষীকান্ত প্রতাপের বিশেষ অনুগৃহীতদের অন্যতম। কেহ কেহ বলেন, রূপরাম বসুর কৌশলে গুপ্তভাবে কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরিত হয় এবং মানসিংহ যশোহরের সমীপবর্ত্তী হইলে লক্ষীকান্ত গোপনে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন। শুধু যোগ দেওয়া নহে যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত প্রতাপ কি ভাবে আয়োজনাদি করিয়াছিলেন, লক্ষীকান্ত সে সকল গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়াছেন—তদ্দ্বারা মোগল সৈন্যের জীবনরক্ষা হয়।

ভবানন্দ মজুমদার, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার * এবং বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ জয়ানন্দ মজুমদার—এই তিন মজুমদার বঙ্গদেশটাকে ভাগবাটরা করিয়া লইয়াছিলেন—এরূপ প্রবাদ আছে। ইহারা সকলেই মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেশের অবস্থাটা বেশ বুঝা যায়। ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালী প্রতিভার এখনও পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগেও পরমহংস দেব, রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তিমান্ পুরুষদের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গলার সে ঐক্য আর নাই, যাহা মহীপালকে ভীম কৈবর্ত্তের বিরুদ্ধে শক্তি দিয়াছিল, যাহার বলে বল্লাল সেন সমস্ত বঙ্গদেশে কৌলীন্য চালাইয়াছিলেন, যাহা আদিকালে গোপালের হস্তে সমস্ত রাজশক্তি তুলিয়া দিয়াছিল। কোন মনস্বী ব্যক্তি প্রতিভাদ্বারা কিছু কালের জন্য উর্দ্ধলোকে শির উত্তোলন করিতে পারেন,—কিন্তু লক্ষ্যভেদ করিতে অর্জ্জুন উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল ("এত বলি ধরাধরি করি বসাইল"—কাশীদাস)—বঙ্গদেশের লোক সেইরূপ কাহারও উদীয়মান প্রতিভা দেখিলে তাঁহাকে সহায়তা করা দূরে থাকুক—তেমনই নিরস্ত করে। পরস্পরের গার্হস্থ্য বিবাদ ভুলিয়া সর্ব্বজনহিতকামীর হস্তে বলসঞ্চার করার যোগ্য ঐক্য-বন্ধন আর এদেশে নাই। সেই শকুনির সময় হইতে যে গৃহবিবাদ চলিয়া আসিয়াছে, যাহাতে পৃথ্বীরাজ ভারতসাম্রাজ্য হারাইলেন—তাহা কবে নির্ব্বাপিত হইবে?

"জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্। অস্মদ্রূপকরগ্রাহী বভূব নরশার্দ্দূলঃ।"

প্রতাপসম্বন্ধে ঘটককারিকা।

প্রতাপ এইভাবে স্বগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত খোজা কমল সাতদিন উপবাসী থাকিয়া অবিশ্রান্ত লড়াই করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন, সূর্য্যকান্তের মৃতদেহের উপর হয়ত তাঁহার চিরবিশ্বস্ততার জন্য দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের এই যুদ্ধ তিনদিন যাবৎ চলিয়াছিল; ইহাতে শৌর্য্যবীর্য্যের চূড়ান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য শুধু খোজা কমল ও আশৈশব বন্ধু সূর্য্যকান্তকে হারান নাই—এই যুদ্ধে তাঁহার প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বন্দী হইলেন, তৎপক্ষীয় ফিরিঙ্গী সেনানায়ক রডা নিহত হইলেন এবং তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মদন-মল্ল প্রাণ হারাইলেন। মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন। শেষে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেন। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষায় বাঙ্গলাদেশের অবস্থা মানসিংহের ভালরূপই বিদিত ছিল, পূর্ব্ববৎসর বর্ষায় তাঁহার বিপুল সৈন্যের কোনরূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, বর্ষার বিপদ্ তিনি জানিতেন। সুতরাং যখন প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থী হইলেন, তখন তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন। সন্ধিদ্বারা প্রতাপ নামে মাত্র মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়কে তাঁহার প্রাপ্য 'ছয় আনি' প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৬০৩ হইতে ১৬০৮ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য নিরুদ্বেগে রাজ্য করিয়া বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

* লক্ষ্মীকান্ত বড়িষা গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ।

করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁ নবাব হইয়া বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি একটু উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন। বক্রপুরে তাঁহার সঙ্গে প্রতাপের দেখাসাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব দূরীভূত হইলেও স্বাধীনতার সেই চিরপোষিত ইচ্ছা তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। এ ছুতো সে ছুতো ধরিয়া তিনি সন্ধির নিয়ম ভাঙ্গিলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইবার প্রতাপাদিত্য ধূমঘাটের নৌযুদ্ধে ইসলাম খাঁর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মীর্জ্জা সহনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। তাঁহার বন্দী হওয়ার সংবাদে তৎপুত্র উদয়াদিত্য মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগলসৈন্যসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শালিখার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি নিবৃত্ত হন, এবং পিতার যোগ্য পুত্রের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। এদিকে বন্দী প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকায় গিয়া ইসলাম খাঁ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রকে আগ্রায় প্রেরণ করেন। পথে কাশীধামে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে প্রতাপের লীলাবসান হয়। ভারতচন্দ্র এবং অপর দুই একজন লেখক লিখিয়াছেন—মানসিংহের দ্বারাই তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ভুল। মানসিংহ নহে, ইসলাম খাঁর হাতেই তাঁহার পতন।

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বহুস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একখানি নাতিক্ষুদ্র ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, একখানি পার্শীতে লেখা 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' হইতে তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নূরজাহানের ভ্রাতা আসাদ খাঁর অনুচর আবদুল লতিফ খাঁ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক মীর্জ্জা সহন আলাউদ্দিন ইস্পাহিনী (অপর নাম থাইবী) "বাহিরিস্তান থাইবী" নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কথা সবিস্তারে লিখিয়াছেন, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং খুঁটি-নাটি তত্ত্বে পূর্ণ। ঘটককারিকা গ্রন্থসমূহেও প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিভারেজ-লিখিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, পর্ত্তুগীজদের লিখিত অনেক বিবরণ, বিশেষতঃ ডুজারিকের ইতিহাস—প্রভৃতি বহুগ্রন্থে যশোররাজসম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যশোর ব্যাপিয়া প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। আমাদের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের সঙ্গে প্রতাপের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েরই সখ্য ছিল—তিনি তাঁহার পদে ইহাদের নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

আর একটি কথা বলিয়া প্রতাপাদিত্যের কথা উপসংহার করিব। মোগলদের বিরুদ্ধে ইশা খাঁ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল, অন্যতম ভূঞা সত্রাজিৎ ও আরও অনেকে মোগলদিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। এদিকে পাঠানেরা মোগলের চিরশত্রু, বঙ্গদেশে তখনও তাঁহাদের প্রভাব একেবারে নষ্ট হয় নাই। সুতরাং মোগল সমস্ত দেশের শত্রু-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহারা কেন মিলিত হইলেন না—প্রতাপের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ ইশা খাঁ, যিনি নানা উৎসবে ধূমঘাটে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের

শুভকার্য্যে যোগ দিয়াছেন, তিনিই বা প্রতাপকে সাহায্য করিলেন না কেন? এক একটি ক্ষত্রিয় প্রতিপক্ষ রাজা ও মুসলমান নায়ক পতঙ্গের মত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন—সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেন না কেন? একথা দূরে থাকুক, প্রতাপের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত মোগলদিগকে তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ দেখাইয়া দিল। তাঁহার নিজ জামাতা বাক্‌লারাজ কি ক্ষণকালের জন্য পারিবারিক কলহ ভুলিয়া তাঁহার সাহায্যে দাঁড়াইতে পারিতেন না? অনৈক্যে দেশ নষ্ট হইল, ঐক্য-লক্ষ্মী এদেশে থাকিলে রাজলক্ষ্মী এস্থান হইতে বিদায় লইতেন না। তাঁহার সিংহাসন পাতা ছিল—আমাদের নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাই সমস্ত বিড়ম্বনাকে বরণ করিয়া আসিয়াছি। (এই অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই আমরা সতীশ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।)

কেদার রায় ও চাঁদ রায়।

তথাকথিত "বারভূঞা"র অন্যতম বীর কেদার রায়। চাঁদ রায় ও কেদার রায় সহোদর ছিলেন। ইঁহাদের রাজধানী পদ্মার এক শাখা কালীগঙ্গার কূলে শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিম রায় সম্ভবতঃ সেন-রাজাদের সময়ে কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুর আরা ফুল-বেড়িয়াতে বাসস্থাপন করেন, নিম রায় তৎকালীন বঙ্গাধিপের নিকট 'ভূঞা' উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের একজন পরাক্রান্ত জমিদার বলিয়া গণ্য হন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে আকবরের সময়ে নিম রায় কর্ণাট হইতে আসিয়াছিলেন। (বারভূঞাসম্বন্ধে জেমস্ ওয়াইজ্ সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনাল, ১৮৭৪.) চাঁদ রায় ও কেদার রায় সমস্ত বিক্রমপুর পরগনা ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া পাঠান-রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী সন্দীপ মোগলদের দখলে ছিল—কিন্তু জনৈক পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো কেদার রায়ের নামে ঐ স্থান অধিকার করেন। কেদার রায় তাঁহার সেনাপতি কার্ভালোর দ্বারা ঐ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারস্বরূপ ঐস্থান সেই পর্ত্তুগীজ যোদ্ধাকেই প্রদান করেন। এই সন্দীপের অধিকার লইয়া আরাকানের রাজার সঙ্গেও কেদার রায়ের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। দুইবার তিনি আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্তু শেষে সন্দীপের অধিকার শেষোক্তের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল (১৬০২ খৃঃ)। কাম্পোস লিখিত "Portuguese in Bengal" পুস্তকে দৃষ্ট হয় আরাকানরাজ মানরাজগিরি-কর্ত্তৃক সন্দীপ অধিকৃত হওয়ার পর কার্ভালো তাঁহার নৌবহর লইয়া শ্রীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কেদার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরের রাজকীয় সেনার অন্যতম অধিনায়ক হইয়াছিলেন। মোগলেরা বুঝিল তাঁহাদের অধিকৃত দ্বীপটি কেদার রায়ের সাহায্যে কার্ভালো কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রীপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মহারাজ মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায়ও কেদার রায়ের সঙ্গে যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহা অনেকটাই জলযুদ্ধ। তাহাতে কালীগঙ্গার শ্যাম সলিল উভয় পক্ষের শোণিতে লোহিত হইয়াছিল। যুদ্ধে কেদার রায় জয়ী হইলেন এবং মোগল-পক্ষীয় দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা মন্দারায় নিহত হইলেন (Parch's Pilgrims, Pt. IV, Bk. V, p. 513)। কথিত আছে এই যুদ্ধে

কার্ভালো অতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং আহত হন। তখন (১৬০৩ খৃঃ) মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষরূপ ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাপের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তিনি কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত সৈন্য লইয়া অভিযান করিলেন। প্রথমতঃ তরবারি ও শৃঙ্খল প্রেরিত হইল, দর্পিতভাবে কেদার রায় শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিলেন এবং মানসিংহকে বিদ্রূপ করিয়া প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠাইলেন, তাহা তদবধি সংস্কৃত-সাহিত্যের উদ্ভট শ্লোকগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। "ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং। বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্। করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে। তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥" মানসিংহ বলশালী, ক্ষমতাপন্ন, রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠার শিখরদেশে স্থিত, তথাপি তিনি পশুতুল্য। এই বিদ্রূপে উত্তেজিত হইয়া মানসিংহ শ্রীপুর অবরোধ করেন। কেদার রায় এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। কথিত আছে মানসিংহ কেদার রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে অনেক প্রবাদ চলিত আছে, তাহার একটি এই—"যদি রাজা মানসিংহজীউকি বেটি মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেনী করী। আর মিলাপ হবো। যদি নীজর করি।" (অম্বরের শিলাদেবীর পুরোহিতগণের বংশাবলী।) কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কথিত আছে নয় দিন পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধের পর কেদার রায় পরাস্ত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের কথা Elliot's History of India, Vol. vi, এবং আকবরনামার ১১১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। (যোগেন্দ্রবাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসের ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কথিত আছে কেদার রায় তাঁহার ৫০০ রণতরী লইয়া এই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং মোগল সেনাপতি কিল্মককে বন্দী করিয়াছিলেন কিন্তু পরিণামে মোগলেরই জয় হইয়াছিল। কিন্তু জনপ্রবাদ অন্যরূপ। ইশা খাঁ যে কেদার রায়ের ভগিনী সোণামণিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইয়া বিবাহ করেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে বিক্রমপুরের ইতিহাস (যোগেন্দ্রবাবু-কৃত) এবং অপরাপর ঐতিহাসিক গ্রন্থে যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে জানা যায় ইশা খাঁ ও চাঁদ-কেদার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক সময়ে খুব সৌহার্দ্দ্য ছিল। ইশা খাঁ এক সময়ে শ্রীপুর রাজধানীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া স্নানার্থিনী সোণামণির অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া যেরূপে পারেন তাঁহাকে লাভ করিবেন এইজন্য কৃতসংকল্প হন। রায় রাজাদের এক অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে তিনি কতকদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অপমানে ও লজ্জায় চাঁদ রায় যে দুঃসহ পরিতাপ পাইলেন—তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কেদার রায় প্রতিশোধার্থ পদ্মার অপর পারে থাকিয়া ইশা খাঁর অন্যতম রাজধানী খিজিরপুর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন, তাহা ছাড়া কৈলাগাছা দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। কিন্তু "ইশা খাঁ" শীর্ষক যে পল্লীগাথা বহুদিন যাবৎ ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান কবিকর্ত্তৃক রচিত হইয়া মুসলমান গায়েন-কর্ত্তৃক গীত হইয়া আসিতেছে—তাহাতে এই বিষয়টি ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, একদা ইশা খাঁ তাঁহার অপূর্ব্ব শিল্পখচিত সুবৃহৎ কোষা লইয়া যখন শ্রীপুরের

নদী দিয়া যাইতেছিলেন তখন চাঁদ রায়ের ভগিনী সুভদ্রাকে দেখিতে পান (সোণামণি হয়ত তাঁহার আদরের দেওয়া নাম ছিল, পোষাকী নাম সুভদ্রাটাই হয়ত তিনি মুসলমান অন্দর-মহলে প্রচার করিয়াছিলেন)। উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট হন। সুভদ্রা সোনার মাঝে চিঠি লিখিয়া ইশা খাঁকে কোন নির্দ্দিষ্ট যোগের দিনে কোষা লইয়া শ্রীপুরে আসিতে অনুরোধ করেন—সেই যোগ উপলক্ষে তিনি নদীতে পুনরায় স্নান করিতে আসিবেন, তখন ইশা খাঁ তাঁহাকে অনায়াসে তাঁহার ক্ষিপ্রগতি কোষাতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এই ইঙ্গিত পাইয়া ইশা খাঁ সেই যোগ উপলক্ষে সদ্যঃস্নাতা সুভদ্রাকে ধরিয়া লইয়া যান। কেদার রায় তাঁহার কোষা লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পলাতক তস্করকে অনুসরণ করিয়াছিলেন—শেষে ইশা ঢাকায় মুসলমান নবাবের রাজ্যে আসিয়া পড়িলে তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। কেদার রায় তদবধি ইশা খাঁর সহিত চিরশত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি জঙ্গলবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন বিধবা বেগম (নাম "নিয়ামৎ জান" হইয়াছিল) দুই পুত্র আরাম ও বিরামের সহিত রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি নানা ছন্দে ভগিনীকে আদর করিয়া বলেন—তাঁহার দুই কন্যার সঙ্গে আরাম ও বিরামের বিবাহ দিবেন, মুসলমানী-মতে বিবাহ হইলে ইহাতে কোন বাধা হইবে না। কেদার রায় আরও বলেন যে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা বালক দুটাকে দেখিতে চান, সুতরাং মাতুলের সহিত কয়েকদিনের জন্য তাহারা যাইয়া শ্রীপুরে বেড়াইয়া আসুক। নিয়ামৎ জান এই স্নেহের প্রস্তাবের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় ভ্রাতার ক্রূর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে কেদার রায় বিপুল ভোজের আয়োজন করিয়া জঙ্গলবাড়ীর গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার কোষা নৌকাগুলিতে আনাইলেন, আরাম-বিরামও সঙ্গে আসিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ-আহ্লাদে ব্যয়িত হইল এবং কেদার রায় তাঁহার ভাগিনেয়দিগকে এরূপ মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট করিলেন যে তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে "আজ বাকী রাতটুকু এখানে থাক," এই অনুরোধ করিলে তাহারা আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইল। রাজপুত্রদ্বয় নিদ্রিত হইলে বহুহস্তসঞ্চালিত কোষা অবশিষ্ট রাত্রি বাহিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীপুরে আসিল। "কালনেমী মামা" কেদার রায়ের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। ভাগিনেয়দ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কারাগারে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে কালীমন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য সমারোহ করিয়া আয়োজন চলিল। এদিকে কেদার রায়ের দুই কন্যা শুনিয়াছিলেন যে তাহাদের পিসতুত ভাইয়েদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হইবে। তাহাদের পিতা স্বয়ং এই কথা দিয়াছেন, তাহারা প্রতারণা বুঝিল না, "যখন পিতার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আমরা তাহাদেরই হইয়া গিয়াছি" এই মনে করিয়া তাহারা বন্দিদ্বয়ের নিকট কারাগারে যাইয়া মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিল। আরাম-বিরাম

কেদার রায়ের মৃত্যু-সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ।

বলিলেন, "আমরা চোরের মত তোমাদিগকে বিবাহ করিয়া পালাইয়া যাইব না, বিবাহ করিলে প্রকাশ্যভাবেই করিব।" যখন কালীর কাছে তাঁহাদিগকে বলি দেওয়ার জন্য উপস্থিত করা হইল, তখন এই দুই রাজকুমারী খড়্গ হস্তে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে দাঁড়াইল, ভয়ে কেহ অগ্রসর হইল না। এদিকে শতযুদ্ধের বীর, অসাধারণ বলসম্পন্ন, ইশা খাঁর দক্ষিণহস্ত করিমুল্লা—বিধবা বেগমের শোকোন্মত্ততা দেখিয়া অধীর হইলেন। তিনি নৌবাহিনীর নেতা সাধনের সাহায্য লইয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং যখন আরাম ও বিরাম কালীমন্দিরে রাজকুমারীদ্বয়ের আনুকূল্যে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তখন অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত উপস্থিত হইয়া ইঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কেদার রায় নিকটবর্ত্তী বনে পালাইয়া গিয়া তাঁহার ভূনিম্নস্থ প্রাসাদ নিরাপদ্ মনে করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেন। রাজকুমারীরা দেখিল, কেদার রায় বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের নিজেদের জীবন ও আরাম-বিরামের জীবন সর্ব্বদাই শঙ্কটাকীর্ণ থাকিবে। তাহারা সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিল। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী 'আসুয়া' নামক স্থান ঘোরজঙ্গলাকীর্ণ, সেই জঙ্গলের মধ্যে কেদার রায়ের একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, উহা শ্রীপুর হইতে মাত্র পাঁচ রশী দূরে—সেই আসুয়ার রাজ-প্রাসাদে একটা গুপ্ত সুরঙ্গ ছিল, তাহার দ্বারা নদীতে পৌঁছান যায়। করিমুল্লা সেই স্থানে যাইয়া কেদার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন—তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন।

করিমুল্লা।

আরাম-বিরাম যে ইশা খাঁর দুই পুত্র ও সোণামণির গর্ভজাত তাহার উল্লেখ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) এই সময়ে কেদার রায় মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, হয়ত এই ঘটনাই খাঁটি, কিন্তু করিমুল্লার ন্যায় মল্লবীরের বীরত্বের যশ লুপ্ত করিয়া মোগলেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা আগ্রার দরবারে বাড়াইবার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, ইশা খাঁর মৃত্যুর পর ব্রহ্মরাজ হাজিগঞ্জ দুর্গ আক্রমণ করিলে সোণামণি উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। অপর এক প্রবাদ যে, সোণামণির স্বামীর মৃত্যুর পর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

যে দ্বাদশ জন ভৌমিক মোগল-আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ একরূপ শাসন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ভূষণা বা ফতেয়াবাদ (আধুনিক কালে অনেকটা ফরিদপুর জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল) রাজ্যের অধিপতি মুকুন্দরাম রায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত জীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম অতি অল্প সময়ের জন্য মোগল রাজ-প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম খাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কুচবিহার অভিযানের সময়ে কিছু সৈন্য দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু মূলতঃ ইনি মোগলদের চিরশত্রু ছিলেন। ক্ষণকালব্যাপী সখ্যের ফলে কতকদিনের জন্য তিনি পাণ্ডুয়া ও গৌহাটীর সুবেদার হইয়া মোগলদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি

এই কার্য্য একেবারেই পছন্দ করেন নাই, তাঁহার পুত্র সত্রাজিৎকে ঐ সুবেদারী দিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ ও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করেন। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও তিনি মোগলদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন। তিনি মোগল-সেনাপতি মোরাদের পুত্রগণকে ভূষণায় আমন্ত্রণ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (বেভারিজ—আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ)। কথিত আছে মুকুন্দরাম রায় মোগলরাজপ্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর সৈয়দ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পুত্র সত্রাজিৎও তাঁহার পৈত্রিক বিদ্রোহভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি সময়ে সময়ে মুখে বশ্যতা স্বীকার করিলেও মোগলদিগের বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কোচদের সঙ্গে যখন মোগলেরা যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাজ বলদেবের সঙ্গে একটা গুপ্তসন্ধি করিয়া ইনি মোগলদিগের গতিবিধির সমস্ত সংবাদ শত্রুপক্ষকে দিতেছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, "Satrajit gave Jahangir's governors of Bengal no end of trouble and refused to send in the customary *peskash* or do homage at the court of Dacca." (Blockman, p. 332.) সত্রাজিৎ জাহাঙ্গীরের বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তাদের যৎপরোনাস্তি অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে প্রচলিত পেশকাশ প্রদান কিংবা বশ্যতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হন এবং তথায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ভূষণার মুকুন্দরাম রায়।

বার ভূঞার অন্যতম ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য অতি প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তিরও অনেকস্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি "বিখ্যাত-বিজয়" নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র ইঁহার সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধব পাশাকে হত্যা করেন।

ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য।

মোগলদিগের বিরুদ্ধে বঙ্গবীরদের জাতক্রোধ ছিল। যে শক্তি দ্বারা যজ্ঞস্থলে আনীত পশুরা তাহাদের আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারে, যাহাদ্বারা কসাইয়ের কাছে বিক্রীত গাভী বা বৃষ তাহার আসন্ন বিপদ্ বুঝিয়া ছটফট্ করে—সেই শক্তি দ্বারা বঙ্গীয় বীরেরা বুঝিয়াছিলেন, মোগলদের অধীনত্ব স্বীকার করার অর্থ চিরকালের জন্য দাসত্বের যূপকাষ্ঠে নিজেদের আবদ্ধ করা। পাঠানেরা তাঁহাদের নিকট সামান্য কিছু দক্ষিণা পাইলেই পুরোহিতের মত সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইতেন এবং শুধু যুদ্ধবিগ্রহকালে তাঁহাদের সহায়তা চাহিতেন—কিন্তু সাম্রাজ্যলোভী বহুকামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মোগলদের খপ্পরে পা দিলে আর রক্ষা নাই। তোদরমল্লের জরিপে কোথায় কাহার কতটুকু জমি তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল,—দেশের শাসনকর্ত্তারা মোগলানুগ্রহে খাইতে পরিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চলাফেরা, কার্য্যকলাপ সমস্তই মোগল বাদশাহের সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণাধীন হইত। মোগলব্যাঘ্রের নখের দাগ, সাম্রাজ্য-গঠনের কঠোর নিয়মাবলী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে পড়িয়াছিল। দেশের লোকগণ

বঙ্গদেশ মোগলদের বিরুদ্ধে কেন হইল?

স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অবকাশ পাইত না, আকবরের প্রেরণায় তোদরমল্ল ও মানসিংহ যে ভারতব্যাপী জাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে জালে পড়িলে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না। রাজস্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে—লুব্ধ মোগলগণ ভারতের সর্ব্বত্র অর্থসংগ্রহ করিয়া তাজমহল, ময়ূর-সিংহাসন, দেওয়ানী খাস প্রস্তুত করিবেন, রাজপ্রাসাদে নরোজা উৎসব সম্পাদন করিবেন, মোগল অন্তঃপুরের বিলাসিনীদের জন্য অমূল্য হীরামাণিক্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিবেন—এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত না লইলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের রক্ষা নাই; সুতরাং রাজারা শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া জমিদারে পরিণত হইলেন, সে জমিজমার যতই কেন উন্নতি হউক না, রাজস্ব-সচিবের খরদৃষ্টি এড়াইয়া তাহা আর নিরুদ্বেগে ভোগ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্য উত্তরকালে "নরককুণ্ডে"র সৃষ্টি হইয়াছিল, ময়মনসিংহের সুকুমার রাজপুত্রদের দেহ বেত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তপ্লাবিত হইয়াছিল,—যাহার এই পরিণাম—সেই সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীয় হইয়া দুঃখলাঞ্ছনার চূড়ান্ত ভোগ করিতে হইবে, তাহা সম্ভবতঃ পাঠান-রাজ্যাবসানে বঙ্গের রাজগণ আভাসে টের পাইয়া মরিয়া হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর বাহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের গিল্‌টি করিয়া যে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল গড়িয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা স্বর্ণশৃঙ্খল কিংবা স্বর্ণহার বলিয়া গলায় পরিয়াছিলেন তাঁহারাই চিরদাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বারভূঞার পতনের পর বীর বাঙ্গালীজাতির প্রকৃত শৌর্য্যবীর্য্য লুপ্ত হইল। আকবরের পরিকল্পিত সাম্রাজ্যশক্তি-নিষ্পেষণে সেই বিক্রমবহ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। প্রচণ্ড অগ্নিদাহের পর যেমন মাঝে মাঝে ভস্মস্তূপের মধ্যে দুই একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, তেমনি হিন্দু ও মুসলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে দুই একটা খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ আমরা দেখিতে পাই। দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় একটাকিয়ার জমিদারের সঙ্গে অপর কয়েকটি জমিদারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনা অতি কৌতূহলপ্রদ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এগুলি নির্ব্বাপিততেজ অনলকুণ্ডের দুই একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। মোগল-রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের নবাব যে পক্ষকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই পক্ষের বিজয়লাভে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় নাই। এই সকল আসন্ন দুঃখ-বিপদ্ বোধ হয় বারভূঞাগণ আভাসে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—এজন্য তাঁহাদের বংশধরগণকে সেই অজগরতুল্য সাম্রাজ্য-নীতির বদন হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া জীবনপণ করিয়াছিলেন। এই 'ভূঞা রাজাদের' পর একমাত্র সীতারাম রায় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন—কিন্তু তিনি একক কি করিবেন? মোগলের সর্ব্বগ্রাসী বিজয়শক্তির বিরুদ্ধে ভূষণার বীরবরের জীবনপণ-বীরত্ব তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

ভূঞাদের মনে মোগলবশ্যতা যে কিরূপ দুঃসহ ছিল, তাহা ঈশা খাঁর বংশধর (সম্ভবতঃ প্রপৌত্র) ফিরোজ খাঁর তরুণ যৌবনের কতকগুলি মনোভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ঈশা খাঁ ছিলেন রাজপুত কালিদাসের পুত্র। ক্ষত্রিয় রক্ত তাঁহার ধমনীতে বহিত। তিনি যদিও মানসিংহের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোগলদের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন,

তথাপি তাঁহার বংশধরগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত মোগলদের বশ্যতা একান্ত ক্ষোভের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। আমরা 'ফিরোজ খাঁ' শীর্ষক পল্লীগাথায় এই ভাব দেখিতে পাই।

তরুণ ফিরোজ খাঁ জঙ্গলবাড়ীর গদীতে উপবিষ্ট হইয়া একদা তাঁহার সুহৃদ্ ও সামন্তদিগকে তাঁহার সুবৃহৎ 'বারদুয়ারী' গৃহে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আমি দিনরাত আমার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের কথা স্মরণ করিয়া থাকি—তাঁহারা তো দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার পূর্ব্বপুরুষ এই দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ঈশা খাঁ এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন যে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাঁহাকে ভয় করিতেন। আমি তাঁহারই বংশধর একথা একমুহূর্ত্তও ভুলিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন আমার সঙ্কল্পের কথা শুনুন—ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া এই জঙ্গলবাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের মালিক। আমি বৎসর বৎসর আমার সমস্ত রাজ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ দিল্লীতে পাঠাইয়া এই অপমানসূচক দেওয়ানগিরি আর রাখিতে চাই না। এখন আমি কি ঠিক করিয়াছি, শুনুন—আমি দিল্লীতে রাজস্ব দেওয়া এখন হইতে বন্ধ করিয়া দিব। আমি দিল্লীর দরবারে আর হাজিরা দিতে পারিব না। সম্রাটের সৈন্য আমায় যাহা ইচ্ছা করুক। আমার যদি মৃত্যু হয়—ঈশ্বর যদি তাহাই বিধান করেন, তবে সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। ইহাই আমার স্থির সঙ্কল্প, আমি মৃত্যুকে আমার গৃহদ্বারে ডাকিয়া আনিতেছি।"

ফিরোজ খাঁর প্রতিজ্ঞা।

যখন ফিরোজ খাঁ এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন সেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপুর হইতে এক দাসী আসিয়া জানাইল যে তাঁহাকে রাজমাতা আহ্বান করিয়াছেন। ফিরোজ খাঁ সেদিনের জন্য দরবার শেষ করিয়া অন্তঃপুরে মাতার সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

"অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে তিনি তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিলেন। দাসীরা তাঁহাকে সুস্নিগ্ধ সরবৎ আনিয়া দিল। তিনি তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিলেন। বেগম তাঁহার উদীয়মান চন্দ্রিকার ন্যায় তরুণ কান্তি মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া গৌরব অনুভব করিলেন। দেওয়ান মাতাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন—"বৎস, আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইও না। তোমার মুখখানি আমি যতবার দেখি ততবার আমি মনে করি, তোমার বিবাহ না হইলে আমি কিছুতেই সোয়াস্তি পাইব না। বিবাহ করিতে সম্মতি দাও; তোমার তরুণ যৌবন, কেন বল যে 'বিবাহ করিব না?' আমার বারংবারের অনুরোধ কি তুমি এইভাবে অগ্রাহ্য করিবে? আমার বয়স হইয়াছে, আমার বড় ইচ্ছা যে কবরে যাওয়ার পূর্ব্বেই আমি একটী সুন্দরী বউ দেখিয়া মরি।"

"দেওয়ান তাঁহার মাতার কথা শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন—"আমার মনের কষ্ট মা তুমি বুঝিতে পারিবে না, আমার পূর্ব্বপুরুষ ঈশা খাঁকে দিল্লীশ্বর স্বয়ং ভয় করিতেন; তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া তিনি যাচিয়া

তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের অতি প্রসিদ্ধ সামন্তগণও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমাদের এই মহাবংশে আরও অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমার সঙ্কল্প শুনুন—আমি অবিবাহিত জীবন যাপন করিব। আমার রাজ্যের চিন্তা দিনরাত আমার সকল চিন্তার উপরে। আমি দিল্লীতে কিছুতেই রাজস্ব পাঠাইব না। আমি আর সম্রাটের দরবারে পাগড়ী পরিয়া হাজিরা দিতে যাইব না।"

মাতা এই কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিয়া পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ।) পূর্ব্ববঙ্গের পয়ারের ভাষা কঠিন বলিয়া আমরা গদ্যানুবাদ করিয়া দিলাম। অনুবাদটি প্রায় আক্ষরিক হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ফিরোজসম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিব। কেল্লা তাজপুরের দেওয়ান ওমর খাঁর কন্যা সখিনার সহিত ফিরোজ খাঁর প্রেম হয়। ফিরোজ খাঁ তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান,—ওমর খাঁ, জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানেরা হিন্দুবংশসম্ভূত, এই আপত্তি করিয়া প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন এবং ফিরোজ খাঁর বংশের নানারূপ নিন্দা করেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া ফিরোজ খাঁ কেল্লা তাজপুর আক্রমণপূর্ব্বক রাজধানী ধ্বংস করিয়া সখিনাকে লইয়া আসেন। সখিনা স্বেচ্ছায় তাঁহার অনুগামিনী হন;—বিবাহ হইয়া যায়। ওমর খাঁ দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ঘটনা নিবেদনপূর্ব্বক সহায়তা যাচ্ঞা করেন। ওমর খাঁ ইহাও বলেন যে ফিরোজ বিদ্রোহী, সে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দিল্লীর এক সুবৃহৎ মোগলবাহিনী লইয়া আসিয়া ওমর ফিরোজ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কেল্লা তাজপুরের সুবৃহৎ ময়দানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের সমস্ত বার্ত্তা যথাসময়ে জঙ্গলবাড়ীতে পৌঁছে। তখন সখিনা স্বামীর বিজয়সংবাদ শুনিতে উন্মুখী হইয়াছিলেন। এমন সময়ে দাসী দরিয়া দুঃসংবাদ-জ্ঞাপনার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া সখিনা স্বয়ং বলিলেন, "গত পরশু আমার স্বামী যুদ্ধে গিয়াছেন, তিনি অবশ্য আজ অপরাহ্নে বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন। দরিয়া, বাগানের বড় বড় গোলাপ সংগ্রহ করিয়া রাখ, আমার বিজয়ী স্বামীকে আমি ফুলের মালা দিয়া সংবর্দ্ধনা করিব। যুদ্ধক্লান্ত হইয়া স্বামী ফিরিবেন, দরিয়া, তুমি স্বর্ণ ভৃঙ্গারে সুবাসিত সুস্নিগ্ধ জল ভরিয়া রাখ, তিনি আসিয়া 'অজু' করিবেন। যুদ্ধশ্রম অপনোদনের জন্য সেবার দরকার হইবে, আভের পাখা কাছে রাখ। আমরা তাঁহাকে ব্যজন করিব।

"সুগন্ধি তৈল এবং গোলাপ জলের বোতলগুলি সাজাইয়া রাখ, সোনার পানের বাটা ভর্ত্তি করিয়া পান রাখ, পাঁচ পীরের দরগার পবিত্র মাটী আনিয়া রাখ; দরিয়া, তিনি আসিয়া সেই মাটী যে মাথায় ছোঁয়াইবেন। পীরদের পত্নীরা আমায় আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন, দরিয়া, তাঁহার জয়সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে আনন্দে তাঁহার দুই রক্তিম গণ্ড উজ্জ্বল হইল। তিনি থামিয়া আবার বলিলেন—"দরিয়া, একি! আজ তোমার মুখের হাসি কোথায় গেল? তোমার মুখ ম্লান দেখাইতেছে কেন? কিন্তু জানিও আমার স্বামী আজ নিশ্চয়ই বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন, তখন তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে।"

দরিয়া আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, "আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, রাজকুমারি, শোণিতার্দ্র পতাকাসহ দেওয়ানের ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আপনার পালঙ্কে শয্যার দিন ফুরাইয়াছে,—এখন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এখন হইতে বিধবার মলিন সাজ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কঙ্কণ ও চুড়ী খুলিয়া ফেলুন—হীরার হার আর কণ্ঠে শোভা পায় না; এখন মুখের হাসি ফুরাইবে, রাজ-কুমারি! আপনার যৌবনের আশা এখন প্রাতে ফোটাফুল যেমন সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে, তেমনই অল্প সময়ের মধ্যে ফুরাইল। সংবাদ আসিয়াছে, তরুণ দেওয়ান এখন কেল্লা তেজপুরের দুর্গে বন্দী।"

ক্ষণকাল সখিনার মুখে বৈশাখী মেঘের সমস্ত আঁধার কেহ ঢালিয়া দিল। তখন রাজমাতা ফিরোজা বিবি এবং অন্তঃপুরের নারীগণ ক্রন্দনশব্দে জঙ্গলবাড়ীর রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিতেছিলেন। কিন্তু সখিনা কাঁদিলেন না, তিনি দরিয়াকে বলিলেন, "যোদ্ধার সাজ লইয়া আইস। তাঁহার একটা ঘোড়া আমাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে যাইব। আমার সৈন্যদলকে বলিও আমি দেওয়ান সাহেবের সম্পর্কে ভ্রাতা।"

এই তরুণ বীরবেশধারী নেতার পশ্চাৎ জঙ্গলবাড়ীর অবশিষ্ট সৈন্য চলিল। দেওয়ানের প্রিয় ঘোড়া 'দুলালে'র পিঠে চড়িয়া সখিনা সৈন্যসহ দ্রুতগতিতে চলিলেন, এক দিনের পথ আধ ঘণ্টায় গেলেন, কারণ তিনি সমস্ত মনের আগ্রহ সহ সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেল্লা তেজপুরের মাঠে মোগল সৈন্যের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী তাঁহার যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই তিন দিন তিনি লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া অভুক্ত, অস্নাত, দিন রাত "দুলালে"র পিঠে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। "পিতাই আমার শত্রু" ইহা বলিয়া তিনি তৃতীয় দিবসে কেল্লা তাজপুরের রাজপ্রাসাদে আগুন জালাইয়া দিলেন। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সশব্দে পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সেই অমোঘ বীরত্বের নিকট তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল। তখনও তিনি অদম্য উৎসাহে ঘোড়ার পিঠ হইতে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। আমি এই স্থানে পুনরায় মূলের গদ্যানুবাদ দিতেছি—

"সেই মুহূর্ত্তে তাজপুরের দুর্গ হইতে একটি সৈন্য উপস্থিত হইল। সে তরুণ বীরবেশী সখিনাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি মহাবীর হানিফ হইতেও বড় যোদ্ধা। আমি জঙ্গলবাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। মোগলেরা জঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই দুর্ভাগ্য রাজধানীর পক্ষে আপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। ফিরোজ খাঁ এই চিঠি দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি মোগলদের সঙ্গে যে সর্ত্তে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা এই দলিলে আছে। তিনি আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন—তিনি সখিনাকে তালাক দিয়াছেন—তাঁহারই জন্য সোণার জঙ্গলবাড়ী আজ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সর্ত্তে আরও আরও যে প্রস্তাব আছে, তাহাতেও তিনি এই সপ্তাহেই সম্মত হইবেন। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইয়াছে।" এই বলিয়া সে ফিরোজ সাহার স্বাক্ষর-যুক্ত তালাকনামা সখিনার হাতে দিল।

এক মুহূর্ত্ত সখিনা সেই দলিলটির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তারপর সর্পদষ্ট মানুষ যেরূপ ঢলিয়া পড়ে, তেমনই ভাবে ঘোড়ার পিঠ হইতে ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথার সোণার মুকুট ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "দুলাল" ঘোড়াটা অশ্রুপাত করিতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে সৈন্যেরা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যিনি সদর্পে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, এখন তিনি ভূলুণ্ঠিতা। জঙ্গলবাড়ীর সহর আজ প্রকৃতই তিমিরাচ্ছন্ন হইল। তাঁহার সুদীর্ঘ কুন্তলরাজি এলাইয়া পড়িল। তাঁহার দেহ হইতে পুরুষের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। তাজপুর কেল্লায় এই সংবাদ তড়িদ্‌বেগে রাষ্ট্র হইল; সেনাপতি ও সৈন্যেরা রাজ্ঞীকে চিনিতে পারিল। ওমর খাঁ ফিরোজ খাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখাইলেন—পূর্ণচন্দ্র মাটিতে পড়িয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে।

তারপর ওমর খাঁ ও ফিরোজ খাঁর অনুতাপ ও ২২ জন লোকের দ্বারা খাত সমাধিতে শবের শেষকার্য্য-সম্পাদনের বিবরণী আছে।

যে রমণী স্বামীর ভালবাসার জন্য মোগলের শত শত গুলি সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী মহিলা একটা সাংঘাতিক গুলি সহ্য করিতে পারেন নাই,—তাহা অবিশ্বাসী নির্ম্মম স্বামীর স্বাক্ষরিত তালাকনামা। আজও কেল্লা তাজপুরের মাঠ পড়িয়া আছে, সেখানে সাধ্বীর মাথার সিন্দুরের ন্যায় উজ্জ্বল—সখিনার স্মৃতি হয়ত এখন সেই দেশের আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। এই কাহিনীর ভিত্তি যে ইতিহাসমূলক তাহা বিশ্বাস করায় বাধা নাই।

সব দিক্ দিয়া দেখিলে এই সকল পল্লীগানের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা অবশ্য বলা যায় না। তবে বহু বাঙ্গালী নারী যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শন আছে। "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতির ভিত্তি ঐতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটি মুসলমান রমণীর অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যের কথা বর্ণিত আছে। "মাণিকতারা"নামক গীতিকায়ও সেইরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। পাঠান-রাজত্বকালে যে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই দেহে বল এবং হৃদয়ে সাহস ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সেই সাহস ও বল লুপ্ত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে মোগলশক্তি বন্যার মত আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব আভাস হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দেশের লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল। মোগল রাজনৈতিকগণ ক্রমাগত ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া শেষে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। 'ভূঞা রাজারা' যদি একত্র হইতে পারিতেন, তবে মানসিংহ কিংবা ইসলাম খাঁ এদেশে কিছুই করিতে পারিতেন না। যে একটি জিনিষের অভাবে তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্য বিফল হইয়া গেল, তাহা—ঐক্য।

মোগলেরা এদেশে আসিয়া যে শুধু পাঠান ও ভূঞা রাজগণের প্রতিপক্ষতা নিবারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। প্রথমতঃ বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁ পাঠান ওমরাদের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া তাহা মোগলদিগকে প্রদান করিলেন। পাঠানেরা তো অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হইলই, পরন্তু মোগল ওমরাগণও প্রীত হইলেন না, কারণ তাঁহারা যে জায়গীর পাইলেন, তাহা

নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার সুবিধা পাইলেন না। মোগলসম্রাট্ কর্ত্তা করিয়াও কাহাকেও কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। বড় বড় রাজা হইতে ছোট ছোট ভূস্বামী পর্য্যন্ত সকলের টীকি তিনি এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে সকলেই এক মহাশক্তির অধীন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব যে নামমাত্র, তাহা সর্ব্বক্ষণ তাঁহারা বুঝিতেন। জায়গীরদারগণ রাজকীয় সৈন্যরক্ষার জন্য যে রাজস্বের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্গেশ্বরের মারফৎ দিল্লীতে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। শুধু ইহাই চূড়ান্ত নহে—পাছে কেহ দীর্ঘকাল জায়গীর ভোগ করিয়া কোন প্রদেশে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, সেই আশঙ্কায় মোগলদরবারে কোন জায়গীরদার বেশী দিন তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন না। প্রায়ই জায়গীরগুলি হস্তান্তরিত হইত। এই সকল কারণে মোগল ওমরাগণও পাঠানদের জায়গীর পাইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। শাসনকর্ত্তার উপর এ সকল বিষয়ে কড়া হুকুম ছিল ("He was ordered frequently to change the Jaigirs to prevent the troops establishing themselves in any one place."—Stewart). মোগল আমীরেরাও এই সকল কারণে একত্র হইয়া আকবরের বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহী মোগলদের নেতা ছিলেন—খলেদী খাঁ (জলেশ্বরবাসী) এবং বাবা খাঁ (ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা), ইহারা শীঘ্রই গৌড় দখল করিয়া লইলেন। আকবর এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁকে মোগল আমীরদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারের দরুন কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে আদেশ করেন। আমীরেরা ঐ আদেশের কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আগে রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা ফিরবী খাঁ ও সেই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পুত্রদাস আসিয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ভাল করিয়া জানিয়া যাউন, তৎপরে মিটমাট হইবে। তদনুসারে উক্ত দুই প্রধান রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের শিবিরে আগমন করিলেন। আমীরেরা তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের স্পর্দ্ধা ও দাবী আরও বাড়িয়া যায়। অবশেষে বিদ্রোহীরা রাজধানী তাণ্ডা অবরোধ করিয়া মজঃফর খাঁকে হত্যা করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিয়া ঘোষণা করেন।

বিদ্রোহীদের দলে ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁর হত্যার পর এই দল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আকবর দেখিলেন—এত রক্তক্ষয়, এত কৃচ্ছ্রসাধন এবং চেষ্টার পর বঙ্গদেশের অধিকার—তাঁহারই স্বশ্রেণীস্থ লোক—তাঁহারই পূর্ব্বতন ওমরাহগণ তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছে।

এই সময়ে আকবর রাজা তোদরমল্লকে বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করিয়া মোগল-বিদ্রোহ-দমনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন; আকবর তাঁহাকে ৫,০০,০০০ টাকা ডাকযোগে প্রেরণ করেন। এই টাকার অধিকাংশই উৎকোচাদি দিয়া প্রতিপক্ষকে বশীভূত করার জন্য। তিনি ভাগলপুরে আসিয়া বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন। কয়েক মাস যাবৎ উভয় পক্ষ পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ করিলেও কোন বড় সংগ্রামে লিপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে রাজা তোদরমল্ল হিন্দু জমিদারদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং

কখনও কখনও উৎকোচে বশীভূত করিয়া এতটা হস্তগত করেন যে, বিদ্রোহীরা রসদ-সংগ্রহে অসমর্থ হইলেন। দুর্ভিক্ষজনিত নানারূপ বিপদে শত্রুশিবির বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে ককেশিলানদের নেতা বাবা খাঁর মৃত্যু হয়, বিদ্রোহীদের অন্যতম মাসুম কাবুলী বিহারের দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বশীভূত করিবার নানা উপায় জানিতেন। যে সকল ওমরা এককালে তাঁহার সভায় অবমানিত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন, এই বিপৎকালে তিনি তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা ও নানাগুণ স্মরণ করিয়া স্বয়ং বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে বড় বড় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে আজিম খাঁ ও সেরিফ্ খাঁকে তিনি বশীভূত করিয়া সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আজিম খাঁ মুজাকে বঙ্গেশ্বরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া উৎকোচের বলে ককেশিলানদিগের নূতন নেতা জব্বর্দ্দিকে বশীভূত করেন, এবং অপরাপর বিদ্রোহীদের মধ্যে গৃহবিবাদের সৃষ্টি করেন। এইভাবে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের শেষ না হইতে হইতেই বঙ্গেশ্বর তাণ্ডা রাজধানী পুনরায় দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা ঘোড়াঘাটে অবস্থিত হইয়া যশোর অঞ্চলে উৎপাত করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহারা জঙ্গলে লুকাইয়া ছিলেন—কিন্তু যুবরাজ জগৎসিংহ তাঁহাদিগকে সেখানেও নিষ্কৃতি দেন নাই। তিনি তাঁহাদের বড় বড় গোলাসকল দখল করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের অবশিষ্ট ৫৪ টি হস্তী অধিকার করিয়া দরবারে প্রেরণ করিলেন। মোগলদের প্রবল বিদ্রোহ এইভাবে নির্ম্মূল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর্ত্তুগীজ দস্যু, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি

উৎকোচ দেওয়া, বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করা, শত্রুশিবিরে ভেদ সৃষ্টি করা, মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ করা ইত্যাদি নানা বিদ্যা আকবরের করায়ত্ত ছিল। যেখানে এইসকল বিদ্যা কার্য্যকরী হয় নাই, সেখানে দুর্জ্জয় সিংহের মত তিনি শত্রুকে আক্রমণ করিতেন। যে কোন প্রকারে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও শত্রুশির হেঁট করিয়া সকল মাথার উপর স্বীয় মাথার প্রতিষ্ঠা করা—এই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

আকবরের নীতি।

বিশাল সাম্রাজ্যের আয় দিয়া তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করা, ক্ষমতাশালী কাহাকেও একদণ্ড স্থির থাকিতে না দেওয়া—পাছে তিনি বড় হইয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়া বিদ্রোহী হন, শাসনকর্ত্তাদিগকে ঘন ঘন একস্থান হইতে অপরস্থানে নিয়োগ, বড় ছোট

সকলের ভাণ্ডারের দিকে খরদৃষ্টি এবং চিরস্থায়ী ভাবে সেই ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠাংশগ্রহণ—এই ছিল তাঁহার রাজনীতি। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোন দেশ লুণ্ঠন করা, কিংবা বলপূর্ব্বক কাহারও সম্পত্তি গ্রাস করা—এসকল তিনি করেন নাই। পাঠানেরা যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন -লুণ্ঠনাদি ছিল তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক রাজকার্য্যের অঙ্গীয়,—এসকল বিগর্হিত কাজ তিনি করেন নাই। তিনি লুণ্ঠন করিতেন না, শোষণ করিতেন। নিতান্ত অবাধ্য না হইলে তিনি কাহারও নিকট পরাক্রম দেখাইতেন না। কিন্তু প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া তিনি কোন সুদৃঢ় পত্রপুষ্পাচ্ছাদিত লতার ন্যায় এই প্রবল ভারত-বিটপীকে আসমুদ্রহিমাচল জড়াইয়া ধরিয়া নির্বীর্য্য ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যনীতির ফলে সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—লোকে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিয়াও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই বিরাট্ রাজধানীমুখী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে মোগলদের সৃষ্ট রাজধানী ইন্দ্রের অমরাবতী কিংবা বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ-তুল্য হইয়াছিল, কিন্তু মোগল-শাসনের সময়ে বৃন্দাবনের কয়েকটী মন্দির ব্যতীত সমস্ত দেশে হিন্দুদের বিশেষ কোন কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সম্রাটের মহাশক্তির আওতায় হিন্দুস্থানের জাতীয় শক্তির অপচয় ছাড়া শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে নাই। বিদেশীর অধিকারে বঙ্গদেশের যাহা কিছু গৌরব—তাহা পাঠান আমলের। পাঠানগণ বিদেশী কারিগর আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না—তাঁহাদের যাহা কিছু শিল্প—তাহা খাস বাঙ্গালী শিল্পী ও স্থপতিদের কার্য্যের নিদর্শন। আকবর এই সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা হিন্দুদের সহযোগে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাদ দিয়া যুদ্ধজয় হইতে পারিত, কিন্তু এরূপ বিশাল সাম্রাজ্য কেহ স্থাপন করিতে পারিতেন না। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করেন নাই। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ শুধু মুখের অনুরাগ ছিল না - উহা আন্তরিক ও যথার্থ ছিল। রাজা বীরবল একজন সামান্য ভাট কবি ছিলেন, তাঁহাকে আকবর রাজপদে উন্নীত করিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধু করিয়াছিলেন। বীরবলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি তিন দিন কাহারও সহিত কথা কহেন নাই—এবং মানসিংহের ভগিনীকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া রাজাকে সাম্রাজ্যের প্রধান কাণ্ডারী স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মানসিংহ ৭,০০০ সৈন্যের মনসবদার হইয়াছিলেন, কোন মুসলমান আমীরও এত বড় পদ পান নাই। তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া 'এলাহীধর্ম্ম' নামক এক নব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি তিলক পরিতেন এবং অনেক সময়ে আমিষ ভক্ষণ করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণদ্বারা হাতে রাখি বাঁধিতেন এবং তাঁহার রাজপুত স্ত্রীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য 'হোম' করিতেন।* তিনি খৃষ্টান

* "Akbar marked his forehead like a Hindu and wore jewelled strings tied to his wrist by Brahmins. He forbade slaughter of cows and the eating of their flesh. From early youth in compliment to his Rajput wives he burnt *hom* and prostrated himself before the sun."
—Nizamuddin Tabakati Akbari.

পাদ্রীদের মনেও বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাদের ধর্ম্মের অনুরাগী। এই সকল বিবিধ গুণসত্ত্বেও তিনি হিন্দুস্থানের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজের মাথা আকাশে ঠেকাইয়া অন্য সকলের মাথা হেঁট করাইয়াছিলেন—রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় তিনি ক্ষুদ্র বিদ্রোহীকেও তুচ্ছ করেন নাই। রাজকীয় সমস্ত সৈন্য লইয়া তিনি তৃণ-দূর্ব্বাকেও নিষ্পেষিত করিয়াছেন। অগ্নিকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বিদ্রোহকেও তিনি মারাত্মক মনে করিতেন, তাঁহার প্রভাবে দেশের সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় শক্তি সূর্য্যের প্রভাবে নক্ষত্রের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। আকবরের সময় হইতে হিন্দুস্থানের প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয়। এই দাসত্বের বেড়ী হাতে লইয়া মানসিংহ ও তোদরমল্ল দেশে দেশে ঘুরিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রতাপ ঘৃণাভরে সেই বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া দূতকে বলিয়াছিলেন, "বেড়ী দিও আপনার মনিবের পায়।" প্রতাপ শুধু যশোরের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন—ইহা সঙ্কল্প করেন নাই,—দিল্লী পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করিবেন—ইহা জানাইয়া বলিয়াছেন (তরবারিখানি রাখিয়া) "যমুনার জলে ধোব এই তরবারি।" যে অনৈক্যের বীজ বাঙ্গলার জাতীয় চরিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল—সেই বীজ সম্রাটের কূট-নীতিতে অঙ্কুরিত হইয়া প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। হিন্দু রাজাদের কেহ ছিলেন এই ব্যাঘ্রবিক্রম সম্রাটের নখ, কেহ ছিলেন দন্ত। সাম্রাজ্যনীতির শ্রীবৃদ্ধির উপলক্ষ হইয়াছিলেন ইহারা,—কিন্তু ইহার উদ্ভাবনী শক্তি সমস্তই আকবরের। অশোকের সার্ব্বভৌমত্ব বাহ্যদৃষ্টিতে আকবরেরই মত, কিন্তু দুইটী সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মৌর্য্য-রাজার অনুশাসনে স্পষ্ট করিয়া লিখিত ছিল—"আমার পুত্র ও পৌত্রগণ যেন দেশ-বিজয় বাঞ্ছনীয় মনে না করেন, তাঁহারা যেন ধর্ম্ম-বিজয়কেই যথার্থ বিজয় মনে করেন।"

আকবর ও অশোক।

আমরা দেখাইয়াছি, আকবর কিরূপে পাঠানশক্তি নির্ম্মূল করিয়া স্বয়ং মোগল ওমরাদের প্রবল বিদ্রোহ দলন করিয়া—ভূঞারাজগণের দুর্দ্দমনীয় শক্তি নিরস্ত করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় মোগল-আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি ভেদনীতি ও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করার কৌশল যথেষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন। যেখানে দরকার হইয়াছে, সেখানে যুদ্ধাদি-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন, অগ্নির শেষ ও শত্রুর শেষ রাখিতে তিনি দেন নাই। জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার পথেই চলিয়াছিলেন, তবে আকবর তাঁহার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য নিষ্ঠুরতা পরিহার করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বে সে দয়াটুকু ছিল না। পরাজিত শত্রুকে তিনি ক্ষমা করেন নাই। আকবর ইশা খাঁর সহিত সখ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্য, মুকুন্দ রায়, তৎপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়কে অব্যাহতি দেন নাই। এই সার্ব্বভৌমত্বের চেষ্টা সাজাহান পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; আকবরের পর হইতে এই সাম্রাজ্যনীতির রথ অতি দুর্দ্ধর্ষভাবে চলিয়াছিল, আগ্রার দেওয়ানি-খাসের দ্বারের উপরিভাগে লেখা আছে "স্বর্গ যদি থাকে, তাহা এইখানে—এইখানে।" দিল্লীশ্বর লোকমতে জগদীশ্বরের স্থান লইয়াছিলেন—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—এই মোগল বাদসাহত্রয় হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ জানিতেন না। শেষোক্ত দুই জনের ধমনীতে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু আকবর

অযথা নির্ম্মমতা করিতেন না—বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজস্বের শ্রেষ্ঠভাগ মোগল দরবারে পাঠাইলে তিনি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতেন না, শত্রুপক্ষকে বশীভূত করিবার জন্য ডাকযোগে অর্থ পাঠাইতেন। আমরা দেখিয়াছি রাজা তোদরমল্লকে তিনি পাঁচলক্ষ টাকা এই জন্য পাঠাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের ন্যায়-অন্যায়বোধ অনেক সময়ে লুপ্ত হইত। নৌরজা উৎসবে আকবর মাতাল হইয়া নানারূপ দুষ্কার্য্য করিতেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর যে ভাবে সের আফগানকে হত্যা করিয়াছিলেন এমন অন্যায় আকবর স্বপ্নেও প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না।

পাঠান-শত্রু-দলন, ভূঞা রাজগণের শক্তিধ্বংস এবং মোগল শিবিরের পরাক্রান্ত ওমরাদের বিদ্রোহদমনের কথা আমরা লিখিয়াছি; কিন্তু ইহা ছাড়া এক প্রবল শত্রু বঙ্গের পূর্ব্বদক্ষিণ সীমান্তে মোগল সম্রাটের শত্রু হইয়া অত্যাচার করিয়া দেশ ছারখার করিতেছিল। ইহারা পর্ত্তুগীজ দস্যু, লৌকিক ভাষায় হার্ম্মাদ ("আরমাডা" হইতে উদ্ভূত)। মগেরা শেষ সময়ে এই জল-দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে লুণ্ঠন, অপহরণ, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অবাধে চালাইতেছিল—এই জন্য হার্ম্মাদ শব্দ প্রথমতঃ পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে বুঝাইলেও শেষে মগদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। পল্লীগীতিকাসমূহে এই হার্ম্মাদদিগের সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড, 'নসির মালুম' দ্রষ্টব্য)। ইহাদের গায়ে লাল কুর্ত্তা এবং মাথায় নানা বর্ণের পাগড়ী থাকিত (এই পাগড়ী সম্ভবতঃ মগদস্যুরা ব্যবহার করিত)। ইহাদের হাতে দূরবীণ থাকিত। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ইহারা সেই দূরবীণযোগে বহুদূর হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ লক্ষ্য করিত, এবং অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে বাণিজ্যদ্রব্য-বোঝাই জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত। কবিকঙ্কণ ষোড়শ শতাব্দীতে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্ত সদাগরের নাবিকেরা "রাত্রিদিন বাহি যায় হার্ম্মাদের ডরে।" ইহারা সময়ে সময়ে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান-সমূহে অবতরণ করিয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের উপকূলের বাণিজ্য-তরীগুলি ইহাদের উৎপাতে সমুদ্রে একা যাইতে সাহস করিত না। উক্তরূপ বহুসংখ্যক জাহাজ একত্র হইয়া মিছিল বাঁধিয়া যাইত। এই তরণীর মিছিলকে "বহর" বলিত, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নানা বিষাক্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকিত, এবং বহরের মধ্যে যিনি রণপণ্ডিত থাকিতেন তাঁহারই নির্দ্দেশে জাহাজের গতি-বিধি এবং নঙ্গর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রধান ব্যক্তির উপাধি ছিল "বহরদার"। তৎকালে সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোকদের সাহস ও বীর্য্যবত্তা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। হার্ম্মাদদের সঙ্গে মাঝে মাঝে অধিবাসীদের লড়াই চলিত। একটি পল্লীগীতিতে দেখিতে পাই—জেলেরা একত্র হইয়া তাহাদের বৃদ্ধ দলপতির পরামর্শ অনুসারে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া হার্ম্মাদদের প্রত্যেকের চক্ষে মুষ্টি মুষ্টি লঙ্কার গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে। হার্ম্মাদেরা ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতি ডিঙ্গিতে আসিয়া মধুর মাছি বা পঙ্গপালের ন্যায় বণিক্‌দের জাহাজ ঘিরিয়া ধরিত। পল্লীগ্রামে ইহারা যে লুণ্ঠনকার্য্য চালাইত, তাহা দেশবাসীদের অসহ্য হইয়াছিল। সুন্দরী গৃহস্থ-বধূদের দুর্দ্দশাসম্বন্ধে আমরা অনেক পল্লীগাথা পাইয়াছি। কোন কোনটিতে বর্ণিত আছে—হৃতা রমণী তাঁহার স্বামীকে

পর্ত্তুগীজ জলদস্যু 'হার্ম্মাদ'।

স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন, "অভাগিনীকে মনে রাখিও। ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া রহিল, আমার হাতের কঙ্কণ ফেলিয়া আসিয়াছি; আমাকে মনে করিয়া দুঃখ হইলে কঙ্কণ ও কলসী তোমার হাত দুখানি দিয়া ছুঁইও—তাহাতে আমি জুড়াইব। আর সুন্দরী দেখিয়া একটি মেয়ে বিবাহ করিও। আমি যে আদর ও স্নেহের জন্ম পাগল ছিলাম, তাহা তাহাকে দিও, হতভাগিনীর অদৃষ্টে তাহা নাই।" বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়—পর্তুগীজ দস্যুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজে শুধু সমুদ্রে বা উপকূলে নহে, কখনও শতাধিক মাইল দূর পর্য্যন্ত স্থলপথে যাইয়া লুণ্ঠন করিত। বিবাহ-বাসরে এবং অপরাপর উৎসবে ইহারা হঠাৎ বজ্রাহতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অনেক দ্বীপ ও নগরী জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। যদুনাথ সরকার মহাশয় অক্সফোর্ড লাইব্রেরীর তালীসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট (Persian MS., Bod 569, Entry No. 240) হইতে এই দস্যুদের একটি বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—ইহারা বন্দীদিগের হাতের তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত চালাইয়া দিয়া শত শত স্ত্রীপুরুষকে পশুর মত টানিয়া আনিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিত এবং লোকে যেরূপ পাখীদের জন্ম শস্য ছড়াইয়া দেয়—সেইভাবে তণ্ডুলমুষ্টি হতভাগ্যদের সম্মুখে ছড়াইয়া দিত। অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যাহারা বাঁচিত, তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকের নিকট বিক্রয় করিত। কোন কোন সময়ে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরেও তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। পাদ্রী ম্যানরিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, "প্রত্যেকেই জানেন এই পর্তুগীজ দস্যুরা কিরূপ প্রতিবৎসর বাকলা, শালিমাবাদ, যশোর, হুগলী, হিজলী, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিয়া (মোগল) শত্রুর শক্তি নাশ করিয়াছে। এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহারা এই রাজ্যের এগার হাজার পরিবারকে আনিয়া বিক্রয় করাইয়াছে" (Bengal Past and Present, 1916, Part II, p. 58)। এই দস্যুরা এক সময়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৮,০০০ লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মগদস্যুরা এই পর্তুগীজদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অতি ভয়াবহ। তাহাদের স্পর্শদোষে অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও পতিত হইয়া আছেন। বিক্রমপুরে 'মগব্রাহ্মণ'দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মগ ও পর্তুগীজদের ঔরসজাত অনেক সন্তানে এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ। ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪-পরগনার উপকূলে, নোয়াখালীতে, হাতিয়া ও সন্দ্বীপে, বরিশালে, শুগসাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, খাপড়াভাঙ্গা, মগপাড়া প্রভৃতি স্থানে অগণিত। ঢাকায় ফিরিঙ্গিবাজারে, তাহা ছাড়া কক্সবাজারে ও সুন্দরবনে হরিণঘাটার মোহানায় অনেক দুঃস্থ ফিরিঙ্গী বাস করিতেছে। বাঙ্গলাদেশে পর্তুগীজদের কীর্ত্তি এইখানেই শেষ হয় নাই। অনেক পর্তুগীজ শব্দ বাঙ্গলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা এই জাতির বাঙ্গলাদেশে ব্যাপক প্রভাব প্রতীয়মান হয়। আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা, নোনা, আতা, রাঙ্গাআলু প্রভৃতি আমরা পর্তুগীজদের নিকট হইতে পাইয়াছি। এখনও এদেশে 'ফিরিঙ্গী খোপা' প্রচলিত।

পাঁউরুটির পূর্ব্ব নাম ছিল "ফিরিঙ্গী রুটি।" কড়ি-বরগা, জানেলা, গরাদিয়া, কামরা, বারেন্দা, আলমারি, কেদারা (chair), মেজ, আলপিন্, ফিতা, চাবি, বোতাম, বয়েম, বোতল, বালতি, বাসন, কামান, পিস্তল, লস্কর, বজরা, বয়া, মাস্তুল, তুফান, মিস্ত্রী, কামিজ, ইস্ত্রী, কাপড়, কুঠি, আয়া, ছাপা, গোলাপ, নীলাম প্রভৃতি শব্দের অনেকগুলিই বোধ হয় পর্তুগীজ ভাষা হইতে আমদানী। হালহেড সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময়ে ভদ্রলোকেরা এই সকল বিদেশী শব্দের যত বেশী মিশ্রণদ্বারা বাঙ্গলাভাষায় কথা কহিতেন, ততই তাঁহাদের বাহাদুরী ছিল। (মৎপ্রণীত Bengali Prose Style এবং সতীশ মিত্র মহাশয়ের যশোর ও খুলনার ইতিহাস দ্রষ্টব্য। এই শেষোক্ত পুস্তক হইতে আমি অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।) পর্তুগীজগণ তাহাদের নির্ব্বিচার ও অবাধ ব্যভিচারদ্বারা বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভাবপ্রকাশে "ফিরিঙ্গী ব্যাধি" নামক রোগের উল্লেখ আছে। এই দুঃসাধ্য-পীড়ার ফলে গলিতকুষ্ঠাদি জন্মে। "গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্" (শব্দকল্পদ্রুম—ফিরঙ্গ শব্দ, ২৮০-৪ পৃঃ)।

ভাস্কোডিগামার সময় হইতে পর্তুগীজগণ এদেশে আসিতে থাকে। কালিকটের এক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাস্কোডিগামা এক দুর্গাদেবীর মন্দিরকে মেরীর মন্দির মনে করিয়া পাণ্ডাদের গঙ্গাজলকে জরডনের জল ভাবিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুসেন সাহের সময়ে বাঙ্গলায় ইহাদের প্রথম আবির্ভাব। কোয়েলেহ, সিলভিয়া প্রভৃতি পর্তুগীজ নেতৃগণ আসিয়া এদেশে দস্তরমত আড্ডা স্থাপন করেন। ১৫২৮ খৃঃ অব্দে ইহাদের অধিনায়ক মেলো বাণিজ্যের ছলে অত্যাচার করার অপরাধে অনেকদিন গৌড়ে বন্দী হইয়া থাকেন। কালে চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। শের খাঁর সময়ে ইহারা মামুদ সাহের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম ইহাদের সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়। ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গের নানা স্থানে আড্ডা স্থাপন করিয়া দেশবাসীদের উপর অত্যাচার চালাইত। কোন স্থায়ী অধিকার বা সর্ব্বজনসম্মত নেতা বা শাসনপদ্ধতি ইহাদের ছিল না। একসময়ে ইহারা আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল—ইহাদের নৌবল যথেষ্ট ছিল। মগদিগের সঙ্গে শেষে ইহাদের বেশ ভাব হইয়া যায়। তখন মগ ও পর্তুগীজ একত্র হইয়া বঙ্গদেশ লুটপাট করিয়া খাইত। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান-রাজ তাঁহার রাজ্যের সমস্ত পর্তুগীজকে নিহত করিতে আদেশ দেন। তখন ইহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সন্দীপের মোগল শাসনকর্তা ও সেই স্থানবাসী পর্তুগীজদিগকে নিহত করে। ইহাদের অত্যাচারে ফতে খাঁ (সন্দীপের শাসনকর্তা) ইহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা মনে করিয়া পর্তুগীজ জলদস্যুদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরে উপস্থিত হন। কিন্তু পর্তুগীজগণ জলযুদ্ধে বিশেষ ওস্তাদ ছিল। সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস নামক এক নেতার অধীনে জলদস্যুগণ ফতে খাঁর সহিত অতি বিক্রমসহ যুদ্ধ করিয়া মোগল-সেনাপতি ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করে। গঞ্জালেসের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়, এবং তিনি সন্দীপ দখল করিয়া তথাকার রাজা হন। সেখানকার মুসলমানদিগকে

তিনি একেবারে নির্মূল করেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা তাঁহার আকস্মিক সফলতায় আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন—কিন্তু গন্জালেস অহঙ্কারে দৃপ্ত হইয়া সেই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে আরাকান-রাজের ভ্রাতা অনাপরম তাঁহার রাজভ্রাতার দ্বারা কোন অপরাধের জন্ত দণ্ডিত হন। তিনি গন্জালেসকে বহু অর্থ ও তাঁহার ভগিনীকে পত্নীস্বরূপ দিয়া আরাকান-রাজ্য জয় করিতে ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু গন্জালেস ও অনাপরমের অভিযান ব্যর্থ হয়—আরাকান-রাজের সঙ্গে ইঁহারা পারিয়া উঠেন না। তথাপি অনাপরমের দত্ত বহু অর্থ পাইয়া পর্ত্তুগীজ বীর প্রীত হন এবং উক্ত যুবরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। ১৬১০ খৃঃ অব্দে আরাকানের রাজা গন্জালেসের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে আসিয়া লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত দখল করিয়া লন। মোগলেরা এক প্রকাণ্ড বাহিনী সঙ্গে আনিয়া উঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, আরাকানরাজ ও গন্জালেস উভয়েই বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়া পলায়ন করেন। গন্জালেস অতি বড় দুর্বৃত্ত ছিলেন, ইনি এই সময়ে মগরাজের কয়েকজন অমাত্যকে সন্ধির একটা প্রস্তাব করিবার ছলে নিজ জাহাজে আনিয়া নিহত করেন এবং পরে গোয়ার শাসনকর্ত্তার অধীনত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আরাকানরাজ্য অধিকারের লোভ দেখাইয়া তথা হইতে ডন ফ্রান্সিস নামক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য আনয়ন করেন। ইঁহারা আরাকানরাজ্যের প্রান্তভাগ লুণ্ঠন করিতে থাকেন। আরাকানের রাজা ওলন্দাজদের সহায়তায় পর্ত্তুগীজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ডন ফ্রান্সিস নিহত হন এবং গন্জালেস পালাইয়া যান। আরাকানরাজ অনায়াসে সন্দীপ দখল করিয়া লন (১৬১৮ খৃঃ অব্দ)। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ আরাকানরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হুসেনবেগ সেনাপতির দ্বারা মোগলের নষ্ট ক্ষমতা উদ্ধার করেন। প্রায় ৫০ বৎসর কাল এই মগেরা এবং পর্ত্তুগীজ দুর্ব্বৃত্তেরা মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে তাহার কতক কতক বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে; বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে আরও অনেক ভয়াবহ কথা জানিতে পারা যায়। এই পর্ত্তুগীজ দস্যুরা গর্ব্ব করিয়া বলিত, "পাদ্রীরা ১০ বৎসরের চেষ্টায় যত লোককে খৃষ্টান করিয়াছে আমরা এক বৎসরে তদপেক্ষা বেশী করিয়াছি।" ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি ওমেদ খাঁ ও হুসেনবেগ চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দখল করেন। মগেরা ১,২২৩টি কামান ফেলিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ ধনরত্ন ভূমিতে প্রোথিত করিয়া যাওয়াতে মোগলেরা আশানুরূপ অর্থ পাইতে পারেন নাই। আরাকানরাজের সঙ্গে একত্র হইয়া ইহারা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত। আরাকানরাজের সৈন্যগণের মধ্যে অনেক পর্ত্তুগীজ সৈন্য ছিল, কিন্তু ইহারা কোন বেতন পাইত না। বাঙ্গলা দেশটা আরাকান-রাজের অনুমতিক্রমে ইহারা জায়গীর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সেখানে বারমাস ইহারা লুণ্ঠন, হরণ এবং অত্যাচার চালাইত (J. A. S. B., 1907, No. 6, p. 425)।

ইসলাম খাঁ তাঁহার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করিলেন। এই মগ ও পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করাই তাঁহার এই রাজধানী-পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ ছিল। তৎপূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য

মগ ও পর্ত্তুগীজদের দৌরাত্ম্য অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছিলেন। এমন কি ছলনাপূর্ব্বক সন্দীপের শাসনকর্ত্তা কার্ভালোকে ধুমঘাটে আনিয়া অবিচারে নিহত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় পর্ত্তুগীজদের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেক পর্ত্তুগীজ পাত্রী এদেশ হইতে পালাইয়া যান। ইসলাম খাঁ পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার অনেকটা নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সায়েস্তা খাঁ ইহাদিগকে একেবারে সায়েস্তা করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ ও মগেরা সায়েস্তা খাঁর অভিযানে চট্টগ্রাম হইতে যেভাবে পালাইয়া যায়, তাহাতে পর্ত্তুগীজ ও ফিরিঙ্গীগণ একেবারে শক্তিহীন হয়; এবং "মগের মুল্লুকের" বহুবিশ্রুত অত্যাচার একেবারে গল্পের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। মগেরা যে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে পালাইয়া গিয়াছিল—তাহার স্মৃতি এখনও তদ্দেশীয় লোকের স্মৃতিতে জাগরূক আছে। মগ-দিগের পলায়ন জেনোফোনের "Retreat of the Ten Thousand" এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লৌকিক কথায় এই পলায়নের নাম "মগ-ধাওনি।" মগেরা পালাইবার সময়ে তাহাদের দেববিগ্রহ ও অতুল ঐশ্বর্য্য মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আরাকানে যাইয়া সেই গচ্ছিত ধন ও দেবমূর্ত্তি প্রোথিত করিবার স্থানের একটা সাঙ্কেতিক মানচিত্র তাহারা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। বহুকাল পরে যখন দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন মগ-পুরোহিতেরা সেই মানচিত্রহস্তে ধূমকেতুর মত চট্টগ্রামে উদিত হইয়া সেই গুপ্ত দেববিগ্রহ ও মণিরত্নমোহরপূর্ণ কুম্ভ উঠাইয়া লইয়া যাইতেন। এখন পর্য্যন্ত নাকি মগ-পুরোহিতেরা সে সন্ধান ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা মানচিত্র লইয়া মাঝে মাঝে দেখা দেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ পাহাড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও অপরাপর বিগ্রহ ভূনিম্নে পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি অটুট ও উৎকৃষ্ট অবস্থায় আছে—ইহারা যে সেই মগ-ধাওনির সময়কার পরিত্যক্ত বিগ্রহ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বহুকাল পূর্ব্বে আমি মগ-ধাওনির সময়কার কয়েকখানি বুদ্ধ ও গণেশমূর্ত্তি পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি আমি জয়নগর-মজিলপুর-বাসী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানী কালিদাস দত্ত মহাশয়কে দিয়াছি। 'নছর মালুম' নামক পল্লীগাথায় (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড) মগ-পুরোহিতগণ কিরূপে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গুপ্তধন পুনরুদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌতুকাবহ কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ এই ভাবে মগদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে 'ইসলামবাদ' নামে পরিচিত করেন। মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুর অত্যাচার বিশেষভাবে সেই সময় হইতে নিবারিত হইলেও, পর্ত্তুগীজদের সাময়িকভাবে এখানে-সেখানে দস্যুতার কথা ইংরেজ আমলেও শুনা যাইত। লঙ্গ সাহেব লিখিয়াছেন—১৮২৪ খৃঃ অব্দেও মগ দস্যু-কলিকাতাবাসীরা ভয় করিত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট গঙ্গার একটা বাঁধ তৈরী দিগকে করিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদের আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন। বর্ত্তমান "উদ্ভিদ্-বীথিকার" (Botanical Garden) কাছে এই বাঁধ ছিল।

পাঠান ও ভূঞারাজগণের প্রতিপক্ষতা ও খাস মোগল শিবিরের বিদ্রোহদমন এবং পরিশেষে মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার-নিবারণের পর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে

মোগল-সাম্রাজ্যের অধিকার মেঘনির্মুক্ত আকাশের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন দিল্লীশ্বরের একাধিপত্য। যে সকল বীর আগ্রা পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া যমুনার জল মোগলরক্তে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাদের জয়ী খড়্গ সেই জলে ধৌত করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন, তখন সেই সকল উচ্চাভিলাষী বীরের বংশধরেরা সম্রাটের প্রতিনিধির দরবারে কুর্নিশ করিতে করিতে যাইয়া রাজস্বদানপূর্ব্বক কুর্নিশ করিতে করিতে দরবার ত্যাগ করিতেন। প্রবল দস্যু, প্রবল রাজা, প্রবল পাঠান, প্রবল মোগল—ইহারা সকলেই কেহ-বা শির দিয়া, কেহ-বা শির হেঁট করিয়া স্বীয় অধিকারভ্রষ্ট হইলেন। আকবরের চাল-বাজিতে মোগল শক্তির এইভাবে জয় হইল। ইহার পরে রাষ্ট্র-বৃদ্ধির কথা। তাহাও আমরা সংক্ষেপে বলিয়া যাইব।

কুচবিহার রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত এবং উত্তরে আসাম ও তিব্বতের পর্ব্বতমালা। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ বহুকাল হইতে স্বাধীন ছিল।

কুচবিহার রাজ্য।

১৪২২ শকে (১৫০০ খৃঃ) বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ বিশু সিং বা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন; প্রবাদ ইনি শিবপুত্র। ষ্টুয়ার্ট সাহেব মোগলদিগের সঙ্গে কোচরাজাদের যে সংঘর্ষের বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—১৫৯৫ খৃঃ অব্দে কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মণনারায়ণ মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া স্বেচ্ছায় মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক সৈন্য, ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৭০০ হস্তী এবং ১,০০০ রণতরী ছিল। মোগলদিগের সঙ্গে এই অহেতুকী প্রেম ও দাসত্বের নাগপাশ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়াতে তাঁহার আত্মীয়, সুহৃৎ এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা অত্যন্ত বিরক্ত হন; তাঁহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা স্বীয় দুর্গে আশ্রয় লইয়া বঙ্গাধিপের নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপনপূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখেন। মোগলেরা এই সুবর্ণ-সুযোগ কেনই বা ছাড়িবেন? জেহাজ খাঁর অধীন একদল মোগল সৈন্য যাইয়া রাজশত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করে—এই ভাবে কুচবিহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়, তৎকালে তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ শিশু ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপক ছিল। ইঁহার খাস মুন্সী জয়নাথ ঘোষ (মুন্সী) রাজার রাজ্যভার গ্রহণের সময়ে কুচবিহাররাজ্যের একখানি ইতিহাস লিখিতে আদিষ্ট হন। যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি পুস্তকে উক্ত রাজ্যের পূর্ব্বতন ইতিহাস লিখিত ছিল, এরূপ জানা যায়। জয়নাথ মুন্সীর ইতিহাস ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ। ১৫২৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই দুর্লভ পুস্তকখানির একখানি পাণ্ডুলিপি আমি পাইয়াছি, ইহা এপর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অনুমান ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই ইতিহাসের লেখা সুরু হইয়াছিল। প্রাচীন কালের ধরনে ইহাতে আজগুবি গল্পের অভাব নাই, কিন্তু রাজাদের রাজনৈতিক জীবন এবং রাজত্বের প্রধান প্রধান

ঘটনা এই পুস্তকে যথাযথরূপে বিবৃত হইয়াছে। জয়নাথ মুন্সী রাজবাড়ীর সমস্ত কাগজপত্র, প্রাচীন দলিল দেখিয়া এবং বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির বাচনিক বিবরণগুলি শুনিয়া ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। 'প্রত্যক্ষ' খণ্ড অর্থাৎ হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৎপরবর্ত্তী রাজার ইতিহাস তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চোখে দেখা। তন্মধ্যে কোন ভুল আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

মোগলদিগের সঙ্গে কুচবিহারের যে সংঘর্ষের বিবরণ ষ্টুয়ার্ট দিয়াছেন, তাহার অনেকটাই সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিকগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত কাহিনী হইতে সংগৃহীত। এই বিবরণের সঙ্গে জয়নাথ মুন্সীর কথিত বৃত্তান্তের অনেকাংশে মিল নাই। প্রথমতঃ রাজার নাম লক্ষ্মণ-নারায়ণ নহে,—লক্ষ্মীনারায়ণ। এসম্বন্ধে রাজবাড়ীর সুদীর্ঘকালের কর্ম্মচারী রাজানুগৃহীত লেখক রাজাদেশে লিখিত পুস্তকে রাজার বংশাবলীসম্বন্ধে ভুল করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খৃঃ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ১৬২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জয়নাথ মুন্সীকৃত "রাজাবলী"তে দৃষ্ট হয়, মোগল সেনারা কুচবিহারে আসিয়া উৎপাত করে। রাজা স্বয়ং রণক্ষেত্র অপেক্ষা অন্দরমহলই বেশী আরামপ্রদ মনে করিতেন, এজন্ত স্বয়ং যুদ্ধে না যাইয়া সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিলেন,—তাঁহারা মোগল সৈন্তদের দ্বারা পরাস্ত হইলেন। মোগলেরা রাজ্যের অনেক ক্ষতি ও লুণ্ঠনাদি করিয়া চলিয়া গেল। রাজার দুই পুত্র বজ্রনারায়ণ আর ভীমনারায়ণ অসীম দৈহিক শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু রাজা বিলাসী ও অলসপ্রকৃতি ছিলেন। একদা মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামে এক মহাপণ্ডিতকে রাজা অবমানিত করেন। এই ব্যক্তি মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া নালিশ করেন। জাহাঙ্গীর হিন্দুর দৌহিত্র, তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে আদর করিতেন। মুকুন্দ পণ্ডিত তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, তাঁহার প্ররোচনায় কুচবিহার দখল করিবার জন্ত তিনি গৌড়ের রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করেন। মোগল সৈন্তগণ কুচবিহার আক্রমণ করে, কিছু সময় ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইতে থাকে। কোন কোন যুদ্ধে মোগলেরা পরাস্ত হইলেও মোটের মাথায় তাহারাই জয়ী হইয়া রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখিয়া মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। দিল্লী থাকা কালীন তৎপুত্রদ্বয় বজ্রনারায়ণ ও ভীমনারায়ণ-কর্ত্তৃক কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়—তাহাতে দরবারে তাঁহাদের বীরত্বের কথা প্রচারিত হয়। এই সকল ঘটনা নিছক গল্প বলিয়া মনে হয়। একটা ক্ষুদ্র গলি দিয়া রাজা যাইতেছিলেন—একটা হাতী বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছিল। রাজাদের ফিরিয়া যাইবার প্রথা নাই,—সুতরাং রাজা অগ্রসর হইতে থাকেন। পথ হাতীকে ফিরাইবার যোগ্য প্রশস্ত ছিল না; মাহুত কি করিবে? এমন সময়ে কুমার বজ্রনারায়ণ "হস্তীর দুই দন্ত ধারণ করিয়া পিছু পানে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিলেন যে হস্তী চীৎকার করিয়া পশ্চাদ্গামী হইল।" আর একদিন রাজা যমুনাতে স্নান করিয়া তর্পণ ও আহ্নিক করিতেছেন—এমন সময়ে একটি ১৬ দাঁড়ী নৌকা সেই ঘাটে বেগসহকারে উপস্থিত হইল, রাজা হয়ত গলুইয়ের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত

হইতেন কিন্তু ভীমনারায়ণ তাঁহার কবাটতুল্য বিশাল বক্ষ দ্বারা নৌকাটা অতিবেগে ফিরাইয়া দিলেন। তৃতীয় গল্পটি এই যে রাজা যাহাতে মাথা হেঁট করেন এজন্য তাঁহার পথে জাহাঙ্গীর একটা ক্ষুদ্র তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন শিববংশীয় নৃপতিরা কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিবেন না, এই তাঁহাদের পণ। বজ্রনারায়ণ "ঐ দ্বার মস্তকে ধারণ করিয়া আরো উচ্চ করিলেন—রাজা ও ভীমনারায়ণ মাথা নত না করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রবিষ্ট হইলেন।

জয়নাথ মুন্সী লক্ষ্মীনারায়ণের এই সকল কাহিনী দিয়াছেন, তাহা তাঁহার সময় হইতে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ভীমনারায়ণ ও বজ্রনারায়ণ অবশ্যই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু এই সকল গল্পগুজব এই দুই শত বৎসরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া কুচবিহাররাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। রাজপুত্রদের দেহে শক্তির প্রবাদের উপর খুব মোটা তুলিতে রং ফলান হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে রাজার দেখা-শুনার কথাটা বোধ হয় সত্য। জয়নাথ মুন্সী-কথিত রাজা ও সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত ঠিক বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ উহা রাজকীয় দলিল-পত্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন। সর্ত্ত অনুসারে মোগলেরা কুচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু তদবধি "রাজার নারায়ণী মুদ্রা পূরা থাকিবে না, অর্দ্ধমুদ্রাতে মোগল সম্রাটের নাম অঙ্কিত থাকিবে।" এইরূপে মহারাজ লক্ষ্মী-নারায়ণ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের এই বশ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মধ্যে মধ্যে মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সাময়িকভাবে বিজিত হইলেও কুচবিহার ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। তাঁহাদের নারায়ণী মুদ্রা একই ভাবে সদর্পে প্রচলিত হইত। কুচবিহারের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি

মুণ্ডমালা ও তুরুককাটা।

জীবন আত্মকলহ, ভুটিয়াদের সহিত সংগ্রাম প্রভৃতির বিবরণে পূর্ণ। পঞ্চবর্ষবয়স্ক মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের সময়ে অমাত্যগণ স্ব স্ব প্রধান হইল। ঢাকার এব্রাহিম খাঁ এবং তৎপুত্র জবরদস্ত খাঁর সঙ্গে তাঁহারা মিলিত হইয়া কিঞ্চিৎ কর দিতে স্বীকৃত হইয়া তখন ঘোড়াঘাটে যে ফৌজদার থাকিত তাহারই অনুগত হইতে লাগিল। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে মহীন্দ্রনারায়ণের সেনাপতি মুসলমানদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। "মোগল-সৈন্য এক যুদ্ধ জয় করিয়া রাজসৈন্যের মস্তক কাটিয়া মালা গাঁথিয়া বাঁশের উপর লটকাইয়া রাখিয়াছিল,—ইহাতেই সেই স্থানের নাম হইল 'মুণ্ডমালা'। রাজসৈন্য প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই, তাহারাও একস্থানে অনেক যবনের শিরশ্ছেদ করিয়াছিল, সে স্থলের নাম হইল 'তুরুককাটা'। জয়নাথ মুন্সীর বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের উক্তির অনেক স্থলেই মিল নাই। কিন্তু এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস মুন্সী মহাশয় এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহার কথা আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি যে ষ্টুয়ার্ট সাহেব পুনঃ পুনঃ কুচবিহার-জয়ের কথা লিখিয়াছেন (১৯১, ২১৪, ২৭৪, ৩২৪, ৩২৫, ৩৬৯ ও ৪০৫ পৃঃ, বঙ্গবাসীর সংস্করণ)। কিন্তু একবার জয় হইলে তাহার পরে যে রাজারা পুনরায় স্বাধীন কি ভাবে হইয়াছিলেন—সেই অবকাশ

পূরণ করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাঁহাদের পরাজয়ের কথা সাধ্যমত গোপন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঢাকার ফৌজদার মহম্মদ আলি মহারাজ রূপনারায়ণের (১৬৮৪-১৭৬৩ খৃঃ) সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রংপুরে পালাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা মুসলমানেরা কোন ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। ১৬৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গলার নবাব জবরদস্ত খাঁর সহিত মহারাজ রূপনারায়ণের এক সন্ধি হইয়াছিল। মহারাজ হারিয়া গিয়া এই সন্ধিতে দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ঢাকাতে ছিলেন নবাব জবরদস্ত খাঁ, তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন, চাক্‌লে বোদা ও চাক্‌লে পাটগ্রাম ও চাক্‌লে পূর্ব্বভাগ মহারাজের অধিকারে থাকিবেক সুবাকে কিছু কর দিবেন। ছত্রধারী—গজসিক্কার রাজা, অন্যকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে এমতে শান্তনারায়ণ নাজির দেও বনামে ইজারা লিখিয়া ঐ নামে কর দিতেছিলেন।* কিন্তু সুবেজাতের সেরেস্তাতে শান্তনারায়ণের মারফৎ চাক্‌লে বোদা ও গয়রহ তরফ রূপনারায়ণ মহারাজা বেহার এই প্রকার লেখা হইত। ১১১৮ সনে (১৭১০ খৃঃ) এই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। তখনও মহারাজ নিজনামাঙ্কিত মুদ্রা চালাইতেন ও ছত্রদণ্ডধারী ছিলেন, অপরকে রাজকর দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিতেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব সম্ভবতঃ এই সন্ধির কথাই মুরসিদ কুলি খাঁর কুচবিহারের স্বাধীনতা-লোপের নিদর্শন মনে করিয়াছেন। মিরজুমলা ১৬৬১ খৃঃ অব্দে কুচবিহার জয় করিয়া উহার নাম দিয়াছিলেন "আলমগীর নগর"—(ষ্টুয়ার্ট, ৩১৮ পৃঃ।) এই উক্তির কোন ভিত্তি নাই। এই নাম হয়ত মুসলমান সময়কার সরকারের দলিলপত্রেই ছিল। এই সময়ে কুচবিহারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, এই যুদ্ধে মিরজুমলা যে কিছুতেই পারিয়া উঠিতে-ছিলেন না, তাহা ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, যদিও মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করাতে তিনি সাময়িক সন্ধি বা জয়, যাহা মুসলমানের পক্ষে গৌরবজনক, তাহারই উপর জোর দিয়াছেন। জয়নাথ ঘোষ এই সকল বিষয়ে অকপটে সত্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসখানি খুব মূল্যবান্। আমার নিকট যে পাণ্ডুলিপি আছে তাহা ৪৬৯ পৃষ্ঠা ব্যাপক (ফুলস্কেপ কোয়ার্টো সাইজ)। বস্তুতঃ মোগলেরা সময়ে সময়ে কুচবিহারের রাজস্ব ও বশ্যতার নিদর্শন পাইলেও এই রাজ্য সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারেন নাই। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হন। পারলিঙ্গ (Mr. Parling) সাহেবের অধীনে কতকগুলি সিপাহী কুচবিহারের সৈন্যসহ মিলিত হইয়া ভুটিয়াদিগকে পরাস্ত করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কুচবিহারের যে সর্ত্ত হয়, তাহাতে রাজসরকার হইতে বৎসর বৎসর লক্ষ-টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন রাজস্ব দেওয়া এবং অপরাপর কথা নির্দ্ধারিত হইয়া রাজ্য ইংরেজদের দখলে আসে।

আসামের সৈন্য ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বঙ্গের অনেক পল্লী ও নগর লুণ্ঠন করে। তাহারা সুবৃহৎ ৫০০ রণতরী লইয়া আগমন করে। ইসলাম খাঁ ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পলায়নপর রাজসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক আসামে প্রবেশ করেন

এবং রাজার ১৫টি দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু বর্ষা আসিয়া পড়াতে রসদের অভাবে দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়া পালাইয়া রক্ষা পান।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে মিরজুমলা আসামের স্বাধীনতা লুপ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু আসামের জঙ্গলে রসদের অভাবে ও শত্রুদের অবিশ্রান্ত শরবর্ষণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। বর্ষার অবসানে রাজা পালাইয়া পাহাড়ে যাইতেন—তখন মিরজুমলা জয়ের আশায় উৎফুল্ল হইতেন। কিন্তু বর্ষায় আবার বিড়ম্বনা আরম্ভ হইত। কিন্তু পরিশেষে মিরজুমলার জয় হইল। রাজা তাঁহাকে ২০,০০০ তোলা সোনা, ১০,০৮,০০০ তোলা রৌপ্য, ৪০টি হস্তী এবং রাজান্তঃপুরের দুইটি সুন্দরী কুমারী প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। তিনি বাৎসরিক একটা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন, এবং এই রাজস্ব রীতিমত দেওয়া হইবে—তাহার জামিনস্বরূপ চারটি রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া আসেন। মোগলদিগের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরেরও সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মোগলেরা যে কোন উপলক্ষ পাইলেই তাঁহাদের সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সুবিধা খুঁজিতেন। পাঠানেরা যেরূপ অর্থের অভাব হইলে বা প্রতিহিংসানিবন্ধন নিকটবর্ত্তী রাজ্যে উৎপাত করিয়া লুণ্ঠনদ্বারা ভাণ্ডার ভর্ত্তি করিয়া আনিতেন এবং বিজিত রাজা এইভাবে লাঞ্ছিত করিয়া খোস মেজাজে চলিয়া যাইতেন—মোগলদের রাষ্ট্রনীতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, তাঁহারা রন্ধ্রপথ পাইলেই তৎসূত্রে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্যটি চিরকালের তরে আত্মসাৎ ও পদানত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন। কিন্তু কুচবিহার, ত্রিপুরা ও আসাম বহুদিন এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর আক্রমণ ও তৎকর্ত্তৃক রাজ্যের অধিকার ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। আমরা স্বতন্ত্রভাবে এই তিন রাজ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিব, এজন্য এখানেই এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত বাদশাহের নিকট-আত্মীয় এক মুসলমান যোদ্ধাকে কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। এসকল কথা আমরা এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

ত্রিপুরা ও আসাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তৃগণ

বঙ্গদেশে মোগলেরা ধীরে ধীরে সমস্ত শত্রুপক্ষ জয় করিয়া আত্মশিবিরের বিদ্রোহ দলনপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের প্রায় সকলগুলিকে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সার্ব্বভৌম অধিকার পাইয়াছিলেন; তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে দিলাম। আকবর যাহা করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান সেই নীতিই মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন। আকবর

মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা ভারতবর্ষকে করতলগত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তথাপি তিনি যুদ্ধ ভালবাসিতেন না; যেখানে ক্ষমা ও মিষ্ট ব্যবহার ব্যর্থ হইত, সেখানে তিনি এক টুকরা জমির জন্যও তাঁহার বিপুল বাহিনীকে জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিতেন। অধীন ব্যক্তিরা সদয় ব্যবহারের মুক্ত পরিবেষণে তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু যিনি মাথা হেঁট করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন, তাঁহাকে তিনি উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁহার সার্ব্বভৌম পদগৌরবের কণামাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে তিনি সম্মত হইতেন না। শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে যদি কেহ ক্ষমাগুণের একটু বেশী পরিচয় দিতেন, তবে তিনি তাহা ক্ষমা করিতেন না। শত্রুকে যে যতটা বেশী দলন করিতে পারিত, তাহার উপর তিনি ততটা সন্তুষ্ট হইতেন। শাসনের শিথিলতা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি সাহাবাজ খাঁ মোগলবিদ্রোহী কাকশালদের নেতা এবং পাঠান কতলু খাঁর প্রতি একটু বেশী সদয় হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন (১৫৮৫-৮৬ খৃঃ), এজন্য আকবর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কার্য্যচ্যুত—এমন কি উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহ করিয়া তিন বৎসর তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। অধীন ব্যক্তির প্রতি দয়ার আদর্শ—অধীন যোগ্য ব্যক্তির গুণগ্রাহী সম্রাট্ আকবর লৌহমুষ্টিতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রতি স্বভাবতঃ বিরাগসম্পন্ন—অথচ এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অটল, অধ্যবসায়শীল যোদ্ধা জগতের ইতিহাসে বেশী দেখা যায় না। ১৫৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যায় পাঠানদের সঙ্গে কতকটা তাহাদের অনুকূলে সন্ধি করাতে আকবর বিরক্ত হইয়াছিলেন। ("The Emperor was displeased at the want of energy evinced by the Raja on the occasion."—Stewart, Bangabasi edition, p. 209.) আকবর যথাসাধ্য ন্যায়পর হইতে চেষ্টা পাইতেন। সের আফগানকে বলিয়াছিলেন, মেহেরুন্নেসাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবেন কিন্তু শেষে যখন জানিলেন, সেলিম তাঁহার জন্য পাগল—হয়ত ইঁহাকে না পাইলে তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইবে, তখনও তিনি যুবরাজের মুখের দিকে না চাহিয়া যে কথা দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন; মেহেরুন্নেসা সের আফগানের পত্নী হইলেন। তাঁহার বাক্যের মর্য্যাদারক্ষা রাজোচিত। শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেখানে ক্ষমা অথবা শিথিলতা-প্রদর্শন তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ—সে শত্রু যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, আকবর বহ্নির শেষের ন্যায় শত্রুর শেষকে আশংসঙ্কুল মনে করিতেন। এই সাম্রাজ্যনীতিতে তদায়ত্ত ভারতবর্ষের বিশাল অধিকার তাঁহার অঙ্গুলীসঞ্চালনে চলিত। তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজল, তান সেন, মানসিংহ, তোদরমল্ল প্রভৃতি বিজ্ঞ ও প্রতিভাপন্ন লোককে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে চালাইতেন। এতবড় রাষ্ট্রপ্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে খুব বেশী নাই। কিন্তু তিনিই হিন্দুস্থানের বলক্ষয় করিয়াছেন, হিন্দুস্থানের রণশার্দ্দূলদিগকে নিধন করিয়া তিনি সমস্ত শক্তি দিল্লীর কেন্দ্রমুখী করিয়াছেন—যখন তাঁহারা মেষ বনিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।

আকবরের নীতি।

এইভাবে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ আবার জাঁকিয়া উঠিয়াছিল—ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি দিল্লী অভিমুখী হইয়াছিল, তদবধি ভারতবর্ষ দিল্লীর আওতায় পড়িয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য নক্ষত্র এমন কি চন্দ্রতুল্য জ্যোতিষ্ক সূর্য্যোদয়ে বিলুপ্ত হওয়াতে একমাত্র প্রখর মোগলশাসন রৌদ্রের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা এখানে বঙ্গেশ্বরগণের সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দিব।

১।	হুসেন কুলি খাঁ, খান জিহান	...	...	১৫৭৮-১৫৮০ খৃঃ
২।	রাজা তোদরমল্ল	...	...	১৫৮০-১৫৮৫ খৃঃ
৩।	খান আজিম মির্জ্জা কোক্	...	...	১৫৮২-১৫৮৪ খৃঃ
৪।	সাহাবাজ খাঁন কুমবো	...	...	১৫৮৪-১৫৮৭ খৃঃ
৫।	উজির খান হেরেবি	...	...	১৫৮৭ খৃঃ (অকালমৃত্যু)
৬।	সৈয়দ খাঁন	...	...	১৫৮৭-১৫৮৯ খৃঃ
৭।	মানসিংহ	...	...	১৫৮৯-১৬০৪ খৃঃ
৮।	আবদুল-মজিদ আসফ খাঁ	...	...	১৬০৪-১৬০৮ খৃঃ
৯।	মানসিংহ	...	...	১৬০৯-১৬১০ খৃঃ

আকবর পীড়িত হইয়া পড়াতে জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যাহাতে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, মানসিংহ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন; কারণ খসরু মানসিংহের ভাগিনেয় ছিলেন। এদিকে জাহাঙ্গীর (সেলিম) আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে কতকটা অবাধ্যতাপ্রদর্শন এমন কি পিতার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে উদ্যত ছিলেন। মানসিংহ এই সুবিধা পাইয়া ষড়যন্ত্রটি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত ছিলেন।

কুতুবুদ্দিন খাঁ কোকুলটাস কোকা—১৬০৬-১৬০৭। ইহার সময়ে বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলায় বিখ্যাত সের আফগানের হত্যা হয় এবং মেহেরুন্নেসা বর্দ্ধমান হইতে জাহাঙ্গীরের রাজান্তঃপুরে নীত হইয়া নুরজাহান (জগতের আলো) নাম গ্রহণ করিয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী হন। এইখানে আমরা সংক্ষেপে নুরজাহানের কাহিনী বর্ণনা করিব।

দক্ষিণ তাতারে খাজা আয়াস নামক সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি অবস্থার বিড়ম্বনায় ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার স্ত্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও পিতৃকুল অতি নিঃস্ব ও দরিদ্র ছিল, এই দম্পতী ভারতবর্ষের পথে দুরবস্থার চরমে উপনীত হন। আয়াসের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; তাঁহাকে একটি ঘোড়ায় চড়াইয়া স্বামী বল্গা ধরিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। দম্পতী তিন দিন উপবাসী ছিলেন, তাঁহাদের সমস্ত সংস্থান ফুরাইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় রমণীর সন্তানপ্রসবের কাল উপস্থিত হইল, এবং যিনি কালে জগতের মহীয়সী মহিলাদের অন্যতম হইয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী হইবেন, সেই 'জগতের আলো' তথায় আবির্ভূত হইলেন। তখন রজনী আসন্ন, নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তি

নূরজাহানের জন্মকথা।

নাই, তাজা আয়াস ও তাঁহার পত্নী এত দুর্ব্বল যে তাঁহারা আর চলিতে পারেন না। নবজাত শিশুসহ চলা অসম্ভব দেশ ছাড়িয়া দুরাশায় বিদেশে আসার জন্ত পত্নী পতিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সে স্থান হিংস্রজন্তুপূর্ণ, রাত্রি হইলে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া দম্পতী কোন দয়ার্দ্রচিত্ত আগন্তুকের ভরসায় তাঁহাদের সুন্দরী নবজাত কন্তাকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিশুটিকে লতাপাতা দিয়া কতকটা ঢাকিয়া একটি বৃক্ষের নিম্নে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এক মাইল চলিয়া যাওয়ার পর সেই গাছটি যখন জননীর অদৃশ্য হইল, তিনি তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া শিশুর জন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উঠিয়া বসিতে পারিলেন না। তাজা আয়াস পত্নীকে শান্ত করিবার জন্ম এবং বাৎসল্যবশতঃ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এক রোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

তিনি দেখিলেন এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণসর্প শিশুটিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে ও তাহাকে গ্রাস করিবার জন্ম ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়াছে। সেইখানে দ্রুতবেগে আসিয়া গোল গোল করাতে সাপটা হঠাৎ ভয় পাইয়া শিশুকে ছাড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিরাপদে স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তখন কয়েকটি লাহোরযাত্রী বণিক্ সেই পথে চলিতেছিল, তাহারা এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেল। তখন আকবর লাহোরে ছিলেন। আসফ খাঁ নামে তাঁহার এক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাজা আয়াসের সম্পর্ক ছিল, ইহার আনুকূল্যে এই দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশঃ রাজ-দরবারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি মোগল দরবারে রাজস্বসচিব হইলেন। সেই নবজাত কন্তার রূপলাবণ্য দর্শনীয় বিষয় হইল। তাঁহার নাম হইল মেহেরুন্নেসা অর্থাৎ "রমণীকুলমিহির", কারণ তাঁহার সৌন্দর্য্য সত্যই সূর্য্যের ন্তায় চক্ষে ধাঁধা দিত। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নানাগুণে গুণবতী হইয়া উঠিলেন। সঙ্গীতে, চিত্রবিদ্যায়, কবিতারচনায় ও নর্ত্তনে তিনি রমণীসমাজে অদ্বিতীয়া হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দীর্ঘ ও সুগঠিত, কথা চাতুরীপূর্ণ অথচ সম্ভ্রমাত্মক, হাস্য মধুর ও দিগ্বিজয়ী ছিল। কোন নিমন্ত্রণ-সভায় সেলিম তাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার রূপ তাঁহাকে আবিষ্ট করিল, তাঁহার গানে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। যুবতীরও চেষ্টা ছিল যুবরাজের হৃদয় জয় করা। হঠাৎ যেন অতর্কিতে তাঁহার অবগুণ্ঠন মুখ হইতে অপসারিত হইল, তখন তাঁহার সলজ্জ-রক্তিম গণ্ড, স্ফুরিতাধর ও কুন্তলাবৃত কপোল এবং চকিতহরিণীবৎ দৃষ্টি সেলিমের বুকে যাইয়া শেলের মত বিঁধিল। ("Then, as by accident, she dropt her veil and shone upon him at once with all her charms. The confusion which she could well feign on the occasion heightened the beauty of her face. Her timid eye by stealth fell upon the prince and kindled all his soul into love."—Stewart, p. 232.) সেলিম সমস্তদিনটা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তাজা আয়াস ইহার পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ সের আফগানের সঙ্গে কন্তার বিবাহ দিবেন, এইরূপ বাগ্দান করিয়া-

ছিলেন। নিরুপায় হইয়া সেলিম তাঁহার পিতার নিকট প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ন্যায়ের অবতার আকবর বাদশাহ তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি শত স্নেহসত্ত্বেও বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহে বাধা জন্মাইতে সম্মত হইলেন না। আকবরের জীবদ্দশায় সেলিম সের আফগানের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেলিম ও নুরজাহানের প্রেম লইয়া এতটা নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত হইল যে, সের আফগান বিরক্ত হইয়া আগ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিলেন এবং বঙ্গাধিপের আনুকূল্যে বর্দ্ধমান জেলার শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন।

সের আফগানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

আকবরের মৃত্যুর পর যে আগুন চাপা ছিল, তাহা আবার জ্বলিল। তরুণবয়সে যে ফুলশর বক্ষে আসিয়া পড়ে, তাহা সহজে যায় না। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সের আফগানকে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইয়া আনিলেন, তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিলেন; সের আফগানও নিতান্ত উপেক্ষণীয় লোক ছিলেন না। তরুণবয়সে তিনি পারস্যরাজ সফবিবংশের তৃতীয় রাজা সা ইসমাইলের একজন প্রিয় সঙ্গী ছিলেন এবং আকবরের সময়ে নানা যুদ্ধে অতিশয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন; বিশেষতঃ অপরিমিত দৈহিক বলের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সিন্ধু-বিজয়কালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া আকবর ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইঁহার নাম ছিল আস্তা জিল্লো, কিন্তু একটি ব্যাঘ্র বধ করিয়া তিনি সের আফগান নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার হৃদয় উদার এবং সাহসের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল—সুতরাং ইনি সেই সময়ে সর্ব্বজনপ্রিয় ও রাজদরবারে সকলের সম্মানিত ছিলেন। ঈদৃশ ব্যক্তির পত্নীকে জাহাঙ্গীর কি করিয়া বল বা ছলনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন? তাহাতে নিন্দা ও বিপদের উভয়বিধ আশঙ্কাই ছিল। কিভাবে মেহেরুন্নেসাকে পাইবেন, সম্রাট্ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু নানাজনের নানাকথায় সের আফগান কর্ণপাত করিতেন না, তাঁহার উদার অন্তঃকরণে সন্দেহের কালিমা থাকিতে পারিত না। সম্রাটের বাহ্য-সৌজন্য তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একদিন একটা ব্যাঘ্রের উৎপাতে লোকজন বড়ই উৎপীড়িত হইতেছিল, সম্রাট্ উহা শিকার করিতে গেলেন, অন্যান্য ওমরাদের সহিত সের আফগানকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। ব্যাঘ্র যেখানে ছিল সেই স্থানটা কেন্দ্র করিয়া একটা বৃহৎ পরিধি নির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্রাটের লোকজন পশুকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা ব্যাঘ্রের এত সন্নিহিত হইল যে উহার লাঙ্গুল-আস্ফোটন, গর্জ্জন ও লম্ফঝম্পের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাইতে লাগিল। সম্রাট্ বলিলেন, "আমার ওমরাদের মধ্যে কে আছেন, যিনি একাকী যাইয়া বাঘটি নিধন করিয়া আসিবেন?" সম্রাট্ ভাবিয়াছিলেন, সের আফগান অবশ্য প্রস্তুত হইবেন। এদিকে সের আফগান ভাবিলেন, "কিছুকাল দেখা যাক্; ওমরাদের মধ্যে এরূপ সাহসী কেহ নাই, তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইলে তখন আমি প্রস্তুত হইব।" এই ভাবিয়া তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনজন ওমরা লজ্জার দায়ে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন সের আফগান

দেখিলেন, তাঁহার প্রাপ্য যশ অন্যে লইয়া যায়, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ব্যা'ঘ্র যে বল ভগবান্ দিয়াছেন, আমাদেরও তাহাই দিয়াছেন। নিরস্ত্র অবস্থায় কে [illegible] তে পারেন?" ওমরাগণ এ প্রস্তাবে বিমুখ হইলেন, তখন সের আফগান নিরস্ত্র হইয়া বন্য ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি চাহিলেন। সম্রাট্ বাহ অনিচ্ছা দেখাইয়া দুএকবার নিষেধ করিয়া শেষে মনে মনে আনন্দের সহিত অনুমতি দিলেন। রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত-দেহে সের আফগান ব্যাঘ্রটিকে হত্যা করিয়া সম্রাট্-শিবিরে ফিরিলেন। অসম্ভব সম্ভব হইল এবং সের আফগানের বীরত্বখ্যাতি সমস্ত সহরে মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিন্তু জাহাঙ্গীর পুনরায় চক্রান্ত করিলেন। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড হাতীর মাহুতের উপর গোপনে আদেশ হইল যে, কোন ক্ষুদ্র অলিগলির ভিতর দিয়া যখন সের আফগান যাইবেন, তখন 'হাতীটা পাগল হইয়াছে' এই ভাব দেখাইয়া সের আফগানকে উহার পদতলে ফেলিয়া মারিতে হইবে। কিন্তু সের আফগানের কি অপূর্ব্ব বীরত্ব! তিনি হাতীটার শুঁড়ের মূলে এমনই জোরে খড়্গাঘাত করিলেন যে, শুঁড় ছিন্ন হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল এবং হস্তী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। জাহাঙ্গীর রাজপ্রাসাদের এক জানালা দিয়া উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছিলেন; তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হয়ত এই মহামনা বীরের প্রতি এরূপ নীতিবিরুদ্ধ দুষ্ট ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া সম্রাট্ ছয়মাস নিরস্ত ছিলেন। ইহার পরে সের আফগান বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবার কুতুবুদ্দিন যিনি নাকি জাহাঙ্গীরকে ক্রমাগত উস্কাইয়া দিতেছিলেন, তিনিই বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন; সম্ভবতঃ তাঁহার বঙ্গের মসনদ পাওয়ার একটা সর্ত্ত ছিল, সের আফগানকে বধ করা। সের আফগান রাত্রে অস্ত্রধারী কোন দেহরক্ষক রাখিতেন না, দরজা খুলিয়া রাত্রে শুইয়া থাকিতেন, তাঁহার আবাসগৃহে একটি বৃদ্ধ চাকর থাকিত, অপরাপর দাসদাসীরা সন্ধ্যার পর যার যার বাটীতে চলিয়া যাইত। ৪০জন অস্ত্রধারী লোক একরাত্রে ঘুমন্ত সেরের গৃহে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ সৈনিক বলিয়া উঠিল, "ঘুমের মানুষকে মারিতে নাই।" তখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে,—তিনি বৃদ্ধ সৈনিককে ধন্যবাদ দিয়া সিংহবিক্রমে এই ৪০জন সশস্ত্র লোককে আক্রমণ করিলেন, অনেকে হত হইল, অনেকে আহত হইল, এবং জীবিতদের মধ্যে সকলেই পালাইয়া গেল। কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্র বিফল হইল। কিন্তু এই ঘটনায় সের আফগানের খ্যাতি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। তিনি যে পথ দিয়া যাইতেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় ভিড় হইত। রাজধানী নিরাপদ্ মনে না করিয়া সের আফগান বর্দ্ধমানে চলিয়া আসিলেন,—ইচ্ছা মেহেরুন্নেসাকে লইয়া বাকী জীবন নিশ্চিন্তভাবে কাটাইয়া দিবেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সফলতার সম্ভাবনা, ভাবী জীবনের উন্নতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এ সব বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বিঘ্ন দাম্পত্যজীবনের শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর, নীতিবিগর্হিত, ষড়যন্ত্রকারী কুতুব নিরস্ত হইলেন না। আকবর হইলে এরূপ অসাধু ব্যক্তিকে একটা রাজ্যশাসনের ভার কখনই দিতেন না। জাহাঙ্গীরকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিতেন, সের আফগানকে নিহত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সহজ

সৌহার্দ্দ্যের ছলনায় তিনি রাজমহল ঘুরিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সের আফগানের সঙ্গে মিত্রভাবে মিশিয়া পথে যাইতে লাগিলেন—কিন্তু একটা সৈনিকের উপর হঠাৎ সেরকে হত্যা করার আদেশ ছিল। অহৈতুক ভাবে সের আফগানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে সের আফগান তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্র সেদিন এতটা প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়িয়াছিল যে, সের আফগানের উদার হৃদয়ও এই উদ্দেশ্য অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কুতুবুদ্দিনকে তরবারীর আঘাতে বিখণ্ডিত করিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রীতির জন্য যে ব্যক্তি ক্ষিপ্ত কুকুরের মত লোককে দংশন করিতে পারিত, সেই হীনচরিত্র শাসনকর্ত্তা নিজের জালে নিজে পড়িয়া মারা গেল। কিন্তু সম্রাটের ওমরারা সের আফগানকে ঘিরিয়া ফেলিল—সের আফগান একক সেদিন চারিটা ওমরাকে হত্যা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন পাঁচহাজারী মনসবদার ছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র বহু যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কেহ তীর, কেহ গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। সের ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা এক একজন করিয়া আয়, দেখি বল কার বেশী" কিন্তু সে কথা কেহ শুনিল না। সপ্ত রথী ঘিরিয়া যেরূপ অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল,—এই বীরশ্রেষ্ঠ তেমনই ভাবে অসম ও অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি পশ্চিমমুখী হইয়া জলের অভাবে রাস্তার ধূলি মাথায় ছড়াইয়া তর্পণ করিলেন। তাঁহার শরীরে ছয়টি গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। নুরজাহান স্বামীর হনন-সংবাদ পাইয়া বিচলিত হন নাই। তিনি নাকি এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী, তাঁহার নিশ্চিতমৃত্যু পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া, তাঁহাকে বিনা আপত্তিতে সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হইবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুসংবাদে জাহাঙ্গীর এরূপ বিশ্বস্ত ও প্রিয় কর্ম্মচারী মারা পড়িলেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মেহেরুন্নেসার মুখ তিনি দর্শন করিবেন না; কিন্তু তারপর মেহেরুন্নেসা নুরজাহান হইলেন। তাঁহার নাম সম্রাটের নামের সঙ্গে মুদ্রায় ও রাজকীয় দলিলপত্রে মুদ্রিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের যুগলনামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় এই কথাগুলি উৎকীর্ণ থাকিত :—

"বহুক্ত শাহ জহাঙ্গীর যাফৎ সদ জেবর
বনামে নুরজহাঁ বাদসহে বেগম জর॥"

জাহাঙ্গীর; কুলি খাঁ কাবুলী ১৬০৭ খৃঃ।

কুলি খাঁ কাবুলী আগে বেহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার চরিত্র লীলাময়। ইনি সর্ব্বদা একশত মৌলভী সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকে কোরান আবৃত্তি করিতেন। প্রতি আবৃত্তির পর তাঁহাদিগকে বলিতে হইত—"এই আবৃত্তির পুণ্য-ফল বাদশাহ পাইবেন।" তিনি পাঁচবার নমাজ পড়িতেন, কিন্তু সেই সময়ে মুখের ভঙ্গী ও করসঞ্চালন দ্বারা কাহাকেও বেত্রাঘাত, কাহাকেও ফাঁসি দেওয়া অথবা শিরশ্ছেদের হুকুম দিতেন। যখন বাহির হইতেন, তখন সঙ্গে একশত ঢাকী থাকিত। কোন বিবাদ-বিসংবাদের স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি সেই

এক শত ঢাকীকে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিতেন, সেই বিরাট্ শব্দে অন্যান্য বিবাদের গোলমাল চাপা পড়িয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গে এক শত অব্যর্থসন্ধানী ধনুর্দ্ধর সৈন্য থাকিত, ইহারা কাশ্মীরবাসী ছিল এবং আকাশে উড্ডীয়মান ক্ষুদ্রতম পাখীটিকেও মারিয়া মাটীতে ফেলাইতে পারিত—কোন ভিড়ের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদা রাজাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। বঙ্গদেশ শীঘ্রই এই পাগলাখীর হাত হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল, তিনি একটি বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান	...	...	১৬০৮-১৬১৩ খৃঃ
কাশীম খাঁ	...	...	১৬১৩-১৬১৮ খৃঃ
ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ ...	...	...	১৬১৮-১৬২২ খৃঃ
সাজাহান	...	...	১৬২২-১৬২৬ খৃঃ

জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী হইয়া সাজাহান বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তিনি ঢাকায় আসিয়া বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্তার সম্পত্তি ও সরকারী রাজস্ব হস্তগত করেন। তৎপরে পাটনা বিজয় করিয়া রোটাস দুর্গ দখল করেন। দরাব নামক কোন ব্যক্তিকে এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহের পর সম্রাটের সহিত সাজাহানের প্রীতির ভাব পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল।

মহাবাৎ খাঁ	...	অল্প সময়ের জন্য	... ১৬২৬ খৃঃ
খানজেদ খাঁ	...	ঐ	

মুকুরেম খাঁ—ইনি ঢাকায় বাস করিতেন; সম্রাটের পুত্র আসিয়াছেন শুনিয়া রাজদূতকে অতি শ্রদ্ধার সহিত সংবর্দ্ধনা করিয়া আনিতে যাইয়া ইনি ধলেশ্বরীগর্ভে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ফিদাই খাঁ	...	...	১৬২৭-১৬২৮ খৃঃ
কাশীম খাঁ যোবানি	...	...	১৬২৮-১৬৩২ খৃঃ

ইহার সময়ে পর্ত্তুগীজগণ হুগলী হইতে অধিকারভ্রষ্ট এবং তাড়িত হয়।

আজিম খাঁ—১৬৩২ খৃঃ-১৬৩৭ খৃঃ—ইহার সময়ে ইংরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি পান এবং পিপলি বন্দরে (বালেশ্বরে) তাঁহাদের প্রথম কুঠি স্থাপিত করেন।

ইসলাম খাঁ মুসেদি	...	...	১৬৩৮-১৬৩৯ খৃঃ
সুজা বাদশাহ (সুলতান মহম্মদ সুজা)	...	...	১৬৩৯-১৬৪৭ খৃঃ

২৪ বৎসর বয়সে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৬৩৯ খৃঃ)। কিন্তু পাছে ইহার শক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সাজাহান শায়েস্তা খাঁকে (নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র) বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে সাজাহানের এক কন্যার সর্ব্বাঙ্গ আগুনে পুড়িয়া যায়—গেব্রিয়েল বাউটন (Gabriel

Boughton) নামক এক ইংরেজ-ডাক্তার তাঁহাকে আরোগ্য করাতে পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট্ তাঁহার প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ইংরেজদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। বাউটন রাজমহলে আসিয়া সুজার সঙ্গে দেখা করেন; তখন রাজান্তঃপুরে এক মহিলা গুরুতররূপে পীড়িতা ছিলেন—বাউটন তাঁহাকেও আরোগ্য করেন। সুজা বাদশাহ ইংরেজ-জাতির উপর বিশেষ সদয় হন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে মিঃ ব্রিজম্যানকর্ত্তৃক বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয় (১৬৪০ খৃঃ)।

সুজা রাজমহলে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন, তিনি বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। রাজমহলকে তিনি প্রায় দিল্লীর মত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। মানসিংহকর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গগুলির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই নবনির্ম্মিত রাজধানীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন; কিন্তু বৎসর ঘুরিয়া যাইতে না যাইতেই এক ভীষণ অগ্নিদাহে নগরী দগ্ধ হইয়া যায়, এমন কি অতিকষ্টে বাদশাহের পরিবারবর্গ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পান। পরবৎসর আবার রাজধানীর কতক অংশ গঙ্গাগর্ভস্থ হয়, কিন্তু সুজা বাদশাহের প্রাসাদের কতকগুলি প্রকোষ্ঠ এখনও বিদ্যমান আছে।

সুজা মোটের উপর উন্নতমনা, ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন; দারার মত উদার ও মুক্তপ্রাণ ছিলেন না, তিনি কূটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রজারা তাঁহার শাসনকালে খুব সুখী ছিল। ১৬৩৯ হইতে ১৬৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল রাম রাজ্যের যুগ ছিল। তাঁহার প্রভাব বঙ্গদেশে বেশী হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া সাজাহান তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান, কিন্তু সুজা ইহাতে প্রীত হন নাই। এক বৎসর পরে তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় মসনদ অধিকার করেন। এই সময়ে সাজাহানের সঙ্কটাপন্ন রোগ হওয়াতে সুজা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া বাদশাহের সিংহাসনে তাঁহার দাবী প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারার সহিত তাঁহার চিরশত্রুতা ছিল, সুতরাং দারা সম্রাট্ হইলে যে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত—ইহাই আশঙ্কা করিয়া তিনি এই বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সাজাহান তাঁহাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি মরেন নাই, ভাল হইয়াছেন, কিন্তু সুজা প্রচার করিলেন সেগুলি সমস্ত জালচিঠি, দারা তৈরী করিয়াছেন। রাজকীয় সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার কাশীরের নিকটে সংঘর্ষ হয়। জয়সিংহ এবং দারার পুত্র সোলেমান সম্রাটের সৈন্যের নেতা ছিলেন। জয়সিংহ সুজার সঙ্গে সন্ধি করিলেন, কিন্তু তরুণবয়স্ক সোলেমান সেই সন্ধি অস্বীকার করিয়া অতর্কিতভাবে সুজার শিবির আক্রমণ করেন। বাহাদুরপুরের নিকটে যুদ্ধ হয়, সুজার বিশাল বাহিনী পরাস্ত হয়, সুজা পাটনা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরের দৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে, দারা পরাস্ত হইয়াছেন, সম্রাট্ বন্দী এবং আরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করিয়াছেন। সোলেমান বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন, এদিকে সুজা আরও শুনিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ সিংহাসনের দাবী করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সুজা পুনরায় এক মহতী বাহিনীর পুরোভাগে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদের

খুজগা নামক স্থানে এক মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সুজার দূরদর্শিতা এবং নির্ভীকত্ব সত্ত্বেও কার্য্য-তৎপরতার অভাব এবং আরঙ্গজেবের দৃঢ়সঙ্কল্পিত অদ্ভূত কর্ম্মশীলতা বিজয়লক্ষ্মীর গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। সুজার অনেক সুবিধা ছিল, বঙ্গদেশের সৈন্যেরা তাঁহাকে ভালবাসিত এবং তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে দাঁড়াইয়াছিল; তাঁহার হস্তী, অশ্ব ও ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না, এদিকে আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল না; এক সময়ে এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার সৈন্যের কতক অংশ সুজার সঙ্গে যোগদান করিবে কিনা, এই দ্বিধার ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্যতম প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। সুজা এসকল সংবাদ রাখিতেন কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার এই গুরুতর বিষয়গুলির প্রতি অবহিত থাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি অনায়াসে যশোবন্ত সিংহকে ও তৎসহ আরঙ্গজেবের সৈন্যের বহু অংশ স্বপক্ষে টানিয়া আনিতে পারিতেন—তাহা হইলে যুদ্ধের ফল অন্যরূপ হইত। এদিকে আরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজুম্লা অকুতোভয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে শত্রুশিবিরের প্রত্যেক কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন। যশোবন্ত সিংহের বিদ্রোহে অগণিত রাজপুত সৈন্য আরঙ্গজেবের বিপক্ষ হইয়া তাঁহার শিবির আক্রমণপূর্ব্বক লুটপাট করিতে লাগিল। সম্রাট্ প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু সুজা চোখ বুজিয়া এই সুবিধাগুলি হারাইলেন। যুদ্ধ অতি ভীষণ হইল, সুজার জয় একরূপ নিশ্চিত, এই সময়ে যখন তাঁহার ক্লান্ত হস্তীর উপর হইতে আরঙ্গজেব নামিয়া আসিতেছিলেন তখন মীরজুম্লার স্বর তাঁহার কাণে পৌঁছিল—"আরঙ্গজেব কি করিতেছ? তুমি তোমার সিংহাসন হইতে নামিতেছ।" চতুর সম্রাট্ তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ করিয়া সেই ক্লান্ত হস্তীর উপরই চাপিয়া বসিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে সুজা বাদশাহের প্রকাণ্ড হস্তীটা অবাধ্য হইয়া উঠিল। আরঙ্গজেবকে শুঁড় দিয়া ধরিয়া পিষিয়া মারিতে যতই মাহুত তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল, ততই সেই পশু গুলিগোলার শব্দে ও যুদ্ধের কলরবের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ঘামিতে লাগিল। সে এক পা অগ্রসর হইল না,—হইলে আরঙ্গজেবের জীবন শেষ হইত এবং সুজা বাদশাহই ভারতেশ্বর হইতেন। হস্তীর বল কে কাড়িয়া লইল, কে তাহার গতিরোধ করিল?—দৈব; সেই অকর্ম্মণ্য হস্তীর উপর হইতে সুজা নামিয়া অশ্বারোহণ করিলেন, এই তাঁহার কাল হইল। বহু পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধে পুরুরাজ (পোরাস্) হস্তীর উপর হইতে নামিয়া আসায় তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া তিনি হত এই মনে করিয়া তাঁহার বিশাল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে দারা হস্তী হইতে নামিয়া যাওয়াতে তদীয় সৈন্যেরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছিল। এবারও তাহাই হইল,—সৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতে লাগিল। কথিত আছে, মীরজুম্লার ঘুষে বশীভূত হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ নামক সুজার এক সেনাপতি তাঁহাকে হস্তী হইতে নামিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছিল। জনপ্রবাদ এই "সুজা জেৎ বাজি, আপনা হাত হারা" (সুজা বাজি জিতিয়া আপনার হাতে

হারিলেন)। সুজা মুঙ্গেরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন, মীরজুম্লা এবং আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এখানে সুজা পুনরায় যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন করিতেছিলেন এবং ছয়দিন পর্য্যন্ত মুঙ্গের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অবস্থা সুবিধাজনক না বুঝিয়া রাজমহলে চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে পরিবারবর্গ ও বিশ্বস্ত সৈন্যগণ ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার ভয়ানক দুর্য্যোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সম্রাটের বাহিনী তাঁহাকে আর অনুসরণ করিতে পারে নাই। এই সময়ে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের সঙ্গে সুজার এক কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব বহুদিন পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল। কন্যা বাগ্‌দত্তা ছিলেন। পিতার এই বিপদের সময়ে কন্যা রাজকুমার মহম্মদকে তাঁহার ভালবাসা এবং বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া যাঁহাকে তিনি মনে মনে স্বামিপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কায় অনেক মর্ম্মান্তিক দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। এই পরমসুন্দরী রূপসীর পত্র পাইয়া মহম্মদের সুচিরপোষিত ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। তিনি আরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সুজার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তিনি তাঁহার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীকে ত্যাগ করিবেন না, এই পণ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সুজা বাদশাহ নিরতিশয় সুখী হইয়া খুব ধুমধামের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। আরঙ্গজেব এই সময়ে এক অমোঘ চাতুরী খেলিয়া এই প্রীতির সম্বন্ধ ভেদ করিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদকে একখানি চিঠি লিখিলেন—যেন উহা রাজকুমারের পত্রের উত্তর। তাহাতে লিখিত ছিল, "তুমি যে অনুতপ্ত হইয়া আমাদের দরবারে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছ এবং ঈশ্বরের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিতেছ—এজন্য ক্ষমা পাইবে। আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুজা বাদশাহের শিবিরে বন্ধুভাবে যাইয়া তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিবে—কিন্তু দেখিতেছি তুমি রূপের জালে ধরা পড়িয়াছ এবং স্ত্রীর হাসিমুখ দেখিয়া কর্ত্তব্যের পথ ভুলিয়াছ।" পত্রখানি আরঙ্গজেব গোপনে পাঠাইলেন, কিন্তু যাহাতে সুজা বাদশাহের গুপ্তচরদের হাতে তাহা ধরা পড়ে এরূপ কৌশল ও ব্যবস্থা ছিল। যথাসময়ে পত্রখানি ধৃত হইয়া সুজার হাতে পড়িল, তাহাতে আরঙ্গজেবের রাজকীয় নীলমোহর ছিল এবং পত্রের ভাষা এরূপ সরল ও নিপুণ ছিল যে উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যুবরাজ মহম্মদ ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন, তিনি কোন পত্র তাঁহার পিতাকে লিখেন নাই,—এই তথাকথিত প্রত্যুত্তর পিতার চালবাজি মাত্র। কিন্তু কিছুতেই সুজার মনে আর জামাতার উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল না, তাঁহার অমাত্যগণও একবাক্যে বলিলেন এই পত্র জাল বলিয়া বোধ হয় না। সুজা জামাতাকে কোন শাস্তি দিলেন না। তাঁহাকে কন্যাসহ ধনরত্ন দিয়া স্বশিবির হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। কন্যা ও জামাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলে হতভাগ্য পুত্রকে ক্রূর ও নির্ম্মম পিতা বন্দী করিয়া সেলিমগড়ের দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ইহার মাসিক ব্যয় ১০০০৲

ধার্য্য হয়—কিন্তু পরে ইহাকে ২০,০০০ সেনার অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে ইনি কিস্তবারের রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ১৬৫০ খৃঃ অব্দে সুজা সুতি নামক স্থানে পুনরায় মীরজুম্লার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বহু বাঙ্গালী সৈন্য নিহত হয় এবং সুজা তাঁহার অবশিষ্ট ১,৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে বিদায় করিয়া চট্টগ্রামে পালাইয়া যান। এইখান হইতে তিনি আরবে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন মকায় যাপন করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সে বৎসর অত্যন্ত দুর্য্যোগ হওয়াতে আরব-যাত্রী একখানি জাহাজও পাওয়া যায় নাই। অগত্যা তিনি তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গ বিদায় দিয়া শুধু পরিবারবর্গ ও দাসদাসী সমেত আরাকানের দিকে যাত্রা করেন। ১৬৬১ খৃঃ নাফ্‌ নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্থলপথে আরাকানের সীমান্তে উপস্থিত হন। তাঁহার এক দূত পূর্ব্বেই তথাকার রাজাকে তাঁহার আগমনের কথা জানাইয়াছিল। রাজা তাঁহার এক প্রধান কর্ম্মচারী পাঠাইয়া সেই সীমান্তপ্রদেশ হইতে তাঁহাকে সংবৰ্দ্ধিত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসেন। সুজা আরাকানের রাজার আতিথ্যে কিছু কাল সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন। কিন্তু সহসা রাজার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। হয়ত বঙ্গের রাজ-প্রতিনিধির উৎকোচে বশীভূত হইয়া নতুবা কতকগুলি গুজবে বিশ্বাস করিয়া সুজার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং নানারূপে তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া এক কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, অবিলম্বে তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে চলিয়া যাউন। সুজা বলিলেন যে, সে সময়ে ঘোর বর্ষা, জাহাজ পাওয়া যাইবে না, যদি তিনি এই বর্ষা ঋতু পর্য্যন্ত সেখানে থাকার অনুমতি পান, তবে আরাকান-রাজের সৌজন্যের প্রতিদান ও মূল্য তিনি দিবেন। (তাঁহার হাতে তখন অনেক মণিমুক্তা ও ধনরত্ন ছিল।) আরাকানরাজ তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। তাইমুরের বংশীয় দিল্লীশ্বরের পরিবারের কন্যা বিধর্ম্মী মগ-রাজের হাতে দেওয়া—এত বড় একটা অপমানজনক প্রস্তাব সুজা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা তখন, সুজা আরাকান অধিকার করিবেন এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন—এই একটা অভিযোগ দিয়া সুজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। আমরা কবি আলোয়ালের লিখিত আত্মচরিত হইতে জানিতে পারি যে, কবি সুজার এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—মুজা নামক সাক্ষীর এই মিথ্যা অভিযোগে আরাকানরাজ তাঁহাকে সাতবৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। সুজা তাঁহার পরিবারবর্গ ও পরিকরদিগকে বলিলেন, "তোমরা ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া আরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হও। আমি এখানে নিহত হইলে আরঙ্গজেব খুব সম্ভব তোমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন।" কিন্তু তাঁহারা কেহই সুজাকে এই বিপৎকালে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় মোগল অগণিত আরাকানবাসীর বিরুদ্ধে কি করিবে? অনেকেই নিহত হইলেন, সুজা বাদশাহ ও তাঁহার পরিবারবর্গ আহত হইয়া ধৃত হইলেন। সুজার পরমসুন্দরী কন্যা পরীবানু, যিনি সঙ্গীতবিদ্যা, নর্ত্তন, চিত্রাঙ্কন ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মোগল অন্তঃপুরের সেরা রমণী ছিলেন, তাঁহাকে জোর করিয়া আরাকানরাজ বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইলেন।

রাজকুমারী বক্ষঃস্থিত ছুরিকা দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া নিজে আত্ম-হত্যা করিলেন। সাহ সুজাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইল। সুজার ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্র যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন, তাঁহার অপর দুই কন্যা রাজান্তঃপুরে বন্দী হইয়া আরাকান-রাজের ভোগতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন,—বেশীদিন এই অপমান সহ্য করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় সুজা-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। আরাকানের অরণ্যে ও রেঙ্গুনের সমুদ্রকূলে পরীবানু-সম্বন্ধে শত শত গান আছে—আমরা তাহাদের মধ্যে দুইটি মুদ্রিত করিয়াছি। গীতোক্ত কাহিনীর পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে অনেকটা ঐক্য হইলেও কিছু কিছু বিভিন্ন। আমরা তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দেওয়ান ইশা খাঁর পুত্র দেওয়ান মুসা খাঁ, মুসা খাঁর পুত্র মাচুম খাঁ (১৬৬৭ খৃঃ), মাচুম খাঁর পুত্র মন্থর খাঁ। মন্থর খাঁ ইশা খাঁর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। ইহার সম্বন্ধে আমরা একটি নাতিক্ষুদ্র গ্রাম্য-গাথা পাইয়াছি। এই গাথাটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ইহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া আমরা Eastern Bengal Ballads পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগের ভূমিকায় দিয়াছি। এই গীতিকায় সুজা বাদশাহ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা আমরা পাইয়াছি; মোটামুটি সেগুলি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি স্ত্রীলোকের সঙ্গ বেশী কামনা করিতেন এবং বিলাসী ছিলেন—ষ্টুয়ার্ট সাহেবের এই উক্তির সহিত গীতি-কথিত বর্ণনার বেশ সঙ্গতি আছে। ঢাকায় সম্ভ্রান্তবংশীয় নবাব-উপাধিধারী আমির আলী নামক এক জমিদার বাস করিতেন। "সোনাই" (চলিত নাম বলিয়া মনে হয়) নামে নবাব সাহেবের এক সুন্দরী কন্যা ছিলেন। সুজা বাদশাহ ইহাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন এবং কন্যাপণ দুইলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন। এসময়ে সুজা বাদশাহের শরীরটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মোটা হইয়াছিল। নবাব-নন্দিনী ইহাকে পছন্দ করেন নাই। ইহার মধ্যে কার্য্যগতিকে মন্থর খাঁ দেওয়ান ঢাকায় আসিয়া কোন উপলক্ষে সোনাইকে দেখিতে পান, তিনি সোনাইকে পাইতে জীবনপণ করিয়া বসেন। নর্ত্তকীর ছদ্মবেশে মন্থর খাঁ নবাবের অন্তঃপুরে ঢুকিয়া নাচিয়া গাহিয়া নবাব-নন্দিনীর মন হরণ করেন। নর্ত্তকী যে মন্থর খাঁ একথা জানিতে পারিয়া সোনাইও এই তরুণবয়স্ক সুন্দর যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হন। তাঁহার জননী দেওয়ানের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হন না। কোথায় সাহান শা সাজাহান বাদসার প্রিয় পুত্র বঙ্গেশ্বর সুজা বাদশা, আর কোথায় জঙ্গলবাড়ীর ক্ষুদ্র এক দেওয়ান। মাতা কন্যার ভাব বুঝিয়া বিশেষ বিরক্ত হন। কিন্তু মন্থর খাঁ কৌশলে সোনাইকে হস্তগত করিয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে বিবাহ করেন। আহত অভিমানে এবং নিজের মনোনীত পাত্রীকে তাঁহার অধীন এক সামন্ত-নেতা এইভাবে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া সুজা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠেন। তিনি নিজের সৈন্যসহ এবং মুরসিদাবাদের কতকগুলি লোককে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া মন্থর খাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ

ধাবিত হন। মনুর খাঁ উদ্ধশ্বাসে পলায়নব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া নদীর বক্র শাখা ধরিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র নৌবাহিনীর সহিত ছুটিতে থাকেন। ৩২ দাঁড়ি এক নৌকায় তিনি ঢাকার নিকট ভেমরা নামক স্থানে উপনীত হন। তথা হইতে বিশালতোয়া শীতলাক্ষার বক্ষে প্রধাবিত হন। এপর্য্যন্ত সোনাইকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহাকে লইয়া চলা নিরাপদ্ নহে বুঝিয়া স্ত্রীকে জঙ্গলবাড়ী পাঠাইয়া দেন। শীতলক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া দেওয়ান ক্যাটারা নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু সুজার অনুচরগণের গতি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া নারায়ণগঞ্জ আসেন। এই সংবাদ পাইয়া চল্লিশটি রণতরীর সহিত সুজা নারায়ণগঞ্জের দিকে ধাবিত হন। এবার মনুর খাঁ বরিশালে পলায়ন করেন। সুজা বরিশালের দিকে আসিতেছেন শুনিয়া দেওয়ান ঝালকাঠীতে উপস্থিত হন। ঝালকাটী হইতে খুলনা এবং তথা হইতে কেশবপুর—এই ভাবে অনুসৃত এবং অনুসরণ-কারীর সঙ্গে নৌকাদৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। কেশবপুর হইতে মনুর খাঁ আরও কয়েকটি স্থানে গমন করেন। এই অনুসরণ-ব্যাপারে সুজা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, কারণ প্রায় এক বৎসর কাল তিনি এইরূপ ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তাঁহার নৌবাহিনীর রসদ সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়িল, যেহেতু নিতান্ত দূর ও অতি ক্ষুদ্র পল্লীর নিকট দিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইয়াছিল। এবার তিনি ৫০টি মাত্র শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ বাছিয়া লইয়া দেহরক্ষী নিযুক্ত করিলেন এবং অপর সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু নবাবনন্দিনীর অপহরণে তিনি এরূপ নিদারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন যে, কিছুতেই তিনি মনুর খাঁর অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। এইবার দেওয়ান সন্দীপে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কোন ক্রমে এই সংবাদ পাইয়া হঠাৎ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তিনি তথায় মনুর খাঁকে আক্রমণ করেন। একেবারে নিরুপায় হইয়া মনুর খাঁ তথাকার এক মসজিদে আশ্রয় লইলেন। সুজা মসজিদের অবমাননা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো অনাহারে মারা যাইবে নচেৎ শত্রু আত্মসমর্পণ করিবে। অনেক দিন গত হইল, মসজিদে যে কেহ আছে এমন কোন চিহ্ন বাদশাহ পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন মনুর খাঁ না খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। এই বিশ্বাসে মসজিদের কবাট বলপূর্ব্বক খোলা হইল, কিন্তু একি দৃশ্য! উপবাসক্লিশ অথচ এক বীরমূর্ত্তি দরজার পাশ হইতে অসি লইয়া যুদ্ধ করিতে দাঁড়াইল। মনুর খাঁর প্রিয়দর্শন দেবরূপ দেখিয়া সুজা মুগ্ধ হইলেন। অথচ তাঁহার সিংহবিক্রমে কোন যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, পঞ্চাশজন সহচরের অনেকেই আহত হইয়াছে। তিনি সোনাইর স্বামিনির্ব্বাচনের কারণ ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষের দ্বারা মনুর খাঁকে আলিঙ্গন করিয়া সদ্ভাবের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। উভয়ে মিলিত হইয়া চট্টগ্রামের রাজা রহনগামের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মনুর খাঁর বিক্রম ও কৌশলে উক্ত রাজা নিহত হইলেন; তখন সুজা বাদশাহ তাঁহার নব বন্ধুবরের সহিত রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন পাইলেন। নানাদিক্ হইতে বহু মুসলমান আনাইয়া তথায় বাসস্থান নিরূপিত করিয়া তাঁহাদিগকে লাখেরাজ দিলেন। লুণ্ঠিত ধনরত্নের এক

ভাগ মন্থর খাঁ পাইলেন ; ধনরত্নে বোঝাই দুই নৌকা জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরিত হইল। ইহার পর সাহ সুজা রাজমহলে এবং মন্থর খাঁ জঙ্গলবাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গীতিকারক লিখিয়াছেন, "এইবার সুজা বাদশাহের জীবনের এক নূতন অধ্যায় দুঃখের মধ্য দিয়া আরম্ভ হইল" ; ইতিহাস-লেখকেরা তাহা সকলেই জানেন।

ত্রিপুরার রাজমালায় পাওয়া যায়, এই সময়ে ছত্র মাণিক্যের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আরাকান রাজ সুধর্ম্মা এবং গোবিন্দ মাণিক্য দুই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে সুজা উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসন ছাড়িয়া তাঁহাকে সেই সিংহাসনে বসাইলেন। রাজা সুধর্ম্মা গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই বিদেশীকে এতটা সম্মান দেখাইলেন কেন ? উত্তরে গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, "আমার ও আপনার মত ইহার অনেক সামন্ত রাজা আছে।"

পথে গোবিন্দ মাণিক্যকে সুজা বলিলেন—"আপনি এই দেশী রাজার সভায় আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমার এখন আর কি আছে, যাহা এই বন্ধুত্বের প্রতিদানস্বরূপ দিতে পারি ?" এই বলিয়া তাঁহার কোষ হইতে বহুমূল্য হীরকখচিত একটি ছুরিকা ও একটি মূল্যবান্ হীরকাঙ্গুরীয় তাঁহাকে বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ প্রদান করিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজ্য পুনর্ব্বার লাভ করিয়া কুমিল্লাতে সেই অঙ্গুরীয়টির বিক্রয়-লব্ধ টাকাতে সুজার নামে এক মসজিদ স্থাপন করিয়া তাহার উপস্বত্ব ঐ মসজিদে প্রদান করেন। কুমিল্লায় এখনও সেই মসজিদ বিদ্যমান এবং সুজানগরের উপস্বত্ব এখনও মসজিদের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

এই পল্লীগীতিকার একটিতে সুজা বাদশাহের সহিত আরাকান-রাজের (সুধর্ম্মার যে সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া আছে—তাহা ষ্টুয়ার্টপ্রদত্ত বিবরণের সহিত রেখায় রেখায় মিলিয়া যায় না। পল্লীগাথায় দৃষ্ট হয়—সুজা আরাকান-রাজ সুধর্ম্মার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। সুজা আরাকান রাজ্য দখল করিবার উদ্দেশ্যে রাজকন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার অছিলায় ৪০খানি পাল্কী রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেন। এই পাল্কীগুলির প্রত্যেকখানিতে দুইজন করিয়া সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। রাজাকে অন্তঃপুরে নিহত করা ইহাদের অভিপ্রায় ছিল। ছয় দেউড়ী পার হইয়া যখন পাল্কীগুলি সপ্তম দেউড়ীতে পৌঁছিল, তখন তথাকার প্রধান দ্বাররক্ষকের মনে সন্দেহ হইল, এত পাল্কী অন্তঃপুরের ভিতর যায় কেন ? ফলে সন্ধান আরম্ভ হওয়াতে যোদ্ধবর্গ বাহির হইল। তাহাদের সঙ্গে দ্বাররক্ষক ও রাজার সৈন্যের ছোটখাট যুদ্ধ হইল। সুজার লোকেরা নিহত হইল এবং সুজা স্বয়ং ধৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিহত হইলেন। এই বিবরণটি বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুজা বিপদে পড়িয়া যাঁহার আতিথ্য লাভ করিয়া প্রাণ পাইয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে হীন ষড়যন্ত্র করিবেন এরূপ মনে হয় না ; বরং ষ্টুয়ার্টের উক্তির সহিত সুজাতনয়া পরীবানুর যে সকল বারমাসী প্রচলিত আছে—তাহার সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হয়। আরাকানের নিকটে সমুদ্রতটে চট্টগ্রামের পূর্ব্বে সুজা ও পরীবানুসম্বন্ধে

অনেক গাথা প্রচলিত আছে। কৈলাস সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় এই গাথাগুলির অস্তিত্বের কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার দুইটি প্রকাশিত করিয়াছি। সুধর্ম্মার কন্যাকে যে সুজা বাদশাহ বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথা তাহাতে নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। এই গাথা দুইটিতে দৃষ্ট হয়—(১) সুজা ও তাঁহার পত্নী সমুদ্রে পড়িয়া মারা যান, (২) তাঁহাদের সঙ্গে বহুমূল্য ধন ও মণিমুক্তা ছিল, তাহা আরাকান-রাজ লুণ্ঠন করেন, (৩) পরীবানু সুধর্ম্মার অন্তঃপুরে নীত হন, "নাপ্পী" খাইতে যাইয়া তাঁহার ঘৃণায় সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া যায়, সোণার "নাধং" কাণে পরাইতে যাইয়া দশজন সহচরী তাঁহাকে জ্বালাতন করে, (৪) ব্রহ্মদেশের পোষাক তাঁহার অসহ্য হয়, তিনি তাঁহাদের পাচিকার রান্না খাইতে স্বীকৃত হন না। এই গীতিকায় ব্রহ্মদেশবাসীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। কিন্তু মূলতঃ এগুলি বড়ই করুণ, পরীবানুর দুঃখে আর্দ্র হইয়া গ্রাম্য কবিরা উহা রচনা করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্টের বিবরণ অনুসারে পরীবানু সুধর্ম্মাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজে আত্মঘাতী হন। এই গাথা দুইটিতে তাঁহার মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐরূপ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ষ্টুয়ার্ট মুসলমানদিগের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন—সুজা চট্টগ্রাম হইতে স্থলপথে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু বার্ণিয়ার বলেন, তিনি একখানি জাহাজে আরাকান গিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্টের কথাই সত্য। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ লুইন, যে স্থানটিতে আরাকান-রাজের প্রতিনিধি সুজাকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন। উহা নাফ নদীর তীরে। সুজার মৃত্যুর বহু পরেও আরঙ্গজেব তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া অনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। কেহ কেহ বলিত, সুজা কনষ্টান্টিনোপলে গিয়াছেন, তথা হইতে বহু সৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিবেন। সম্রাট্ কখনও শুনিতেন, সুজা পারস্যদেশ পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আর একটি জনরব রটিয়াছিল যে, সুজা পেগু এবং শ্যাম-দেশের রাজাদের দত্ত দুইটি সশস্ত্র সৈনিকপূর্ণ বৃহৎ রণতরী লইয়া রওনা হইয়াছেন; তাঁহার জাহাজের নিশান রক্তবর্ণ।

কিন্তু কয়েক দিন পরে তাঁহার পুত্রকন্যাসহ সমূলে নিধনের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বন্দী সাজাহান রাজা এই সংবাদ শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিয়াছিলেন, "হতভাগ্যের একটি বংশধরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না যে, সেই বর্ব্বর রাজাটার প্রতিশোধ লইতে পারিত।"

মীরজুমলা—১৬৬১-১৬৬৪ খৃঃ

ইনি পারস্যবাসী ছিলেন। ইনি তেলিঙ্গনার (দাক্ষিণাত্যে) রাজার অধীনে সেনানায়ক হইয়া গোলকুণ্ডার খনিলব্ধ বহু অর্থের মালিক হন। কিন্তু ইঁহার পুত্র মীর মহম্মদ আমীন অহঙ্কৃত ও মদ্যপায়ী হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। কথিত আছে মদ খাইয়া একদিন তিনি রাজার শয্যায় শুইয়াছিলেন। নানারূপ দুর্ঘটনার পর মীরজুমলা আরঙ্গজেবের আশ্রয় লাভ করেন। সুজা বাদশাহের পর ইনিই বাঙ্গলার গদি অধিকার করেন। ইঁহার সময়কার

প্রধান ঘটনা—কুচবিহার-রাজ বিষ্ণুনারায়ণের সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইনি আরঙ্গজেবের অতি বিশ্বস্ত ওমরা ছিলেন।

সায়েস্তা খাঁ—১৬৬৪-১৬৭৭ খৃঃ (প্রথম বার)

আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ এবং মগদিগের দৌরাত্ম্য-নিবারণ ইঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। ইঁহার সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাণিজ্যের জন্য ইঁহাদের কোন কর দিতে হইত না। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ মাঝে মাঝে ইংরেজদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দের ৭ই মে তারিখের এক পত্রে মাদ্রাজের গভর্নর সায়েস্তা খাঁর নিকট কয়েকটি অভিযোগ করেন—(১) ইংরেজদের নিকট হইতে হিন্দু প্রজাদের মত বাণিজ্যকর লওয়া হইতেছে। (২) আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বলপূর্ব্বক ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য লওয়া হইতেছে, (৩) রাজ-কর্ম্মচারীরা অশেষরূপ নির্য্যাতন করিয়া ইংরেজ বণিক্‌দের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেছে। গভর্নর সাহেব উপসংহারে ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিলেন, "যদি এই সকল অত্যাচার নিবারিত না হয়, তবে তাঁহারা বাঙ্গলা হইতে সমস্ত ব্যবসায় তুলিয়া চলিয়া যাইবেন" (threatening if the English are not better treated, they will entirely withdraw from Bengal.—Stewart, p. 332).

ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ—১৬৭৭-১৬৭৮ খৃঃ

রাজকুমার সুলতান মহম্মদ আজিম—১৬৭৮-১৬৭৯ খৃঃ

রাজা যশোবন্ত সিংহের শিশুসন্তানদিগকে নানা ছলে যোধপুরের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, হিন্দুদের অসম্ভবরূপ করবৃদ্ধি, হিন্দুবিগ্রহ ও মন্দির ভঙ্গ করা প্রভৃতি কারণে সমস্ত রাজপুতনা আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন সম্রাট্ শিবাজিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এই সময়ে রাজকুমার আজিম বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার অপর লোকের হাতে ন্যস্ত করিয়া ঢাকা হইতে এক বিপুল সৈন্যদল লইয়া রাজপুতনার দিকে অভিযান করেন, সঙ্গে তাঁহার নয়বৎসরবয়স্ক পুত্র বেদার বক্ত ছিলেন। প্রায় ৫০ দিনে তিনি যোধপুরের নিকটবর্ত্তী হন। শেষের একদিন তিনি ৭০ ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই অভিযান ও শিশুকুমারের সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। আরঙ্গজেব রাজকুমারকে রাজপুতনার বিরুদ্ধে যে বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তাহার সেনাপতিত্ব প্রদান করেন।

সায়েস্তা খাঁ—১৬৭৯-১৬৮৯ খৃঃ (দ্বিতীয় বার)

ইংরেজ বাণিজ্যের এই সময়ে অনেকটা অবস্থান্তর হয়। ইংরেজেরা নবাবের কর্ম্মচারীদের দ্বারা নানারূপে উত্যক্ত হইয়া বিলাতে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী হইতে মিঃ গাইফোর্ড সায়েস্তা খাঁকে সমস্ত অভিযোগ নিবেদন করিয়া কতকগুলি প্রার্থনা করেন, তন্মধ্যে গঙ্গার উপকূলে একটি দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতির প্রার্থনা ছিল।

সায়েস্তা খাঁ উহা মঞ্জুর করেন নাই। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্স—এ্যাড্মিরাল নিকলসনের অধীনে এক রণতরী পাঠাইবার আজ্ঞা দেন, উদ্দেশ্য ছিল,—আরাকানের রাজা ও অসন্তুষ্ট হিন্দুপ্রজাদের সহিত যোগ দিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আরঙ্গজেবের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর প্রচলন করেন এবং তাঁহাদের অনেক দেবমন্দির ভগ্ন করেন, এজন্য হিন্দুরা একান্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে চারনক সাহেবের নেতৃত্বে কিছু কিছু যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ইংরেজেরা প্রথমতঃ সুতানুটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু মোগলসৈন্যকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া উলুবেড়িয়া ও তৎপরে ইঞ্জিলি নামক গঙ্গার এক উপদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি আব্দুল সমাদ খাঁ মিঃ চারনককে এই উপদ্বীপ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি জানিতেন সেখানকার জলবায়ু এত খারাপ যে আবহাওয়াই তাঁহার শত্রুপক্ষের ধ্বংসসাধন করিবে। ফলে তাহাই হইল। অর্দ্ধেকের উপরে ইংরেজ সৈন্য তিনমাসের মধ্যে কালাজ্বরে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে আরাকানের রাজার সঙ্গে প্রস্তাবিত সন্ধি ব্যর্থ হইল। ক্রমাগত ইংরেজেরা তাঁহার আদেশ অমান্য করায় আরঙ্গজেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ তিনি যখন জানিতে পারিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার বদ্ধ শত্রু শম্ভুজির সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি বিষম উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগের মুসলিপত্তনের বিস্তৃত কারবারগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তথাকার সমস্ত ইংরেজকে হত্যা করিলেন, ইহা ছাড়া ভিজগাপট্টমের তাঁহাদের দোকান-পাট এবং কারবারগৃহ লুণ্ঠিত হইল। সায়েস্তা খাঁ সম্রাটের আদেশে ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। আরঙ্গজেব আদেশ করিয়াছিলেন—ইংরেজদিগকে তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র সমূলে ধ্বংস করিতে।

সায়েস্তা খাঁর সময়ে বিহারের জমিদার গঙ্গারাম বিদ্রোহী হইয়া পাটনা অঞ্চলে অনেক লুটপাট করেন। সায়েস্তা খাঁর নির্ম্মিত অনেকগুলি হর্ম্ম্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও ঢাকায় দৃষ্ট হয়।

নওয়াব ইব্রাহিম খাঁ—১৬৮৯-১৬৯৭ খৃঃ

ইব্রাহিম খাঁর সময়ে সম্রাট্ আরঙ্গজেব ইংরেজদের প্রতি কিছুকালের জন্য প্রসন্ন হইয়াছিলেন, যেহেতু ইংরেজদের বাণিজ্য দ্বারা রাজকোষে একটা আয় হইত, তাহা ছাড়া ইংরেজদের রণতরীর মক্কাযাত্রীদের উপর উৎপাত করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রসন্নতার ফলে ইব্রাহিম খাঁ মাদ্রাজ হইতে চারনক সাহেবকে এদেশে আসিয়া পুনরায় বাণিজ্যাদি করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা মাত্র বৎসর ৩০,০০০৲ টাকা দিবেন—তাঁহাদিগকে বাণিজ্যের জন্য আর কোন শুল্ক দিতে হইবে না এই প্রস্তাব হইল। কিন্তু ইংরেজেরা এসম্বন্ধে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন। যেহেতু একটা দুর্গ না হইলে তাঁহারা কিছুতেই নিজদিগকে নিরাপদ্ মনে করেন নাই। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা এই অনুমতি পান নাই। এবার আকস্মিকভাবে একটা সুযোগ ঘটিল। শোভাসিংহ নামক বর্দ্ধমানের এক জমিদার

বর্দ্ধমান-রাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বহু সৈন্ত সংগ্রহ করেন। সেই নির্ব্বাপিত পাঠানবহ্নি যাহা একেবারে নিরস্ত হইয়া গিয়াছিল—তাহার একটা স্ফুলিঙ্গ তখনও দেশের এক কোণায় ছিল। পাঠান-শক্তির এই শেষ দীপটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। রহিম সেখ পুনরায় বঙ্গে মোগলশক্তি বিলোপ করিয়া পাঠান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়া শোভাসিংহের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইহারা বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। কৃষ্ণরামের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন, শোভা সিংহ তাঁহার বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাওয়ায় রাজকুমারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ পাঠানদের সহযোগে দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সৈন্তসামন্তেরা একবাক্যে রহিমকে তাহাদের নেতৃত্বে বরণ করিল। রহিম অপ্রতিহত গতিতে মালদহ হইতে রাজমহল এবং মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান দখল করিয়া লইলেন। শেষোক্ত স্থানে নিয়ামৎ খাঁ নামক এক জমিদার তাঁহাকে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু রহিম তাঁহাকে নিহত করিয়া বিলাতের লোকেরা বাণিজ্য দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন জানিয়া সুতানুটি, চুঁচুড়া এবং চন্দননগর লুটপাট করিলেন। সাহেবেরা ইহাকে বিশেষরূপে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং এই সুযোগে তাঁহাদের কারবারখানার দুর্গগুলি দিনরাত লোক খাটাইয়া খুব সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। এদিকে কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন, অলসপ্রকৃতি নবাব যশোরের কৌজদার নুরউল্লাকে একটা হুকুম দিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। নুরউল্লা অর্থসংগ্রহে যেরূপ পটু, সামরিক ব্যাপারে তদ্রূপ ছিলেন না। তিনি তিন হাজার সৈন্ত লইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহীদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া গেল। ইব্রাহিম খাঁর কর্ণে চতুর্দ্দিক্ হইতে সংবাদ পৌছিতে লাগিল, তিনি উপেক্ষার ভাবে তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁ এবং মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "এসকল ঘরাও যুদ্ধ ভাল নহে, ইহাতে বলক্ষয় হয় মাত্র। করুক না কেন—পাঠানেরা কিই বা করিবে? এর পরে আপনা হইতেই নিরস্ত হইয়া যাইবে। কিছু রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে এই মাত্র।" এদিকে তখন সমস্ত বাঙ্গলা দেশটা পুনরায় পাঠানদের প্রায় দখলে আসিয়াছে। আরঙ্গজেব এই বৃত্তান্ত প্রথম শুনিয়া বিষম বিচলিত হইলেন এবং তখনই তাঁহার পৌত্র কুমার আজিম ওস্মানকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার গদিতে অভিষিক্ত করিয়া এবং নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়া বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত করিলেন।

সুলতান আজিম ওস্মান—১৬৯৭-১৭০৭ খৃঃ

জবরদস্ত খাঁ ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন। রাজমহলের যুদ্ধে রহিম খাঁর সেনাপতি খিরেট খাঁ নিহত হন। জবরদস্ত খাঁ ইংরেজ ও ডাচ্‌দিগের কারবার-গৃহগুলি উদ্ধার করেন, কিন্তু পাঠানদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করেন। এই সময়ে মুরসিদকুলি খাঁ নামক এক প্রতিভাপর ব্যক্তিকে আরঙ্গজেব রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা 'দেওয়ান' করিয়া পাঠান। মুরসিদকুলি খাঁ যৌবনে মুসলমানদের হাতে পড়িয়া হাজি সুফিয়া নামে

ইসপাহানে নীত হন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মুসলমান করা হইয়াছিল। তখন ইহার নাম হইয়াছিল মহম্মদ হাদি। ইনি প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদে কাজ করেন, তখন নাম হয় জাফর খাঁ। হায়দ্রাবাদে ইনি আরঙ্গজেবের সুনজরে পড়িয়া দেওয়ান হন, তখনকার নাম করতলব খাঁ। বঙ্গের দেওয়ান হইয়া ইহার নাম মুরসিদকুলি খাঁ হইল। ইনি বাঙ্গলার তৎকালীন রাজস্ব-বিভাগের গোলমাল মিটাইয়া সেরেস্তা পর্য্যন্ত দুরস্ত করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রিয়, এজন্য সুলতান ইহাকে ঈর্ষা করিতেন। কিন্তু যতবার ইহার সহিত আজিম ওস্মানের সংঘর্ষ হইয়াছে, ততবার সম্রাট্ রাজকুমারকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিয়াছেন। সুতরাং সুলতান ইহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। জবরদস্ত খাঁ পাঠানদিগকে পরাস্ত করার পর সুলতানের সহিত দেখা করিতে যান, কিন্তু আজিম ওস্মান তাঁহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া উপেক্ষার ভাব দেখান। জবরদস্ত খাঁ পদত্যাগ করেন। পাঠানেরা আবার মাথা জাগাইয়া লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। সুলতানের সহিত শেষ যুদ্ধে পাঠানেরা জয়ী হওয়ার মধ্যে আসিয়াছিল, এবং আজিম ওস্মানেরও মৃত্যু প্রায় অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু হামিদ খাঁ নামক মোগল পক্ষের এক আরব হঠাৎ বিদ্রোহি-নেতা রহিম সেককে নিহত করায় পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

ইংরেজরা মিঃ ওয়ালসের দ্বারা সুলতানের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন করিয়া পাঠান, তাঁহারা কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি স্থানসম্বন্ধে নানারূপ সুবিধা প্রার্থনা করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকেন। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে একটা অবস্থান্তর হয়। ১৬৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়াম আরঙ্গজেবের নিকট উইলিয়াম নরিস্ নামক এক রাজদূত প্রেরণ করেন—ইনি বহু কষ্টে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিয়া ইংরেজদের পক্ষে অনেকটা সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে সংবাদ আসিল যে তিনখানি মোগলা জাহাজ মক্কাযাত্রীদিগকে ফিরাইয়া দেশে লইয়া আসিতেছিল, ইংরেজ দস্যুরা তাহা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছে। সম্রাটের ক্রোধ দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রাজদূতকে ("He must know his way back to England." - Stewart, p. 382.) ইংলণ্ডের পথ চিনিয়া বাড়ী যাইবার হুকুম দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ দস্যু আর জলপথে মক্কাযাত্রীদের উপর দৌরাত্ম্য করিবে না—তবে তিনি তাঁহার বিষয়টি সুবিবেচনা করিবেন এবং এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াও তিনি অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন, কিন্তু রাজদূত এরূপ দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না। ইংরেজ দস্যুদের উৎপাত জলপথে ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সম্রাট্ হুকুম দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যত য়ুরোপবাসী আছে তাহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

মুরসিদকুলি খাঁকে সুলতান ষড়যন্ত্র করিয়া রাস্তায় হত্যা করিবার জন্য আবদুল বাহিয়া নামক এক গুণ্ডাকে নিযুক্ত করেন। মুরসিদকুলি দেওয়ান হইয়া সমস্ত রাজস্ব-বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। সম্রাট্প্রদত্ত ক্ষমতার বলে জমিদারগণ তাঁহার

আদেশ অমান্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাদের দেয় রাজস্ব অনেকগুণে বাড়াইয়া সম্রাটের অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন, রাজকুমার স্থলতান আজিম ওস্মানের আদেশ মান্ত না করিয়া দেওয়ানকে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলিতেন। এই কারণে এবং ঈর্ষার বশীভূত হইয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, মুরসিদকুলির উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের জন্ম সেই অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল; বরং মুরসিদকুলি সর্ব্বসমক্ষে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া তাঁহার সহিত সম্মুখদ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করিলেন। কুমার ভয় পাইয়া অনেকরূপে নিজদোষ গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন। আরঙ্গজেব এই ঘটনা জানিতে পারিয়া পৌত্রকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভৎ'সনা করিয়া এবং নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন, বাঙ্গলা ছাড়িয়া তাঁহাকে বিহারে থাকিতে আদেশ দিলেন। মুরসিদকুলি রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া—স্থলতানের বিনা অনুমতিতে ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদ চলিয়া আসিলেন।

সম্রাটের আদেশ অনুসারে রাজমহলে বহু ইংরেজ বন্দী হইলেন। ৫১ দিন তাঁহারা কারাবাস করিয়াছিলেন, মুরসিদ কুলির কড়া অনুশাসনে হুগলীতে তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িলেন। স্থজা-দত্ত মূল সনদ তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, স্থতরাং ইংরেজেরা দেওয়ান সাহেবের সেক্রেটারীকে অনেক উৎকোচ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এদেশের কারবার একেবারেই উঠিয়া যাইত, কিন্তু স্থলতান আজিম ওস্মান তাঁহাদের প্রতি সদয় ছিলেন, এবং মুরসিদকুলিও তাঁহার কড়া শাসন একটু শিথিল করিলেন। স্থলতান রাজমহলে বন্দী ইংরেজদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আসিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্য আবার বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুই দলের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়া যাওয়াতে এবং মাদ্রাজের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্যুত হওয়াতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইল। কোম্পানির দুইদল একত্র হইলেন এবং তাঁহাদের সঞ্চিত বহু অর্থ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে মজুত রহিল।

এই সময়ে (১৭০৭ খৃষ্টাব্দে) আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তিনি মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্য তিন ভাগ করিয়া তিন পুত্রকে দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা মান্ত না করিয়া ঝগড়া করিতে লাগিলেন। আজিম সাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন; বঙ্গের মসনদ ত্যাগ করিয়া আজিম ওস্মান সিংহাসনের দাবী করিয়া অগ্রসর হইলেন। আগ্রার শাসনকর্ত্তা আজিম সাহের শ্বশুর আজিম ওস্মানের গতিরোধ করিলেন এবং আজিম সাহ বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এককোটি টাকা রাজস্ব দখল করিয়া শাসনকর্ত্তাকে পরাভূত করিয়া বন্দী করিলেন। তাঁহার নিজ তহবিলে এক কোটী টাকা ছিল। এই বিপুল অর্থে তিনি অসংখ্য সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া আগ্রার নিকটে জাজু নামক স্থানে আজিম সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে আজিম সাহ ও তাঁহার দুই পুত্র বেদার বক্ত এবং বালুঝা নিহত হইলেন (১৭০৭ খৃঃ)। আজিম ওস্মানের পিতা মহম্মদ মজিয়াম "সাহ আলম" উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। আজিম ওস্মান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সাহ আলমের মস্তিষ্ক খারাপ হওয়াতে সাম্রাজ্যের ভার অনেকটা আজিম ওস্মানের

উপর পড়িল। ১৭১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। আজিম ওস্মানের ব্যবহারে আমির উল ওমরা প্রভৃতি মন্ত্রীরা চটিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার তিন ভ্রাতা ময়জদ্দিন, জিনসাহ এবং রাফী হুসেনের সঙ্গে যোগ দিলেন। আবার সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিল। ভীষণ আহবে আজিম ওস্মানের আহত হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া রবি নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে আজিম ওস্মানের জীবনলীলা শেষ হইল। ময়জদ্দিন "জাহান্দার সাহ" উপাধি লইয়া আগ্রার তক্তে বসিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ—১৭০৭-১৭২৫ খৃঃ

১৭০৭ খৃঃ অব্দের অনেক পূর্ব্ব হইতে মুরসিদকুলি খাঁ বাঙ্গলার একরূপ কর্ত্তা ছিলেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজিম ওস্মান আগ্রার যুদ্ধবিগ্রহ এবং তৎপরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নামে মাত্র সুলতান হইয়া এদিকে বেশী মনোযোগ দিতে পারেন নাই, মুরসিদকুলিই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আজিম ওস্মানের মৃত্যু হইলে মুরসিদকুলিই নবাব হন। তিনি মুরসিদাবাদ রাজধানীই তাঁহার স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত করেন। ভূপতি রায় এবং কেশরী রায় নামক দুইটি ব্রাহ্মণ যুবককে (সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মীয়) তাঁহার বিশ্বস্ত সহকারিস্বরূপ নিযুক্ত করেন। তিনি হিন্দু-জমিদারদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন। ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে হিন্দু জমিদারদিগকে হয়রান করিয়াছিলেন। এখন নবাব হইয়া তাঁহাদের জমিজমা একরূপ কাড়িয়া লইলেন। সমস্ত জমির মাপ হইল। প্রজার সঙ্গে কোন সম্পর্কই জমিদারের রহিল না, নবাব সরকারের লোকেরা রাজস্ব প্রজাদের হাত হইতে আদায় করিতে লাগিল, যাহা কিছু সামান্য জমি তাঁহাদের রহিল, ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া তাহার উপস্বত্ব ভোগ করার অধিকার লুপ্ত করা হইল। রাজকর্ম্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদিগকে লাঞ্ছনা ও কষ্টজনক চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। এই জাতীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন নাজির আহম্মদ ও রেজা খাঁ। নাজির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কখনও তাঁহাদিগকে পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া, কখনও বা কোঁড়া প্রহারে নির্য্যাতন করিতেন। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে খাড়া করিয়া রাখা এবং শীতকালে শীতল জলে নিমজ্জন প্রভৃতির কথাও শোনা যায়। তিনি পুরীষাদিপূর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন "বৈকুণ্ঠ" এবং উহাতে জমিদারদিগকে নিমজ্জিত করা হইত—সেই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদাই কম্পান্বিত থাকিতেন। (যশোর খুলনার ইতিহাস, ৫৮১ পৃঃ)। মুরসিদকুলি খাঁ হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াও রাজভাণ্ডার বাড়াইয়াছিলেন, এজন্য রাজসভায় তাঁহার এত প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি হিন্দুদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেন বলিয়াই বোধ হয় আরঙ্গজেবের তিনি এত প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন যে খুব কড়া ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিবার দরুন তিনি স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দুদিগের প্রতি কিরূপ সদ্বিচার করা হইত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

চুনাখালির জমিদার বৃন্দাবনের নিকট এক মুসলমান ফকির সাহায্য চাহিতে আসে। ইহার ব্যবহার অত্যন্ত গর্ব্বিত ও বিরক্তিকর দেখিয়া জমিদার তাহাকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিয়া একটা ছোট মসজিদের মত ঘর তৈরী করে। বৃন্দাবনের বাড়ীর কাছে এই কাণ্ডটা করে। ঐখানে দাঁড়াইয়া ফকির বিকট চীৎকার করিয়া লোকজনকে নমাজ পড়িতে আহ্বান করিত। বৃন্দাবন ঐ পথে যাইবার সময়ই ফকির বিশেষ করিয়া ঐরূপ চীৎকার করিত। বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবন খান-কয়েক ইট ফেলিয়া দিয়া ঐ ফকিরকে তাড়াইয়া দেন। ফকির মুরসিদকুলি খাঁর নিকট নালিশ করে। কাজি মহম্মদ শরীফ্ এবং অপর একজন আইনজ্ঞ মুসলমান বিচারক এই মোকদ্দমার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। কাজি মহম্মদ শরীফ্ প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া স্বহস্তে বৃন্দাবনকে বধ করেন। সদয়হৃদয় মুরসিদকুলি নাকি বৃন্দাবনের পক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজি ফকিরের প্রতি এত বড় গর্হিত অত্যাচারের মার্জ্জনা করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত শত শত স্বর্ণমণ্ডিত দেব-মন্দির ভাঙ্গা যাহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল, তাহাদের মসজিদ-নামধেয় ইষ্টক-স্তূপের একখানি ইট সরাইলে সে অপরাধের মার্জ্জনা ছিল না। স্বয়ং আজিম ওশ্মান যখন এই সংবাদটা আরঙ্গজেবের নিকট জানাইলেন, তখন আরঙ্গজেব লিখিলেন, "কাজি যাহা করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত।" যখন এই কাজি শরীফ্ বার্দ্ধক্যের জন্ম অবসর প্রার্থনা করিলেন, তখন এই সদ্বিচারককে রাখিবার জন্ম সরকার হইতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজা সীতারাম রায়

মুরসিদকুলি খাঁর রাজত্বের প্রধান ঘটনা—সীতারামের অভ্যুদয় ও পতন। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ রামদাস খাঁ গজদানী বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইহারা কায়স্থ দাস, কাশ্যপগোত্রীয়। রামদাস খাঁ এত বড় লোক ছিলেন যে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে স্বয়ং রাজা গণেশ ও বহু উপস্থিত হইয়াছিলেন। কান্দী মহকুমার কুলিয়া গ্রামে ইহার বাস ছিল। তথায় ইহার নির্ম্মিত দীঘি ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। অনন্তরাম এই রামদাসের পুত্র। অনন্তরামের দুই পুত্রের মধ্যে সীতারাম ধরাধরের ধারায় জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তরাম হইতে ষষ্ঠস্থানীয় হিমকর দাসের পুত্র শ্রীরামদাস মুসলমান সরকার হইতে "খাঁ বিশ্বাস" উপাধি প্রাপ্ত হন

সীতারাম "খাঁ বিশ্বাস" মহাশয়ের প্রপৌত্র ও উদয়নারায়ণের পুত্র। ইঁহারা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামদাস গজদানীর পর হইতে ইঁহাদের অবস্থার কতকটা অবনতি হইয়াছিল। সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্দ্র মোগল সরকারে কাজ করিয়া "রায় রাঁয়া" উপাধি লাভ করেন, তখন হইতে আবার এই পরিবারের অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়।

বার ভুঞার অন্যতম ভূষণার রাজা মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র সত্রাজিতের মোগলদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নিহত হওয়ার কথা আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। সত্রাজিতের মৃত্যুর পর উক্ত পরগনা তথাকার ফৌজদারের হাতে পড়ে। তখন মোগল সরকারের এক বিশ্বস্ত ক্ষত্রিয় সেনাপতি সংগ্রামসিংহ ভূষণার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া রাজানুগ্রহে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি জোর করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য-সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাঁহাদের পুত্র-কন্যা ইনি জোর করিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা "হাম বৈদ্য" নামক এক পৃথক্ থাক হইয়া বৈদ্যসমাজে কলঙ্কলাঞ্ছিত হইয়া আছেন।* মোগল সরকারে উদয়নারায়ণের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি ভূষণার কতকাংশ জমা লইয়া তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে তেমন কেহ ছিলেন না। এখনও নালিয়া, মথুরাপুরী প্রভৃতি স্থানে সংগ্রাম-সিংহের অনেক মন্দির দৃষ্ট হয়। এই সময়ে মগ, পাঠান ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের দ্বারা ভূষণা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অনুমান ১৬৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে উদয়নারায়ণের ঔরসে দয়াময়ীর গর্ভে সীতারামের জন্ম হয়।

উদয়নারায়ণ তহসিলদারের কার্য্য করিতেন, সীতারাম বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া খেলা শিক্ষা করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। প্রতিভা চাপা থাকে না। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইল। তখন ভূষণা পরগনায় একদিকে মগদস্যু, অপরদিকে পাঠানবিদ্রোহী সীতারামের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ প্রীত হইয়া সীতারামকে ভূষণার অন্তর্গত নল্‌দি পরগনা জায়গীর দিলেন।

এই পরগনা খুব বড় ছিল, কিন্তু দস্যুতস্করের অত্যাচারে ইহা একরূপ জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সীতারাম ইহার শ্রী একেবারে ফিরাইয়া দিলেন। মুকুন্দরায় ও সত্রাজিতের পর ভূষণা প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সীতারাম দস্যু-তস্করের যমস্বরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দস্যু ছিল—তাঁহার নাম বক্তার খাঁ; এই দস্যুপতিকে পরাস্ত করিয়া সীতারাম যশস্বী হইলেন। বক্তার খাঁ সীতারামের সাহস ও অমিতবিক্রম দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় দলবল লইয়া সীতারামের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। অন্যান্য দস্যুরা সীতারামের ভয়ে দূর দূরান্তরে চলিয়া গেল। নল্‌দি পরগনায় শত শত লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সীতারাম বহু দীঘি খনন

* কথিত আছে, বঙ্গদেশে আসিয়া ইনি জিজ্ঞাসা করেন, "এদেশে ব্রাহ্মণের পরে কোন্ জাতি শ্রেষ্ঠ?" উত্তরে শুনিলেন—"বৈদ্যজাতি"। তখন নিজ পরিচয়-স্থলে ইনি বলিলেন, "হাম্ বৈদ্যি।"

করাইয়াছিলেন—প্রবাদ এই যে, এই দীর্ঘিকা-খনন-ব্যাপারের অন্যতম উদ্দেশ্য সৈন্য সংগ্রহ করা। প্রকাশ্যভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিলে উহা নবাবের নজরে পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি দীঘি-খননকারী সহস্র সহস্র লোককে রাত্রে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেন। একদল লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া নূতন দল নিযুক্ত করিতেন। এই ভাবে রাজ্যের বহু লোক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তাহারা সীতারামের আহ্বানে একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত। তাঁহার পরগনায় মগ, পাঠান ও দস্যুদের অত্যাচার নিবারিত হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ সীতারামের বিক্রম ও দস্যু-নিবারণের কথা শুনিয়া বরং প্রীত হইলেন। তিনি আরঙ্গজেবের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধির সনন্দ আনাইয়া তাঁহাকে দিলেন। অনুমান ১৬৮৭-৮৮ খৃঃ অব্দে সীতারাম এই 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

নল্‌দি পরগনা বহুজননিবাসে পরিণত হওয়াতে ইহার আয় খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা ছাড়া সাতৈর পরগনার অনেকটা তিনি তালুক হিসাবে লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপ এখন প্রবাদবাক্যের ন্যায় লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইল। তিনি বিপুল উৎসবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। সেকালে এই ব্যাপারে তাঁহার ২৮,৯৭২, টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সতীশ মিত্র বলেন, "এখনকার দিনে উহা অন্যূন দুই লক্ষ টাকার সমান।" (৫৩৯ পৃঃ)। রাজা উপাধি প্রাপ্তির পর ইনি মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক যেরূপ বহু ঘটার সহিত অভিষেকোৎসব করিয়াছিলেন, বহুদিন কোন হিন্দু রাজা বাঙ্গলায় সেরূপ করেন নাই। লোকে মুখে মুখে গাহিয়া বেড়াইত—"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর। যাঁর বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর॥ বাঘ মানুষে একুই ঘাটে সুখে জল খায়। রামী-শ্যামী পুঁটলী বাঁধি গঙ্গাস্নানে যায়॥"

শৈশব হইতে শিবাজির মত সীতারাম সার্ব্বভৌম হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে কয়েকজন অক্লান্তকর্ম্মা মহাবীর তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন, ইঁহাদের একজনের নাম "মেনা হাতী।" বস্তুতঃ তাঁহার বিরাট্ হৃষ্টপুষ্ট দেহ ও বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিলে তাঁহাকে ছোটখাট একটি হাতী বলিয়াই মনে হইত। দস্যুরা ইঁহার নাম শুনিলেই অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পালাইত। ইঁহার প্রকৃত নাম রামরূপ ঘোষ (আকনার দক্ষিণ-বাড়ীর ঘোষবংশীয়)। অপর একজনের নাম মুনিরাম ঘোষ—খুলনা জেলার বঙ্গজ কায়স্থ। মুনিরামের দুঃসাহসিক মন্ত্রণা ও মেনা হাতীর দৈহিক বল ও অদম্য বীরত্ব—সীতারামকে সর্ব্বকার্য্যে প্রবুদ্ধ করিত। ইহা ছাড়া পাঠান বক্তার খাঁ, মোগল আমল বেগ, রূপচাঁদ ঢালী ও ফকিরা (মাছকাটা) প্রভৃতি সেনাপতিও যুদ্ধকালে তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিল। এই নবগঠিত বীরদলের মধ্যে অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সীতারামের জীবনীলেখক অন্ধ যদুবাবু রঘো, রামা, শুম্ভো, শ্যামা, বিশে, হরে, কালা, নিমে, দীনে, ভুলো, জগা ও মেধো—এই বারজন প্রধান দস্যুবীরের উল্লেখ করিয়াছেন, সকলেই বাঙ্গালী ছিল এবং শেষে সীতারামের দলভুক্ত হইয়াছিল। রাজা সীতারাম পাঞ্জাব

হইতে শিখ, নেপাল হইতে গুর্খা আমদানী করেন নাই। বাঙ্গালী রাজা বাঙ্গলার ভাইদের লইয়া দেশের অনাচার-নিবারণের জন্ত লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে ভেদ দেখেন নাই। এসম্বন্ধে পল্লীকবি সেই সময়ে এই গানটি বাঁধিয়াছিলেন—"শুন সবে ভক্তিভরে করি নিবেদন। দেশ গাঁয়েতে যাহা হইল তার বিবরণ॥ রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই। বাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই॥ হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাসন (কাসন্দী) মুসলমানে খায়। মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বাড়ী যায়॥ রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুইজন। ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক সে তেমন॥ মিলে মিশে থাকা সুখে, তাতে বাড়ে বল। ভয়েতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীর দল॥ চুলে ধরে নারী লয়ে চড়্‌তে নারে নায়। সীতারামের নাম শুনিয়া পলাইয়া যায়॥" (যদুবাবুর—সীতারাম ১১২ পৃঃ)। সীতারাম হিন্দুরাজার আদর্শ লইয়া যে সুখ-শান্তির সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন তাহা এই দেশে টিঁকিল না। এই ভ্রাতৃবিরোধখিন্ন, স্বার্থান্ধ, পরশ্রীকাতর—ঐক্যহীন উষর মরুভূমিতে স্বর্গের কল্পতরুর চারা বাড়িবে কিরূপে?

সীতারাম ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সত্রাজিতের মৃত্যুর পর ভূষণা পরগনার অনেকাংশ অবশেষে কালীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয়। ইহার পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হইলে সেই জমিদারীর শিশু মালিকগণের পক্ষে সীতারাম অভিভাবক হইয়া রূপাপাত, লোকভানী, রকনপুর প্রভৃতি পরগনা শাসন করেন। মামুদসাহী পরগনার ভূস্বামী রামদেবের জমিদারীর পুর্ব্বাংশ সেনাপতি মেনা হাতী বলপূর্ব্বক দখল করেন। উত্তরে মাগুরার নিকটবর্ত্তী নান্দুয়ালীতে শচীপতি মজুমদার নামক এক বৈদ্য জমিদার ছিলেন, সীতারাম তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। "উত্তরে পদ্মা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারিগুলি সীতারামের হস্তে আসে" (সতীশ বাবু—৫৫৭ পৃঃ)। সাতৈরের উত্তরে নসিব ও নসরৎ নামক দুই পাঠান বিদ্রোহী হইয়াছিল। সীতারাম নবাবকর্ত্তৃক ইহাদিগকে দমন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। এই সুযোগে তিনি অনেকগুলি নূতন দুর্গ ও মহম্মদপুরে কামান প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন। পাঠানেরা সহজেই পরাভূত হয়, এবং নবাব সরকারে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যায়। চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়, মীর্জ্জানগরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর সাহায্যে সীতারামের রাজধানী আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। তখন সীতারাম তাঁহার দুর্গতির একশেষ করিয়াছিলেন (১৭০৩ খৃঃ)। সুন্দরবনের জায়গীর সীতারামের ছিল, কিন্তু কতিপয় জমিদার প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করেন। রাজা স্বয়ং তথায় যাওয়াতে সকলে নিরস্ত হইয়া যায়। এই সূত্রে নলদী, তেলিহাটী ও মকিমপুর তাঁহার হস্তগত হয়। জানকী বিশ্বাস মজুমদার নামক এক বৈদ্যজমিদারের বংশধরেরা সুলতানপুর খড়ড়িয়া পরগনার মালিক ছিলেন। সীতারাম এই সমস্ত জমিদারের নিকট হইতেই রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। বাগেরহাট-রামপালে বিদ্রোহী জমিদারদের সঙ্গে তাঁহার একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রামপাল জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত সনদে তাহা পাওয়া যায়। পরমধুদিয়ার নিকটে "রণভূম" বা রণের মাঠ নামক একটা স্থান

আছে, সম্ভবতঃ এইস্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সীতারাম এইবার চিকলিয়া, মধুদিয়া প্রভৃতি পরগনা অধিকার করিয়া লইলেন।

যশোর খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশ বাবু বলেন "সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" (৫৬৩ পৃঃ)। উত্তরে পাবনা, দক্ষিণে ভৈরব নদ, পশ্চিমে মামুদসাহী পরগনা—তেলিহাটী পরগনার শেষ। এই এক অংশ, আর দ্বিতীয় অংশ—দক্ষিণে সুন্দরবনের আবাদী মহল, উত্তরে ভৈরব নদ হইতে আবাদ শেষ, পূর্ব্বে বালেশ্বর হইতে বরিশালের কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত অধিকার ৪৪টি পরগনায় বিভক্ত ছিল এবং ইহার আয় তখনকার দিনে এককোটী টাকার উপরে হইত।

মোগলেরা সীতারামকে এতদিন পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কেন?—তাহার একমাত্র কারণ—তাঁহারা হিন্দুজমিদারদিগকে নগণ্য মনে করিয়াছিলেন, জনশ্রুতিতে যত কিছু শোনা যাইত, নবাব তাহা কাণে আনিতেন না। সীতারামের সুশাসনে মুসলমানেরা প্রীত ছিল। তৎকালে নবাবেরা পাঠানদিগকে ও মগদিগকে আশঙ্কা করিতেন। সীতারাম নবাবের পক্ষ হইয়া দুর্দ্দান্ত পাঠান ও মগদিগকে দলন করিয়াছিলেন, ইহাতে সায়েস্তা খাঁ-প্রমুখ শাসনকর্ত্তারা বরং তাঁহার উপর প্রীতই হইয়াছিলেন। সীতারাম যে রাজস্ব দিতেন না—ইহাতে তাঁহারা এই কারণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধির একটা সীমা আছে, সীতারাম যখন সে সীমানা লঙ্ঘন করিয়া গেলেন, তখন তাঁহার প্রতি নবাব সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

পাঠান-নির্যাতনের অছিলায় সীতারাম বহু দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দীর্ঘিকা-খননের উপলক্ষে তিনি রাজ্যের শতসহস্র প্রজাকে সামরিক শিক্ষা দিয়াছিলেন, দস্যুদলন-প্রচেষ্টায় তিনি বহু দস্যুকে করতলগত করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যশ্রেণীতে হিন্দু, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক রাজভক্তিপরায়ণ ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিল।

এইভাবে বলসঞ্চয়পূর্ব্বক সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি মহম্মদপুরের দুর্গকে অতি দুর্গম করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশাল অরণ্য ও তিনদিকে বিল পরিবেষ্টিত থাকায় নিভৃত প্রদেশে তিনি স্বদেশী কর্ম্মকারকর্ত্তৃক বড় বড় কামান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মহম্মদপুর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। রাজার আয় বাড়িয়া গেল। রাজা নিজে বিদ্বান্ ছিলেন। শৈশবে তিনি টোলে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গলা ও উর্দ্দু খুব ভাল জানিতেন। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদ খুব ভাল করিয়া আবৃত্তি করার পুরস্কারস্বরূপ তিনি জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীকে জমি দান করিয়াছিলেন—সেই সনন্দে লিখিত ছিল—"পরমপূজনীয় জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীচরণেষু—আমার জমিদারি পরগনে মাহিমসাহীর হোগলডাঙ্গা ও কল্যাণপুর গ্রামে বার পাখী ও পরগণে নলদীর নারায়ণপুর ও নহাটি গ্রামে আট পাখী জমি আপনার চণ্ডীদাস ও জয়দেবের মুখস্থ কবিতা শুনিবার জন্য ব্রহ্মোত্তর দিলাম—আপনি পুরুষানুক্রমে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভোগদখল করুন। সন ১১১৩, তাং ৫ই বৈশাখ (১৭০৭ খৃঃ)। মহম্মদপুর অঞ্চলে

পূর্ব্ব হইতেই শিল্পের খ্যাতি ছিল। সীতারাম শিল্পের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। এখনও নালিয়া গ্রামে সাত হাত উচ্চ নানারূপ কারুকার্য্যশোভিত চিনির মঠ, রথ, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়—ময়রারা চিনির যে কদমা এখনও তৈরী করিয়া থাকে—তাঁহার অধিকারে তাহার বেড় দুই হাত এবং উচ্চতায় দেড় হাত হইত। এই জিনিষটা তুলার ন্যায় হাল্কা, কাজ এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর যে মনে হয় এত বড় কদমাটা ফু দিলে উড়িয়া যাইতে পারে। তাঁহারই রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হইত, এখন তাহার লুপ্ত গৌরবের চিহ্ন আছে। সাতৈরের পাটী ও মাদুর একসময়ে ভারতবিশ্রুত ছিল। কয়েক বৎসর মাত্র অতীত হইল তখনও এমন কারিগর বর্ত্তমান ছিল যে ৫০০৲ টাকা মূল্যের মাদুর তৈরী করিতে পারিত। তাঁহারই মন্দিরাদির ইটে যে কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা বঙ্গে সূক্ষ্ম শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কাঠের উপর, কাগজের উপর তাঁহার সময়ের যে কত সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যের নমুনা আমরা পাইয়াছি তাহাতে মনে হয়, বীর সীতারাম রায় কেবল যুদ্ধবিদ্যায় দেবসেনাপতির পূজা করিতে অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই, তিনি স্বর্ণপদ্মের ডালি অর্ঘ্য দিয়া বঙ্গের কলালক্ষ্মীর পূজা করিতেন। ভূষণা পরগনা পূর্ব্ব হইতে বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুত করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল ("বনাত-মখমল-পটু ভূষণাই খাসা। বুটাদার ঢাকাই দেখিতে তামাসা॥" রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর।) ভূষণাই কাগজ সেকালে বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই অঞ্চলের যে শিল্পমণ্ডিত ঘরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সীতারামের রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী। মহম্মদপুরে এখনও কাচারু নামক একজাতীয় লোক বাস করে, তাহারা কাচের চুড়ী প্রস্তুত করিত। গালা, মোম, তামা, পিত্তল, কাঁসা এবং সোণারূপার কারুশিল্পের জন্য সীতারামের ভূষণা বিখ্যাত ছিল। মুরসিদাবাদ নবাববাড়ীর যে সুবৃহৎ কামান আছে—তাহা ঢাকার জনার্দ্দন কামার ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পিত্তলফলকে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে। এই কামানের নাম "জাহান-কোষা" বা "জগজ্জয়ী"। সীতারাম এই জনার্দ্দন কর্ম্মকারের স্বজাতীয় শিল্পীদিগকে ঢাকা হইতে আনিয়া মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট করেন। তাঁহারাই তাঁহার সুবিখ্যাত "কাল্ খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ" নামক কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঢাকায় উক্ত নামধের কামানদ্বয়ের মত একটি বৃহৎ কামান আছে, তাহা সীতারাম রায়ের কি না বলিতে পারি না। সীতারামের বহু পুষ্করিণী ও দীঘি এখনও বিদ্যমান। ইষ্টকমন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সকল দীঘির পুণ্য নীর এখনও সুপেয়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দীঘি "রামসাগর", এখনও পাহাড় লইয়া তাহার বেষ্টনী ৬,০০০ হাতের কম হইবে না, ইহার বর্গফল অন্যূন ২০০ বিঘা। "সুখসাগর" নামক দীঘিতে গুরুতর রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নানা কারুশিল্পমণ্ডিত "ময়ূরপঙ্খী" নৌকাতে বহু রমণী-পরিবৃত হইয়া 'বিলাসী' সীতারাম নৌবিহার করিতেন। অতি জটিল ও কঠিন রাজনৈতিক সমস্যাপূর্ণ যাঁহার জীবন, যিনি দরিদ্র অবস্থা হইতে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে 'বিলাসী' বলা মূর্খতা, তবে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও রুচি অনুগত "একপত্নীক" ধর্ম্ম তখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত

হয় নাই, নর্ত্তন, গান, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদজনিত ক্ষণিক সুখভোগে তখনকার বড়লোকেরা নৈতিক বিভীষিকা দেখিতেন না। 'সুখসাগর' ছাড়া 'কৃষ্ণসাগর' ও অন্যান্য দীঘিও এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাধারণের হিতকামনার নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে।

সীতারামের রাজসভা বহুপণ্ডিতমুখরিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে বারুইখালি, নালিয়া, নহাটা, বাটাজোর প্রভৃতি স্থান বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কেন্দ্রস্থান ছিল। পলিতা নহাটার প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ, বৈষ্ণবচূড়ামণি কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। আগমবাগীশ মহাশয় তৎসম্বন্ধে বাঙ্গলায় এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন ; "ভাস্বরে উদয়ভাস, উদয়নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। গুণেন্দ্র, দেবেন্দ্র তথি, ভূ-অধিপতি, ভুবনে ভূষিত গুণগ্রাম।" "বৈদ্যকুল-প্রদীপ" অভিরাম কবীন্দ্র-শেখর কবিরাজ রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি রাজার নিকট হইতে "মহোপাধ্যায়" উপাধি পাইয়াছিলেন (সতীশবাবু, ৫৬৮ পৃঃ)। "অভিরামঃ কবীন্দ্রোহসৌ সীতারামাদ্ধি ভূপতেঃ। মহোপাধ্যায়পদবীং মহৎপূর্ব্বামবাপ্তবান্" (রামতনু হড়—কুলপঞ্জী)। সীতারামের সভায় দর্শন, সাহিত্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বদা আলোচনা চলিত। "তিনি মুসলমান প্রজাদের শিক্ষার জন্য মৌলভী-দ্বারা বহুসংখ্যক মক্তব খুলিয়াছিলেন" (সতীশবাবু, ৫৬৯ পৃঃ)।

সীতারামের "দোলমঞ্চ", "দশভুজার মন্দির", "কৃষ্ণজীর মন্দির", "রামচন্দ্রবাটী", "পঞ্চরত্ন" প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। তাঁহার মালঙ্গী গ্রামের প্রসিদ্ধ দুর্গ, কালিকাপুরের গড়, এমন কি মহম্মদপুরের দুর্গ এখন ঢিপিতে পরিণত।

একটি দরিদ্র বালক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বীয় প্রতিভাবলে আদর্শ হিন্দু-সাম্রাজ্য গড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। প্রথমজীবনে তাঁহার দুই অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন, রামজীবন ও রামরূপ (মেনা হাতী), উঁহারা তাঁহার আজীবন-সঙ্গী। কত গভীর রজনীর পরামর্শ, কত উদ্যোগ, কত জীবন-পণ যুদ্ধ, মগ-পাঠান-হিন্দু-দস্যুর সহিত সংঘর্ষ, কত কৃচ্ছ্র ও বিপৎসঙ্কুল অভিযান ও বিলবেষ্টিত স্থানে দুর্গম রাজধানীতে কামান-নির্ম্মাণ, দীর্ঘি-খননোপলক্ষে দুর্দ্ধর্ষ বাঙ্গালী সৈন্যের সৃষ্টি—একটা অজ্ঞাত অরণ্যপ্রদেশকে সহসা যাদুমন্ত্রপ্রভাবে যেন বস্ত্র-মেখলা সৌধকিরীটিনী লঙ্কার মত করিয়া গড়া এবং বিদ্যা, শিল্প, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্যের বিলাসক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তোলা—প্রজাদিগকে রামরাজ্যের স্বপ্ন সফল করিয়া প্রদর্শন—১৬৯০ খৃঃ হইতে ১৭১২ খৃঃ—এই স্বল্প দ্বাবিংশতি-বর্ষব্যাপী অধ্যবসায়ে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—সেই সাহান সা সম্রাটের বিরুদ্ধে অটল প্রতিজ্ঞায় দাঁড়ানো—এভাবে এতটা বড় স্বপ্ন আর কোন্ বাঙ্গালী গত চারিশত বৎসরের মধ্যে এতটা সফলতার দিকে আনিতে পারিয়াছেন? হিন্দু-মুসলমানে এই প্রীতি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গুণগ্রাহিতা, কায়স্থ হইয়া বৈদ্য পণ্ডিতকে "মহোপাধ্যায়" উপাধিপ্রদান, মন্দির ও মসজিদ, চতুষ্পাঠী ও মক্তব একত্র প্রতিষ্ঠা, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীতি শুনিয়া নিষ্কর জমিদান, শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং রাজধানীর "মহম্মদপুর" নামকরণ—এমনভাবে প্রতাপাদিত্যের পরে আর কে

করিয়াছেন ? অপর মহাবীরেরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সীতারাম তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের গঠন-শক্তি সর্ব্বদিকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। যখন মুরসিদকুলি খাঁ রাজস্ব দেওয়ায় দেরি হইলে ব্রাহ্মণ জমিদারদিগকে ধরিয়া ধরিয়া 'বৈকুণ্ঠে' নিক্ষেপ করিতেন, সেখানে পুরীষমিশ্রিত জল তাঁহাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইত, তখন সীতারাম অটলভাবে দাঁড়াইয়া জমিদারদিগকে বলিতেন, "রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কর।" তিনি জানিতেন—এই সংঘর্ষ শুধু মুরসিদাবাদের সঙ্গে নহে, সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্যের মালিকের—হিমাদ্রিপ্রমাণ গুরুতর রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ, সেই বিশাল যন্ত্রের নিষ্পেষণে তাঁহার মহম্মদপুর বুদ্বুদের মত বিলীন হইবে। পতঙ্গ যেমন অগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়ে—সেইরূপ তিনি এই বিপদকে বরণ করিয়া লইলেন। এ যুদ্ধ দাউদের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ নহে—দ্বাদশ ভৌমিকের সমবেত শক্তির সহিত মানসিংহের যুদ্ধ নহে, জয়পরাজয় সে সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ছিল, এই যুদ্ধ নগণ্য মহম্মদপুরের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের। এ সকল জানিয়াও তিনি মুরসিদকুলি খাঁ-কৃত হিন্দুজমিদারদের অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, ফৌজদার তরপ খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি রাজস্ব দিবেন না। মেনা হাতীর সঙ্গে যুদ্ধে তরপ খাঁ নিহত হইলেন। যে সকল হিন্দু জমিদার তাঁহার শাসনে গরুড় পক্ষীর ন্যায় হইয়া ছিলেন, তাঁহারাই রং বদলাইয়া মুরসিদকুলি খাঁর পক্ষাশ্রয়পূর্ব্বক সীতারামকে টিট্‌কারী দিতে লাগিলেন। স্বয়ং দয়ারাম রায় বক্‌সার খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়া মোগল সৈন্যের নেতা হইয়া মহম্মদপুরে অভিযান করিলেন, গুপ্ত গুণ্ডা লাগাইয়া মেনা হাতীকে অতর্কিতভাবে বধ করিলেন। মুরসিদকুলি শত্রু হইলেও ততটা হীন ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নরমুণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কি করিয়াছ ? এরূপ বিশালকায় বীরকে না মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা উচিত ছিল!" ("The Nawab seeing the huge head said, 'A man like that you should have brought alive and not killed!' He directed the head to be taken back to Muhammudpur and it was there buried and a great tomb raised over it." Westland's Report, p. 27.) সীতারামের সহিত বারাসিয়ায় মোগলদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ৬০০ মুসলমান সৈন্য নিহত হয়।

দয়ারামের দ্বারাই সীতারামের পতন ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত মহম্মদপুরের দুর্গ সমাশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বন্দী হইয়া তিনি মুরসিদাবাদে নীত হন। তাঁহার বহু পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বে নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার তিন বিবাহিতা পত্নীর মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গী লেখক আপনাকে সীতারামের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া পর্ত্তুগীজ ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্দরমহলের বহু রমণীর মধ্যে দুই একজন ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তাঁহার দেশীয় লোকের শত্রুতার ফলে তাঁহার পতন হইয়াছিল, তাঁহার রাষ্ট্রনীতি আদর্শ-নরপতির যোগ্য ছিল। তাঁহার সংগঠনী-প্রতিভা সম্রাটের যোগ্য ছিল। অদম্য বীরত্ব, সাহস, ন্যায়বোধ প্রভৃতি গুণে তিনি জগন্মান্য মহাবীরদের পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত।

তিনি নিজের দোষে বিনষ্ট হন নাই। "জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে—" নিজের লোক যদি পর হয়—স্বজাতি যদি দ্রোহী হয়—তবে বিনাশ অনিবার্য্য। ভারতের ইতিহাস—বিশেষ হিন্দুজাতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে। যেদিন তাঁহার শৈশবসঙ্গী, নিত্যসহচর, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশীদার, রাজ্যের প্রধান ভিত্তি "মেনা হাতী"র মৃত্যু হইল—যাঁহার সহায়তায় তিনি শত দস্যুর অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে বাঁচাইয়াছেন—যিনি জগতে ন্যায়রাজ্যস্থাপনের জন্য রাউণ্ড টেবেলের নাইটের ন্যায় আর্থারতুল্য রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, কতদিন রাত্রিতে জল্পনা করিয়া পরদিনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই চিরসুহৃদ্ মেনা হাতীর মৃত্যুসংবাদ যখন পৌঁছিল, সেদিন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়াছিল—তাহার দূরকম্পন আজও আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। ১৭১২ খৃঃ অব্দে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। জন্ম ১৬৫৮(৬০)—মৃত্যু ১৭১২, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ অথবা ৫২ বৎসর হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী বাদসাহগণ

মুরসিদকুলি খাঁর সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যসংক্রান্ত অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইংরেজেরা বৎসরে শুধু ৩,০০০৲ টাকা দিয়াই মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুদের ও অন্যান্য প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার, তাহা হইতে বেশী সুব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। মোগল এবং আরব বণিকেরা যেরূপ সর্ব্বদা শুল্ক হইতে মুক্ত, ইংরেজেরা সেইরূপ মুক্তি পাইতে আব্দার করিয়াছিলেন। নবাব এই আব্দারের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি সুজা বাদশাহের মঞ্জুরী-পত্র অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি জানিতেন উৎকোচ দিয়া ইংরেজ বণিক্ রাজকর্ম্মচারীদের বশীভূত করিয়া অনেক সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। সুজার মঞ্জুরী দলিল যখন নবাব একখণ্ড ছিন্ন কাগজের মত উড়াইয়া দিলেন, তখন তাঁহারা স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ ফেরোক্সেয়ারের নিকট আবেদন করিলেন। এই উপলক্ষে জন সুরম্যান সম্রাট্‌কে যে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইলেন, তাহার মূল্য ৩০,০০০ পাউণ্ডের কম নহে। ইংরেজদের পক্ষীয় খোজা সরহাদ সম্রাটের নিকট ঐ মূল্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া ১,০০,০০০ পাউণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিলেন, সম্রাট্ সেগুলি যাহাতে নিরাপদে পৌঁছিতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এত খরচ করিয়াও ইংরেজেরা খুব সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নবাব দেখিলেন, ইংরেজেরা তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া খুব অন্যায়রূপ দাবী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং ওমরাদিগকে বিস্তর উৎকোচ দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে উদ্যোগী। তিনি তাঁহার ভ্রাতা প্রধান মন্ত্রী হুসেন আলি খাঁর দ্বারা আবেদনের বিরুদ্ধতা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, কিন্তু

এই সময়ে দৈব ইংরেজদের সহায় হইল; ফেরোক্‌সেয়ার রাজপুতরাজগণের অন্যতম রাজসিংহের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবেন, সব ঠিকঠাক, এমন কি কন্যা রাজধানীতে আনীত হইয়াছেন,—এই সময়ে সম্রাট্ গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইলেন, দেশী চিকিৎসকেরা হার মানিল। ইংরেজদের ডাক্তার হ্যামিলটন অস্ত্রোপচার করিয়া সম্রাট্ ফেরোক্‌সেয়ারকে শীঘ্র শীঘ্র ভাল করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, ডাক্তার যাহা চাহিবেন তাহাই দিবেন। ডাক্তার নিজের স্বার্থ না খুঁজিয়া তাঁহাদের আবেদন-মঞ্জুরীর প্রার্থনা করিলেন। বিবাহোৎসবের গোলমালে ছয়মাস কাটিয়া গেল। ফেরোক্‌সেয়ার হ্যামিলটনকে অনেক বহুমূল্য উপহার ও জাতীয় সুবিধার কয়েক দফা মঞ্জুর করিয়া দিলেন, কিন্তু বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলিসম্বন্ধে মন্ত্রিবর্গকে রিপোর্ট করিতে বলিলেন। আবেদন যাইয়া পড়িল হুসেন আলি খাঁর কাছে। সুতরাং আবার বিভ্রাট্। অন্তঃপুরের এক খোজাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করা হইল। মহাভিষকের দত্ত ঔষধের মত এই উৎকোচের ক্রিয়া তখনই দেখা গেল। কিন্তু নবাব বাঙ্গলাদেশে তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পথে, প্রকাশ্যভাবে না পারিয়া, নানারূপ বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। একটা দফা এইরূপ ছিল যে, ইংরেজগণ কলিকাতার পার্শ্বে ৩৮টি নগর কিনিতে পারিবেন। সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে তাঁহারা এত বড় হইয়া উঠিবেন যে ফোর্ট উইলিয়ামের জোরে পদে পদে তাঁহারা নবাবের প্রতিপক্ষতা করিতে সাহস করিবেন। নবাব জমিদারদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, যত মূল্যই দিক না কেন তাঁহারা যেন বিদেশীদিগের নিকট জমি বিক্রয় না করেন। তবে কলিকাতায় মুরসিদকুলি খাঁ ফেরোক্‌সেয়ারের মঞ্জুরী দলিলের বলে যে সকল সুবিধা দিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল।

এই সময়ে ফেরোক্‌সেয়ার নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন (১৭১৯ খৃঃ)। মহম্মদাবাদের পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু হুগলীর ফৌজদার আসান আলি খাঁ তাহাদিগকে দমন করেন। তাহারা মুরসিদাবাদের নিকট সরকারী ৬০,০০০৲ টাকা লুট করিয়াছিল। মুরসিদকুলি খাঁ সেই টাকা পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। তাঁহারা কেন পাঠানদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এই অপরাধে পাঠানদের সমস্ত জমিদারি তিনি তাঁহার প্রিয় রামজীবন নামক এক হিন্দুকে প্রদান করেন। রামজীবন রাজসাহীর জমিদার ছিলেন। নবাব ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের রাজাদের সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই সকল রাজারা একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। নবাবের অত্যাচারে বঙ্গের হিন্দুজমিদারদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল; কেবল বীরভূম ও বনবিষ্ণুপুরের রাজারা অনধিগম্য আরণ্য-রাজধানীতে কতকটা নিরাপদ্ হইতে পারিয়াছিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ হিন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে গোঁড়ামি দেখাইয়াছেন, তাহা ধর্ম্মদ্রোহী, অপর ধর্ম্মাশ্রয়িগণই সর্ব্বদা দেখাইয়া থাকেন। তিনি মোগল-সম্রাট্ আরঙ্গজেবের প্রিয় ওমরাহ ছিলেন এবং দোষেগুণে সেই নৃপতিই তাঁহার আদর্শ ছিলেন। তিনি ২০,০০০ মৌলভী ও গায়ক রাজসভায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সদাসর্ব্বদা তাঁহার কাছে

কোরান আবৃত্তি করিতেন। মুসলমানী উৎসবগুলি তিনি খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পাদন করিতেন। কথিত আছে, তিনি একস্ত্রী-নিষ্ঠ ছিলেন, আহারে, বিহারে ও পরিচ্ছদে সংযত ছিলেন—কথা বলিয়া তিনি কখনই তাহা লঙ্ঘন করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাঁহার খুবই প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণগুলি একমাত্র গোঁড়াদলই বেশী দেখিতে পাইতেন,—বাহিরের লোক—বিশেষতঃ হিন্দুরা—তাঁহার উদ্ভাবিত 'বৈকুণ্ঠ' নামক নরক ও শত প্রকার অপমান ও যন্ত্রণাদায়ক বিধানের ভয়ে সশঙ্ক থাকিতেন। কাফেরের দুঃখ দুঃখ নয়—কাফের ও বলির পশুর চীৎকার উপেক্ষণীয়—উহারা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণের হাতে নিহত হইলে অক্ষয় স্বর্গলোক পাইবে—সুতরাং তাহাদের জন্য যাহারা দুঃখ করে—তাহারা বুদ্ধিহীন।—এই সকল গোঁড়া মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির পার্শ্বে হাফেজের এই উক্তি সোণা দিয়া লিখিয়া রাখা উচিত—"মদ খাও, কোরান পুড়াইয়া ফেল, কাবা-মন্দিরে আগুন ধরাইয়া দাও, পৌত্তলিকেরা যেখানে বাস করে সেইখানে যাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ কর—কিন্তু ভাই মানুষের মনে ব্যথা দিও না"—সকল মন্দির, সকল মসজিদের চূড়া ডিঙ্গাইয়া এই কথাগুলি স্বর্গের তোরণের উপর লিখিত হওয়ার যোগ্য।

নবাব মুরসিদকুলি খাঁ ১৭২৫ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সুজা উদ্দীন খাঁ—১৭২৫-১৭৩৯ খৃঃ

সুজা উদ্দীন খাঁ মীরজুমলার এক মাত্র কন্যা জিয়তয়েসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মৃত নবাবের ইচ্ছা ছিল তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন! কিন্তু সম্রাটের আদেশে সুজা উদ্দীন নবাব হইলেন।

সুজা উদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী হিন্দুজমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজকুমার নির্ব্বাসিত হইয়া নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগে নবাব-সৈন্য অতর্কিতভাবে আগরতলায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন, আশ্রিত রাজকুমার মোগলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই কথা লিখিয়াছেন। এই সময়ে জার্ম্মানেরা নবাবের সনন্দ পাইয়া ওয়েষ্টেণ্ড কোম্পানির নামে বাঁকিবাজারে (কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দূরে) তাঁহাদের এক বিস্তৃত কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ডাচ্ ও ইংরেজগণ ইহাদের বিপক্ষতা করিয়া নবাবের কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করাইয়া জার্ম্মানদের নামে মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত করেন। ফলে নবাব-সৈন্যদল বাঁকিবাজারের কারখানাটি ধ্বংস করিয়া বঙ্গদেশে জার্ম্মান বাণিজ্যের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই নবাব বঙ্গের রাজস্ব এক বৎসরের মধ্যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকায় পরিণত করেন। জমিদারদের প্রতি ভূতপূর্ব্ব নবাবের কড়া শাসনে যাহা হয় নাই—সুজা উদ্দীনের উদারনীতির ফলে তাহা হইল। ইনি মীরজুমলার অত্যাচারের সহায় নাজির আহাম্মদ ও মোরাদ এই ওমরাহদ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার ৫০০ রাজকর্ম্মচারীর

মধ্যে দুইটি হিন্দুকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাঁহাদের একজন রায় আলমচাঁদ, ইঁহাকে নবাব "রায় রাঁয়া" উপাধি দিয়াছিলেন, অপর জগৎ শেঠ; ইঁহাদের পরামর্শে কাজ করিয়াই ইনি সরকারী আয় এত বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা নবাবের এত প্রিয় ছিলেন যে মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সকল চুক্তিতে স্বীকার করাইয়া পুত্র সরফরাজ খাঁকে উত্তরাধিকারি- পদে মনোনীত করেন, তাহার প্রধান এক দফাএই যে, তিনি সর্ব্ববিষয়ে রায়রাঁয়া ও জগৎ শেঠের মত লইয়া কাজ করিবেন। মীরজুমলা যেরূপ অতিরিক্ত পরিমাণে মিতব্যয়ী ছিলেন, সুজা উদ্দীন তেমনই অপরিমিত বিলাসী ছিলেন, তিনি তাঁহার রাজধানী যাহাতে দিল্লীর সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৩৮ খৃঃ তাঁহার সেনাপতি আলিবর্দ্দী খাঁ পাটনার দস্যুদের অত্যাচার নিবারণ করেন এবং ঐ সময়ে মির হবিব নামক তাঁহার অন্য এক সেনাপতি ত্রিপুরার রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে অনেক অর্থ দেন। কথিত আছে, সুজা উদ্দীনের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'রোসনাবাদ' হইয়াছিল।

সরফরাজ খাঁ—১৭৩৯-৪০ খৃঃ

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজা উদ্দীনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯-৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সৌখীন নৃপতির অন্দর মহলে ১,৫০০ রমণী ছিলেন, ইঁহাদের লইয়া তিনি প্রমত্তাবস্থায় দিন রাত্রি কাটাইতেন কিন্তু তিনি সুরাপায়ী ছিলেন না। কোন সুন্দরী রমণীর কথা শুনিলে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া ন্যায়-অন্যায় বোধ হারাইতেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি নাদির সাহের আক্রমণে দিল্লীর দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইলেন। ভয় পাইয়া ইনি বাঙ্গলার তিন সনের বাকী খাজনা নাদির সাহকে পাঠাইলেন, শুধু তাহাই নহে—নাদির সাহের নামাঙ্কিত করিয়া তিনি মুদ্রার প্রচলন করিলেন। এই ঘটনা পরিশেষে তাঁহার শত্রুরা যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া উত্তরকালে দিল্লীশ্বর সম্রাট্ মহম্মদ সাহার মন নবাবের প্রতি বিমুখ করিয়া দিয়াছিল। যে তিন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে তাঁহার পিতা বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হাজি আহম্মদ একজন, বাকী দুইজন আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠের কথা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। প্রথম প্রথম নবাব ইঁহাদের কথামত চলিতেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইঁহাদের দুইজনকে বিষম চটাইয়া দেন। হাজি আহম্মদের নাতি ও নাতিনীর মধ্যে একটি বিবাহ সুস্থির হইয়াছিল, ইনি তাহা ভাঙ্গাইয়া দিয়া কন্যাটিকে তাঁহার নিজের ছেলের সঙ্গে জোর করিয়া বিবাহ দেন। জগৎ শেঠের পুত্রের সঙ্গে একটি অপূর্ব্ব-রূপসী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। জগৎ শেঠ তাঁহার পুত্রবধূকে নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যদিও নবাব কোন ব্যভিচার করিতে সুবিধা পান নাই। এই ঘটনায় জগৎ শেঠের পরিবারে যে কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছিল, তাহাতে শেঠজীর উচ্চ-কুলগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। নবাবের শত্রুগণ মহম্মদ সাহের দরবারে এই সকল কথা এবং নাদির সাহের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও সম্রাট্‌কে অবজ্ঞা করার কথা অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন

বং হাজি আহম্মদের ভ্রাতা আলিবর্দ্দী খাঁকে নবাব করিলে সম্রাট্‌কে যে তিনি অপরিমিত অর্থ দিবেন তাহার এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সম্রাট্ পাটনার শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁকে গোপনে বাঙ্গলার গদি দখলের জন্ত নিয়োগপত্র দিলেন। এদিকে হাজি মহম্মদ ও জগৎ শেঠ নবাবকে কুপরামর্শ দিয়া ব্যয়-সঙ্কোচের উপলক্ষে তাঁহার বহু সৈন্ত বিদায় করিয়া দিলেন। নবাবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ নানারূপ বাহ্য-রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিতেন ও হাজি মহম্মদ এবং জগৎ শেঠ মিষ্ট কথা বলিয়া নবাবকে ভুলাইয়া রাখিতেন, তারপরে ভোজপুরীদের বিদ্রোহদমনের ভান করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পাটনা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন মৌলভির হাতে কোরান ও একজন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাজলের ঘটি ও তুলসীপত্র দিয়া সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্তদিগকে আহ্বান করিলেন। মুসলমান কোরান ও হিন্দু গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আলিবর্দ্দী যাহা বলিবেন, ন্তায় হউক অন্তায় হউক তাহারা তাহা করিবে। এই প্রতিশ্রুতির পরে, আলিবর্দ্দী যে নবাবের বিরুদ্ধে যাইতেছেন তাহা তাহাদিগকে জানাইলেন। হাজি মহম্মদ, আলিবর্দ্দী ও জগৎ শেঠ মন্ত্রগুপ্তি এত চাতুর্য্যের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন যে, যখন আলিবর্দ্দী সৈন্ত লইয়া একেবারে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী, তখনও নবাব সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সত্যসত্যই ষড়যন্ত্র করিতেছেন। শেষ মুহূর্ত্তে যখন শত্রুপক্ষের শিবির হইতে কামান গর্জ্জন করিয়া বলিল যে আলিবর্দ্দী তাঁহার শত্রু, তখন নবাব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাহুত বলিল, এ অসম যুদ্ধে অগণিত শত্রুর মধ্যে প্রাণ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, বরঞ্চ হাতী দ্রুতবেগে ছুটাইয়া দিই,—বনবিষ্ণুপুরের রাজার প্রবল সাহায্যে হয়ত তিনি শত্রুদলনে সমর্থ হইবেন। নবাব সে কথা শুনিলেন না, বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে মহাবীরের ন্তায় যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন (১৭৪০)।

আলিবর্দ্দী খাঁ—১৭৪০-১৭৪৬ খৃঃ

নবাব সরফরাজ খাঁকে হত্যার পর মুরসিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই আলিবর্দ্দী মৃত নবাবের মাতা জেরতঅলনিসার দর্শনপ্রার্থী হইয়া স্বয়ং তাঁহার গৃহদ্বারে যাইয়া সংবাদ পাঠাইলেন—"আমি নবাবকে হত্যা করিয়া অকৃতজ্ঞতার অনুতাপে পুড়িয়া মরিতেছি। আমি ক্ষমার্হ নহি, তথাপি ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি এই ঘোর পাপকার্য্যের পর আপনার মনে আর কোন কষ্ট দিব না, সর্ব্ববিষয়ে আপনার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব।" অনেকক্ষণ আলিবর্দ্দী দ্বারে অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু শোকসন্তপ্তা মাতা কোন জবাবই দিলেন না। সুতরাং পুত্রহন্তা নবাবকে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইল। পাপটি কম গুরুতর নহে—নবাব সরফরাজ খাঁ স্বয়ং তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ আলিবর্দ্দীকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহাকে হত্যা করা।

কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য এই সকল গুরুতর অপরাধ, স্বগৃহে ডাকিয়া আনিয়া বন্ধুত্বের ভান করিয়া অতর্কিতভাবে হত্যা করা—এই সকল গর্হিত ও নিষ্ঠুর কার্য্য মোগল ইতিহাসে বারংবার দৃষ্ট হইয়াছে। সাম্রাজ্যের লোভ অতি প্রবল, এজন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "মুক্তিমিচ্ছসি রে তাত, বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।"

আলিবর্দ্দী নবাব হইয়া সম্রাটদের রাজত্বে অহর্নিশ-সংঘটিত এই সকল ক্রূর ব্যবহারের একটিও বাদ দেন নাই। কিন্তু শত্রু ও যাঁহাদিগকে তিনি শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে "মারি অরি, পারি যে কৌশলে" নীতি চালাইয়াও তিনি অপর সকলের সঙ্গে অবাধ ও মুক্ত প্রাণের উদারতা, সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায়বোধ ও প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি মহৎ গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল বাদশাহদের অনেকেই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, শত্রুর শেষ না করিয়া তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু কোন যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নাই। বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি একপদও হটিয়া যান নাই, এবং প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ সুহৃৎ যাঁহাদিগকে তিনি প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের ঊর্দ্ধতম শিখরে লইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা যখন অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছেন তখন সেই অপ্রত্যাশিত দুর্ব্ব্যবহারে তিনি তিলমাত্র ধৈর্য্য-চ্যুত হন নাই। বাঙ্গলার বাদশাহদের মধ্যে আলিবর্দ্দী সামরিক ব্যাপারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আসন-গ্রহণের উপযুক্ত। শেষবয়সে যখন তাঁহার স্নেহের নন্দদুলাল, পরমসুন্দর, তরুণ সিরাজুদ্দৌলা বিদ্রোহী হইয়া পাটনা দখল করিতে অভিযান করিলেন—তখন সেই চিরস্নেহপালিত বালক তাঁহার কি অপকার করিবেন, তাহা মুহূর্ত্তমাত্রও ভাবিলেন না, পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, গায়ে কাঁটার আঁচড়ের দাগ লাগে সেই ভাবনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

তিনি রাজত্বের প্রথমেই সরফরাজ খাঁর পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের জন্য প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবগণের সঞ্চিত বহু অর্থ লাভ করিয়া অকাতরে ও মুক্তহস্তে তাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ মহম্মদকে এককোটি টাকা নগদ ও সত্তর লক্ষ টাকার উপযোগী উপঢৌকন নজরানা পাঠাইলেন। নবাব বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন। এইভাবে যখন স্থির হইয়া কেবল সিংহাসনে বসিয়াছেন, তখন শুনিতে পাইলেন সম্রাট্ মহম্মদ সাহ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া যাহা পাইয়াছেন তাহাতে খুসী না হইয়া আরও অপরিমিত দাবী দিয়া মুরাদ খাঁ নামক এক প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছেন! আলিবর্দ্দী এই লোকটিকে প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করিয়া, একটা হিসাব দাখিল করিয়া এবং সম্রাটের জন্য আর একটি মূল্যবান্ উপঢৌকনের ব্যবস্থা করিয়া মুরাদকে রাজমহল হইতে বিদায়পূর্ব্বক পুনরায় সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিলেন। (১৭৪১ খৃঃ।)

ইহার পরে সুজা উদ্দীন বাদসাহের জামাতা মুরসিদ খাঁকে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব হইতে বিদায় করিয়া নবাব তৎস্থলে তাঁহার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের পুত্র সৈয়দ মহম্মদকে নিযুক্ত করিতে

সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তদনুসারে মুরসিদ খাঁকে লিখিলেন—তিনি যদি স্বেচ্ছায় উড়িষ্যা ত্যাগ করেন, তবে তাঁহার সমস্ত ধন-রত্ন ও পরিবারবর্গ লইয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহাতে তাঁহার অবসরগ্রহণ ও উড়িষ্যা হইতে প্রয়াণ নিরাপদ্ হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত না হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মুরসিদ খাঁ শান্তিপ্রিয় ভালমানুষ ছিলেন—তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে উদ্যত হইলে তাঁহার স্ত্রী দুর্দ্দানা বেগম সিংহীর মত বিক্রমে তাঁহাকে কাপুরুষতার জন্য ভৎর্সনা করেন। তাঁহার আমীরগণও শেষপর্য্যন্ত লড়াই করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সুতরাং যুদ্ধ হইল, আলিবর্দ্দীর জয় হইল। মুরসিদ পালাইয়া দাক্ষিণাত্যে যাইয়া মসলিপত্তনের ফৌজদার আনোয়ার উদ্দী খাঁর আশ্রয় লাভ করিলেন; সৈয়দ মহম্মদ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। গোলমাল এখানেই থামিল না, সৈয়দ মহম্মদ তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং সুন্দরী রমণী-সংগ্রহাদি ব্যাপারদ্বারা প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, তাঁহারা মুরসিদ খাঁকে পুনরায় আসিয়া শাসনভার লইতে আমন্ত্রণ করিল। কিন্তু তিনি এই গোলমালের মধ্যে আসিয়া পড়িতে স্বীকৃত না হওয়াতে বখর খাঁকে নেতা করিয়া অতি গোপনে একদল লোক সৈয়দ মহম্মদকে বন্দী করিয়া ফেলিল। বখর খাঁ উড়িষ্যা দখল করিয়া বসিলেন, এদিকে সৈয়দ মহম্মদের জন্য নবাবের ভ্রাতা হাজি মহম্মদ ও পরিবারবর্গ ভাবিয়া আকুল, তাঁহারা সৈয়দকে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার সর্ত্তে সন্ধি করিতে নবাবকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী কোনকালেই ভয়প্রদর্শন কিংবা স্বীয় বিপদের আশঙ্কায় দুর্ব্বলতা দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। বখর খাঁ সৈয়দ মহম্মদকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া রাখিলেন যে, যুদ্ধে যদি বখর খাঁ পরাস্ত হন, তবে রক্ষকদিগের উপর আদেশ ছিল, যেন তাহারা তখনই বন্দীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলে। যুদ্ধ হইল, বখর খাঁ পরাস্ত হইলেন, কিন্তু দৈবক্রমে সৈয়দ মহম্মদ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ মহম্মদ মসুম খাঁর উপর উড়িষ্যাশাসনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে মৃগয়া করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, ভাস্কর পণ্ডিত-প্রমুখ বর্গীরা বাঙ্গলাদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বঙ্গাধিপের কাছে 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবী করিয়া বসিল (১৭৪১-৪২ খৃঃ।) নবাব টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাহারা অতি দ্রুত অভিযানপূর্ব্বক আলিবর্দ্দীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিল। নবাব বর্দ্ধমানে আশ্রয় লইলেন, তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা চারিদিকে লুণ্ঠনকার্য্য চালাইতে লাগিল। দৃঢ় অধ্যবসায় এবং বিপদে সর্ব্বদা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াও আলিবর্দ্দী খাঁ চারিদিকে সরিষাফুল দেখিতে লাগিলেন। তিনি দশলক্ষ টাকা দিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু সুচতুর বর্গী অবস্থা বুঝিয়া এককোটি টাকা এবং নবাবের সমস্ত হস্তী চাহিয়া বসিল। এরূপ অপমানজনক প্রস্তাবে আলিবর্দ্দী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যে দশলক্ষ টাকা বর্গীদিগকে দিবেন বলিয়া মজুত রাখিয়াছিলেন, তিনি তাহা সৈন্যসংগ্রহে ব্যয় করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে ভাস্কর পণ্ডিতকে তিনি সেই

একেকোটী টাকার প্রস্তাবের উত্তরে হাঁ, না, কিছু না বলিয়া—কথার ছলে ভাঁড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন। ভাস্কর ইহার মধ্যে প্রায় মুরসিদাবাদের কাণের কাছে পলাশী ও দাউদপুর প্রভৃতি গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবের বিদ্রোহী কর্ম্মচারী মীরহবিবের সহায়তায় হুগলী ও হিজিলি হইতে আরম্ভ করিয়া বৰ্দ্ধমান জেলার সমস্ত অংশ এবং উড়িষ্যা বালেশ্বর পর্য্যন্ত, এতদ্ব্যতীত পূর্ণিয়া, বীরভূম ও রাজমহল প্রায় দখল করিয়া লইলেন, সুতরাং মুরসিদাবাদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী কয়েকটি পল্লীছাড়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নবাব আলিবর্দ্দীর আর কিছুই রহিল না। এই সময়ের রচিত বাঙ্গলার ছড়া "খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?"—সকল বাঙ্গালীই জানেন। স্নেহের দুলালকে ঘুম পাড়াইবার সময়ও মাতা বর্গীর বিভীষিকা ভুলিতে পারেন নাই।

এই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দীর অনুমতিক্রমে ইংরেজেরা কলিকাতা অঞ্চলের চারিদিকে একটা পরিখা খনন করিতে লাগিয়া গেলেন। এই পরিখা সাত মাইল ব্যাপক হইবার কথা ছিল, ছয় মাসে তিন মাইল পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার দিকে বর্গীরা না আসাতে তারপর আর খননকার্য্য চলে নাই।

নবাব এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। নৌসেতু দ্বারা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সহসা মারহাট্টা শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই আক্রমণের জন্য ভাস্কর পণ্ডিত প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া অতি দ্রুত পালাইয়া বিষ্ণুপুরের বনবহুল দুর্গমস্থানে আশ্রয় লইলেন। এদিকে নাছোড়বান্দা আলিবর্দ্দী যত জোরে শত্রুসৈন্য পালাইতেছিল, তত জোরে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতেছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত স্থির হইয়া কোনস্থানে থাকিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরের লোকেরা মনে ভাবিল, বর্গীরা তাঁহাদের রাজধানী লুট করিবে। রাজাকে তাহারা সমস্ত অবস্থা জানাইল, রাজা বলিলেন, "আমি জানি কি? তোমাদের কথা মদনমোহনকে জানাও;" এই বলিয়া তিনি ধরা দিয়া স্বয়ং মন্দিরের দ্বারে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিলেন। পাণ্ডা শেষ রাত্রে দেখিল এক দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণহয়ারূঢ় শ্যামমূর্ত্তি পুরুষবর বর্গীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন। প্রাতে সকলে দেখিল বর্গীরা অনেক গোলাগুলি নিকটবর্ত্তী স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পাণ্ডা মন্দিরদ্বার খুলিয়া দেখিল, মদনমোহন-বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গে বারুদ, হস্তপদ বারুদের কালী মাখা। বাঙ্গলার ছড়াটির মর্ম্ম এই যে, বর্গীরা পলায়নের পথে বিষ্ণুপুরে উঁকি মারিয়া গিয়াছিল। প্রজারা ভাবিল স্বয়ং ভগবান্ তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বর্গীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। অকস্মাৎ অজ্ঞাতভাবে বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা ইহা ভগবানের কৃপা এবং তাঁহারই বাহুবলের আশ্রয়ের ফল মনে করিয়া সেই সুন্দর ভক্তি ও কারুণ্যমিশ্রিত ছড়াটি রচনা করিয়াছিল (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ)। মেদিনীপুরে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে নবাবের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বর্গীরা হারিয়া যায়।

কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামা এখানেই শেষ হইল না। রঘুজী ভোঁসলা তাঁহার সেনাপতির পরাজয়-সংবাদে চটিয়া গিয়া বহু সৈন্য স্বয়ং লইয়া বঙ্গদেশে অভিযান করিলেন। সকলেই

জানেন মারহাট্টাদের ইহার মধ্যেই আত্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। বেরার অঞ্চলের নেতা ছিলেন রঘুজী ভোঁসলা এবং পুনার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি বালাজীর অধিকৃত ছিল। যখন রঘুজী ভোঁসলা আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে আগমন করেন, সেই সময়ে বালাজীও নবাবের নিকট হইতে সম্রাট্‌প্রদত্ত সনন্দের বলে এগার লক্ষ টাকা চৌথের দাবী করিয়া বৃহৎ সৈন্যের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই দুই দলের লুণ্ঠনাদিব্যাপারে সোণার বাঙ্গলা ছারখার হইবার দশায় উপস্থিত হইল, এবং আলিবর্দ্দী দুই দলকে সামলাইতে না পারিয়া বালাজীকে তাঁহার প্রার্থিত দাবী মিটাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই সন্ধিসূত্রে বালাজী নবাবকে রঘুজীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং শত্রুশিবিরের লুণ্ঠনলব্ধ ধনরত্নের অর্দ্ধেকটা তাঁহার হইবে, আলিবর্দ্দী এই প্রতিশ্রুতি পাইলেন। রঘুজী এই দুই শত্রুর হাত হইতে নিরাপদ্ হইবার মানসে তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ পলায়নবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যদিও যুদ্ধে নবাবের জয় হইল, তথাপি বর্গীকর্ত্তৃক লুণ্ঠনের ফলে তাঁহার রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হইল।

এই মহারাষ্ট্র হাঙ্গামার সময়ে মুস্তাফা খাঁ আলিবর্দ্দীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই বীরত্ব ও সাহসে আলিবর্দ্দী জয়ী হইয়াছিলেন, এজন্য নবাব কৃতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু মুস্তাফা খাঁর আস্পর্দ্ধা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। বিহার প্রদেশের যুদ্ধে ইহার নিকট পূর্ব্ব ঋণ স্মরণ করিয়া তিনি সেই দেশও তাঁহাকে দিতে মনন করিয়াছিলেন কিন্তু মুস্তাফা খাঁ তাঁহার অধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তথাকার স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার দাবী করিলেন। ইহার পর এই ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশও দখল করিতে চাহিতে পারে—এই আশঙ্কায় নবাব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহাকে খুসী করিবার জন্য নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল জমিদারের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন, মুস্তাফা খাঁ তাঁহাদের নিকট প্রচুর উৎকোচ পাইয়া নবাবকে তাঁহার আদেশ পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিতেন। নবাব সমস্ত জানিয়া শুনিয়া শুধু খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজের হুকুম বদলাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু শেষে উভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি কারণে তিনি মনে করিলেন, নবাব তাঁহাকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি নবাবকে প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করিয়া বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং নানারূপ হিসাব দেখাইয়া নবাবের নিকট সতের লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে ইহা পাইলেই তিনি নবাবের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইবেন। এইরূপপ্রস্তাবে নবাব মনে মনে খুসী হইয়া তখনই হিসাব না দেখিয়া তাঁহাকে সেই দাবীর টাকা মিটাইয়া দিলেন। কিন্তু মুস্তাফা খাঁ নবাবের পাঠান সেনাপতি সমসের খাঁ ও রহিম খাঁকে লোভ দেখাইলেন যে, আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুনরায় বাঙ্গলাদেশ পাঠানদিগকে দেওয়াইবেন, তাঁহারা যদি যোগ দিয়া মুস্তাফার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মুস্তাফা বর্গদের সঙ্গে একযোগে আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, এই ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

মুস্তাফা খাঁর দাবী।

১৭৪৫ খৃঃ অব্দে মুস্তাফা খাঁ রাজমহল লুণ্ঠন করিয়া মুঙ্গের হইয়া পাটনায় জিনউদ্দিনের রাজধানী আক্রমণ করেন। যদিও জিনউদ্দিনের সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তথাপি তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। একটা তীর লাগিয়া মুস্তাফার ডান চক্ষুটা নষ্ট হইয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে কষ্টে আনা হয়—ইহার পর তিনি বেশী দিন বাঁচেন নাই।

কিন্তু সমসের পাঠানও বেশীদিন বিশ্বস্ত রহিলেন না। তিনি গোপনে রঘুজীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। একসময়ে নবাবসৈন্য রঘুজীকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারিত, কিন্তু সমসের তাঁহাকে পালাইতে সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী সমস্তই জানিতে পারিলেন। সমসের হঠাৎ পাটনায় যাইয়া জিনউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নির্দ্দয়ভাবে জিনউদ্দিনকে নিহত করিলেন; তাঁহার ভূ-প্রোথিত সত্তরলক্ষ টাকা ও বহু মণি-মাণিক্য সমসেরের হাতে পড়িল; সমসের এতদ্ব্যতীত জিনউদ্দিনের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, ইহাদের মধ্যে বেগম আমনাও (আলিবর্দ্দীর কন্যা) ছিলেন।

এদিকে রঘুজীর পুত্র জানোজী কটকের নিকট লুণ্ঠনাদি চালাইতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দী ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ সেনাপতি মীরজাফরকে মেদিনীপুর অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মীরজাফর ভয়ে মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমানে পালাইয়া গেলেন এবং তাঁহার ধনরত্ন ও হস্তীগুলি বর্গীরা সহজেই লুণ্ঠন করিয়া লইল। মীরজাফরকে একেবারে অকর্ম্মণ্য দেখিয়া আলিবর্দ্দী আতাউল্লা নামক এক কর্ম্মঠ সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি প্রথম জানোজীর একদল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কার্য্যতৎপরতা দেখাইলেন, কিন্তু এক পাগলা ওমরাহ গণিয়া বলিল যে, তিনি শীঘ্রই বাদসাহ হইবেন। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়া আতাউল্লার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল এবং তিনি নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মীরজাফরকে তিনি নবাব হইয়া বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব দিবেন—এই লোভ দেখাইয়া নিজের দলে টানিয়া লইলেন।

আলিবর্দ্দীর গুপ্তচরেরা এ সমস্ত সংবাদই তাঁহাকে দিয়াছিল। তিনি সময় নষ্ট না করিয়া এই দুই সেনাপতিকে অবমানিত করিলেন; তিনি মীরজাফরকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি তাঁহাকে হিসাব-নিকাশ দিতে অসম্মত হওয়াতে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নবাব জয়ী হন, সমসের নিহত হন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হয়। নবাব তাঁহার কন্যাকে আশাতীতরূপে ফিরিয়া পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে জিনউদ্দিনের মৃত্যুর পর নবাব জানকীরামকে বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন।

বর্গীদের সঙ্গে শেষ সন্ধি।

তখন আলিবর্দ্দীর বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর; জানোজীর আক্রমণ তখনও থামে নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই দীর্ঘকালের যুদ্ধবিগ্রহে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া নবাব এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন; সন্ধির সর্ত্তানুসারে বর্গীদিগকে কটক প্রদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন এবং

বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে বারলক্ষ টাকা মহারাষ্ট্র-সরকারে পৌছাইয়া দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন (১৭৫১ খৃঃ)। ইহার পর বর্গীরা আর কোন উপদ্রব করে নাই।

আলিবর্দ্দী এত বড় বীর হইয়াও স্নেহজনিত দুর্ব্বলতা এড়াইতে পারেন নাই। তিনি সিরাজকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং এই সুশ্রী কিশোরবয়স্ক দৌহিত্রের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। সিরাজের বিবাহে তিনি এমন ঘটা এবং বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছিলেন যে, বহুদিন পর্য্যন্ত এই সমারোহ-ব্যাপারের কথা বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র আলোচিত হইত।

যখন আলিবর্দ্দী খাঁ এইভাবে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা সুশাসন করিয়া বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সিরাজউদ্দৌলাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারিপদে মনোনীত করিলেন। মাতামহের আদরে সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, আলিবর্দ্দী তাঁহার শত দোষ দেখিতেন না। সিরাজউদ্দৌলা যাঁহাকে তাঁহার দাদা মহাশয় বা তাঁহার ভাইদের প্রিয় মনে করিতেন, তাঁহাকেই হত্যা করিতেন। এই ভাবে হুসেনকুলি খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিলেন। নবাব তাঁহার স্নেহের দুলালকে কোন দণ্ড দিলেন না। প্রজারা সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। ইহাই শেষ নহে—হঠাৎ সিরাজ মুরসিদাবাদ হইতে কতক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, নবাবকে লিখিলেন, "আপনি আমাকে পুতুলের মত আদর দিয়া রাখিয়াছেন, কোন রাজ্যের শাসনভার দেন না, সুতরাং আমি আপনার সঙ্গে লড়াই করিব এবং বলপূর্ব্বক রাজ্য কাড়িয়া লইব।" সিরাজ পূর্ণিয়ার দিকে সসৈন্যে যাইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা জানকীরামের শাসনভার তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে নবাব তাঁহার দুলালটি পাছে এইরূপ অস্বাভাবিক যুদ্ধবিগ্রহে আহত হন,—তাঁহার অধিকার নষ্ট হওয়া অপেক্ষা উহাই তাঁহার বেশী ভাবনার বিষয় হইল। তিনি অতি স্নেহের সহিত তাঁহাকে জানাইলেন—"তুমি এই সিংহাসন পাইবে, ফিরিয়া এস" ইত্যাদি। সিরাজ সে সকল স্নেহের বাক্যে ভুলিলেন না। জানকীরাম দেখিলেন, সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে পাছে তিনি হত বা আহত হন, ইহাও যেরূপ ভাবনার বিষয় হইল, এদিকে নবাবের বিনা অনুমতিতে তিনি সিরাজকেই বা কি করিয়া শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন—এই সমস্যায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন; অবশেষে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। সিরাজের প্রধান পরামর্শদাতা মাধি নিস্পার খাঁ যুদ্ধে নিহত হইল এবং সিরাজ দূর এক পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জানকীরাম কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার বাসস্থানের জন্য মস্ত বড় এক প্রাসাদ নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং অল্প পরেই তাঁহাকে শরীররক্ষকগণ-পরিবৃত করিয়া মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া অক্ষতদেহে যে তিনি তাঁহাকে ফিরিয়া পাইলেন, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। নবাবের ভ্রাতা হাজি মহম্মদের ছেলেরা একে একে দুইজন এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহারা উভয়েই জনপ্রিয় ছিলেন। নবাবদুহিতা ঘেসেটি বেগম বিস্তর টাকাকড়ি লইয়া মতিঝিলে বাস করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সিরাজ না হইয়া তিনিই পিতৃ-রাজ্যের

অধিকারী হন, তাহার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পূর্ণিয়াতে হাজি মহম্মদের পৌত্র সৈয়দ আহম্মদের পুত্র শকৎজঙ্গ শাসনভার গ্রহণ করিলেন। আলিবর্দ্দী ৮০ বৎসর বয়সে শোথরোগে দেহত্যাগ করিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সিরাজউদ্দৌলাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্দর মহলের বেগমেরা তাঁহাদের পক্ষে নবাব যাহাতে সিরাজকে কিছু বলিয়া যান এই অনুরোধ করিলে আসন্নমৃত্যু নবাব বলিলেন, "হায়! যদি তিনটি দিনও সিরাজ ভাল হইয়া থাকিত ও তাঁহার মাতামহীর সহিত ভাল ব্যবহার করিত, তবে এই অনুরোধের ফল প্রত্যাশা করা যাইত।" ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মালিক, মহাবীর, ধীরস্বভাব সর্ব্বজনপ্রিয় নবাব ১৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহাকে জমিদারেরা এতটা বিশ্বাস করিতেন যে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে তাঁহাকে তাঁহারা সাহায্যার্থ এককোটি টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা—১৭৫৬-৫৭ খৃঃ

যখন শৈশবে আমরা নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা শুনিতাম, তখন মনে হইত তিনি পক্ককেশ, পক্কশ্মশ্রু এক মহা অত্যাচারী দানবপ্রকৃতির লোক। তখনকার দিনের ইতিহাস ও জনশ্রুতি তাঁহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর মাত্র। তিনি চার মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অতি প্রিয়দর্শন এবং বৃদ্ধ নবাবের চোখের মণির ন্যায় ছিলেন। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (ফোর্ট উলিয়ম্ কলেজের অধ্যাপক) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ "কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" নামক যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে—সিরাজ সিংহাসনে উঠিয়া গর্ভবতী রমণীর পেট চিরিয়া সন্তান কিরূপে থাকে তাহা দেখিতেন, গঙ্গাগর্ভে নৌকা ডুবাইয়া লোকে কি ভাবে মরে তাহা দেখিয়া হৃষ্ট হইতেন। আমাদের দেশের একটা রীতি আছে, যদি তাঁহারা কোন সাধুর জীবন বর্ণনা করেন তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুরা যে সকল অলৌকিক কাণ্ড ও লীলাখেলা করিয়াছেন সেগুলির সমস্ত তাঁহার জীবনে আরোপ করেন; সেইরূপ কোন দুষ্ট চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অসাধুগণ যাহা কিছু করিয়াছে—তাহাও বর্ত্তমান চরিত্রে আরোপ করিয়া থাকেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবেই সিরাজচরিত্রে এই সকল কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। ইহা কোন মুসলমানের ইতিহাসে নাই, কোন সাহেবের বর্ণনায় নাই। মুতাক্ষরিন ও ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস এবং অপরাপর লেখকেরা—যাঁহারা সিরাজের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল কথা লিখিয়াছেন—তাঁহারা কেহই ঐরূপ অদ্ভুত কথা লিখেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত-লেখক যত পাড়াগেঁয়ে আজগুবি কথা শুনিয়াছেন, সবই নির্ব্বিচারে লিখিয়া গিয়াছেন।

সিরাজ, তরুণ বয়সে—যখন হয়ত তাঁহার ঈষৎ গোঁফের রেখা উদ্গত হইয়াছিল—তখন তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া চারিমাসের কিছু ঊর্দ্ধকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই চারিমাস বিদেশীদিগের সঙ্গে মনোমালিন্য এবং স্বীয় দরবারের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি একটি দিনও শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। এই অল্প সময়ে তিনি এত কি অত্যাচার করিতে পারিতেন যে জগতের ইতিহাসে তাঁহাকে 'নিরো'র পার্শ্বে স্থান দিতে হইবে? জগৎ শেঠের অন্দরে রমণীর বেশে প্রবেশ করিয়া তিনি সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে অপমান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে এবং নবীনচন্দ্র সেন "বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে" ইত্যাদি সরোষ উক্তি শেঠজীর মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইয়াছি, ঐরূপ একটা দুষ্কার্য্য নবাব আহম্মদ করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেন নবাব আহম্মদ সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন। সিরাজের সম্বন্ধে এই অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। অন্ধকূপ হত্যাটা অমূলক নহে, কিন্তু উহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের বন্দীদিগকে কেহই রাজপ্রাসাদে স্বর্ণখট্টায় শোয়াইয়া রাখেন না। হয়ত সেখানে কর্ম্মচারীরা কিছু অত্যাচার করিয়াছিল, কিংবা বন্দীদিগের অভাব-অভিযোগের দিকে কর্ম্মচারীরা মনোযোগী হয় নাই। ঠিক ঘটনার সময়ে এই বিষয়টা এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে তাহা সাহেবেরা প্রথম দিক্‌কার রিপোর্টে উল্লেখ করেন নাই, শেষকালে উহার একটি অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, নবাব উহার কিছুমাত্র খবর রাখিতেন না। এখনই কি বড়লাট ভারতবর্ষের কোন্ জেলে কোন্ বন্দীর প্রতি কি অত্যাচার হইতেছে, কাহার কি অসুবিধা হইতেছে ইহার সকল সংবাদ রাখেন? জেলের কর্ম্মচারীরা কি বন্দীদিগের সহিত ব্যবহারে প্রত্যেক বিষয়ে বড়লাটের মঞ্জুরী লইয়া কাজ করেন? আমাদের বিশ্বাস অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপারটা একেবারে অমূলক নহে, কিন্তু শেষকালে তিলকে তাল করিয়া লেখা হইয়াছে। রাজীবলোচন, যিনি ইংরেজদের পক্ষ হইয়া কেরি সাহেবের প্রেরণায় তাঁহার পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তিনিও এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত লণ্ডনে ছাপা হয়;—ইহাতে সিরাজের সম্বন্ধে অতি বীভৎস বহু মিথ্যাকথা—যাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মাত্র ৫০ বৎসর পরের লিখিত এই বিবরণটিতেও সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ থাকা সত্ত্বেও অন্ধকূপের কথা একবারও উল্লিখিত হয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহের সময় এইরূপ সকল ঘটনা এত সচরাচর দৃষ্ট হয় যে তাহা কেহ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। এই ঘটনা অত্যাচারমূলক স্বীকার করিলেও নবাবকে এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা সঙ্গত হইবে না।

তবে নবাব যে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত কথা। তিনি তাঁহার দাদা-মহাশয়ের আদরে অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ করিলেও বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে শাসন করেন নাই, এজন্য তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেন। প্রজাদিগকে অযথা পীড়ন করিতেন, লোকে জানিত সিরাজ যাহা করিবেন, তাহার উপরে নালিশ চলিবে না। সুতরাং জনসাধারণ এই অতিরিক্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত খামখেয়ালী তরুণ যুবকের প্রতি বীতরাগ

হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তিনি সুন্দরী স্ত্রীলোক খুঁজিয়া বেড়াইতেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব ওস্তাদ ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি এইভাবে বহু অপরাধ করিয়াছেন, কিন্তু সিরাজ ৪ মাস কালের মধ্যে এরূপ অপরাধ কতটাই বা করিতে পারিয়াছিলেন? নাটোরের মহারাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী রাজসাহী-বাজুরাগ্রামবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর পত্নী ছিলেন, তিনি নিরুপমা সুন্দরী ছিলেন, তিনি বালবিধবা। তাঁহার দিকে সিরাজের লোভ ছিল। এসম্বন্ধে দেশব্যাপী এত প্রবাদ আছে যে তাহা অবিশ্বাস করা চলে না।

তারাসুন্দরী।

তারাসুন্দরীকে লইয়া রাণী ভবানী এতটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার একটা মূর্ত্তি গড়িয়া তাহা শ্মশানে পোড়াইয়া তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আদুরে ছেলে তাঁহার অভিভাবক গুরুজনের যত আদর পায় সেই পরিমাণে সে অপরাপর লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া থাকে! এই হিসাবে সিরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই লোকের বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। অবশ্যই হুসেনকুলি ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া বিনা শাস্তিতে ক্ষমা লাভ করাতে এবং পূজনীয় মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে অত্যধিক আদরে নষ্ট এই বালককে দেখিতে না পারার জন্য আমরা জনসাধারণকে দোষ দিতে পারি না। তিনি লোকশ্রদ্ধা এতটা হারাইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিষ্ঠুর মৃত্যু এবং তাঁহার বিরুদ্ধে হেয় ষড়যন্ত্র—লোকে জানিলেও তাঁহার স্মৃতি কোন কারুণ্যের সৃষ্টি করে নাই, এমন কি যে ফকির তিনদিনের উপবাসী নবাবকে খাবার দেওয়ার লোভে ডাকিয়া আনিয়া মীরজাফরের লোকের হাতে ধরাইয়া দিল, তাহার বিরুদ্ধে লোকে একটা কথাও বলিল না। কয়েক দিনের নিরম্বু উপবাসের পর ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর হতভাগ্য নবাব যখন আহারে বসিবেন, তখন ধৃত হইয়া হত্যার জন্য মীরজাফর-গৃহে নীত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শব হস্তিপৃষ্ঠে রাজপথে নীত হইলে তাঁহার মা আমনা বেগম আর্ত্তনাদ করিয়া সেই হস্তীর পদতলে পতিত হইলেন। যে প্রিয়দর্শন কিশোর তাঁহার দাদামহাশয়ের আদরের দুলাল ছিলেন, তাঁহার অনাহার-অনিদ্রা-ক্লান্ত দেহের উপর নির্ম্মম খড়্গাঘাত ও রাজনন্দিনীর পরিতাপে বোধ হয় পাষাণও বিগলিত হইত, কিন্তু তাঁহার এই করুণ শোচনীয় পরিণাম উপলক্ষে পল্লীকবিরা একটা ছড়া বা গীতিকা রচনা করিল না। পলাশীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চাষারা যেরূপভাবে হলচালনা করিত, সেইভাবেই কৃষি-কার্য্য চলিল, কোন পল্লী-কবি এরূপ শোকাবহ ব্যাপার লইয়া একটি গান বাঁধিল না, ইহার কারণ কি? অথচ ইংরেজদের গুণগানে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিকে জয়জয়কার পড়িল—এই বিসদৃশ কাণ্ডের অর্থ কি? নবাব জনমত অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন—অত্যাচার করিয়াছেন—এবং প্রজারা এমন কি রাণী ভবানীর ন্যায় পূজনীয়া সম্ভ্রান্ত মহিলাও তাঁহার ভয়ে অনিদ্র নিশা যাপন করিয়াছেন। সেনবংশের রাজত্বনাশের পরেও তৎসম্বন্ধে পল্লীকবিরা নীরব ছিলেন, নিম্ন সম্প্রদায়ের শতসহস্র লোকের প্রীতি তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, শুধু ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে ইতরের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, বাঙ্গলা ভাষায় শাস্ত্রপ্রচার ও ইতরশ্রেণীর সম্বন্ধে

ছোঁয়াচে রোগের চূড়ান্ত লীলা দেখাইয়া জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সেনবংশের কীর্ত্তিগুলি তাঁহাদের পল্লীগাথার অন্তর্ব্বর্ত্তী করেন নাই। কিন্তু সহস্র দোষসত্বেও হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাকে রাজনীতিক্ষেত্রে কোনরূপ দোষ দেওয়া চলে না।

সিরাজউদ্দৌলার মাসী ঘেষিটি বেগম বহু ঐশ্বর্য্য লইয়া মতিঝিলে বাস করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর তিনি কতকগুলি ওমরাহকে হাত করিয়া সিংহাসন লাভ করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সিয়ার মুতাক্ষরিনের লেখক লিখিয়াছেন—এই দুশ্চরিত্রা এবং বুদ্ধিহীনা রমণী যদি সিরাজকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন, তবে কত ভাল হইত। তাঁহাকে যাহারা উৎসাহ দিয়া প্রচুর অর্থ গ্রাস করিয়াছিল, সেই সকল ওমরাহ—মীর নজর আলি, দোস্ত মহম্মদ এবং রহিম খাঁ—সেই অর্থে দূরে যাইয়া প্রাসাদ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুখে বাস করিতে লাগিলেন, এবং সিরাজ তাঁহার বিপুল অর্থ স্বীয় ভাণ্ডারে আনিয়া তাঁহাকে মতিঝিল হইতে বন্দীবাসে প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ প্রাচীন কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কয়েকজনকে বিদায় দিয়া বাকী কয়েকজনের মাথা ডিঙ্গাইয়া—স্বীয় মনোনীত দুই তিনটি প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইহাদের স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কারে প্রবীণ কর্ম্মচারী ও ওমরাহরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে সিরাজ যে অবিবেচনার কাজ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যাঁহাদিগকে তিনি বিদায় করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মীরজাফর। ইনি অলিবর্দ্দী খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা অনেকবার করিয়াছেন, বৃদ্ধ নবাব তথাপি ইহাকে দুই একবার কর্ম্মচ্যুত করিয়াও শেষে ক্ষমা করিয়াছিলেন। সিরাজ কুসঙ্গীদিগের সঙ্গে মিশিয়া অত্যাচার করিতেন—এই অভিযোগ তাঁহার কার্য্যকলাপে সমর্থিত হয় না, বরঞ্চ তিনি যাঁহাদিগকে পদমর্য্যাদা দিয়া শাসনভার দিয়াছিলেন—তাঁহাদের একটিও অবিশ্বাস্ত বা অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার উদারহৃদয় দাদামহাশয় বরং যাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই বিশ্বাস হারাইয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন, কিন্তু সিরাজ এবিষয়ে চতুর ছিলেন। মীরজাফরকে তিনি প্রথম হইতেই অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। যে দুই ব্যক্তিকে নবাব শাসনবিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মোহনলাল। ইনি সিরাজের পারিবারিক বিভাগের দেওয়ান বা প্রধান সরকার ছিলেন; সিরাজ ইঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দিয়া সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ (Prime Ministership) দিয়াছিলেন। বাজার-সরকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন, তারপর তিনি কাফের। প্রবীণ ওমরাহদের দল তাঁহার নামে যেসকল কথা রাষ্ট্র করিল, তাহা সত্য কি না কে বলিবে? হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের উত্তেজনায় মানুষ অনেক মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কথিত আছে, মোহনলালের একটি ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রাচ্য আদর্শ-অনুসারে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন—সে আদর্শের কথা আমরা সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পারসী প্রভৃতি অনেক ভাষায় লিখিত দেখিতে পাই; "দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী"—পদ্মিনীলক্ষণাশ্রিত নারীর বর্ণনায় পাওয়া

যায় ; "কৃশোদরী," "ক্ষীণমধ্যা," "ক্ষীণকটি"—ইত্যাদি বিশেষণ বাল্মীকি সীতার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন ; কালিদাসের "মধ্যে ক্ষামা"ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাঙ্গলায় কৃত্তিবাস "মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাকলী" লিখিয়া এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আরও জটিল করিয়াছেন। পালীতে জেলেখার রূপ-বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন, "জেলেখার কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, বরং তাহারও অৰ্দ্ধেক।"—আমরা বুঝিতে পারি এই সকল বর্ণনায় কবিরা কোন সুন্দরী রমণীর দিকে চাহিয়া রূপবর্ণনা করেন নাই—তাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্রের কেরামত ও বুদ্ধির কসরৎ দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, তথাপি একথা নিশ্চয় যে চীনা রমণীর ক্ষুদ্রপদের মত ভারতীয় কিংবা পারস্যের রমণীদের ক্ষীণ কটি ও দেহ প্রশংসিত।

কথিত আছে মোহনলালের ভগিনীটি ওজনে শুধু ২২সের ছিলেন এবং পান খাইলে মাত্র তাঁহার ঠোঁট দুইটি লাল হইত না, তাঁহার কণ্ঠের খানিকটা অংশ পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠিত। ইনি নর্ত্তকী ছিলেন—ইহাকে নাকি মোহনলাল সিরাজউদ্দৌলাকে দিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি সিরাজউদ্দৌলার এক শ্যালকের সঙ্গে ব্যভিচারে ধৃত হন। নবাব তাঁহাকে বলিলেন, "কুমারি! আমি দেখিতেছি, আপনি একটি গণিকা মাত্র।" সুন্দরী জানিতেন, এবার তাঁহার রক্ষা নাই, সুতরাং ভারতরমণীর স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া তিনি ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন, "হাঁ নবাব সাহেব, আমি গণিকাই বটে, আমি নর্ত্তকী—গণিকাবৃত্তি আমার ব্যবসায়," তৎপরে সিরাজের মাতা আমনা বেগমের সম্বন্ধে একটা ক্রুর ব্যঙ্গ করেন। (অবশ্য সিরাজের মাতা আমনা বেগম সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা প্রচলিত ছিল।) সিরাজ এই কুমারীকে জীবিত অবস্থাতেই চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া বদ্ধ করিয়া মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, মুতক্ষরিনে যেরূপ বর্ণিত আছে, আমি অবিকল তাহাই লিখিলাম (সিয়ার মুতক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ)। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, এই রমণী আদবেই মোহনলালের ভগিনী ছিলেন না।

মোহনলালের ভগিনীসম্বন্ধে এই সকল কথার মূলে যাহাই থাকুক না কেন, একথা কখনই স্বীকার্য্য নহে যে মোহনলাল সেই হতভাগিনী রূপসীর খাতিরে নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি নবাবের বাল্যসখা ছিলেন, দক্ষতা, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততায় যে তাঁহার দ্বিতীয় ছিল না—তাহা ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ওমরাহ যাঁহার উপর সিরাজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, তিনি ছিলেন ঢাকানিবাসী মীরমদন। ইহারও অনেক মহা গুণের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। সুতরাং সিরাজ যে তাঁহার দুষ্ট কুসঙ্গীদিগকে বড় বড় পদ দিয়াছিলেন, একথা গ্রাহ্য নহে। বরং যখন প্রবীণ মন্ত্রী ও ওমরাহের দল চিরকাল তাঁহার নুন খাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তখন এই দুই চিরবিশ্বস্ত, রণনিপুণ ও স্বীয় আপদ্-বিপদে সম্পূর্ণ নির্ভীক ব্যক্তি সিরাজকে রক্ষা করিবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

সিরাজ তাঁহার মামাত ভাই পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সকৎজঙ্গ হাজি মহম্মদের পৌত্র এবং সৈয়দ মহম্মদের পুত্র। এই যুবকের বুদ্ধির প্রাখর্য্য

সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গগণও প্রশংসাপত্র দিতে পারিবে না। সিয়ার মুতক্ষরিনের লেখক গোলাম হুসেন স্বয়ং ইহার এক ওমরাহ ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সকৎজঙ্গের ব্যবহারের অনেক রহস্যজনক ঘটনা উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পূর্ণিয়ার এই তরুণ নবাবের নাম-দস্তখতের মত বিদ্যাও ছিল না। সুতরাং গোলাম হুসেন তাঁহার আদেশমত যে সকল পত্রের মুসাবিদা করিতেন, তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে যাইয়া অনেক বিভ্রাট উপস্থিত হইত। কোন্ অক্ষর কেমন করিয়া লিখিতে হইবে, কোথায় নোক্তা, কোথায় বক্ররেখা বা সরল রেখা দিতে হইবে, প্রতি পদে নবাবকে তাহা বলিয়া দিতে হইত। এইরূপ করিতে যাইয়া গোলাম হুসেন একদিন দেখিলেন, নবাব কলম ফেলিয়া দিয়া দূরে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ওমরাহ আর কি করেন, এক ঘণ্টা তিনিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কি অপরাধে নবাব বিরক্ত হইয়াছেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আর একদিন নবাব বলিলেন, "দেখ, তুমি আমার ওমরা, তুমি আমার মাষ্টার নও, তবে তুমি আমার লেখাপড়া লইয়া এত মাথা ঘামাও কেন?" গোলাম হুসেন সতর্ক হইয়া গেলেন, ইহার কিছুদিন পরে সকৎজঙ্গ আবার ইহাকে সানুনয়ে অনুরোধ করিলেন, "তোমায় আমাকে কিছু লেখাপড়া শিখাইতে হইবে বৈকি? অমন চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন?" যুদ্ধকালে ওমর খাঁ নামক এক মন্ত্রী তাঁহাকে সুপরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুবৎসর নিজামুলমুলুকের অধীনে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নবাব যে ভাবে সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহা যুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে। তখন নবাব নিজামুলমুলুককে গালাগালি দিয়া বলিলেন "আমি কোন উপদেশ শুনিতে চাহি না, আমি তিনশত যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইয়াছি।" সিরাজউদ্দৌলা রাজা রাসবিহারীকে পূর্ণিয়ায় পাঠাইয়া দুইটি পরগনাসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর শুনিয়াছিলেন, মীরজাফর এবং অপর কয়েকজনের প্রবর্তনায় সকৎজঙ্গ তাঁহার অধীনত্ব অস্বীকার করিয়া অনেক রকম কাণ্ড করিতে উদ্যোগ করিতেছেন। সিরাজের পত্রখানি খুব ভদ্রভাবে লিখিত হইলেও তাহার ভিতরে একটা রাজনৈতিক চাল ছিল। এই পত্রের উত্তর যাহা দিতে হইবে, গোলাম হুসেন সকৎজঙ্গের আদেশমত তাহার একটা খসড়া করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিলেন। এই খসড়াটায় খুব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় ছিল; স্পষ্ট জবাব বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু নানা অছিলায় দেরী করিয়া সময় লইবার অভিসন্ধি ছিল। সিরাজউদ্দৌলা সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য যাহাতে না বুঝিতে পারেন সেইরূপ লিপিকৌশলের সঙ্গে মুসাবিদাটি করা হইয়াছিল, সকৎজঙ্গ উহা শুনিয়া খুবই খুসী হইলেন। কিন্তু যখন সভাসদেরা গোলাম হুসেনের চিঠির অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন "ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্,"—নবাব নিতান্ত চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "ইহার (গোলাম হুসেনের) অবশ্যই বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমার বুদ্ধির সঙ্গে ইহার তুলনা হয়? ইহার ঘটে যদি দশ হাজার লোকের বুদ্ধি থাকে, তবে আমার ঘটে লাখ লোকের বুদ্ধি আছে, আমি ইহার লেখাটা অনুমোদন করিব না।" সুতরাং তিনি অন্য এক মন্ত্রীর বুদ্ধিতে সিরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি দিল্লী

হইতে তিন প্রদেশের সনন্দ পাইয়াছি, তদনুসারে আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের মালিক। কিন্তু যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তজ্জন্য আপনার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি এই পত্র পাওয়া মাত্র ঢাকা কি অন্য প্রদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জায়গীর গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাউন, কিন্তু খবরদার, আপনি মুর্সিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে একটি কপর্দ্দক বা কোন দ্রব্যসামগ্রী লইতে পারিবেন না, এই পত্রের উত্তরের জন্য আমি ঘোড়ার পাদানিতে পা দিয়া অপেক্ষা করিতেছি।" সত্যসত্যই কতকগুলি নির্বুদ্ধি আমীরের মন্ত্রণায় সকৎজঙ্গ বহু টাকা খরচ করিয়া সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মালিকানির সনন্দ আনাইয়াছিলেন, উক্ত সম্রাট্‌কে এক কোটী টাকা বৎসরে রাজস্ব দেওয়ার সর্ত্ত তাহাতে ছিল। মুতক্ষরিনে লিখিত আছে—এই সনন্দ পাইয়া "তিনি ছিলেন চন্দ্রলোকে, লাফ দিয়া একেবারে উঠিলেন সূর্য্যলোকে," বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়া তিনি কি কি করিবেন, তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীদিগের সহিত তাহা আলোচনা করিয়া বলিতেন, "আমি তাহার পর সুজা উদ্দিন খাঁ ও সাহেবুদ্দিনকে দমন করিব, তারপর ইচ্ছামত একজন সম্রাট্‌কে আমার হাতের পুতুলের মত আগ্রার সিংহাসনে বসাইব। অতঃপর আমি লাহোর ও কাবুল হইয়া কান্দাহার ও খোরাসানে যাইয়া বাস করিব, যেহেতু বাঙ্গলার হাওয়া আমার একেবারেই সহ্য হয় না।" আলানাস্কারের মত এই ক্রমোন্নতির পরিকল্পনা করিতে যাইয়া তাঁহার পূর্ণিয়া রাজ্যটি একটা খেলানার মত ভাঙ্গিয়া গেল। মীর আলি খাঁ নামক এক ফৌজদার একদা তাঁহাকে "জগতের একমাত্র আশ্রয়" বিশেষণ দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। সকৎজঙ্গের এই উপাধিটি এত ভাল লাগিয়াছিল যে সরকারী সমস্ত দলিলপত্রে ও সনন্দে তিনি ঐ উপাধি ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ উপাধি ছাড়া চিঠিপত্র লিখিত, তাঁহার পত্র তিনি না পড়িয়াই টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। সেরূপ কোন পত্র নবাবের সেরেস্তায় গৃহীত হইত না। তিনি সমস্ত প্রবীণ ও তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া চটাইয়া দিলেন। এমন কি রণস্থলেও তিনি তাঁহার বড় বড় ওমরাহদিগকে এইরূপ ভাষায় তাড়া করিতেন,—"গুলিগোলার লক্ষ্য হইয়া থামের মত দাঁড়াইয়া আছ কেন? দেখছ না হিন্দু শ্যামসুন্দর কতটা এগিয়া গেল?" বয়স্ক যোদ্ধগণ এইরূপ সম্বোধনে এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে যখন সিরাজের সঙ্গে প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল—তখন খুব অল্পলোককেই তিনি স্বীয় অনুচরস্বরূপ পাইলেন। মীরজাফর লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও কার্য্যকালে তাঁহার কোন সহায়তা করিলেন না। সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহ তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল, তিনি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী লালীকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার দুই দিন বয়স্ক পুত্রকে হাতীর পিঠে চড়াইয়া তাহাকেই সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। লালীকে তিনি বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিয়াছিলেন, সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহগণ একত্র হইয়া নিবেদন করিলেন—এরূপ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে এভাবে দণ্ডিত করা নীতিবিরুদ্ধ,

তাই লালী রেহাই পাইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি এত মদ খাইয়াছিলেন যে, স্খলিতপদে টলিতে টলিতে মাহুতের কাঁধে ভর করিয়া কোনরূপে হাতীর পিঠে চড়িয়াছিলেন এবং শত্রুশিবিরের গুলিতে যখন তাঁহার মাথাটা উড়িয়া যায়, তখন সে মাথায় মদের নেশা ছাড়া কোন বুদ্ধি এমন কি বেদনা-বোধটাও ছিল কিনা সন্দেহ।

অনেক ঐতিহাসিক সকৎজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার তুলনা করিয়াছেন; মাসতুতো ভাইদের প্রকৃতি কতকটা একরূপ ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন, একথা সর্ব্বৈব ভুল। একটা বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল, উভয়েই জনমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পদ-মর্য্যাদানুসারে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু সিরাজ অবিশ্বাসীদিগের প্রতিই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন—সকৎজঙ্গ নির্ব্বিচারে সকলকে অপদস্থ করিয়া গালাগালি করিতেন। সিরাজের সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না।

ইংরেজ-সংঘর্ষ।

ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভ নানা উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, সিরাজের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল; সুতরাং কোন্ মুহূর্ত্তে খামখেয়ালী নবাব তাহার প্রতিশোধ লইবেন, তাহার ঠিকানা নাই;—এই ভয়ে তিনি তৎপুত্র রাজা কৃষ্ণবল্লভকে বহু অর্থসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ড্রেক সাহেবের তখন কলিকাতায় অসীম প্রতিপত্তি। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারসহ নিরাপদ্ হইলেন। নবাব এই সংবাদ গুপ্তচরের নিকট পাইয়া ড্রেক সাহেবের নিকট উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার অর্থাদির সহিত মুর্সিদাবাদে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া চিঠি লিখিলেন। ড্রেক অস্বীকার করিলেন। নবাব ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি বঙ্গদেশে ইংরেজ-বাণিজ্য একেবারে উন্মূলিত করিতে সংকল্প করিয়া পূর্ণিয়া হইতে অবিলম্বে বাঙ্গলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরাম এবং অপরাপর প্রধান অমাত্যগণ ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহাকেও অনুরোধ করিলেন না, ইংরেজের কারখানা আক্রমণ করিয়া মিঃ ওয়াটকে বন্দী করিলেন। ড্রেক সাহেবের স্পর্দ্ধিত উত্তরে তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত সাহেব বুঝিতে পারিয়া প্রথমতঃ চুঁচুড়ায় ডাচ্ ও তৎপরে চন্দননগরে ফরাসীদের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন সাহায্য দিলেন না। সুতরাং সাহেব পলায়নপর হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সিরাজ তাঁহাকে হত্যা করিবেন—তিনি প্রথমতঃ ১,৫০০ বন্দুকধারী বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার বারুদ ভিজিয়া যাওয়াতে বন্দুকগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কতকগুলি সাহেববিবি লইয়া কলিকাতা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গোবিন্দপুরের জাহাজে উঠিয়া মান্দ্রাজে প্রয়াণ করিলেন। এদিকে হাউএল সাহেব খুব বীরত্বের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়া যখন ১৭০ জন মাত্র ইংরেজ অবশিষ্ট—তখন নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইখানে বন্দীদের জন্য ভাল বন্দোবস্তই হইয়াছিল—তাঁহারা বারান্দায় থাকিবেন এই কথা ছিল। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত-

কর্ম্মচারী বলিলেন, খোলা জায়গায় বন্দীদিগকে রাখা নিরাপদ্ নহে, আর কোন স্থান আছে কিনা খুঁজিয়া দেখ, অধীন কর্ম্মচারীরা বলিল, "দুরন্ত কয়েদীদের জন্ত একটা কামরা আছে।" প্রধান কর্ম্মচারী না দেখিয়াই বলিলেন, "বেশ, সেইখানেই রাখা হউক।" এই ঘরটিই ইতিহাসবিশ্রুত অন্ধকূপ। ইহার সংবাদ সিরাজউদ্দৌলা দূরে থাকুক, তাঁহার ওমরাহদের কেহও জানিতেন না। এখানে যে গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণা ও গরমে আর্ত্ত হইয়া সাহেবেরা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজদের প্রাথমিক রিপোর্টে লিখিত হয় নাই। সুতরাং এই ঘটনা যুদ্ধের আনুষঙ্গিক একটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া ধরা হইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহ তো মৃত্যুর শয্যা পাতিয়াই রাখিয়াছে—রণক্ষেত্রে, কি যুদ্ধের পরক্ষণেই অবরোধ-গৃহে মৃত্যুটা খুব একট অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বল্পপরিসর গৃহে, যতগুলি লোক মরিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে—তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা প্রথমতঃ বঙ্গবাসীর সম্পাদক ৺বিহারীলাল এবং পরে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঘটনাটি নিশ্চয়ই খুব অতিরঞ্জিত করিয়া শেষে বর্ণিত হইয়াছে। এখন এদেশী লোকের অপরাধে পতিত এক বিন্দু ইংরেজরক্তের যতটা মূল্য—যুদ্ধসম্পর্কিত ব্যাপারে তখন সেই রক্ত তত মহামূল্য ছিল না। এখনকার পাশ্চাত্য মাপকাঠির দ্বারা এই বিষয়ের ওজন নিরিখ করা ঠিক হইবে না। এ বিষয়ে কাহারও কোন ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতা হয় নাই। নিম্ন কর্ম্মচারীদের অনবধানতার দরুনই এই অনর্থটি ঘটিয়াছিল। ("The prisoners were at first ordered to draw up in the Verandah, but the officer commanding the guard, thinking that they would not be sufficiently secure there—inquired where was the prison of the fort." (Stewart, p. 539.) সেটা ইংরেজদিগেরই দুর্গ এবং সেই বন্দীখানার একটি গৃহে তাহাদের স্থান করা হইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় "without examining the extent of the apartment"—সেই গৃহের আয়তন পরীক্ষা না করিয়াই সেখানে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজ-দিগের প্রাথমিক ঘটনার বিবরণীতে ইহার উল্লেখ নাই। রাজীবলোচনের মত ইংরেজের ভক্ত এবং সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষপক্ষীয় লেখকও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি গোলাম হুসেন, যিনি সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার পরিবারবর্গকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন—এই অভিযোগ দিয়া যেখানে-সেখানে উক্ত নবাবের নিন্দাবাদ ও সাহেবদের সুখ্যাতি করিতেন, তিনি তাঁহার মুতক্ষরিনের মত সিরাজের রাজত্বের সুবিস্তৃত ইতিহাসে এই অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ-মাত্র করেন নাই। সুতরাং এবিষয়ের জন্ম নবাবকে দায়ী করা কতটা ন্যায়-সঙ্গত তাহা বিবেচনা করা উচিত।

মন্ত্রীরা সকলেই সিরাজউদ্দৌলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফর আলিবর্দ্দীর সময় হইতে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু দয়ার সাগর বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে তাড়াইতে যাইয়াও তাড়ান নাই। সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে ও প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরামকে ডিঙ্গাইয়া মীরমদন ও মোহনলালকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া শাসন-বিভাগের

কর্ত্তৃত্ব দিয়াছিলেন। এজন্য এই দুইজনের ইঁহার বিরুদ্ধে জাতক্রোধ ছিল। বৃথা-প্রজ্ঞাভিমানিনী ঘেসেটি বেগমের মাথায় হাত বুলাইয়া মীরজাফর যে বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিবার জন্য তিনি সৈন্যসংগ্রহে এবং সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যয় করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়ায় সকৎজঙ্গকে সিরাজের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম তিনিই নাচাইয়া তুলিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। দাদামহাশয়ের আমলের লোক—এবং আত্মীয়, এইজন্য সিরাজ তাঁহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াও তাঁহাকে শাসন করিতে পারেন নাই। এমন কি পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে মীরজাফর ও দুর্লভরাম যে ইংরেজদের সঙ্গে একযোগ হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা পাইতেছে—একথা জানিয়াও তিনি তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিতে সাহস পান নাই। সেই সময়ে মুঁসিও লাস (ফরাসী সেনাপতি) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নবাব সাহেব, আপনার আমলা ও ওমরাহ সকলে আপনার শত্রু—ইঁহাদের ইচ্ছা ফরাসীদের তাড়াইয়া আপনি ইংরেজদের হাতে যাইয়া পড়েন। তখন আপনার সর্ব্বনাশ ইঁহারা সহজেই করিতে পারিবেন। আমাকে যদি আপনার অধীনে কাজ দেন, তবে আমি ও আমার সৈন্যদল প্রাণপণে আপনার জন্য যুদ্ধাদি করিব" (মুতক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)। লাস সাহেব ফরাসী এবং ইংরেজের শত্রু,—এদিকে নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন দুই একটি লোক ছাড়া সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ; এজন্য কতক মীরজাফরের ভয়ে, কতক ইংরেজেরা চটিয়া যাইবেন এই আশঙ্কায় তিনি বিশ্বাসী ফরাসী সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না। লাস সাহেব ঠিক বুঝিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নবাব অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, এজন্য যখন নবাব অত্যন্ত দ্বিধার সহিত বলিলেন, "সময় হইলে আপনাকে আহ্বান করিব," তখন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার সহিত আমার আর দেখা হইবে না।" শেষমুহূর্ত্তে যখন বিপদ্ আসন্ন, তখন তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া লাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য্য বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লাসের আসিতে গৌণ হইল, যখন আসিলেন, তখন সিরাজ আর মর্ত্ত্যলোকে ছিলেন না। লাসকে ইংরেজেরা তাড়া করিয়া ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনক্রমে তিনি ভাগ্যবলে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইংরেজেরা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ক্লাইভ আসিয়া পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সন্ধি অনুসারে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, নবাব তাহা দিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ অজুহাতের অভাব হইল না। মোট কথা মীরজাফর, দুর্লভরাম, কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎ শেঠ প্রভৃতি দেশের প্রধান ব্যক্তিরা ইংরেজদিগকে উস্কাইতে ছিলেন। এদিকে কলিকাতার দুর্গধ্বংসের ব্যাপারে তাঁহারাও মনে মনে প্রতিশোধ লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চতুর ক্লাইভ বুঝিতে পারিলেন,—মুর্সিদাবাদে নবাবের মিত্র নাই, সকলেই শত্রু। মীরজাফরাদির পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এদিকে মীরজাফরের প্রবর্ত্তনায় ঘেসেটি বেগম আসিয়া সিরাজ তাঁহার প্রতি

কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিয়া সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন। সিরাজের ধনভাণ্ডার কুবেরের ভাণ্ডারের মত, ষড়যন্ত্র সফল হইলে তাঁহারা একদিনে এত দীর্ঘকালের তপস্যা সফল করিতে পারিবেন—ষড়যন্ত্র বিফলই বা কেন হইবে? নবাবের বিশালকায় কামানগুলি—অসংখ্য সৈন্তবল—ইহারা তো মীরজাফরের করতলগত। যাহা অসাধ্য—অভাবনীয়, তাহা সহজেই দৈবানুগ্রহে সিদ্ধ হইবে।

নবাব পূর্ণিয়ার যুদ্ধ জয় করিয়া ঘেসেটি বেগমের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার ভয়ের কারণ নাই; কলিকাতার দুর্গ ধ্বংস করিয়া ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার একমাত্র শত্রু ইংরেজের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন; সুতরাং যখন জানিলেন, জগৎ শেঠ, দুর্লভরাম ও মীরজাফর সকৎজঙ্গকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতেছেন, তখন প্রথমতঃ নগণ্য মনে করিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ড দেন নাই, বরং রাজদরবারে তাঁহাদের যে স্থান ছিল কিছু ভয়প্রদর্শনাদির পর তাহাতেই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ও দৈন্ত দেখিয়া কোন কোন সময়ে তাঁহার এমনও মনে হইত যে, ইহারা নির্দ্দোষ, কিন্তু তথাপি নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা যে ব্যবহার পায় ইহারা নবাবের কাছে সে ব্যবহার পাইতেন না। তিনি মীরজাফরের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া একটা বৃহৎ কামান রাখিয়া দিয়াছিলেন, উহা নবাবের ভ্রূকুটির মত মীরজাফরের গৃহের দিকে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধলক্ষ্য ছিল। জগৎ শেঠকে তিনি সুন্নৎ করিয়া মুসলমান করাইবেন, সর্ব্বদা এই ভয় দেখাইতেন। দুর্লভরাম অন্ততম প্রধান মন্ত্রী—ইহার কোন কথাই তিনি শুনিতেন না—ইহারা তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন,—এজন্য নবাবের এই সকল ব্যবহার অসঙ্গত মনে করিতে পারা যায় না। তাঁহার দোষ তরুণ বয়সের; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অতি তীব্র ভাষায় ইহাদিগকে অপমান করিতেন এবং বড় বড় মন্ত্রীদিগকে মীরমদন ও মোহনলালের ন্যায় তরুণবয়স্ক প্রিয় মন্ত্রীদের দ্বারা অপদস্থ করাইতেন। অথচ তাঁহাদিগকে দণ্ড দিয়া নিরস্ত করা, কিংবা কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখার মত তাঁহার মনের সাহস বা দৃঢ়তা ছিল না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, তাঁহাদের বাহিরের ঠাট্ বজায় থাকাতে তাঁহারা প্রাসাদে বসিয়াই ষড়যন্ত্রটি পাকাইবার বেশী সুবিধা পাইলেন। তিনি মীরজাফর, জগৎ শেঠ ও দুর্লভরামসম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে যে সকল সংবাদ পাইতেছিলেন, বিশেষ মুঁসিয়ার লাস তাঁহার নিকট যে সকল গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইহাদিগকে পিপীলিকার ন্যায় পিষিয়া মারিলে শ্রাদ্ধ আর বেশী দূর গড়াইত না। কিন্তু নষ্টা বধূকে যেরূপ ঘোর শাসন করিয়াও কোন কোন স্বামী ছাড়িতে পারেন না—সেইরূপ ইনি এই সকল সম্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াও ইহাদিগকে ছাড়িতে পারেন নাই। নষ্টবধূর ন্যায়ই ইহারা এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লাভ করিয়া স্বীয় প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের নানাদোষ সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বজননিন্দিত ও সকল লোকের অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঘরের শত্রু যাহা পারে, বাহিরের শত্রু অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাহা করিতে পারে না। রাণী ভবানীর কন্যার প্রতি নবাবের লোভের ব্যাপার সমস্ত রাজা ও ওমরাহদলের মনে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল।

এইজন্য নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্রও আসিয়া এই দলে ভিড়িয়া গেলেন। তিনি তাঁহার বংশের পূর্ব্বসংস্কার ও ব্রাহ্মণসমাজের গুরুর স্থান অধিকার করার দরুন বহু ব্যয় করিতেন,—পূজার্চ্চনা, দানধ্যান, বার মাসে তের পার্ব্বণ খুব জাঁকিয়া করিতেন, এইজন্য তিনি একজন চির-দেউলিয়া জমিদার ছিলেন। বণিক্ ও অর্থশালী ব্যক্তিদের কাছে, ঋণগ্রহণের ব্যপদেশে তাঁহাকে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত—ইংরেজদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। মুসিদাবাদে যখন মীরজাফর, দুর্লভরাম ও জগৎ শেঠ এই ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্রের ডাক পড়িল। মীরজাফর রাজাকে তথায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাজীবলোচন বিস্তারিত ভাবে এই দৌত্যের বিবরণ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র সহসা এরূপ একটা ব্যাপারে মাথা দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন, তিনি তাঁহার প্রধান অমাত্যকে প্রথমতঃ পাঠাইয়া দিলেন। দুর্লভরামের সাহায্যে অমাত্য নবাবের দেখা পাইয়া বলিলেন, "আমাদের রাজা হুজুরের সঙ্গে সিংহাসন পাইবার পর দেখা করেন নাই—একবার দর্শনপ্রয়াসী,—হুজুরের অনুমতির জন্য আসিয়াছি।" তাঁহার হঠাৎ মুসিদাবাদে আসা যদি কোন সন্দেহের সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় নবাবদর্শনের অছিলায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিলেন। এদিকে কিরূপে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা যাইতে পারে, ধূর্ত্তত্রয় সেই বিষয়ে প্রতি রাত্রে জটলা করিতেছিলেন। কেহ বলিলেন—ইহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা যাউক। কেহ বলিলেন, আমরা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করি, কেহ বলিলেন, যবনের অধিকার আর কোনরূপে সহ্য করা যায় না—অপর একজন মীরজাফরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? এখানে যে মীরজাফর উপস্থিত, তাহা কি ভুলিয়া গেলেন।" তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, কৃষ্ণচন্দ্র অতি চতুর ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া পরামর্শ করা হউক; তিনি ধীর স্থির-বুদ্ধি, এ সমস্যার তিনি যে সমাধান করিবেন, তাহাই গৃহীত হইবে। এই অবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া বুদ্ধি দিলেন, "ইংরেজদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা হউক, আমি কালীঘাটে মায়ের দর্শনকামনায় (বোধ হয় ঋণ পাওয়ার চেষ্টায়ও বটে) প্রায়ই কলিকাতায় যাইয়া থাকি। তাঁহারা মান্য, বদান্য, বুদ্ধিমান্, রণনিপুণ, তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইয়া আমরাই দাবার চাল চালিব, শেষ পর্য্যন্ত নবাব আমাদের হাতে কলের পুতুলের মত থাকিবেন, আমরাই যুদ্ধ চালাইব; 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'-নীতি অবলম্বন করিলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না, অথচ অভীষ্টসিদ্ধি অতি সহজেই হইবে, মীরজাফরকে আমরা নবাব করিব।" এই যুক্তি শুনিয়া সভায় "বাহবা" পড়িয়া গেল। তখন মীরজাফরের সঙ্গে ক্লাইভের গোপনে চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল। এদিকে নবাবকে জব্দ করিবার জন্য ক্লাইভ ও ইংরেজেরা নানা উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সুবর্ণ-সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে মীরজাফর অর্থের যে লোভ দেখাইলেন, তাঁহাদের অবাধ বাণিজ্য ও নবাবের অপরিমিত ধনভাণ্ডারের বখরার যে আশা দিলেন, তাহাতে নিতান্ত উদাসীন ব্যক্তিরও মাথা ঘুরিয়া যাইতে পারিত। ইংরেজ-সৈন্য দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল।

সিরাজের তেজ, বিক্রম, বুদ্ধি সকলই ছিল,—এত অল্পবয়সে এরূপ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও লোকচরিত্র বুঝিবার শক্তি বোধ হয় আলিবর্দ্দীরও ছিল না। তাঁহার দোষ ছিল—তিনি মাতামহের আদরে একেবারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, চারিদিকের লোকজনকে কীটের মত গণ্য করিতেন, কাহাকেও হস্তগত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবার শক্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। আলিবর্দ্দী তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দ্বারা শত্রুকেও মিত্র করিতে পারিতেন। এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। আলিবর্দ্দীর প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ও অপরাপর পাঠান সামন্তগণ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহারা শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়া আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত,—গুপ্তচরের মুখে নবাব সমস্ত কথা শুনিয়া বিনা অস্ত্রে শরীর-রক্ষী ছাড়া একাকী সিরাজের হাত ধরিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে মুস্তাফা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে এই অবস্থায় নবাবকে দেখিয়া পাঠান সেনাপতি বিস্মিত হইয়া গেলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ বলিলেন, "আপনাকে আমি আমার প্রধান সহায় বলিয়া জানিতাম, আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন জানিতে পারিলাম আপনি আপনার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। অতি নিঃসহায়, নিরস্ত্র ও অসমর্থ অবস্থায় বৃদ্ধ নবাব আপনার দ্বারস্থ; আপনি অনায়াসে এখানে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষয় করিবার প্রয়োজন হয় না। আমার প্রাণ আপনার হাতে দিতে আমি আসিয়াছি, আর (সিরাজকে দেখাইয়া) যদি আমার প্রাণ অপেক্ষা বেশী প্রিয় কিছু থাকে, তবে এই সিরাজ, যদি ইচ্ছা করেন, তবে ইহাকেও হত্যা করিতে পারেন; আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবন, জীবনাধিক প্রিয়বস্তু ও সর্ব্বস্ব আপনার হাতে দিয়া আপনার বন্ধুত্বপ্রার্থী হইয়া এই অসময়ে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম।"

সিরাজের দোষ।

মুস্তাফা খাঁ ও আলিবর্দ্দী।

এই কথার পরে পাঠানদের সমস্ত বিদ্রোহভাব তৃণের মত ভাসিয়া গেল। মুস্তাফা খাঁ প্রতিশ্রুত হইলেন, "যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, সে পর্য্যন্ত নবাব সাহেবের নিম্নতম সৈনিকের ঘোড়ার খুরে আমার মাথা বাঁধা রহিল। যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আলিবর্দ্দী, তাঁহার সন্তান ও পরিবারবর্গের হিতার্থ আমার জীবন অর্পণ করিলাম।" (সিয়ার মুতক্ষরিন, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ)।

আলিবর্দ্দীর এই রাজনৈতিক কায়দা ও চাল সিরাজ একেবারেই জানিতেন না। যখন শেষ মুহূর্ত্তে বিপদ্ আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল, তখন তিনি মীরজাফরের পায়ে পাগড়ী ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু সে অসময়ের কান্না! যদি সময়ে মিষ্ট ব্যবহার করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, তবে তাঁহার কেশ স্পর্শ করা সহজ হইত না। একদিকে দুর্লভরাম বিষ ছড়াইতেছিলেন, অপরদিকে জগৎ শেঠ—যাঁহার বিপুল অর্থ বহুলোকের টাঁকি তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—তিনি জনমত সিরাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছিলেন। চিরশত্রু, ক্রূর ও কূটচক্রী মীরজাফর—সমস্ত সৈন্যগণকে ঘেসেটি বেগমের অর্থে করতলগত করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া জুটিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশ এই

অনতিক্রান্ত-কৈশোর বালকের নিন্দাবাদে মুখরিত হইতে লাগিল। হঠাৎ তিনি একদিন দেখিলেন, চারিদিকে কেহই তাঁহার মিত্র নহেন, ঘেসেটি বেগম হইতে ক্ষুদ্র সৈনিকেরা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে,—এমন কি তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত বিপদের দিনে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। মাত্র মীরমদন প্রাণ দিয়া মুমূর্ষুশয্যায় তাঁহাকে শুনাইয়া গেলেন, তিনি দুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়াছিলেন—মাত্র মোহনলাল রণক্ষেত্রে রোষ-কষায়িত নেত্রে মীরজাফরের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া অসমর্থ হইয়া প্রাণ দিলেন—মাত্র ফরাসী সেনাপতি লাস হতভাগ্য বালক-নবাবের দুঃখে পরম দুঃখ পাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার বৃথা চেষ্টা করিলেন।

আর পলাশীর যুদ্ধ—উহা যুদ্ধ নহে, দৈবের খেলা। যাঁহারা বিলাসী, অত্যাচারী, স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং অলস—তাঁহাদের হাত হইতে ভগবান্ ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর প্রকৃত সেবক, স্বার্থ-বিস্মৃত, জাতীয়স্বার্থসর্ব্বস্ব, গিরি-সাগর-লঙ্ঘী, অদম্য-উৎসাহশীল, নবগঠিত, নব-তেজোদৃপ্ত একটি জাতির হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিলেন, পলাশী উপলক্ষমাত্র। উহা রাজলক্ষ্মীর কৌটা—একটা ময়দানে বসিয়া যুদ্ধের ছলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহা তাঁহার যোগ্য সন্তানদিগকে দিলেন। মীরজাফর আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা দিকের প্রতীক। শকুনি, জয়চন্দ্র, মীরজাফর প্রভৃতি ব্যক্তির যুগে যুগে অভ্যুদয় হইয়াছে—ভারতবর্ষ যে এখনও স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে। আমাদের রক্তের মধ্যেই মীরজাফর ও জয়চন্দ্র রহিয়াছে—উহা বহুদিনের ব্যাধি।

সিরাজউদ্দৌল্লা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কোন নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন একথা ইতিহাসের কোথাও নাই, বরঞ্চ সর্ব্বত্র তাঁহার উদারতার প্রমাণ আছে তিনি হুসেন কুলি খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, উহা সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে—তখন তিনি বালক, এবং এই ব্যাপারে ঘেসেটি বেগম ও অপরাপর বয়োবৃদ্ধ লোকের বিশেষরূপ হাত ছিল; তথাপি উহা অতি গর্হিত কর্ম্ম এবং এজন্ত যে তিনি কত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুকালীন কাতরোক্তি হইতে জানা যায়। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভের জন্তই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অন্যায় উপায়ে লব্ধ অপরিমিত ঐশ্বর্য্য লইয়া রাজবল্লভ ঢাকায় ছিলেন এবং ঘেসেটি বেগমের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তথাপি সিরাজ রাজবল্লভকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু মনে পাপ থাকিলে ভিতরে সোয়াস্তি থাকে না। রাজবল্লভ তাঁহার অর্থের এক বিপুল অংশ রাজা কৃষ্ণবল্লভের হাতে দিয়া কলিকাতায় ইংরেজদের নিরাপদ্ আশ্রয়ে পাঠাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় মুল্লুকের অধিপতির এই দাবী ন্যায়সঙ্গত, তিনি কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে ড্রেক সাহেবকে চিঠি লিখিলেন, ড্রেক স্বীকৃত হইলেন না। নবাব কলিকাতা দুর্গ দখল করিয়াই ইহাকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে বলিলেন। নবাবের আর একজন বিদ্রোহী প্রজা ছিলেন উমিচাঁদ। তিনিও ইংরেজের আশ্রয়ে গা-ঢাকা দিয়াছিলেন। নবাব

নবাব ব্যবহার।

উভয়কেই আনিতে আদেশ করিলেন। Stewart সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "He (Nawab) immediately ordered Umichand and Krishnaballabh to be brought before him and received them with civility" (p. 538). (তিনি তখনই উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত ভদ্রব্যবহার করিলেন); তিনি এ অবস্থায় কৃষ্ণবল্লভের টাকাকড়িগুলি অন্ততঃ আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, অন্য কেহ হইলে শুধু টাকাকড়ি গ্রহণ নহে, তাঁহার অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া তদ্‌বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রয় করার জন্য তাঁহার একটা ন্যায়সঙ্গত দণ্ডও হইতে পারিত। কিন্তু নবাব তাঁহাকে আদরে আপ্যায়িত করিয়া গ্রহণ করিলেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছেন—ইহাতো একটা গুরুতর অপরাধ—তাঁহার সহিত ব্যবহারসম্বন্ধে Stewart সাহেব লিখিয়াছেন: "He dismissed him with assurance of safety"(p. 538). (তাঁহার ভয় নাই, তিনি নিরাপদে থাকিবেন, এই আশ্বাস দিয়া নবাব তাঁহাকে বিদায় দিলেন)। কলিকাতায় ইংরেজেরা বাণিজ্য করিয়া অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি মাত্র ৫০,০০০৲ টাকা পাইলেন। তাঁহার সন্দেহ করিবার কারণ যথেষ্ট ছিল যে হয়ত হলওয়েল সাহেব টাকাপয়সা গুপ্ত স্থানে রাখিয়াছেন, এজন্য তিনি তাঁহাকে কতকটা ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন: "However finding that no discoveries could be obtained concerning the treasures which he supposed to be buried in Calcutta he released Mr. Holwell and other English prisoners." (p. 541). (কিন্তু যখন সেইরূপ কোন গুপ্তসম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তিনি মিঃ হলওয়েল এবং অপরাপর ইংরেজ বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন।) ক্লাইভ মীরজাফরের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিতে প্রথমতঃ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই। যখন সেই সকল বন্ধুত্বসূচক চিঠির বলে তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—তখন রোজ তিনি চন্দননগর হইতে গোপনে চিঠি পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু একখানির মাত্র জবাব পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল—মীরজাফর নবাবের সঙ্গেই সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইবেন, কিন্তু ঠিক সময়ে তিনি ক্লাইভকে সাহায্য করিবেন। চিঠিটা যেমন তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তেমন নহে, তাহাতে আগ্রহ বেশী দেখা গেল না, তখন ক্লাইভ মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন,—হয়ত নবাবের মন্ত্রী তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিয়া শেষে প্রভুর শত্রুর প্রতিশোধ লইবেন! ইহার পরে ক্লাইভ মন্ত্রীর নিকট হইতে আরও দুইখানি চিঠি পাইলেন, কিন্তু কতকটা আশ্বস্ত হইলেও মীরজাফরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করার মতন মনের ভাব তখন ইংরাজদের মধ্যে কাহারও ছিল না।

সবৎজঙ্গ।

ভারতবর্ষে ক্লাইভ "সবৎজঙ্গ" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন; ক্লাইভ বলিলে তাঁহাকে অল্প লোকেই চিনিত। তাঁহার অধীনে ৮০০ ইংরেজ পদাতিক সৈন্য, ১০০ কামান-চালক, ৫০ জন—কামান লইয়া যাইবার নৌসেনা। এই কামানের মধ্যে মাত্র ছয় পাউণ্ড বারুদ ধরে এমন আটটি কামান ছিল;

তাহা ছাড়া পর্ত্তগীজ ও ২,১০০ সিপাই ছিল। নবাবের সঙ্গে ১,৮০০ সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, ৫০,০০০ পদাতিক, তাহাদের হাতে বন্দুক, বর্শা, ধনু, বোমা ইত্যাদি অস্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া ৪০টি কামান ছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশেই ২৪ হইতে ৩২ পাউণ্ড বারুদ ধরিত। এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মীরজাফরের সম্পূর্ণ আশ্বাস না পাইলে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। মীরজাফর আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন আগ্রহাতিশয় দেখান নাই! তারপর নবাবের সৈন্যের নেতা হইয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তবে ত সর্ব্বনাশ। ক্লাইভ (সবৎজঙ্গ) তাঁহার ২০ জন প্রধান কর্ম্মচারীকে লইয়া একটা সভা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মীরজাফরের কথার উপর নির্ভর করিয়া নবাবকে আক্রমণ করা—এই পথ খোলা আছে। দ্বিতীয় পথ—আমরা কাটোয়া হইতে অনেক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—এখানে অনায়াসে কয়েক মাস প্রতীক্ষা করা চলে, ইহার পর বর্ষাশেষে মারহাট্টারা আসিবে, তখন তাহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া নবাবকে আক্রমণ করা যাইতে পারে।"

পলাশীর যুদ্ধ।

২০ জনের মধ্যে ১৩ জন অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হইলেন। ৭ জন তখনই নবাব-শিবির আক্রমণ করার পরামর্শ দিলেন। ক্লাইভ কিছু না বলিয়া নিকটস্থ তরুকুঞ্জে যাইয়া গভীর চিন্তায় এক ঘণ্টাকাল নিবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে যাহা স্থির করিলেন, তাহা বীরের মত; এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন আর দ্বিধার ভাব ভাল নহে; যে করিয়া হউক যুদ্ধ করিতে হইবে। নদী পার হইয়া তখনই তিনি দূরে—৮০০ গজ দীর্ঘ এবং ৩০০ গজ প্রস্থ আমবাগে শিবির স্থাপন করিলেন, এই আমবাগই সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র। তিনি তথায় যাইয়া দেখেন নবাবের মানকরে যাইবার যে কথা ছিল তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও সৈন্যদল লইয়া অতি নিকটেই আছেন।

নবাবের অবস্থা তখন শোচনীয়; তিনি দেখিলেন যেন তাঁহার লোকেরা আর কেহ তাঁহার নহে। তাঁহার পরিকরবর্গ নমাজ পড়িবার ছলে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। এমন কি সেই শিবির এরূপ জনশূন্য যে একটা চোর তথায় ঢুকিয়াছিল। একটি পরিচারককে তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোরা কি ভাবিয়াছিস্ যে আমি এখনই মরিয়াছি?"

পরিজন-বর্জ্জিত নবাব।

এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মীরমদন ও মোহনলাল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; মোহনলাল ২৫,০০০ সৈন্য লইয়া তুমুল রণোদ্যমে মাতিয়া গেলেন। একটা গোলা লাগায় মীরমদন অবসন্ন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় সিরাজের শিবিরে আনীত হইলেন, তিনি মরিতে মরিতে বলিয়া গেলেন, "নবাব সাহেব, আপনার নিজের লোকই আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছে, সকলেই আপনার শত্রু। আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।" এই বিপদে সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, দূতের পর দূত গেল, 'আসছি,' 'যাচ্ছি' করিয়া মীরজাফর অনেক বিলম্বে নবাবের নিকট আসিলেন। নবাব তাঁহার পায়ের নীচে নিজের পাগড়ী ফেলিয়া বহু অনুনয় বিনয় করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা

করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মীরজাফর পাথরের মত নিশ্চল থাকিয়া নবাবের সাগ্রহ অনুরোধের উত্তরে বলিলেন, "আজ রাত্রি হইয়াছে, কাল সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।" উত্তরে নবাব বলিলেন, "আজ যুদ্ধ বন্ধ করিলে যে প্রমাদ হইবে—রাত্রে শত্রুরা শিবির আক্রমণ করিবে।" মীরজাফর বলিলেন, "সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।" মুতক্ষরীনের পাদটীকায় লিখিত আছে, "সিরাজ এই অবস্থায় মীরজাফরের সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধিহীন বা অত্যাচারী রাজার মত আদৌ নহে। সকৎজঙ্গের পরিজনবর্গ ও সন্তানগণের প্রতি তিনি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং গোলাম হুসেনের স্বগণদিগকে তিনি যেরূপ দয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাব কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, তিনি অত্যাচারী ছিলেন—একথা তো একেবারেই বলা চলে না। ইনি বাল্যকালে অত্যধিক স্নেহে লালিতপালিত হইয়া সৎশিক্ষা পান নাই, এবং যখন তাঁহার কিছু কাল স্কুলে থাকা উচিত ছিল,—তখন হঠাৎ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।"

মোহনলাল পুনর্ব্বার বেগে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। গোলাম হুসেন এবং রাজীবলোচন উভয়েই লিখিয়াছেন—ইংরেজেরা বিপর্য্যস্ত হইলেন। জয়লক্ষ্মী নবাবের দিকে সবে মাত্র প্রসন্নবদন ফিরাইবেন, তখনই মীরজাফর আদেশ দিলেন, "আজ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দাও।" মোহনলাল তীব্রস্বরে বলিয়া পাঠাইলেন, "এই কি যুদ্ধ থামাইবার সময়? আমি কিছুতেই এই অন্যায় আদেশ পালন করিব না, তাহা হইলে আমার সৈন্যেরা নিরুৎসাহ হইবে, এবং ইংরেজেরা সোৎসাহে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।" নবাবের এই কথাগুলি খুব মনে লাগিল, কিন্তু মীরজাফর বলিলেন, "তাহা হইলে হুজুরের যাহা মর্জ্জি, তাহাই করুন—আমি আর কি করিব?" যে ব্যক্তি তাঁহার কাঁধে চাপিয়া তাঁহাকে অতলে ডুবাইবে, অশুভ মুহূর্ত্তে শনির কোপে নবাব সেই মীরজাফরকেই আশ্রয় করিলেন। তাঁহাকে চটাইতে ভয় করিয়া মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে বারংবার নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। নিতান্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া মোহনলাল কৃপাণ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিলেন। তখন শত্রুরা সোৎসাহে তাঁহার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। মোহনলাল চলিয়া গিয়াছিলেন—তখন ইংরেজদের বিজয় সম্পূর্ণ হইল। গোলাম হুসেনের বিবরণানুসারে মোহনলাল বন্দী ও আহত হইয়া দুর্লভরামের হাতে সমর্পিত হন, তথায় অল্প পরেই তিনি নিহত হন। কিন্তু রাজীবলোচন লিখিয়াছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মীরজাফরের আদেশ বারংবার লঙ্ঘন করিয়াও তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজাফরের এক চর পশ্চাৎ ভাগ হইতে গুলি করিয়া তাঁহাকে নিহত করে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মীরজাফর সৈন্যদল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

হতভাগ্য নবাব এখন আর রাজপ্রাসাদের লোকজন কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কে তাঁহার গলায় ছুরি দিবে, ঠিকানা নাই। তিনি তাঁহার বেগম লুৎফুন্নেসা এবং বহুমূল্য কতকগুলি মণিমুক্তা লইয়া মুর্সিদাবাদ ছাড়িয়া চলিলেন। তিনি তাঁহার

সেনাপতিদিগকে আদেশ করিলেন, যে পর্য্যন্ত তিনি কোন নিরাপদ্ স্থানে না পৌছিবেন, সে পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহারা মীরজাফরের করতলগত, কেহ তাঁহার আদেশে কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি তাঁহার শ্বশুর মির্জ্জা রেজার্থাও তাঁহাকে কোন সহায়তা না করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। একটা দিন তিনি রাজপ্রাসাদে ছিলেন, তখন জনপ্রাণী তাঁহার খোঁজ নিতে আসে নাই। মহাবিপদ্ আশঙ্কা করিয়া তিনি রাজমহলের দিকে চলিলেন, পথে ফরাসী সেনাপতি মুঁসিয়ার লাসকে আসিতে চিঠি পাঠাইলেন। গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন, "রাজমহলে যদি স্থলপথে যাইতেন তাঁহার অনেক সুবিধা হইত; কিন্তু পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া তিনি জলপথে চলিলেন। কিছু খিচুড়ীর ব্যবস্থার জন্য তিনি নৌকা ভিড়াইলেন। এমন সময়ে একটি ফকির আসিয়া আতিথ্য করিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। তিন দিন তিনি, বেগম সাহেবা, সন্ততিবর্গ ও অপরাপর স্ত্রীলোকেরা এক ফোটা জল পর্য্যন্ত খাইতে পান নাই; এই সম্পূর্ণ অভুক্ত রাজ-পরিবারকে দানা সা ফকির খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিতে লাগিল। এদিকে সে মীরজাফরের চরদিগকে পূর্ব্বেই খবর দিয়া রাখিয়াছিল, তাহার নাকি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি আগেকার কি এক আক্রোশ ছিল! যখন অভুক্ত ব্যক্তিগণ খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে মীরজাফরের লোকজন আসিয়া নবাবকে ধরিয়া লইয়া গেল। নবাব অভুক্তই রহিয়া গেলেন, এ জীবনে তাঁহার আর খাওয়া হইল না।

মীরন যখন সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্সিদাবাদে লইয়া আসে, তখন তাঁহার অভুক্ত ও বিড়ম্বিত অবস্থা দেখিয়া সৈন্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। আটদিন পূর্ব্বে যিনি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেন, আজ তাঁহার একি দুর্দ্দশা! সেই বিচলিত সৈন্যগণ কোন উৎসাহই পাইল না, কারণ সেনাপতিগণ সকলেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মীরজাফরের পুত্র মীরন একটা হিংস্র পশু, মূর্খতা ও নিষ্ঠুরতার অবতার। সিরাজকে আবদ্ধ করিয়া সে বহু অর্থের লোভ দেখাইয়া একজন হত্যাকারীর খোঁজ করিল। কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মে কেহই স্বীকার পাইল না। অবশেষে মহম্মদী বেগ নামক অপর এক পশু-প্রকৃতি লোক জুটিল। সে আলিবর্দ্দী ও সিরাজের অন্নে চির-প্রতিপালিত। এক আঘাতে সে হত্যা করিতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া বারংবার আঘাত করিয়া হতভাগ্য নবাবকে নিহত করিল। মরিবার পূর্ব্বে সিরাজ বলিলেন, "আমি সত্যই আমার যোগ্য শাস্তি পাইলাম, হুসেন কুলি, তোমার আত্মার এখন তৃপ্তি হইবে।" * যখন সিরাজ এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন, তখন

* গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন, "তিনি বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ কসাইটা তাঁহার উপর ক্রমাগত খড়্গাঘাত করিতেছিল। এই আঘাতগুলির কয়েকটি তাঁহার মুখের উপর পড়িল; যে মুখের লাবণ্য ও অনুপম সৌন্দর্য্য সমস্ত বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের মত হইয়াছিল, সেই মুখশ্রী আঘাতে আঘাতে নষ্ট হইল। মুখখানি হেলিয়া পড়িল।" গোলাম হুসেন এই মীরনের নিষ্ঠুরতার অনেক কথা লিখিয়াছেন, এই নরপিশাচের একটা নীতি ছিল যাহাকে সন্দেহ করিবে, তাহাকেই শেষ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে এই দুষ্ট ব্যক্তি পশুর মত

মীরজাফর সেই নবাবের শয্যায় আরামে (প্রকৃতই হউক কিংবা ভান করিয়াই হউক) দিবা-নিদ্রা যাইতেছিলেন, চক্ষু মেলিয়া যোগ্য-পুত্র মীরনকে দেখিয়া বলিলেন, "দেখ যেন নবাব পলাইয়া না যায়।" একথা ঠিক সত্যকার কথা কি ছলনা তাহা বলা যায় না। মীরন উত্তর করিল, "তজ্জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সিরাজউদ্দৌলার ছিন্ন-ভিন্ন দেহ হস্তীর পৃষ্ঠে রক্ষা করিয়া সেই হস্তীকে মুর্সিদাবাদের সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কারণ জনসাধারণকে বুঝিতে দেওয়ার দরকার যে পুরাতন নবাব আর নাই, নূতন নবাব হইয়াছেন। যেখানে হুসেন কুলি খাঁ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিহত হইয়াছিলেন, কি এক প্রয়োজনে মাহুত সেইস্থানে হাতীকে থামাইল এবং ঠিক সেই জায়গায়ই সিরাজের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে লাগিল। হস্তী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই স্থান দিয়া চলিল এবং যে গৃহে সিরাজের মাতা ছিলেন, সেইখানে আসিয়া থামিল। হতভাগিনী তাঁহার পুত্রের এই শোচনীয় পরিণামের কিছুই জানিতেন না। অকস্মাৎ এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভুলিয়া গেলেন যে তিনি মুসলমান অন্দরমহলের সম্ভ্রান্ত মহিলা, ভুলিয়া গেলেন যে তিনি আলিবর্দ্দীর দুলালী কন্যা আমনা বেগম। ভিখারিণীর মত চীৎকার করিয়া নগ্নপদে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পুত্রের ছিন্ন-ভিন্ন দেহের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া চারিদিকের লোকেরা

হত্যা করিত। ইহার সর্ব্বশেষ দুষ্কার্য্য—ঘেসেটি বেগম ও সিরাজ-মাতা আমনা বেগমকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা। আলিবর্দ্দী খাঁর এই দুই কন্যাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে মীরন ঢাকার শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়াছিল—"আপনার তত্ত্বাবধানে এই দুই রাজকুমারী আছেন, আপনি অবিলম্বে ইঁহাদিগকে হত্যা করিবেন।" কিন্তু ঢাকার রাজপ্রতিনিধি এই দুই নিরপরাধ রাজকুমারীকে হত্যা করিতে স্বীকৃত না হইয়া উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আপনি ঢাকার জন্য অন্য এক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া তাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করুন। আমি ইহা পারিব না।" মীরন একজন লোককে ঢাকায় পাঠাইয়া দিল এবং ঢাকার শাসনকর্ত্তাকে লিখিল,—"ইনি বেগমদ্বয়কে মুর্সিদাবাদে আনিতে যাইতেছেন, ইঁহার সঙ্গে তাঁহাদিগকে পাঠাইবেন।" লোকটীর উপর এই আদেশ ছিল—ইঁহাদিগকে পথে জলে ডুবাইয়া মারিতে। আসন্নকাল বুঝিয়া বৃদ্ধা ঘেসেটি বেগম কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ বেগম (সিরাজ-মাতা—আমনা বেগম) বলিলেন—"দিদি, কাঁদিয়া কি হইবে? আমরা উভয়ে ভগবানের কাছে অশেষ অপরাধে অপরাধী। এইভাবে তিনি যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন, তাহা তাঁহার দয়া। মীরনের উপর তাঁহার রোষাগ্নি বর্ষিত হউক।" এই অভিসম্পাতের পর দুই ভগিনী গলাগলি করিয়া অতলজলে প্রাণত্যাগ করিলেন। যেদিন এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটিল, ঠিক তাহার আটদিন পরে (১৭৬০ খৃঃ) ও সিরাজের মৃত্যুর দুইবৎসর পরে মীরন আজিমাবাদের জঙ্গলে ক্ষুদ্র একটি শিবিরে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। আজিমাবাদের প্রধান সাধু—সা মহম্মদ আলি হাজিন—এই সংবাদ পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "বিধাতার রোষাগ্নি কেমন সুন্দরভাবে সন্ধান লইয়া জঙ্গলের এক ক্ষুদ্র শিবির হইতে তাহার লক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে!" দুইবৎসর পূর্ব্বে সিরাজের শব যে পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, মুর্সিদাবাদের সেই পথেই মীরনের মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে আনীত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর মীরনের পকেটে পুস্তিকায় ৩০০ শত সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের নাম পাওয়া গিয়াছিল। ইঁহাদিগের সকলকেই সে হত্যা করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। ঘেসেটি ও আমনা বেগমের অনুগ্রহেই সে প্রথমজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের সর্ব্বনাশ-সাধন ভগবান্ সহিতে পারেন নাই (মুতাক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ৩৬৩-৩৭২ পৃঃ)।

আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে খোদাম হসেন খাঁ বারান্দা হইতে তাঁহার আশ্রয়-দাতার পুত্রের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। তিনি কতকগুলি গুণ্ডা লাগাইয়া লাঠির গুঁতা মারিয়া বেগম সাহেবাকে জোর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার সংবর্দ্ধনার্থ সৈন্যদল অসি নিষ্কাসন করিল। মীরজাফর ইংরেজের কায়দা জানিতেন না, সুতরাং তাহারা বুঝি তাঁহাকে হত্যা করিবে, এই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; এই সময়ে স্বয়ং ক্লাইভ আসিয়া তাঁহাকে 'নবাব' সম্বোধন করিয়া প্রীতিভরে করমর্দ্দনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিলেন।

সিরাজের মৃত্যুসম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "কর্ণেল ক্লাইভকে সমর্থনার্থ আমরা এই বলিতে পারি যে, ভারতীয় কোন ইতিহাস-লেখকই সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুতে তাঁহার কোন হাত ছিল, একথা বলেন নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন, সিরাজ যে বন্দী হইয়াছেন, একথাই তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহাকে এসকল কথা জানান হইয়াছিল" (৫৬৯ পৃঃ)।

বাস্তবিক ক্লাইভের মত বীরপুরুষ এরূপ হেয় কার্য্য কখনই অনুমোদন করিতেন না, এমন কি মীরজাফরের এবিষয়ে কিছু ইঙ্গিত ছিল, কেহ কেহ এ সন্দেহ করিলেও তৎসম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত করার যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে মীরজাফরকে কেহই দেখিতে পারিত না। নবাব হওয়ার পর তিনি নিজে মস্ত বড় জাঁকালো একটা নাম ধারণ করিয়াছিলেন, "সুজা এল মুল্‌ক হিসামএদ্ দৌলত মীরজাফর খাঁ বাহাদুর মেহাবৎজঙ্গ" ("But as he was very much smitten with the charms of the title of Mehabut djung, which had been borne by Alybardy Khan, he ordered a new seal to be engraven for himself, where he assumed the title of Sujah-el-Mulk Hysam-ed-doulat Mirdjafar Ally Khan Bahadur, Mehabut djung—that is, the high and valiant Lord Mirjafar khan, who is the valorous of the State, the sword of the Empire and the formidable in War and the Majestic in Battles." (Metaqherin, Vol. II, p. 208), কিন্তু তাঁহার এক রহস্যপ্রিয় সভাসদ্ তাঁহার মসনদে বসিবার অল্প কয়েক মাস পরে আর একটি সহজ নাম দিয়াছিল, "কর্ণেল ক্লাইভের গর্দ্দভ"—এই উপাধি দ্বারা তিনি আজীবন পরিচিত হইয়াছিলেন। (A very few months after Mirzafar's accession, he was nicknamed by some of the wits of the Court, "Colonel Clive's Ass" and retained the title till his death (Stewart, p. 569). মীরজাফর মৃত্যুকালে নন্দকুমারের উপদেশানুসারে কিরীটেশ্বরীদেবীর পাদোদক পান করিয়াছিলেন। গোলাম হসেন লিখিয়াছেন, "ইহাই তাঁহার শেষ খাওয়া—খোদা আমাদিগকে এই ভাবের পীড়া ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন"।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-দীক্ষার কথা

পাঠানদের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুর যে তেজ ছিল, তাহা মোগলদের সময়ে অনেকটা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। পাঠানেরা এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে যতটা মিশিয়াছিলেন— মোগলেরা তাহা করেন নাই। হুসেন সাহ প্রভৃতি প্রধান রাজারা সম্রান্ত ব্রাহ্মণদিগের পুত্রকন্যা খুঁজিয়া তাঁহাদিগের সহিত স্বীয় সন্ততিবর্গের বিবাহ দিতেন। আমরা একটাকিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশের অনেক সুন্দরী কন্যা এবং গুণশালী যুবকের সহিত মুসলমান বাদসাদের পুত্রকন্যার বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য এই সকল কন্যা ও পুত্রদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। এইভাবে অযোধ্যা প্রদেশের বাইশোয়ারা পরগনার অধিপতি ক্ষত্রিয় ধনপৎ সিংহের বংশীয় ভগীরথের পুত্র কালিদাস গজদানীর রূপে মুগ্ধ হইয়া নবাব বাহাদুর সাহের কন্যা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীতে কবিত্বের রং ফলাইয়া মুসলমান কবি যে পল্লী-গীতিকা রচনা করিয়াছেন, তাহা "ইশা খাঁ" শীর্ষক কাব্যে আছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাস স্বর্ণহস্তী (অবশ্য ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্ত্তি) ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া গজদানী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। নবাবকন্যার প্রেমে পড়িয়া তিনি ধর্ম্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক 'সোলেমান' নাম গ্রহণ করেন। এই দেওয়ান কালিদাস গজদানীর পুত্রই জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ইশা খাঁ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে যিনি একটা কলঙ্কের দাগের মত হইয়া রহিয়াছেন, সেই 'কালাপাহাড়'ও হিন্দু ছিলেন, তিনি মুসলমান বাদশাহের কন্যা বিবাহ করিয়া জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেন; তাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠানেরা হিন্দুর রাজ্য জয় করিলেও তাঁহাদের মধ্যে সম্রান্ত বংশীয়দিগকে স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যেমন দাউদ খাঁ, কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানেরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরাম ও সত্রাজিৎ রায় প্রভৃতি হিন্দু জমিদারগণও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কারন পাঠানেরা শুধু মাথা হেঁট করাইতে চাহিতেন, কিছু রাজস্ব চাহিতেন, দক্ষিণা পাইলেই চলিয়া যাইতেন; হিন্দু রাজারা প্রায় স্বাধীনই ছিলেন, তাঁহারা ঐ রাজস্ব দেওয়ার পর নিজ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন করিতেন, এমন কি পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা অপর শত্রুদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন—গৌড়দ্বারের রাজা চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায় এইভাবে কতলু খাঁকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে ইঁহারা এত প্রবল হইতেন যে, বঙ্গাধিপের রাজ্য আক্রমণ করিবার কথাও মনে মনে পোষণ করিতেন। এইভাবে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর একদা নবাবের রাজধানী আক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত হুসেন সাহের সেনাপতি মমারক খাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি

পাঠানাধিকারে বাঙ্গালী।

দিয়াছিলেন। পাঠানদের সময়ে হিন্দুর প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয় নাই। পূর্ব্বকালে জরাসন্ধ ও পৌণ্ড্র বাসুদেব যেরূপ মথুরা ও দ্বারকার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গের নগণ্য জমিদারেরাও সেইরূপ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিয়াছিলেন। এমন কি প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার রাজধানী পর্য্যন্ত যাইবেন, ভারতচন্দ্র কবি তাঁহার এই ইচ্ছা আভাসে জানাইয়াছেন ("যমুনার জলে ধোব এই তরবার"), দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতি এই বিদ্বেষ বাঙ্গালীর চিরসংস্কারাগত। মহারথরা পূর্ব্বকাল হইতে পূর্ব্বভারতকে ভয় করিয়া চলিতেন। জগজ্জয়ী আলেকজাণ্ডার পূর্ব্বাঞ্চলের নাম শুনিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। স্বয়ং মঃ ইবন বক্তিয়ার খাঁ এদেশের স্বাধীনতা মাত্র হরণ করিয়া আরো পূর্ব্বে অভিযান করিবার চেষ্টায় নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এদেশ ইতিহাসের পূর্ব্বযুগ হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের আনুগত্যের বিরোধী। পুরাণের যুগ ছাড়িয়া দিলেও ইদানীং কালে প্রতাপাদিত্য, তৎপুত্র উদয়াদিত্য, মুকুন্দরাম, তৎপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়, ইশা খাঁ, ফিরোজ খাঁ সেই ইন্দ্রপ্রস্থ-বিরোধী পতাকা বহন করিয়া প্রাণ দিয়াছেন, কিন্তু পণ ছাড়েন নাই।

বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য ও দিল্লীর বিদ্রোহ।

পাঠান-রাজত্ব পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের এই স্বাধীনতার চেষ্টা সর্ব্বত্র চলিয়াছিল। পাঠানেরা ভূম্যধিকারী ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন রণক্ষেত্রের বীর—সংগ্রামবিজয়ী। কৃষি-ব্যবসায়, বাণিজ্য, দেশের উৎপাদিকা শক্তি এবং তজ্জাত অর্থাগম—এসকল বিষয় অসহিষ্ণু, সততকৃপাণপাণি, রণজয়ী বীরগণের কল্পনাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য জানিতেন না; কি জমির কত আয় হইতে পারে, রাজস্ব কত হওয়া উচিত—এসকল লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইতেন না। অর্থের প্রয়োজন হইলে নিকটবর্ত্তী কোন রাজভাণ্ডার বা দেবমন্দির লুণ্ঠন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের ঐহিক-পারত্রিক উভয় প্রকারের সুফল লাভ হইত। শুধু শের সাহ ও হুসেন সাহ জমিজমার আয়সম্বন্ধে খবর রাখিতেন, অপরাপর পাঠান নবাবেরা দিনরাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ ও সেই চিন্তাই করিতেন। যাঁহারা অর্থের চিন্তা হইতে মুক্ত থাকেন, তাঁহাদের মন স্বভাবতঃই উদার হয়। পাঠান নবাবদের কতকটা সেরূপ উদারতা ছিল। এই সুযোগে এদেশে হিন্দুরা বাণিজ্যাদি দ্বারা বিপুল অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই ধনকুবেরদের শেষ দীপশিখা পরবর্ত্তী কালে জগৎশেঠের গৃহ হইতে জ্বলিয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, জগৎ শেঠের মত ধনী তখন পৃথিবীতে ছিল না।

পাঠানাধিকারে হিন্দু শিল্পিগণই হিন্দু-মুসলমান সকল নৃপতিবৃন্দ ও গণ্যমান্য লোকের উৎসাহ পাইত। বিদেশ হইতে পাঠান নবাবেরা শিল্পী বেশী আনাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যের বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিত, পাঠানদের অত্যাচারে তাহারা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছিল।

হিন্দুশিল্প।

হ্যাভেল সাহেব পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মোগল ও পাঠান-শিল্প বলিয়া যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পেরই মূলতঃ রূপান্তর।

তাহাতে ইরানী প্রভাব কতকটা আছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় শিল্পই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ফতেপুর সিক্রি এবং অন্যান্য স্থানের আকবর-কৃত মসজিদসমূহের সিংহদ্বারের কারুকার্য্যের মত উৎকৃষ্ট চারুকলা—কি গঠনে কি কারুকার্য্যে—পারস্যদেশীয় কোন মসজিদে দৃষ্ট হয় না। (A Handbook of Indian Art, E. B. Havell, p. 113.) তিনি বলেন হিন্দু কারিগরদিগকে আকবর ঐ সকল ইরানী মসজিদের আদর্শে মসজিদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অপূর্ব্ব শক্তিবলে তাহারা বিদেশী আদর্শ অনেকদূর ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিল। হিন্দুদিগের মূর্ত্তি ও চিত্রনির্ম্মাণের কথা উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল বলিয়াছেন, "ইহাদের চিত্রাঙ্কনশক্তি আমাদিগের ধারণার অতীত। সমস্ত জগতে ইহাদের সমকক্ষ শিল্পী অল্পই আছে।" (আইন-ই-আকবরী—ব্লকম্যানের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ) ("Their pictures surpass our conception of things. Few in the whole world we found equal to them.") হ্যাভেল বলেন, "হিন্দু শিল্পীদের দ্বারা গড়া এই সকল মুসলমানী মসজিদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আরব, তুরস্ক, ইজিপ্ট এবং স্পেনের মুসলমানী শিল্পের নিদর্শনগুলি ইহাদের কাছে দাঁড়ায় না। হিন্দুর আধ্যাত্মিক ধারণা এবং তাঁহাদের সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যে মণ্ডিত হইয়া বিজাপুর, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, আহমদাবাদের মসজিদগুলি কেইরো এবং কনষ্টাণ্টিনোপলের মসজিদগুলি হইতে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে শেষোক্তগুলি উহাদের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।" (The Ideals of Indian Art, Havell, p. 119) "Inlay workers who were all Hindus from Kanoj and a Hindu garden designer from Kashmere." (A Handbook of Indian Art, Havell, p. 137) হ্যাভেল সাহেব নানা প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৌদ্ধশিল্প-প্রভাব সমস্ত এশিয়ার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। চীন ও জাপানে, সিংহল, জাভা, শ্যাম এবং সমস্ত ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এই ভারতীয় শিল্পের আদর্শ সুপ্রোথিত হইয়াছিল,—পারস্য ও আরবও এই শিল্প (মূর্ত্তি বা বিগ্রহ-নির্ম্মাণপ্রথা অবশ্য বাদ দিয়া) হিন্দুস্থানের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিল। আহমদাবাদ ও বিজাপুরের আশ্চর্য্য মসজিদগুলি কিছু সামান্য পরিবর্ত্তনের পর বৌদ্ধ বিহারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়াছিল। আহমদাবাদের বিশাল ও সুন্দর হর্ম্ম্য ও মসজিদগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে গঠিত হইয়া দর্শনীয় হইয়া আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যপ্রভু আহমদাবাদ গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচর গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, "আশ্চর্য্য আহমদাবাদ জাঁকের সহর।"

মোগলদের সময়ে শাসনকর্ত্তারা বঙ্গের শিল্পীদিগকে কোন বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু পাঠানেরা যে হিন্দু শিল্পী দিয়া তাঁহাদের সমস্ত মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধিক্ষেত্র গড়িয়াছিলেন, তাহার প্রভূত উদাহরণ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এখনও আছে। গৌড়ের "বড় সোনা মসজিদ" বা "বারদুয়ারী" মসজিদে মাত্র বারটি গম্বুজ লাগাইয়া উহাতে মুসলমানী প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

বারদুয়ারী মসজিদ।

এই "বারদুয়ারী" গৃহ হিন্দু আমল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, প্রাচীন পল্লীগীতিকায় বঙ্গদেশের এই "বারদুয়ারী ঘরের" পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখনও মৈমনসিংহ জেলার ঘরামীরা "বারদুয়ারী ঘর" নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ফার্গুসন সাহেব লিখিয়াছেন, "প্রাচীন গৌড়ের সৌধমালার মাল-মসলা দিয়া মুর্সিদাবাদ, মালদহ, রঙ্গপুর, রাজমহল প্রভৃতি নগরী সমগ্রভাবে গঠিত হইয়াছে, এমন কি কলিকাতা ও হুগলীর অনেক স্থানে সেই উপকরণ গৃহীত হইয়াছে।"

বাঙ্গলাদেশে ইট দিয়া বাড়ী-ঘর নির্ম্মিত হইত, পাথর এস্থানে কতকটা দুর্লভ; পোড়া মাটীতে (terracotta) নানারূপ কারুকার্য্য করা হইত। ইটের দ্বারা বঙ্গীয় কোঠাবাড়ীতে খিলান প্রস্তুত করা সহজ—পাথর দিয়া গোলাকৃতি কি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (চামচিকা) খিলান তৈরী করা কঠিন। দিল্লী অঞ্চল অপেক্ষাও এদেশে মুসলমানদের মসজিদ প্রভৃতিতে পোড়া ইটের উপর হিন্দু কারিগরদের হস্ত-নৈপুণ্যের চিহ্ন বেশী। গৌড়ের মসজিদ ও সমাধিমন্দিরগুলিতে এইরূপ ইটের উপর যেসকল অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দৃষ্ট হয় তাহা এদেশের হিন্দুকারিগরের হাতের কাজ। আমার মনে হয়, ইট কাঁচা থাকিতেই, এখন যেরূপ মালিকের নামের ছাঁচ তাহার উপর ছাপ দিয়া পোড়ানো হয়, সেইরূপ প্রাচীন কালে নানারূপ পৌরাণিক এবং সামাজিক ঘটনা, নানারূপ মূর্ত্তি ও শিল্প-সৌষ্ঠবের ছাঁচ তৈরী থাকিত, তাহারই ছাপ দিয়া ইট পোড়ানো হইত। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের খিলানের কাজ, ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদের কারুকার্য্য, এগুলি সমস্তই হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্ম্মিত, এমন কি শেষোক্ত মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনের একাংশ মসজিদের অঙ্গীয় হইয়া রহিয়া গিয়াছে। গৌড়ে হুসেন সাহর সমাধি এবং কয়েকটি মসজিদে যে নানা রঙ্গের এনেমেল করা টালির উপর কাজ দেখা যায়, তাহাও এই দেশের লোকের মৌলিক কাজ—বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্প। "The Pathan mosques and tombs of Gour, Pandua and Malda on this account are even closer imitation of Hindu and Buddhist buildings than they were in the neighbourhood of Delhi, where stones of large dimensions were procurable and consequently the arch was not used by Hindu masons to secure a structural purpose. The terracotta and fine moulded brick-decorations used both in mosques and temples in Bengal were certainly not imported by Muhammedans. The cognate art of enamelled tiles and bricks so much used in Muhammedan buildings in India was probably a local one in Gour"—(A Handbook of Indian Art, Havell, p. 123).

হুসেন সাহের সময়ে অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, বঙ্গের নানাস্থানে তিনি মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৫০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পাটনা জেলায় বিহার মহকুমার বোনহারা গ্রামে, ঢাকা জেলার বল্লীপুর পরগনায় মাচাইন গ্রামে ১৫০১ খৃষ্টাব্দে, মালদহ জেলায় ১৫০২ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ্চ, ১৫০৩ খৃঃ অব্দে গৌড়ে কদম রসুলের নিকট সারন জেলায় চোরান গ্রামে, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায়—

এইরূপ বহুস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হুসেন সাহ মসজিদ, তোরণ ও কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার ওমরাহ ও অধীন লোক ও আত্মীয়বর্গও অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বঙ্গের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ২৫২ হইতে ২৬৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই দেশব্যাপী স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহাতেই প্রায় দশটি পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছে। গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মালদহই এই স্থাপত্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। সারন ও বিহার হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত হুসেন সাহের এই উদ্যম সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। হুসেন সাহ ছাড়া পাঠানদের মধ্যে শের সাহের মসজিদ, সমাধি ও রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শের সাহের সমাধি-মন্দিরে স্থাপত্যের সেরা সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনি সুন্নি ছিলেন, এজন্য তদীয় স্মৃতি-চিহ্নে পার্শ্ববর্ত্তী মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধির আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকালো ভাবটি নাই। একটি কৃত্রিম হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এই সমাধি স্বীয় মহিমান্বিত স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করিয়া দেখাইতেছে। উহা অনেকটা তাঁহার স্বীয় মহান্ চরিত্রের ন্যায়। চারিদিকের সমতলভূমি ও জলরাশির মধ্যে থাকিয়া উহা সেই উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রের মহিমায় ঐন্দ্রজালিক প্রভাব প্রকটিত করিতেছে। ইহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বেশী নাই, কারণ সুন্নিরা সহজ নিরাভরণ, সতেজ সারল্য বেশী পছন্দ করিতেন। কিন্তু উহাতে ইরানী প্রভাব কিছুই নাই, উহা ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্তূপগুলির অমল-ধবল শারদ জ্যোৎস্নার মত প্রভা-দ্যোতক। হাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, "ইনি সুন্নিদের নিষেধাত্মক বিধি মানিয়া হিন্দু কারিগরদিগকে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই সকল শিল্পী ইহা কারু-কার্য্যে অলঙ্কৃত করে নাই, এই সমাধিমন্দিরও সর্ব্বাংশে ভারতীয়। এই সমাধিতে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের সমাধি-মন্দির ও বৌদ্ধস্তূপেরই পঞ্চদশ শতাব্দীর বিকাশ দৃষ্ট হয়" (He set Hindu craftsmen to work in carrying out his building projects in conformity with the Sunni prescriptions ; just as the Indian mosque is always Indian so is the tomb of the great Pathan : it is the fifteenth century development of the Indo-Aryan heroes' tomb—the Buddhist *silpa*"—(A Handbook of Indian Art, Havell, p. 115). অজান্তার গুহা-মন্দিরাদি হইতে দৃষ্ট হয় বৌদ্ধস্তূপগুলি গোলাকৃতি সুদৃঢ় আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় শিল্প-কলার সুচিরাগত আদর্শে পদ্মাকৃতি হইয়া আসিতেছিল। মসজিদের গম্বুজগুলি এই পরিবর্ত্তিত ভাবের দ্যোতনা করিতেছে। কি ইরানে, কি আরবে, কি ভারতবর্ষে, মসজিদের গম্বুজগুলি ভারতীয় বৌদ্ধস্তূপের অনুকৃতি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধশিল্প অর্দ্ধজগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সুন্নিরা মূর্ত্তি বাদ দিয়াও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পাঠানের সময়ে এদেশের হিন্দু ও মুসলমান-কীর্ত্তি সমস্তই বাঙ্গালী হিন্দু কারিগরের হাতের। হিন্দুধর্ম্মের জটিল নিষেধবিধি কতকপরিমাণে এড়াইয়া এবং ইসলামের সহজ ও সরল আদর্শের অনুবর্ত্তী

শের সাহের সমাধি।

হইয়া কাজ করিতে আদিষ্ট হওয়াতে হিন্দু কারিগরদের হাত একটু বেশী স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল হইয়াছিল।

সকলেই অবগত আছেন যে, হিন্দুপণ্ডিত ও ভিষকৃগণ বোগদাদের রাজসভায় বিশেষরূপে আদৃত হইতেন। আমরা দেখিতে পাই ইসলামের বীরবরগণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে পাইলেই সংহার করিতেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতীয় কারিগরদিগকে রক্ষা করিতেন। মহম্মদ গজনী ভারতীয় মন্দিরাদির অতুলনীয় সৌষ্ঠব এবং স্থাপত্যের পরা কাষ্ঠা দেখিয়া সহস্র সহস্র হিন্দুকারিগরকে গজনীতে রাজপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গজনীতে তিনি হিন্দু রমণী ও হিন্দু কারিগরদিগের একটি হাট বসাইয়াছিলেন। সমস্ত মুস্লিম-এশিয়ায় এই হাট হইতে দাসী এবং নিপুণ কারিগর ক্রয় করা হইত।

এই কারিগরদের শ্রেষ্ঠ ছিল—মাগধ শিল্পীরা। 'মাগধ বন্দীর' ন্যায় মাগধ শিল্পীও জগতের সর্ব্বত্র জয়মাল্য পাইয়াছিল। পাঠান আমলে হিন্দু কারিগরদের এই খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই। হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, হিন্দুস্থান হইতে কারিগরেরা যাইয়া ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিদেশে নূতন প্রভাবে পড়িয়া তদনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। বাধ্য হইয়া তাহারা পারস্য, আরব, তুরস্ক, স্প্যানিয়ার্ড ও ইজিপ্সিয়ান নাম গ্রহণ করিল। এই ভারতীয় শিল্পাচার্য্যগণের বংশধরেরাই মুসলমান হইয়া সর্ব্বত্র প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যের দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। (A Handbook of Indian Art, p. 129) "Thousands of craftsmen, each expert in his own special branch, were forced into the service of Islam in different parts of Asia and Europe and set to work indiscriminately at the bidding of their masters" (p. 129). হিন্দু কারিগরেরা 'বিমান' নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা সহজেই গম্বুজ করিতে পারিল। তাহারা মূর্ত্তি তৈরী করিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্ম চারুশিল্প, যাহা নানারূপ সপুষ্পলতিকার ভঙ্গীতে মন্দিরদ্বারে প্রদর্শিত হইত, সেই শিল্পজ্ঞান ও হাতের অবলীলাক্রম ভঙ্গীদ্বারা তাহারা কোরানের 'শ্লোক'গুলিকে মসজিদের দ্বারদেশে অতি সুন্দর করিয়া চারুশিল্পকার্য্যে পরিণত করিল। তাহারা হয়ত মানুষের ছবি আঁকিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু মসৃণ টালির উপর এবং প্রাচীরের গায়ে নানারূপ বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া তাহাদের শিল্পপ্রতিভা প্রদর্শন করিল।

পৃথিবীময় হিন্দুকারিগর উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।

বৌদ্ধ যুগের স্তূপ, তোরণ এবং মন্দিরাদি পাশাপাশি রাখিয়া এশিয়ায় ইসলামের মসজিদ ও সৌধমালায় হিন্দু কারিগরের এই হস্তচিহ্ন বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা হ্যাভেল সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন; ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাঁহার সহায় হইয়াছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য ও চারুশিল্পের প্রভাব অতি আশ্চর্য্যভাবে সমস্ত এশিয়াতে এবং য়ুরোপের স্থানে স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; তাহার আদি খুঁজিতে গেলে হয়ত আমরা অতল ঐতিহাসিক কূপের থৈ পাইব না। খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বের মহেঞ্জো-দারোতে যে সকল

শিল্প-নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—তাহা আর্য্যসভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহারই ক্রমবিকাশ আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম-যুগে দেখিতে পাই এবং তাহার কেন্দ্রভূমি ছিল ভারতবর্ষ।

মোগল-সম্রাট্ আকবর ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্মের মিলন ঘটাইতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারই উদারতার ফলে মোগল-দরবারে স্থাপত্য ও সূক্ষ্মশিল্পের এরূপ আশ্চর্য্য বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারই উদারতার ফলে তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পরবর্ত্তী দুই বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি বংশধরের রাজত্ব-কালে হিন্দু ও মুস্লিম এই উভয় জাতির আদর্শে তাজমহল, সাজাহানের মসজিদ, সম্মনবুরুজ (আগ্রা), ইতি মাদউল্লার সমাধিমন্দির (আগ্রা), দেওয়ানি খাস্ প্রভৃতি বিখ্যাত সৌধমালা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আরঙ্গজেব শিল্প ও স্থাপত্যের শেষশিখা নিবাইয়া ফেলিলেন। তিনি সাদা জামা ও সাদা কাপড় পরিতেন, সভাসদ্ সমস্ত নৃপতি প্রভৃতিকেও তাহাই পরিয়া দরবারে আসিতে হইত। তিনি চিত্রকর ও সূক্ষ্মশিল্পের কারিগরদিগকে নিরস্ত করিলেন। বেশভূষায় নিযুক্ত গল্প বলিবার লোক থাকিত, তাহারা নাচিয়া গাহিয়া এবং নানারূপ মুদ্রাসহযোগে অভিনয় করিয়া গল্পে প্রচুর রস সঞ্চার করিত, তাহাদিগকে তিনি কর্ম্মচ্যুত করিলেন না বটে, তবে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন (মুতক্ষরিন)। এ যেন জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করা হইল। সঙ্গীত বিদ্যাটাকে তিনি অতি হেয় মনে করিয়া তাহা নিগৃহীত করিলেন। যমুনার পারে বীণা ও বেণুরব থামিয়া গেল, কোরানের আবৃত্তি চলিল। এই কার্য্যের দ্বারা দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়—প্রথমতঃ ইসলাম ধর্ম্মের সুন্নিমতের গোঁড়ামি, কিন্তু মূলতঃ বোধ হয় পিতৃদ্বেষী পুত্র তাঁহার বাপের কীর্ত্তিগুলি কিছুই নহে বলিয়া উহার অসারতা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন, তাই নিজে একটা নূতন সহজ সরল জীবনের মৌলিক আদর্শ খাড়া করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিল্প ও কলা-চর্চ্চার বিদ্বেষ ধর্ম্মের গোড়ামি না পিতৃবিদ্বেষের ফল তাহা বলা কঠিন।

আরঙ্গজেব-কৃত শিল্প ও সঙ্গীতের নিরুৎসাহ।

সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে টাকা আসিত, তাহা আগ্রায় ব্যয় হইত। আরঙ্গজেব সে অর্থ ব্যয় করিতেন যুদ্ধবিগ্রহে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্‌দ্বয় তাহা শিল্পচর্চ্চায় ব্যয় করিতেন। এই মোগল যুগের শিল্প বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। শিল্পের কায়দা-কানুন ও পরিচ্ছন্নতার এই ইঙ্গিত যদিও অজান্তাযুগেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, (সুতরাং তাহাকে ভারতীয় শিল্প নাম দিতে বাধে না)—তথাপি মোগল-শিল্প এদেশের জন-সাধারণের অনায়ত্ত। বাঙ্গলাদেশ সর্ব্বদা গণতান্ত্রিক, মোগলের সাম্রাজ্যবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসন তাহাদের প্রকৃতির অনুকূল নহে, এইজন্য তাহারা মোগলাধিকারের পথে এত বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। যে প্রভূত অর্থে মোগল স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শ রচিত হইয়াছিল, তাহা সার্ব্বভৌম শক্তি ভিন্ন অন্যের আয়ত্ত নহে। বিশেষ তটভঙ্গে নিত্য-লীলা-চঞ্চল নদনদীপূর্ণ বাঙ্গলা দেশে স্থাপত্যের সেরূপ অবকাশ নাই। কিন্তু মোগলচিত্রও বাঙ্গালীদিগকে ততটা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এদেশ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য। হ্যাভেল সাহেব বলেন,

বাঙ্গালী মোগল কলমের পক্ষপাতী কেন হয় নাই।

তাহা তাজমহলেও নাই। শিল্প-পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—তাজমহলাদি উচ্চাঙ্গের স্থাপত্যের সঙ্গে অজান্তার শিল্পের এই স্থানে প্রভেদ। বৌদ্ধ ও হিন্দুজগতের আধ্যাত্মিক মহিমা মোগলশিল্পে নাই। এইজন্য সৌন্দর্য্যের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও মোগল-শিল্প বাঙ্গালীদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ মোগল-শিল্পের আদব-কায়দা বাঙ্গালীর মোটেই ভাল লাগে নাই। দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের আসন দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে যতটা সম্ভ্রম ও সতর্ক দৃষ্টির দরকার, ভক্ত দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতেও ততটা দেখাইতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্থলে সাজাহানের সভা, আকবরের জন্ম প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রত্যেক সভাসদ্ ও দ্বারী চাকর পর্য্যন্ত আদব-কায়দার চূড়ান্ত দেখাইতেছে, তাহাদের বসিবার ভঙ্গীতে একটুও ত্রুটি নাই, পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ ঘেরা। এমন কি ফকির ও সন্ন্যাসী আঁকিতে যাইয়াও তাঁহাদের ভঙ্গী বা বেশভূষায় মুহূর্ত্তের জন্যও মোগল-শিল্পী—তাঁহার অতি সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত আদব-কায়দার জ্ঞান ভুলিতে পারেন নাই। বাহিরের এই কায়দাকানুন, অবান্তর বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু প্রভৃতি সর্ব্ব চিত্রের মধ্যে উঁকি মারিতেছে। সর্ব্বত্রই যেন রাজদরবার—বসিবার বা চলিবার ভঙ্গী পাছে বেকায়দা হইয়া যায় মোগল শিল্পী সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বাল্মীকি রাবণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, "নিষ্কম্পপত্রাস্তরবো নদ্যশ্চ স্তিমিতোদকাঃ।"——"আমি যেখানে থাকি বা চলাফেরা করি সেখানে তরুগুলি নিষ্কম্প ও নদীর জল স্তিমিতগতি হইয়া যায়" (রামায়ণ, আরণ্য, ৩৮ সর্গ, ৯ শ্লোক) তদ্রূপ দিল্লীশ্বরের প্রবল প্রতাপ যেন মোগল-শিল্পকে অতি মাত্রায় স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে, সকল মূর্ত্তিই যেন রোমের সিনেটারগণের মত স্থিরগম্ভীর, এরাজ্যে যেন হাসা, কাঁদা ও অঙ্গসঞ্চালন নিষিদ্ধ। এই ভাব বাঙ্গলার লোক পছন্দ করিবে কি করিয়া? তাহাদের আদর্শ—চাঞ্চল্য, স্থৈর্য্য তাহারা মোটেই পছন্দ করে না। বৌদ্ধযুগের বুদ্ধবিগ্রহে অবিচলিত স্থৈর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিকতা মোগল-শিল্পে নাই। মোগল-শিল্পে সমস্ত মূর্ত্তিই যেন বাহ্য-দৃষ্টিতে বুদ্ধাবতার। মোগল যুগে বাঙ্গলায় হরি-সংকীর্ত্তনের তুমুল ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সংকীর্ত্তন-ক্ষেত্রে নৃত্যকারীদের লম্ফঝম্প, খোলবাদক লাফাইয়া আড়াই হাত উঁচু উঠিয়াছে—এক পা ধরণীতলে আর এক পা বায়ুর উপর। তাহার দুই হাতের উদ্দণ্ড গতিতে খোলের আওয়াজের উচ্চতার কল্পনা করা যায়। যেখানে বাঙ্গালী ছবি আঁকিতে বসিয়াছে, সেইখানেই ক্ষিপ্রগতি ও প্রাণের দ্রুত স্পন্দন দেখাইয়াছে; হয়ত কোন সময়ে তাহারা মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—এই নর্ত্তন, কুর্দ্দন, টীকি নাড়া ও বাহ্বাস্ফালনের দেশে, সারি সারি বুদ্ধদেবের মত প্রশান্ত ছবি, তাহা যতই নিপুণ-হস্ত ও সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক হউক না কেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? বাঙ্গালী হয়ত এককালে বৌদ্ধমূর্ত্তির প্রশান্ত ভাব পছন্দ করিত, কারণ তাহাতে আধ্যাত্মিক ভাব ছিল, সে যুগ চলিয়া গিয়াছিল। মোগল-শিল্পের অন্য এক সম্পদ্ সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন; মানুষের মুখ ও শরীর-অঙ্কনে তাহা এত সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি দেখাইয়াছে যে, ছবি দেখিলে মনে হয়—ছবি মানুষ হইতে সুন্দর। ভোগবিলাসের রাজা সাহেন সা

বাদশাহাদের অন্দর মহলে ছবি যাইবে, বেগম, বাদসা, নবাব ও রাজপুরুষদের ছবি আঁকিতে হইবে, চিত্রকর তুলি ধরিয়া রং ঘষিতে ঘষিতে বর্ণের ভিতর এরূপ পরিমার্জ্জনা, এরূপ অলৌকিক লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, তাহার সমকক্ষতা করা সহজ নহে। চিত্রকর জানে, ছবিখানি ভাল হইলে তাহার আজীবনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, বিশ্রী হইলে হয়ত তাহার মুণ্ড যাইবে—এইজন্য নূরজাহান, মমতাজ, জাহাঙ্গীর, সাজাহান প্রভৃতির ছবি হাতীর দাঁতের উপর আঁকিতে যাইয়া তাহারা যত্নের কোন ত্রুটি করে নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তাহারা প্রাণপণ করিয়াছে। কিন্তু এত যত্নের আঁকা ছবি কি সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ্ দিতে পারিবে, যদ্দ্বারা হিন্দু বা বৌদ্ধ শিল্পী কোন দেবতা বা দেবপ্রতিম ব্যক্তির মূর্ত্তিতে সেই দেবত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে? দৃষ্টান্ত স্থলে বুদ্ধের সেই অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তির কথা বলা যাইতে পারে, যাহাতে অজান্তাগুহা উজ্জ্বল হইয়া আছে—যেখানে কুলরমণী ভিক্ষা দিতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার শিশুপুত্রের হাতে ভিক্ষাভাণ্ড, সেই অলৌকিক প্রভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া শিশু ভুলিয়া গিয়াছে; ভিক্ষা দেওয়ার কথা যেন মনে নাই; কিংবা চৈতন্যদেবের গঙ্গার কূলে সেই অপূর্ব্ব নৃত্যের ছবিখানি, যাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া মাঝি লগি হাতে দাঁড়াইয়া আছে—নৌকা বাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে, নৌকার স্বামীর হাতের হুঁকা হইতে কল্কে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার হুঁস নাই; অথবা কাঠের উপর সেই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি—যাঁহার মাথার মুকুট মাতৃগরিমার দ্যোতনা করিতেছে, অঙ্কস্থিত শিশুর স্তন্যদানের সময়ে তাঁহার ভাবগম্ভীর মুখে স্নেহের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোগল আর্ট অত সুচিন্তিত, অত সুদক্ষ কারিগরী ও সাবধানতার পরিচায়ক হইয়াও কি ভক্তের বা সাধকের একটানে অবলীলাক্রমে আঁকা ছবির সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছে? শুক্রনীতি মানুষের ছবি আঁকিতে নিষেধ করিয়া শুধু দেবতার ছবি আঁকিতে উপদেশ দিয়াছে; কেন এই নিষেধ-বিধি তাহা পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। সকলেই অবগত আছেন আরঙ্গজেবের অত্যাচারে আগ্রার শিল্পীরা রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিল। হাভেল সাহেব বলিয়াছেন—তাহারা রাজপুতনায় যাইয়া রাজাদের আশ্রয় লইল। এইখানে তাহারা যে সকল ছবি আঁকিয়াছে তাহা কতকটা মোগল-শিল্পের পরিচ্ছন্ন ভাব ও কতকটা হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিয়াছে। মানসিংহের পর হইতে রাজপুতনার সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটু বেশী মেশামিশি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সংগ্রামসিংহ একেবারে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং মানসিংহ কুচবেহারের রাজকন্যা এবং কেদার রায়ের কন্যা বিবাহ করেন, ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গদেশ হইতে আরও অনেক রমণী লইয়া গিয়া অন্দরমহলে পুরিয়াছিলেন। মোগল বাদশাগণ প্রায়ই বহু বিবাহিত পত্নী ও বহু উপরাজ্ঞী অন্দরমহলে রাখিতেন, মানসিংহ এ বিষয়ে তাঁহার প্রভুদের অনুকরণ করিয়াছিলেন। সনাতন ও জীবগোস্বামীর কৃপায় রাজপুতনার অনেক রাজা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজপুত-শিল্প।

তাঁহারা বাঙ্গলাদেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন, এইভাবে

রাজপুত-শিল্প বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। এই শিল্পের নমুনা বাঙ্গলায় যাহা পাই, তাহা একের উপর অন্যের প্রভাব বিস্তার করার প্রমাণ ছাড়া সৌন্দর্য্যের আদর্শ হিসাবে খুব উচ্চ মূল্যের যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জয়পুরের শিল্প বাঙ্গলা চিত্রশালার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জয়পুরী কৃষ্ণ অত্যন্ত মহিমা-সহকারে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বাঁশীহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন—তাঁহার সহিত বঙ্গের স্বচিরসম্পদ—মাধুর্য্যের সম্পর্ক অল্প। রংএর খেলায় জয়পুরী চিত্রকর সিদ্ধহস্ত—তাহাদের ছবিগুলি কমনীয়তা মাখানো, লাবণ্যপূর্ণ বর্ণসংযোগে বেশ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু খাঁটী বাঙ্গলা চিত্রের লীলাচঞ্চল প্রাণের খেলা তাহাতে অল্প।

কাঙ্গড়া কলম।

কাঙ্গড়া কলমের চিত্র এখানে উল্লেখযোগ্য। আমরা উল্লেখ করিয়াছি পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব্বসীমায় হিমালয়ের উপত্যকাপ্রদেশস্থ কতকগুলি রাজ্যের অধীশ্বর আপনাদিগকে সেন-রাজবংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কাশ্মীর, পুঞ্চ, মুকেত, মণ্ডী এবং জুব্বার রাজবংশের প্রাচীন তালিকায় দৃষ্ট হয় যে গৌড়ের লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুরসেন ১২৫৯ বিক্রম সংবৎসরে মুসলমানকর্ত্তৃক গৌড়দেশ হইতে তাড়িত হইয়া প্রয়াগে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দেশগুলির অধীশ্বরেরা সুরসেনের পুত্র রূপসেনের বংশধর।* যখন রাজন্যবর্গের বংশতালিকায় একথা উল্লিখিত আছে, তখন আমাদের তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পাঞ্জাব গেজেটিয়ার উক্ত রাজগণের যে বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা পাওয়া যায় এবং পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর স্বর্গীয় রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী বঙ্গের বিদুষী কন্যা সরলা দেবী তথা হইতে এই বংশাবলী সঠিক জানিয়া আসিয়াছেন। ১২৫৯ বিঃ অব্দ, ইংরেজী ১২০২ খৃঃ অব্দ, এই সময়েই লক্ষ্মণসেন মুসলমানের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়েন, তিনি তখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গৌড়ের শাসনভার তৎপুত্র কেশবসেনের উপর ন্যস্ত ছিল। কেশবসেনের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোনস্থলে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে পিতা নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলে কেশব শত্রুদিগকে সহজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে দেন নাই। সেই হৃতরাজ্য রাজগণের ইতিহাস কোন দেশীয় লোক লিখিয়া যান নাই। ১২০২ খৃঃ অব্দে সুরসেন মুসলমানকর্ত্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, ইনি কেশবসেনের পুত্র হওয়াই সম্ভব। যদি তাহাও না হয়, তবে তিনি যে লক্ষ্মণসেনের পৌত্র ছিলেন—তাহা সহজেই অনুমিত হয়। লক্ষ্মণসেন উত্তর-ভারতে "হিন্দুধর্ম্মের খলিফা" বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। মুসলমানকর্ত্তৃক উত্তর-ভারত-বিজয়কালে যে বঙ্গদেশের রাজা একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এমন মনে হয় না। তাহা হইলে এতগুলি পার্ব্বত্য প্রদেশে লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা কখনই রাজত্বপদ পাইতেন না। খুব সম্ভব সুরসেন হিন্দু-মুসলিম সমরে উত্তর-ভারতে কোন না কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কিংবা নিপীড়িত হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন—নতুবা

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড (২০-২১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

কোনরূপ কৃতজ্ঞতা বা কৃতিত্বের পরিচয়-প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত না পাইলে সহজে স্বরাজ্য-তাড়িত রাজকুমারকে পার্ব্বত্যদেশের হিন্দুরা রাজপদে বরণ করিয়া লইবে কেন? মঃ ইবন বক্তিয়ার খিলজী শুনিয়া আসিয়াছিলেন আর্য্যাবর্ত্তে লক্ষণসেন অপর সকল রাজার ধর্ম্মগুরু ছিলেন। সম্ভবতঃ এই আভিজাত্যের ফলে এবং সুরসেনের রণনৈপুণ্য কিংবা অপর কোন মহৎ গুণের পরিচয় পাইয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীর ও অপরাপর দেশের লোকেরা মুসলমানকর্ত্তৃক নিহত পূর্ব্বরাজগণের বংশধরের অভাবে, ইহার পুত্রগণকে স্বীয় স্বীয় রাজ্যের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাজা হইয়া ইহারা অবশ্যই ঐসব দেশে বাঙ্গালী ভাস্কর ও বাঙ্গালী চিত্রকর লইয়া গিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্‌গণ যাহাকে "কাঙ্গড়া কলম" নাম দিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব "বাঙ্গলা কলম।" বাঙ্গালী চিত্রকরেরাই এই চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা। তাহা না হইলে কালীঘাটের প্রাচীন চিত্রপটগুলির সঙ্গে কাঙ্গড়া চিত্রপটের এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কেন হইবে? আমরা একখানি মহাদেবের চিত্রে ও পরীর চিত্রে এবং অপরাপর কালীঘাটের চিত্রে যে অদ্ভুত লীলায়িত কালীর রেখাঙ্কন দেখিয়াছি, কাঙ্গড়ার অনেক চিত্রে ঠিক তাহাই আছে। বাঙ্গালী চিত্রকরের কালীর রেখাগুলি সুস্পষ্ট ও তাহাদের বঙ্কিমত্ব কাঙ্গড়ার ঐরূপ রেখাঙ্কন হইতে স্পষ্টতর। কাঙ্গড়ার সমীপবর্ত্তী দেশগুলির রাজপুত কি মোগল-শিল্পে কৃষ্ণ-রেখার এই লীলায়িত ভাব আদৌ নাই।

কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির গণতন্ত্রতাও বাঙ্গালী চিত্রের অনুকূল। মোগলচিত্রের বাদসাহী ভাব এবং রাজপুত চিত্রের দেবভাবের প্রাধান্য কাঙ্গড়ার চিত্রে নাই। রাজপুত চিত্রের দেবতারা আসন জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারা খুব সুন্দর হইলেও নড়াচড়াটা তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। কাঙ্গড়া ও বাঙ্গলার চিত্রে যে গতিশীলতা আছে—তাহা অনেকটা একরূপ। মোগলদের কতকগুলি চিত্রে বিশেষ একটা শিকার-চিত্রে গতি সূচিত হইয়াছে—কিন্তু সে গতিও যেন একটু সম্ভ্রমাত্মক। হরিণেরা ছুটিয়াছে—ক্ষিপ্রগতিতে, কিন্তু যে চাহনী তাহারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতেও যেন শিকারী রাজকুমারের প্রতি একটা বিস্ময়বিমূঢ় আবেশ আছে। কাঙ্গড়ার বৈষ্ণব চিত্রগুলি বাঙ্গালীর হাতের ছবির ন্যায়। এই চিত্রকরদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙ্গলার লোক—এই ধারণার অনেক কারণ আছে। ১৯২১ সনের 'রূপম্' পত্রিকায় প্রকাশিত কাঙ্গড়ার একখানি স্বাধীনভর্ত্তৃকার ছবি লাহোর মিউজিয়ামে আছে। ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, এম. এ. মহাশয় তাঁহার "ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস" নামক পুস্তকের ভূমিকায় (।৴ পৃষ্ঠায়) সেই ছবিখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"এই ছবিতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের গীতের ভাব এত সুস্পষ্ট যে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।" বাঙ্গালীর সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর দেশের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা মেশামেশি ছিল ইতিহাসে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীরা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নানা ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহার পদ রচনা করিয়া জীব গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইতেন। ঐ পদগুলি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বড়ই উপাদেয় মনে হইত। ব্রজবুলিতে লিখিত হওয়াতে

তাহা বৃন্দাবনে গাওয়া হইত। বঙ্গীয় কবি ও চিত্রকরেরা বাঙ্গালীকর্তৃক নবভাবে সৃষ্ট বৃন্দাবন তীর্থে নিশ্চয়ই যাতায়াত করিতেন। কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির উপর বাঙ্গালীর এরূপ বেশী প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়।

বৌদ্ধযুগে শিক্ষা সার্ব্বজনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু সর্ব্ববর্ণের মধ্যে দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধ-সংস্কারগুলি কতক পরিমাণে এখনও বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যে কোন জাতি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন। মুসলমানদের জন্যও তাঁহারা অর্গল বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্য-যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্ত্তী যুগেও এই উদারতা অনেক পরিমাণে বজায় ছিল এবং এখনও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাম মৈত্র নামক কুলীন ব্রাহ্মণ এক মুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা আবদুলকে বৈষ্ণব করিয়া ভুবণা ও রূপদয়াল নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া বৈষ্ণব সমাজে কোন বিশেষ গোলমাল হয় নাই। (সামাজিক ইতিহাস, ১৫৪ পৃঃ) মুসলমান হরিদাস, মুসলমান-ভাবাপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যুত রূপ-সনাতন বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। মুসলমান সেনাপতি এবং আরবী পারসী প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিজলী খাঁ, শ্রীবাসের বাড়ীর মুসলমান দরজী প্রভৃতির বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ চৈতন্য প্রভুর সময়েই তাঁহার প্রভাবে ঘটিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্যামানন্দ ধারেন্দা-বাহাদুরপুর নামক স্থানে শের খাঁ নামক শক্তিশালী মুসলমান দস্যুকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিম্নজাতি বৈষ্ণবদলে এত ঢুকিয়াছিল যে, তাহারাই এখন 'জাত-বৈষ্ণব' দলের প্রধান শক্তি। সহজিয়া বৈষ্ণবদলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সর্ব্বজাতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরে সহজিয়ারা বৌদ্ধ-সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহজিয়াদের গুরু অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাকা জেলায় রোয়াইল গ্রামের নিকট খারার বাসী পঙ্কুফকির মুসলমান—শত শত হিন্দু তাঁহার শিষ্য। সহজিয়াদের সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন মুসলমান। তাঁহারই নামে সম্প্রদায়টির নাম হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিকট সালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা জাতিভেদ একেবারেই মানেন না। হিন্দু ও মুসলমান এক থালায় বসিয়া খান। ইহারা বিগ্রহ পূজা করেন না এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ গাঢ়রূপে অনুরক্ত যে পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে পারেন। দরবেশী সম্প্রদায় সনাতনকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। রামকেলীর নিকট চৈতন্যের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হুসেন সাহের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন-পর সনাতন কিয়ৎকালের জন্য দরবেশের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এই হেতুতে প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। দরবেশী সম্প্রদায়ের মূল শিক্ষা—"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান। মিল-জুলকে কর সাঁইজীকো নাম।" (হিন্দুই কি মুসলমানই বা কি, একত্র মিলিত হইয়া সাঁইজীর নাম কর) এখানে সাঁইজী শব্দ দ্বারা সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। (সাঁইজি গোঁসাইজি শব্দের অপভ্রংশ)। হজরতি সম্প্রদায়ের নেতা হজরতের বাড়ী ছিল

সর্ব্ববর্ণের সমন্বয়-চেষ্টা ও সহজিয়া।

বাঁশবেড়িয়া। পাগল নাথী ও গোবরা সম্প্রদায়ের উক্ত নামধেয় নেতৃদ্বয়ও মুসলমান ছিলেন। প্রথমোক্তের বাড়ী মুরাদপুর এবং দ্বিতীয়টীর নিবাস ছিল নাগদা গ্রামে। রামবল্লভী-সম্প্রদায় জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তা ছাড়া প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি গান এইরূপ "কালী-কৃষ্ণ-গড-খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টল। মন কালী-কৃষ্ণ-গড-খোদা বল রে।" ইহারও পূর্ব্বে বঙ্গের ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন, "মগে বলে ফারা, তারা, 'গড' বলে ফিরিঙ্গী যারা খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।" নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ঔদার্য্য এবং সম্পূর্ণরূপে সংস্কারশূন্যতা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

একদিকে সমাজের স্কন্ধারূঢ় হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেরূপ সামাজিক শাসন অতি উৎকট ভাবে কড়া করিয়া গড়িতেছিলেন, অপরদিকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া দলের পর দল গঠন করিয়াছেন। ইহারাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধনীতির সারোদ্ধার করিয়া বাঙ্গলার সমস্ত দ্বারগুলি স্বখকর—স্বাস্থ্যদায়ী অনাবিল ভাবপ্রবেশের জন্য মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে মালাপাড়া গ্রামে বলরাম হাড়ী-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে চৌকিদারী করিতেন। কিন্তু একসময়ে তিনি চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হন, মেহেরপুরের (নদীয়া জেলায়) মল্লিক বাবুদের সরকারে ইনি কাজ করিতেন। অভিযোগ টিঁকিল না,—কারণ বলরাম নির্দ্দোষ ছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের পর তিনি ঘৃণায় চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। বহুবৎসর তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া যখন দেশে আসিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া মানিতে লাগিল। তিনি পাগলের মত থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সকল কথা বলিতেন—যাহা লোকের মর্ম্মে তীরের মতন যাইয়া প্রবেশ করিত; ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে গভীর তত্ত্বকথা শুনিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদা কয়েকজন ব্রাহ্মণ নদীতীরে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জল নদীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

বলরাম হাড়ী।

ঐ সময়ে বলরাম গঙ্গার জল লইয়া নদীর পাড়ের দিকে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। এরূপ করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "তোমাদের তর্পণের জল যদি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাইতে পারেন, তবে আমার নিক্ষিপ্ত জলই বা আমার শাকসব্জীর বাগানে যাইবে না কেন, উহাতো মাত্র কয়েক ক্রোশ দূর বই নয়।" খুসী বিশ্বাসী দলের নেতা মুসলমান ছিলেন, তিনি বলিতেন "তোমরা কষ্টে পড়িলে আমাকে প্রার্থনা জানাইও, আমার যদি কেহ থাকে তবে আমি তাঁহাকে জানাইব।" এই সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান দলের স্থাপয়িতা বাবা আউল

বাবা আউল।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ২২ জন শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে রামশরণ পাল, নিতাই ঘোষ প্রভৃতি প্রধান। ইহার সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ে একটি চলিত গান আছে, তাহা এই "এভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো। এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল॥ এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একমন, জয়কর্ত্তা বলি,

বাহু তুলি, করে প্রেমে ঢল ঢল। এযে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গাঙ্গ শুকালো॥" বস্তুতঃ সহজিয়া দলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই তাহাদের গুরুদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। আমরা তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসঙ্গে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময়কার নানা শ্রেণীর মত সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, তদ্দ্বারা স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে—বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাঙ্গা দল বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া এই সহজিয়াদের নানাদলের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা সামাজিক বা ধর্ম্মের চিরাগত সংস্কারের কোনটিই মানে নাই, ইহাদের চিন্তাশীলতার গতি অবাধ। ইহারা সামাজিক অনুশাসনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই এবং সময়ে সময়ে এরূপ উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা এত সংক্ষেপে কহিয়াছে যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেই সকল কথা শুনিলে ভড়্‌কাইয়া যাইতে পারেন। স্ত্রীলোকের সতীত্বসম্বন্ধে ইহারা সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ মানে নাই। আমাদের সমাজে পতিব্রতার জন্য যে স্বর্গলোক পরিকল্পিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ পাতিব্রত্যের যে উচ্চ মূল্য দিয়া থাকে, সহজিয়ারা তাহা দিতে সম্মত নহে। তাহাদের মতে সাধ্বীর তথাকথিত একনিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কতটা পরকালের সুখ-কামনা ও ইহকালের লোক-খ্যাতির আশা হইতে সঞ্জাত, তাহা জানিবার উপায় নাই; হিন্দুর সংস্কার-জাত সতীত্ব এতটা মিশ্র ভাবের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, এজন্য তথাকথিত সতীত্ব বা দাম্পত্য ভাব—প্রেমের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ যাচাই করিবার জন্য বিচার-সহ কষ্টিপাথর নহে। "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে"র প্রথম ভাগের ভূমিকায় 'জ্ঞানাদি সাধন' হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ইহাদের ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণাও একেবারেই কোন সংস্কারাধীন নহে—উহাতে চিন্তার যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি দেখা যায় তাহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মত। সমাজে জাতিভেদ প্রভৃতির সংস্কারের ইহারা কোন ধার ধারে না। ইহারা প্রকাশ্যভাবে কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজের দলে টানিয়া আনিয়া তাহার কপালে স্বীয় সম্প্রদায়ের ছাপ মারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না। অথচ ইহাদের দলের লোক, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, ব্রাহ্মণ হউক, দলের নেতার প্রতি এতটা অনুরক্ত যে জগতে তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও মানে না, তাঁহার এক কথায় অবলীলাক্রমে প্রাণ দিতে পারে। কর্ত্তাভজাদের নেতা বাবা আউল বা আউল চাঁদ পরবী নামক গ্রামে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। রামশরণ এবং বাবার আর সাত শিষ্য তাঁহার দেহ পরবী গ্রামে (চক্রদহ হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে) শ্মশানে ভস্মীভূত করেন। বাবা আউলের পরলোক-গমনের পরে, রামশরন পাল গদীর অধিকারী হইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দলে খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু আছে এবং যদিও নরনারীর অবাধ মিলনে কোন বাধা নাই তথাপি ইহাদের নীতি অতি উচ্চ। ইহাদের একটি অনুশাসন এইরূপ "স্ত্রী হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্ত্তা ভজা।" কর্ত্তাভজা লাল শশীর গানগুলি 'সন্ধ্যাভাষায়' লিখিত, তাহা দুর্ব্বোধ, কিন্তু কতকগুলি বোঝা যায়। সহজিয়াদের একটি গান—"তুফান আসছে কত্তে, জলে জল যাবে মিশে, মাজি হাল ধর কষে। আবার যাঁহা নৌকা, তাঁহা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ! ওরে মাজি দাঁড়িয়ে শোন। মাজি সতা বাদাম লও, ধীরে ধীরে বাও, তুফান পানে কেন চাও, হাল ধরেছে নিরঞ্জন।" মানুষ এখানে মাঝি,—দাঁড় বাহিবার তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন

ভগবান্, কিন্তু কোন্‌দিকে নৌকা চলিবে, তাহার নিয়ন্তা ভগবান্ স্বয়ং হাল ধরিয়া আছেন। অর্থাৎ পুরুষকারের কিছু ক্ষমতা আছে—তাহা দাঁড় বাহা পর্য্যন্ত, কিন্তু দৈবই নিয়ন্তা ; যে ক্ষমতাটুকু আছে, তাহা ব্যবহার না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। আর মানব-জীবনরূপ তরণী, তাহা তো তুফানের মধ্যে চলিবেই, কোন নৌকা এমন নাই, যাহা তুফানের হাতে পড়ে নাই। তুফানের দিকে লক্ষ্য করিতে নাই, তাহা হইলে ভয় পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তুফানে নৌকা চালাইবেন যিনি তিনি তো কর্ণধার—হাল ধরিয়া আছেন, উঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি দাঁড় বাহিয়া যাও। উপনিষদের "স ন বন্ধুর্জনয়িতা স এব বিধাতা" পদের ভাব গানের শেষ ছত্রটিতে স্পষ্ট।

সন্ধ্যাভাষা।

সহজিয়াদের অনেক কথাই 'সন্ধ্যাভাষায়' লিখিত, এই ভাষাভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। শব্দের সাধারণ যে অর্থ, অনেক সময়ে সন্ধ্যাভাষায় তাহা ভিন্নার্থ-বোধক। সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে তাহারা সে সকল কূট অর্থ কাহাকেও বলিবে না। সমস্ত ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারগুলি পদদলিত করিয়া যে সকল মত অসামান্য মৌলিকতা দেখাইয়া অতিরিক্ত সাহসিকতার সহিত কথিত হইয়াছে তাহা সাধারণ লোক শুনিলে বিদ্রোহী হইবে—এজন্য সহজিয়ারা সন্ধ্যাভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। "সে দেশের কথা, এ দেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা"—চণ্ডীদাস।

বাঙ্গলার তথাকথিত নিম্নশ্রেণী।

বাঙ্গলাদেশের সহিত পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইবে, ততই নিম্নশ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধা বেশী হইবে। আমরা বারংবার বলিয়াছি—ইহারা আমাদের জাতির নিজস্ব ভাব বজায় রাখিয়াছে। ঊর্দ্ধতন পর্য্যায়ে বিদেশীর প্রভাবের ঝড়,—পাণ্ডিত্যের দর্প, সংস্কারের বোঝা, এবং নানারূপ আবর্জ্জনা জুটিয়া সমস্ত প্রশ্ন জটিল ও দুরূহ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু নিম্নে শ্যামলশস্যপূর্ণ—নিত্য সজীব তরু-গুল্মময় সবুজ পল্লী—এখানেই বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার ধন-ভাণ্ডার রাখিয়াছেন। এখানেই বঙ্গের চারুশিল্প—অজান্তার শেষ চিহ্ন, এখানেই নিরক্ষর কবির অপূর্ব্ব পল্লী-গীতি, রায়বেঁশে, বাউল ও বৈষ্ণব নৃত্য, এখানেই সহজিয়ার সুনির্ম্মল অদ্বিতীয় প্রেমের আদর্শ—কিছুদিন পূর্ব্বেও ছিল। পাশ্চাত্য বন্যায় আজ সেই রত্নভাণ্ডার চলিয়া যাইবার পথে। যদি বাঙ্গলার পল্লী-গীতিকা, মনোহর সাই কীর্ত্তন, সহজিয়ার আদর্শ প্রেম, রায়বেঁশে নাচ, পল্লীর শিল্পকলা চলিয়া যায়, তবে বাঙ্গলার ভৌগোলিক তত্ত্ব জানিয়া আমরা কি করিব ? বাঙ্গলাদেশ তো তাহা হইলে লুপ্ত হইল ! কতকগুলি গিল্টী করা বিদেশী শিক্ষার ফলে এদেশের কি গৌরব থাকিবে ? যাহা বিদেশের নকল, তাহা তো নকল ছাড়া কিছুই নয়। জগতের শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালীর যে সকল অসাধারণ দান ছিল—তাহা লুপ্ত হইলে বাঙ্গলাদেশকে অন্য যে নাম দাও, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু "বাঙ্গলা—সোনার বাঙ্গলা" নাম দিয়া সেই পবিত্র নামের অবমাননা করিও না।

বিদেশী শিক্ষা-সঞ্জাত উপেক্ষা ও ঘৃণায় এই কিঞ্চিৎ অধিক অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলার

শৌর্য্য-বীর্য্য, শিল্প, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি সমস্ত লুপ্ত হওয়ার মধ্যে আসিয়াছে। সহজিয়াদের বিপুল সাহিত্য—যাহা এখনও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট কিছু কিছু পাওয়া যায়,—তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, রামমোহন ও কেশব ধর্ম্মসম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলেন নাই।

বাঙ্গলার পল্লীবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের শিক্ষার অভাব কোন কালেই হয় নাই। আকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। আমাদের দেশে আর্য্যগণ পূর্ব্বকালে মুখে মুখেই বেদ-বেদান্ত আবৃত্তি করিতেন। পুস্তক লেখা ও পড়ার পাঠ বৈদিক যুগে কমই ছিল। মনে ও স্মৃতিতে তাঁহারা জগতের সকল তত্ত্ব গাঁথিয়া রাখিতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অর্থ—সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া চরিত্রের অঙ্গীভূত করা, জ্ঞান শুধু লিপি-পরিচয়-প্রচারের অপরিহার্য্য অঙ্গীয় বলিয়া অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না। আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা মুখে মুখে এখনও বড় বড় গণিতের সমস্যা পূরণ করিতে পারে—তাহাদের কতকগুলি এমনতর বাঁধা নিয়ম ছিল যাহাতে অতি সহজে তাহারা গণিতে এরূপ জ্ঞান অর্জন করিতে পারিত, যাহা অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. উপাধিধারীর পক্ষেও কষ্টসাধ্য। ১২৬৩ বাঃ সনের (১৮৫৫ খৃঃ অব্দের) হাতের লেখা একখানি শুভঙ্করী আমার নিকট আছে, তাহাতে গণিতের কতকগুলি সূত্র ও দৃষ্টান্ত আছে। আমি সকল স্থানে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, সুতরাং বুঝাইতে চেষ্টা করিব না, যেমন পাইয়াছি, নিয়ে তাহা তেমন ভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

সাঙ্গাকশী (সাঙ্গাকস্থ)—

(১) বিঘা প্রতি দর খণ্ডা, আড়ায় ধর সোলগণ্ডা
কুড়িয়া গণ্ডা লেখা জান মানে কড়া সমাধান
সেরে কাক বুঝ শিশু কহেন শুভঙ্কর সাঙ্গাকস্থ।

(২) শুনহ কাএস্থ ভাই করি নিবেদন। শত গজ কিন্যা দেহ লেহ কিছু ধন। কার কার গণ্ডা কার ভেড় বুড়ি। সত গজ কিনে দেহ চার কো(ড়ি ?)।

আসামী	গজ	দর	নেট
বড় গজ	৫	৻৭৷৹	⁄১৭৷৷
মাজারি	২৫	৻১	⁄৫
ছোট গজ	৭০	।০	৻১৭৷০
	১০০	...	।০

(৩) এক এক এগার মাথে। একশত শাক্তিতিশ দিআ তাথে॥ কি কড়ি পাতত্র নাথ। পনের বাইসার স্থন্নি শাত।

পাতন ১ ১ ১ ১
ভাগ ১৩৭
১ ৫ ২ ২ ০ ৭

(৪) দুই দুই বাইস মাথে। কিবা ভাগ দিব তাতে॥
স্থত কহে ওহে তাত। পনের বাইশার স্থন্নি সাত॥

পাতন ২ ২ ২ ২
ভাগ ৬৮৸৹
১ ৫ ২ ২ ০ ৭

(৫)

রাজা বলে অবধানে শুনরে কোটাল
শত তঙ্কাঅ শত পক্ষ আনহ ততকাল॥
কিনিবে সারস পক্ষ দুই টাকা দরে
অর্দ্ধতঙ্কা দিআ শুক কিনহ সত্তরে॥
শিকা শিকা পাঅরা, মঅনা তিন শিকা
কিনে আন শত পক্ষ দিয়া শত টঙ্কা॥

আসামী	...	জ্বি	...	দর	...	নেট
সারস	...	৪২	...	২৲	...	৮৪৲
শুক	...	৪	...	৷৹	...	২৲
পাঅরা	...	৫৩	...	।৹	...	১৩৷৹
মঅনা	...	১	...	৵৹	...	৵৹
		১০০				১০০৲

(৬) টাকাঅ ছাগ শিকাঅ গাই। পাঁচ টাকাতে মোহিশ পাই। শঅ টাকাঅ শঅ জিব। বলে গেল সদাশিব॥

আসামী	...	জ্বি	...	দর	...	নেট
ছাগ	...	২৪	...	১৲	...	২৪৲
মোহিশ	...	১২	...	৫৲	...	৬০৲
গাই	...	৬৪	...	।৹	...	১৬৲
		১০০				১০০৲

(৭) তিন টাকায় ছাগ শিকায় গাই। আট আনাতে মোহিশ পাই॥ কুড়ি টাকায় কুড়ি জিব। বলে গেল সদাশিব॥

আসামী	...	জি	...	দর	...	নেট
ছাগ	...	৫	...	৩৲	...	১৫৲
গাই	...	১০	...	।০	...	২॥০
মোহিশ	...	৫	...	॥০	...	২॥০
		২০				২০৲

বোটকে আউটি

(৮) বটেক ছুবট বটেক সাত। ছয় পাঁচ ছয় দিআ তাত॥ এগার হাজার ছশ আশী। ভাগ জাননে হুতে বশী।

পাতন ।০ ॥০ ১৸০ ১॥০ ১।০ ১॥০

ভাগ ১১৬৮০

১১ ১১ ১১ ০ ০

(৯) শুনি অশ্ব পাখা পাখা পাখা। রামচন্দ্র দিআ সখা॥ ঘোড়ার পৃষ্ঠে দিআ রাম। অষ্ট কোটার এই নাম।

পাতন ১ ৫ ২ ২ ০ ৭

ভাগ ৫৮৪

১১ ১১ ১১ ১১

(১০) পন শশী পঞ্চম—শরগজ বাণ। নবহ নবহ রস বোস্থ পণ॥ অষ্টাদশ পণ বুড়ী দিজ্যে। আদি বিগম খোড়ি শিবরাম কিজ্যে॥

পাতন ৴০ ৷৴০ ৷৴০ ॥০ ৴০ ॥৴০ ॥৴০ ।৵০ ॥০

ভাগ ১৵৫

(১১) নব কোঠার আরম্ভা

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়। সাত আট ছাড়া নয়॥ গিহ ভাগ দিআ জান। নবকোঠার জন্মস্থান॥

পাতন ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯

ভাগ ৯

১১ ১১ ১১ ১১

(১২) অষ্ট কোঠার আরজ্যা

চার চার চোআলিস মাথে। সখা চোত্তস দিআ তাথে
কি কড়ি পাতএ নাথ। পনের বাইশার গুরি সাত।

পাতন		৪	৪	৪	৪
ভাগ		৩৪।০			
১	৫	২	২	০	৭

(১৩) বাণ বাণ বোঙ্গ পণ। সোল গণ্ডা দিআ জান॥ বাণের ভাগে পুরি আন। মুনি মুনি জম্মস্থান॥

পাতন	৫	৫	॥১৬
ভাগ	৫		
২	৭	৭	৫০

(১৪) মুনি মুনি বামে পাখা। ডাহিনা বার পণ দিআ। সখা শোল দিআ পুরি আন। চার চার জম্মস্থান।

পাতন	২	৭	৭	৫০
ভাগ	১৬			
	৪৪		৪৪	

(১৫) মাস মাহিনা

মাস মাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত।
টাকা প্রতি ‹১০॥=দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হত্থ।
আনা প্রতি ॥= দুই কড়া দুই ক্রান্তি শিবরাম কয়॥

(১৬) বৎসর মাহিনা

বৎসর মাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত।
টাকা প্রতি ৫৫ তিন কড়া পাঁচ দন্তি হত্থ।
আনা প্রতি দুই দন্তি শিবরাম কত্থ॥

(১৭) বৎসর মাহিনা জার জত। মাস তার পড়ে কত। টাকা প্রতি ⁄৶॥= ছাব্বিশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হত্থ। আনা প্রতি ‹॥= অষ্ট ক্রান্তি শিবরাম কত্থ।

(১৮) সনা (সোনা) কেনা

সনা (সোনা) কিনিতে যখন যাবে। ছিআনই (ছিয়ানব্বই) রত্তিতে মোহর লবে। টাকা প্রতি ‹৩⁄ তের কড়া এক ক্রান্তি হত্থ। আনা প্রতি=৶ আড়াই ক্রান্তি শিবরাম কত্থ।

(১৯) সনা (সোনা) কিনিতে জখন জাবে। সব রতিতে মোহর লবে। টাকা প্রতি ৩৶৪ তিন গণ্ডা তিন কাক চার তিল হয়। আনা প্রতি ৶৪ তিন কাক চার তিল শিবরাম কয়।

(২০) চারি ধানে রত্তি হয়, দশ রতিতে মাসা, দশ মাসায় তলা (তোলা) হয়, সুন সত্যভাষা। চৌষট্টী তোলায় সের বত্তিস প্রমাণি। চোল্লিশ সেরে মন হয় সর্ব্বলোকে জানি। পাঁচ সেরে পোশরি হয় চারি সেরে বিশা। ইহাতে জানিলে ঘুচে অবোধের দিশা।

মাথতের আরজ্যা

(২১) জতেক তঙ্কার গ্রামে মাথত করিবে। তত গণ্ডা মাথতের তলে ভাগ দিবে। আসলে হরিলে অঙ্ক যত টাকা হয়। টাকা প্রতি তত গণ্ডা শিবরাম কয়।

আসল নফার আরজ্যা

(২২) লাভে মূলে যত পাই। বিকি-দরে কিন ভাই। কিনন-দরে হরে লবে। আসলের ঠিকানা পাবে।

বগড়া ধান কেনা

(২৩) ধান্য কিনিতে জাবে নিবে দর করে। আনা প্রিতি কুড়িতে দেড়পাই লবে ধরে। মনে লবে দেড় কনা পেঞ্যাচো ঠিকনা। আমঠি এক। শিবরাম দাশ কহে হিসাব করে দেখ।

(২৪) মনের করার জার সের পড়ে কত। টাকা প্রিতি অষ্টগণ্ডা হয় লেখার মত। আনা প্রিতি দুই কড়া শুন শিশুগণ। এই মত মনকরা শিবরাম কন।

(২৫) সেরের করার জার ছটাক পড়ে কত। টাকা প্রিতি এক আনা হয় লেখার মত। আনা প্রিতি পাঁচ কড়া গণ্ডায় কাক হয়। এই মত সেরকরা শিবরাম কয়।

(২৬) সেরের করার জার তলা (তোলা) পড়ে কত। টাকা প্রিতি এক পাই হয় লেখার মত। আনা প্রতি পাঁচ কাক শুন শিশুগণ। এই মত সেরকরা শিবরাম কন॥

ধান কেনার আরজ্যা

(২৭) তঙ্কা দিয়া জত আড়া কিনিবে সে ধান। আড়া প্রিতি কুড়ি হয় আনার প্রমাণ। কুড়ির প্রিতি সের হয় পুষ্য ধর মানে। সেহেতে ছটাক ধান্য শিবরাম ভনে॥

মন করার আরজ্যা

(২৮) তঙ্কায় লইবে জত মন আশবাব। মনেতে আড়াই সের আনার হিসাব। জত সের থাকয় ছটাক তত হয়। ছটাকেতে আড়াই সের শিবরাম কয়॥

(২৯) মনের করার জার পুত্র পড়ে কত। তঙ্কা প্রিতি দুই গণ্ডা হত্র লেখার মত। আনা প্রিতি দুই কড়া শুন শিশুগণ। এই মত মনকরা ভিগু (ভৃগু) রাম কন॥

আনা মসার (মাসার ?) আরজ্যা

(৩০) কাহনে লইবে পন চোকে লবে বুড়ি। গণ্ডায় লইবে কাক পোনে পাঁচ কোড়ি॥ কড়াত্র লইবে পঞ্চ তিলের লিখন। আনা মসা কর শিশু আনন্দিত মন॥

গণ্ডা কোড়ির আরজ্যা

(৩১) কাহনে লইবে গণ্ডা করিয়া জতন। পনেতে লইবে কাক শুন শিশুগণ। গণ্ডায় লইবে তিল কড়াত্র ধুল হত্র। এই মত গণ্ডার কোড়ি শিবরাম কত্র।

জমাবন্দির আরজ্যা

(৩২) জমি বিঘা যত তঙ্কা করিবে বর্ণন। তঙ্কা প্রিতি ষোল গণ্ডা কাঠাত্র ধরন। জত আনা তত গণ্ডা পাই প্রিতি বট। গণ্ডা প্রিতি ষোল তিল জানি অকপট। কড়া প্রিতি চারি তিল শুভঙ্কর ভনে। জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে। *

(৩৩) তেরিজের আরজ্যা—"তেরিজ ধারণ কথা শুন শিশুগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান করিবে গণন। কড়া থুয়ে চাড়িকড়ায় গণ্ডা লবে হাতে। হাতশুদ্ধ গণ্ডা থোবে দশক পশ্চাতে। দশকে দশকে পণ কমি হৈলে থোবে। পণে পণে এক কড়ি চৌথ ধরে লবে। চারি চৌকে টাকা হয় তেরিজ লেখা কয়। নরসিংহ রচয়ে ক্রমে এই অংশ ধয়।

(৩৪) জমা-ওয়াশিলের আরজ্যা—"জমা ওয়াশিল বাকী শুন শিশু ভাই। জমা ছোট, খরচ বড় ফাজিল বলি তাই। জমা বড়, খরচ ছোট, বাকীদার হয়, জমা ওয়াশিল সমান হৈলে সাধু খালাস হয়।

(৩৫) দেউলের মাপ—আছিল দেউল এক পর্ব্বত প্রমাণ। ক্রোধ করি ফেলে দিল বীর হনুমান। অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তিন ভাগ জলে। দশম ভাগের ভাগ সেহালার তলে। উপরে ৫২ গজ দেখি বিদ্যমান। সকলে কতেক শিশু কর পরমাণ।

(৩৬) আরজ্যা—বাণবট ঘৃতসের, আটা এক বটে। কড়ায় তিন সের চাল্ আইলের হাটে॥ দশ কড়া কড়ি দিয়া গেল সদাগর। পাঁচ সের দধি কেন ইহার ভিতর॥

(৩৭) রামচন্দ্র দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ ধরি। চন্দ্রবদনে নিলেন মোহন মুরলী। ভুজে ধরি অষ্ট সখী বিহারয়ে বনে। বাণে বিন্ধি হয়াসুর স্থিতি বৃন্দাবনে। ভুবন মোহিত হৈল যাঁর বাঁশী রবে। আছয়ে প্রকাশ চক্ষু দেখিবারে পাবে। গাঁথিয়া মুক্তার হার যদি দিবা

* ফিরিস্তি কাগজ বোই পঠনার্থে শ্রীকোকি(ল) দাস নিমেজদার পরগনে জাহানাবাদ সাকিম বলরামপুর। সন ১২৬৩ সাল তারিক ২৩ চৈত্র। [(১) হইতে (৩২) পর্য্যন্ত একখানি পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।]

গলে। করহ ইহার সূত্র আপন বুদ্ধি বলে। ছুইপাশে চন্দ্র হবে মধ্যে তারাগণ। তবে সে হইবে হার শুন সর্ব্বজন।

পাতন ১৪২৮৫৭১৪৩
৭৮৪৬৫২৭৮১
২১৫৩৪৭২২
১০০০০০০০০১

সাত দিয়া পুরিবে ৭

(৩৮) তঙ্কা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি অষ্টগণ্ডা সের প্রতি ধর। আনা প্রতি ছুই কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল। শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল।

(৩৯) তঙ্কা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি ছুই কড়া ছটাক প্রতি ধর। আনা প্রতি দশ তিল গণ্ডায় অর্দ্ধেক কয়। শুভঙ্কর দাস কহে এই মত হয়।

(৪০) তৈল লবণ ঘৃত চিনি যাহা কিনিতে যাই। মোন দরে সেরে টাকায় অষ্ট গণ্ডা পাই। পোয়া প্রতি ছুই গণ্ডা সেরে ছটাক জান। কহেন শুভঙ্কর শুন বালক বুঝান।

(৪১) ইন্দ্রের অমরাপুরে পারিজাত আছে। দিনে শত লক্ষ ফুল ফোটে সেই গাছে। এক এক ফুলের মূল্য সোয়া মন সোনা। চারি যুগে কত পুষ্প কত মোন সোনা। [ইহা একটা খুব দীর্ঘ পূরণের ব্যাপার—কিন্তু শিশুরা ইহা মনে মনে করিতে পারিত। (১২ বৎসর = ১ যুগ)]

(৪২) মুনি গেলা তপস্তায় শূন্ত ঘর করে। ছুই পাখা গরুড় নিল বাণ কন্দর্পের ঘরে। পৃথিবীতে চন্দ্র নাই উদয় আকাশে। কোথা গেল পোনর বাইশ অঙ্ক হবে কিসে। গুরু অগ্নি বসু রাম রত্নাকর তায়। একাদশে পূরে নিল অষ্ট কোঠা হয়।"

পাতন ১৩৮৩৭
ভাগ পূরণ ১১
১৫২২০৭

এইরূপ আর্য্যা ও প্রশ্ন শত শত এখনও পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের জানা আছে—কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিদ্যা যাহা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে এখনও অপরিহার্য্য, তাহা একবারে নষ্ট হইবে। আর একটা কথা, অঙ্কের অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ ছিল, তাহা বহুযুগ ধরিয়া দেশময় প্রচলিত ছিল, সেগুলি উপেক্ষা করিয়া আমরা মনগড়া শব্দ নির্ম্মাণ করিতেছি,—পদ্মার তীরে বসিয়া কূপ খনন করার বৃথা শ্রম করিয়া মরিতেছি। আমরা যাহাকে "পাটীগণিত" বলি, হিন্দুস্থানীরা তাহা তাঁহাদের পারিভাষিক ঠিক রাখিয়া "অঙ্কগণিত" বলেন। আমাদের মনগড়া "ক্ষেত্রতত্ত্ব"-শব্দ তাঁহাদের পারিভাষিকে "রেখাগণিত।"

শুভঙ্করী আর্য্যায় অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহা কৃপা করিয়া গণিতের অধ্যাপকগণ চক্ষু খুলিয়া একবার দেখিলে ভাল হয়। যথা—'হার্য্য', 'হারক', 'লব্ধ', 'হীন', 'হ্রস্বহরণ', 'দীর্ঘহরণ', 'পাতন ন্যাস', 'পর্য্যান্তাঙ্ক'। শুভঙ্করের আর্য্যার প্রাচীন পাতড়া হইতে এই গদ্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—"তাহার বিবরণ এই, যে অঙ্ককে অঙ্কান্তর দ্বারা বিভাগ করা যায় তাহার নাম হার্য্য, এবং যে অঙ্ক দ্বারা তাহা হরণ করি তাহার নাম হারক, আর হরণ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহার নাম লব্ধ। এবং হরণ করিলে অবশিষ্ট যে থাকে তাহার নাম হৃতাবশেষ।" এই পাতড়া-সাঙ্কেতিক অঙ্কসম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা আগে শিশু মাত্রই জানিত। এখন তাহার কতক কতক জানা থাকিলেও অনেক শব্দ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। পাতড়া হইতে আর একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১=চন্দ্র, মহী, শশী, গুরু। ২=পক্ষ, কর, পাখা, ভুজ। ৩=নেত্র, রাম, লোচন, অগ্নি। ৪=বেদ, যুগ। ৫=বাণ, শর। ৬=মদ, ঋতু। ৭=সমুদ্র, অশ্ব, মুনি। ৮=বসু, গজ। ৯=গ্রহ, রন্ধ্র। ১০=দিক্। ১১=রুদ্র।

জমির মাপ—৮ যবে এক অঙ্গুলী ; ৪ অঙ্গুলীতে এক মুট ; ৩ মুটে এক বিগৎ ; ২ বিগতে এক হাত ; ৫ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থে এক ছটাক ; ১৬ ছটাকে এক কাঠা ; ২০ কাঠায় বিঘা ; ১৬ বিঘায় এক খাদা। সময় নিরূপণ—১৮ নিমিষে ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় এক কলা, ৩০ কলায় এক অনুপল (ক্ষণ), ৬০ অনুপলে এক পল, ৬০ পলে এক দণ্ড, ৭॥ দণ্ডে এক প্রহর, ৮ প্রহরে এক দিবারাত্র, ৭ দিবসে এক সপ্তাহ, ১৫ দিবসে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় ঋতুতে এক বৎসর, ১২ বৎসরে এক যুগ, ৭১ যুগে এক মন্বন্তর।

গণিতের অনেক সূত্র নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে মুখে জানা ছিল। এজন্য তাহাদের কাগজ কলম লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া অঙ্ক কষিতে হইত না। তাহারা অতি জটিল হরণ-পূরণ, ও বাজার দরের সূক্ষ্মতম হিসাব মুখে মুখে করিতে পারিত। শ্রীমান্ সোমেশ বসু আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে যাইয়া বড় বড় জটিল হরণ-পূরণ অতি অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে মুখে মুখে বলিয়া তথাকার মনীষী অধ্যাপকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি যোগবলসম্ভূত? ভারতবর্ষে যোগবল অবিশ্বাস করা উচিত নহে। সেই বিশ্বাস আমাদের অস্থি-মজ্জাগত, কিন্তু তাহাতে এত ভেল চলিয়াছে যে, তাহা অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচারসহ হয় না। হয়ত সে বিদ্যা জনসমাজে অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং ভণ্ডদের প্রতারণা এই বিদ্যার উপর একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনিয়াছে। কিন্তু বসুমহাশয়ের এই গণিতের অপূর্ব্ব সফলতা হয়ত বা প্রাচীনকালের অধুনাবিলুপ্ত সূত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। মুখে মুখে সাধারণ লোকেরা এদেশে যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে গণিতের জটিল অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিল—তাহা এখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমরা বার্নার্ড স্মিথ মুখস্থ করিয়াছি, কিন্তু শুভঙ্কর, শিবরাম ও ভৃগুরামকে বিচারের সুবিধা না দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি। নিত্যকার প্রয়োজনে এখনও গণিতের

অনেকখানি প্রয়োজন আছে ; জমিজমার হিসাব, বাজার দর, কাঁসা, তামা, পিত্তল প্রভৃতির দর ও ওজন, শস্যাদির দরের হিসাব প্রভৃতি বিষয়ে চাষারা মুখে মুখে যাহা এখনও করিতে পারে, আমাদের এম. এ. উপাধিধারী গণিতের অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে তাহা অনেক বেশী সময়ে কষ্টেসৃষ্টে করিতে পারেন। চাষারা কাগজে-কলমে অভ্যস্ত নহে, নিতান্ত জটিল অঙ্ক হইলে তাহাদেরই মধ্যে অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট মাতব্বর দুই একজন লোক তাহা 'কালী' করিতে বসে। নিতান্ত জটিল অঙ্ক না হইলে তাহারা মসি, মস্যাধার বা কাগজের সহায়তা লয় না। এই জন্য যাহারা "কালী" করিতে জানে, চাষাসমাজে তাহাদের প্রভূত মান। এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের অতি সূক্ষ্ম হিসাব, যাহা তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করে, তাহা ভুল হয় না। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত লোক সেইরূপ করিতে গেলে দ্বিগুণ চৌগুণ সময় তো লইবেনই —তাহাতে অনেক সময়ই ভুল হইয়া থাকে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার সাহায্যে সমস্ত অধিতব্য বিষয়ের জ্ঞান বিস্তার করিবেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে যে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ ছিল, —জগতের সমস্ত জাতি যে সকল কথা নিজের ভাষায় শিখে, ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে জাপান যেভাবে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান তাহাদের নিজের ভাষায় শিখাইয়া উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন,—এখনও হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর যাহা নিজরাজ্যে প্রচলন করিয়াছেন, তাহা এদেশে অগ্রাহ্য হইয়া আছে। স্বদেশের ভাষায় জ্ঞান প্রচার করার বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছেন, ইঁহাদের মাথা অনেকটা ইংরেজী শিক্ষায় বিগড়াইয়া গিয়াছে। যিনি এখন অঙ্ক শিখেন, তিনি বিদেশী ভাষায় তাহা শিখিতে অর্দ্ধেকের বেশী সময় সেই বিষয়ের উপযোগী ভাষা শিখিতে ব্যয় করেন। আসল বিষয় শিখিতে আর কতটুকু সময় থাকে ?

যাহা হউক এখন যখন বাঙ্গলা ভাষায় গণিতাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, তখন আমাদের গণিতের যে সকল সূত্র বিলাতী পুস্তকে পাওয়া যায় না, অথচ নিত্যকার জীবনযাত্রার পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য, সেইগুলি কি শুভঙ্করের আর্য্যা হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত নহে ? এই আর্য্যাগুলিতে কড়া, কাঠা, ক্রান্তি প্রভৃতি যে সকল শব্দ আছে—তাহা প্রয়োজন হইলে, পাউণ্ড, টাকা, পয়সা, পেন্স প্রভৃতি এখনকার প্রচলিত গণিতাঙ্কে পরিণত করিয়া প্রাচীন আর্য্যাগুলির অনুসরণপূর্ব্বক সূত্র রচনা করিতে বোধ হয় এখনকার অধ্যাপকেরা অসমর্থ হইবেন না। অনেক সময়ে দেশীয় মাপ, দর এবং মূল্যাদি বাঙ্গলাদেশের চিরাগত সংস্কারাধীন করাতে বিশেষ দোষ নাই, তবে যখন বিলাতের সঙ্গে কারবারের প্রয়োজন হইবেই, তখন দুইরূপ গণিতাঙ্কে মূল্য ও ওজনের সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দজ্ঞানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে সকল সূত্র শিখিয়া এতদ্দেশের লোকেরা এত সহজে গণনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিত, সেই অসামান্য বিদ্যা—অশিক্ষিতপটুতা— আমরা বিবেচনাহীন হইয়া হারাইতে বসিয়াছি। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায় হিন্দুদিগের গণিতশিক্ষা-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাদ্রী লঙ সাহেব শুভঙ্করকে "The Cocker of Bengal" (বাঙ্গালাদেশের 'ককার') উপাধি দিয়াছেন। এই নামে শুভঙ্করের কোন গৌরব বৃদ্ধি হয়

নাই। গণিতের যে সকল অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের সূত্র আবিষ্কার করিয়া শুভঙ্কর সমস্ত কূট প্রশ্নের সহজ সমাধান করিয়াছেন, অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। লঙ সাহেব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিয়াছিলেন, "১৪০ বৎসর যাবৎ শুভঙ্করের আর্য্যার আবৃত্তিতে অনুমান ৪০,০০০ বঙ্গবিদ্যালয় মুখরিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমাদের ইংরেজী শিশু-বিদ্যালয়সমূহে যে ভাবের শিক্ষা পরবর্ত্তী সময়ে প্রচলিত হইয়াছে তাহার পূর্ব্বগৌরব হিন্দুদেরই প্রাপ্য।" হিন্দুরা মানসাঙ্ক বিদ্যায় ওস্তাদ ছিলেন। হিন্দুর এই সুচিরাবলম্বিত পন্থা এখন mental arithmetic আখ্যা পাইয়া শিক্ষিতদের মধ্যে গৌরবান্বিত হইয়াছে। শুধু গণিতের নহে, জ্যোতির্ব্বিদ্যার গুরুতর প্রশ্নগুলি ডাক ও খনার প্রসাদে বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এরূপ আশ্চর্য্যভাবে সমাধান করিতে পারিত, যাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন্ দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, তাহা অতি সহজে নিম্নশ্রেণীর লোক গণিয়া কহিতে পারে। "যে যে গৃহের যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী, সেদিন যদি হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী। দুই তিন পাঁচ ছয় একাদশে দেখ্‌তে হয়।" সহজে প্রশ্নটার উত্তর হইয়া গেল। আর কোন্ দেশের ইতর জনসাধারণ এভাবে প্রশ্নটির সমাধান করিতে পারে তাহা আমি জানি না। আশ্চর্য্যের বিষয় যোগ ও তন্ত্র সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ বহুলপ্রচার লাভ করিয়াছিল যে, আমরা মনেই করিতে পারি না, অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেরা কিরূপে এই দুরূহ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিল। সহজিয়াদের বিস্তৃত সাহিত্যের অনেকাংশ সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই সাহিত্যের পাঠক, শ্রোতা ও লেখকগণের অধিকাংশই মূর্খ পাড়াগেঁয়ে লোক—কিন্তু তাহাদের সাহিত্যে যেরূপ ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া ষট্‌পদ্মভেদের ও সহস্রারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিবরণ আছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। "গোরক্ষবিজয়" নামক বাঙ্গলা পুস্তকখানি এতদিন অবজ্ঞাত হইয়া নিম্নশ্রেণীর কুটিরে পড়িয়াছিল। ইহার লেখক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান, এবং পাঠকও সেই শ্রেণীর। অথচ এই কাব্যের শেষাংশে গোরক্ষনাথ যে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু মীননাথের মায়া-মোহ ভঙ্গ করিলেন, তাহা যোগপথের পন্থী—কৃতী সাধক ভিন্ন কেহই উত্তর দিতে পারিবেন না। আমরা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি; তথাপি বিশ্ব-পণ্ডিতেরা যখন এম. এ. পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকা হইতে গোরক্ষ-বিজয়ের সেই অংশ বাদ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমি বলিয়া কহিয়া এ বৎসরের জন্য তাহার কতকাংশ রাখিয়া দিয়াছি। এই ৩১টি প্রশ্নের মধ্যে একটি "অজপা কাহাকে বলে, জপে কোন জন?" এখন জানিতে পারিয়াছি, "অজপা" কথাটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও যোগের অতি প্রাথমিক কথা, তাহা পূর্ব্বকালে এদেশের আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিত। প্রশ্নগুলির আর দুইটি—প্রদীপ "নির্ব্বাণ হইলে জ্যোতিটা কোথায় যায়? এবং ধ্বনি ফুরাইয়া গেলে স্বর কোথায় বিলীন হয়?" ইত্যাদি। এদেশে মহোৎসবে যেমন ছোট বড় সকলে নির্ব্বিচারে একত্র বসিয়া যায়, জ্ঞানবিস্তারের পরিবেষণেও এদেশের লোকেরা অপর সকলকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা শুধু তাহা ভোগ করিতেন না। অন্ততঃ বৌদ্ধাধিকারের সময়ে এইরূপই নিয়ম ছিল। মাঝে কয়েক শতাব্দীর জন্য গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের দ্বার

আগ্‌লাইয়া পাহারা দিয়া উহার ভাণ্ডার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন ; কিন্তু এই গণ-তান্ত্রিক দেশে সেরূপ প্রভুত্ব টিঁকিল না—বৈষ্ণবেরা আসিয়া ঠেলা দিয়া সেই প্রাচীন দরজা ভাঙ্গিয়া দিলেন ; সমস্ত শাস্ত্রের আদেশ ও ব্রাহ্মণের নিষেধ-বিধি উলট-পালট করিয়া দিয়া সহজিয়ারা সতীত্বের আদর্শ ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়াছিল ; বৈষ্ণব গোস্বামী নিম্নতম শ্রেণীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন ; অশেষ গালাগালির ভাজন হইয়াও অনুবাদকগণ সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে বসিয়া গেলেন। নরোত্তম কায়স্থ ও শ্যামানন্দ সদ্গোপ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন—গোঁড়ার দল রোষ-কষায়িত চোখে তাহাদিগকে বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

উচ্চশিক্ষা।

প্রাচীনকালে বিদ্যার কিরূপ সম্মান ছিল তাহা পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে (২৯১-৩০০ পৃঃ) আমরা দেখাইয়াছি। "অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্। যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ" (পঞ্চতন্ত্র)। বাঙ্গলা প্রাচীন সরস্বতীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যে আমরা দেখিতে পাই, রাজা সুরেশ্বর তাঁহার মূর্খ পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন। অবশ্য এতটা বাড়াবাড়ি কবিকল্পনার অবাধগতিশীলতা প্রমাণ করে ; কিন্তু দয়ারাম কৃত 'সারদামঙ্গলে'র সমস্ত অতিরঞ্জনের মধ্যে এইটুকু সত্য যে, বঙ্গীয় সমাজে এক সময়ে মূর্খ পুত্র অতিশয় ঘৃণার পাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ্য-যুগে শিক্ষার ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে চাহিলে ইতরসাধারণের মধ্যে তাহার যতটা উপকরণ এখনও পাওয়া যাইবে—লিখিত পুস্তকে কি অনুশাসনাদিতে তাহা ততটা পাওয়া যাইবে না। অধুনা আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এদেশের কোন ঐতিহাসিক পুস্তক বা সন্দর্ভ (thesis) লিখিতে যাইয়া কেবলই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। যে সকল উপকরণ তাঁহাদের চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে—তাহা দেখিবার শক্তি তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা কোন সাহেব দেখেন নাই বা বলেন নাই, এমন কোন সত্য একান্ত স্পষ্টভাবে দেখিলেও তাহা বলিবার মত তাঁহাদের সাহস নাই। টলেমি যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া আমি বুঝিয়াছি, তদুক্ত "সলসোসু," "সাবার," "দাসরা," এবং "বেনিয়াজুড়ম" এই কয়টি নগর খাস বাঙ্গলায়। যে সকল সাহেব সেই ভৌগোলিক বৃত্তান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা খুব সম্ভব বাঙ্গলাদেশের অধুনা নগণ্যত্বপ্রাপ্ত ঐ কয়টি পল্লীর অস্তিত্ব জানিতেন না, সুতরাং উহাদের স্থাননির্ণয় করিতে যাইয়া নানারূপ উৎকট কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন। সোলসুনো টলেমির বিবরণে খুব বড় অক্ষরে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া লেখা হইয়াছে, যে জায়গায় উহার সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমার মনে হয় তাহা কালীঘাটের নিকট। "সরসুনো" গ্রাম এখনও বেহালার দক্ষিণে বিদ্যমান। উহা যে অতি প্রাচীন তাহাতে সংশয় নাই। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও তথায় দৃষ্ট হয়—তাঁহার দুই কন্যার নামে যে পাশাপাশি দুইটি বৃহৎ দীঘি আছে—তাহাও ঐ গ্রামের প্রাচীনত্বের প্রমাণ ; কারণ সম্ভবতঃ এই দুই দীঘি বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল—উহাদের

পুনঃসংস্কার করিয়া শেষে বসন্তরায়ের কন্তাদের নামে উহাদের পরিচয় হইয়াছে। পদ্মাতীরে সুপ্রসিদ্ধ রাজবাড়ীর মঠ, যাহা সেদিনমাত্র উক্ত নদীর কবলিত হইয়াছে—তাহার ভিত হইতে সমস্তই বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন, অথচ উহা কেদার রাঁয়ের নামের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কেদার রায় উহা সংস্কার করিয়া উহাতে কোন দেবতা স্থাপনা করিয়া থাকিবেন। সরস্থনোর দীঘিও এইভাবে নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন ভগ্ন রাজবাড়ীর সঙ্গে গঙ্গার যোগ করিয়া তথায় একটা বৃহৎ সুড়ঙ্গ-পথ ছিল। কিন্তু দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভগ্নাবশেষ অনেকস্থলেই মৃত্তিকার উপরে থাকে না। তাহা খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। বসন্তরায় যে গ্রামে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে গ্রাম পূর্ব্ব হইতেই সমৃদ্ধ ও ভদ্রনিবাস ছিল, নতুবা তিনি সেখানে বাড়ী করিতে যাইবেন কেন? তিনি ঐ গ্রাম স্থাপন করেন নাই। গ্রামটী দেখিলেই খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় এক কালে বাসুদেবপুর, বেহালা, বড়িবা প্রভৃতি অনেক গ্রাম লইয়া 'সরস্থনো' একটা পরগনার মত ছিল, এজন্য টলেমি উহার আয়তন এত বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। "সাবার" যে ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ "সাভার"—তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই, ঐ অঞ্চলটা ভীমসেনের পুত্র যশোমন্ত সেন কিরাতদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন (সপ্তম শতাব্দীতে)। হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় এই বৌদ্ধ নৃপতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি। "দাসরা" সাভার হইতে অনতিদূরে। টলেমির সংস্থাপনানুসারেও তাহাই দৃষ্ট হয়। দাসরা গ্রাম এক কালে কুলীন বৈদ্যগণের ২৭টি সমাজের মধ্যে অন্যতম ছিল। ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব্বের কুলজি গ্রন্থসমূহে এই গ্রামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গ্রামের সন্নিহিত 'শিববাড়ী' বহু প্রাচীন, তথায় শিব একটি বৃহৎ অসম পাথররূপে গভীর কূপের মধ্যে বিরাজিত। শিববাড়ীতে যে সকল প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাশুলী অতি প্রাচীন, নবম-দশম শতাব্দীর বাসুদেব মূর্ত্তিও তথায় দৃষ্ট হয়। দাসরার খালের ধারে একটি প্রাচীন কালীবাড়ী ছিল। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে সেই স্থানটির একাংশে পুষ্করিণী করিতে ইচ্ছুক হইয়া মালিক খুঁড়িয়াছিলেন। প্রায় একুশ হাত নিম্নে একটি প্রস্তরস্তম্ভ তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে হস্তীর উপরে সিংহমূর্ত্তি ও অপরাপর কারুসৌষ্ঠবের চিহ্ন আছে। উহা গুপ্তযুগের শেষের দিকের বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ঐ স্তম্ভটি কোন দেবমন্দিরের ছিল। আমাদের দেশে যেখানে কোন মন্দির থাকে, যুগ যুগ ধরিয়া সেই থানটায় নব নব মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সেই যে নবম শতাব্দীতে তথায় মন্দির ছিল, সেদিনকার কালীবাড়ী এতকাল পরেও সেই স্থানটির সূচনা করিতেছে। স্তম্ভটি দাসরার প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; উহা শিবলিঙ্গ বলিয়া পুরোহিত পূজা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। পূর্ণবাবু আমার শিক্ষক ও আত্মীয়; তিনি উহা আমাকে দিয়াছেন। অধুনা উহা আমাদের বাড়ীর

'রূপেশ্বর' মন্দিরে আছে। টলেমির নির্দ্দেশ অনুসারে "বেনিয়াজুড়ম" দাসরার নিকটবর্ত্তী। এই "বেনিয়াজুড়ম" এখনও বিদ্যমান—ইহার বর্ত্তমান নাম "বানিয়াজুরী"। গ্রামটাতে কিছু কিছু প্রাচীন চিহ্ন আছে। সাহেবেরা অজ্ঞতাবশতঃ এই তিন গ্রামের ঠিকানা না জানিয়া যেখানে সেখানে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার মতই যে সত্য—একথা আমি বলিতেছি না, অন্ততঃ এ বিষয়টা বাঙ্গালীর পক্ষে এত গুরুতর, যে এসম্বন্ধে কতকটা আলোচনা চলে। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ইতিহাস, এমন কি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ পরীক্ষা দিতে হইলে আমাদিগকে বিলাতে যাইয়া পড়িতে হয়। সাহেবদের লিখিত পুস্তকগুলি তো আমরা বাড়ীতে বসিয়াই পড়িতে পারি, কিন্তু একবার অজন্তা, অমরাবতী, সাঁচি, গয়া, ভুবনেশ্বর, হস্তিগুম্ফা, খেজুরাহ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেখিবার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহাতে অল্পসময়ে অনেক কাজ হয়, এবং ভারতীয় ইতিহাস-লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখী পরিচয় হইতে পারে। খরচও কম পড়ে। জাবা, প্রম্বনম, শ্যাম ও কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানও প্যারি বা লণ্ডন হইতে অনেক কাছে।

সঙ্গীতে যখন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর আকবর তানসেনপ্রমুখ সঙ্গীতাচার্য্যগণের দ্বারা রাগ-রাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন বাঙ্গলা-পল্লীতে সেই সুর পৌছায় নাই। কিন্তু হিন্দুযুগে এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঙ্গীতের চর্চ্চা বিশেষ-রূপেই হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রাগ-রাগিণী রাজসভায় মূর্ত্ত হইত বলিয়া কথিত আছে। যে সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেন, তাঁহার সেই সুরলহরী, নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীত সম্রাট্‌দিগকেও লজ্জা দিত বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে এই বীণাতে তিনি এরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে, তাঁহার মুদ্রায়ও তাঁহার মূর্ত্তি বীণাবাদকরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সভায় জয়দেবের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী পদ্মাবতী 'গান্ধার' রাগে গান গাহিয়া কপিলেশ্বরের সভা-জয়ী সঙ্গীতাচার্য্যকে জয় করিয়াছিলেন, স্বয়ং জয়দেব তাঁহার চরণের গতির ক্রম লক্ষ্য করিয়া তান রাখিতেন এবং নিজকে "পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার নর্ত্তকী শশিকলা এবং বিদ্যুৎ-প্রভার গানে রাগ-রাগিণী এরূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিত যে, লোকে তাহা শুনিয়া বেহুঁস হইয়া যাইত। এক রমণী সেইরূপ অবস্থায় বিদ্যুৎ-প্রভার মুখে 'সুহৈ' রাগের গান শুনিয়া নিজের শিশুকে কলসী মনে করিয়া রজ্জু বাঁধিয়া কূপোদকে নামাইয়া দিয়াছিল। সেক শুভোদয়াতে এই ঘটনাটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সেক শুভোদয়া, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ৬৮-৬৯ পৃঃ)। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সমস্ত ভারতবর্ষে গীত হইত, কিন্তু এই সকল গান সর্ব্বদাই গুর্জ্জর, খাম্বাজ, গান্ধার প্রভৃতি রাগে গীত হওয়ার নির্দ্দেশ আছে। সম্ভবতঃ গুজরাট, কাম্বোজ, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে ঐসকল রাগের নাম গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদেশ চিরকালই গণতান্ত্রিক, এখানকার জনসাধারণ কোন কালেই একটা নির্দ্দিষ্ট কায়দা বা বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে রাজী নহে। জনসাধারণ সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারা শিরোধার্য্য করিয়া

লয় নাই, তাহাদের নিজস্ব একটা সুর ছিল—এই সুর হিন্দী মনসামঙ্গলে (বেহুলাকাব্যে) 'বাঙ্গাল রাগ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ। এই সুর কোন প্রচলিত রাগরাগিণীর ধার ধারে না, উহা খাঁটি পল্লীহৃদয়ের সমস্ত করুণ রস নিংড়াইয়া লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত। এই সুর পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর গর্ভে মাঝিদের মুখে যিনি শুনিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন এই নদীমাতৃক দেশের উহা নিজস্ব সুর।

ভাটিয়াল ও মনোহর সাই।

আকাশ ও নদী যেখানে তুল্য রূপই বিশাল, বাতাসের গতি যেখানে অবাধ, সেই অসীম রাজ্যের অসীম বেদনা বা ভক্তির সমস্ত বাধা-নির্মুক্ত এই সুর যেন নৈসর্গিক দৃশ্যপটের নিজস্ব। মাঝি যখন উহা গায়, তখন তাহার সেই সুরতরঙ্গ পদ্মার তরঙ্গের মতই আকাশ-বাতাসকে উন্মাদনা দিয়া চলিয়া যায়। যে সুরে মনসাদেবীর কীর্ত্তন গাহিয়া দ্বিজ-বংশীদাস কেনারামের মত হিংস্র পশুকে বিমুগ্ধ করিয়া তাহার পঙ্কিল জীবনস্রোত মন্দাকিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ভেলুয়া কাব্যের নায়ক সারেঙ্গ বাজাইয়া পশুপক্ষী বশীভূত করিতেন বলিয়া বাঙ্গলা পল্লীগীতিকায় বর্ণিত আছে,—ইহা হৃদয়ের সেই তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া অধীর বেদনার সৃষ্টি করে। "আমার গুরু বড় দয়াল সত্য - আমি হলাম অপদার্থ, আমি যে ভক্তিহীন—ভক্তিহীন" কথাগুলি অতি সরল সহজ—কিন্তু ভাটিয়াল রাগে যখন নদীর উপর এই গানের সুর বহিয়া যায়—তখন ভগবানের অসীম দয়ায় মানুষের নিজ অস্তিত্ব ডুবিয়া যায়।

এতকাল ভাটিয়াল রাগ—করুণ রসের প্রস্রবণস্বরূপ পল্লীর হৃদয় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল—হঠাৎ এক সোনার মানুষ তাঁহার যাদুকাঠি দিয়া এই রাগটি স্পর্শ করিলেন—অমনই তাহা সোনা হইয়া গেল; যেন গুড়কে চিনি কিংবা চিনিকে মিছরিতে পরিণত করা হইল। বোধহয় এটি দেখান যাইতে পারে যে রেনেটি, গড়নহাটী এবং মনোহর সাই প্রভৃতি কীর্ত্তনের সুর—এই ভাটিয়ালের উপাদানেই সৃষ্ট। আমি জানি না—মনোহর সাই কীর্ত্তনের মত এরূপ প্রেমের উন্মাদনা জগতের আর কোন সুরে আছে কিনা—কারণ উহা প্রেমের উন্মাদেরই সুর—সে সুর বিজ্ঞানসম্মত কিনা জানি না; যদি না হয়, তবে এই সুরকে বুঝিবার জন্য নববিজ্ঞান সৃষ্ট করা উচিত। আজ প্রায় পঞ্চশত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী এই সুরের মোহে পাগল হইয়া আছে। যেদিন চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল, সেইদিন হইতে গীতগোবিন্দের প্রাচীন সুর এদেশ হইতে উঠিয়া গেল এবং বাঙ্গলা কীর্ত্তনের সুরে তাহা গাওয়া হইতে লাগিল।

স্ত্রীশিক্ষা।

বহু রূপকথা ও গীতিকথায় দৃষ্ট হয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ এক গুরুর নিকট এক পাঠশালায় বসিয়া পড়িতেন। সখীসোনার গল্পে রাজকন্যা ও কোটালের পুত্র একত্র এক পাঠশালায় পড়িতেন—সেই সূত্রে একটা প্রতিশ্রুতির ফলে উভয়ে পলায়ন করিয়া স্বামি-স্ত্রীর মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। পল্লীগীতিকায়ও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে এই প্রথা রহিত হইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে ফকির-রাম কবিভূষণ বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিয়া সখীসোনার গল্পের একটা নূতন কবিত্বপূর্ণ সংস্করণ সঙ্কলন করেন। গল্পটি কিন্তু বহু প্রাচীন, ফকির-রামের সময়ে বিষয়টা একটা সংস্কারে

দাঁড়াইয়াছিল, তখন হয়ত এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এতগুলি রূপকথায় আমরা রমণী ও পুরুষের একত্র পড়াশোনার কথা পাইতেছি, যাহাতে মনে হয় ইহা দেশব্যাপী একটা প্রাচীন রীতির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে। কিন্তু পাঠশালায় একত্র না পড়িলেও স্ত্রীলোকের পড়াশুনা যে এ দেশে মুসলমানদের সময়েও প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, অরুন্ধতী প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুতা ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের পণ্ডিতাদিগকে লইয়া টানাটানি করিব না। কালিদাস তাঁহার স্ত্রী ভোজরাজের কন্যার নিকট স্বীয় মূর্খতার জন্য বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, কিংবা বিদ্যার ন্যায় রাজকুমারীরা পণ করিয়া বসিতেন যে, যে তাঁহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন—এই সকল গল্পকেও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান দিব না। কিন্তু মধ্যযুগে আমরা চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী রামী, শিখী মাইতীর ভগিনী মাধবী এবং চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবিদিগের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছি। চণ্ডীকাব্যে দেখা যাইতেছে যে বণিকের বধূরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন, পল্লীগীতিকায় জেলে-কৈবর্ত্তের কন্যা মলুয়া ও খুল্লনা পত্রাদি লিখিতে পারিতেন—এরূপ উল্লিখিত আছে। ইহার সকলগুলিই গল্প কিনা, কিংবা ইহাদের কোন কোন কাহিনী সত্যমূলক, তাহা নির্ণয় করিবার অবসর আমাদের নাই। যাঁহারা শিল্পবিদ্যায়—সঙ্গীতে এবং অপরাপর কলাবিদ্যায় এতটা পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারা যে লেখাপড়া জানিতেন না, এমন মনে হয় না। আমরা গত একশত-দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের অনেক শিক্ষিতা মহিলার কথা জানি—তাঁহারা শুধু লেখাপড়া জানিতেন না—কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, দ্রবময়ী।

ফরিদপুর যপসা-গ্রামনিবাসী লালা রামগতি সেনের কন্যা বিদুষী আনন্দময়ী দেবীর নাম সুপরিচিত। ইনি পলাশী যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন। ইনি অথর্ব্ববেদ হইতে যজ্ঞকুণ্ডের আকৃতি আঁকিয়া রাজা রাজবল্লভকে তাঁহার যজ্ঞের জন্য দিয়াছিলেন। বেদনির্দ্দিষ্ট সেই যজ্ঞকুণ্ডের খসড়া পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেন যে 'হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ইঁহার অনেক পদ আছে, তাহাতে সংস্কৃতে তাঁহার অসামান্য অধিকার প্রমাণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চন্দ্রাবতীর নাম এখন সুপরিচিত। ইনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্না ছিলেন, এবং মলুয়া, কেনারাম প্রভৃতি অপূর্ব্ব গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং পিতার আদেশে রামায়ণের পদ্যানুবাদও করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার ১ম ও ৪র্থ খণ্ডে এই কবির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার রচিত কাব্যগুলিও সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পল্লীসাহিত্য খুঁজিলে আমরা বহু রমণী-কবির রচনা পাইতে পারি। কিন্তু সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ১০০ বৎসর পূর্ব্বেও কোন কোন বঙ্গীয় মহিলার আয়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। শুধু চন্দ্রাবতী এবং আনন্দময়ী নহেন, বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও এমন সকল পণ্ডিতা রমণী ছিলেন, যাঁহারা বিদ্বৎসমাজে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখের "সম্বাদ-ভাস্কর" নামক পত্রিকায় দ্রবময়ী দেবীর সবিস্তার উল্লেখ আছে। ইঁহার কাহিনী আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-

মোহন ভট্টাচার্য্য, এম. এ. সম্বাদ-ভাস্করের প্রাচীন স্তূপ হইতে আবিষ্কার করেন এবং তাহার সহায়তায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে (১৩৩৮ সন, ফাল্গুন) প্রকাশিত করিয়াছেন। দ্রবময়ী দেবী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর-বয়স্কা ছিলেন। সম্বাদ-ভাস্করে তাঁহার সেই সময়ের কথাই লিখিত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী বালিকা কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা। ইনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর আমরা সম্বাদ-ভাস্কর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—"দ্রবময়ী বালিকাকালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও মূল সাতখানি টীকা এবং অভিধান-পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকন্যার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায়শাস্ত্রেরও কিয়দংশ শিক্ষা দিলেন; পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভারতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণ দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দবৎসর। পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫.১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী কর্ণাটরাজের মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না। আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক ও মুখ নিরাবরণ থাকে; তিনি চার্ব্বঙ্গী, যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেও পরাস্ত হন। দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয়। বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন, আমরা দ্রবময়ীর বিদ্যা-শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয়, তবে আমাদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

১২৩১ বাং সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক" নামক পুস্তক হইতে হটী বিদ্যালঙ্কার নাম্নী অপর এক মহিলার বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।—

হটী বিদ্যালঙ্কার।

"রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি বাল্যকালে আপন আপন গৃহকার্য্যের অবকাশে পড়াশুনা করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে

—তোমার সেই অন্তিম বিবাহের জ্যোতিঃ-সূত্রময় অনন্ত পট্ট-বসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উন্নত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি! অগ্নি আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।" অবশ্য অল্পসংখ্যক স্থানে যে জোর-জবরদস্তি না চলিত তাহা নহে, কিন্তু এই ব্যাপক পদ্ধতির মূলকথা ছিল প্রেমার্থে আত্মবিসর্জ্জন। যাঁহারা বাঙ্গলার পল্লীগীতিগুলি পড়িবেন, তাঁহারা ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। বঙ্গের মহিলাদের সর্ব্বস্ব দেওয়া প্রেমের প্রকৃত দুর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—বঙ্গের মর্ম্মকথা বলিতে সুদক্ষ পল্লী-কবিরা। একদিকে স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন, অপরদিকে জীবনে প্রেমের জন্য সমস্ত দুঃখ ও মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়া এই নায়িকারা যে ভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—তাহাতে এই উভয় ব্যাপারেরই মর্ম্মকথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ আভিধানিক জি. সি. হটন তাঁহার বাঙ্গলা ও ইংরাজী শব্দের নির্ঘণ্টে (A Glossary of Bengali and English—1825 A.D.) লিখিয়াছিলেন, "To crown all, the matchless constancy and fearless indifference of death in the Indian widow, who voluntarily mounts the funeral pile in the expectation of accompanying her husband to a region of bliss." [সকলের সেরা দৃষ্টান্ত, হিন্দু বিধবার অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন উপেক্ষার ভাব, যাহাতে তাঁহারা স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।]

এক সময়ে বঙ্গের মহিলাদিগের চিকিৎসার ভার পল্লীর মেয়েদের হাতেই ছিল বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণলীলার অভিনয় দেখিতে দেখিতে যখন রাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন রাজধানীর এক প্রাচীনা আহিরিনীকেই চিকিৎসার জন্য আনা হইল, তিনি মন্ত্র-তন্ত্র, তুক্‌তাক এবং গাছগাছড়া প্রভৃতি ঔষধের উপাদান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। যখন রাজকন্যার চিকিৎসার জন্য এইরূপ মহিলা-চিকিৎসকের আহ্বান হইল, তখন মনে করিতে পারা যায়, মেয়েদের চিকিৎসার জন্য মেয়ে-চিকিৎসকই ডাকা হইত। অবশ্য চণ্ডীদাসের রচনা কাব্য-কথা, কিন্তু তথাপি রূপ-কথা ও কবি-কল্পনার ফাঁক দিয়া আমরা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার আভাস পাইতে পারি—এই হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও তাহাদের স্থান আছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে বাঙ্গলাদেশের তাৎকালীন প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলির উল্লেখ আছে। অজ্ঞ পুঁথিলেখকগণের দোষে সেই স্থানগুলির নাম অনেক পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, দেববিগ্রহগুলির নাম ও তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। হয়ত পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার যে সকল তীর্থস্থান ছিল, তাহার কতকগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। সেই দেবতাগুলির কোন কোনটির পূজা হয়ত বৌদ্ধযুগ কিংবা তৎপূর্ব্ব হইতেও চলিয়া আসিয়াছে। দেবতত্ত্ব জানিতে হইলে স্বয়ং

যাইয়া তত্তৎস্থল পরিদর্শন করা দরকার—এই দেববিগ্রহের সহিত অনেক সময় প্রাচীন ইতিহাসের কথা জড়িত আছে। যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাসের গবেষণা করেন, আমি তাঁহাদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গলার চাষাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। ইহাদের একখানি নিজস্ব শাস্ত্র আছে,—তাহা ইহাদের কাছে বেদের ন্যায়; নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের অনুশাসন তাহারা সর্ব্ববিষয়ে মানিয়া চলে। এই শাস্ত্র তাহারা লিখিত আকারে শিখে না—ইহা তাহাদের মুখে মুখে কত যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ভাষা অবশ্যই রূপান্তরিত হইয়াছে এবং যুগে যুগে নূতন কথার সংযোজনা হইয়াছে—তথাপি ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন বাঙ্গলার সমস্ত লোকই কৃষি-কার্য্য করিত ও বীজবপন, বাণিজ্যের আরম্ভ অথবা শুভকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য গ্রহ-উপগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—এই শাস্ত্র তখন হইতে বিরচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অনেক সময়েই একান্ত নির্ভুল এবং চাষাদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বাঙ্গলার ঋতুভেদে উৎপাদিকা শক্তির বৈষম্য এবং আবহাওয়া প্রভৃতির গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এই প্রবচনগুলি ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে বিলাত হইতে যে সকল বাঙ্গালী কৃষিতত্ত্বের উপাধি লইয়া এদেশে আসেন, কিংবা যাঁহারা বোম্বাই সহরে যাইয়া কৃষিবিজ্ঞানে পারদর্শী হন—তাঁহারা এতদ্দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং বাঙ্গলার অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচিত "ডাক ও খনার" এই অভ্রান্ত শাস্ত্রকে নিতান্ত উপেক্ষা করেন। গণিতের পণ্ডিতেরা যেরূপ শুভঙ্করী আর্য্যার কোন খবরই রাখেন না, কৃষি-বিষয়ক বিজ্ঞানবিদ্ এদেশের পণ্ডিতেরাও ডাক-খনার কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। যাহা লইয়া উক্ত বিষয়গুলির হাতেখড়ি হওয়া উচিত, সেই উপকরণ অগ্রাহ্য করাতে এই পণ্ডিতগণের শিক্ষার ভিত্তি চিরকালই কাঁচা থাকিয়া যায়। ডাক ও খনার সহস্র সহস্র প্রবচন এখনও পল্লীগ্রাম খুঁজিলে উদ্ধার করা যাইতে পারে। কয়েকটি প্রবচন নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। (১) চৈত্রে কুয়া (-সা) ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান। (চৈত্রে কোয়াসা ও ভাদ্রে বান হইলে মড়ক লাগে।) (২) পূর্ণ আষাঢ়ে দখিনা বয়। সেই বচ্ছর বন্যা হয়। (দখিনা=দক্ষিণা হাওয়া।) (৩) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া। (পৌষ মাসে যদি গরম হয় এবং বৈশাখ মাসেও যদি শীত থাকে, তবে সে বৎসর আষাঢ়ের প্রথম দিকেই ভয়ানক বর্ষা হইবে।) (৪) কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। বলগে চাষারে বাঁধতে আল। আজ না হয় জল হবে কাল। (কোদাল ও কুড়ুল দিয়া কোপাইলে যেরূপ হয়, যখন মেঘগুলি সেইরূপ ছিন্ন হয় এবং তখন যদি মাঝে মাঝে হাওয়া দেয়, তবে বৃষ্টি আসন্ন বুঝিতে হইবে, সুতরাং তখনই চাষাদের বৃষ্টি ধরিবার জন্য ক্ষেতে আইল বাঁধিয়া রাখা উচিত।) (৫) যদি বরে আগনে, রাজা নামেন মাগনে। যদি বরে পৌষে, কড়ি হয় তুষে। যদি বরে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

যদি বরে ফাগুনে, চিনা কাওন হয় দিগুণে। জ্যৈষ্ঠ শুকে আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার না সহে ধরা। মাঘ মাসে বর্ষে দেবা, রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা। (যদি অগ্রহায়ণে বৃষ্টি হয়, তবে এরূপ দুর্ভিক্ষ হইবে যে, রাজাকেও ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া বাহির হইতে হইবে। পৌষে বৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষ আরও ভয়ানক হয়, তখন তুষ বিক্রয় করিয়াও অর্থলাভ হয়। যদি জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি না হইয়া আষাঢ়ে খুব বৃষ্টি হয় তবে অপর্য্যাপ্ত শস্য হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রজারা এত ধনী হইবে যে, রাজা ছাড়িয়া প্রজার কাছে গেলেও অর্থলাভ হইবে।) (৬) মেঘ করে রাত্রে আর দিনে হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল। (৭) আষাঢ়ে নবমী শুকুল পখা, কি কর শ্বশুর লেখা জোখা। যদি বর্ষে রিমিঝিমি। শস্যের ভার না সহে মেদিনী। যদি বর্ষে মুষলধারে, মধ্যসমুদ্রে বগা চরে। যদি বর্ষে ছিটে কোঁটা, পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা। (শুক্লপক্ষীয় আষাঢ়ের নবমীতে যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খনা তাহার শ্বশুরকে বলিতেছেন, কেন আর হিসাবটিসাব করিতেছেন—আমার কথা মানিয়া লউন, ঐ তিথিতে ঐরূপ বৃষ্টি হইলে সেবার এরূপ অনাবৃষ্টি হইবে যে, মধ্যসমুদ্রও শুকাইয়া যাইবে—সেখানে চড়া পড়িবে ও তথায় বক চরিয়া বেড়াইবে। যদি খুব প্রবল বৃষ্টি না হইয়া ঐ তারিখে ছিটেকোঁটা অর্থাৎ অল্প বৃষ্টি হয়, তবে সেবার বর্ষা এরূপ বেশী হইবে যে, পর্ব্বতের উপরও মৎস্য দেখা দিবে। যদি রিমিঝিমি বৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ছোট ছোট বিন্দুতে অবিশ্রান্ত বর্ষা হয়, তবে সেবার অপর্য্যাপ্ত শস্য হইবে।) (৮) খনা ডেকে ব'লে যান। রোদে ধান ছায়ায় পান। (যত রৌদ্র বেশী পাইবে, ততই ধান্য ভাল হইবে এবং যত বেশী ছায়া পাইবে, ততই পান বেশী হইবে।) (৯) আশ্বিনে উনিশ কার্ত্তিকের উনিশ, বাদ দিয়া যত পারিস মটর কলাই বুনিস। (১০) খনা বলে চাষার পো। শরতের শেষে সরিষা রো। (১১) সাত হাত তিন বিঘতে। কলা লাগাবি মায়ে পুতে। কলা লাগিয়ে না কাট পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। (১২) যদি থাকে টাকা করবার গোঁ, তবে চৈত্র মাসে ভুট্টা রো। (১৩) দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল। (১৪) শুনরে বাপু চাষার বেটা। মাটীর মধ্যে বেলে যেটা। তাতে যদি বুনিস পটোল। তাতেই তোর আশা সফল। (১৫) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হলুদ রোও। দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া থোও। (১৬) ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটী। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি। শুন বাপু চাষার বেটা। বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা। দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে। দুই কুড়া ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে। (১৭) খনা বলে শুন শুন। শরতের শেষে মুলো বুন। (১৮) তামাক বুনে গুড়িয়া মাটী। বীজ পুত গুটি গুটি। ঘন ঘন পুত না। পৌষের অধিক রেখো না। (১৯) ব'লে গেছে বরাহের পো। দশটি মাস বেগুন রো। চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ। (২০) অগ্রহায়ণে যদি না হয় বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি। (২১) ডাকছেড়ে বলে রাবণ। কলা রোবে আষাঢ় শ্রাবণ। তিন শত ঝাড় কলা রুয়ে। থাক গৃহী ঘরে শুয়ে।

এইরূপ অসংখ্য প্রবচন আছে। কতকগুলি রন্ধন সম্বন্ধে—যথা, যত আলে ব্যঞ্জন মিষ্ট। তত আলে ভাত নষ্ট। (ব্যঞ্জন রাঁধিতে যত বেশী আল দিবে ততই ভাল, কিন্তু ভাত রাঁধিতে

মুহ আল ভাল।) আঁতুড় ঘর সম্বন্ধে, আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে, সর্ব্বপ্রকার কৃষি সম্বন্ধে—এই সকল প্রবচন বাঙ্গলার পক্ষে খাঁটি সত্য। যখন বাঙ্গালীর চাকুরী মিলিতেছে না, তখন আমাদের কৃষির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; কিন্তু এই প্রবচনগুলি কি এখন আমাদের উদ্ধার করা উচিত নহে?

আমার নিকট খনার বচনের একটা সংগ্রহ আছে। বাঙ্গলা পঞ্জিকাগুলিতে কিছু কিছু সংগ্রহ আছে, কিন্তু চাষার পল্লীতে না গেলে এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুর যে সেইটিই মহাভয়ের কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলি ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবুয়া মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের দেশের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় অনেক মৈথিলী পুঁথিতে (কোন কোনটি ৩০০।৪০০ বৎসরের পূর্ব্বের) অথ "খনাবচনং" বলিয়া বাঙ্গলা ভাষায় রচিত খনার বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সকল প্রবচনের বটতলার কতকগুলি সংস্করণ আছে। তাহাতে বেশী বচন সংগৃহীত হয় নাই। ইহাদের কাল নির্ণয় করা সহজ নহে, বৃহৎসংহিতা (৫ম শতাব্দী), এমন কি পতঞ্জলির মহাভাষ্য (খৃঃ পূ ৩০০ শতাব্দী) প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে এই সকল প্রবচনের মত কতকগুলি বচন সূত্রাকারে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এতদ্দেশ-প্রচলিত খনার বচন নামধেয় প্রবচনগুলিতে ঠিক বাঙ্গলা দেশের কথাই বেশী করিয়া পাওয়া যায়। নারী-চরিত্র, জ্যোতিষিক প্রসঙ্গ এবং সামাজিক বিষয়ের প্রবচনই ডাকের কথায় বেশী।

এই সকল প্রবচনে মাঝে মাঝে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। ভগীরথ যে গঙ্গার গতি ফিরাইয়া দিয়া একটা বিরাট্ পূর্ত্তকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক উপাখ্যানের আড়ালে তাহা চাপা পড়িয়াছে—কিন্তু খনার বচনে "মরবি যদি মরগে ভগার খাদে"—ছত্রটি পাওয়া যায়। "খাদ" অর্থ "খাল"—সুতরাং ভগীরথ যে খাল কাটিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাইতেছে। আর একটি প্রবচন এইরূপ :—"উঠ্‌তে শুতে পাশমোড়া, তার অর্দ্ধেক ভীমে ছোঁড়া, ভবার চৌদ্দ ভবীর আট, এই সব ক'রে জন্ম কাট। এ যদি না করতে পারিস, ভগার খালে গিয়ে ডুবে মরিস।" এখনও গোঁড়া ব্রাহ্মণদের রীতি আছে যে গঙ্গায় স্নান করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা এক মুঠ মাটী নদী হইতে তুলিয়া তীরে ক্ষেপণ করিয়া শেষে স্নান করেন। এই বিরাট্ পূর্ত্তকার্য্যে যে হিন্দুমাত্রই সহযোগিতা করিয়াছিল এবং কোন কালে এই ধারা রুদ্ধ না হয়, এজন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই নিত্য-সাহায্য বাধ্যতামূলক ছিল, এই রীতিদ্বারা যেন সেই কথার আভাস পাওয়া যায়।

আবার শুভদিন ও অশুভদিন সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী জনসাধারণ প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া সিংহবিক্রমে বন্ধন মুক্ত হইতে পারে। খনার এই বচনটির প্রতি লক্ষ্য করুন—

"রজক দেখবে যখন, কাপড় ছাড়বে তখন॥ নাপিত দেখবে যখন, খেউরি হবে তখন॥ কিসের তিথি কিসের বার। লাফ দিয়া হও গহিন পার॥ জল ভাল গঙ্গার জল, বল বল বাহু বল॥ আর যত সব ভাসা দিসা। খনার বিচারে বুদ্ধিনাশা॥"

ইহার পূর্ব্বেই একটি বচনে পাই সোম ও শুক্র বার বাদ দিয়া নূতন কাপড় পরিবে, রবিবারে ও মঙ্গলবারে খেউরি হইবে না, জলপথে বিদেশে যাইতে হইলে অনেক অশুভ দিন বর্জ্জন করিতে হইবে। কতকগুলি নিষিদ্ধ দিনে রজকালয়ে কাপড় দিতে নাই; কিন্তু এইবার শৃঙ্খলিত পুরুষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া বলিতেছেন—যখন রজক আসিবে, তখনই কাপড় দিবে—তাহাতে দিন-ক্ষণ নাই। নাপিত পাইলেই খেউরি হইবে এবং লাফাইয়া সমুদ্র পার হইও, তাহাতে দিন-ক্ষণ দেখিতে হইবে না। জলের মধ্যে গঙ্গা-জল শ্রেষ্ঠ, এবং বলের মধ্যে বাহু বলই শ্রেষ্ঠ, গ্রহাদির বল কিছুই নহে। খনা বলিতেছেন ওসকল শাস্ত্রের বচনে কেবল বুদ্ধি নাশ করে এবং উহারা নিরর্থ।

আশ্চর্য্যের বিষয় অন্যান্য প্রাকৃতিক উপদ্রবের মত, ভূমিকম্প সম্বন্ধেও কতকগুলি পূর্ব্ব লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—"ভন্ ভন্ ক'রে উড়ে মশা। এক চাপড়ে শতেক মরে সে দিন মেদিনী নড়ে॥" (মশার যদি এরূপ বাহুল্য হয় যে, এক চাপড়ে একশটি বিনষ্ট হয়—সেই দিন ভূমিকম্প হইবে, জানিবে।) এইভাবে বন্যা ও ঝড়ের সূচনা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারির সূচনা প্রভৃতি ব্যঞ্জক অনেক প্রবচন আছে। ধান, চাল হইতে সুরু করিয়া মাষ কলাই প্রভৃতি বিবিধ ডাল, কচু, পান, বেগুন, কলা, আম, কাঁটাল প্রভৃতি বিবিধ ফল উৎপাদন করিবার উপযোগ্য আবহাওয়া এবং শস্য ও ফলের ব্যাধি নষ্ট করিবার উপায়—বাঙ্গলার কৃষিতত্ত্বের সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে খনা দিয়াছেন। ডাকের বচনেও এ সকল কথা আছে, কিন্তু তাহাতে নরনারীর চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে প্রবচনই বেশী। মৎসঙ্কলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বিদেশীর অভিমত।

আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে বিদেশী লোকেরা অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজদের মন আমাদের উপর অনেকটা সদয় ছিল; তখন তাঁহারা আমাদের দোষগুণ উভয়ই সরলভাবে ব্যক্ত করিতেন। কেরি, ওয়ার্ড ও মার্সম্যান এদেশের রীতিনীতি অনেক সময়ে অতিরিক্ত ভাবে নিন্দা করিয়াছেন—তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার জন্য। কিন্তু এদেশের ভাল দিক্‌টাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন; তখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কূটরাষ্ট্রনীতি ইংরেজ কি দেশীয় সমাজে প্রবেশ করে নাই। মিস মেওর মত লোক তখন একটিও ছিল না, বরঞ্চ এদেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে কত এলফিনষ্টন, ফার্গুসন, উইলসন, কোলব্রুক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এখনও মহামনা গ্রীয়ারসন জীবিত আছেন—তুলসীদাসের প্রতি শ্রদ্ধায় যাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী পড়িয়া বিমুগ্ধ। তিনি এই কবিকে কখনও চসার এবং কখনও ক্রেবের সঙ্গে তুলনা করিয়া উচ্চাসন দিয়াছেন এবং স্বয়ং চণ্ডীকাব্যের অনেকাংশ ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। হটন তাঁহার বাঙ্গলার অভিধানের (বাঙ্গলা হইতে ইংরেজী; ইহা একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)

নির্ঘণ্টের ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তাপ ভূ-নিম্নে প্রবেশ করিতে যেরূপ দেরী হয়, সমাজের নিম্নস্তরে জ্ঞানের প্রসারও তেমনই সময়- ও কষ্ট-সাপেক্ষ। এই জ্ঞানের পরিধি যুগযুগান্তরের চেষ্টায় ভারতীয় কুটীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। যিনি এই তথ্য সহজ ও সরল স্বাভাবিক জীবনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তিনি এই দেশের পাণ্ডিত্য ও পারিভাষিক মুন্সিয়ানার জটিলতা ব্যতীতও সেই জ্ঞান যে কতটা বিশ্বজনীন প্রসারতা এবং গভীরতা লাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন। সেই জ্ঞান যে সকল লোকের আছে, তাহারা যে উহা কত দুর্লভ ও মূল্যবান্ তাহা আদৌ অবগত নহে। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি প্রায়-নগ্নদেহ কোন কুটীরবাসীর মুখে নর-চরিত্র এবং মানুষের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে এরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞানের কথা শুনিবেন, যাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া যাইবেন। তিনি তাঁহার এতদ্দেশীয় নিম্নতম চাকর-বাকরের মুখে চারিদিকের লোকের স্বভাব সম্বন্ধে এরূপ অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক আলোচনা শুনিবেন, যাহা অন্য দেশের মাত্র মহাজ্ঞানীদের মধ্যে আশা করা যায়। তিনি পল্লীগুলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে খোলা হাওয়ার মধ্যে এরূপ সূক্ষ্ম শিল্প ও কারুকার্য্যের নমুনা দেখিবেন, যাহা যুগযুগান্তরের চেষ্টালব্ধ।

এই প্রদেশগুলির পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণকালে বর্ত্তমান শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। তিনি অনেক মন্দির, মসজিদ এবং obelisk দেখিবেন, যাহা সদ্যঃফোটা ফুলের ন্যায় শিল্পীর কোমল হস্তের গন্ধ এখনও হারায় নাই। এইসকল মন্দিরের যে কোনটি য়ুরোপে কোন স্থানে থাকিলে তাহা সেই দেশের, সেই শিল্পীর ও সেই যুগের গৌরব বলিয়া স্বীকৃত হইত। সেইরূপ মন্দিরের খ্যাতিতে সমস্ত খৃষ্টীয় দেশগুলির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। এই শিল্পের অসাধারণ শ্রম, গঠন-নৈপুণ্য, নির্ম্মাণের কষ্ট ও অর্থব্যয় সম্বন্ধে কতই-না সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়া ইহাদিগকে সম্মানিত করা হইত। প্রাদেশিক এই সমস্ত শিল্পকার্য্যের নিদর্শন আমাদের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু যিনি একবার ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলি দেখিবেন, শিল্পসাধনা—সুরুচি ও আয়তন সম্বন্ধে এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দিরগুলির সমকক্ষতা করিতে পারে, তিনি জগৎ খুঁজিয়া এরূপ স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা কোথায়ও পাইবেন না। যখন পর্য্যটক এই মন্দিরময় নগরটি দেখিবেন, তখন যে অসামান্য প্রতিভাশালী ইহাদের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং যেসকল কর্ম্মনিপুণ অধ্যবসায়শীল হস্ত ইহাদের আকার দিয়া গ্রানাইট্ পাথরে তাঁহাদের অমরকীর্ত্তি চিরকালের জন্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পরিচয় পাইয়া তিনি সহজেই বুঝিবেন যে তিনি জগতের এমন এক অত্যাশ্চর্য্য জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, যাহাদের তুলনা নাই। তিনি তাঁহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহাদের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী উপকরণগুলি উপেক্ষা করিয়া তিনি

যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারিত, তাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী পর্ব্বতের শিলা কাটিয়া তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

এমন সকল লোকও আছেন যাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের নীতিজ্ঞান আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। যাঁহারা এরূপ অসার মত পোষণ করেন, তাঁহারা একবার এদেশের সৈনিকদের অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা ভাবিয়া দেখুন। এদেশের লোকের সখ্যের আদর্শ কত বড়, তাহা একবার ভাবুন, বন্ধুর জন্য বন্ধু—সুখে দুঃখের চূড়ান্ত পরীক্ষাস্থলে কিরূপভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন—এদেশের ভৃত্যেরা সামান্য কিছু উপকার পাইলে প্রভুভক্তির কি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করে—এই সকল তাঁহারা একবার চিন্তা করুন। এই দেশের তপস্বীরা ভগবানের প্রীতিলাভের অন্ধবিশ্বাসে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কি উৎকট ভাবে নিপীড়ন করেন—তাহা ভাবুন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমি সতীদের কথা কহিব। অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি একান্ত উপেক্ষার প্রতীক হিন্দু বিধবা স্বামীর সঙ্গলাভ করিবার আশায় স্বেচ্ছায় চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সেই দৃষ্টের কথা আপনারা একবার স্মরণ করুন। যে জাতির মধ্যে এই সকল মহাগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যের পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। যদি বিধি-প্রবর্ত্তক শাসনকর্ত্তারা এই সকল একনিষ্ঠ নৈতিক গুণ লক্ষ্য করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, তবে এই জাতিকে উন্নতির শেখরদেশে আরূঢ় করাইয়া অনায়াসে ইহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।"

["Knowledge, which like heat, pervades with difficulty the mass beneath, has in the progress of ages penetrated into the cottage; and the man who knows how to discover it in the simple language of nature, even though it be unaccompanied by pedantic commonplace or technical obscurity, will be astonished at its universality and profundity without its possessor being conscious either of its rarity or its value. He will hear the most profound desertations on human life and actions from the mouth of the almost naked peasant. He will discover a knowledge of character in the lowest of his menial servants, that would not dishonour the most acute penetration and accurate observation. He will behold in his progress through the country, the most delicate arts pursued in the open air and each affected by a simplicity of process that could only result from the felicitous contrivances of centuries upon centuries.

In his travels through the provinces it may be his fortune to see many splendid specimens of modern art. He may observe temples, mosques and obelisks that have scarcely lost the bloom of the artificer's hand: Works that in Europe would each have been the glory of its age, its country and its projector; the fame of which would have resounded

from one end of christendom to the other, and be consecrated in elaborate descriptions, commemorative of its proportions and its extension, its difficulties and its expense. These he may veiw with amazement ... he will be convinced that he is amongst the most surprising race of men that ever existed; among the descendants of those who wishing to proclaim to posterity the mighty things of which they were capable, and feeling the frail and perishable nature of the common records, conceived the bold design of cutting a memento of their skill and power in the living rock for ever.

There are those who would deny the possession of moral principles to the natives. Let such prejudiced and superficial observers bear in mind the moral dignity, the jealous sense of honour and the heroic fortitude of the native soldier; the singular fidelity and affection of the people in their plighted friendship for each other, through every extreme of good or evil; the devoted attachment of servants who are treated with any degree of kindness and consideration by their masters; the self-inflicted torments of the ascetic in the blind hope of making himself acceptable to his God; and to crown all, the matchless constancy and fearless indifference of death in the Indian widows, who voluntarily mount the funeral pyre in the expectation of accompanying her husband to a region of bliss. A people capable of these things are of no common character and nothing but the skill of the legislator is required to direct such steadfastness of principle to whatever can advance and perpetuate their happiness." (Pages viii, ix.)]

এদেশের চাষাদের হয়ত বর্ণজ্ঞান অনেকেরই ছিল না বা নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালে গ্রামে গ্রামে এত পাঠশালা ছিল যে, লঙ্ সাহেব তাঁহার ক্যাটালগে বিস্ময়ের সহিত প্রাচীন বঙ্গে লেখাপড়ার বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময় বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও বিষয়জ্ঞান তাহাদের এতটা ছিল এবং হয়ত এখনও আছে যাহাতে তাহারা শিক্ষিত রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এ সম্বন্ধে হটন সাহেব ও তৎসময়ের অপরাপর অনেক ইংরেজও ইঙ্গিত করিয়াছেন। পাঠক বর্ণজ্ঞানশূন্য বাঙ্গলার চাষাকে ভিল, সাঁওতাল বা কুকী মনে করিবেন না। বাঙ্গলার চাষা সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীর অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতগুলির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঋষির আশ্রম হইতে উপনিষদের উপদেশ শুনিয়াছে; পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইন্দ্রিয়সংযম, নীতিসূত্র ও ত্যাগসম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। নব ব্রাহ্মণ্য তাহাদিগকে ভক্তির বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনগণ, কথক ও বাউল-দরবেশের প্রসাদে, তাহারা ভক্তি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের নানা সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়াছে। অন্য দেশে জনসাধারণ ভাগবত জ্ঞান-সম্বন্ধে অজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যে চিন্তা করেন, জনসাধারণকে তাহা তাঁহারা বিলাইতে জানেন

না। ইলিয়াড কাব্য হইতে টেনিসনের গীতি পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষিতের পাঠাগারের সমস্ত দ্রব্যই জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিলাতের কয়জন চাষা সেক্সপীয়রের নাটক বা চসারের কাব্যের কথা জানে? কিন্তু এদেশের কোন্ চাষা—মুসলমান চাষাকে বাদ দিয়া বলিতেছি না,—রামায়ণ, মহাভারতের কথা জানে না? ৫০০ বৎসরের কৃত্তিবাস, বহু প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল, এমন কি শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, মহীপালের গান, চণ্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর গান—এই চাষারাই জিয়াইয়া রাখিয়াছে। বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও পদাবলীর অপূর্ব্ব সম্পদ্ ও পালাগানের আশ্চর্য্য কবিত্বের ভাণ্ডারের চাবি ইহাদেরই কাছে। ডাক ও খনার বচন ইহাদেরই কণ্ঠে, কবিকঙ্কণের চরিত্র-বিশ্লেষণের এবং মহাজনের পদ-কীর্ত্তনের আসর ইহারাই জমাইয়া রাখিয়াছে। বঙ্গের যাহা কিছু প্রেম ও জ্ঞানের গরিমা—নিরক্ষর চাষীরাই তাহার মালিক। ইংরেজী বিদ্যার প্রচলন অবধি যে জ্ঞানের ধারাবাহিকত্ব এতকাল আপামর সাধারণের মধ্যে (বর্ণজ্ঞান থাকুক বা না থাকুক) চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার গতি থামিয়া গিয়াছে।

এই জন্যই বাঙ্গলার চাষা যাহা জানে বা বলে তাহা শুনিয়া বিদেশীরা স্তব্ধ হইয়া যায়, হটন সাহেবের উক্তি কিছুমাত্র অতিবাদ নহে। বাঙ্গলার চাষা কত বিপ্লবের মধ্যে বাস করিয়াছে,—দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচার, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী এ সকল তো তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তবু ক্ষেতে দাঁড়াইয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবের কথাই তাহার বেশী মনে পড়ে। ইংরেজ কবির আর্ত্তনাদ—I am acquainted with sad misery as the galley-slave is with his oar. [শৃঙ্খলিত জাহাজের ক্রীতদাস যেরূপ জাহাজের দাঁড়কে চিনে, (তাহা হইতে তাহার মুক্তি নাই, সারাদিন সেই দাঁড় টানিতেই হইবে) দুঃখের সহিত আমি তেমনই পরিচিত' (John Webester)] কিন্তু আমাদের চাষা দুঃখকে সর্ব্বাঙ্গে বহন করিয়া অবাস্তবের স্বপ্ন দেখে। বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুর প্রেমশাস্ত্রের তত্ত্ব তাহাকে যে ঊর্দ্ধলোকে স্থাপিত করিয়াছে সে আসন টলায় কে? তাহাদের জন্য রামপ্রসাদাদি কবি তাহাদের মনের কথাগুলি ছন্দে বাঁধিয়া দিয়াছেন। ঘাস নিড়াইতে নিড়াইতে, লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে সে তাহাই গাহিয়া শান্তি লাভ করে—"মনরে কৃষিকাজ জান না—এমন মানব জীবন রইল পড়ে, আবাদ কর্লে ফলতো সোনা।" কলু ঘানি চালাইতে চালাইতে গাহে—"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের মত, ভবের গাছে বেঁধে দিয়া মা, পাক দিতেছে অবিরত—কি দোষ করিলে আমার ছটা রিপুর অনুগত।" দুর্য্যোগ, ঝড় তুফানে পড়িয়া যখন তাহার তরীখানি ডুবু ডুবু—তখনও সে বাহিরের বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার জীবনতরণীর কথা স্মরণ করে—"কাল সমুদ্র দেখে আমার একা যেতে ভয় করে—গুরু আমায় ফেলে যেও নারে!" কিংবা তাহার জীবনতরীর একমাত্র কর্ণধারের কাছে কাঁদিয়া বলে, "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে—আমি আর বাইতে পারি না। জীবন ভরে বাইলাম বৈঠারে, তরী—ভাটার সময় আর উজায় না।" দিন-মজুর কুয়ো খুঁড়িতে খুঁড়িতে গায়—"দোষ কারু নয়গো মা—আমি স্বখাত সলিলে

ডুবে মরি জ্বামা। ষড়্‌রিপু হল কুন্দগুস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।” ঘরে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে চাষা গায়—“ভবের আশা খেলব পাশা বড় আশা মনে ছিল।”

এরূপ শত শত উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে বাঙ্গলার চাষা মাটিতে বাস করিয়াও প্রকৃত পক্ষে অবাস্তব রাজ্যের অধিবাসী। সে জমিদার কি মহাজন—বা অদৃষ্টের ভৃত্য নহে, সে বুদ্ধ ও জৈন গুরুদের শিষ্য। একটুখানি বর্ণজ্ঞান দিয়া ইহাকে উন্নত করা এবং আকবরকে নাম সই করিতে শিখাইয়া শ্রেষ্ঠতর করিবার বাহাদুরী লওয়া—উভয়ই তুল্যরূপ। বাঙ্গালী চাষা প্রশ্ন করে—“দীপ নিবিলে, আলো কোথা যায়? সুর থামিলে শব্দ কোথায় যায়?” (গোরক্ষবিজয়।) এইরূপ দার্শনিক প্রশ্ন কোন্ দেশের চাষা করিতে পারে? অন্য দেশের গ্রাম্য কবিতায়—বেদনার গভীরতা, জীবনের উপভোগ, স্বাভাবিক কবিত্ব আছে, কিন্তু বাঙ্গলা পল্লীগাথায় প্রেমের যে তপস্যা আছে,—জগতের আর কোথায়ও সেরূপ সাধনা আছে কিনা তাহা জানি না। পল্লীগাথাগুলিতে সেই আশ্চর্য্য তপস্যার কথা পড়িয়া নিতান্ত বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠকও বাঙ্গলার চাষার প্রতি সশ্রদ্ধ হইবেন। এদেশের কবি অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিজ জন। বাঙ্গলার গ্রাম্য কবির গাথা পড়িয়া এজন্য তাহাদের সৃষ্ট নায়িকাদিগকে চিত্রবিদ্যাবিশারদ মিসেস হেগ, সেক্সপীয়র ও রেইনীর নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; রোমা রোঁলা পল্লীগাথায় অপূর্ব্ব কাব্যশিল্পের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং উইলিয়াম রথনষ্টাইন তাহাদের মধ্যে অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত রমণীমূর্ত্তিদিগকে জীবন্ত পাইয়াছেন। জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব যদি চাষারা বৌদ্ধ-শ্রমণের নিকট পাইয়া থাকে,—হিন্দু ব্রাহ্মণের নিকট তাহারা ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছে। সংসারের দুঃখ সে মায়ের হাতের 'মার ধ'র' মনে করিয়া সেই মাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—'বারে বারে যত দুখ দিয়াছ, দিতেছ তারা, সে কেবল দয়া, তব জেনেছি মা দুখহরা।' ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে সে যে গান গায়, তাহার মর্ম্ম ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন্ দেশের চাষা বুঝিবে? বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্ধ্যাভাষায় বিরচিত লাল শশীর যে গানগুলি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলির মর্ম্মার্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটি যে খুব উচ্চ অঙ্গের ভাবরাজ্যের কথা ও অবাস্তব তত্ত্বের সম্পদ্ তাহা সেগুলি পড়িলে পাঠকমাত্রেই ইঙ্গিতে বুঝিবেন।

বণিক্‌দের কথা।

বাঙ্গলার বণিকেরা যে ক্রমশঃ অর্থগৃধ্নু ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমরা ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যগুলিতেই দেখিতে পাই। পল্লী-গীতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়—মগ ও মুসলমানদিগের মত হিন্দু ললনাদিগকে নদীর ঘাট হইতে বণিকেরাও হঠাৎ তুলিয়া লইয়া চম্পট দিতেছে। রূপকথায় শৈশবে আমরা শুনিয়াছি—সদাগরেরা স্নানার্থিনী সুন্দরী রমণী পাইলে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইত। চট্টগ্রামের মধাই বণিকের চিত্র 'মহিষাল-বন্ধু' নামক গীতিকায়, ভেলুয়া গীতির ভোলা বণিকের চিত্রে, এবং মহুয়া-গীতির বিলাসী বণিকের চরিত্রে ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা কাব্য-কথায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বণিকেরা পরস্বাপহারী এবং অর্থলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয় সাধারণ কাচ কি প্রস্তরখণ্ড ইহারা সময়ে সময়ে

মহামানিক্য বলিয়া সরলপ্রকৃতি গ্রাম্য লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে (Folk Literature of Bengal দ্রষ্টব্য)। কবিকঙ্কণ মুরারি শীলের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা একান্ত ধূর্ত্ত, সদসদ্‌জ্ঞানবর্জ্জিত ঠক বণিকের। সমাজে বহু মুরারি শীল না থাকিলে হয়ত কবি কাল্পনিক মুরারি শীলের এরূপ জীবন্ত চিত্র আঁকিতে পারিতেন না। বঙ্গ দেশের বিপুল বাণিজ্য যে নষ্ট হইয়া গেল তাহা দুর্নীতির ফল বলিয়াই মনে হয়। যে পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীর লোক সুনীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক থাকে, ততদিন তাহাদের পতন হয় না। এক সময়ে বাঙ্গালী বণিকের নাম ছিল "সাধু"। এই 'সাধু'শব্দের অপভ্রংশ 'সাউ' (শাহা, সাহু)। নৈতিক জগতেও এই সাধুদের চরিত্র-ভ্রংশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

জাহাজ-নির্ম্মাণ।

বঙ্গদেশের বিস্তৃত বাণিজ্য-সম্বন্ধে উল্লেখ অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি ও গীতিকায় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে জাহাজগুলির আকার ও আয়তনাদিসম্বন্ধে অনেক পুস্তকে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বংশীদাসের (১৫৭৫ খৃঃ) মনসামঙ্গলে জাহাজ-নির্ম্মাণের একটা উৎসাহিত বিবরণ আছে। কবিকঙ্কণের তদ্রূপ বর্ণনায় অত্যধিক অতিরঞ্জন প্রবেশ করিয়াছে। জাহাজগুলি এক যুগে খুব বৃহৎ হইত, সেই সংস্কার অতিরঞ্জিত করিয়া কবিরা যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অশ্রদ্ধেয়। "কোষা" নামক ডিঙ্গির উল্লেখ পল্লী-গাথার অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ইশা খাঁর গীতিতে এই কোষার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে। এখনও ঢাকা অঞ্চলে "কোষ" নৌকার ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাহাজগুলির মধ্যে যেটিতে স্বয়ং সদাগর থাকিতেন এবং যাহা বিশেষ সুসজ্জিত হইত, তাহা 'মধুকর' নামে অভিহিত হইত। আমরা কাব্যগুলিতে জাহাজের বহু নাম পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, যথা—"রাজবল্লভ," "রাজহংস," "সমুদ্রফেনা," "শঙ্খচূড়," "উদয়তারা," "গঙ্গাপ্রসাদ," "দুর্গাবর"। কোন কোন নাম প্রাকৃত-যুগের, যথা—"গুয়ারেখী," "টিয়াঠুটি," "ভাড়ার-পটুয়া," "বিজু হুজু" (বিজয় গুপ্ত)। ইহারা পুরাকালে যে খুব বৃহদাকৃতি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের অতিরঞ্জনের মূলে কিছু না কিছু সত্য আছে। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় যুগযুগান্ত পরে যে সকল সংস্কার ছিল, তাহা ক্রমশঃ পাড়াগেঁয়ে কবিরা বাড়াইয়া অশ্রদ্ধেয় করিয়া ফেলিয়াছেন। চাঁদ সদাগরের একটি জাহাজের মাস্তল এত উঁচু ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার উপর উঠিলে বাঙ্গলা দেশ হইতে রাবণের লঙ্কা দেখা যাইত। কোন কোন বৃহৎ জাহাজে চাঁদ সদাগর হাট বসাইতেন; তামিলদেশীয়া নর্ত্তকীরা কোন কোনটিতে নৃত্য করিত। এই জাহাজের বহর এত বড়—দীর্ঘ ছিল যে, একদিকের নৌকায় যখন রৌদ্র খেলিত, সেই সময়েই অপরদিকের নৌকার উপর বৃষ্টি হইত ("তার পিছু বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়-তারা। অনেক নায় ঝড়_বৃষ্টি অনেক নায় খরা।"—বিজয় গুপ্ত। কোন কোন জাহাজে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ থাকিত। চাঁদ সদাগরের কোন ডিঙ্গা এত বড় ছিল যে তাহা ৮০ গজ জল ভাঙ্গিয়া যাইত। কোন জাহাজ এত বড় ছিল যে তাহা একদিকে ঠেকিলে নদীর পাড় ধ্বসিয়া পড়িত ও নিম্ন ভূমিতে আটকাইয়া যাইত, তখন তাহাকে চালাইবার

জন্য ছাগ-মহিষ বলি দিয়া কালী মায়ের তুষ্টি সাধন করিতে হইত। এই সকল আজগুবী বর্ণনার কতকগুলি অতিরঞ্জিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা চাঁদ সদাগরের অতুলনীয় বাণিজ্য, তরণী, নৌবল এবং বিপুল বৈভবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তখন রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্রের মর্য্যাদা প্রায় তুল্য ছিল। চাঁদ সদাগর রাজদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাজা এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বণিকেরা রাজার মতনই সম্মানিত। রূপকথা গুলিতে দৃষ্ট হয়, রাজপুত্র ও সওদাগরের পুত্রের মর্য্যাদা প্রায় তুল্য। সেই সকল বণিক্-রাজের দেশে আজকাল জেলেরাও চারটি ভাত পায় না। সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর ছিল। এখানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত। সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে সরস্বতী নদী হইতে বণিকেরা "মিঠা পানি" তুলিয়া লইত। ঐ নদী শুকাইয়া যাওয়ার পর সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য লুপ্ত হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। পল্লীগাথায় যে সকল বাণিজ্য-তরণীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে অতিরঞ্জন অতি অল্প। চট্টগ্রামে নির্ম্মিত জাহাজে চড়িয়া বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্কা, লঙ্কাদ্বীপ, মাটাবান প্রভৃতি দেশে যাইতেন। "নিলঙ্কা" শব্দ বোধ হয় লঙ্কাদ্বীপকে, "প্রলম্ব" প্রথনমকে ও "আবর্ত্তনা" মাটাবানকে বুঝাইতেছে। "নাকুট," "অহীলঙ্কা," "চন্দ্রসালা" প্রভৃতি যে সকল দেশের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহারা খুব সম্ভব ভারত-সাগরের কোন কোন দ্বীপ। চট্টগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের এই দুই বন্দর বিশ্ববিশ্রুত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীরবাসী "বালামী" নামক এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নির্ম্মাণ করিত। এখনও বালামীদের বংশধরেরা ছোট ছোট জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। "বালামী নৌকা" ইহাদের নামানুসারে পরিচিত। চীন পরিব্রাজক মাহুদের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—একদা তুরস্কের সুলতান আলেকজাণ্ডি য়ার জাহাজ-নির্ম্মাণপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন। আরবী লেখক ইদ্রিস দ্বাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি সে দেশের নাম করিয়াছেন "কর্ণবুল"— এইশব্দ 'কর্ণফুল' শব্দের অপভ্রংশ। ১৪০৫ খৃঃ অব্দে চীন দেশের মন্ত্রী চেং হো বাণিজ্য-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের সমাধানার্থ স্বয়ং চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পর্য্যটক ইবনবতাতু চট্টগ্রামের জাহাজে চড়িয়া জাবা এবং চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগিজ নাম্নু ডি চোনা (গোয়ার শাসনকর্ত্তা) তাঁহার সেনাপতি দি মান্নাকে চট্টগ্রামে তাঁহাদের একটা বাণিজ্য-কেন্দ্রস্থাপনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় নব-উদ্ভাবিত যন্ত্র-চালিত জাহাজের প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামের এই বিপুল জাহাজ-নির্ম্মাণ কারবারটি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হতশ্রী হইয়া পড়িল। চট্টগ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক জাহাজের মালিকদের নাম লোকে বলিয়া থাকে—তাঁহারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেন। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে তাঁহারা জীবিত ছিলেন—রঙ্গ, বসির, ওমানি মালুম, মদন কেরানি, দাতারাম চৌধুরী প্রভৃতি জাহাজাধ্যক্ষদের কোন কোন জনের শতাধিক জাহাজ ছিল। ইহারা হার্ম্মাদদিগের অত্যাচারের সময়ে বৃহৎ নৌসজ্জা লইয়া অগ্রসর হইতেন। এই শ্রেণীবদ্ধ জাহাজ-

গুলিকে 'গ্র্পবহর' বলা হইত। যিনি হার্ম্মাদদিগকে দমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন, তাঁহাকে "বহরদার" বলা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ জীবিত ছিলেন; পিরু সদাগর, নসুমালুম, রামমোহন দারোগা প্রভৃতির নাম এখনও শোনা যায়। রামমোহন দারোগার জাহাজ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া স্কটলণ্ডের টুইড বন্দরে গিয়াছিল। চট্টগ্রাম-নির্ম্মিত কতকগুলি জাহাজের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিব :—

১। বালাম নৌকা—ইহা পূর্ব্বে খুব বড় হইত, এখন আর তত বড় হয় না। সাধারণতঃ ইহারা ১৬ দাঁড়ে, পাল উড়াইয়া চলে। ইহাদের মধ্যে বড় গুলি ২০০ এমন কি ২৫০ টন ধান্য বোঝাই লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫০ টনের অধিক মাল লইয়া ইহাদিগকে সমুদ্র-পথে যাইতে দেওয়া হয় না। এই ক্ষিপ্রগামী বালাম নৌকা যন্ত্রাদির সাহায্য বিনাও অনায়াসে ভারত-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কাটিয়া চলিয়া যায়। এক সময়ে ইহারা অতি প্রকাণ্ড হইত।

২। গোধা নৌকা—ইহাও অতি প্রাচীন। এই নৌকাগুলি সচরাচর অতি দীর্ঘ হয়। ইহারা সাধারণতঃ শুঁটকি মাছের কারবারের জন্ত ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে ইহারা সমুদ্র-পথে সোনাদিয়া, লালদিয়া, রাঙ্গাবালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মৎস্তের কারবার উপলক্ষে যাতায়াত করে। এই নৌকাগুলি লৌহের পেরেক দিয়া আটকান হয় না। "গল্লক" নামক বেত দিয়া নৌকার বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়, এবং সেই বেতের অবকাশে "শ্যামা" গুলি (ছিদ্র) দড়ি, তুলা, ধুনা প্রভৃতির দ্বারা এমন শক্ত করিয়া আটকান হয় যে, তাহাতে জলপ্রবেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গোধা নৌকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ খুলিয়া রাখা হয়। বর্ষাকালে সেগুলি জোড়া দিয়া নৌকা সমুদ্রযাত্রার জন্ত প্রস্তুত করা হয়; ইহাদের গলুই হাঙ্গরমুখো করা হয়। যখন বর্ষাকালে সমুদ্রপথ পর্য্যটন করিয়া বিপুল মৎস্তের পশার লইয়া শত শত গোধা নৌকা কর্ণফুলী নদীতে আসিয়া নঙ্গর করে, তখন সেই মৎস্তব্যবসায়ীদের আত্মীয়স্বজন দামামা, দগড় ও ঢোল পিটিয়া ও বাঁশী বাজাইয়া তাহাদিগকে যেরূপ অভিনন্দন করে, তাহা একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

৩। গ্র্প নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, পর্ত্তুগীজ প্রভাবে কতকটা রূপান্তরিত হইয়া ঐ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে।

৪। সারেঙ্গা নৌকা—কতকটা ডোঙ্গা বা সালতির মত। এগুলি সমুদ্রে যাইতে সাহসী হয় না; একটি বড় গাছ কুঁদিয়া নির্ম্মিত হয়।

৫। সাম্পান—অনেকটা হাঁসের মত আকৃতি, ইহা চীনা নৌকার ধরণে প্রস্তুত।

৬। কোন্দা—চট্টগ্রামের অরণ্যসমূহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কুঁদিয়া এই শ্রেণীর নৌকা তৈরী হয়। ইহা বহু মাল লইয়া যাতায়াত করে, মাঝিরা ইহা লগি দিয়া ঠেলিয়া চালাইয়া থাকে।

এখন চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা যন্ত্রচালিত জাহাজনির্ম্মাণ শিক্ষা করিতেছে। মিঃ উইলিয়ামস্ এবং লেফট্‌ন্যাণ্ট উইলসনের উৎসাহে ইহারা এই বিষয় শিখিয়াছে। উইলসন বাঙ্গালীদের হাতের কাজ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা জাহাজ-নির্ম্মাণে সুদুর্লভ কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

অধুনা মাধব, কালীকুমার ও দ্বারকানাথ জাহাজ-নির্ম্মাণে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমাদের স্বদেশী নেতাদের ইহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, দুঃখের বিষয় ইহাদের নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানেন না।

পল্লী-গীতিকা-সাহিত্যে "নসর মালুম" নামক গাথায় (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১-৪৪ পৃঃ) জাহাজ ও সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মালুমেরা সমুদ্রপথের সমস্ত বিষয় অবগত হইতেন, তাঁহারা দীর্ঘ পর্য্যটনের প্রাক্কালে মানচিত্র আঁকিয়া লইতেন এবং নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেন। সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রামে অভিযান-প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের ডিঙ্গিগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কৌতুকাবহ (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা দ্রষ্টব্য)।

জাহাজের অংশগুলির যে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে তাহার কয়েকটি এখানে দিতেছি:—বাক (Rib), কাহন (floor), ইরাক (keel), শুকানকিলা (keelson), শুদস্তা (stern post), রাদ (stem), মাস্তল (mast), মাস্তলের চালুতা (rake of the mast), ইস্কা (batten)। "ধুরন্নেহা ও কবর" নামক গাথায় (পূঃ গীঃ, ৪র্থ খণ্ড, ৯৩-১৩০ পৃঃ) নৌ-সৈন্য লইয়া জাহাজের বহর কি ভাবে যুদ্ধ করিতে যাইত, তাহার একটা উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমানেরা কোরানবাহী জাহাজকে অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধের অভিযান করিতেন। কোরানের পশ্চাতে ধর্ম্মপ্রচারের অন্তবিধ উপকরণ, যথা—গোলা, গুলি, কামান প্রভৃতি জাহাজে বোঝাই থাকিত। প্রাচীন হিন্দু বানিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা ৪৭০-৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

গৃহ-নির্ম্মাণাদিসম্বন্ধে অনেক কথা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। কোন কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের ডাক ও খনা এ বিষয়ে নীরব নহেন, তাঁহাদের সূত্র বাঙ্গলার কৃষকগণের মুখে মুখে—"পূবে হাঁস (পূর্ব্বদিকে জলাশয়—তথায় হংস বিচরণ করিবে), উত্তরে বাঁশ, পশ্চিম ঘিরে, দক্ষিণ ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে।"

গৃহ-নির্ম্মাণ।

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে তারাপতি নামক কর্ম্মকাররাজের যে লৌহ-গৃহ-নির্ম্মাণের বর্ণনা আছে, তাহা পড়িলে কিরূপ সমারোহের সহিত পুরাকালে আমাদের হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইত তাহার একটা আভাস চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই স্থপতিরা হয়ত ভিন্ন দেশাগত ছিল, নতুবা সূত্রধর ও লৌহকর্ম্মকারদের জল অনাচরণীয় রহিয়া গেল কেন? ইহারা কোনরূপ নোংরা কাজ করে না, তথাপি ইহাদের জন্য পতিতের ব্যবস্থা কেন? বংশীদাসের বর্ণনায় স্থপতিশ্রেষ্ঠ তারাপতির রূপবর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে এইজাতীয় লোক যে ভিন্ন দেশবাসী, তাহার একটা সংস্কার কবির মনে ছিল। তারাপতি অবশ্য কল্পিত চরিত্র, কিন্তু এই চরিত্র যে শ্রেণী-নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা ঐতিহাসিক।

"তারাপতি কর্ম্মকার সকলের প্রধান।
অধিক গুণ তার জানে সর্ব্বকাম॥
দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা, মাথায় ঝাটা চুল।
ডান হাতে হাতুর বাম হাতেতে তুল॥

পিঙ্গল মাথার চুল বেকা কাকলী।
নাকে মুখে চক্ষুতে লাগিয়াছে কালী॥"

ইহার পর হাজার হাজার কামার একত্র হইয়া "সাড়ে সাত গজ," "নয় গজ দীর্ঘে" এবং "উচ্চে নয় গজ" লৌহের ঘরখানি কি ভাবে গড়িয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

বঙ্গে যে সকল কুটিরশিল্পের চর্চ্চা হইত, তাহার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বাণিজ্যের জন্ম বঙ্গের বস্ত্রশিল্প জগতের সর্ব্বত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার মসলিনের কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বঙ্গদেশের বাণিজ্যশিল্পের মধ্যে "শঙ্খশিল্প" একটি প্রধান, ঢাকা নগরী তাহারও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

শঙ্খের কারবারটা প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যেই ছিল। শঙ্খ-শিল্পিগণ তথায় 'পারওয়া' নামে অভিহিত হইত। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের অনেক শাঁখার কাজ তামিল দেশের প্রাচীন রাজধানী কোরকাই এবং কায়েলের ভগ্নস্তূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ভাবে তথায় শঙ্খ কাটা এবং কারুকার্য্যমণ্ডিত হইত, তাহাতে বুঝা যায় এই শিল্পীদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক ঢাকার শাঁখারীদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের মতই ছিল। মালিক কাফুর কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে টিনিভেলি জেলায় হিন্দু-রাজধানীধ্বংসের পর এই শিল্পিগণ বঙ্গদেশে ঢাকায় আগমন করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত জে. হোরনেল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালের মেময়রের (memoir) ৪১১ পৃষ্ঠায় যে মত অত্যন্ত দ্বিধার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু ঢাকার এই শিল্প যে এত আধুনিক তাহা মনে হয় না। হাতের শাঁখা বাঙ্গলা গৃহস্থ রমণী বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহার করিতেন এবং সেই শাঁখা যে দূরদেশবাসী শিল্পিরা প্রস্তুত করিয়া দিত, এমন মনে হয় না। শিবের প্রাচীন ছড়ায় বাঙ্গালী কবিরা দেবাদিদেবকে শাঁখারী সাজাইয়া গৌরীর সঙ্গে তাঁহার দাম্পত্য-কলহের পরিকল্পনা করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকেরাই শঙ্খকে অতি পবিত্র সামগ্রী বলিয়া মনে করিতেন; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ে এতদ্দেশীয় মেয়েরা যে শাঁখা পরিতেন, তাহা দাক্ষিণাত্য হইতে আমদানী হইত বলিয়া মনে হয় না; "শঙ্খ কর চুর, বসন করহ দূর—তোড়হ গজমতি হাররে"—বিদ্যাপতির এই কবিতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর। পুরাকালে অবশ্য মহীশূর, বেলেরি, হায়দ্রাবাদ, অনন্তপুর, কর্ণাল, কাথিওয়ার, কুষ্ণা, গুজরাট প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে শাঁখার কাজ হইত। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ঢাকাও এই শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ট্যাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিয়াছেন ঢাকা ও পাবনা (অনুবাদক ভুল করিয়া পাবনাকে পাটনা করিয়াছেন,—এ. সো. মেময়ার, ৪২৫ পৃঃ) এই দুই নগরীতে অন্যূন ২০০০ শাঁখারী ছিল। বাঙ্গলায় ঢাকা, নবদ্বীপ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে শাঁখার কারবার চলিতেছে। এই ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বে সকলেই হিন্দু ছিল, কিন্তু এখন দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানেরা এই ব্যবসায়টা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। তথাপি মোটামুটি ধরিলে হিন্দু শিল্পীর সংখ্যাই সমধিক। ঢাকার শাঁখারীবাজারে যে সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাস করেন, তাঁহাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলা যায় না। তাঁহাদের মেয়েদের বর্ণ এত ফরসা ও মুখের গড়ন এরূপ যে, তাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলাদেশের লোক বলিয়া মনে হইত না। তাঁহারা যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকটা বিদেশী ভাষার মত, কলহের সময়ে তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা কিছুতেই বাঙ্গলা বলিয়া মনে হইত না। আমি অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহারা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছেন, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বেও স্বীয় শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া বহির্জ্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। ইঁহারা তখন অতি ক্ষুদ্র গুহার ন্যায় ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেই সকল বাড়ী ত্রিতল-চৌতল হইত,— এক একখানি রথের মত দেখাইত। ঢাকার শাঁখারীবাজার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের নিজস্ব ছিল—অতি সঙ্কীর্ণ ৩০০ গজ পরিমিত রাস্তার দুই ধারে দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতল ছোট ছোট ঘরগুলি; শাঁখারীদের, বিশেষ তাঁহাদের মেয়েদের অতিশয় ধবধবে শ্বেতবর্ণ; শাঁখ কাটিবার একরূপ অদ্ভুত লৌহের করাত এবং অপরাপর যন্ত্র, শাঁখ কাটার সেই একঘেয়ে শব্দ, যাহা লইয়া তামিল কবি তাঁহার সমালোচককে খৃঃ পূঃ কোন এক শতাব্দীতে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, এই সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ঢাকার শাঁখারী সম্প্রদায়—বহুযুগ যাবৎ ঢাকা কোতয়ালীর নিকটে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তখন একটি করিয়া কূপ ছিল; সেই কূপে স্নান এবং সেই গৃহে আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক দিনরাত তাঁহারা শাঁখা তৈরী করিতেন—তাঁহারা কদাচিৎ বাহিরে যাইতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদিও বুড়ীগঙ্গার ঘাট তাঁহাদের গৃহ হইতে অর্দ্ধ মাইল মাত্র দূরে, তথাপি অনেক অশীতিপর বৃদ্ধ বুড়ীগঙ্গার ঘাট কোথায় তাহা জানিতেন না। এ সকল প্রবাদ অবশ্যই অতিরঞ্জিত, কিন্তু ইহার মূলে এই সত্যটুকু নিহিত যে এই স্বীয়-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্টচিত্ত-সম্প্রদায় বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঢাকা জেলার দাসরা গ্রামে ইঁহাদের এক কেন্দ্র ছিল। ইঁহারা পূর্ব্বে অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিতে পারিতেন; রেখাগুলি এরূপ সূক্ষ্মভাবে টানিয়া যাইতেন ও তাহা গালা দিয়া এরূপ সুন্দরভাবে রঞ্জিত করিতেন যে, তখন শাখাগুলি অনাড়ম্বর হইয়াও একান্ত সুরুচি ও সংযত কলার নিদর্শন হইত। এখন নানারূপ কারুকার্য্য তাহাতে ঢুকিয়াছে সত্য, কিন্তু কাজগুলি আর সেরূপ যত্নের সহিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এখনকার শাঁখা বা; চুড়ি পূর্ব্বের মত সুচারুরূপে কর্ত্তিত হয় না, এখন বাহিরে নানারূপ চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত থাকে, কিন্তু ভিতরটা উঁচুনীচু ও খুব ভাল ভাবে কাটা হয় না। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ভাল শাঁখার পশ্চাদ্ভাগ নিখুঁতভাবে সমতল হইত।

হরনেল সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময় ঢাকার শাঁখার ব্যবসায়টার অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। বিলাতী বেলোয়ারী চুড়ি ও বিদেশী পাট্যারনের গহনার প্রতি অনুরাগের জন্য বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরা আর শাঁখার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতেন না; কিন্তু স্বদেশী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মেয়েরা আর বিলাতী চুড়ি পরেন না, আবার শাঁখার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়াছে; এজন্য আবার এই শিল্প জাগিয়া উঠিয়াছে।

১৯০৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কলিকাতায় শঙ্খের আমদানীর নিম্নলিখিত ফর্দ্দ হরনেল সাহেবের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে :—

	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯	১৯০৯-১০
সিংহল হইতে					
	১৪৪৭৭২৲	১৮৯২৮০৲	৮৬৫১৫৲	১৮১২২৩৲	১৬৬০৬০৲
মাদ্রাজ হইতে					
	৩৩৭৫৫৲	৩৬০৫৭৲	৫৫৮৯৲	৫৫২৪১৲	৬৮০১৯৲
ত্রিবাঙ্কুর হইতে					
	১১৪৲	শূন্য	৫৯২৲	শূন্য	৫০০৲
বোম্বাই হইতে					
	৬৭৪৪৲	১৩৭৩০৲	৩৮২৩৲	২৩০৫৲	৪২৯৮৲
মোট	১৮৫৩৮৫৲	২৩৯০১৬৭৲	৯৬৫১৯৲	২৩৮৭৬৯৲	২৩৮৮৭৭৲

এই তালিকায় দৃষ্ট হয় শাঁখার চাহিদা এদেশে বাড়িতেছে। ইহা একটু শুভ লক্ষণ। দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী এই বিশ বৎসরে ব্যবসায়টি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার হিসাব আমাদের কাছে নাই।

বর্ত্তমানকালে শাঁখার যে সকল কারুকার্য্য চলিতেছে তাহার নমুনা নিম্নে দিতেছি।

শ্রীহট্টে দেবালয়ে ব্যবহৃত শাঁখের উপর অতি সূক্ষ্ম হস্তে অনেক চিত্রাদি ক্ষোদিত হইত। তাহাতে কোন পৌরাণিক দেবলীলার চিত্র আঁকা হইত,—এখনও সেই দেবতাদের লীলার ক্ষোদিত সূক্ষ্মরেখায় সুন্দরভাবে অঙ্কিত চিত্রযুক্ত শাঁখ কোন কোন দেবালয়ে পাওয়া যায়। একটি চিত্র দেওয়া হইল। এখনকার দেবতারা নৈবেদ্য হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন, কে আর তাঁহাদের জন্য মন্দির ও পূজার উপকরণ সাজাইবে ?

কবি জসীম উদ্দীনের মারফৎ ঢাকা ৬৩নং শাঁখারীটোলাবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ধর শাঁখারী এবং তাঁহার পুত্র এবং আত্মীয়গণের নিকট হইতে অতীত ও বর্ত্তমানকালের ঢাকার শাঁখার কারবারের নিম্নলিখিত বিবরণ পাইয়াছি।

(১) যে যে স্থান হইতে শঙ্খ আমদানী হয় :—তিতুপুর (মাদ্রাজ), ঝাপ্না (কলম্বো) ইত্যাদি।

(২) শঙ্খের জাত :—তিতপুটী, রামেশ্বরী, ঝাঁজী, দোয়ানী, মতি-ছালামত, পাটী, গারবেশী, কাচ্চাম্বর, ধলা, ভেজাল, কেলাকর, জামাই পাটী, এলপাকার পাটী, নায়াখাদ, খগা, সুর্কীচোনা।

(৩) শঙ্খের দ্বারা কি কি তৈরী হয় :—শাঁখা, আতরদানী, মালা, এসট্রে, সেফ্‌টীপিন্, ঘড়ির চেন, আংটি, বোতাম, ক্রশ, ব্যাংগেল, ব্রেসলেট্, পো, রুমালদানী, জলশঙ্খ, বাজশঙ্খ।

(৪) শাঁখার নাম :—

প্রথম যুগ—গাড়া (২ গাছা হইতে ৪০ গাছা পর্য্যন্ত)।

মধ্য যুগ—সাতকাণা, পাঁচদানা, তিনদানা, বাচ্চাদার, সাদাবালা, আউলাকেশী।

বর্ত্তমান যুগ—সোণা বাঁধানো, টালী, লাইনমোড, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, মোড়ানো, সতীলক্ষ্মী, জালফাঁস, হাঁইসাদার, দানাদার, সাদাশাঁখা, শঙ্খবালা, আইপেটেরন, ইংলিশপ্যাচ, তেড়াশঙ্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা।

লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুক্তি, হাসিখুসী, দার্জিলিং, তারপেঁচ, জয়শঙ্খ, পাখুরহাটা, গোলাপ ফুল, মোটালতা, মাজ, মুড়িদার, আঙ্গুরপাতা, বেণী, উপবেণী, বাঁশগীর, গোলাপবালা, নাগরী বয়লা।

বঙ্গদেশ বস্ত্রবয়ন-শিল্পের জন্মভূমি। বসোরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন দেবদারু, বস্ত্রবয়নশিল্প তেমনই বঙ্গের নিজস্ব। এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

বস্ত্রবয়ন-শিল্প।

এদেশে এককালে চরকা মেয়েদের হাতের অপরিহার্য্য অস্ত্র ছিল, যেমন বিষ্ণুর হাতের সুদর্শন চক্র। এখন উহা মহাত্মা গান্ধীর হাতে উঠিয়াছে। চরকা কথাটা 'চক্র' কথারই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। উহার আকারটা কতকটা সুদর্শন চক্রেরই মত। পূর্ব্বকালে রাজার রাণী হইতে দীনতম কুটিরবাসিনী সকলেই চরকায় সূতা কাটিতেন। বাঙ্গলার ব্রত-কথার অনেকগুলিতেই চরকা দিয়া সূতা কাটার কথা আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সুসঙ্গদুর্গাপুরের রাণী একদারাজাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে কেমন ভালবাস ?" রাজা জানকীনাথ তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। রাণী কমলা মাথা হেলাইয়া বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পরে তুমি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলে, চিতায় মঠ দিলে, আমি তো আর তাহা দেখিতে আসিব না! আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তুমি কি করিতে পার, আমি দেখিতে চাই।" রাজা বলিলেন, "তুমি যা বলিবে তাই করিব।" রাণী বলিলেন, "বেশ, আমি সাত দিন সাত রাত ধরিয়া চরকায় 'এক টাকিয়া' সূতা কাটিব, সেই সূতা যতটা দীর্ঘ হইবে, সেই মাপে তুমি আমার জন্ম একটা দীঘি কাটাইয়া দিবে—তাহার নাম রাখিবে 'কমলা-সায়র'।" কমলা সায়রের কতকাংশ এখন সোমেশ্বর নদের গর্ভে, বাকী অংশ এখনও বিদ্যমান। সেই দীঘিসংক্রান্ত দুর্ঘটনা এবং রাজ্ঞী কমলা দেবীর

চরকাকাটা।

শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক পল্লীগীতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত, তাহাদের দুইটি আমি প্রকাশ করিয়াছি (পূঃ গীঃ, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)।

"চরকা আমার ভাতার পুত, চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে হাতী বাঁধা," প্রভৃতি অর্থ-বাচক প্রবচন এখনও পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মুখে মুখে শোনা যায়। মেয়েরা চরকার ভাবে এতটা অভিভূত ছিলেন যে, চাঁদের কলঙ্কটাকে "চাঁদের মা বুড়ী চরকা কাটিতেছে" এই ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদের বুঝাইতেন। চরকার সূতা এত সরু হইত যে এখনও তাহার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়; অথচ চরকার ব্যবহার তো এযুগে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখনও বিক্রমপুরের বামুণের মেয়েরা চরকার সূতায় এরূপ সূক্ষ্ম পৈতা তৈরী করেন যে, চার দণ্ডী পৈতার চার পাঁচটা একটা বড়-এলাচের খোসার মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া রাখা যায়। আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়িতাম, তখন আমার এক বিক্রমপুর-নিবাসী সহপাঠী বড়-এলাচের খোসার মধ্যে পুরিয়া তাঁহার মাতার হাতের কাটা চারিটি পৈতা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন; সেই চারিটি পৈতায় ২৪০ হাত সূতা ছিল। সেই সূতা মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম হইলেও বেশ শক্ত ছিল, আমি তাহা বহুদিন ব্যবহার করিয়াছিলাম।

একটি বড়-এলাচের খোলে ৪।৫টি পৈতা।

বাঙ্গলার চরকা ও বাঙ্গলার সূতা বাঙ্গলার গৃহগুলির এরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গীয় উপকর হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে কথাবার্ত্তা, উপমা দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই চরকা ও সূতার উত্থাপন করিত। এমন সকল ব্যাপারে সূতার উল্লেখ ও উপমা দেওয়া হইত, যাহা এখন অদ্ভুত ঠেকে; কিন্তু সেইভাবের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়, বাঙ্গলার সূতার কারবারটা কত প্রিয় ও বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। একটি প্রাচীন বৈষ্ণবগান এইরূপ :—

বাঙ্গলার সূতার ব্যবসায়।

"(সে হাটে) বিকায় নাকো অন্য সূতো।
বিনা তাঁতি নন্দের সুত॥
সে হাটের প্রধান তাঁতি, প্রজাপতি পশুপতি,
আর যত আছে তাঁতি—তাদের শুধু যাতায়াত॥"

কিন্তু পুরুষেরা চরকা কাটিতেন না—তাহা তাঁহাদের অপমানের বিষয় ছিল। গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে দেখাইয়াছি, যদি কোন সেনাপতি যুদ্ধে অক্ষমতা দেখাইতেন, তবে রাজা প্রায়ই তাঁহাকে অপমান করিয়া বলিতেন, "তোমার আর যুদ্ধে যাইয়া কাজ নাই, তোমাকে একখানি চরকা পাঠাইয়া দিব।" বঙ্গদেশে চরকার পাট উঠিয়া গেলেও আসামের মেয়েরা এখনও চরকা ছাড়েন নাই। তাঁহারা রেশমের উপর এখনও যেরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করেন, তাহা অতি সুন্দর। চাদরের উপর কন্ধা বড়ই শোভন হয়। বড় ঘরের মেয়েদের হাতের কাজ দেখাইয়া বরপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তবেই ভাল বিবাহ হয়। বাঙ্গলার মেয়েরা এখন বিলাতীর নকল করিয়া 'লেস' তৈরী করেন এবং যাহা কচিৎ ব্যবহারে লাগে তাহাই

রচনা করিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত হন। কিন্তু আসামের মেয়েরা ভাল রেশমে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া থাকেন।

কার্পাস দ্বারা বস্ত্রবয়ন ভারতবর্ষে যে কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে তাঁতিদের সূত্রের উল্লেখ আছে ("হে শতক্রতু, ছুঁচোগুলি যেরূপ তাঁতিদের সূতা খাইয়া ফেলে, দুশ্চিন্তা আমাকে তেমনই খাইয়া ফেলিতেছে—১০৫-৫৮)। এই শ্লোকের ইঙ্গিতার্থ—তাঁতিরা সেই প্রাচীন কালেও সূতায় মাড় দিত। খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকেরা ভারতীয় কার্পাসের কথা জানিতেন। ষ্টাটিটিয়াস (Statitius) কার্পাসকে "কার্বাসস" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। জে. ফর্বেস্ রয়েল (J. Forbes Royle, M. D., F. R. S.) তাঁহার "Early History of Cotton" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "গ্রীকেরা ঢাকার মস্‌লিনের কথা বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ইহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং 'গ্যাঙ্গোটিকা' নাম দিয়াছেন, যেহেতু ইহা গঙ্গার উপকূলে প্রস্তুত হইত (১২০ পৃঃ)।" বাঙ্গালী শিল্পী যে এ বিষয়ে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্লিনি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাক্তার উরে (Dr. Ure) এবং টেইলর পর্য্যন্ত বহু লেখক ঢাকার মস্‌লিনের অশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

প্লিনির সময় বাঙ্গলার মস্‌লিনের নাম ছিল "কার্পাসিয়াম"; এই শব্দটি সংস্কৃত 'কার্পাস' শব্দের অপভ্রংশ। অতীতকালের মস্‌লিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, ঢাকার অদূরবর্ত্তী ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত "কাপসিয়া" এখনও ঐ নামে পরিচিত।

বাইবেলে এই মস্‌লিনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (ইজেকিল, ১৪শ অধ্যায়, ১০, ১৩ এবং ইসিয়া, ৩য় অধ্যায়, ২৩)।

বিদেশী মত।

প্লিনি লিখিয়াছেন, "রোমের মেয়েরা মস্‌লিনের ভান করিয়া স্বীয় নগ্ন অবয়ব সাধারণের চক্ষের নিকট উপস্থিত করেন।"—"A dress under whose slight veil our women continue to show their shapes to the public."

ডাক্তার উরে বলিয়াছেন, "রোমের পূর্ণতম ঐশ্বর্য্যের যুগে ঢাকার মস্‌লিন তথাকার মহিলাদের সর্ব্বপ্রধান ও প্রিয় বিলাসের সামগ্রী ছিল (Cotton Manufacture of Great Britain by Dr. Ure)। ইয়েটস্ লিখিয়াছেন, ভারতীয় কার্পাস খৃষ্ট জন্মিবার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশের বাজারে প্রচলিত ছিল। (Tesitrium Antiquorum.)

৬০ হাত কাপড় হাতে রাখিলে টের পাওয়া যায় না।

জুভিনেলের পুস্তকেও মস্‌লিনের প্রশংসাসূচক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্লিনির লেখাতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশের ঢাকানগরীই এই বস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রভূমি ছিল। সমস্ত জগতে সুপ্রাচীন কাল হইতে ইহার ব্যবহার ও আদর হইত। "একদিকে চীন, অপর দিকে তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এবং পারস্যদেশের সহিত এই বাণিজ্য চলিত; ইহার কিছুদিন পরে প্রভেন্স, ইটালী, ল্যাংগুই ডক এবং স্পেন দেশেও ঢাকার মস্‌লিন প্রেরিত হইত (১৩২০,

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ঢাকার মস্‌লিন শীর্ষক প্রবন্ধ—আবদুল আলি)। ইজিপ্টের সুবিখ্যাত রাজা এ্যাণ্টোনিও তাঁহার সৈন্যদিগকে "কার্বাসাস" বস্ত্র উপহার দিতেন। ট্রেভারনিয়ার লিখিয়াছেন, মহম্মদ আলিবেগ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যদেশে ফিরিয়া রাজা চাসেফিকে একটি মূল্যবান্ প্রস্তর-খচিত বৃহৎ ডিম্বের মত শুভ্র নারিকেল উপহার দেন, ইহার মধ্যে ৬০ হাত দীর্ঘ একখানি মস্‌লিন কাপড় ছিল; উহা এত পাৎলা যে হাতে রাখিলে আদৌ কোন জিনিষ হাতে আছে বলিয়াই মনে হইত না।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এরিয়ান ঢাকার মস্‌লিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, (Periplus of the Erythrean Sea)। নবম শতাব্দীতে দুইজন চীন পর্য্যটক ভারতবর্ষের বিবরণ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন (Account of India and China by Two Mahammedan Travellers)। এই পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন আবির ডিও ইছারাং। টেলার সাহেব তাঁহার 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' গ্রন্থে (১৬৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"উক্ত দুই মুসলমান লেখকের মতে ঢাকার লোকেরা এমন চমৎকার কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করে যে জগতের অন্যত্র তাহার তুলনা হইতে পারে না। গোল আধারে এই বস্ত্রগুলি রক্ষিত হয় এবং ইহার একখানি এত সূক্ষ্ম যে একটি অঙ্গুরীয়কের রন্ধ্রপথে সমস্ত কাপড়খানি টানিয়া আনা যায়।" প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন "৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ বস্ত্রশিল্পে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন" (Introduction to Rigvada Samhita)। কুলভা নামক একখানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে Gteing Dgahmo নাম্নী একজন ধর্ম্ম-যাজিকা মস্‌লিন পরিয়া বাহির হইছিলেন বলিয়া তিনি উলঙ্গ হওয়ার অপরাধে অভিযুক্তা হইয়া অপমানিতা হইয়াছিলেন। গ্রীসের লেখকগণ প্রাচীনকালে তথাকার তরুণ ও তরুণীদের এইরূপ বস্ত্র ব্যবহারের নির্লজ্জতার জন্য তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। টেলর য়ুরোপীয় প্রাচীন লেখকদের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহাদের মতে "ঢাকার মস্‌লিন মানুষের হাতের তৈরী নহে—উহা পরীদের হাতের কাজ" (১৬৩ পৃঃ)। একদা মস্‌লিন-পরিহিতা রাজকুমারী জেবউন্নিসাকে দেখিয়া তাঁহার পিতা আরঙ্গেব উলঙ্গ মনে করিয়া ভর্ৎসনা করাতে কুমারী বলিয়াছিলেন, "আমি কাপড়খানি সাতবার ঘুরাইয়া পরিয়াছি।"—এই সাড়ীখানি ২০ গজ লম্বা ছিল, ইহার ওজন প্রায় ১০ আউন্স (Bolt's Consideration on the Affairs of India, p. 206)। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এইরূপ বস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার সহচরীরা মস্‌লিন পরিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। মোগল সম্রাট্‌গণ এই মস্‌লিন বস্ত্রের প্রচার সম্বন্ধে এতটা ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন যে কোন কোন সম্রাট্ এই বস্ত্র বিদেশে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া আইন প্রচার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নূরজাহানের সুরুচি ও ফ্যাসানের প্রতি অত্যধিক অনুরাগের ফলে ভারতবর্ষীয় সমস্ত প্রধান নগরে সম্ভ্রান্তঘরে মস্‌লিন বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নূরজাহানের উৎসাহ।

যখন মস্‌লিনের সৌভাগ্য প্রায় অস্তমিত, তখনও বাঙ্গলার কয়েকজন রাজা বিশেষ

ত্রিপুরেশ্বরগণ এই বস্ত্রের উৎসাহ দিয়া ইহাকে কথঞ্চিত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। "India of Ancient and Middle Ages" নামক পুস্তকে মিসেস ম্যানিং লিখিয়াছেন—ঘাসের উপর বিছানো একখানি সুদীর্ঘ মসলিন এক গাভী ঘাসের সঙ্গে খাইয়া ফেলিয়াছিল; এই জন্য সেই গাভীর মালিক নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ইতিহাস লেখক কাফি খাঁ মোগল রাজ-অন্তঃপুরে মস্‌লিনের আদর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায়, এই বস্ত্রশিল্প রাজাবাদসাহের কতটা মনোযোগ এবং অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার হইতে (১৯০৫ খৃঃ) নিম্নলিখিত বিবরণ শ্রীযুক্ত আব্দুল আলি সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃঃ):—১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ঢাকার মস্‌লিন জগতের যত বস্ত্রশিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল; অধ্যাপক কুপার এই প্রদর্শনীর বিবরণে এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ভাল মস্‌লিন একটু দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক আয়াসে কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন "শিল্পের জয়চিহ্ন" নাম অর্জ্জন করিয়াছিল, তখন উহা এতটা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল যে ঢাকায় মাত্র একঘর তাঁতি উহা বয়ন করিতে পারিত। লণ্ডনের শিল্পশালায় একখানি মস্‌লিন রক্ষিত ছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে বিশ গজ ও প্রস্থে এক গজ এবং তাহার ওজন ৭½ আউন্স ছিল। Textile Manufactures নামক গ্রন্থে ডাঃ এফ্. ওয়াটসন জগতের সমস্ত বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, শুধু গুণে নয়—এরূপ সূক্ষ্ম কাপড় যে এতটা টেঁকসই হইতে পারে তাহা ধারণার অতীত। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে একখানি মস্‌লিনের ৬০ পাউণ্ড মূল্য ছিল, জাহাঙ্গীরের সময়ে একখানি উৎকৃষ্ট মস্‌লিন (আবরোয়ান) ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মস্‌লিন য়ুরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৮১৭ অব্দে কেবল ঢাকা হইতেই এককোটি বাহান্নলক্ষ টাকার মস্‌লিন রপ্তানি হইয়াছিল। ভারত-নির্ম্মিত সাধারণ বস্ত্রেরও য়ুরোপে যথেষ্ট কাটতি হইত।

১৭৫ হাত মসলিনের ওজন ৪ তোলা।

"টপোগ্রাফি অব ঢাকা" পুস্তকে লিখিত আছে, ১৭০ হাত লম্বা একখানি মস্‌লিনের ওজন ছিল মাত্র ৪ তোলা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অবনতির সময়ও সোনারগাঁয়ে নির্ম্মিত একখানি ১৭৫ হাত দীর্ঘ মস্‌লিনের ৪ তোলা মাত্র ওজন ছিল। পূর্ব্বে ঢাকায় ইহা হইতেও অনেক সূক্ষ্ম মস্‌লিন নির্ম্মিত হইত।

ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এই নদনদীর সঙ্গমস্থলে ১৯৬০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ডে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রস্তুত হইত, ইহাদের কেন্দ্রস্থান কাপাশিয়া এখন ভাওয়ালের জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। ঢাকা, মুড়াপাড়া, সোনারগাঁ, ডেমরা, তিতবর্দী, বালিয়াপাড়া, নপাড়া, মৈকুলী, বহারক, চরপাড়া, বাশটেকি, নবিগঞ্জ, সাহাপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে মস্‌লিনের স্মৃতি এখনও তাঁতিরা বহন করেন। তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এককালে তাঁহাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা জগৎ জয় করিয়াছিলেন এবং শিল্পজগতে তাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তীর আসনে সমাসীন ছিলেন।

যেখানে পদ্মা, মেঘনা ও ধলেশ্বরী বিরাট্ জলরাশি লইয়া বহিয়া যাইতেছে,—যেখানে নির্ম্মল সৌরকরোজ্জ্বল আকাশ ঐ নদনদীর মতই দিগন্ত প্রসারিত,—যেখানে ডিঙ্গা বাহিয়া জেলেরা তাহাদের অবাধ স্ফূর্ত্তির দ্যোতক ভাটিয়াল গান গাইয়া আকাশ বাতাস ও জলরাশির সুরে সুর মিশাইয়া থাকে—সেই রাজ্যের তন্তুবায়গণ আকাশ, রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার বর্ণ ধরিয়া রাখিয়া, জলরাশি ও অভ্রের স্বচ্ছতা লইয়া—স্রোতের প্রবহমাণ গতি আয়ত্ত করিয়া বস্ত্রশিল্পের যে বর্ণ, স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা যে "বস্ত্রের স্বপ্ন", "বিজয়চিহ্ন", "পরীগণের লীলা", "সান্ধ্যশিশির", "প্রবহমাণ নীর", "গঙ্গাজলী", "মেঘডুম্বুর", "বাতাসের জাল" প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

মাদ্রাজের অন্তঃপাতী মছলিপত্তন বন্দর হইতে বিদেশীয় বণিকেরা এই বস্ত্র য়ুরোপে চালান দিতেন। এই মছলিপত্তন হইতে 'মস্‌লিন' নাম বাঙ্গলার কার্পাস বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তুরস্কের সম্রাটেরা বাঙ্গলার এই কার্পাস বস্ত্রের পাগড়ী পরিতেন, এজন্য তথায় ইহার চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে বঙ্গোপসাগরে যাতায়াত কঠিন ও অসুবিধা-জনক হইয়া উঠে, তখন তুরস্কের রাজধানী মোসল নগরের বস্ত্র-নির্ম্মাতারা বঙ্গের বস্ত্র-শিল্পের অনুকরণে একরূপ সূক্ষ্মবস্ত্র তৈরী করিতে আরম্ভ করেন। সেই নাম হইতে 'মস্‌লিন' শব্দের উদ্ভব হয়। আমাদের মনে হয় মছলিপত্তন নাম হইতেই মস্‌লিন নামের উদ্ভব বেশী সম্ভবপর।

মস্‌লিন নামের উৎপত্তি ও প্রকারভেদ।

মস্‌লিনের নিম্নলিখিত প্রকার ভেদ পরিদৃষ্ট হয়:—(১) ঝুনো—ইহা ঠিক মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম—ইহা পরিলে কোন কাপড় শরীরে আছে বলিয়াই মনে হইত না। (২) রং—ইহাও খুব সূক্ষ্ম। (৩) সরকার আলি—নবাব বাদসাহেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন, ইহা যেমনই সূক্ষ্ম তেমনই শক্ত হইত,—তাঁতিদের উৎসাহের জন্য এই বস্ত্রের বয়নকারীদিগকে সরকার হইতে জায়গীর দেওয়া হইত। (৪) খাসা—ইহাও সূক্ষ্ম ঘন-সন্নিবিষ্ট সূত্রে প্রস্তুত হইত। আইন আকবরিতে ইহা 'কসাক' নামে অভিহিত হইয়াছে। সোনারগাঁয়ে উৎকৃষ্ট খাসা নির্ম্মিত হইত। (৫) সবনম্ (সান্ধ্য শিশির) নামেই ইহার পরিচয়—শিশিরের মতই ইহা স্বচ্ছ এবং সন্ধ্যার মতই ইহার বর্ণ। (৬) আবরোয়ান (প্রবাহিত জল-স্রোত), ইহা পরিধান করিয়া জেবউন্নিসা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আরঙ্গজেব তাঁহার কন্যাকে উলঙ্গ ভ্রম করিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ কুমারী সাত বেড় দিয়া কাপড় পরিয়াছিলেন। আবদুল আলি ৭০ বেড় লিখিয়াছেন—ইহা স্পষ্টই অতিরঞ্জন।

ইহা ছাড়া তাঞ্জেব, সরবন্দ, বদনখাস, আলাবাল্লে, সরবতী, তরন্দাম, কুমীস, তুরিয়া, নয়নসুক, চারখানা, মলমল-খাস ও জামদানি প্রভৃতি বহু প্রকারের মস্‌লিন প্রস্তুত হইত। টেলরের টপোগ্রাফী-পুস্তকে এই সকল বস্ত্রের সূত্র-সংখ্যা, ব্যবহার, ওজন, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে

অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে। ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে এই সকল বিবরণ বিস্তারিত ভাবে সঙ্কলন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন (১৫৪—২২৪ পৃঃ)। ঢাকাই মসলিনের যে সকল শ্রেণীর বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার অনেকগুলির আবার সূক্ষ্মভেদ আছে, যথা—জামদানী বস্ত্রের মধ্যে, তোড়াদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, ছবলিজাল, ছাওয়াল, বাল আর, ডুরিয়া, সেলা, সাবুরগা প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঢাকার মোটা কাপড়ের এক সময়ে খুব আদর ছিল, যথা—বাফ্‌তা, বুন্নি, এক পাট্টা ও জোর, হাম্মাম, লুঙ্গি, কসিদা। মসলিনের ছিটও পূর্ব্বে নানারকমের ছিল। যথা—নন্দন-সাহী, আনার-দানা, কবতুর খোপী, সাকুতা, পাছাদার, কুন্তিদার প্রভৃতি। এই যুগে সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এ দেশের কৌস্তভ, পারিজাত, চিন্তামণির মতই সেগুলি নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে। অবনতির দিনেও ১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকায় ৪৫০০০০৲, সোনার গাঁয়ে ৩৫০০০০৲, ডেমরাতে ২৫০০০০৲, তিতবর্দ্দিতে ১৫০০০০৲ টাকার মসলিন প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দেও ঢাকায় ১৫০০, সোনার গাঁ ও ডেমরাতে ৯০০, তিতবর্দ্দিতে ১০৬০ এবং মুড়াপাড়া, আবদুল্লা পুর প্রভৃতি স্থানে ৭০০—সকল সমেত ৪১৬০ খানি তাঁত ঢাকা জেলায় চলিত। যতীন্দ্রবাবু নবাবী আমলের বস্ত্রের চাহিদা ও বিক্রয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন, ইহার অনেক কথাই টেলরের পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ১৮০০ খৃঃ অব্দের তালিকা এইরূপ :—

ঢাকা মসলিনের চা'হিদা।

"দিল্লীর বাদশাহের জন্য সাদা ও বুটাদার মসলিন ও রৌপ্য-খচিত বস্ত্র ১০০০০০৲ (আর্কট মুদ্রা), মুর্সিদাবাদ নবাবের জন্য ৩০০০০০৲, জগৎশেঠের জন্য ১৫০০০০৲, তুরানীদের জন্য ১০০০০০৲, পাঠান ব্যবসায়ীদের জন্য ১৫০০০০০৲, মোগল ব্যবসায়ীদের জন্য ১৫০০০০০৲, ইংরেজ কোম্পানী ৩৫০০০০৲, হিন্দু ব্যবসায়ী ২০০০০০৲, ফরাসী ব্যবসায়ী ৫০০০০৲, ওলন্দাজ কোম্পানী ১০০০০০৲ টাকা (১৮৯ পৃঃ)।"

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে ২৮৫০০০০ টাকার বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ৫০০০০০০৲ টাকার বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ১৩৬২১৫৪৲ মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ১৩৬২৬০১৮ ||৴৫ মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

ইংরেজরা অনেক কল-কব্জা করিয়াও ঢাকার এই অপূর্ব্ব বস্ত্র-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন নাই। ওয়াট্‌সন লিখিয়াছেন, "With all our machines and wonderful inventions we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the 'woven air' of Dacca."—আমাদের সমস্ত যন্ত্র এবং নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য উপায়গুলি দ্বারাও আমরা এপর্য্যন্ত কি ব্যবহারের পক্ষে উপযোগিতায় কি চারুশিল্প হিসাবে ঢাকার এই "হাওয়ার ইন্দ্রজালে"র সমকক্ষতা করিতে পারি নাই।

যাঁহারা অসামান্য সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের অসামান্য কঠোর পরীক্ষা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এই বুঝি বিধাতার নিয়ম। ঢাকার এই বিরাট্ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পটি কিভাবে বিলোপ প্রাপ্ত হইল সেই করুণ ইতিহাস না বলাই ভাল। মুসলমান রাজত্বের শেষদিক্ হইতে এই তন্তুবায়গণ যত বিড়ম্বনা সহিয়াছে, তাহা সাধনার শাস্তি, প্রতিভার প্রায়শ্চিত্ত। দালাল-দিগের হাতে তন্তুবায়গণ লাঞ্ছনার একশেষ সহ্য করিয়াছে, হতভাগ্যগণ বন্দীশালায় আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপর যে সকল জুলুম হইয়াছে, তাহাতে তাহারা প্রাণপণ করিয়াও পারিশ্রমিকের ভাগ নানাজনকে দিয়া তাহাদের হাতে একরূপ কিছুই রাখিতে পারিত না। বড় দুঃখে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যবসায়টি তাঁতিরা ছাড়িয়া দিয়াছিল—সে সকল দুঃখের কথা William Bolts (১৭৭২) তাঁহার Considerations of Indian Affairs নামক গ্রন্থে, Mill তাঁহার History of British India, Sir George Birdwood তদীয় Report on the Old Records of the India Officeএ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় এই কারবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড তদ্দেশজাত বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে ঢাকার মস্‌লিন ইংলণ্ডে বিক্রয় নিষেধ করিয়া আইন পাস করেন।

কারবারীদের কষ্ট ও কারবার ধ্বংস।

মলমল, আবরোয়া, ঝুনা, তারেন্দাম, তাঞ্জেব, জামদানি, ডুরিয়া ও খাসা এই আট প্রকার মসলিনের উপর নিষেধবিধি জারি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই (১৭৮৭ খৃঃ) ম্যাঞ্চেষ্টারের সদ্যো-জাত শিল্পের রক্ষার জন্য মস্‌লিনের উপর শতকরা ৭৫৲ টাকা কর ধার্য্য হয়; বেড়াজালে পড়িয়া এই শিল্প নষ্ট হইয়াছে।

কিরূপে মস্‌লিন তৈরী হইত, টেলর সাহেব তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (১৩৩৭, শ্রাবণ) প্রবাসী পত্রিকায় কোন সুদক্ষ ব্যক্তির সাহায্য লইয়া মস্‌লিন বয়ন সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন য়ুরোপের প্রস্তুত নকল মস্‌লিনের সূতায় প্রত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে

মস্‌লিনের উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব।

৬৮০৮ এবং ৫৬০৬ পাক দেওয়া হয়, তৎস্থলে ঐ পরিমিত ঢাকা মস্‌লিনের সূতায় গড়ে ১১০০১ এবং ৮০০৭টি পাক দেওয়া হইত। হাতে কাটা সূতা ও কলের সূতায় পার্থক্য অনেক। কলে কাটা সূতা তাদৃশ মজবুত হয় না, কাপড় পরিবার অযোগ্য হয়, অত সূক্ষ্ম কাপড় ধোপে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু হাতে কাটা সূতার মস্‌লিন ধোয়াইলে তাহার চাকচক্য বাড়ে, আরও বেশী টেঁকসই হয় এবং ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ।

সাধারণতঃ যে সকল উৎকৃষ্ট মস্‌লিন তৈরী হইত, তাহার সূতা ৩০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক মেয়েরা প্রস্তুত করিত। বস্ত্রবয়নকারীরা যে যন্ত্রের সাহায্যে মস্‌লিন তৈরী করে তাহাতে জটিলতা কিছুই নাই। তাহা অতি আদিম প্রণালীতে কয়েকখানি কাঠ, দড়ি ও কয়েকটি আংটা দ্বারা প্রস্তুত। এই উপায়ে মস্‌লিনের মত উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাহারা কিরূপে নির্ম্মাণ করিত,

তাহা য়ুরোপীয় শিল্প-সমালোচকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। কেদারবাবু লিখিয়াছেন, "ঢাকার তাঁতিদের দেহের গড়ন ছিপ ছিপে ও কোমল। তাহাদের দৈহিক শক্তি ও উদ্যমের কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহারা সূক্ষ্মস্পর্শজ্ঞান ও ওজন সম্পর্কে সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন; শুধু তাহাই নহে,—দেহপেশীর পরিচালনে তাহাদের যে অসামান্য ক্ষমতা আছে, তাহার ফলে হাতের আঙুলের সঙ্গে পায়ের আঙুল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক অর্ম্মে ইহাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলিয়াছেন যে ইহারা যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, ঐ সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা ইয়ুরোপীয় তাঁতিরা তাহাদের শক্ত ও স্থূল অঙ্গুলির সাহায্যে মোটা চট্‌ও তৈরী করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয়............ঢাকার তাঁতিরা সূতা দেখিবামাত্র তাহার সূক্ষ্মতা ঠিক করিতে পারে, নলের মধ্যে কতটা সূতা পাকানো আছে তাহা ঠিক করিবার তাহাদের কোন তৌলদণ্ড নাই। সূতার শ্রেষ্ঠত্ব চোখ চাহিয়াই ঠিক করে এবং দৈর্ঘ্য ঠিক করিতে হইলে খানিকটা খোলাজমিতে কিছু দূরে দূরে কাঠি পুঁতিয়া তাহাতে সূতা মেলিয়া দিয়া স্থির করে।.........সূতা মাপিতে এক হাত দুই হাত করিয়া গণনা করে এবং রতি দিয়া ওজন করে। এক রত্তির ওজন প্রায় দুই গ্রেন। পূর্ব্বকালে যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে মসলিন পাঠান হইত, তখন সেই মস্‌লিনের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ছিল ১৫০ হাত, ওজন এক রতি; কিন্তু সময় সময় কম বেশী হইয়া ১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্য্যন্ত হইত। টানায় ১৪০ হাত এবং প'ড়েনে ১৬০ হাত সূতা আবশ্যক হইত" (প্রবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবণ)।

বিলাতের শিল্পীদের অনধিগম্য।

সূতা প্রস্তুত করিবার প্রণালীও অতি সূক্ষ্ম শিল্পকলার পরিচায়ক। বেশী গরমে সূক্ষ্ম সূতা হইতে পারিত না। কাটুনীরা প্রত্যূষ হইতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে সূতা কাটিত। কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট সূতা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভাল হয়। যদি গরম বেশী হয়, তবে একটা আধারে জল রাখিয়া তাহার উপর সূতা কাটা হইত। জলের স্বাভাবিক বাষ্প গরমের সময় সূতা কাটার অনুকূল।

সূক্ষ্ম মসলিন ধোওয়াও নানারূপ উপায়ে সম্পাদিত হয়—পাটে আছড়াইলে ইহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রথমে কাপড়খানি ঈষৎ উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পরে সাজিমাটি ও সাবানের জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তারপর এক নবদূর্ব্বাদল যুক্ত খোলা-স্থানে উজ্জ্বল রৌদ্র-করে শুকাইতে হয়। আধা শুক্‌নো হইলে মস্‌লিন পুনরায় জলে সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বশেষ নেবুর রসযুক্ত খুব পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিতে হয়। যে সকল কাপড়ের সূতা ব্যবহারের দরুন এদিক সেদিক সরিয়া গিয়াছে তাহা সোজা করিবার প্রথাকে ঢাকার লোক 'কাঁটা করা' বলে। উহা ঢাকায় নদ্দিয়া নামক এক শ্রেণীর লোকেরাই জানে; ঢাকা ছাড়া অন্যত্র ঢাকার মস্‌লিন তেমন সুন্দর করিয়া কেহ ধৌত করিতে পারে না, কারণ অন্য কোন স্থানে এই 'কাঁটা করা'র রীতি পরিচিত নহে।

ঢাকার রিপুকরেরা মস্‌লিনের ছেঁড়া জায়গাগুলি এমন সুন্দরভাবে মেরামত করিতে পারে যে তাহাতে রিপুর চিহ্নমাত্র থাকে না। টেলর সাহেব লিখিয়াছেন ঢাকার রিপুকর্মীরা অহিফেন খাইয়া রিপু করিতে বসে, তাহাতে নাকি তাহাদের কাজের নেশা বাড়িয়া যায় এবং রিপু উৎকৃষ্ট হয় (Topography of Dacca, p. 176)।

অহিফেন খাইয়া রিপুকর্ম করে।

সূতা কাটার দুই প্রধান যন্ত্র চরকা ও ডলন কাঠি। খুব ভাল মস্‌লিনের সূতা ডলন কাঠি দিয়া তৈরী করিতে হয়। দশইঞ্চি দৈর্ঘ্য একটি সূঁচের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র গোলাকৃতি মৃত্তিকা রাখিয়া দেওয়া হয়, উহাকে "ডলন কাঠি" বলে। টেকো চালাইবার সময় হাত ঘামে ভিজিলে খড়ির গুঁড়া দিয়া ঘাম শুকাইয়া লইতে হয়। ডলন কাঠির সাহায্যে দুই আঙ্গুলে টেকো ঘুরাইতে বেশ ভার বোধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু সূতা ও কাপড়ের প্রস্তুত-প্রণালী স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার একটা পরিষ্কার ধারণা করা অসম্ভব।

চরকা ও ডলন কাঠি।

ঢাকার মস্‌লিন বহু প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই ইহার খ্যাতি জগন্ময় প্রচারিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ যুগের পরেও জগতের ঈশ্বর সমকক্ষ দিল্লীর ঈশ্বরেরা উত্তর-কালে এই কারবারটা বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরগণ ময়ূরসিংহাসনে বসিতেন, তাজমহলের সৃষ্টি করিতেন, মস্‌লিন পরিতেন এবং যমুনার নীলসলিলে দেওয়ানী খাসের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেন ; এই যুগে ইহাদের কোনটির মতই কিছু হয় নাই।

ঢাকার মস্‌লিন সম্বন্ধে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'শিল্পিক দর্শন' নামক পুস্তকে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ঢাকাই বস্ত্র সকলেরই প্রিয় ; অপিচ হিন্দুদিগের শিল্পকর্মনৈপুণ্য বিষয়ে এই অনুপম বস্ত্র এক মহতী ধ্বজা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল পারদর্শী তন্তুবায়েরা ইহার তুল্য বস্ত্রবয়নে বহুকালাবধি যত্নশীল আছে ; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় এই জয়পতাকার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অদ্যাপি কেহই সক্ষম হয় নাই। ঢাকাই বস্ত্র যৎপরোনাস্তি সামান্য যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সামান্য যন্ত্র ও তদ্ব্যবহারকর্ত্তৃদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে বিলাতের অদ্বিতীয় শিল্পকুশল ব্যক্তিরা বহুমূল্য বাষ্পীয় যন্ত্রসহকারেও তাদৃশ সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করণে পরাস্ত হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অনুপম বস্ত্র প্রাচীন রোম রাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগের শিল্প-সাফল্যের অনির্ব্বচনীয় প্রমাণ স্বরূপ গণ্য ছিল ; এবং অধুনা ইংলণ্ডদেশের তন্তুবায়দিগের তিরস্কার স্বরূপ জনসমাজে বিখ্যাত আছে। জনৈক য়ুরোপীয় শিল্পকর ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন যে 'বোধহয় ইহা বিদ্যাধরী ও অপ্সরারা বপন করিয়াছে ; এতাদৃশ সূক্ষ্মবস্ত্র মনুষ্যের স্থূল হস্তে সম্ভবে না।' ফলতঃ এই প্রশংসা অপ্রযোজ্য নহে।

"ঢাকা প্রদেশের সর্ব্বত্র এই উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয় ; পরন্তু পশ্চাৎ লিখিত নগর সকল ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থল ; তদ্যথা : ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, ডুমরা, তিতবাদী, জঙ্গলবাড়ী ও বজেৎপুর। এই সকল নগরী মধ্যে ঢাকা সর্ব্বতোভাবে সুপ্রসিদ্ধ। এতন্নগরীর বস্ত্রার্থে

পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সকল সুসভ্যদেশ হইতে বনিগ্‌বর্গ ঐ স্থানে আগমন করিত। অধুনা অল্পমূল্যের বিলাতি বস্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহুমূল্য ঢাকাই বস্ত্রের প্রতি জনগণের তাদৃশ অনুরাগ ও স্পৃহা নাই; তথাপি ঐ নগর নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই। অদ্যাপি তথায় নানাবিধ ব্যবসায়ীদিগের সমাগম হইয়া থাকে।

"বস্ত্রবয়নের প্রথম ক্রিয়া সূত্র প্রস্তুত করণ। এই কর্ম্ম এদেশীয় পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকদিগকে সামান্য লোক কাটনী বা 'সূতা কাটনী' বলিয়া থাকে। এই কাটনীদিগের ত্বগিন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তদ্দ্বারা ইহারা সূত্রের সূক্ষ্মত্ব—তারতম্য যে প্রকার উত্তমরূপে করিতে পারে পৃথিবী মধ্যে এরূপ আর কুত্রাপি কোন জাতীয়েরা পারে না। অল্পবয়স্কা স্ত্রীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইলে তাহাদিগের নয়ন ও ত্বগিন্দ্রিয় তৎকর্ম্মে অপটু হয়, সুতরাং তাহারা আর তত উত্তম সূত্র প্রস্তুত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্ব্বাহ্ণে বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্ণে ৪ ঘটিকার পর সূত্র কাটিবার সময়, এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে বিশেষতঃ রৌদ্র প্রখর থাকিলে, উত্তম সূত্র প্রস্তুত হয় না। 'মলমলখাস' নামক সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র বুনিবার সূত্র অতি প্রত্যুষে কাটিতে হয়; এবং যদ্যপি সেই সময় কাটনীর চতুর্বর্ত্তিত স্থানে শিশির না থাকে, তবে এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তদুপরি সূত্র কাটিবার প্রয়োজন হয়; নচেৎ সূত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে যে সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা উর্ণনাভের সূত্র হইতেও সূক্ষ্ম। ইহার ১৭৫ হস্ত সূত্রের পরিমাণ এক রতি মাত্র। ফলতঃ ইহার একসের পরিমাণ সূত্র বিস্তার করিলে প্রায় ৪০০ জ্যোতিষীয় ক্রোশ স্থান ব্যপ্ত হয়!!! অপিতু এই অদ্ভুত সূত্র যাদৃশ সূক্ষ্ম ইহা প্রস্তুত করণের শ্রমও তৎপরিমাণে বহুল। দুইমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক তোলক পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত হয়; সুতরাং ইহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক। একসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র ৬৪০ টাকার ন্যূনে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সূত্র প্রস্তুত হইলে 'ফেটী' বা 'লুটীর' আকারে রাখিতে হয়। পরে তন্তুবায়েরা ঐ ফেটী বা লুটী জলে ভিজাইয়া উহা বংশনির্ম্মিত এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া ঐ সূত্রকে দুই অংশে পৃথক্ করে, যাহা উত্তম তাহা 'টানার' (বস্ত্রের লম্বসূত্র) নিমিত্তে ব্যবহার হয়, এবং অবশিষ্ট 'পড়েনের' (বস্ত্রের প্রস্থসূত্র) উপযোগ্য। সূত্র ঐ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ হইলে টানার সূত্র তিন দিবস নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। চতুর্থ দিবসে উহা হইতে নিষ্পীড়ন করত ঐসূত্র এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। অনন্তর তাহা অঙ্গারচূর্ণ মিশ্রিত জলে পুনরায় ভিজাইতে হয়। অঙ্গারচূর্ণের পরিবর্ত্তে ভূষা অর্থাৎ পাক-পাত্রের তলজাত অঙ্গারবৎ পদার্থও ব্যবহৃত হয়। দুই দিবস এই জলে রাখিয়া ঐ সূত্রকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করা হয়। অতঃপর ঐ সূত্র পুনরায় এক রাত্রিকাল পরিষ্কার জলে ভিজান থাকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। ঢাকা অঞ্চলে খৈয়ের মণ্ডের ব্যবহার আছে এবং উহা সূত্রোপরি লিপ্ত করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ধুনা মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে টানার সূত্র প্রস্তুত হইলে তাহাকে

'উত্তম' 'মধ্যম' ও 'অধম' সূত্র মধ্যভাগে ব্যবহার করিয়া থাকে; সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়ন কালেও এই নিয়মের অন্যথা করে না। 'পড়েন' প্রস্তুত করণে পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম নাই। তাহাকে একরাত্রি কাল জলে ভিজাইয়া তৎপর দিবস প্রাতে মণ্ডে লিপ্ত করিতে হয়; পরন্তু টানার সূত্র এককালে প্রস্তুত করিতে হয়। পড়েনের সূত্র প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হয়। এককালে এক থানের ব্যবহারোপযোগী সূত্র প্রস্তুত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

"পূর্ব্ব প্রকারে সূত্র প্রস্তুত হইলে যথানিয়মে বপনকর্ম্ম আরম্ভ হয়; কিন্তু স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহার বিস্তারিত বিবরণে অধুনা নিরস্ত থাকিতে হইল। 'মলমলখাস' বস্ত্রবপনের উত্তম সময় আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে তৎকর্ম্ম করিতে হইলে তাঁইতের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্রম করত তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়। ঢাকা প্রদেশে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে মলমলখাস, সরকার আলি, ঝুনা, রঙ্গ, আবরওয়া, খাসা, শবণম, আলাবালী, তঞ্জেব, তরন্দম, সরবন্দ, সরবতী, কোমিস, ডোরিয়া, চারখানা এবং জামদানী—এই কয়েক প্রকার বস্ত্র সর্ব্বপ্রসিদ্ধ।

"মলমলখাস মুসলমান রাজাদিগের আধিপত্য সময় রাজপরিবারেরা ব্যবহার করিত। তৎপ্রযুক্ত ইহা 'খাস' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার টানায় ১৮০০ সূত্র থাকে এবং এক অর্দ্ধ (আধি) থানের পরিমাণ ৮ তোলা ৵০ আনা মাত্র!!! ঐ থান অনায়াসে এক অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে। ইহা বপনে ছয়মাস কাল ব্যয় হয় এবং ইহার মূল্য ১০০।১৫০৲ টাকা।

"সরকার আলি পূর্ব্বাপেক্ষায় মধ্যম। রাজপ্রতিনিধিরা ইহা ব্যবহার করিত এবং ইহার টানায় ১৯০০ সূত্র থাকে। 'ঝুনা' বস্ত্র এমত অত্যন্ত সূক্ষ্ম যে ইহা পরিধান করিলে শরীরোপরি বস্ত্র আছে এমন বোধ হয় না। ইহার তুলনায় 'গাজ' নামে প্রসিদ্ধ বস্ত্রও অতি স্থূল জ্ঞান হয়। ইহার দুই হস্ত প্রশস্ত বস্ত্রে ২০০০ টানায় সূত্র থাকে। মুসলমান রাজমহিষীরা ও নর্ত্তকীরা এই বস্ত্র ব্যবহার করে। অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে এই বস্ত্রের ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষেধ আছে। তাবর্ণিয়ার সাহেব লেখেন যে মুসলমান রাজাদিগের আজ্ঞাক্রমে কোন বণিক্ এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্থানান্তর করিতে পারিত না। 'রঙ্গ' বস্ত্র পূর্ব্ববৎ, কেবল বপনের প্রথা স্বতন্ত্র। ইহার টানায় ১২০০ সূত্র মাত্র থাকে। 'আবরওয়া' অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র। ইহার তুল্য স্বচ্ছ বস্ত্র আর কুত্রাপি হয় নাই। ইহার টানায় ৭০০ সূত্র মাত্র থাকে। যবনেরা ইহার স্বচ্ছতা স্রোতোজলের তুল্য জ্ঞান করিয়া ইহাকে 'আব' (বারি), 'রওয়া' (গতিবিশিষ্ট) উপাধি দিয়াছেন। এই বঙ্গোদেশে কথিত আছে যে কোন সময় আরঙ্গজেব বাদশাহ স্বতনয়ার বর্ণ তাহার বস্ত্র ভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করাতে সে কহিয়াছিল, "পিতঃ, সপ্তস্তর বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, তথাপি কেন তিরস্কার করেন?" 'খাসা' বা 'জঙ্গল খাসা' পূর্ব্বে সোনারগাঁয়ে প্রস্তুত হইত। ইহা অন্যান্য মলমল অপেক্ষা ঘন এবং অধিক প্রশস্ত। ৩ হস্ত প্রশস্ত খাসা অপ্রাপ্য নহে। 'শাবনম,' এই মলমল অতি মনোহর। ইহা রজনীযোগে

তৃণময় ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে শিশির দ্বারা সিক্ত হইয়া পর প্রাতে অদৃশ্য হয়; ক্রমাগত যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির শুষ্ক হইলে তাহা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ব্বোত্তম শবণমের টানায় ৭০০ সূত্র থাকে।"

রেশম

বঙ্গদেশে রেশমের কীট-উৎপাদকদিগের নাম তুতচাষী। তুতপত্রের জন্ত সাধারণতঃ ১০ বিঘা জমির প্রয়োজন। তুত চারি প্রকার, ১ম সার,—পত্রবৃহৎ ও ফল কালো বর্ণ হয়; ২য় ভোর—পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট—হুগলী ও মেদনীপুর অঞ্চলে ইহা বেশী জন্মে; ৩য় দেশী; ৪র্থ চীনি।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চারি প্রকারের কীট দ্বারা রেশম প্রস্তুত হইত। ১ম বড়—ইহাতে বৎসরে একবার মাত্র রেশম জন্মে। ২য় দেশী—বৎসরে ইহা হইতে পাঁচবার রেশম হয়। ৩য় চীনি (অপর নাম মাদ্রাজী)—বৎসরে ছয় সাতবার রেশম হয়; ৪র্থ বর্ণশঙ্কর—দেশী ও চীনি কীটের মিশ্রণে জন্ম—ইহাতে উত্তম রেশম হয় না।

রেশমের কীটকে তুতচাষীরা সাধারণতঃ "পুলো," "পোকা" বা "পোক" বলে। দেশী কীটের ডিম বসন্তকালে ১০ দিনে, বৈশাখে ৮ দিনে, আষাঢ় মাসে ৭ দিনে ও শরৎকালে প্রায় দুই মাস পরে ফুটিয়া থাকে। বড় কীটের ডিম ফাল্গুনের শেষে জন্মে এবং দশমাস পরে অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথমে কীটাবস্থায় পরিণত হয়। ফাল্গুনের শেষে ৪০টি পুংকীট ও ৪০টি স্ত্রীকীট ভাল হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২৮০০ (১০ কাহন) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি প্রথম পীতাভ তারপর মেটে পাথরের বর্ণ হয়। নব জাত কীটদিগকে চাষীরা প্রত্যহ চারবার নূতন তুতের পাতা খাইতে দেয়। চারিদিন তুতের পাতা খাইয়া কীটগুলি ঘুমাইয়া পড়ে। এই ঘুমকে চাষারা "আহারে ঘুম" বলে। এই ঘুম দুইদিন পর্য্যন্ত থাকে; ঘুম ভাঙ্গিলে কীটের চর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া অনুরূপ চর্ম্ম হয় এবং এই অবস্থায় তাহারা পুনরায় তুত খাইতে থাকে। এই খাওয়া ও তৎপরবর্ত্তী অপরিহার্য্য ঘুম—এই প্রক্রিয়া ৪ বার হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে ত্বক্ পরিবর্ত্তন করিয়া কীট ৩½ অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ হয়। এইবার পুনরায় ইহাদিগকে ১০ দিন তুত খাইতে দেওয়া হয়—তারপর তাহারা আর কিছু খাইতে চাহে না। এই সময় একটা ডালা হইতে তাহাদিগকে দরমা দিয়া প্রস্তুত ২৫০ হাত প্রস্থ এবং ৩৫০ হাত দীর্ঘ অপর একটা আধারে রাখা হয়। এই আধারের নাম "ফিং"। ফিংএর ঊর্দ্ধে দুই অঙ্গুলী গভীর তিন অঙ্গুলী প্রস্থ সরু বাঁশের খোপ সকল নির্ম্মিত থাকে। চাষীরা ঐ খোপে এক একটি কীট রাখিয়া দেয়। তখন কীটগুলি তাহাদের মুখ হইতে এক প্রকার সূত্র বাহির করিয়া স্বীয় দেহ আবৃত করে। ক্রমাগত ৫৬ ঘণ্টা সূত্র প্রস্তুত করার পর কীটেরা নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। এই গুটি প্রস্তুত হওয়ার ৪।৫ দিন পরে চাষীরা

গুটি মধ্যস্থ কীট রৌদ্রের উত্তাপে অথবা "তুন্দুর" নামে গৃহে রাখিয়া নিহত করে, তৎপরে গুটিগুলি তপ্ত জলে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে সূত্র প্রস্তুত হয়।

এখনও বহরমপুর বাঙ্গলার রেশমী বস্ত্রের গৌরব কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। "রেশম" ফার্সি শব্দ। আমাদের দেশে এইরূপ বস্ত্রের নাম ছিল 'কৌষেয়' 'ক্ষৌম,' 'পট্ট'। রামায়ণে সীতার পীত কৌষেয় বাসের উল্লেখ আছে। মহাভারতে সভা পর্ব্বে দৃষ্ট হয়, হিমালয়ের উত্তর প্রদেশস্থ শক জাতীয় রাজারা যুধিষ্ঠিরকে "কীটজ বস্ত্র" উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে চীন দেশীয় রেশমী বস্ত্রের অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রথের পতাকা পর্য্যন্ত চীনা বস্ত্রে প্রস্তুত হইত। এ সম্বন্ধে কালিদাসের সুপরিচিত "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য" সহজেই মনে পড়িবে।

চীন সম্রাট্ ফোহির (Fo-hi) বংশোদ্ভব রাজা চীননং (Chin Nong) ২৮০০ খৃঃ পূর্ব্বে রেশমী বস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ২৬০২ খৃঃ পূর্ব্বে চীন সম্রাট্ হোয়েনটি (Hoan Ti) তাঁহার পাটরাণী সিলিং চিকে (Si-Ling-Chi) রেশমী সূতার উৎকর্ষ সাধনের ভার প্রদান করেন। এ বিষয়ে রাজ্ঞীর কৃতিত্ব এত বেশী হইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে রেশমের দেবতা বলিয়া জানিত।

Economics of Silk Industry নামক পুস্তকের লেখক আর. সি. রওয়াল্লি (R. C. Rawalley) প্রভৃতি রেশমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের রেশম—এই দেশজ, উহাকে অন্য কোন স্থান হইতে আনিতে হয় নাই। শুধু রামায়ণ মহাভারতে নহে, পৃথিবীর আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে। মনু বহু স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, (পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক; নবম অধ্যায়, ১৬৮ শ্লোক; দ্বাদশ আধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)। বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতে এই বস্ত্রের যে যে নাম পাওয়া যায় (ঊর্ণ, কৌষেয়, কীটজ, ক্ষৌম) তাহাদের কোনটিরই চীন দেশীয় রেশমী বস্ত্রের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য নাই। সে সকল নাম ভারতবর্ষের নিজস্ব, এবং এই বস্ত্রের উল্লেখ যখন খৃষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে (চীনদেশীয় বস্ত্রের আদিকাল হইতে প্রাচীনতর সময়ের) ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে—তখন এই শ্রেণীর বস্ত্র এদেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (R. C. Rawalley's Economics of Silk Industry, p. 15)।

ইয়ুরোপে এই বস্ত্র দুর্লভ ছিল। রোমের রাজারা এই বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। কিন্তু ইহা এত দুর্মূল্য ছিল যে রাজরাণীরাও ইহা পরিতে পাইতেন না। সম্রাট্ আরিলিয়ানের পত্নী একটা অঙ্গরক্ষা এই বস্ত্রে বানাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ বহুব্যয়-সাধ্য বলিয়া তাহা রাজ্ঞীকে দিতে সম্মত হন নাই। ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রোম সম্রাট্ হেলিওগেবলস রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া তদ্দেশীয় রাষ্ট্রসভা তাঁহাকে অপরিমিত ব্যয়শীলতার জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মিবার অল্প সময় পরেই য়ুরোপে ভারতীয় রেশমেরই পরিচয় হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন লেখকদিগকে কল্পনাপ্রিয় ও ইতিহাস-জ্ঞান-শূন্য বলিয়া নিন্দা করিতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে বাস্তবক্ষেত্রেও কোন জাতি হইতে ন্যূন নহেন, য়ুরোপীয় প্রাচীন লেখকগণই তাঁহাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ইসনার্ড লিখিয়াছেন, শুধু তুত খাওয়াইয়া একটা গাভীকে বহুদিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তারপর তাহার বাছুর হইলেও তাহাকেও তুত খাওয়াইয়া শেষে মারিয়া ফেলা হয়। ঐ বাছুরের মাংস একটা পাত্রে রাখিয়া দিলে তাহা পচিয়া যায় এবং তন্মধ্যে রেশমী কীট দেখা দেয়,—সেই কীটজ সূত্রে ভারতীয় কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে গৃহে এইভাবে কীটের ক্রমবিকাশ হয়—তাহার নাম "বানক"; ইহার পরিমাণ ১০ হাত দীর্ঘ, ১০ হাত প্রস্থ, ৬ হাত উচ্চ। এই গৃহে পর পর পাঁচটি মাচান থাকে, প্রত্যেক মাচানে ১৬টি ডালা—উহার পরিমাণ ৩৮ হাত দীর্ঘ, ও ২৮ হাত প্রস্থ; এক একটি ডালায় ৩২০০ কীট রক্ষিত হয়। সুতরাং সকলগুলি ডালাতে ২,৫৬,০০০ কীট পালিত হইতে পারে। এই গৃহে এককালে তিন মণ, তিন সের রেশম প্রস্তুত হয়—তাহা ছাড়া আরও কিছু অল্পদরের রেশম পাওয়া যায়—তাহাকে "ওছা রেশম" বলে।

রেশম ধৌত করিয়া মাজা ঘষা করিতে হয়। তাহাতে প্রতি সেরে এক পাদ পরিমাণে রেশম নষ্ট হয়। চীনি গুটীতে এক রতি পরিমাণ রেশম জন্মে এবং ঐ রেশম প্রায় ৮০০ হাত দীর্ঘ হয়। ঐ রেশমের বাট তোলায় এক জোড়া উত্তম গরদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পরিমাণ-বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পাঁচ হাজার সাতশো বাট (৫৭৬০) গুটীর সূত্র দরকার।

এ সম্বন্ধে ৯২ বৎসর পূর্ব্বে এক বিশ্ববিশ্রুত বাঙ্গালী পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, "৫৭৬০ জীবের প্রাণ নষ্ট না করিলে এক জোড়া গরদের বস্ত্র পরিধান করা অসাধ্য। অধুনা যাঁহারা অবিরত বৈধ হিংসার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য যে তসর, গরদ, চেলি, সাটিন ও মকমল ইত্যাদি কীটজ বস্ত্র তাঁহারা কি বিবেচনায় ধারণ করেন? তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে বিংশতি বৎসর প্রত্যহ ছাগমাংস ভক্ষণে যত সংখ্যক জীবহত্যা ঘটে, এক জোড়া গরদের বস্ত্রার্থ ততোধিক পাপের (?) সম্ভাবনা; কারণ উক্ত বস্ত্রের প্রত্যেক গজ-পরিমিত পদার্থ প্রস্তুতকরণে সহস্রাধিক জীবের প্রাণহানি হয়। ১২৪৯ বঙ্গাব্দে (১৮৪১ খৃঃ) ১৬,১১৮।০ মণ রেশম ও ৭৬, ৮৪৬ থান কোড়া আর ৭,৫৮,৭৮৩ থান রেশম মিশ্রিত কার্পাস বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশে যে রেশমের বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল তৎসমুদয় প্রস্তুতকরণার্থে ১,২০,০০০ মণ রেশমের আবশ্যক; এবং এই রেশম উৎপন্ন করণার্থ প্রতিবর্ষে অভাবতঃ ৮,৩২,৫২,০৩,২৫২ জীব-হত্যা হইয়া থাকে। বৈধহিংসাদ্বেষী মহাশয়েরা কৌষেয় বস্ত্র ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত সংখ্যক জীবের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে!!!" (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২য় পর্ব্ব, ২৫ পৃঃ।)

নৈতিক ও অধ্যাত্ম জগতের এই গূঢ় প্রশ্ন সমাধানের আমাদের অবকাশ নাই। কিন্তু উপরে যে সংখ্যার অঙ্ক দেওয়া হইল তাহা দ্বারা ৯২ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ রাজত্বের প্রাকালে

আমাদের রেশম, ব্যবসায়ীদের যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার কথা স্বতঃই মনে হইবে। আমরা মোগল রাজত্ব পর্য্যন্ত এই ইতিহাসের দাঁড়ি টানিয়াছি। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ের বঙ্গের বাণিজ্য-ধ্বংসের বিষাদময় তুলনা-মূলক চিত্র উদ্ঘাটন করা আমাদের বিষয়-বহির্ভূত। এখন সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে রেশম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, তাহার একটা তালিকা আমার টেবিলের উপর আছে। এই তালিকা হইতে শুধু বঙ্গদেশের অংশটা কতক পরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে। ১৮৬৭—৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৮৭—৮৮ অব্দে যে চালান যায় তাহার মূল্য শুধু ৪০ লক্ষ টাকা। ১৮৯২—৯৩ অব্দে রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছিল, উহার মূল্য ৬৭,১৫,০০০৲ টাকা—ইহা সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাব।

বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বঙ্গদেশে বহু পূর্ব্বে আর্য্য-নিবাস হইয়াছিল এবং অধিবাসীরা বেদোক্ত ধর্ম্ম পালন করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, আসামের পাহাড়ে এখনও বৈদিকধর্ম্ম-পালনকারী এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ঠিক বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র জপ করিয়া বৈদিক অনুষ্ঠান করেন।

বেদ-বিদ্যা।

পরবর্ত্তী জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার পরে এবং এদেশের জনসাধারণ স্বভাবতঃই পশু-বধ-বিরোধী হওয়াতে বৈদিকধর্ম্ম এদেশে ততটা প্রচলিত হইতে পারে নাই। মহাভাষ্যের উদাহরণ-প্রসঙ্গে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, "লোকেশ্বর আজ্ঞাপয়তি………প্রাগঙ্গং গ্রামেভ্যো ব্রাহ্মণা আনীয়ন্তামিতি।" এই লোকেশ্বর শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজা পুষ্যমিত্র। তিনি বৌদ্ধ প্রভাবে পূর্ব্বদেশ বৈদিকাচার-বিরহিত দেখিয়া তথায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, উহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা।

কিন্তু নিম্নস্তরে যদিও জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি খৃষ্টীয় প্রথম দিক্‌কার কয়েক শতাব্দীতে এদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোন কালেই অভাব হয় নাই। তাম্রলিপিতে ইহার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। দামোদরপুরের (দিনাজপুর) পাঁচখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে এদেশে ব্রাহ্মণগণ "অগ্নিহোত্র" ও "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" সম্পাদন করিতেন, পুণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষে এই সকল বৈদিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। ফরিদপুর জেলার তিনখানি তাম্রশাসনে জানা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশের "বারক মণ্ডলে" যজুর্ব্বেদের বাজসন শাখাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। ত্রিপুরার তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় প্রদোষ শর্ম্মা নামক জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ চারিবেদে অভিজ্ঞ শতাধিক ব্রাহ্মণকে তদ্দেশে উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। নেপালের রাজকীয় পুঁথিশালায় চতুর্ভুজ-বিরচিত হরিচরিত কাব্যের পুষ্পিকায় দৃষ্ট হয়, পালবংশীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে

বরেন্দ্রভূমিতে শ্রুতিবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত দিনাজপুরের গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভে দৃষ্ট হয় উক্ত মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে বেদবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন। কেদার মিশ্র বাল্যকালেই "চতুর্ব্বিদ্যাপয়োনিধি" পান করিয়া বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যে প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি "বেদচতুষ্টয়রূপ মুখপদ্মলক্ষণাক্রান্ত" ছিলেন। দেবপাল দেবের সমসাময়িক "ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ" গ্রন্থকর্ত্তা নারায়ণেরও অশেষ বেদজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম শতকে মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা ভূতি বর্ম্মার সময়ে তদানীন্তন কামরূপে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপের ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে বেদের বিভিন্ন শাখাবলম্বী ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম আছে। ইহা ছাড়া এদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন যুগের বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিষয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার লিখিত হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনা-লেখমালার অন্তর্গত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সেই প্রবন্ধটি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। বৈদিক গ্রন্থ বৌদ্ধযুগে এদেশে তাদৃশ আদৃত হয় নাই, এই জন্য যাহা কিছু ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তথাপি গুণবিষ্ণু, হলায়ুধ, রামনাথ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েক জন বৈদিক গ্রন্থকর্ত্তার নাম ও তাঁহাদের গ্রন্থের বিষয় পণ্ডিত দুর্গানাথ উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ সেন রাজাদের পূর্ব্বে পশুবলি ও বৈদিক যজ্ঞাদির বিরোধী ছিল। এই জন্য বঙ্গের বাহিরের লোকেরা এই দেশ বেদ-বহির্ভূত, ব্রাহ্মণহীন বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে কোন কালেই পণ্ডিতের অভাব হয় নাই। আমরা ২৯১-৯৮ এবং ৩৫৩-৭৬ পৃষ্ঠায় বঙ্গীয় পণ্ডিতদের কথা আলোচনা করিয়াছি।

ইংরেজদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেও বাঙ্গলায় এইরূপ ভুবনজয়ী পণ্ডিত অনেক ছিলেন, যাঁহাদের পদতলে বসিয়া উইলসন, কোলব্রুক, কেরি, ওয়ার্ড, টমাস ও মার্সম্যান প্রভৃতি সুপণ্ডিত সাহেবগণ এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিতেন। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমরা মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মার্সম্যান সাহেব তাঁহার শ্রীরামপুরের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদিগের পুরোভাগে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়; ইনি উড়িষ্যাবাসী, এবং বিদ্যার জাহাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন" (আমি Colossus of literatureএর ভাবার্থ "বিদ্যার জাহাজ" শব্দে বুঝাইলাম)। কিন্তু তিনি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন না; বঙ্গদেশবাসীই ছিলেন। যে হিসাবে মার্সম্যান তাঁহাকে 'উড়িষ্যাবাসী' বলিয়াছেন—সে হিসাবে আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও উড়িষ্যাবাসী বলা চলে। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৭৬২ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মার্সম্যান ইঁহার সম্বন্ধে আরো লিখিয়াছেন :—"ইঁহার সঙ্গে আমাদের সুবিখ্যাত অভিধান-রচয়িতার (জনসনের) খুব সাদৃশ্য ছিল। জনসনের মতই মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁহারই মত হিন্দু পণ্ডিতের বিরাট্ ও অশোভন বপু ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার মত পাণ্ডিত্য আর কাহারও ছিল না; মিঃ কেরি প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা

ইহারই কাছে ভাষা শিক্ষা করিতেন।" মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত প্রবোধচন্দ্রিকার ইংরেজী ভূমিকায় মাসম্যান লিখিয়াছেন, "মৃত্যুঞ্জয় বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্যতম" ("One of the most profound scholars of the age")। এই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের শুধু পাণ্ডিত্য নহে, ইহাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিয়া সেই সকল সুপণ্ডিত পাদ্রী সাহেবেরাও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। কেরি সাহেবের জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় ব্রাহ্মণ একদা একটি লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন হয়, এবং ব্রাহ্মণকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে যাইয়া শপথ লইতে হয়। ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাত্মা ব্রাহ্মণকে হাজত ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান স্বরূপ আদালত তাঁহার উপর এই উৎকট ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ হাজতে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া রহিলেন, প্রাণত্যাগ করিবেন তবুও আদালতে শপথ গ্রহণ করিবেন না, এই তাঁহার পণ। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান দেখাইয়া কেরি সাহেব বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। বঙ্গদেশে তখনও যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পাদ্রীরা অনেক সময় বিলাপ করিয়া বলিতেন, "কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের খৃষ্টানদিগের মধ্যে তাহার সিকি পরিমাণ অনুরাগও তো দেখিতে পাই না।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, ৫৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) টমাস সাহেব নবদ্বীপে যাইয়া তথাকার পণ্ডিতদের আশ্চর্য্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালীদের উদারতা, বন্ধুর জন্য, প্রতিশ্রুতির জন্য অকাতরে স্বীয় প্রাণদান প্রভৃতি মহাগুণের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এই পুস্তকে সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ নাই। বাঙ্গালীদের অসামান্য বিদ্যানুরাগে সাহেবেরাও বিস্মিত হইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত-লেখক **রামরাম বসু** সম্বন্ধে ডাঃ কেরি লিখিয়াছেন, "ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত আমি দেখি নাই। ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল।" "A more devout scholar than him I never saw ....Before his 16th year he became a perfect master of Arabic and Persian. His knowledge of Sanskrit was not less worthy of note." কেরির মত বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতের এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার কথা নহে। রামরাম বসু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নিমতা গ্রামের এক পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আরও অনেক দেশবিশ্রুত পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে **গঙ্গাধর কবিরাজের** নাম স্মরণীয়। ইহার সম্বন্ধে ১৩৩১ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠের "নায়ক" পত্রিকায় কৃতবিদ্য কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন লিখিয়াছেন,

"বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে বলিতে শুনিয়াছি—'আর্য্য-চিকিৎসার শেষ ঋষি গঙ্গাধর। শ্রীচৈতন্যদেবের যুগের পর এত বড় পণ্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই'।"

ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন এবং ৭৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ-সংক্রান্ত ৩২খানি, তন্ত্রগ্রন্থ ২খানি, জ্যোতিষ ১খানি, ব্যাকরণ ৮খানি, স্মৃতি ৭খানি, নাটক, আখ্যায়িকা, মহাকাব্য ও ছন্দগ্রন্থ ১৩খানি এবং ১৪খানি বিবিধ বিষয়ক। তাঁহার রচিত আয়ুর্ব্বেদ-সংক্রান্ত টীকা "জল্পকল্পতরু" এখন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ ভিষক্‌গণের প্রধান অবলম্বন। গঙ্গাধর যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে (২৪শে আষাঢ়, শুক্রবার) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পিতার নাম ছিল ভবানী রায় ও মাতার নাম অভয়া দেবী—এবং ইনি তাঁহাদের একমাত্র সন্তান ছিলেন।

এই পণ্ডিতদিগের শিরোমণি-স্বরূপ আমরা **রাজা রামমোহন রায়ের** নাম উল্লেখ করিতে পারি; ইনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের সন্ধিস্থলে বিরাজমান। ইনি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃষ্টল নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। পরাধীন জাতির একটি লোক, ধন-মান-ঐশ্বর্য্য-বিত্তাগর্ব্বিত ইংরেজদিগের মধ্যে তখনকার দিনে যে উচ্চ প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাইয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যাইবে, আর্য্যসভ্যতার প্রধান লীলাকেন্দ্রসমূহে তখনও জ্ঞান-ধর্ম্মের পুণ্য-প্রদীপ জ্বলিতেছিল; জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বাঙ্গলার ব্রাহ্মণকে যে জগদ্-গুরু বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহাদের অজস্র অকপট হৃদয়ের অভিনন্দন দ্বারা প্রতীতি হয়। আমরা এখানে কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—বঙ্গীয় মন্দিরের হোমানল বিদেশী শ্রদ্ধাভক্তি কতটা আকর্ষণ করিয়াছিল। লণ্ডনের ইউনিটারিয়ান সমিতি হইতে রামমোহন রায়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সেই সমিতির মুখপাত্র হইয়া রাজাকে মানপত্র দেওয়ার সময় স্যার জন বাউরিং (Sir John Bowring) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—"কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন, যদি এখন আমাদের মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত অমর-কীর্ত্তি ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের যশ যুগযুগান্ত যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত হন, তবে আমাদের মনে কি ভাব হইবে? যদি হঠাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্, মিলটন কি নিউটন অকস্মাৎ আসিয়া দেখা দেন, তবে আমরা কি ভাবিব? আমাদের একজন কবি, যিনি স্বর্গীয় প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তিনি দক্ষিণ মেরুর সেই সুন্দর জ্যোতিষ্মান্ আলোকপুঞ্জ যাহা 'স্বর্ণ ক্রুশদণ্ড' (Golden Cross) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিস্ময়াবিষ্ট মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি এই সমিতির পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায়কে আপ্যায়ন করিতে যাইয়া সেইরূপ ভাব-বিহ্বলতার সহিত হস্ত প্রসারিত করিতেছি।" আমেরিকার ডাঃ বুথ মিঃ ইষ্টলিনের নিকট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর যে চিঠি লিখিয়াছিলেন,

তাহাতে রামমোহন সম্বন্ধে এই কথাগুলি ছিল:—"ইহার মৃত্যুর পরে আমি ইহার সমস্ত গ্রন্থাবলী ভাল করিয়া পাঠ করিলাম। তাহার ফলে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি জগতে বর্ত্তমান কালে বা অতীতে কখনও জন্মেন নাই।" রেভারেণ্ড জে. স্কট্ পোর্টার প্রিসবিটেরিয়ান সভায় বলেন, "যে কোন বিষয় আলোচনায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইত, সেরূপ পাণ্ডিত্য আমি আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা এবং মৌলিকত্ব এরূপ ছিল, যাহার অধিক আর কাহারও হইতে পারে না। জগতে যত লোক যে কোন যুগে জন্মিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম।" ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ফিনস্ বাড়ী গির্জ্জায় (লণ্ডন) বক্তৃতা কালে রেভারেণ্ড জে ফক্স বলিয়াছিলেন, "একটা কবিত্বপূর্ণ স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে! কিন্তু তিনি মৃত হইয়াও এখনও যে স্বরে কথা কহিতেছেন তাহা যুগ যুগান্তর ভরিয়া শুধু ভারতবাসী নহে, য়ুরোপের ও আমেরিকার অধিবাসীদের কাণে বাজিবে।" নিউ গ্রাভেল পিটে রেভারেণ্ড এ্যাসপ্ল্যাণ্ড রামমোহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত জগতে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইবে, ততকাল রামমোহনের নাম কেহ ভুলিতে পারিবেন না।" কর্ণেল ফিট্জ্ লরেন্স (মানচেষ্টারের আরল) তাঁহার ইংলণ্ড, ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (১৮১৭-১৮ খৃঃ) লিখিয়াছেন, "অত্যাশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ; আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ইঁহার নখাগ্রে এবং ইনি কথায় কথায় লক (Locke) এবং বেকনের (Bacon) গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন।" সামাজিক সাম্যবাদের তৎকালের প্রধান নেতা সুবিখ্যাত রবার্ট ওয়েন ইঁহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মিঃ রেকর্ডার হিল (Recorder Hill) লিখিয়াছেন, "রাজা আমাদের ভাষায় তর্ক করিলেন, ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বিস্ময়কর অধিকার আমাদিগকে অভিভূত করিল। রবার্ট হারিয়া গিয়া একটু চটিয়া গেলেন। তাঁহার এরূপ বিচলিত ভাব ও অসহিষ্ণুতা আমি আর কখনই দেখি নাই। রাজার ভাব স্থির, সংযত ও প্রশান্ত।" ডাঃ বুট ইষ্টলিন সাহেবকে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন, "আমার চক্ষে রাজা রামমোহন রায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, জগতের অতীত ইতিহাসে ও বর্ত্তমানে জ্ঞান ও বিনয়ের এরূপ পূর্ণ প্রতিমা আর একটিও আমি কল্পনা করিতে পারি নাই।" আর একজন ইংরেজ লিখিয়াছিলেন, "তর্কযুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় অপ্রতিদ্বন্দী। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে এক্ষেত্রে রাজা ইংলণ্ডে তাঁহার সমকক্ষ একজনও পান নাই।" মেরি কার্পেন্টার লিখিয়াছেন, "শ্রীরামপুরের মিঃ এডামস্ রাজাকে ব্যাপটিষ্ট্ মতে দীক্ষিত করিতে আসিয়া নিজে রাজার সঙ্গে তর্কে পরাভূত হইয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন।" সেই সময়ের সর্ব্ব প্রধান হেতুবাদী দার্শনিক জেরেমী বেন্থাম রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি রাজাকে একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আপনার পুস্তকে নাম না থাকিলে আমি কিছুতে ধরিতে পারিতাম না যে উহা হিন্দুর লেখা,—বরঞ্চ উহা কোন শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চশিক্ষিত

ইংরেজের দ্বারা লিখিত বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল।" জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুখ্যাতি করিয়া বেন্থাম রাজাকে লিখিয়াছিলেন,—"মিলের ইংরেজী লেখাটা যদি আপনার মত সুন্দর ও নির্খুত হইত, তবে আর কিছু বলিবার থাকিত না।" বিলাতের তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেল রামমোহনকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তিনি যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন সেই দেশের আভিজাত্য এবং বিদ্যাদর্পিত ইংরেজ সমাজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া আতিথ্য দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের সভায় এবং ফরাসী রাজ লুই ফিলিপের প্রাসাদে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন।

এই বাঙ্গলার এক নগণ্য প্রদেশ রঙ্গপুর—তথাকার কালেক্টারের সেরেস্তাদার, যিনি তৎকালের বিধি অনুসারে কেরানিগিরি হইতে উচ্চতর কোন পদের দাবী করিতে পারিতেন না, তিনি এত বড় হইয়াছিলেন যে সমস্ত সভ্য জগৎ সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট মাথা নোয়াইয়াছিল। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ 'মুকুটহীন রাজশ্রীর' প্রভাবে চিরকাল সমস্ত জগতের উপর রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। কুটিরবাসী এক নগণ্য পল্লীর পণ্ডিতকে দেখিয়া পণ্ডিতশিরোমণি কেরি প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রথিতযশা ব্যক্তি তাঁহাদের বেতনভুক্ সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে তৎকালীন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের একজন বলিয়া সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতের মস্তিষ্কের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—নব্যন্যায়ের কূটতর্কের মধ্যে এখনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মাথা প্রবেশ করাইতে পারিতেছেন না। হে ভারতবাসী! চারিদিকে বিপদ্‌জাল ঘিরিয়া ধরিয়াছে, ঊর্দ্ধে মহামেঘের উদ্দামলীলা। এই দুর্য্যোগের গভীর নিশার গাঢ় অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু যুগে যুগে নব নব প্রতিভার স্ফুরণে, নানক, কবির, তুকারাম, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পুরুষবরদিগের অভ্যুদয়ে কি মনে হয় না যে, এই তপস্যার ক্ষেত্রে—এই যজ্ঞস্থলে এখনও হোমাগ্নি জ্বলিতেছে, এখনও আহিতাগ্নিকের চির জ্যোতিষ্মান্ বহ্নিদীপ্তি হেথায় নির্ব্বাপিত হয় নাই? এই যুগের মুক্তিমন্ত্র শিখাইবার যোগ্য কোন পুরোহিত আসিবেন, কি আসিয়াছেন; তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীর প্রত্যাশায় সমস্ত দেশ স্তম্ভিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিব।

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষার উপর এই বিদ্যালয় জোর দিয়াছিল, বস্তুতঃ ইহা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এ কথাটা ভাবিতে পারা যায় না যে, যাঁহারা কোটী কোটী লোকের ভাগ্যনিয়ন্তা শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা সেই দেশের ভাষা না জানিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ কি করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারেন। এই প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ্য করাতে শিক্ষাশালাগুলিতে নানারূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এদেশের লোকেরা মৌলিক চিন্তাশীলতার প্রতিষ্ঠা একরূপ হারাইতে বসিয়াছে। গণিত পড়িবে গণিতের ভাষা ইংরেজী; ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ন্যায়, ভিষক্‌শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই ইংরেজীতে শিখিতে হয়। ফলে প্রত্যেক বিষয় শিখিতে সময়ের অর্দ্ধেকটা যায় তৎসম্বন্ধীয় ভাষাটা দখল করিতে। এমন কি

সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় এমন প্রশ্নপত্র আছে যাহাতে ঐ দুই ভাষার জ্ঞান না থাকিলেও শুধু ইংরেজী জানিলেই পরীক্ষার্থী কৃতকার্য্য হইতে পারে। ভাষা লইয়া কসরৎ করাতে বিষয়জ্ঞান অতি অল্পই হয় এবং যেটুকু হয় তাহা গতানুগতিক হয়—স্বাধীন চিন্তাশীলতার কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না। বিদেশী ভাষার নানারূপ কসরৎ দখল করিতে করিতেই জীবনের অর্দ্ধেক চলিয়া যায়। এজন্য মেডিক্যাল কলেজে এত ভাল ভাল ছাত্র গত অর্দ্ধশতাব্দীকালে এদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু গুডিব চক্রবর্ত্তী হইতে ডাঃ সরকার পর্য্যন্ত একজনও এমন দাঁড়ান নাই, যিনি মৌলিক গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন নূতন তত্ত্ব দান করিতে পারিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে আমরা এত কৃতী যে আমরা একরূপ ইংরেজীতে হাসি, ইংরেজীতে কাঁদি এবং ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ আমরা সেক্সপীয়র সম্বন্ধে লিখিতে গেলে কেবলই টেইন, ডাউডন, ভিকটর হিউগো কি বলিয়াছেন, তাহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকি ; আমাদের যে কোন স্বাধীন মত বা স্বকীয় আদর্শ আছে তাহা জানিও না, ভাবিতেও পারি না। এদিকে ২৪ বৎসরের ইংরেজ যুবক বেদ, পুরাণ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহা কিছু পড়িবেন, বুড় বাল্মীকি, দ্বৈপায়ন কিংবা ঋগ্বেদের ঋষি কেহই ইঁহাদের অত্যদ্ভুত সমালোচনা হইতে রেহাই পান না। ইঁহারাই বা চিন্তাজগতে এমন স্বাধীন ও আমরাই বা এরূপ পরানুগ ও শেকলে-বাঁধা গোলাম হইলাম কেন? ইতিহাস এবং দর্শনেও আমরা কেবলই পরের মত রোমন্থন করিতেছি। ইহার একমাত্র কারণ আমরা নিজেদের কথাও নিজের ভাষায় পড়িতে পাই না। এ সম্বন্ধে এফ. এচ. স্ক্রাইন, আই. সি. এস. বলেন, "কুক্ষণে মেকলে সাহেব বাঙ্গলার শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নতুবা বাঙ্গালীরা যে মৌলিকতাহীন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া থাকেন সেই নিন্দার দশমাংশের একাংশেরও তাঁহারা ভাজন হইতেন না।"

প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ্য করার ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর দৃষ্ট হয়। এই যে কোটী কোটী লোকের ভাষা না জানিয়া রাজপুরুষেরা এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার ফলে শত শত মতরজম (অনুবাদক) অফিসে অফিসে বসিয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ যদি আমাদের ভাষা শিক্ষা করেন, তবে শত শত উকীল মোক্তারের ভাঙ্গা, অশুদ্ধ ও অপরিস্ফুট ইংরেজী দিয়া বিচারককে সকল কথা বুঝাইতে হয় না। ইহাদের এই পণ্ডশ্রমে ব্যয়িত সময়ের কি কোন মূল্যই নাই? সাক্ষীর জবানবন্দীর ইংরেজী অনুবাদে যে কত বৃথা সময় ও শক্তির অপচয় হয় তাহা সকলেই জানেন। মাত্র জনকয়েক হাইকোর্টের জজ, ছোট আদালতের জজ ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা জজ এদেশীয় ভাষা শিখিবেন না আর তজ্জন্য সমস্ত জাতি এই ভাবে ঘোর প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহা যুক্তিসহ নহে। বিচারককে ইংরেজীতে কি সকল কথাই এই সকল উকীল ভাল বুঝাইতে পারেন, না, নাম-মাত্র দেশী ভাষার জ্ঞান লইয়া বিচারক সাক্ষীর জবানবন্দী বুঝিতে পারেন? শাসনকর্ত্তাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেশের অবস্থা বুঝিয়া লইতে হয়, দেশীয় ভাষা না জানিয়া তিনি এই কার্য্য কি ভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারেন? প্রাদেশিক ভাষায় তিনি যে পরীক্ষা দিয়া পাস করেন, তাহা খেলা মাত্র ; ম্যাট্রিকুলেসনের বাঙ্গলা পরীক্ষার

উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। কি আশ্চর্য্য যে বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বাঙ্গালী উকীল ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন! ইংরেজী শিক্ষা এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে ইংরেজীর বর্ণজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবহারকালেও সেই ভাষার শরণ লইতে হইবে তাহার কথা নাই। সংস্কৃত দায়ভাগ, মুসলমানী আইন কানুন ও ইংরেজী ব্যবহার-শাস্ত্র শিক্ষা করা অপরিহার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃত, ফারসী কি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে হইবে এবং সাক্ষীর জবানবন্দী তর্জ্জমা করিতে হইবে এ কথাতো সমর্থন করা যায় না। শাসক ও শাসিতের সঙ্গে পরস্পরের সহানুভূতি ও প্রীতির অন্যতম মূল-বন্ধন পরস্পরের ভাষাজ্ঞান। আমাদের ভাষা জানিলে— সাহিত্যপাঠে ও কথোপকথনে বিদেশী শাসন-কর্ত্তা আমাদের মনোভাব বুঝিয়া যতটা শ্রদ্ধা ও প্রীতিপরায়ণ হইবেন—আমরা যদি চিরকালই কৃত্রিম বুলি বলিয়া তাঁহাদের কাছে পশুপক্ষীর ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া থাকি, তবে সে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আমরা তাঁহাদের কাছে কখনই পাইব না।

মহাত্মা লর্ড ওয়েলেসলী কর্ত্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অতি বড় সদুদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই দেশস্থ সিভিলিয়ানগণকে তাঁহাদের পদ পাইবার পূর্ব্বেই সেই পদে উন্নতি লাভ করিবার জন্য দেশী ভাষায় খুব শক্ত পরীক্ষাস্থলে স্বীয় স্বীয় গুণপনার পরিচয় দিতে হইত। তাঁহাদিগকে চারটিবার বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া দেশী ভাষায় তর্কবিতর্ক দ্বারা তাঁহাদের শাসিত প্রদেশের ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ দিতে হইত। এই তর্কসভায় দেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, রাজগণ, বিদেশী রাজদূতেরা, মন্ত্রিগণ এবং বিশিষ্ট মুন্সী ও মৌলভিরা উপস্থিত থাকিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ানদের বাঙ্গলা ও ফারসীতে এই বিচার কলিকাতার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে হইত। এদেশের উচ্চকর্ম্মচারীদের কর্ম্মোন্নতি এই কলেজের অভিমতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। এখানে বিদ্যার পরিচয় না দিয়া সমস্ত ভারতে কোন সিভিলিয়ানের পদ বা বেতনের উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। (No promotion was to be given in the public service throughout India in any branch of the service held by civilians except through the channel of this College."—Memoirs of Dr. Buchanan, Vol. I, p. 208.) এই কলেজে বড় বড় ইংরেজ অধ্যাপক ও দেশের পণ্ডিতগণের ভাব-বিনিময়, চিরস্থায়ী অন্তরঙ্গতা ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যের একটা বিশিষ্ট স্থান সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সিভিলিয়ানদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িতে হইত—(১) য়ুরোপের বর্ত্তমান কালের প্রধান প্রধান ভাষা, (২) ল্যাটিন, গ্রীক ও ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্য, (৩) গণিত, (৪) ভূগোল, (৫) সাধারণ ইতিহাস, (৬) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, (৭) রসায়নশাস্ত্র, (৮) জ্যোতির্ব্বিদ্যা, (৯) নীতিবিজ্ঞান, (১০) স্মৃতি, (১১) সমস্ত জগতের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারশাস্ত্র, (১২) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গলা, তেলেগু, মহারাষ্ট্রী, তামিল এবং কেনারিজ প্রভৃতি

সাহিত্য, ভারতবর্ষের ও দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস। এই কলেজ রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রের একটা বড় বিভাগ ছিল এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা অধ্যাপকদিগের সহিত সহযোগ করিয়া ইহা পরিচালনা করিতেন। ওয়েলেসলীর ইচ্ছা ছিল যে গার্ডেন রিচে একটা বড় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া কলেজকে সুপ্রোথিত করা—তাহাতে সমস্ত অধ্যাপকগণ থাকিবেন, ৫০০ ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়া একটি বৃহৎ পাঠাগার, বক্তৃতাশালা, ভোজনাগার এবং আনুষঙ্গিক গৃহাদি থাকিবে।

বহু উদারচেতা ইংরাজ এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটা কোম্পানী কর্ত্তৃক এত বড় সাম্রাজ্যের পত্তন হওয়ার ব্যপদেশে এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা আর কোথায়ও হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ভারত সরকারের সঙ্গে এদেশের প্রধান প্রধান লোকের একটা মিলন-স্থল স্বাভাবিক ক্রমে এই ভাবে গড়িয়া উঠিলে বোধ হয় পরবর্ত্তী নানা রাষ্ট্রনৈতিক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না; প্রাক্কালেই মিলনের পথ সুগম হইলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতদ্বৈধ এরূপ উৎকট হইয়া দাঁড়াইত না।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিপন্থী হইলেন মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৩৫ সন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রধানতঃ ইংরেজদের সহায়তায় যে অভূতপূর্ব্ব সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইয়াছিল—যাহাতে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য একরূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা মূলতঃ এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে।

মোগলাধিকারে বাঙ্গালী

মোগল রাজত্বেও দেখা যায় বাঙ্গলাদেশে প্রধান প্রধান যোদ্ধার অভাব হয় নাই। কিন্তু পাঠান আমলে হিন্দু রাজা ও অপরাপর ভুঞারাজগণ যেরূপ দিল্লীশ্বরের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, মোগল-যুগে আকবর-প্রতিষ্ঠিত বিপুল সাম্রাজ্যের আওতায় পড়িয়া বাঙ্গলার সে সাহস ও বীর্য্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্যতন্ত্রী মোগলের তীব্র লক্ষ্য মুসলমান বাদসাহগণের উপর যেরূপ ছিল, ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীবীরের উপরও সেইরূপ ছিল,—সেই শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া কেহ কিছু ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতে সাহস পাইত না। আরঙ্গেব অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা ছিলেন, পাছে কেহ দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিয়া শক্তি সঞ্চয় করে, এজন্য তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দিতেন না। আরঙ্গেব বলিয়া নয়, মোগল রাজত্বে এই সাম্রাজ্যতন্ত্র অল্প-বেশী সকল সম্রাটের রাজত্ব-কালেই দেখা যাইত। আরঙ্গেবের সময়ে হিন্দুদিগের উপর অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার চলিয়াছিল—সুতরাং সেই যুগে বাঙ্গালীরা কতকটা অসাড় ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি মুসলমান নবাবদিগের অধীনে থাকিয়া ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন এবং অনেক সময়েই বিশ্বস্ততা-নিবন্ধন

বাদসাহগণের প্রিয়পাত্র হইতেন। গোলাম হুসেন দেখাইয়াছেন যে, আরঙ্গেব তাঁহার নানা প্রকার অত্যাচারের অনুমোদনে গোঁড়া মৌলভীদিগের নিকট উৎসাহ পাইতেন। তাঁহার কাফের-দলনের সদিচ্ছার জন্ত ইহারা তাঁহাকে নিরন্তর "বিশ্বাসী সম্রাট্" (Faithful Emperor) "সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়" (The cherisher of religion) ইত্যাদি উপাধি দিয়া স্তোক-বাক্য বলিতেন, ফলতঃ ইহাদের দ্বারা দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। আরঙ্গেবের শত্রুরাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি অতি দৃঢ়হস্তে শাসন করিতেন, সুতরাং তৎকৃত অন্তায়গুলিদ্বারাও দেশের শাসনযন্ত্র শিথিল হইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী সম্রাটগণের অর্থগৃধ্নুতা এবং শক্তিসামর্থ্যের অভাবে দেশ উত্তরোত্তর ধ্বংসের মুখে চলিতে লাগিল; যাঁহারা আইনজ্ঞ ও সুবিচারক তাঁহারা ক্রমশঃ হটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত দুষ্টচরিত্র লোকেরা সিংহবিক্রমে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। ("At last the office of the Cazy or Judge and that of Sadar or great Almoner, with many other Magistratures came to be publicly put up to sale, so that the people skilled in law and in distributive justice, entirely disappeared from the land; nor was anything else thought of, but how to bring money to hand by any means whatever." (Mutakharin, Vol. III, p. 160.) বাঙ্গলাদেশে এই অর্থগৃধ্নুতার ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন্ত 'বৈকুণ্ঠের' ব্যবস্থা হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমাণে বুঝা যাইবে—সামান্ত হিন্দু প্রজারা যে কত সহিয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল। মোগলের সাম্রাজ্যতন্ত্র অর্থকেই মূলমন্ত্র করিয়া সমস্ত প্রদেশে এই বিষের আওতা প্রসারিত করিয়াছিল।

সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বেও হিন্দুরা সামরিক ব্যাপারে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা অবশ্যই নিরস্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্য্যেবীর্য্যে তখনও বঙ্গেশ্বরগণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে —বিশেষতঃ রাজস্বসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যে—তাঁহারা অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। গুণপনা দেখিয়া নবাবেরা জাতি বা ধর্ম্ম গ্রাহ্য না করিয়া ইহাদিগকে উচ্চতম পদ দিয়াছিলেন। মোগল ও পাঠান উভয় জাতির মধ্যে যেরূপ অবিশ্বাস ও কৃতঘ্নতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতে দেখা যায়, হিন্দুদিগের মধ্যে সেইরূপ বিশ্বাসের অভাব কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু সিরাজের সর্ব্বনাশসাধনে কয়েকজন হিন্দু বড়লোক মুসলমান-চক্রীদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। মুসলমানের অধিকার-বিলোপের পর সেই সকল বিক্রান্ত ওমরাহ ও নবাব কোথায় গেলেন? বঙ্গদেশের জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁহারা মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িলেন। শত অত্যাচারেও হিন্দু স্বীয় চরিত্রবল বজায় রাখিয়াছেন, এজন্তই তাঁহারা এপর্য্যন্ত টিঁকিয়া আছেন, অন্ত কোন জাতি হইলে ভীষণ অত্যাচারের ফলে হয় তাঁহারা বিজেতাদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের নিয়স্তরে কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিবার একটা অবকাশ করিয়া লইতেন, নতুবা নির্ম্মূল হইয়া যাইতেন। কতক পরিমাণে ধর্ম্মচ্যুত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও আজও বঙ্গে হিন্দুরাই প্রবল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আমরা বহু হিন্দুকে শাসন-বিভাগের শেখরদেশে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ঢাকার দেওয়ান যশোবন্ত রাও নবাব সরফরাজ খাঁর শিক্ষা-গুরু ছিলেন। তিনি এই সময়ের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাদবাক্য হইয়া আছে। তাঁহার রাজধানী রাজনগরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিরাশি—দোলমঞ্চ, নবরত্ন, একুশরত্ন প্রভৃতি বহু হর্ম্ম্য কীর্ত্তিনাশার অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে—এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরামের ভ্রাতা রাসবিহারী পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মকুশলতা দ্বারা নবাবের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঐ নবাবের (সকৎজঙ্গ) অন্যতম প্রিয়পাত্র কায়স্থ শ্যামসুন্দর তাঁহার কামান ও অস্ত্রশস্ত্র-বিভাগের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে সকৎজঙ্গ তাঁহার মুসলমান সেনাপতিদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা থামের মত দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? দেখ্‌ছ না হিন্দু শ্যামসুন্দর অগ্রগামী হইয়া কেমন যুদ্ধ করিতেছে!" একথা পূর্ব্বে একবার লেখা হইয়াছে। রাজা রামনারায়ণ ও সুন্দরসিংহ পূর্ণিয়া ও মুরসিদাবাদের যুদ্ধবিগ্রহে প্রধান কর্ম্মিরূপে নবাবদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। মুতক্ষরিনে ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত আছে। আলমচাঁদ রায়রাঁয়ার পুত্র দেওয়ান রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়-রাঁয়া নবাবের রাজস্ব-বিভাগের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জগৎ শেঠ ও বর্দ্ধমান রাজার এককোটী কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব আলিবর্দ্দীর দপ্তরে বহুদিন যাবৎ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, উহার অস্তিত্বও নবাব সরকারে বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র এই হিসাব ধরাইয়া দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আলিবর্দ্দীর রাজভাণ্ডারে প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। দুর্লভরাম রাজস্ব-বিভাগে আলিবর্দ্দীর সরকারে অনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার অসামান্য যোগ্যতার জন্যই ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন। তরুণবয়স্ক মোহনলাল সিরাজের সর্ব্ববিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব চালাইতেন,—দুঃসহ অভিমানে দুর্লভরাম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন; মুতক্ষরিনে লিখিত আছে, মোহনলাল পলাশীর ক্ষেত্রে বন্দী হইয়া ইঁহারই করতলগত হইয়া নিহত হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা, আলিবর্দ্দীর জামাতা, ঘেসেটি বেগমের স্বামী নবিসমহম্মদ খাঁন দয়াদাক্ষিণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি মাসিক ৩৭ হাজার টাকা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে গরীব, বৃদ্ধ ও দুঃস্থদিগের মধ্যে দান করিতেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন আজীব রায়, এই বিশ্বাসী দেওয়ানের সহযোগে পুণ্যবান্ নবাব সর্ব্বজন-প্রিয় আদর্শ-নৃপতি হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান মানিকচাঁদকে নবাব ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ১০০০ পদাতিকের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই দুর্গরক্ষার ভার দিয়া চলিয়া যান। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যসময়ে আরও বিস্তর হিন্দুরাজকর্ম্মচারীর কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, ইঁহারা শান্তিপ্রিয় হইলেও রণক্ষেত্রে সিংহবিক্রান্ত ছিলেন। আলিবর্দ্দী যখন মহারাষ্ট্রীদের হাতে পড়িয়া দুর্গতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন এক বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু রাজা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া ভ্রম-

বশতঃ বিপথে লইয়া গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি এতদূর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন যে তিনি নিজের তরবারি দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সীতারাম রায় নামক এক হিন্দু কর্ম্মবীর, অতি অল্পবেতনের কর্ম্মচারীর পদ হইতে আজিমগঞ্জের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়াছিলেন। ইংরেজের পক্ষ হইয়া ইনি ফরাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তদীয় সেনানীদিগের সাহস ও রণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা গোলাম হসেন করিয়াছেন (মুতক্ষরিন, ১৫০ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড)। ইনি ক্লাইভকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া রাজনৈতিকক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের কথা মুতক্ষরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ইনি আজিমগঞ্জ ফলফুলের বাগানগুলির উন্নতিসাধন ও সাধারণকে বিনা ব্যয়ে তাহাদের উৎপন্ন ফলভোগ করিবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা সুন্দরসিংহের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইনিও সেই যুগের একজন সর্ব্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এক নর্ত্তকীর পুত্র গোলাম ঘোউস্ ইঁহারই প্রাসাদে বড় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ইঁহাকে নিহত করেন। বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দ্দীর অতি-বিশ্বস্ত জানকীরামের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। এখানে বলা উচিত বঙ্গদেশের এই যুগে কায়স্থগণই অধিকাংশ সময়ে বড় বড় রাজ-পদবী ও সমরকুশলতার খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কায়স্থ জাতি।

ক্লাইভ ও মীরজাফর যখন সিরাজের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া পরস্পরের বখরার টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন নবাবের অন্তঃপুরে যে বিরাট্ ধনাগার লুক্কায়িত ছিল তাহার সন্ধান ক্লাইভ পান নাই। কথিত আছে নগদ আটকোটি টাকা ও বহু মণিমুক্তা ও জহরৎ রাজ-অন্তঃপুরে ছিল। মীরজাফর ও লাভকৃষ্ণ নামক ক্লাইভের এক দেওয়ান এই টাকা আত্মসাৎ করেন। লাভকৃষ্ণ ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ৬০ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। ইঁহার দশবর্ষ পরে মরিবার সময়ে তিনি নগদ ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিজমা ও ৪০০ শত প্রকাণ্ড ঘড়া প্রভৃতি রাখিয়া যান। এই ঘড়াগুলির ৮০টির মধ্যে খাঁটি সোনার মুদ্রা ও বাকী ৩২০টিতে রৌপ্য-মুদ্রা ছিল।

ক্লাইভের প্রধান মন্ত্রী (দেওয়ান) ছিলেন রামচাঁদ। আমি শুধু নবাবের কর্ম্মচারীদেরই কথা এখানে বলিলাম। রাজাদের কথা বলিবার অবকাশ এখানে নাই। এই কাহিনী পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে, স্বাধীনতা-হারা হইলেও হিন্দুগণ রাজসরকারে সম্মানিত সমস্ত পদই প্রাপ্ত হইতেন। ধর্ম্মের বাধা থাকিলেও অধিকাংশ বড় কর্ম্মচারীরাই হিন্দু ছিলেন, এবং ধনৈশ্বর্য্যে জগৎ শেঠ শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা হিন্দু সেনাপতিদের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা পাইতেছি এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণই ইহা কহিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর ইতিহাস হিন্দুরা লিখেন নাই, হিন্দুর কথা হিন্দু নিজে কহেন নাই। তথাপি অনেক বাদ দিয়া বিদেশীয়েরা এদেশীয় লোকের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতেও চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এই সময়ে আহাম্মদাবাদের নবাব দাউদ খাঁর এক হিন্দু স্ত্রী ছিলেন। রাজমহিষী যখন পূর্ণগর্ভা তখন নবাব মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হিন্দু স্ত্রী সহমরণ যাওয়ার জন্ম উতলা হইয়া পড়েন, কিন্তু এখনতো তিনি রাজকুমারী হইয়াও মুসলমান নবাবের পত্নী—বেগম। স্বামিদত্ত একখানি ছোরা তাঁহার ছিল। তিনি চিতানলে উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই ছোরা দিয়া স্বয়ং অতি কৌশলে স্বীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে ধাত্রীর হস্তে দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ম মিনতি করিয়া শান্ত সমাহিতভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। স্থির মস্তিকে এমন কাজ জগতে হিন্দুমহিলা ভিন্ন কে করিতে পারিত? মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা প্রণীত রাজাবলীতে পৌরাণিক এক রাজসীমন্তিনী সম্বন্ধে এইরূপ একটি উপাখ্যান পড়িয়াছিলাম। ধার-রাজ-কন্যা স্বীয় স্বামী গন্ধর্ব্বসেনের মৃত্যুতে শোক-কাতরা হইয়া "তীক্ষধার এক ছুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার প্রাণবিয়োগ হইল। বালক অক্ষত দেহে গর্ভ হইতে নির্গত হইল।" মুতক্ষরিনে লিখিত আছে :—
"Daud Khan (of Ahamadabad) had left a consort by whom he was tenderly loved. She was the daughter of a zemindar or great landlord of that kingdom where it was a standing rule, that some of these gentoo (Hindu) Princes should give their daughters to the viceroy in being. This lady who had been initiated in the Musalman religion, on her entrance into the seraglio, was now pregnant and seven months gone with the child and she had entreated for the liberty of following her husband of whom at his departure, she had obtained his poignard, as a token of his love. The news of his death in the middle of a victory having now reached Ahamadabad, she took the poignard, and opening her own belly with a precaution and dexterity that amazed everyone, she carefully drew out the child and tenderly recommended it to the by-standers, after which few words, she expired." (Mutakbarin, Vol. I, p. 96.) এই আহম্মদাবাদের হিন্দুরমণীর সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত সতীর নাম করা যাইতে পারে। আমরা খাস বাঙ্গলাদেশের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব—ইনি বর্দ্ধমানের সুন্দরী রাজকন্যা। ইনি শোভা সিংহকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। শোভা সিংহ বৰ্দ্ধমান আক্রমণ করিয়া রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করেন, রাজ-হন্তা, মহাক্ষমতাশালী শোভা সিংহ রাজকুমারীর প্রেমপ্রার্থী হইয়া তাঁহার শয্যাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অনেক অনুনয়বিনয় করেন, তৎপরে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিতে গেলে—["she drew from under her garment a knife which she had concealed in hopes of finding an opportunity to gratify her revenge. With this weapon she ripped up his belly." ("Narrative of the Govt. of Bengal" by Francis Gladwin, 1788, pp. 5-8.] রাজকুমারী প্রতিহিংসা লইবার জন্ম যে শাণিত ছুরিকাখানি বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা শোভা সিংহের পেটে বিঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ—আদিযুগ

"নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি তৃষা॥"—নিধুবাবু।

বাঙ্গলা ভাষা বা পৃথিবীর যে কোন ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা। আদিযুগের মানব প্রথম যে ভাষা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই যুগে যুগে রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। এই অচিহ্নিত আদিস্থান খুঁজিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। বাঙ্গালী যতদিন, বাঙ্গলা ভাষা ততদিন ;—কারণ এমন কোন যুগ নাই, যখন এদেশের লোক কথা কহে নাই। পূর্ব্বে এই দেশের ভাষাকে পণ্ডিতেরা ঘৃণা করিয়া 'প্রাকৃত' বা শুধুই 'ভাষা' নাম দিয়াছিলেন, তারপর সংস্কৃত ভাষার লোকেরা ইহাকে 'গৌড়ীয় ভাষা' নামে অভিহিত করিতেন, 'বাঙ্গলা ভাষা' নামটা খুবই আধুনিক।

তবে এই ভাষায় কবে পুস্তক, কবিতা, নীতিসূত্র ইত্যাদি নানাবিষয়ক রচনা হইতে সুরু হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকেরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা বুঝে না। কিন্তু তাহাদের মনেও আনন্দ, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাবের উচ্ছ্বাস বহিয়া যায় ; আনন্দ ও দুঃখের আতিশয্যে কথার সুর আসে ; সেই সুরই গান, সেই সুরই বেদ ; সামবেদে তাহা রাগ-রাগিণীতে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষায়ই যেন তাহা লিপিবদ্ধ হয়। এই আদেশের ফল "ধম্মপদ।" শুধু ধম্মপদ নহে, হীন-যানাবলম্বী বৌদ্ধগণের সমস্ত সমৃদ্ধ পল্লী-সাহিত্য। এই পল্লীভাষার নাম হইল পালি। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারও এই একসঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হয়। পণ্ডিতেরা যে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং যাহা পাণিনি ও অপরাপর বৈয়াকরণ বহু গবেষণা ও বিজ্ঞান-সঙ্গত অনুশীলন দ্বারা সুধীমণ্ডলীর গ্রাহ্য এবং একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর—সেই ভাষার নিয়স্তরে আর এক ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়া গেল এবং তাহাও কালে এতটা বিশুদ্ধ ও উন্নত হইয়া গেল যে তজ্জন্যও পুনরায় ব্যাকরণ-সঙ্কলনের প্রয়োজন পড়িল। এই ভাষার সাধারণ নাম প্রাকৃত। সাহিত্য-দর্পণকার ইহার ১৮ প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির সংখ্যা আরও অনেক বেশী।

এক সময়ে এই ভাষাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রী ও মাগধী ভাষাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। আর্য্যভাষায় ইহাদের ভিত গড়িয়া উঠিলেও তৎসঙ্গে বহু দেশজ আদিম ভাষার শব্দ এই প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশে যে প্রাকৃত কথিত হইত, তাহার অনেকটাই অর্দ্ধ-মাগধী নামে পরিচিত ছিল। আমরা অনেকবার লিখিয়াছি, বাঙ্গালীরাই মগধের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং আদিকালে কথিত বাঙ্গলা ভাষার উপর মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, শুধু অর্দ্ধমাগধী নহে, পৈশাচিক প্রাকৃতেরও কতকগুলি লক্ষণ এই ভাষায় স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, এই সকল ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার স্থান বা অবকাশ আমাদের নাই।

বৈদিক যুগের ভাষার ব্যাকরণ আছে, তাহার সাহায্যে বৈদিক-সাহিত্যে আমরা প্রবেশ লাভ করিতে পারি। দ্বিতীয় যুগে আর্য্যভাষা সংস্কৃত; পাণিনি ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন বৈয়াকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বোপদেব এবং ক্রমদীশ্বর পর্য্যন্ত শত শত পণ্ডিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় যুগে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এই দুই ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিত হয় এবং ইহাদের রীতি, নীতি, রচনাপ্রণালী ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্তও ব্যাকরণের অভাব হয় নাই।

ভাষার তিন যুগ।

ক্রমে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের অনধিগম্য হইয়া উঠিল। অলঙ্কার-শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিল, সুতরাং জনসাধারণের সুখদুঃখ ও মনের ভাব বুঝাইবার পক্ষে ইহারা আর উপযোগী রহিল না, তখন জনসাধারণের কথিত ভাষায় পুনরায় সংগীত ও প্রবচনাদি রচিত হইতে লাগিল। সংস্কৃতের আদিযুগে পণ্ডিতেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে "প্রাকৃত" নাম দিয়াছিলেন,—এই নাম কতকটা ঘৃণাব্যঞ্জক; শিক্ষিতগণের গণ্ডীর বহির্ভূত লোকেরা "প্রাকৃত" সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ দিকে সন্দিগ্ধচিত্ত রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সীতা বলিয়াছিলেন, "রাম, তুমি প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ তাহার স্ত্রীকে গালি দেয়, সেইরূপ অপভাষা ব্যবহার করিতেছ কেন?" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, 'প্রাকৃত' শব্দের প্রতি আর্য্যগণ কি ভাব পোষণ করিতেন।

বাঙ্গলাদেশে যে সকল পুস্তক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা কি হইল—এই প্রশ্ন সহজেই মনে হয়। প্রাকৃত ভাষায় সাধারণতঃ বৌদ্ধগণই গ্রন্থাদি রচনা করিতেন, সুতরাং অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পরাভূত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুঁথি, তথা ঐ ভাষার প্রভাব, এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। সেন-রাজাদের সময় হইতে সংস্কৃতের উপর লোকদের অত্যধিক ঝোঁক হইল। সুতরাং সংস্কৃত নাটকাদিতে স্ত্রীলোক ও ইতর ব্যক্তিদের কথোপকথনের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা ছাড়া এদেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক খুব অল্পই দেখা যায়—কতকটা নিশ্চিহ্ন হইয়া প্রাকৃত ভাষা উত্তর-ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। "গৌড়বহ"

'ব্রজবুলি' এ দেশপ্রচলিত প্রাকৃতের নিদর্শন কিনা?

প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক আমরা প্রাকৃত ভাষায় পাইতেছি। নেপালের পার্ব্বত্য উপত্যকায় এই প্রাকৃতের নিদর্শন কিছু কিছু আছে, যেহেতু বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পুঁথি-পত্র লইয়া তদ্দেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় গোবিন্দদাস, ঘনশ্যাম, রায় শেখর প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব কবি যে ভাষায় পদ লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা সাধারণতঃ "ব্রজবুলি" বলিয়া পরিচিত,—তাহার উপর মৈথিল কবির প্রভাব খুব বেশী হইলেও উহা হয়ত এদেশ-প্রচলিত প্রাকৃতের প্রাচীন ধারাটি বজায় রাখিয়াছে। গোবিন্দ দাসাদি কবি যে হঠাৎ একটা নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। কোন স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় একটা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না। ব্রজবুলির সঙ্গে মৈথিলীর সাদৃশ্য থাকিলেও ব্রজবুলি মৈথিলী নহে।

ব্রজবুলি।

দুই কারণে আমাদের এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রাকৃত ভাষা লিখিবার জন্ত ব্যবহৃত হইত, ইহা অনুমান করিবার কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃতের টোলে পঠিত হইত—তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শুধু নাটকে প্রাকৃত আছে বলিয়াই যে উহা অধীত হইত, এরূপ অনুমান হয় না,—নিশ্চয়ই প্রাকৃত ভাষা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা না হইলে প্রাকৃত ও পালি উভয়বিধ ভাষা শিখিবার ব্যবস্থা এক সময়ে সংস্কৃত টোলে থাকিবে কেন, গৌর-পদ-তর ঙ্গিণীর একটি পদে দৃষ্ট হয় গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতন্ত দেব পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কাব্য-কথা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক না হইলেও অনেক সময়ে ইতিহাসের ইঙ্গিত উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে; কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয় "বানিয়ার বালা" শ্রীমন্ত প্রাকৃত পিঙ্গলাদি পাঠ করিতেছেন, ভারতচন্দ্রও প্রাকৃত জানিতেন, স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। জয়-নারায়ণ প্রভৃতি কবির লেখায়ও ইহার ইঙ্গিত আছে। যদি শুধু নাটকাদি পাঠ করিবার জন্তই প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা হইত, তবে এখনকার টোলগুলিতেও পালি ও প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা থাকিত।

দ্বিতীয়তঃ রূপ গোস্বামিকৃত প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত কবিতা চৈতন্তচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে, "ধরিঅ পবিচ্ছন্দং রূপং সুন্দরং" ইত্যাদি পদে বিদ্যাপতির প্রভাব আদৌ নাই। এই প্রাকৃতই কতকটা সহজ করিয়া এবং বিদ্যাপতির ভাষার কতকটা অনুগ করিয়া গোবিন্দদাসাদি কবিরা পদ লিখিয়াছিলেন। এদেশ-কথিত প্রাচীন কালের লিখিত প্রাকৃতই উত্তর কালে "ব্রজবুলি" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বস্তুতঃ উহা হাওয়া হইতে আসে নাই। দুই কারণে এই প্রাকৃত মৈথিল ও বৃন্দাবনী (ব্রজ) ভাষার বেশী সন্নিহিত হইয়াছে। (১) বিদ্যাপতির অনুকরণ, (২) বাঙ্গলা দেশের বাহিরে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-প্রচার। গোবিন্দদাসাদি কবি এই ব্রজবুলি আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বতোগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। একদিকে উড়িষ্যা অপর দিকে মথুরা, বৃন্দাবন, এমন কি রাজস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদের গানের শ্রোতা জুটিয়াছিল—ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি পুস্তক পড়িলে ইহা বুঝা যাইবে। ব্রজবুলি প্রাকৃত কবিতারই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে।

চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগে যেখানে বৌদ্ধ প্রভাব (হীনযানী বৌদ্ধ) বহুদিন পর্য্যন্ত বজায় ছিল, সেখানে "গীতি-কথা"র অন্তর্ব্বর্ত্তী কবিতাগুলিকে "পালি" বলে। ইহাতে মনে হয়, পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ গদ্যভাগ কথিত প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্তি করিয়া গানের অংশগুলিকে বিশিষ্টতাদান করিবার জন্য উহা পালি ভাষার রচনা করিতেন।

উড়িয়া, হিন্দী, বাঙ্গলা, মৈথিলী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অনেকটা একরূপ ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য খুব বেশী ছিল। এই কারণে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সঙ্কলিত দোহাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা-ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু "বৌদ্ধ দোহা ও গান" এবং "ডাকার্ণব" কখনই বাঙ্গলা ভাষার আদিরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাদের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্যই বেশী। যে সকল শব্দ 'বাঙ্গলা শব্দ' বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অপরাপর লক্ষণ অনুধাবন করিলে ঐ সকল দোহা ও গানের ভাষা হিন্দী প্রভৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়। স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিবিধ ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের এই মত, এবং যতদূর জানিয়াছি তাহাতে ডাঃ সিলভ্যান লেভি, ডাঃ ব্লক ও ডাঃ গ্রিয়ারসনেরও কতকটা এই মত। যদি এ কথাও প্রমাণিত হয় যে এই সকল লেখকদের মধ্যে কোন কোন জনের বাড়ী বঙ্গদেশে ছিল, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সেই সেই লেখক বঙ্গ ভাষায় দোঁহা লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ইহা মনে করাই বেশী সঙ্গত যে তাঁহারা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদের লেখার টীকা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইবে কেন? সেই সকল কবিতার ভাষার লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয় না, পার্শ্ববর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষাগুলির কোন কোনটির সঙ্গেই তাহাদের বেশী সাদৃশ্য। এই দোঁহা লেখকদিগের কেহ কেহ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন। সেই যুগের খাঁটি বাঙ্গলার দৃষ্টান্ত দুর্লভ হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি, গোরক্ষবিজয়—ডাক ও খনার বচন প্রভৃতির ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের মাঝে মাঝে কতক কতক অংশ সেই আদত ভাষা বজায় রাখিয়াছে, দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে—শূন্যপুরাণের গদ্যাংশ, যেখানে পূজা-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, ডাকের অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত প্রবচনগুলি যথা—আতুর-বিধি, স্ত্রী-চরিত্র এবং পিতাপুত্র কলহ সংক্রান্ত সূত্রগুলি, গোরক্ষ-বিজয়ের সাধনা-সম্বন্ধীয় একত্রিশটি প্রশ্ন—এই সকল অংশ কতকটা অবিকৃতভাবে প্রাচীন বাঙ্গলার প্রকৃতি রক্ষা করিয়াছে; এবং দুই শতাব্দী পরে লিখিত চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা খাঁটি আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ জানাইয়াছেন। সুতরাং একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভাষার দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে একেবারে বিরল নহে। এই সকল দৃষ্টান্তের সঙ্গে বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা মিলাইয়া পড়িলে একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। এমন কি কাহ্নুপাদের ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন 'র' বা 'এর' যাহা

বৌদ্ধ দোহা ও গান।

বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়—তাহার উদাহরণও অপরাপর ভাষায় দুর্লভ নহে। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, অপরাপর দোঁহাকারেরা যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ বাঙ্গলা নহে, কিন্তু কানুপাদের ভাষার মাঝে মাঝে বাঙ্গলার লক্ষণ একটু একটু দৃষ্ট হয়,—কিন্তু তাহা এত প্রচুর নহে যে তদ্দ্বারা উহা বাঙ্গলা ভাষারই আদিরূপ বলিয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত হইতে পারে। "ডাকার্ণব" নামধেয় পুস্তক একেবারে দুর্বোধ; শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় নিজেই লিখিয়াছেন যে উহার এক বর্ণও তিনি বোঝেন নাই, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তথাকথিত নবম কি দশম শতাব্দীতে লিখিত রচনার মধ্যে তিনি কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন দিয়া এবং মাঝে মাঝে দাঁড়ি টানিয়া তাঁহার সংস্করণটি বাহির করিয়াছেন। এই সকল চিহ্ন তিনি নিশ্চয়ই মূল পুঁথিতে পান নাই।

বৌদ্ধ দোঁহা ও গান ছাড়িয়া দিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে খাঁটি বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা করিব।

সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার যে রূপটি ছিল, তাহা প্রাকৃত শব্দবহুল। বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষাকে বহু প্রাচীন বাঙ্গলা লেখক "প্রাকৃত" সংজ্ঞায়ই অভিহিত করিতেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃতের প্রভাব চণ্ডীদাসের সময় হইতে আমরা পাইতেছি। সেই প্রভাবের লক্ষণগুলি এই—(১ বহু আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, যাহা সেকেলে পাড়াগেঁয়ে লোকেরা ব্যবহার করিতেন না। (২) সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত উপমার ছড়াছড়ি যথা—উরুর সহিত কদলী-তরু-কাণ্ডের, বাহুর সহিত নাগের এবং উহা আজানুলম্বিত বলিয়া বর্ণনা, কর্ণের সঙ্গে গৃধিনীর কানের, স্কন্ধ বৃষের ন্যায়, মুখের সহিত পদ্মের, কণ্ঠের সঙ্গে কম্বুর, অধরের সঙ্গে পক্ক বিম্বের, স্তনের সঙ্গে শ্রীফলের, গমনভঙ্গীর সঙ্গে গজপতির কিংবা রাজহংসের গতির, চক্ষুর চাঞ্চল্যের সঙ্গে খঞ্জনের গতির, বেণীর সঙ্গে ভুজঙ্গের ইত্যাদি। (৩) বিষয়গুলির বিস্তারিত বর্ণনা ও একই কথার পুনরাবৃত্তি। (৪) ব্রাহ্মণের প্রতি অগাধ ভক্তি। (৫) প্রতিবিষয়ে দেবতার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা। (৬) দেবতার ও দৈবের উপর অচলাভক্তি ও বিশ্বাস।

বাঙ্গলার নাম প্রাকৃত।

মোটামুটি এইগুলি চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত পাঁচ শতাব্দীর ভদ্র-সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত, এইরূপে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া সব সময়ে আমাদিগের কালের পৌর্ব্বাপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত হইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক ভাগ সংস্কৃত-প্রভাবের পূর্ব্ববর্তী ও অপর ভাগ সংস্কৃত-প্রভাবের অনুবর্তী। প্রথম ভাগের আদিকাল নবম কি দশম শতাব্দী কিন্তু তাহা এখনও শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগের উৎপত্তি চতুর্দ্দশ শতাব্দী এবং ইহারও শেষ হয় নাই। প্রথম যুগের ভাষা ও ভঙ্গীতে এখনও হয়ত বাঙ্গলার কোন নিভৃত পল্লীতে বসিয়া নিরক্ষর কবি গান বাঁধিতেছেন বা গল্প রচনা করিতেছেন, তাহা একান্তরূপে সংস্কৃত

প্রভাব-বর্জ্জিত এবং সেই আদি যুগের লক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রভাবান্বিত সাহিত্যেরও প্রচেষ্টা এখনও অস্ত হয় নাই, হয়ত এখনও কোন কবি কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের অনুকরণে গণেশ ও সরস্বতী-বন্দনা লিখিতেছেন। ইতিমধ্যে নব জাগরণের দিনে 'দম্ভোলি' 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দযোগে মধুসূদন গ্রীকরীতির অনুবর্ত্তী হইয়া ইলিয়ড্ বা প্যারাডাইস্ লষ্টের অনুকরণে যে মহাকাব্য রচনা করিয়া গেলেন, কিংবা রবীন্দ্রের শতবেণুবীণা-মুরজমন্দিরানিন্দিত গীতিধ্বনি বঙ্গীয় কুঞ্জে ধ্বনিত হইয়া গেল—তাঁহাদের রচনায়ও সেই সংস্কৃত প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুতরাং লক্ষণ দেখিয়া—(কালের হিসাবটা কতক পরিমাণে আড়াল রাখিয়া) সাহিত্যকে আমরা পূর্ব্বকথিত দুইশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লইব। প্রথম শ্রেণীতে ৯ম-১০ম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ও তদ্‌ভাবাপন্ন সমস্ত সাহিত্যকে অন্তর্গত করিয়া লইব। দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণগুলি কতক কতক নির্দ্দেশ করিয়াছি, এখানে প্রথম শ্রেণীর লক্ষণগুলি বিবৃত করিব—

(১) খাঁটি প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য। (২) উপমাগুলি কোন পুস্তক বা সাহিত্য হইতে ধার করা নহে—পাড়াগাঁয়ে যাহা সচরাচর চোখে পড়ে, তাহাই উপমা-রূপে ব্যবহার করা, যথা মুখের সঙ্গে 'মহুয়া' ফুলের, চোখের সঙ্গে 'অপরাজিতা' ফুলের, শুভ্র দন্তের সঙ্গে 'সোলা'র।

বেশী ধার।

উপমার বাহুল্য একেবারেই নাই। সংস্কৃত প্রভাবান্বিত সাহিত্যে যেরূপ বিস্তৃত রূপবর্ণনা, সংস্কৃতের কৃত্রিম উপমা ফেনাইয়া দীর্ঘ করা হয়, অথচ উহাতে কোন রূপবান্ বা রূপবতীর রূপ একেবারেই চিত্রিত হয় না, বৃথা পাণ্ডিত্যের কোয়াসার মধ্যে রূপ অদৃশ্য হইয়া যায়,—প্রাক্ সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা হয় না। অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে সুন্দর বা সুন্দরীর ছবি যথাযথরূপে স্পষ্ট হয়—যথা "সোণার তরুয়া বঁধু একবার দেখ, আমার নয়ন দিয়া একবার দেখ" (মহুয়া)—"শয্যায় পড়িয়া কন্যা, এলোথেলো বেশ। সারাটি পালঙ্ক জুড়ি আছে কন্যার দীঘল মাথার কেশ"—সেই মেরু-মান্দার-হংস-গৃধিনী-গজরাজ-নাগ প্রভৃতি উপমানের বাহুল্য-বিড়ম্বিত রূপ-বর্ণনা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্তভাবের দুটি ছত্রে অনাড়ম্বরে ব্যক্ত বর্ণনা চিত্রটিকে কত বেশী উজ্জ্বল শ্রী দান করিয়াছে! দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যগুলির প্রকৃতি বর্ণনায় এক ঘেয়ে কৃত্রিম সংস্কৃতের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কতকগুলি বাঁধা গৎ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। বসন্ত কাল হইলেই কোকিল ডাকিবে, ভ্রমর গুন্‌গুন করিবে; বর্ষা হইলেই ভেক ডাকিবে, কেয়াফুল ফুটিবে—এই ভাবে কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট কথা সমস্ত কাব্যেই পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কাব্যে, কবি নিজের চক্ষে প্রকৃতি দেখেন ও নিজের কাণে প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি শুনেন, তাই দুচার কথায় ছবি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মলুয়া গীতিকার পাড়াগেঁয়ে এঁধো পুকুর ও কদম-মন্দার ও কদলীসমন্বিত পুকুর-পাড়টি কবি যেন কয়েকটি ছত্রে একেবারে চোখের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন—"শাওনিয়া মেঘ শিরে, বজ্র ধরি মাথে। বউ কথা কও বলি কাঁদে পথে পথে।" মাথার উপরে বজ্র, ঝড় বৃষ্টি তুফানে সিক্ত শরীরটা উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহা

অগ্রাহের মধ্যে—পাখীটা তাহার প্রণয়িনীর মান ভাঙ্গিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "হাতেতে সোণার ঝাড়ি বর্ষা নেমে এসে" (কঙ্ক ও লীলা) এখানে সোণার ঝারি অর্থ বিদ্যুৎ।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের আর এক লক্ষণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা এমন কি আধুনিক ঔপন্যাসিক ও কবিরা যাহা একশত পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিতেন তাহা প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যের লেখকগণ দশ পৃষ্ঠায় শেষ করিবেন। ইহারা যাহা স্বচক্ষে দেখেন এবং নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তাহাই লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণ তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত ও সংস্কৃত কাব্যগুলির কথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না, যেখানে সেখানে উপলক্ষ পাইলেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, তীর্থভ্রমণের পুণ্য ও সংস্কৃত পুরাণের গল্পগুলি জুড়িয়া দিয়া স্বীয় কাব্য অযথা ভারাক্রান্ত করেন। পল্লীসাহিত্যে দেবলীলা একেবারেই দৃষ্ট হয় না। কর্ম্ম-গৌরবই নায়ক-নায়িকাদের প্রধান অবলম্বন। তাঁহারা বিপদের চূড়ান্ত ভোগ করিয়াও দেবতার নাম জপ করিতে বসিয়া যাইবেন না, বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। সংস্কৃতের প্রভাবান্বিত সাহিত্যের পথ একেবারে উল্টা—সেখানে নায়ক-নায়িকা বিপদে পড়িলেই স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া দিবেন এবং উদ্দিষ্ট দেবতা যে তখনই আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে ত্রাণ করিবেন, সে সম্বন্ধেও পাঠকের পূর্ব্ব হইতেই কোন সংশয় দৃষ্ট হয় না—এবং এইজন্ম চরিত্রগুলির অণুমাত্র স্বকীয় গৌরব লক্ষিত হয় না।

ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পূর্ব্বে বৌদ্ধনীতিই সমাজে কার্য্যকরী হইয়াছিল। বৌদ্ধনীতি কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; এই সূত্র অনুসারে কর্ম্মফল কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যেমন কর্ম্ম করিবে, তেমনি ফল ভোগ করিবে। এই জন্ম প্রাকৃ-সংস্কৃত সাহিত্যে নায়ক-নায়িকারা অবিরত কর্ম্মশীল। ব্রাহ্মণ্য নীতি ভক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া শেষকালে এদেশে বিকাশ পাইয়াছিল। বাঙ্গলা মহাভারতেও বৈষ্ণবগ্রন্থাদির শিক্ষা—একবার মাত্র হরিনাম করিতে যত পাপ নষ্ট হয় মানুষ একজন্ম তত পাপ করিতে পারে না। "সর্ব্বশাস্ত্রে বীজ হরি-নাম দ্বি-অক্ষর। আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর" (মহাভারত, আদি)। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রধান স্থান পায় নাই। ভক্তিই মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পন্থা। সুতরাং ব্রাহ্মণপ্রভাবান্বিত সাহিত্যে ভক্তির জয়জয়কার, পুরুষকার আড়ালে পড়িয়া গেল। মহুয়া প্রণয়ীকে যখন কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাইল না, তখন আত্মত্যাগ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল, কিন্তু তখনই ভাবিল আমার খোঁজা তো শেষ হয় নাই, সন্ধান করার কাজ বাকী আছে, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি নিরাশ হইব না, সুতরাং আবার খুঁজিতে আরম্ভ করিল। নিজের চেষ্টার চূড়ান্ত না করিয়া এই সকল নায়ক-নায়িকারা হাল ছাড়িয়া দেন নাই। নব ব্রাহ্মণ্যের পূর্ব্বে দেশে যে হিন্দুধর্ম্ম ছিল তাহা বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবান্বিত সাহিত্যে মশানে যাইয়া শ্রীমন্ত চণ্ডীর "চৌতিশা" আবৃত্তি করিতেছেন, গুণবন্ত রাজার গুণধর পুত্র মশানে বসিয়া ককারাদি করিয়া বর্ণমালার সমস্তগুলি অক্ষর দিয়া কালীর একএকটি নাম প্রস্তুত করিতেছেন। কালকেতুর ন্যায় মহাবীরও স্বীয় 'লোহার সাবলে'র

স্বায় দুই বাহু ও অস্ত্রশস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া চণ্ডীমাতার নাম স্মরণ করাই একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যে মানুষই বড়—দেবতার কোন হাত নাই। "সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।" এই জন্য সিদ্ধ ব্যক্তি ও তাপসগণ দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। হাড়িসিদ্ধা "সূর্য্যের পৃষ্ঠে রাঁধে বাড়ে চাঁদের পৃষ্ঠে খায়" এবং দেবরাজের পুত্র স্বয়ং তাঁহার অঙ্গে "চামর ঢুলায়।" ময়নাবুড়ি যমরাজকে তাড়া করিয়া তাঁহাকে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়াইতেছেন ও গোরক্ষনাথ চণ্ডীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নিজের তপঃপ্রভাব দেখাইতেছেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের যুগে কতকটা এইভাবে ব্রাহ্মণকে বাড়ানো হইয়াছে।

প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

প্রাক্-সংস্কৃত যুগের বঙ্গ-সাহিত্য।

১। পালরাজাদের গান ; এই গান এপর্য্যন্ত খুব অল্পই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রাজ্যপাল, ধর্ম্মপাল, মহীপাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে যে বাঙ্গলা গান ছিল তাহা অনুশাসনাদিতে উল্লিখিত আছে। মহীপালের গানের সামান্য অংশ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহার যে একটা দীর্ঘ পালা গান এখনও আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত চৈতন্য-ভাগবতে যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপাল সম্বন্ধে যে ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গীতিকাগুলির বহুল প্রচলন ছিল।

২। নাথ-গীতিকা ; নাথধর্ম্মের গুরুদিগের কীর্ত্তির বর্ণনা উপলক্ষে এই সকল গান বিরচিত হইয়াছিল। হাড়িসিদ্ধা ও ময়নামতীর অদ্ভুত শক্তি ও লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া ময়নামতী-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। ময়নামতী ছিলেন মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। বিক্রমপুরের "চন্দ্র"রাজাদের একজন ইহাকে বিবাহ করেন। ইহার নাম মাণিকচন্দ্র। ইনি উত্তরাধিকার-সূত্রে বিক্রমপুরের অনেকাংশের অধিকারী হইয়া শ্বশুরের পুত্র না থাকাতে মেহেরকুলও লাভ করেন, তাহা ছাড়া গৌড় অঞ্চলে রংপুর প্রভৃতি স্থানের একটা খণ্ডরাজ্যের ইনি ইজারা লইয়াছিলেন। তৎপুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র মাতার আজ্ঞায় অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, তখন ইহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর। গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের অদুনা ও পদুনা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ এই গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের ১০২৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ হইয়াছিল। নাথসম্প্রদায়ের আনুকূল্যে এই ময়নামতীর গান (অথবা মাণিকচন্দ্র-গাথা কিংবা গোবিন্দচন্দ্রের গীতি—প্রভৃতি নামবিশিষ্ট পল্লী-গীতিকা) একদিকে উড়িষ্যা অপর দিকে বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের বহুস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল।

গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ-চন্দ্র।

নাথ-গীতিকার মধ্যে গোরক্ষবিজয় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে যোগী গোরক্ষ-

নাথ কিভাবে তাঁহার গুরু মীননাথকে কদলীপত্তনে মহিলাবর্গের প্রতি অনুচিত আসক্তি ও তজ্জনিত অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। এই কাব্যে ফয়জুল্লা, ভবানীদাস প্রভৃতি কবির ভণিতা পাওয়া যায়।

৩। ধর্ম্মপূজার পুঁথি—ইহার রচয়িতা রামাইপণ্ডিত; বৌদ্ধধর্ম্ম শেষকালে ধর্ম্মপূজায় পরিণত হইয়াছিল। এই পূজার বিধিব্যবস্থাদি 'শূণ্যপুরাণ' ও "ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি" প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়। এই পুস্তকদ্বয়ে অনেক ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে।

৪। গীতিকথা, রূপকথা ও পল্লী-গাথা—প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যের ইহারাই মধ্যমণি—সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালীজাতির গৌরব। কিছুদিন পুর্ব্বেও ইহাদের অস্তিত্ব জানা ছিল না। রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজাদিগের সভায় রূপকথা শুনাইবার লোক ছিল। ভরত যখন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতুলদের সভার "কথা বলিয়ে"রা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নানারূপ গল্প বলিয়াছিল। শুধু রাজসভায় নহে, রাজান্তঃপুরেও কথা বলিবার জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল—ইহাদের নাম ছিল "আলাপিনী"। রাজান্তঃপুরে এই "আলাপিনী"দের প্রত্যহ কথা শুনাইতে হইত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান অধিকারে এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ সর্ব্বদা পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ পালরাজগণের সময়ে তাঁহাদের কীর্ত্তিকথা ইহারা গান বাঁধিয়া শুনাইত। তাম্রশাসনে উক্ত আছে যে ধর্ম্মপাল (?) নিজের প্রশংসাসূচক এই সকল গান ও গল্প শুনিয়া লজ্জায় মুখাবনত করিতেন। মুসলমানরাজাদের সময়েও এই 'কথা বলিয়ে'দের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আলিবর্দ্দী খাঁর সম্বন্ধে মুতক্ষরিনে লিখিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েই এই গল্পকারীদের মুখে গল্প শুনিতেন। মীরজাফরের পুত্র মীরন যেদিন ঘোর অন্ধকার ও ঝড়বৃষ্টি-পূর্ণ নিশীথে আজিমগঞ্জের নিকট গভীর অরণ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র শিবিরে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, তখনও তাঁহার সঙ্গে দুইটি গণিকা ও গল্প বলিবার জন্য একজন 'আলাপিনী' ছিল। এই গল্পকারিকাও সেই বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, গোলাম হুসেন এই উপলক্ষে একটা ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দুষ্টের সঙ্গে থাকে সেও সেই দুষ্টের গতি প্রাপ্ত হয়। আরঙ্গেবও রাজসভার গল্পকারক ও আলাপিনীদের পদ বজায় রাখিয়াছিলেন।

এই সকল "আলাপিনী" ও গল্পকারক রাজা ও রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাসাদে নিযুক্ত হইত, সুতরাং সুকৌশলে গল্প করার নীতি তাহাদের শিক্ষা করিতে হইত। রাজাদের আশ্রয়ে এতদ্দেশে যেরূপ অপুর্ব্ব চারুশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই গল্প বলিবার ভঙ্গী, বিষয়বর্ণন, চরিত্র, মূল ঘটনার বিবৃতি—গল্পকারীরা সেইরূপই আশ্চর্য্য কৌশলের সঙ্গে শিখিয়াছিল। এই গল্পের মধ্যে বৌদ্ধ জাতকের আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ, হিন্দুর নিষ্ঠা, পাতিব্রত্য এবং নরনারীর বিবিধ আদর্শগুণ এরূপ মনোরম ভাবে ফুটিয়া উঠিত, যাহার তুলনা ভদ্র-সাহিত্যেও বিরল। অথচ এক একটি গল্পে অফুরন্ত পরিহাস-রস এবং বালকের মনোরঞ্জনের উপযোগী উপাদানও থাকিত। কথাগুলির অধিকাংশই গদ্য, মাঝে মাঝে গান থাকিত—

ইহাদের যেমনই উচ্চশিক্ষা, তেমনই করুণরস; পাঠক কখনও হাসিবেন এবং কখনও কাঁদিবেন এবং এক সঙ্গে রৌদ্র-বৃষ্টির খেলা—আলো ও ছায়া—তাঁহার মুখে চোখে দেখা যাইবে। মাঝে মাঝে অলৌকিক ঘটনা থাকাতে বালকদের কল্পনা-শক্তি উদ্বোধিত হইবে। গীতি-কথাগুলির মধ্যে মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, আন্ধা বন্ধু শ্যামরায়, নছর মালুম, শঙ্খমালা, কাজলরেখা, ধোপার পাট প্রভৃতি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর। ইহাদের মত গল্প অন্য কোন ভাষায় আছে কিনা জানিনা। কারণ যে জাতির মসলিন সূক্ষ্ম শিল্পের অপ্রতিদ্বন্দী সামগ্রী, যাঁহাদের নব্যন্যায় সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির অতুলনীয় নিদর্শন, সেই জাতি ভিন্ন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের জাল বুনিয়া আর কে এরূপ গল্প রচনা করিবে? মনে হয়, উপনিষৎ, বৌদ্ধ জাতক, হিন্দু পুরাণ, রামায়ণাদি কাব্য প্রভৃতি সকলের রস নিংড়াইয়া এই গীতিকথা-গুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলার গার্হস্থ্য জীবনের মর্ম্মকথা যেরূপভাবে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

রূপকথা শুধুই ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য রচিত। ২২ জোয়ান ও ২৩ জোয়ানের কথা প্রভৃতি এই শ্রেণীর। ইহা সমস্তই গদ্যে রচিত। গীতি-কথার শ্রেষ্ঠত্ব ইহাদের নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় রূপকথাই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাশ্চাত্ত্যদেশ বিজয় করিয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা Folk Literature নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

পল্লীগীতিকা—ইহাদের খুব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটিই মুসলমান-রাজত্বের পূর্ব্বের নহে। সম্ভবতঃ পাল-রাজাদের প্রশংসা-সূচক যে সকল গাথা প্রচলিত ছিল—পল্লীগীতিকাগুলি সেই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে। গঙ্গার আদি খুঁজিতে যেরূপ হরিদ্বারে যাইতে হয়, এই পল্লীগাথাগুলির উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে হইলেও আমাদিগকে সেইরূপ সুপ্রাচীন হিন্দুরাজত্বে যাইতে হইবে। ইহাদের ভাব ও চরিত্রাঙ্কন সমস্তই নবব্রাহ্মণ্যের বিরোধী। ইহাদের অনেকগুলিতে মেয়েরা যৌবনে উপস্থিত হইয়া নিজেরা বর নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিতেছেন। নিজের মতের সঙ্গে অভিভাবকের নির্ব্বাচনের গরমিল হইলে তাঁহারা মনেও দ্বিচারিণী হইতে স্বীকৃত হন নাই, স্বীয় প্রণয়ীর গলেই বরমাল্য দিয়াছেন। ইহাদের কোন কোনটির মধ্যে সমুদ্র-যাত্রার বর্ণনা অতি চমৎকার। ব্রাহ্মণদিগকে এই সকল পল্লীগাথায় কোন স্থান দেওয়া হয় নাই এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নববিধানগুলি ইহারা অগ্রাহ্য করিয়াছে। সমস্ত পল্লীগাথা-সাহিত্যে একটা আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতার হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। এই স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা একদল গোড়া ব্রাহ্মণের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা গাথাগুলি হিন্দুবাড়ীতে এখন আর গাহিতে দিতেছেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান গায়কগণ ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার ওটেন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ধূমাচ্ছন্ন, বালুময় সহরের ধূসর আকাশ ছাড়িয়া হঠাৎ পদ্মার অবাধ হাওয়া ও আলোর মধ্যে আসিলে মন যেরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, কৃত্রিম সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়িয়া এই পল্লীসাহিত্যের সুখদ রাজ্যে আসিলে তেমনই আনন্দ হয়,

পল্লীগীতিকাগুলির কতটা আদর বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে হইবে, তদ্দ্বারা বুঝা যাইবে বাঙ্গালী তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার কতটা শক্তি রাখে। এই পল্লীগাথাগুলির সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে (৩৮৪-৪০২ পৃঃ) একবার আলোচনা করিয়াছি। মলুয়া, মহুয়া, চন্দ্রাবতী, রাণী কমলা, বণিক্ দুহিতা কমলা, দেওয়ানা মদিনা, মঞ্জুর মা, ভেলুয়া, নছর মালুম, সুরন্নেহা ও কবর, আন্ধা বন্ধু, শ্যামরায় প্রভৃতি গাথা উৎকৃষ্ট। আমরা বড় বড় কাব্য ও পুরাণে দুই চারিটি প্রধান নায়িকা পাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গাথাগুলির প্রায় প্রত্যেকটি স্বীয় দশ বার পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এক একটি অমর আলেখ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিহাস-বিশ্রুত ভারতের সাবিত্রী, সীতা, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির পার্শ্বে বঙ্গীয় গাথাগুলির নায়িকারা এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান লইতে পারেন। বসোরার বাগানের গোলাপের মত এই গাথাসাহিত্যে আদর্শ নারীগণ অফুরন্ত। ইঁহারা একছাঁচে ঢালা নহেন। পাতিব্রত্যই ইঁহাদের একমাত্র আদর্শ নহে, অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ্যবিধি লঙ্ঘিত এবং শ্যামরায়, আন্ধা বন্ধু প্রভৃতি পালায় পাতিব্রত্যকে আড়ালে ফেলিয়া একনিষ্ঠ প্রেম তাহার বিজয়ী ধ্বজা উত্তোলিত করিয়াছে। ইঁহারা সামাজিক নিন্দা-প্রশংসা দ্বারা তিলমাত্রও বিচলিত হন নাই। হিন্দু-সাহিত্যের সহিত অভ্যস্ত পাঠক চমৎকৃত হইয়া দেখিবেন এই গাথাকথিত মহিলারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ছাঁচে ঢালা, অথচ ইঁহারা কোন স্থানেই স্বভাবকে অতিক্রম করেন নাই। এমন কি আন্ধা বন্ধুর পালায় যখন রাজকুমারী স্বামীকে বলিয়া কহিয়া তাঁহার রাজ-প্রাসাদের শয্যাত্যাগ করিয়া একটা অন্ধ ভিক্ষুকের জন্য প্রেমের মাল্যহস্তে নির্ভীকভাবে চলিয়া গেলেন তখনও তাঁহার প্রতি দোষারোপ করার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় যেন বিশুদ্ধ একখানি স্বর্ণপ্রতিমার মত প্রেমের দেবতা বিস্ময় উৎপাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। মন্ত্রতন্ত্র, সামাজিক বিধি এই নৈসর্গিক খাঁটি নিষ্ঠার কাছে যেন ফুৎকারে উড়িয়া গেল। সহজিয়ারা যে পরকীয়া প্রেমের আদর্শ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলার হাওয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বাধীন ও একনিষ্ঠ প্রেমিকাদের এই সকল ছবি দেখিয়া। গাথা-রচকেরা সংসার পর্য্যন্ত সীমা-রেখা চিহ্নিত করিয়াছেন, সহজিয়ারা সেই চিহ্ন ডিঙ্গাইয়া যাইয়া ইঁহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—তোমরা ইঁহাদিগকে মাটীর মানুষ মনে করিয়াছ, কিন্তু ইঁহারাই স্বর্গের অধিবাসী; এইরূপ সমাজ-ভোলা সাহসিক প্রেমই ভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র পন্থা—"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না চিহ্নয়ে তারে, প্রেমের আরতি যেজন জানয়ে—সেই সে চিনিতে পারে"—চণ্ডীদাস। ইঁহাদের হৃদয়ের নির্ম্মল, যূথিকাশুভ্র সাধুত্ব এবং তপস্যা ও কষ্ট সহিবার অসীম শক্তি দর্শনে স্বতঃই হৃদয়ের অর্ঘ্য ইঁহাদের পায় দিতে ইচ্ছা হয়,—ইঁহাদের সমাজনিন্দিত দুঃসাহসিক কর্ম্মের জন্য অভিযোগের ভাষা মুখে আসিয়া ফিরিয়া যায়। এই গাথা-সাহিত্যে বাঙ্গলার সমাজ, রাজনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার, বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি নানাবিষয়ের যে উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে অমূল্য।

প্রবচন—ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। (১৯১৫-১৮ পৃষ্ঠা)।

বাঙ্গলার কতকগুলি ধর্ম্মকাব্য প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত, যথা—মনসামঙ্গল, শিবায়ন ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য এবং কৃষ্ণ-ধামালী। ইহাদের পত্তন দেওয়া হইয়াছিল প্রাক্-সংস্কৃত

মঙ্গল-কাব্য।

যুগে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে মহারাজ ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র মেদিনীপুরের ময়না গড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন কর্ত্তৃক কামরূপ (কাউর) ও 'অজেয়ঢেকুর' বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া লাউসেনের মাতুল মহামদের (মাহুত্মার) ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে। পাল-রাজাদের সময়ের এদেশের লোকের আদর্শ ও রাজভক্তি যে কত বড় ছিল, তাহার বহু আভাস এই কাব্যে দৃষ্ট হয়। হিন্দু রমণীর তপোবল রঞ্জাবতীর চরিত্রে উজ্জ্বল ভাবে আঁকা হইয়াছে। কালু ডোমের আশ্চর্য্য বীরত্ব ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে জীবন-ত্যাগ এবং বৌদ্ধ জগতের কতকগুলি গুণকে খুব রং ফলাইয়া দেখান হইয়াছে। লক্ষ্যার চরিত্রে অসামান্য রাজভক্তি, স্বামিপুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াও যে রাজভক্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, এদেশের অধস্তন স্তরের লোকেদের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিপন্ন করিতেছে। রাজদ্বারে সাক্ষ্য দেওয়ার বিভীষিকা হরিহর বাইতির চরিত্রে এবং হিন্দুললনার ধর্ম্মভীরুতা তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রে দৃষ্ট হইতেছে। ধর্ম্মমঙ্গলের আদিলেখক ময়ূরভট্টের রচনা এখনও সমস্তটা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু পরবর্ত্তী কবি মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, ঘনরাম ও সীতারাম প্রভৃতি কয়েক জনের কাব্য আমরা পাইয়াছি। এই সকল কবি ব্যতীত আরও বহুকবি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিরা ব্রাহ্মণ্যের আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ আদর্শ মিশাইয়া কাব্যগুলির গৌরবের হানি করিয়াছেন। এত বড় বীর লাউসেনকে ভক্তের পংক্তিতে ফেলিয়া তাঁহাকে দিয়া ধ্রুব-প্রহ্লাদের অভিনয় করাইতে যাইয়া—তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য সমস্তই মাটী করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি প্রত্যেক খানি ধর্ম্মমঙ্গলে হিন্দুরাজত্বের কিছু-না-কিছু উপকরণ আছে, তাহা অতীব মূল্যবান্; অনেক ভৌগোলিক ও প্রাচীন সমাজের তত্ত্ব এই পুস্তকগুলিতে পাওয়া যায়, শৈললিপি ও তাম্রশাসনগুলির সঙ্গে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি মিলাইয়া পড়িলে বঙ্গের ইতিহাস-সন্ধানী পাঠক অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। এখনও বহু কবির রচিত ধর্ম্ম-মঙ্গল বঙ্গের পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদের খোঁজ করে? এখনও অজেয়ঢেকুরে ইছাই ঘোষের শ্যামরূপার মন্দির, কর্ণগড়ে লাউসেনের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ সেই প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তি-কথা ঘোষণা করিতেছে! যে হরিপাল রাজার কন্যা কানেড়ার সঙ্গে লাউসেন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামাঙ্কিত হরিপাল-নগরী এখনও বিদ্যমান এবং তাঁহার বিশাল পুরীর বাহিরের দিক্‌টা এখনও 'বাহিরখণ্ড' বলিয়া পরিচিত। ইছাই ঘোষ তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্ক চলিতেছে এবং প্রাচীন রাজা পাইলে তাঁহাকে স্বশ্রেণীতে টানিয়া আনিয়া স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য কেহবা তাঁহাকে কায়স্থ, কেহবা সদগোপ, কেহবা গয়লা করিবার চেষ্টায় আছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা পঞ্জিকা-গুলিতে কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তিগণের মধ্যে লাউসেন, মহীপাল প্রভৃতির নাম ছিল। আধুনিক পঞ্জিকাগুলি অনাবশ্যক মনে করিয়া লাউসেনের নামটি তুলিয়া ফেলিয়াছে! মাণিক গাঙ্গুলীর

স্থায় ব্রাহ্মণ অতি-দ্বিধার সহিত বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিজ্ঞাপক এই পুস্তকের যখন একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তখন জাতি যাওয়ার ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা প্রথমতঃ বৌদ্ধ জগতের প্রাচীন কাব্যগুলি, যাহা জনসাধারণের হাতে ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াও এই সকল কাব্যের শ্রোতার সংখ্যা ও প্রাপ্তব্য অর্থের লোভবশতঃ শেষে সর্ব্ব সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একটা প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়া অবশেষে তাঁহারা এই বিষয় হাতে লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মমঙ্গলকে নূতন আদর্শের আমলে আনিতে চেষ্টা করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়াছেন।

শিবায়ন।

শিবায়ন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পূর্ব্বে শিবঠাকুর ইতর লোকের মধ্যে কৃষাণ-দেবতারূপে পূজা পাইতেন। তারপর ব্রাহ্মণ্য-যুগে এই শিবঠাকুরকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, জয়নারায়ণ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিরা একটু উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। মুকুন্দরাম শিবকে কতকটা কালিদাসের শিবের মহিমা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহাভারতকার কাশীদাস ইহাকে স্বকীয় গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; তাঁহার শিবের মধ্যে—জনসাধারণের ধারণার চিহ্নমাত্র নাই—সে শিব কুচুনী পাড়ায় যান না, ক্ষেতে হল চালনা করেন না, ষাঁড়ের উপরে চড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হন না, এমন কি শিবানীর সঙ্গে কোঁদলও করেন না। কিন্তু ভারতচন্দ্র এতবড় সংস্কৃতের ভাব লইয়াও সাধারণের আদর্শটা ছাড়িতে পারেন নাই। সেই পুরাতন খসড়ার উপর তুলি বুলাইয়া তিনি তাঁহাকে কতকটা সভ্যভব্য করিয়াছেন মাত্র। একমাত্র রামেশ্বর "শিবের গীতের" প্রাচীন সুরটি বজায় রাখিয়াছেন; ইহাতে শিবঠাকুর কৃষাণ, তাঁহার ভৃত্য ভীম,—শিব ক্ষেতের আগাছা তুলিয়া ফেলেন, আইল বাঁধেন, শস্যে পোকা লাগিলে ঔষধ দেন—এবং জোঁকের উৎপাত হইলে তাহাদের মুখে চুণ লাগাইয়া হত্যা করেন। ইনি খেয়া পাড়ি দিয়া কুচুনী পাড়ায় যান এবং শিবানীর সঙ্গে কোঁদল করেন এবং তাঁহার মান ভাঙ্গাইবার জন্ম শাঁখার বোঝা কাঁধে করিয়া হিমালয়ে যান। বিজয়-গুপ্তের মনসামঙ্গলের শিবও কতকটা এই ধরনের। শিবের গীত সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা ৫৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয়াছি। বস্তুতঃ এই গীত যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার একটি প্রমাণ এই যে বাঙ্গলা ভাষায় হিন্দুর যতগুলি দেবমহিমা-জ্ঞাপক প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, যথা—চণ্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর ভাসান, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি তাহার সকলগুলিতেই শিবের ছড়া দিয়া মুখবন্ধ করা হইয়াছে। এই প্রাচীন শিব সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-বিরহিত। অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর শিব বঙ্গদেশের শত সহস্র কৃষকের ঘরের লোক; এই দেবচরিত্রটি কৈলাসেরও নয়, শ্মশান-মসানেরও নয়, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার স্থায় নির্ব্বিকল্প যোগ-সমাধি-প্রাপ্ত তাপসও নহেন, এমন কি কালিদাসোক্ত মার্জ্জিত-রুচি, কতকটা সন্দিগ্ধ-চিত্ত প্রেমিকও নহেন, তিনি চাষার ঘরের খাঁটি মানুষ। পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত পুরাণের যে প্রভা দেশময় সর্ব্বত্র পড়িয়া শিবকে ঔজ্জ্বল্য দান করিয়াছিল—

জনসাধারণও যে আদর্শের ভাগীদার হইয়াছিল—এই প্রাচীন শিবচরিত্রে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণ-ধামালী।

শিবের গানে শিব যে রূপ, কৃষ্ণ-ধামালীতে কৃষ্ণও কতকটা সেই প্রকারের, ইনি চাষার ঘরের ছেলে, রাধা চাষার ঘরের মেয়ে; কৃষ্ণ রাধার দইয়ের ভাঁড় বহিবার বাঁক তৈরী করিবার জন্ত বাঁশ চাঁছিতেছেন, কখনও তাহার মোট বহিতেছেন—সমস্তই রাধার একটি চুম্বন পাইবার প্রত্যাশায়। কৃষ্ণ-ধামালীর দৃশ্য অমার্জ্জিতরুচিযুক্ত চাষার ঘরের; এই ধামালী দুই শ্রেণীর: এক শ্রেণীর নাম শুকুল, অপর শ্রেণীর নাম আসল। এই আসল এত অশ্লীল যে তাহা চাষীরা পর্য্যন্ত নিজের ঘরে গাহে না—স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে দূরে রাখিয়া তাহারা মাঠে যাইয়া গায়। কিন্তু শুকুল ধামালীতেও যে রুচি পাওয়া যায়—তাহাতে মধ্যে মধ্যে কাণে হাত দিতে হয়—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন এই কৃষ্ণ-ধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ। বৌদ্ধযুগের এই শিবচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে চাষাদের দেবতা তাহাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া যায় নাই, তাহাদের ঠাকুরকে চাষারা নিজের দলে ভিড়াইয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। এই সকল দেবচরিত্রে কৃত্রিমতা, সাজসজ্জা বা আড়ম্বর কিছুই নাই,—কোন দ্বিধা বা সম্ভ্রমের সহিত চাষারা তাহাদের দেবতাকে দেখে নাই, তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া ভালবাসিয়াছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মানুষ করিয়া লইবার ফলে আমরা উত্তরকালে বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্বের অপূর্ব্ব দার্শনিক মহিমা দর্শন করিতে পাই। গৃহস্থালীকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই পঞ্চরসের গৌরবে মণ্ডিত করিয়া ইহার আদর্শ বৈষ্ণবেরা ধর্ম্মবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত গড়িয়া দিয়াছিল চাষারা।

চণ্ডী-মঙ্গল।

চণ্ডীপূজা বহু প্রাচীন। শ্রীযুক্ত ডাঃ আর. এন. সাহা, এম. আর. এ. এস. ১৯৩১ সনের ১৮ই অক্টোবর তারিখের Advance সংবাদপত্রে চণ্ডীপূজা সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। তাহাতে এই পূজার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ দিয়াছেন; তিনি বলেন, "বাঙ্গালী বণিকেরা অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী দুর্গার পূজা শ্যাম, কম্বোজ, চীন, কোরিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ, সুমাত্রা, জাভা, বালী, বর্নিও, সেলিবেস্ এবং ফিলিপাইন দ্বীপসমূহে লইয়া যান। এই সকল স্থানে আদিম বঙ্গীয় বর্ণমালার আঠারটি অক্ষর (ব্যঞ্জনবর্ণ) মাত্র প্রচলিত। ১৮ মহাপুরাণ, ১৮ উপপুরাণ ও মহাভারতের ১৮ পর্ব্ব, বাঙ্গলার ১৮টি বীজ অক্ষরের মহিমা-জ্ঞাপক।" দক্ষিণা-পথের একটি গিরিগুহায় অঙ্কিত অষ্টাদশ হস্তবিশিষ্টা প্রাচীন মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি যেরূপ, সেইরূপ প্রাচীন শক্তিমূর্ত্তি স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। আমরা "History of the Bengali Language and Literature নামক পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স ৩০০০ খৃঃ পূঃ অব্দের সিংহবাহিনী মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে প্রস্তুত এসিয়া মাইনরের 'ইয়াসিলি'

গিরিমন্দিরে (ভোগাজ কিউ নামক স্থানে) 'মা' দেবতার মূর্ত্তি এইরূপ,—৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দের কার্থেজের দুর্গাও বোধ হয় এক পঙ্‌ক্তির।

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই মাতৃপূজা বহুপ্রাচীন। জাভার পম্‌বনম্ নামক স্থানে অন্যূন একসহস্র চণ্ডীমন্দির আছে। এই সমস্ত মন্দির ৫২৫ খৃঃ হইতে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলাদেশে দেখা যায় মাতৃপূজা বাঙ্গলার আর্য্যগণ প্রথমতঃ স্বীকার করেন নাই। বণিক্‌দের মধ্যে উহা প্রাচীনকালেই প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমতঃ মেয়েদের দ্বারাই উহার প্রচলন ঘটিয়াছিল। বণিক্‌-সীমন্তিনীরা লুকাইয়া পূজা করিতেন এবং তাঁহাদের স্বামীরা চণ্ডীকে "ডাইনী" দেবতা বলিয়া দেবীর ঘটে লাথি পর্য্যন্ত মারিতেন। কিন্তু যে করিয়াই হউক বণিকেরা শেষে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় মুচি, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা এককালে শক্তির উপাসক ছিল। বোধ হয় মায়ের পূজায় পশুবলি এমন কি নরবলি দেওয়া হইত, এজন্য শেষে বণিকেরা পর্য্যন্ত উহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে শক্তির এবংবিধ পূজা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, শেষে মুচির হাতে পৌরোহিত্যের ভার পড়ে—শূন্যপুরাণের দুই একটি কথায় উহাই অনুমিত হয়। 'দুর্গাকে' কখনও "হাড়ির মেয়ে" বলা হয়, হাড়ির বাড়ীতে বাদ্য না বাজিলে দুর্গাপূজা কোন কোন স্থানে আরম্ভই হইত না, এরূপ জনশ্রুতি আছে। "হাড়িকাঠ" শব্দ দ্বারা শুধু "হাড়ি"দের সহিত এই পূজার সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই, পশুবলি ব্যাপারগুলি যে এই শ্রেণীর লোকেরাই করিতেন তাহা অনুমান করা যায়। এখনও কোন স্থানের কালীর মন্দিরে হাড়িরাই পূজার পাণ্ডা। দিনাজপুরের কোন কোনও স্থানে এরূপ পৌরোহিত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বাঙ্গলাদেশে এই পূজা বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিদ্বেষের সহিত দেখিতেন। বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই পূজা এবং এতৎসংক্রান্ত গানগুলির প্রচলন খুব প্রসন্নচিত্তে দেখেন নাই। শ্রীবাসের বাড়ীর দরজায় বিল্বপত্র ও সিন্দুর-মাখা চণ্ডীর আশীর্ব্বাদী সামগ্রী কোন ব্রাহ্মণ রাখিয়া গিয়াছিল, এজন্য বৈষ্ণব-সমাজের সে কি ক্রোধ! সেই ব্রাহ্মণের এই অপরাধে কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। নরোত্তমবিলাসে শক্তিপূজকের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই ভয়াবহ। কোন কোন শাক্ত মদ খাইয়া খড়্গাহস্তে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন যাহাকে পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত। "হলেও ব্রাহ্মণ তার হাত না এড়ায়।" বৈষ্ণবগণ কালীর নাম করিতেন না, দোয়াতের কালীকে 'সেহাই' ও জবাফুলের সঙ্গে কালীর পাদপদ্মের সংস্রব আছে, এজন্য তাহাকে 'ওড়' ফুল এবং বিল্বপত্রকে 'অর্কপাতা' সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বয়ং চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে অষ্টভুজার মন্দির দর্শন ও দেবীকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবদের শাক্ত-বিদ্বেষ।

শাক্তধর্ম্ম মুসলমান আবির্ভাবের পর এদেশে খুব প্রচলিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম জগতের যাবতীয় মনুষ্যের জন্য দরজা খুলিয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও বাদ দেয় নাই। বোধ হয় জগতে এরূপ ঔদার্য্য আর কোন ধর্ম্ম দেখাইতে পারে নাই। চোর, ডাকাত, সিঁদকাটা,

'গামছামোড়া' সকলেই মায়ের সন্তান। যে জন যে ব্যবসায় করিবে, সেই কালীকে মা বলিয়া পূজা দিয়া যায়। আমি একখানি খড়্গ দেখিয়াছিলাম, তাহার উপর কালীর ক্ষুদ্র একখানি ধাতব মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির নাম "ডাকাইতা কালী"। মাতা সন্তানের কলঙ্ক নিজে লইয়া কলঙ্কিতা হইয়াছেন, তথাপি সন্তানকে ছাড়েন নাই।

বাঙ্গলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে শাক্তধর্ম্ম বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যের অঙ্গীয় হইল, সে কথা পরে বলা যাইবে। এখানে মাত্র এই বলা উচিত যে প্রাক্-সংস্কৃত সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস, নারায়ণ দেব ও ক্ষেমানন্দ একদিকে, অপর দিকে কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য্য ও জয়নারায়ণ তাহাই কবিত্বমণ্ডিত করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দী এমন কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের খসড়ার উপর পরবর্ত্তী বঙ্গীয় কবিরা বারবার তুলি চালাইয়াছেন, তজ্জন্য শেষের কাব্যগুলির ত্বক্-মাংস ব্রাহ্মণ্যযুগের হইলেও উহাদের অস্থিপঞ্জর সেই আদি যুগের। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল যে প্রাগ্ ব্রাহ্মণ্য যুগের খসড়া, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে নায়ক-নায়িকা নিম্নশ্রেণীর লোক এবং এই দুই পুস্তকের কোনটিতেই ব্রাহ্মণকে সমুচিত সম্মান দেওয়া হয় নাই। এই কাব্যগুলির নায়ক-নায়িকারা আদৌ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত নহে। উক্ত শাস্ত্রানুসারে নায়ক ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত হইবেন, তিনি বিদ্বান্ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইবেন; কিন্তু এই কাব্যগুলির মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক ব্যাধ কালকেতু, সে তো প্রিয়দর্শন আদৌ নহে, বরং কুশ্রী—"গ্রাসগুলি তোলে যেন তেআঠিয়া তাল। ভোজন কুৎসিত বীরের শয়ন বিকার।" পণ্ডিত হওয়া দূরে থাকুক সে হস্তিমূর্খ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তো সে নহেই—ঘৃণিত ব্যাধ,—যাহার গৃহে প্রবেশ করিবে তাহার "উচিত হয় স্নান।" চণ্ডীমঙ্গলে ব্রাহ্মণগণের অবস্থা এত শোচনীয় যে, একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মত-বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছিল, এজন্য বেণে ধনপতি "নফরে আদেশ করি মারে তারে ধাকা" (মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য)।

কথা হইতে পারে, চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি প্রাচীন কবিদের খসড়াটা বদলাইয়া ফেলিলেন না কেন? কেন তাহা আলঙ্কারিকদের মতানুসারে নূতন ছাঁচে ঢালিলেন না? উত্তর, এই সকল কাব্য যুগ-যুগ ধরিয়া উৎসব-উপলক্ষে চণ্ডীমণ্ডপে গাওয়া হইত, সেগুলির আখ্যানবস্তু নূতন হইলে জন-সাধারণ সেই অনভ্যস্ত কথা শুনিবে কেন? কিন্তু তথাপি নব-ব্রাহ্মণ্যের একজন প্রধান পাণ্ডা মুকুন্দরাম একেবারে নীরব হইয়া প্রাচীন গল্পের উপর হাত বুলাইয়া যান নাই। খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির হাস্যপরিহাস ও রসিকতা এবং তাহার বেশী বয়সে বিবাহ—তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। সেগুলি শ্রোতারা চিরকাল উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কবি তাঁহার সমস্ত আক্রোশ জনার্দ্দন ঘটকের মুখে ব্যক্ত করিয়া খুল্লনার পিতা লক্ষপতি কেন অষ্টম বৎসর বয়সে মেয়েকে গৌরীদান না করিয়া 'ধাড়ি' করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে খুব তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া মনের ঝাল মিটাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃতের গোঁড়া। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের অপলাপ করিতে কিছুতেই স্বীকার করেন নাই। এজন্য তিনি ব্যাধের ছেলে ও বেণের ছেলেকে কাব্য-নায়ক না করিয়া তদীয়

চণ্ডীমঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছেন। কাব্য-নায়ক গুণবন্ধু রাজার পুত্র সুন্দর—ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র এবং সর্ব্বগুণাধার। নায়িকাও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার যোগ্যা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুমোদিতা।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—এগুলির আদত লেখার উপর নানারূপ চারুশিল্পের খেলা দেখাইয়া পরবর্ত্তী কবিরা "নূতন মঙ্গল" লিখিয়াছেন। আদিযুগ ও মধ্যযুগ দুইয়েরই প্রভাব ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

গাথা-সাহিত্যে ও নাথ-সাহিত্যের কালসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। ইহার অনেকগুলিতে চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ এমন কি তৎপরবর্ত্তী যুগের হস্তচিহ্ন থাকিলেও ইহাদের খসড়া বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথের সময় ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময় আমরা জানি; তাঁহাদের সম্বন্ধে গাথাগুলি সেই সময়ে কিংবা তাঁহাদের মৃত্যুর অনতিপরে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়, তবে যুগে যুগে তাহাদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া অসিয়াছে এবং নূতন নূতন কবিরা তাহাদের নূতন নূতন অঙ্গরাগ পরাইয়াছেন, তথাপি ইহাদের মধ্যেই সেই প্রাচীন ভাষা ও ভাবের অনেক চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ডাক ও খনার বচন এবং গীতিকথাগুলি পালরাজাদের সময়কার জিনিষ বলিয়া অনুমিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দী হইতে এই শ্রেণীর কবিতাগুলি আরব্ধ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য

যে বঙ্গদেশ এক সময়ে দীপঙ্কর, শান্ত-রক্ষিত, ভদ্রশীল প্রভৃতি বৌদ্ধনেতার বাসস্থান ছিল—যাহার এক প্রান্তে সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র পরিণত বয়সে ভিক্ষু সাজিয়া ধলেশ্বরীর তীরে বৌদ্ধ মঠগুলিতে জীবনের শেষ-বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, এবং নান্নার ও সুয়াপুরের মধ্যবর্ত্তী বিশাল বিহার জয়দৃপ্ত শির উত্তোলন করিয়া "রাজাসন" নামে পরিচিত হইয়াছিল, অপরদিকে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী পল্লী বৌদ্ধ যোগী ও যোগিনীগণের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, যেখানে হিউন সাঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতে অগুন্তি বৌদ্ধ বিহার দেখিয়া গিয়াছেন—সেই বঙ্গদেশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নব ব্রাহ্মণ্যের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগণ সমাজে যে সকল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন, তন্মধ্যে প্রধান এই কয়েকটি : (১) সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইল। (২) গৌরীদানের ব্যবস্থা হইল। (৩) কথিত

ভাষাগুলি ঘৃণ্য বলিয়া কোন ভদ্র রচনার গণ্ডীতে স্থান পাইল না। (৪) দেবভাষা সংস্কৃতের প্রভাব অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল। (৫) ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন—তাঁহারাই সমাজের একমাত্র আরাধ্য—অপরাপর জাতি পতিত শূদ্র। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কোনপ্রকার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল না। কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া অন্য কোন জাতি নাই; ইহাই তাঁহারা প্রচার করিলেন।

ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে আদর্শের রূপান্তর।

ভক্তিই একমাত্র লক্ষ্য; জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকার লোপ পাইল। কর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণকে দান ও ব্রাহ্মণকে পূজা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এককালে দ্বৈপায়ন ব্যাস ব্রাহ্মণকে কোন্ তিথিতে কি দান করিলে কি ফল হয়, তাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন (৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)—সেই লেখাটাই বঙ্গীয় সমাজের অনুশাসনরূপে বদ্ধমূল হইল। ব্রাহ্মণবেষ্টিত রাজ-সভায় এই সংস্কৃতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের ক্ষেত্রে বাঙ্গলা ভাষার কোন ভরসা ছিল না। পল্লীর কোকিলের কণ্ঠ অবশ্য থামে নাই, এবং দূর ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, গাড়োদেশ প্রভৃতি যে যে স্থান সেন-রাজাদের অধিকৃত হয় নাই, সেখানে হিন্দুদিগের প্রাচীন আদর্শ বৌদ্ধ-কর্ম্মবাদে পুষ্ট হইয়া পল্লীগাথায় গুপ্ত যুগের সৌন্দর্য্যবোধ ও পূর্ব্বরাগের লীলাখেলা দেখাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব সে সকল দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ—যে স্থান হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পল্লীগাথাগুলি পাওয়া গিয়াছে—তাহা বহুযুদ্ধে সেন-রাজগণের হাত হইতে স্বীয় স্বাধীনতা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ এই গাথা-সাহিত্য লইয়া বিভোর ছিল, কিন্তু এবার সেন-রাজগণের যুগে সেই গাথা-সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল। গাথার কবিগণ সেন-রাজগণের কীর্ত্তি কেনই বা গান করিবেন? তাই মহীপাল, রাজ্যপাল, ধর্ম্মপাল, রামপাল, যোগীপাল প্রভৃতি পাল-রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে যাঁহারা গান বাঁধিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন বা সুর সেন সম্বন্ধে একটি গাথাও রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ নাই। অথচ তাঁহাদের পরে ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্য, ধন্যমাণিক্য ও রাজ্ঞী কমলা দেবী সম্বন্ধীয় বহু গাথার উল্লেখ আছে—এদিকে ঈশা খাঁ, মনুর খাঁ, ফিরোজ খাঁ প্রভৃতি বহু মুসলমান নবাব-বাদসাহ-সম্বন্ধীয় পল্লীগাথা আমরা পাইয়াছি। সেন-রাজগণ ব্রাহ্মণদিগের মত অবলম্বন করিয়া পল্লীভাষার কোন উৎসাহ দেন নাই। বিশেষ কর্ম্ম-গৌরব অস্বীকৃত হওয়াতে মানুষের বীরত্ব, শৌর্য্য, জ্ঞান, এ সমস্ত উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িল। ইহারা অঙ্গীকার করিয়া বসিলেন, মানবের কীর্ত্তিকথা লইয়া কোন কাব্য-রচনা পণ্ডশ্রম মাত্র—বিশেষ, ঘৃণ্য কথিত ভাষায়। এই জন্য নরলীলাস্থলে দেবলীলার বর্ণনাই কবি ও অপরাপর লেখকগণের লক্ষ্য হইল। আমরা এইভাবে মালঞ্চমালা, কাজল-রেখা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি আদর্শ-রমণীর কথা হারাইলাম,—পাইলাম ধ্রুবের উপাখ্যান, প্রহ্লাদের কৃষ্ণপ্রীতি ও দেব-বীর্য্যে উৎপন্ন পাণ্ডবাদির কথা, ভগবানের অবতার রামের লীলা ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় শত শত কাহিনী। পল্লীগাথার স্থানে পাইলাম কথকতা, গীতিকথার স্থলে পাইলাম কীর্ত্তন। আমরা হারিয়াছি কি জিতিয়াছি—তাহার বিচারস্থল এখানে নহে।

পল্লীসাহিত্য একেবারে আড়ালে পড়িয়া গেল; ব্রাহ্মণ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ও ব্রাহ্মণ কথকেরা পুষ্পমাল্যের দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া বেদীতে বসিয়া ব্যাখ্যা, বর্ণন ও কীর্ত্তনের ভার লইলেন। পল্লীভাষার বিরুদ্ধে রাজদ্বার বন্ধ হইল। যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা কথিত ভাষায় লিখিবেন, অথবা শ্রবণ করিবেন—তাঁহাদিগের জন্য রৌরব নরকের ব্যবস্থা হইল; ব্রাহ্মণগণ এই অভিসম্পাত করিলেন।

বঙ্গ-ভারতী এই বিপদের সময়ে বিদেশী রাজগণের বাহু আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন। মুসলমান নবাবেরা এ দেশের শত শত ধর্ম্ম-উৎসব সম্বন্ধে তথ্য ও বিবরণ জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই দুরূহ ব্যাপার কতবড় অসম্ভব কার্য্য, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। মোটকথা তাঁহারা মুসলমান নবাবদিগকে শাস্ত্রকথা জানাইবেন না, ভয় দেখাইলেন—শুধু ব্যাকরণ পড়িতেই এক জীবন কাটিয়া যাইতে পারে। তুর্কিরা এদেশে বাস করিয়া এদেশের একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলা কথা কহিতে ও লিখিতে জানিতেন। মুসলমান রাজারা সংস্কৃতের মাহাত্ম্য শুনিয়া কতকটা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সংস্কৃত হইতে মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় অনুদিত করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতে আদেশ করিলেন। এই কার্য্য ব্রাহ্মণগণ অবশ্য ঘোর অনিচ্ছায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নসরত সাহের আদেশে একখানি মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহা এখন লুপ্ত কিন্তু তাহার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই মহাভারত হয়ত খুব উৎকৃষ্ট ভাবে সঙ্কলিত হয় নাই—এজন্য হুসেন সাহের সেনাপতি চট্টগ্রাম-বিজয়ী পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক আর একজন কবি-দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। এই অনুবাদের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার পত্রে পত্রে পরাগল খাঁর অনেক স্তুতিবাদ আছে। জৈমিনী-কৃত অশ্বমেধ পর্ব্বের একখানি অনুবাদ পরাগল খাঁর পুত্র বীরবর ছুটি খাঁর আদেশে বিরচিত হইয়াছিল, সহিত্য-পরিষৎ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুবাদ-কারকের নাম শ্রীকরণ নন্দী। গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইউসফের আদেশে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ খৃঃ ১৪৭৩-৮০ অব্দে সঙ্কলন করেন, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করিয়া-ছিলেন। বিদ্যাপতি সসম্মানে "প্রভু গয়েসুদ্দিন সুলতানের" উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একটি পদে লিখিয়াছেন যে, নসিরা শাহ প্রেমের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছেন এবং "চিরঞ্জীব—রহ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভণে" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মুসলমান বাদসাহগণের মধ্যে হুসেন সাহই "দেশী ভাষার" সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। পরাগলী মহাভারতে ইঁহাকে "কলিযুগের কৃষ্ণ অবতার" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। খৃঃ ১৪৯৪ অব্দে রচিত মনসামঙ্গলে বিজয়গুপ্ত ইঁহাকে "সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি-তিলক" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। আরও কয়েকখানি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ইঁহার সুখ্যাতি আছে।

তুর্কী নবাবদের দ্বারা বঙ্গভাষার উৎসাহ প্রদান।

মুসলমান নৃপতিগণের উৎসাহ।

হুসেন সাহ তাঁহার দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসরের রাজত্বকালে সমস্ত বঙ্গদেশের প্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; ইনি চৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং কথিত আছে ইঁহারই রাজ-প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমানকে এক দেবতার উপাসক করিবার উদ্দেশ্যে 'সত্যপীর' নামক মিশ্র দেবতা পরিকল্পিত হন। এই সত্যপীর সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম মৈমনসিংহ-নিবাসী কঙ্ক নামক জাতিচ্যুত এক ব্রাহ্মণ-যুবক তাঁহার গুরু এক পীরের আদেশে কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে সত্যপীরের মহিমা-প্রচারের ব্যপদেশে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গলাভাষার সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর। পুস্তকখানি কবিত্ব-পূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত, ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আমার নিকট ইহার হস্ত-লিখিত একখানি নকল আছে। কাব্যখানি অনুমান ১৫০২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সত্যপীরের ন্যায় 'মাণিকপীর' এবং 'কালুগাজি' হিন্দুমুসলমানের উপাস্য মিশ্র দেবতা এবং ইঁহাদের মহিমজ্ঞাপক অনেক পুস্তকও বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। বাঙ্গলাভাষার উৎসাহ-দাতা আরও অনেক মুসলমান বাদসাহ-ওমরাহের নাম আমরা পাইয়াছি। এখানে তাঁহাদের উল্লেখের অবকাশ নাই। আমাদের ধারণা যে মুসলমান বাদসাহদের অনুগ্রহেই বাঙ্গলাভাষা রাজ-দরবারে ও ভদ্র-সমাজে প্রবেশের প্রথম সুবিধা পাইয়াছিল, নতুবা সংস্কৃতের ভ্রুকুটি সহ্য করিয়া আমাদের দীনা-হীনা মাতৃভাষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলে ব্রাহ্মণ্য-শাসিত ভদ্র-সমাজে স্থান লাভ করিতে পারিত না। বঙ্গীয় মুসলমানের অধিকাংশই বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধজন-সাধারণের মধ্যে বাঙ্গলার চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। সুতরাং স্বদেশের ভাষার উপর অনুরাগ বঙ্গের মুসলমানেরা পূর্ব্ব-সংস্কার হইতে পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা এই সকল কার্য্যে হয়ত উৎসাহ দেখান নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বর কি জাতীয় ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহার অসংখ্য ভণিতার মধ্যে কোন না কোন স্থানে "দ্বিজ" শব্দের প্রয়োগ থাকিত বলিয়া মনে হয়। এক 'কবীন্দ্র' ছাড়া তাঁহার আর কোন উপাধির উল্লেখ নাই। এখনও হয়ত চট্টগ্রাম বা নোয়াখালীর কোন পুঁথিতে তাঁহার আত্মবিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীকরণ নন্দী ব্রাহ্মণ ছিলেন না—বৈদ্য বা কায়স্থ ছিলেন। মালাধর বসু কায়স্থ ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণগণ সহজে ঘৃণিত ভাষায় কাব্য লিখিতে দাঁড়ান নাই, কিন্তু তৎপরে শাহেন সা বাদসাহগণের আদেশ ও উৎসাহে তাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং রাজা মহারাজদের রাজসভা ও বাদসাহের দরবারের দেখাদেখি বঙ্গভাষার জন্য তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

মহাভারতের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ করেন সঞ্জয়। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বৈদ্য ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাঁহার বাড়ী বিক্রমপুর ছিল, তথায় ঐ গোত্রীয় বৈদ্য এখনও অনেক আছেন। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। পরবর্ত্তী অনুবাদকগণের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও ছুটি খাঁ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী নিত্যানন্দ ঘোষ সমগ্র মহাভারতের যে অনুবাদ করেন, তাহা রাঢ় দেশে ও চব্বিশ পরগনায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে

সঞ্জয়।

কবি ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বিক্রমপুর-ঝিনারদিবাসী এবং সুবর্ণবণিক্ ছিলেন। ষষ্ঠীবরের পিতা কুলপতির কথা গঙ্গাদাস খুব গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ একই সময়ে এবং কাশীদাসের কিছু পূর্ব্বে রামেশ্বর নন্দী নামক আর একজন কবি মহাভারতের একটি অনুবাদ সঙ্কলন করেন। মহাভারতের প্রায় সমস্ত অনুবাদই ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ব্যক্তির লিখিত—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীতেও ইঁহাদের বঙ্গভাষার প্রতি বিরূপতা ঘোচে নাই।

কবি কাশীদাস এবং অপরাপর অনুবাদক।

এই অনুবাদকগণের মধ্যে অবিসংবাদিত ভাবে কাশীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে। এই সিংহগ্রাম ইতিহাস-বিশ্রুত, সিংহলজয়ী বিজয় সিংহের প্রতিষ্ঠাপিত "সিংহপুর।" কাশীদাসের সুদীর্ঘ বংশাবলী তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের "কৃষ্ণমঙ্গল" ও গদাধর দাসের "জগন্নাথমঙ্গল" দুইখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। কাশীদাসের মহাভারতে সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি; সুললিত শব্দচয়ন এবং বর্ণনা জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করার ক্ষমতা তাঁহার বিশেষরূপ ছিল। তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাটের কতদূর লিখিয়া স্বর্গগত হন এবং তাঁহার মৃত্যুকালীন আদেশ রক্ষা করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস বাকী কয়েক পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন. কিন্তু এই শেষ পর্ব্বগুলির অনুবাদ প্রায়ই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ভাল ভাল অংশের জোড়াতালী। নন্দরাম দাস নিত্যানন্দ ঘোষের নিকটেই এ বিষয়ে বেশী ঋণী। তাঁহার মহাভারত হইতেই তিনি বেশী সঙ্কলন করিয়াছেন। এমন কি স্ত্রীপর্ব্বের "গান্ধারী-বিলাপের" উৎকৃষ্ট অংশটি তিনি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত হইতে হুবহু নকল করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইয়াছেন। বাঙ্গলার কত কবি যে মহাভারত এবং ইহার অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর, এবং গোপীনাথ দত্তের "দ্রৌপদীযুদ্ধ" প্রভৃতি পালা সম্পূর্ণরূপ মৌলিক। কাশীদাসী মহাভারতে শ্রীবৎস ও চিন্তার মত কতকগুলি উপাখ্যান মূল-বহির্ভূত। ঐ উপাখ্যানটি গ্রাম্য গাথা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং "তিলক-বসন্ত" পালার (৪র্থ খণ্ড, পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা) সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য সকলেরই চোখে পড়িবে। কাশীদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মহাভারত শেষ করেন।

রামায়ণ, কৃত্তিবাস।

সম্ভবতঃ রাজা গণেশের আজ্ঞায় ফুলিয়া গ্রামের মুরারি ওঝার পুত্র বনমালী মুখুটির ঔরসে এবং মালিনীর গর্ভজাত কবি কৃত্তিবাস সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা রামায়ণ রচনা করেন। রচনার প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ এবং গ্রহণ-বর্জ্জন সম্বন্ধে উপযোগিতা-বোধ কৃত্তিবাসের প্রধান গুণ। মূল রামায়ণের কোন অংশ বাদ দিয়া কি রাখিলে কাব্যখানি বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে, ইহা তিনি বিশেষরূপ জানিতেন; এবং ঠিক এই বোধ না থাকাতে সুপণ্ডিত ও সুকবি রঘুনন্দনের 'রামরসায়ন' খানি কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের পরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ময়মনসিংহ-নিবাসী

বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে পল্লীগাথার আকারে যে সংক্ষিপ্ত রামায়ণখানি রচনা করেন, তাহা এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে পল্লীবাসিনীগণ বিবাহ-বাসরে গাহিয়া থাকেন। মাইকেল মধুসূদন সীতা-সরমার কথোপকথনের অংশটি চন্দ্রাবতীর রামায়ণের একটি স্থল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সহজ সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মনের কথা করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিতে চন্দ্রাবতী সিদ্ধহস্তা। তাঁহার অসম্পূর্ণ রামায়ণ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন। (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, ২য় ভাগ)।

কিন্তু এই রামায়ণগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মৌলিকত্বের দাবী কবিচন্দ্রের। ইঁহার নাম শঙ্কর, উপাধি 'কবিচন্দ্র'। বাঙ্গলার রামায়ণে 'অঙ্গদের রায়বার' 'তরণীসেন ও বীরবাহুর যুদ্ধের পালা' প্রভৃতি অংশ কবিচন্দ্রের লেখা। কবির সম্মুখে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ ভগবানের অবতার হইয়া লীলা করিয়া গিয়াছিলেন। জগাই, মাধাই, নারোজী, ভীলপন্থ প্রভৃতি দানব-প্রকৃতি লোকেরা ইঁহাদের কৃপা-স্পর্শে উদ্ধার পাইয়া গেল। এই সকল জীবন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা কবির হৃদয়পটে গাঢ় বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল। তৎকৃত রামায়ণে সেই সকল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। বাল্মীকির যুদ্ধ-কাণ্ডটাকে তিনি ভক্তির কুঞ্জ বা সংকীর্ত্তন-ভূমিতে পরিণত করিলেন। রাক্ষসগণ জগাই-মাধাইএর ন্যায় রাম-লক্ষ্মণের প্রতি অস্ত্র ছুড়িয়া শেষে অনুতাপের উচ্ছ্বাসে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে বসিল, কেহ কেহ বা রামনামের ছাপ স্বীয় অঙ্গ ও রথের চতুঃপার্শ্বে অঙ্কিত করিয়া রণভূমিতে কীর্ত্তনভূমির অভিনয় করিতে লাগিল। একটা জীবন্ত ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই সকল বিষয়ের বিসদৃশতা আমাদের চোখে ঠেকে না। যিনি যুদ্ধ করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণবোচিত অশ্রু-বিসর্জ্জন এবং যিনি শত্রু তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভক্তি ও ক্ষমার লীলা-প্রদর্শনের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও বিদ্রূপের উপযোগী উপাদান আছে—তাহা আমাদিগের এই সকল কাহিনীর যথার্থ রস উপভোগ করিতে বাধা জন্মায় না। মানুষতো চিরদিনই স্রষ্টার সহিত যুদ্ধ করিতেছে—তাঁহার বিধি নিত্য লঙ্ঘন করিতেছে অথচ অনুতপ্ত হইয়া তাঁহারই পদে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কবিচন্দ্রের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে শুধু বৈষ্ণব ইতিহাসের অংশ নহে, পূর্ব্বোক্ত সনাতন ধর্ম্মের উপাদান থাকাতে উহা চিরকাল হৃদয়স্পর্শী ও সুখপাঠ্য হইয়া থাকিবে। 'অঙ্গদের রায়বারের' মধ্যে যে পরিহাস-রসিকতা আছে, তাহা বিশেষ মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক না হইলেও উহা তৎকালোপযোগী হইয়াছিল। এই মৌলিকত্বই কবিচন্দ্রের বাহাদুরী। দুঃখের বিষয়, তথাকথিত 'কৃত্তিবাসী' রামায়ণ কবিচন্দ্রের সমস্ত রচনাগুলি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া এবং নিজ দেহে কৃত্তিবাসের নামের শিলমোহর লাগাইয়া তাঁহারই স্বত্ব সাব্যস্ত-পূর্ব্বক আজ পর্য্যন্ত সমানে বাজারে চলিতেছে।

রামানন্দ ঘোষ নামক একব্যক্তি বর্দ্ধমান হইতে 'রামলীলা' নামক একখানি রামায়ণ প্রণয়ন করেন। উহা ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে বা তৎসন্নিহিত কালে বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানির মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে—কালিদাসের রঘুবংশ হইতে ইনি কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে ইনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং

নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি সোচ্ছ্বাসে লিখিয়াছেন যে পুরীর দারু-ব্রহ্মকে ইনি 'পাপিষ্ঠ' বৈষ্ণব ও মুসলমানগণের হাত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পুনরায় বৌদ্ধজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। দারুব্রহ্মকে এইভাবে অভিষিক্ত করিয়া তিনি তৎসম্মুখে তাঁহার রামলীলা (রামায়ণ) পাঠ করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কাব্যভাগে প্রদত্ত তাঁহার আত্মবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় যে তাঁহার বহু শিষ্য ও অনুচর ছিল। তিনি নিজকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই কাব্যের মাত্র একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—তাহা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট আছে। তিনি এতৎসম্বন্ধে হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনার পুস্তকে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই পুস্তকের কথা লিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়া উচিত। রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদকগণের মধ্যে মহাভারতের লেখক ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বহু পাণ্ডিত্য ও কবিত্বপূর্ণ বৃহদায়তন 'রামরসায়ন'খানি কবি রঘুনন্দন গোস্বামীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। এই কাব্য বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামমোহনের রামায়ণ ভক্তির অক্ষুরন্ত সুধাভাণ্ডের মত; তাহার একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় আছে। জয়চন্দ্র রাজার আদেশে দ্বিজ ভবানী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে 'লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়' নামক এক কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য-রচনার জন্য তিনি উক্ত রাজার নিকট হইতে প্রত্যহ ১০৲ টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরচিত। সেই সময়ে এই পারিশ্রমিকের মূল্য অনেক বেশী ছিল। শিবচন্দ্র সেনের "সারদা-মঙ্গল"—রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। শিবচন্দ্র সেন বৈদ্যবংশীয়, বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন। পাঁচপুরুষ পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। এই পুস্তক একবার ছাপা হইয়াছিল।

বুদ্ধের অবতার রামানন্দ ঘোষ।

অপরাপর রামায়ণ।

ভাগবতের অনুবাদের মধ্যে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিখ্যাত শ্যামানন্দ, শঙ্কর কবিচন্দ্র, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতি কবিরা ভাগবতের অংশবিশেষ রচনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য গ্রাহ্য করেন না, সুতরাং অধিকাংশ অনুবাদই ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধ সম্পর্কিত এবং ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভাগবতবহির্ভূত কথা আছে। রাধার প্রেমলীলা অনেকগুলির মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গটি অবশ্য ভাগবতে নাই। আমরা প্রায় সমস্ত পুরাণেরই প্রাচীন বঙ্গানুবাদ পাইয়াছি। তাহা ছাড়া রূপ-গোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গীয় প্রাচীন পদ্যানুবাদ আমরা পাইয়াছি। শেষোক্ত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন কবি যদুনন্দন দাস। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমপ্রভা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন।

অনুবাদ-গ্রন্থ।

ভাগবত ও অপরাপর পুরাণ।

রসময় দাস ও অপর কয়েকজন কবি জয়দেবের গীতানুবাদের পয়ারানুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী (১৭৩৬ খৃঃ) অনুবাদক গিরিধর জয়দেবের ছন্দের মাধুর্য্য বজায় রাখিয়া অনুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহাতে জয়দেবের ঠিক সুরটি ধরা পড়িয়াছে।

গীতগোবিন্দ।

১৬৩৮ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আলোয়াল মলিক মহম্মদ জ্যোসি রচিত হিন্দী পদ্মাবতের যে বঙ্গীয় পদ্যানুবাদ করেন তাহা শুধু অনুবাদ বলিলে তৎপ্রতি অবিচার করা হয়। বাঙ্গলা 'পদ্মাবতে' আলোয়াল যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব-'শক্তি,' হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণের জ্ঞান এবং সংস্কৃতের উপর অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। ভারতচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে আলোয়াল বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের যে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমাদিগকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া ফেলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সংস্কৃতবহুল এই কাব্যের অনেক প্রাচীন পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফারসী অক্ষরে লিখিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি কোন কোন ইংরেজের মনে বঙ্গাক্ষর রোমান অক্ষরে পরিবর্ত্তন করিবার কথা উদয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইবার নহে। পালি ভাষাটা দেবনাগর অক্ষর ছাড়িয়া রোমান অক্ষর গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত পালি ভাষার এই বেশ-পরিবর্ত্তন আমরা একেবারেই অনুমোদন করি না। তাই বলিয়া তাঁহারা সংস্কৃত, বাঙ্গলা এবং অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার উপর এই জুলুম চালাইতে সফল হইবেন, এমন বোধ হয় না।

প্রত্যেক বিষয়ে জাতীয়তার একটা দিক্ আছে। বাঙ্গলায় তিনটা 'শ,' তিনটা 'ন,' প্রভৃতির কোন উপযোগিতাই নাই। সাহেবেরা এদেশে আসিয়া গরম বস্ত্র ছাড়িয়া এখানকার উপযোগী ধুতি চাদর পরেন না, দেহটা গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মে সিক্ত করিয়া নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেন, তবু গরম কাপড় ছাড়েন না। বাঙ্গলা অক্ষরে যত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে কথাগুলি লিখিত হয়, রোমান অক্ষরে লিখিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী স্থানের দরকার। আর ভারতবর্ষে যে শত শত প্রাচীন পুঁথি আছে, রোমান অক্ষর প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা পড়িবার লোক জুটিবে না। এই জাতীয়তা-বিরোধী প্রস্তাব কখনও সমর্থিত হইতে পারে না, মুসলমানেরা ফারসী অক্ষর চালাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে কিছু কিছু আছে। আশা করি কেহ বাঙ্গলা ভাষার বুকের উপর এই শেল বিধাইতে চেষ্টা করিবেন না।

বাঙ্গলার বিরাট্ অনুবাদ-সাহিত্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। হঠাৎ সংস্কৃতের মহাভাণ্ডার নিজের গৃহের দ্বারে উন্মুক্ত দেখিয়া বঙ্গীয় অনুবাদ-কারেরা দুহাতে শব্দ লুণ্ঠন আরম্ভ করিতে লাগিয়া গেলেন। প্রথম প্রথম বঙ্গভাষায় সংস্কৃত যোজনা বিসদৃশ হইয়াছিল ; কৃষ্ণদাস কবিরাজের "একাদস্ত্যপবাস"

অনুবাদ-সাহিত্যের স্থায়ী ফল।

'ধাত্র্যশ্বথ' প্রভৃতি সন্ধি-প্রয়োগ উৎকট। এমন কি বহু পরে রামপ্রসাদের "জননী জাগৃহি জাগৃহি এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি"ও দুঃসহ। কিন্তু আলোয়ালের "মলয়সমীর সুসৌরভ সুশীতল, বিলোলিত পতি অতি রসভাবে ; প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালদ্রুম, মুকুলিত চূত-লতা কোরকজালে।" প্রভৃতি পদে বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কৃতের রাজ-যোটক হইয়াছে। এই ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী ভারতচন্দ্র ; তিনি সংস্কৃত দুরূহ তোটক, ভুজঙ্গ-প্রয়াত প্রভৃতি

ছন্দ নির্দ্দোষভাবে বাঙ্গলায় আনিয়াছেন। বাঙ্গলা বর্ণমালায় লঘু-গুরু ভেদ নাই, সুতরাং সংস্কৃতের ছন্দগুলি নির্ভুল করিয়া বাঙ্গলায় আনা যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ভারতচন্দ্র শুধু এই কার্য্যে আশ্চর্য্য সফলতা দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু সংস্কৃত কবিতায় যাহা নাই, সেই সুকঠিন মিল দেওয়ার রীতিও সংস্কৃত ছন্দে রচিত বাঙ্গলা পদ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতার কোন কোনটি সংস্কৃতের এত অধিক অনুগামী হইয়াছে যে তাহা কাশী কি পুনার পণ্ডিতেরা দেবনাগর অক্ষরে পাঠ করিলে তাহা সংস্কৃত বলিয়াই ভুল করিবেন, যথা :—"জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর, জয় শ্মশান-নাটক, বিষাণ-বাদক, হুতাস-ভালক মহেশ্বর।"

ক্রমে বাঙ্গলা ভাষা এতই সংস্কৃত শব্দে বিভূষিতা হইল যে, এদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেখিয়া বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কালে বহু ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল। সেগুলি প্রাক্-সংস্কৃত যুগের। তাহাই পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়াছে।

দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কাণাহরি দত্ত রচিত মনসা-মঙ্গল সম্বন্ধে সংস্কৃত-বিৎ বিজয় গুপ্ত বলিয়াছিলেন—"উহা বহু প্রাচীন কালের লেখা, অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; লেখকের ভাষা ও ছন্দের জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না"—ইত্যাদি। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কাণাহরি দত্ত প্রাক্-সংস্কৃত যুগের কথিত ভাষায় লিখিয়াছিলেন, শিক্ষিত বিজয় গুপ্তের তাহা ভাল লাগে নাই। প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যকে যাঁহারা সংস্কৃত শব্দের নববেশ পরাইয়া ভদ্র সমাজের কাছে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাখরগঞ্জের ফুলশ্রী গ্রাম-নিবাসী বিজয়গুপ্ত (১৪৯৩ খৃঃ), সমকালিক কবি ময়মনসিংহ-নিবাসী নারায়ণদেব, ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত পাতুয়ার-নিবাসী বংশীদাস ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী (১৫৭৫ খৃঃ), বিক্রমপুর ঝিনারদি-নিবাসী ষষ্ঠীদাস ও গঙ্গাদাস সেন (ষোড়শ শতাব্দী), বর্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগনানিবাসী কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবিরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এপর্য্যন্ত মনসামঙ্গল-রচক এক শতের উপর প্রাচীন কবি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশ—বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গ নদীমাতৃক স্যাঁতসেতে, হাওরপূর্ণ জঙ্গলা দেশ, এখানে সর্পভীতিহেতু মনসাদেবী অতি জাগ্রৎ দেবতা; ভাদ্রমাসে ইহার পূজার মন্দিরে গান করিবার জন্য বহু "নূতন মঙ্গল" রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে বিজয়গুপ্তের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান-সংঘর্ষের যুগ, কবি সেই সংঘর্ষের কয়েকটি জীবন্ত চিত্র দিয়াছেন। নারায়ণ দেবের হাতে বেহুলার বিলাপ চিত্তদ্রাবী কারুণ্যমণ্ডিত হইয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বংশীদাস তাঁহার সময়কার সামাজিক ছবিগুলি—দেশে শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা, জাহাজনির্ম্মাণ ও স্থপতিবিদ্যার প্রসঙ্গগুলি খুব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া

মনসাদেবীর গান।

মনসা-মঙ্গলের কবিগণ।

কাব্যখানিতে এত করুণ রস ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে বেহুলার দীর্ঘ দুঃখকাহিনীতে যেরূপ পাঠকের দুঃখাশ্রু পড়িয়া থাকে, তেমনি তাঁহার মাতার সঙ্গে মিলন এবং শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রসঙ্গে চক্ষে অবিরল পুলকাশ্রু পতিত হয়।

চণ্ডীমঙ্গল—এই শ্রেণীর কাব্যও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচিত কতক কতক পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্ত-ভাগবতকার লিখিয়াছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে—চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, বহু ভক্ত চণ্ডীমঙ্গলের পালা গাহিয়া রাত্রি-জাগরণ করিতেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের সমকালবর্ত্তী বা অব্যবহিত পূর্ব্বে বিক্রমশীল নামক এক রাজা মঙ্গলকোটে রাজত্ব করিতেন, ইহার কাহিনী কোন কোন ফারসী পুস্তকে পাওয়া যায় এবং "সেক শুভোদয়া" নামক পুস্তকেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধনপতি সদাগর এই রাজার আশ্রিত ছিলেন। বহু চেষ্টার পর মুসলমানগণ এই রাজ্য ধ্বংস করেন। সুতরাং সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। বলরাম, কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি কবিরা মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্যই এইক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরাম সন্ধি-যুগের কবি, তাঁহার ভাষা ও ভাব—উভয়েই প্রাক্-সংস্কৃত যুগ ও সংস্কৃত-যুগের নিদর্শন আছে। এই আখ্যানের সমস্ত উপাদানই মুকুন্দরাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের নিকট পাইয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টিতে খুঁটিনাটি বিষয়গুলির নানারূপ সৌন্দর্য্য ধরা পড়িয়াছে। চরিত্রাঙ্কনে এবং সামাজিক কি গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনীবর্ণনায় তাঁহার অসামান্য শক্তি ছিল। তিনি ব্যাধ-নায়ককে পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হন নাই, যেহেতু সুচিরাগত গল্প পূজা-মণ্ডপে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে—মূলগল্পের পরিবর্ত্তন শ্রোতারা সহ্য করিবেন না; কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁহার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত মানুষ করিয়াছেন—এইখানে তাঁহার বাহাদুরী। ব্যাধ-নায়কের দুই বাহু "লোহার সাবল", তাহার বক্ষে ব্যাঘ্রনখের পদক, সে শৈশব হইতে মল্ল-বিদ্যায় পটু, "অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে।" সে যখন খাইতে বসে—তখন হাঁড়িতে হাঁড়িতে ক্ষুদ, পুঁইশাক, হরিণের পায়ের গোড়ালীর মাংস প্রভৃতি খাইয়া নিজের সাধ্বী ও অনুরাগিণী স্ত্রীর জন্য কিছু রহিল বা না রহিল—সে চিন্তা না করিয়াই বলিয়া উঠে,—"রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে?"—তাহার গ্রাসগুলি "তেআঁটিয়া তালের মত" এবং ভোজনটি অতীব কুৎসিত। সে এত বড় মূর্খ যে যখন পার্ব্বতী তাহাকে সাতঘড়া ধন দিয়া তাহারই অনুরোধে একঘড়া নিজে কাঁখে করিয়া লইয়া চলিলেন, তখন "মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধনঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী", সে যখন কথা কহে তখন স্ত্রীকে প্রতি কথায় বর্ব্বরের মত ধমক দেয়—"সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য-ভাষা। মিথ্যা হলে চোয়ারে কাটিব তোর নাসা"—সুতরাং সে যে মূর্খ ব্যাধ, তাহা বুঝিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব হয় না; অথচ নৈতিক জগতে সে রাজচক্রবর্ত্তী, তাহার বাহ্য-বর্ব্বরতার মধ্যে তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় চরিত্রের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধূর্ত্ত মুরারি শীলের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তাহার শিশুর ন্যায় সরলতা দৃষ্ট হয়। চণ্ডীর সঙ্গে ব্যবহারে তাহার

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ।

দাম্পত্য-জীবনের শুভ্র সততা, অসামান্য নৈতিক বল, স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে সরল সতেজ সাবধানতা, অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার এই সকল মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাহার সাধুর ন্যায় দৈন্য এবং নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিয়া পরকে সম্মান করার বৃত্তি তদীয় চরিত্র মধুর করিয়া তুলিয়াছে। ফুল্লরার চরিত্র কষ্টসহিষ্ণুতা, সংযম এবং স্বামি-ভক্তির খনি; সে স্বামীকে এত ভালবাসে যে নিদারুণ দারিদ্র্য এবং উপবাসাদির কষ্ট সে তিলমাত্র গণ্য করে না; সে তাহার বারমাসীতে চণ্ডীকে যাহা যাহা বলিয়াছিল—তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—কিন্তু সেগুলিও সে দুঃসহ মনে করে নাই; স্বামি-প্রেমে অম্লান মুখে সে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ সহিয়াছে; সেকথাগুলি বলার উদ্দেশ্য শুধু চণ্ডীকে ভয় দেখাইবার ইচ্ছা। চণ্ডীর প্রতি তাহার সন্দেহ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাহার ভয়াতুর প্রাণের গভীর স্বামি-ভক্তি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে। তারপর যখন চণ্ডী বলিলেন, "এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে—হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ বীরবরে"—তখন যেন স্বর্ণপ্রতিমা ভয়ে ম্লান হইয়া গেল। ফুল্লরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত উপদেশকের যে মুখোস পরিয়াছিল, তাহা খুলিয়া গেল এবং অসহ্য দুঃখে সে কাঁদিয়া ফেলিল। কবিকঙ্কণ যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বর্গের কথা হউক কি নরকের কথাই হউক,—সমস্তই বাঙ্গলার মাটীর। বাঙ্গলাদেশের পল্লীগুলি তাঁহার অঙ্কন-কৌশলে জীবন্ত হইয়াছে। তিনি পশুপক্ষী, প্রাকৃত দৃশ্য প্রভৃতি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন—সমস্ত বিষয়ই মানব-সমাজকে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিয়াছে। কালকেতুর সঙ্গে পশুদের যুদ্ধ—ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলদের সঙ্গে হিন্দুদের লড়াইয়ের একখানি চিত্র। মনুষ্য-সমাজ তাঁহাকে এতটা পাইয়া বসিয়াছিল যে, ভ্রমরগুলি ফুলে ফুলে উড়িয়া যাইতেছে একথা বলিতে যাইয়াও কবি মানুষের সমাজই স্মরণ করিয়াছেন। "এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে। এক গৃহে পেয়ে মান, গ্রামযাজী দ্বিজ যান, অন্য ঘরে আপন সম্ভ্রমে।" ধনপতির গৃহে তর্কমুখর বণিক্‌-সভা এরূপ সুচিত্রিত হইয়াছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় আমরা বড় মানুষের বাড়ীর একটা বড় রকমের সামাজিক কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমরা বলিয়াছি, মুকুন্দরাম সন্ধিযুগের কবি। তাঁহার ভাষায় একদিকে প্রাক্‌-সংস্কৃত যুগ, অপরদিকে সংস্কৃতাত্মক যুগ—গঙ্গাযমুনার মত—আসিয়া মিলিত হইয়াছে। "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি, ভেরেণ্ডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে" প্রভৃতি ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে "জানুভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ"—এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া গিয়াছে। ফুল্লরার বারমাসী, বণিক্‌দের কলহ, মুরারি শীলের সঙ্গে কালকেতুর আলাপ প্রভৃতি আখ্যান প্রাক্‌-সংস্কৃত যুগের ভাষার প্রকৃতি দেখাইতেছে। অপর দিকে দশভুজার বর্ণনা, খুল্লনার ছাগ লইয়া বনে বিচরণ এবং সুশীলার বারমাসী প্রভৃতি অংশ নিছক সংস্কৃত শব্দে রচিত। প্রাচীন আখ্যানের বিষয়-বস্তুটি ঠিকই আছে, কিন্তু জনার্দ্দন-ঘটকের গৌরীদানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন প্রভৃতি অংশে নব-ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব পড়িয়াছে। এইজন্য কবিকঙ্কণকে সন্ধিযুগের কবি বলা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম বর্দ্ধমান দামুন্যা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কয়রি কুলের রাজা তপন ওঝা"র সন্ততি। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র,

পুত্রের নাম শিবরাম। ইনি যৌবনকালে মামুদ সরিফ্ নামে এক অত্যাচারী ডিহিদারের উৎপীড়নে রাজা বাকুড়া রায়ের আশ্রয়ে চলিয়া যান এবং রাজকুমার রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। চণ্ডীকাব্য ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। এই কাব্যের অধিকাংশ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ই. বি. কাউএল (E. B. Cowell) সাহেব ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ করেন। কবিকঙ্কণের পর যে সকল কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জপ্‌সা (ফরিদপুর)-নিবাসী জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক লিখিত "চণ্ডীকাব্যই" সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার একখানি পুঁথি "বার ভূঞা"র লেখক আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজনীয়।

ধর্ম্মমঙ্গল।

ধর্ম্মমঙ্গলের আদি লেখক ময়ূর-ভট্ট সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, তাঁহার রচিত পুস্তক বঙ্গের কোন পল্লীতে হয়ত এখনও আছে। একখানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম কিন্তু তাহা নাকি হারাইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকখানির সন্ধান হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, এম. এ. এই পুস্তকের প্রথমার্দ্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যে যে সকল প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে আমরা তাহার একবার উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্ত্তী লেখকগণ এই প্রাক্-সংস্কৃত যুগের কাব্যখানিকে রূপান্তরিত করিলেও ইহার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান আছে। ভিন্ন ভিন্ন কবিকৃত "ধর্ম্মমঙ্গল"কে একস্থানে জড় করিয়া রীতিমত আলোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ময়ূর-ভট্টের পরে মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, সীতারাম এবং ঘনরাম প্রভৃতি কবি ধর্ম্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ-কবি বিলুপ্ত বৌদ্ধযুগের রাজন্যবর্গের মহিমজ্ঞাপক কাব্য লিখিতে যাইয়া ভয় পাইয়াছিলেন। স্বপ্নের দোহাই দিয়া শেষে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, সীতারাম প্রভৃতি কবি-রচিত পূর্ব্বোক্ত মঙ্গল-কাব্যগুলি ছাড়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, শনি প্রভৃতি বহু দেবতা-সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ কাব্য বাঙ্গলায় রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণগুলিও এই সকল মঙ্গল-কাব্য দ্বারা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নব-ব্রাহ্মণ্যের বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। ইহাদের চেষ্টায় বঙ্গভাষা সাধুভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত যুগের দৈন্য ঘুচিয়া গিয়া এই ভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। জনসাধারণ এখন এত সংস্কৃতাত্মক কথা বুঝিতে পারে যে ভারতের অন্য কোন ভাষা-ভাষী লোকেরা এ বিষয়ে বাঙ্গলার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতির শিক্ষা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়াছিল—তাহাতে এই ভাষা পূর্ব্ব হইতে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থগুলির এই যে অনুবাদের বন্যা দেশময় বহিয়া গেল, তাহাতে এই ভাষার স্বর্ণফসল ফলিয়া উঠিল, এখন ভারতে সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাই সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সন্নিহিত। মুসলমান-প্রভাবে বাঙ্গলার নাগরিক জীবনে ও

রাজসভায় বহু ফার্সী ও আরবী শব্দ ঢুকিয়াছে; আইন ও আদালতের ভাষা মুসলমানী ভাষার অধিকৃত হইয়াছে। 'নিশাপতি,' 'মহাপাত্র,' 'পাত্র,' 'মণ্ডল,' 'মহামণ্ডল' প্রভৃতি পদবী কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তৎস্থলে—উজির, ওমরাহ, নাজির, চাক্‌লাদার, কাজি, দেওয়ান, নায়েব, কারকুন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র সর্দ্দার ও বরকন্দাজ প্রভৃতি সমস্তই মুসলমানী শব্দ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অত্যধিক প্রচলন হেতু পাইক (পদাতিক), কোটাল প্রভৃতি কয়েকটি হিন্দুযুগের প্রাকৃত শব্দ কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিয়া আছে। এই বিদেশী প্রভাব বঙ্গের পল্লীতে ঢুকে নাই, সেখানে চন্দ্রসূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র মেটে দীপটি পর্য্যন্ত হিন্দু কুটিরের সাঁঝের বাতিটা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। এই নিত্যচঞ্চলা রাষ্ট্রলক্ষ্মীর লীলাখেলা পদ্মানদীর উদ্দাম ক্রীড়ার ন্যায় এদেশের প্রাচীন বৈভব ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, কিন্তু পল্লীর কুটিরখানি নিশ্চল দীপ-শিখার ন্যায় এতদিন পর্য্যন্তও স্থির হইয়াছিল—সম্প্রতি পাশ্চাত্য ঝড়ে তাহা বিকম্পিত হইতেছে।

এই যে সংস্কৃত-যুগ আরম্ভ হইল, তাহার প্রধান কথা আচার ও নিয়মের প্রতিষ্ঠা! সর্ব্বগ্রাসী বৌদ্ধপ্রভাবের শেষ সময়ের ব্যভিচার—যাহা চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি যাবতীয় বিদেশী রাজ্য হইতে আসিয়া উৎকটভাবে এদেশে তাণ্ডব করিতেছিল,—তাহার হাত হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইতে যাইয়া ব্রাহ্মণ স্মৃতিকারেরা সামাজিক নিয়মের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত হইলেন, খাদ্যাদির নিয়মসম্বন্ধে খুব আঁটা আঁটি হইল। বৌদ্ধাধিকারে বিবাহ-সম্বন্ধে অত্যন্ত শিথিলতা ঘটিয়াছিল, খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকেও জাভার রাজারা সহোদরা বিবাহ করিতেন, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মামাত ভগিনী থাকিলে অন্যত্র বিবাহ করা সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পুণাতে এই রীতি এখনও বিদ্যমান। উড়িষ্যায় দেবরের সঙ্গে বিবাহ-প্রথা বর্ত্তমান ছিল। নব ব্রাহ্মণ্য এবিষয়ে এত আঁটা আঁটি নিয়ম বাঁধিয়া দিল যে, বঙ্গদেশে সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ব্যাপারটা একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কোন্ তিথিতে কি খাইতে হইবে—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তৎসম্বন্ধে কঠোর বিধি প্রণয়ন করিলেন। কাশীদাস লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাঘ মাসে মূলা ভোজন করে, সে ব্রহ্ম-হত্যাকারীর পাপ করে।

জাতিসম্বন্ধে স্মৃতিকারেরা ব্রাহ্মণকে উঁচুতে রাখিয়া অপর সর্ব্বজাতিকে এতটা নীচে নামাইয়া দিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি কোন অসীম সমুদ্রোত্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির মত স্বতন্ত্র হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যে এই অসমতা এখনও উৎকট ভাবে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু বাঙ্গলা দেশ চিরকালই দুর্দ্দান্ত,—স্বাধীনতা-প্রিয়, সিংহকে খাঁচায় পুরিলে সে যেরূপ শৃঙ্খলকে দুঃসহ মনে করিয়া ছটফট্ করিতে থাকে, অত্যধিক ব্রাহ্মণ-শাসনে পীড়িত হইয়া বাঙ্গালী এই দৌরাত্ম্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ব্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণেরা মন্দিরগুলি আত্মসাৎ করিয়া দেবতাদিগকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, জনসাধারণ ও তাহাদের দেবতার মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্থিত হইল। অভিমানে এদেশের অনেকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

এই সকল অনুশাসনের বিরুদ্ধে চৈতন্যদেব সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও রাগানুগ প্রেমের আদর্শ লইয়া অভিযান করিলেন। সমস্ত বিধিব্যবস্থা ভাসাইয়া দিয়া তিনি ভগবৎ-প্রেমের ডিঙ্গি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ভিড়াইয়া দিলেন। তাঁহার অনুচরেরা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত লোকের গৃহে দেবতা স্থাপন ও স্বদলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহাদের পৌরোহিত্যের ব্যবস্থা করিলেন। আবার দেবের দুয়ার আচণ্ডাল সর্ব্বজাতির জন্য খোলা হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্য-যুগ

এপর্য্যন্ত রূপকথায়, গীতিকথায় ও পল্লীগীতিকায় যে সকল মহীয়সী নারীর চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়,—বঙ্গের শত শত সতী যে প্রেমের আদর্শ দেখাইয়া মৃত্যুতেও প্রেমের বৈজয়ন্তীর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, সহজিয়া প্রেমের সমাজ-বিরুদ্ধ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাদের তপস্যা—এই সমস্ত উপকরণ ও জাতীয় সাধনার ফল আত্মসাৎ করিয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইল। উহা বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ তপস্যার কথা। আমাদের দেশের মহিলাদের একনিষ্ঠ স্বর্গীয় প্রীতি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোভাবের বৈচিত্র্য—সমাজ-বিদ্রোহ ও অবাধ স্বাধীনতাজনিত নির্ভীক হৃদয়বল এই সমস্তই এক রাধিকাচরিত্রে আছে। ইনি গল্পের নায়িকা নহেন, ইনি সাধনার ধন। ইনি কোন কাব্যের চরিত্র নহেন—ইনি 'মহাভাব'। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরা এই মহাভাবময়ীকে আঁকিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের কবিতা।

প্রথমে হরিনাম-মাহাত্ম্য—যে নাম সাধকেরা জগতে একমাত্র সত্য বলিয়া দেখাইয়াছেন, মৃত্যুকালে যে নামই একমাত্র সম্বল—সেই নামের কথা দিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার গীতি আরম্ভ করিয়াছেন। "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"—ভক্ত নাকি এই নাম জপ করিতে করিতে এমন এক স্থলে পৌঁছেন, যেখানে ইন্দ্রিয়ের কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই নামজপের কথা চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলগো"—"অবশ" অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগ বিলুপ্ত হওয়া। যিনি সর্ব্বস্থানে আছেন, অথচ যাঁহার অস্তিত্ব অবিদিত, যদি হঠাৎ তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তা অনুভূত হয়—সাধক যদি প্রকৃতই বুঝিতে পারেন,—এই মুহূর্ত্তে এখানে তিনি আছেন, তবে সেই সত্তার মহিমায় অভিভূত হইয়া গৃহস্থ কি আর গৃহধর্ম্ম করিতে পারেন? তাই "যেখানে বসতি তার, সেখানে থাকিয়া গো যুবতী-ধরম কৈছে রয়"—নামের মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া চণ্ডীদাস রূপের কথা বলিয়াছেন; অরূপের রূপ সে আবার কি প্রকার? সেতো "সুবর্ণের পিত্তল-কলসী;" জগৎ দেখিতেছি,

জগদীশকে কি দেখিতে পাইব না?' এই জগৎকে চারিদিকে শ্যাম ও কৃষ্ণ বর্ণ ঘিরিয়া বসিয়াছে; আকাশ,—প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদ-নদী, সমুদ্র—এ সমস্তই সেই নীলাভ শ্যাম-মিশ্র কৃষ্ণবর্ণ। অপরাপর রঙ্গের খেলা ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়, সেই কৃষ্ণ-মধুরিমাকে সাজাইতেছে। চণ্ডীদাসের রাধা সেই কৃষ্ণবর্ণের মাধুরীতে ডুবিয়া আছেন। তিনি চুল হইতে মালতীর মালা খসাইয়া ফেলিয়া মুক্ত-কুন্তলে কৃষ্ণের আভা দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন—"এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথুনি, দেখয়ে খসায়ে চুলে"—ক্ষণে ক্ষণে মেঘের মধ্যে অরূপের রূপের আভা দেখিয়া "না চলে নয়নে তারা"—ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের বর্ণ দেখিয়া সেই কৃষ্ণ-বর্ণ মনে পড়িতেছে। তাঁহার নাম শুনিয়াছেন, ইন্দ্রিয় নিরস্ত হইয়া গেলে জীবমাত্র তাঁহার আহ্বান শুনিতে পায়, কারণ তিনি সকলকেই তাঁহার মধুরাক্ষরা ভাষায় ডাকিতেছেন। সেই সঙ্গীত আমাদের কাছে ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ আমাদের কাণ সংসারের কোলাহলের দিকে—এজন্য সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "Such music is in our eternal soul, but for the vesture of decay that enshrouds it, we cannot hear."

রাধা সেই ডাক শুনিয়াছেন, এজন্য "বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস (গেরুয়া) পরে, যেমন যোগিনী পারা" এই প্রেমের বাউড়িয়ার ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায়? তিনি গৈরিক পরেন, "সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।"

রাধিকা "ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়, মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়।" এই ছবির সঙ্গে চৈতন্যদেবের ছবি মিলাইয়া দেখুন।

রাধিকা "যে করে কানুর নাম—তার ধরে পায়, পায় ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতুলী যেন তলে লুটায়"—যিনি কৃষ্ণনাম শুনিলে আচণ্ডাল সকলের পায় গড়াগড়ি দিতেন,—এই রাধার চিত্র কি তাঁহারই পূর্ব্বাভাস নহে? যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী সামান্য নায়িকার প্রেম বলিয়া ভুল করিবেন, সেই সকল সংসারী লোক এই পদাবলী-রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী নহেন।

ভগবান্ পুত্রকন্যাস্ত্রীরূপে দিনরাত্রি আমাদের সেবা করিতেছেন। এই আমাদের চিরন্তন প্রভু—চিরন্তনসেবকের—সত্তা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, "একথা কহিবে সই একথা কহিবে। রমণী এমন তপ করিয়াছে কবে। পুরুষ পরশমণি নন্দের কুমার। কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার?" যাহার স্পর্শ যাদুকাঠি, তাহাতে সীসা ও লোহা পর্য্যন্ত সোণা হইয়া যায়, তিনি কেন—কোন্ ধনের জন্য—আমার পায়ে ধরেন? সেই বিরাট্ পুরুষ ক্ষুদ্র হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার নিকট এক ভিক্ষার জন্য (তাহা ভালবাসা) আমার কুটির-দ্বারে আসিয়া হাত পাতিয়া থাকেন। তাঁহাকে না চিনিয়া আমরা প্রত্যহ ফিরাইয়া দিতেছি। তাঁহার সেই অসীম প্রেম—পুত্রকলত্র মাতাভগিনীর মারফৎ আমরা প্রত্যহ পাইতেছি,—"আমি যাই-যাই-যাই—বলে তিন বোল, কত না চুম্বন দেয়—কত দেয় কোল। পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া। বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া। করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে। পুন দরশন লাগি কত চাটু বলে।" এই যে প্রেমের খেলা তাঁহারই বিশ্বে নিরন্তর চলিয়াছে—

এই নিত্য লীলার খেলোয়াড় তিনি। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ বৃহতের নিকট, কীট হইতে কীট কীটের নিকট, এই ভাবে প্রত্যেক জীবের দ্বারস্থ। যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, যিনি রাজচক্রবর্ত্তীর মহোৎসবের বিধাতা, তিনি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মিষ্টান্নকণা লইয়া ক্ষুদ্র গর্ত্তটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আহ্বান করিতেছেন।

রাধিকা ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই মানেন না, কারণ ধর্ম্মকর্ম্মের মালিককে পাইয়াছেন, "কি আর শুনাও ধরম করম—মন স্বতন্তর নয়"—"মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যাঁরা, কাজ নাই সখি তাঁদের কথায়, বাহিরে রহুন তাঁরা।"

"আমি কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপেছি, তিল তুলসী দিয়া"—তিল-তুলসী দিয়া যে দান হয়, তাহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না। কে এরূপ আছেন, যিনি বলিতে পারেন—ভগবান্‌কে তিনি কিছুমাত্র না রাখিয়া দেহ দান করিয়াছেন? তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—সমস্তই ভগবানের অধীন, তাঁহারই প্রীত্যর্থে তাহারা চালিত, তাহাদের অন্য কোন কাজ নাই। রাধিকা যাহা দিয়াছেন—তাহা চেষ্টা করিয়াও ফিরাইয়া আনিবার সাধ্য নাই। "কত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়রে। আনপথে যাই, পদ কানু পথে ধায়রে॥ এ ছার নাসিকা মুই কত করি বন্ধ; তবুতো দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ।"

প্রেমিক হিসাবে চণ্ডীদাস অদ্বিতীয়, কবি-শিল্পী হিসাবেও তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে পাঠক বা শ্রোতার কল্পনা উদ্বোধন করিবার অবকাশ আছে, তিনি সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন নাই, দুর্লভ ভাবগুলির ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। যেদিন ভগবানের প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেদিন সেই পুলকের তরঙ্গ সর্ব্বত্র বহিয়া যায়—সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়; "গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি। পুলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে—সব শ্যামময় দেখি।" যমুনায় যাওয়ার সময়ে সে কি ভাব! তখন তিনি সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারেন না—"সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে—সেকথা কহিবার নয়।" যমুনায় যাওয়ার সময়ে তাঁহার যে অবস্থা হয়—তাহা বলিতে যাইয়া মুখের কথা ফিরিয়া দাঁড়ায়। সে অপ্রকাশ্য অসহ্য আনন্দের কথা মনে হইতেই তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়েন। "যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়?" কেন যমুনার জল ঝলমল করে—তাহা আর তিনি বলিতে পারেন নাই—"সেকথা কহিবার নয়।" কৃষ্ণ কদম ডালে বসিয়া থাকেন, তাঁহারই ময়ূর-পক্ষসংযুক্ত উজ্জ্বল মূর্তির প্রতিবিম্ব জলের উপর পড়িয়া ঝলমল করে—রাধা এত কথা বলিতে পারেন নাই, পরবর্ত্তী এক কবি বলিয়াছেন—"ঢেউ দিও না কেউ জলে, বলে কিশোরী। দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী।"

রাধা লোকনিন্দা সহিতেছেন—তাঁহার জাতি-কুল-শীল ছাড়া প্রেম, জগ-ভরা নিন্দা, তিনি কলঙ্কী, কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—তাহা শতবার বলিয়াছেন; "দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে—এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে।" উপবাস, লোকনিন্দা, গুরুজনের গঞ্জনা, এসমস্তই তিনি প্রফুল্লমুখে সহিয়াছেন "যথা তথা যাই আমি, যতদূর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।" এমন অমৃত থাকিতে সংসারের বিষ আর তাঁহার কি করিবে?

কিন্তু এত ভালবাসিয়াও তিনি সময়ে সময়ে বুঝিতে পারেন না যাঁহাকে তিনি ভালবাসেন তিনি কে? "পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর—ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর। বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।" সাধক সর্ব্বস্ব দান করিয়াও সেই অধ্যাত্মলোকের দুর্জ্ঞেয় শক্তি, যাহা তাঁহাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে, তিনি কে, তিনি প্রকৃতই তাঁহাকে ভালবাসেন কি না এসম্বন্ধে তাঁহার মনে কখনও কখনও দ্বিধার ভাব আসে—পূর্ব্বোক্ত পদ তদ্রূপ এক মুহূর্ত্তের উক্তি। বিদ্যাপতির রাধা এইরূপ এক মুহূর্ত্তে বলিয়াছেন—"মাধব তুহুঁ কৈছে কহবি মোয়।"

চণ্ডীদাসের কবিতা—বাঙ্গলার লোকের প্রাণের স্বর। বহুকাল হইতে প্রেমের মর্ম্মবেদনা যে পল্লীগীতি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে—তাহা চণ্ডীদাসের পদে ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্ত হইয়া প্রমাণ করে—এই কবি আমাদের কত আপনার। "চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ী নিঙাড়ী" প্রভৃতি পদে সদ্যঃস্নাতা পল্লীরূপসীগণের ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া যায়। এই কবির কবিতা মানুষের মনের সন্দেহজনিত তীব্র কষ্ট, সর্ব্বস্ব দেওয়া গাঢ় প্রেম—একেবারে বিনাসর্ত্তে আত্মদান ও চিরবিরহ-বিধুর এবং চিরমিলন-স্ফূর্ত্ত প্রেমিকের হৃদয়ের যে সকল কথা আছে, সেই সর্ব্বকালোপযোগী ভাবের এমন একটা ছাপ মারিয়া গিয়াছে, যাহা যতদিন বাঙ্গলাভাষা থাকিবে ততদিন থাকিবে। একদিকে সংসার, অপরদিকে স্বর্গ—চণ্ডীদাসের পদ—ইহাদের মিলনের সেতু, একের পরিণতি অপরে, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ছাড়াছাড়ি নাই। চণ্ডীদাসের কবিতা ধর্ম্মকে একটা উচ্চস্থানে রাখিয়া ভক্তকে তাহা দূর হইতে দেখায় নাই, তাহাকে একেবারে নিজের ঘরের সংলগ্ন মন্দিরের দেবতার পাদপীঠে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে; এত সান্নিধ্যে আনিয়াছে বলিয়া সংসারের ধূলি লাগিয়া দেবমূর্ত্তি মলিন হইয়াছেন,—শ্লীলতার অভাবে তাঁহার গায়ে কলঙ্কের ছায়া স্পর্শ করিয়াছে, এমন কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যাঁহাকে লইয়া আমরা নিত্য বাস করিতেছি—সেই অন্তরের দেবতাকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জানিতে চাহেন না।

চণ্ডীদাস বীরভূম নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার বাশুলি মন্দিরের তিনি পুরোহিত ছিলেন। রামী (রামতারা) নামক এক ধোবানীর প্রেমে পড়িয়া তিনি জাতিচ্যুত হন। তাঁহার ভ্রাতার নাম নকুল ছিল। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁহার অনেক বন্ধু—তাঁহাদের মধ্যে, একজন রাজা তাঁহাকে জাতে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর (সম্ভবতঃ জালালুদ্দিন) স্বীয় বেগম সাহেবাকে কবির অনুরাগিণী মনে করিয়া চণ্ডীদাসের হত্যার আদেশ দেন। একটা হাতীর উপর তাঁহাকে রাখিয়া তীব্র বেত্রাঘাতে তাঁহার মাংস উঠাইয়া ফেলিয়া গৌড়ের রাজধানীতে তাঁহাকে বধ করা হয়। কথিত আছে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দর্শনে বেগম সাহেবা অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং হৃদয়ের স্পন্দন স্থগিত হওয়াতে তাঁহারও সেই সঙ্গে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে চণ্ডীদাসের বয়স চল্লিশের বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইনি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। গঙ্গাতীরে উভয় কবির দেখা হইয়াছিল এবং উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, অনেক প্রাচীন কবি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয় চণ্ডীদাস ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন তাঁহার তরুণ বয়সের

লেখা বলিয়া মনে হয়। এই কাব্যের শেষের দিকে চণ্ডীদাসের পরিচিত অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের সুরটি আছে। অধুনা কয়েকজন পণ্ডিত রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমসম্বন্ধীয় সংস্রব অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধোবানীর প্রেম, এযে অসম্ভব! এইসকল ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত পণ্ডিতকে চণ্ডীদাসের কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে "কানুর পিরীতি জাতি-কুলশীল ছাড়া।" পঞ্চপুষ্প নামক মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য সবিস্তারে লিখিয়াছি। বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের সুরটি না চিনিয়া যাঁহারা বৃথা প্রজ্ঞাভিমানী হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা চণ্ডীদাসের কথাতেই বলিব "কাজ নাহি সখি, তাঁদের কথায়, বাহিরে রহন তারা।" কেহ কেহ চণ্ডীদাসের গান যে মহাপ্রভু আবৃত্তি করিতেন, তাহাও অস্বীকার করেন।

বিদ্যাপতি।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতির জন্মস্থান মিথিলার বিসফি গ্রামে। ইনি রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক রাজার অনুগ্রহ পাইয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন। এমন কি সুলতান গয়েসুদ্দিন ও নসির সাহার প্রশংসাও ইঁহার ভণিতায় পাওয়া যায়; তাহাতে মনে হয় শুধু মিথিলার রাজগণ নহে, গৌড়েশ্বরগণের মধ্যেও কাহারও কাহারও কৃপাদৃষ্টি ইঁহার উপর পড়িয়াছিল। ইঁহার জীবন শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল ব্যাপক থাকাতে ইনি বহু রাজার রাজত্বকালের ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন। ইনি সংস্কৃতে 'পুরুষ-পরীক্ষা' প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন, বংশানুক্রমে ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহার অনুগ্রাহক রাজা ও রাজ্ঞীগণের মধ্যে শিবসিংহ ও লছিমা দেবীই কবির বিশেষ উৎসাহ-দাতা ছিলেন। ইনি রাজার এতটা অনুরক্ত ছিলেন যে শিবসিংহের মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পরেও তাঁহাকে ইনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, "স্বপনে দেখিনু শিবসিংহ ভূপ। চৌত্রিশ বৎসর পরে শ্যামল রূপ।" প্রায় সমস্ত চতুর্দ্দশ শতাব্দী ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর অবধি ইনি জীবিত ছিলেন। ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যশোরের বসন্তরায় এবং অপর কয়েকজন বাঙ্গালী পদকর্ত্তা হিন্দী-মিশ্র বাঙ্গলা ভাষায় পরিবর্ত্তিত করেন। সেই পরিবর্ত্তিত আকারে মৈথিল কবির পদ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এখনও গীত হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং দিনরাত্র বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করিতেন, এইজন্য বাঙ্গলা দেশে ইঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছে। উপমা ও অন্যান্য অলঙ্কারের ছটায় বিদ্যাপতির সঙ্গীতগুলি ঝলমল করিতেছে। ইঁহার শেষ দিক্‌কার পদাবলীর ভাবের প্রগাঢ়তাও কম নহে। প্রবাদ এই যে চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎকারের পরে অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিবর্ত্তে ভাব-প্রবণতার দিকে ইঁহার ঝোঁক বেশী হইয়াছিল। বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলনের পদ ভাব-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়। "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে, মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে। বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু দেহব তাহে চিকুর বিছানে। আলিপনা দেওব মোতিম হার। মঙ্গল কলস করব কুচ ভার" প্রভৃতি পদে কবি অশরীরী মিলনের কথা গাহিয়াছেন, যেখানে নরদেহই দেবমন্দির এবং কৃষ্ণ স্বয়ং সেই মন্দিরের দেবতা। মাথুরের পর কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে আসেন নাই, কিন্তু গোপীরা তাঁহাকে বাহিরে না

পাইয়া মনের ভিতর পাইয়াছিলেন। ভাব-সম্মেলন বৈষ্ণব কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—চিরবিরহের মধ্যে চিরমিলন।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরে বাঙ্গলায় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, অনন্ত দাস, বংশী দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি শত শত কবি পদ রচনা করেন। **নরহরি সরকার** শ্রীখণ্ডের সর্ব্বজনপরিচিত বৈষ্ণবগুরু ও চৈতন্যের অন্তরঙ্গ। ইঁহার রচিত "অঙ্গনে রহিল মোর হিয়ার হেম হার, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার, রোপিনু মল্লিকা নিজ করে, গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে। নরহরি ক'র এই কাম, সে সময়ে কর্ণে শুনা'ও হরিনাম"—প্রভৃতি পদ প্রেমের পীযূষপূর্ণ; অনন্ত দাসের অভিসার অতি সুন্দর; বংশীবদনের "না যেও না যেও, রাই, বৈস তরুতলে, আসিতে পেয়েছ ব্যথা চরণকমলে।" প্রভৃতি পদ অতুলনীয়। ইঁহাদের অনেকেই চৈতন্যের সহচর ছিলেন। গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, শশিশেখর, বলরাম প্রভৃতি কবি পরবর্ত্তী যুগের। গোবিন্দ দাসের কথা ইতিপূর্ব্বে ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ইনি ব্রজবুলিতেই অধিকাংশ পদ লিখিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পর ইনিই বৈষ্ণব কবিকুলের শীর্ষস্থানীয়—ইঁহার রচিত "করযুগ নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।" "মণিকঙ্কণপন ফণিমুখবন্ধন, শিখয়ে ভুজগ-গুরু পাশে" এবং "বো পদতল থলকমল ধরণী-পরশে উপশঙ্ক। অব কণ্টকময় বাটহি আওত যাত নিশঙ্ক।" প্রভৃতি পদ—প্রেম যে ইন্দ্রিয়বিকার নহে—কঠোর সাধনা, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কাঁদড়া-বাসী **জ্ঞানদাস** ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি চণ্ডীদাসের পদের বিবৃতি করিয়া, কোথাও বা আশ্চর্য্য মৌলিকতা দেখাইয়া যে সকল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা এখন কীর্ত্তন-গায়কদের প্রধান আশ্রয়। কতকগুলি পদের তুলনা নাই, যথা "রূপলাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥ হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে। পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বাঁধে॥"—পদে মানুষ যে অপূর্ণ—শুধু নর কি নারী একক যে স্বীয় স্বাভাবিক অপূর্ণতায় ব্যথিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্য বেদনাতুর ও চিরপিপাসিত—তাহাই বুঝাইতেছে। এই অপূর্ণতা লইয়া নারী-জাতি পুরুষকে ছাড়িয়া টিঁকিবেন কিরূপে? যদি ভগবানের প্রেম দ্বারা এই চিরতৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা না মিটে, তবে নরনারীর দেহ ও মনের অপূর্ণতা লইয়া দাঁড়াইবার আর স্থান নাই। "কবি নৃপজ-বংশজ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" **বলরাম দাস ও ঘনশ্যাম**—গোবিন্দ কবিরাজদের বংশজাত। ঘনশ্যাম গোবিন্দ-পুত্র দিব্যসিংহের পুত্র। বলরাম দাসের পদ অতি সরল পল্লীভাষায় রচিত, ইঁহার "সখি হের দে আসিয়া বা। নিঁদ যায় চাঁদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥ নিশ্বাসে দুলিছে, রতন বেশর, হাসিখানি তাহে মিশা॥" এবং শশিশেখরের "তুঙ্গ মণিমন্দিরে, বিজুলী ঘন সঞ্চরে—মেঘরুচি বসন পরিধানা" কিংবা "অতি শীতল, মলয়ানিল, মন্দমধুর-বহনা" প্রভৃতি পদ বাঙ্গলাদেশে সুপরিচিত। গোবিন্দ দাস-প্রমুখ ঐ সকল কবিগণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন. ইঁহাদের প্রত্যেকের

অপরাপর বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তা।

লেখায় চৈতন্ত দেবের জীবনের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট ; এইজন্য ইহারা এমন একটি পৃথক্ পঙ্ক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে ইঁহাদিগকে অন্যান্ত প্রেম-সঙ্গীত-রচকদের সঙ্গে একত্র একটা স্থান নির্দ্দেশ করা উচিত নহে। ইঁহারা মহাকবি সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গদেশ ইঁহাদিগকে আর একটি নাম দিয়াছেন—যাহা ইঁহাদিগের গুণের বিশেষত্বের পরিচায়ক—সে সংজ্ঞাটি "মহাজন"।

ইঁহাদের পদে কবিত্বের শিল্পকলা অলক্ষিতে খেলিয়া গিয়াছে ; একটি পদের উল্লেখ করিব। চন্দ্রা কৃষ্ণকে খুঁজিয়া ক্লান্তা হইয়াছেন, রাধার নিষ্ঠুর ব্যবহারে হয়ত কৃষ্ণ আত্মহত্যা করিয়াছেন—এই আশঙ্কায় দূতীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে ; তাঁহার চক্ষে অবিরত অশ্রু ঝরিতেছে, তিনি আঁচলে মুছিয়া তাহা সামলাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ যমুনা-কূলে "নীপহি" মূলে তিনি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন—"চূড়া এক ঠাঁই, বাঁশী এক ঠাঁই" ধূলিধূসর দেহে তিনি নদী-সৈকতে লুঠিয়া পড়িয়াছেন। চন্দ্রা কৃষ্ণকে দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু গোপীর চিরাভ্যস্ত কপটতার সহিত মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, দূতী নিশ্চয়ই তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছেন ; রাধা নিশ্চয়ই অনুতপ্তা হইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। তখন এত দুঃখের সুখ-সমাপ্তিতে পুলকিত হইয়া কৃষ্ণ দেহ হইতে ধূলি ঝাড়িয়া দূতীর জন্ত অসহিষ্ণু হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্তা চন্দ্রা তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন ; তখন শুষ্ক-মুখে কৃষ্ণ 'দূতি-দূতি' বলিয়া পিছন হইতে ডাকিতে লাগিলেন, কারণ রাধাকে না দেখিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। দূতী উপেক্ষার ভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'পেছন হইতে ও ভাবে ডাকা ডাকি করিয়া অকল্যাণ করিতেছ কেন ?' "কি কহবি রে, মাধব, তুরিতহি কহ কহ (আমার দাঁড়াইতে সময় নাই) হাম যাওব আন কাজে"—"তব সনে বাত নহে মঝু সমুচিত, দোষ দেওব সখী মাঝে।" অন্তরে কৃষ্ণের সঙ্গ-লাভ—সুদুর্লভ সুখ-প্রাপ্তি, কিন্তু বাহিরে উদাসীনতা। কবি বিলম্বিত ছন্দে এই দুই ভাবের লীলা অতি নিপুণভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথম কৃষ্ণকে ধূলি ঝাড়িয়া দূতীর জন্ত প্রতীক্ষা-সূচক পদটির বিদ্রুতচ্ছন্দ এবং দ্বিতীয় পদটিতে দূতীর বাহ্য-উদাসীনতা কিন্তু কৃষ্ণ-সঙ্গের জন্ত নিবিড় পিপাসা ছন্দের কৌশলে ধরা দিতেছে। দূতী যে কথা বলিতেছেন তাহাতে মনে হইবে যে তাঁহার কথা বলিবার এক মুহূর্ত্তও অবকাশ নাই। এদিকে ছন্দটি এত বিলম্বিত যে তাহাতে তো ব্যস্ততা আদৌ নাই, বরং দূতীর যেন যতটা দেরী করিতে পারেন ততই ভাল—এই ভাবটি প্রদর্শিত হইতেছে। মুখে যাহা বলিতেছেন—ছন্দ তাহার প্রতিবাদ করিয়া মিথ্যাটা জাজ্বল্যমান করিতেছে। "কি কহবি রে, মাধব,—তুরিতহি কহ কহ—হাম যাওব আন কাজে, আমার দাঁড়াইবার সময় নাই"—দাঁড়াইবার সময় আছে বরং আরও কিছু বেশী, নতুবা এত টানা সুদীর্ঘ ছন্দে কি জরুরী কথা বলা হয় ! কথায় যে ব্যস্ততা, সুরে তাহার উল্টা। পদটি **রায় শেখরের**। এরূপ কৌশল বৈষ্ণব পদের অনেকগুলিতেই দৃষ্ট হইবে। পড়িতে তাহা যেরূপ বোঝা যায়—গানে তাহা আরও পরিষ্কার হয়।

আর একটি গানে রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিতেছেন—"রজনী শাওন ঘন, ঘন দেওয়া গরজন, সে যে রিমি ঝিমি শবদে বরিষে। পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, আমি নিঁদ যাই মনের হরিষে। শিখরে শিখণ্ডী রোল, মত্ত দাদুরী বোল, কোকিলা ডাকিছে কুতূহলে। ঝিঁ ঝিঁ ঝিনকী ঝাঁজে, ডাহকী সে গরজে, আমি স্বপন দেখিলাম হেন কালে।" নিদ্রিতার চক্ষু এখানে মুদ্রিত, সুতরাং বর্ষাসুলভ ময়ূরের নৃত্য নাই, নীপ-পুষ্পের ঘটা নাই, কুন্তলোপম কৃষ্ণমেঘের খেলা নাই—আছে শুধু শ্রুতির বিষয়। বর্ষার শত সৌন্দর্য্য ও দৃশ্যাবলী ছাড়িয়া কবি শুধু সুরটির উপর জোর দিয়াছেন, যাহাতে ঘুমের গাঢ়তা আনয়ন করে—ঘন ঘন দেওয়া গরজন—'শাওন'-রজনীর রিমি ঝিমি বৃষ্টি-বিন্দু-পতনের শব্দ,—ঝিঁ রির ঝাঁজ, ডাহকীর চীৎকার—এসকলই শব্দ-মন্ত্র, ঘুমের প্রগাঢ়তা বাড়াইবার ঐন্দ্রজালিক উপায়; দৃশ্যপটের অবতারণা না করিয়া কবি স্বপ্নাবিষ্টের সুষুপ্তির সহায়ক শব্দ-জগতে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। এই কবিরা অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও কবি-প্রসিদ্ধি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এজন্য বর্ষাকালে কোকিলের ডাক শুনাইয়াছেন ও অনন্তদাস অভিসারিকার যাত্রায় ডম্ফ ও রবাবের ধ্বনির পরিকল্পনা করিয়াছেন।

চৈতন্যের সহচর এবং অনুবর্ত্তিগণ যে বিরাট্ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন—তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। **কৃষ্ণদাস** বর্দ্ধমান ঝামটপুরে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে বিরক্ত হইয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চিরকুমার বিদ্যানুরাগী কৃষ্ণদাস পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুরোধে ৮৭ বৎসর বয়সে চৈতন্য-চরিতামৃত মহাগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া ৯৩ বৎসর বয়সে ৭ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সমাধা করেন। পাণ্ডিত্যে, ভক্তিতে ইহার সমকক্ষ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় নাই, এবং ইহার শেষ ভাগের আখ্যায়িকাগুলি যাহা ইনি রূপ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি সাধুগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন, তাহা নির্ভুল। গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপি অপহৃত হওয়ায় তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করেন। তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তথাপি যেন ঝাপ্টা বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল। কৃষ্ণদাস অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিখিয়াছেন, তাঁহার দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুদের কথা কহিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর গোঁড়ামি-জনিত নিষেধ-বিধি মানিয়া পিতা-মাতার নাম পর্য্যন্ত লিখেন নাই। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্যামদাস।

চৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্ব্বে **মুরারি গুপ্ত** সংস্কৃতে "চৈতন্যচরিতম্" কাব্য রচনা করেন, ইহাতে অনেক অলৌকিক কথা লিপিবদ্ধ আছে—ভাষা সহজ ও কবিত্বপূর্ণ। **কবিকর্ণপূর**ও (শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ) এই সময়ে তাঁহার চৈতন্যের জীবনী সংস্কৃতে রচনা করেন—কিন্তু তাঁহার চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকই (সংস্কৃত) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। চৈতন্যের তিরোধানে মহারাজ প্রতাপরুদ্র কিরূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার একটি করুণ-রসাত্মক চিত্র মুখবন্ধ করিয়া কবি নাটকখানি আরম্ভ করিয়াছিলেন। করচা-লেখক **গোবিন্দদাস** দুই বৎসরের চৈতন্য-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পয়ার ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। চৈতন্যের

জীবন-সম্বন্ধে এরূপ ঐতিহাসিক ও চিত্তাকর্ষক পুস্তক আর নাই। চৈতন্যভাগবত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র **বৃন্দাবন দাসের** রচিত। ইহা একখানি সর্ব্বজন-সমাদৃত গ্রন্থ। চৈতন্যের জীবন-সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা ইহাতে থাকিলেও পারিপার্শ্বিক ও তাৎকালিক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা হেতু ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী **জয়ানন্দের** চৈতন্যমঙ্গলেও অলৌকিক কথা এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব উভয়ের সংমিশ্রণ আছে। কোগ্রাম-নিবাসী নরহরি-শিষ্য **লোচন দাসের** চৈতন্যমঙ্গল কবিত্বের নির্ঝর-স্বরূপ, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অল্প।

রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। রূপ প্রথমতঃ একই পুস্তকে এই দুই নাটকের বিষয় লিখিতে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-প্রভুর উপদেশে মথুরার ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা ও বৃন্দাবনের মাধুর্য্যপূর্ণ কথা স্বতন্ত্র করিয়া কবি দুইটি নাটক লিখিয়াছেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে এই দুই নাটকের স্থান খুব উচ্চে। রূপের 'উজ্জ্বল-নীলমণি' বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রের চূড়ান্ত গ্রন্থ। **সনাতনের** 'হরিভক্তিবিলাস' চৈতন্যের উপদেশ-ভিত্তির উপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজের পরিচালক একমাত্র স্মৃতিগ্রন্থ। রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র **জীব গোস্বামীর** 'ষট্‌সন্দর্ভ' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ। এই সকল এবং ইহা ছাড়া সংস্কৃত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ—যাহা বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ **নরহরিকৃত** 'ভক্তিরত্নাকর' এবং আমার Medieval Vaishnava Literature of Bengal নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

এই সকল পুস্তক ছাড়া সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত নরহরি চক্রবর্ত্তিকৃত 'ভক্তি-রত্নাকর' ও **নিত্যানন্দ দাসের** 'প্রেমবিলাস' দুইখানি অমূল্য ঐতিহাসিক পুস্তক। উহাতে তাৎকালিক বৈষ্ণব-সমাজের যথাযথ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তি-রত্নাকরের সঙ্গীত-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি উক্ত শাস্ত্রের একটি মূল্যবান্ সম্পদ্। চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গলায় ইহার মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক আর নাই। **হরিচরণ দাসের** 'অদ্বৈত-চরিত', **ঈশান নাগরের** 'অদ্বৈতপ্রকাশ', **নরহরির** 'নরোত্তম-বিলাস', **লোক-নাথের** 'সীতা-চরিত্র' প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ের মধ্যে লিখিত হয়। বৈষ্ণব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ অনেকগুলি আছে—তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত **বৈষ্ণবদাস** (গোকুলানন্দ সেন, মুর্সিদাবাদ টেঁয়া-নিবাসী)-কৃত 'পদকল্পতরু' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তৎপূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পৌত্র **রাধামোহন ঠাকুর** পদামৃত-সমুদ্র নামক গ্রন্থে অনেক বাঙ্গলা পদ সংগ্রহ করিয়া তাহার টীকা সংস্কৃতে করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগ-অবসানে "ভাষায়" লিখিত পুস্তকের এতাদৃশ সমাদর আর কেহ দেন নাই। নরহরি চক্রবর্ত্তী স্বয়ং সংস্কৃতে কৃতবিদ্য পণ্ডিত হইয়াও তাঁহার ভক্তি-রত্নাকরে সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে বাঙ্গলা গ্রন্থের শ্লোকও প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণবের

মাথুর গান, একদিকে নিমাই-সন্ন্যাসের দ্বারা কারুণ্যে ভরপুর হইয়াছে, অপরদিকে বঙ্গের তাৎকালিক ইতিহাস সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের উপাদান জোগাইয়াছে।

মুসলমানগণ আসিয়া দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাজসাহী জেলায় স্কন্দগুপ্তের মহিষী যে দেবমন্দিরগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাম্রশাসনের কবি লিখিয়াছেন, তাহারা কারুকার্য্যে জগতে অদ্বিতীয় ছিল, এইরূপ শত শত মন্দির শুধু স্থাপত্য-শিল্প হিসাবে নহে অন্য হিসাবেও বড় ছিল। ইহাদের আঙ্গিনায় যে কীর্ত্তন-গান হইত, প্রত্যহ যে রাজ-ভোগ হইত, রাজা ও প্রজা একত্র হইয়া ভক্তির যে লীলা প্রকটিত করিতেন, যে সকল পর্ব্বত-প্রমাণ কুসুমস্তবকের স্তূপ প্রত্যহ দেব-সেবার জন্য আহৃত হইত এবং বিগ্রহের অঙ্গরাগের জন্য যে বিপুল সম্ভার সমানীত হইত, শত শত ভক্তিপ্রেম ও ত্যাগের স্মৃতিজড়িত, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যে সকল মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য সমাহিত হইত, সেই সকল মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিগ্রহ-প্রস্তর রেণুতে পরিণত হইয়া ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গেল—হিন্দুর প্রাণাধিক প্রিয় এই মন্দিরগুলির চিতা-শয্যায় দাঁড়াইয়া কবি যখন গাহিলেন, "কুসুম ত্যজিয়া অলি, মহীতলে লুঠত,—কোকিলা না করতহি গান,—সোহি যমুনা-জল, অনল সমান ভেল—বাঁশীস্বরে না বহে উজান, সখাগণ, ধেনুগণ,—বেণুরব বিসরণ"—তখন ঐতিহাসিক দৃশ্য অধ্যাত্ম সম্পদের অঙ্গীয় হইল এবং "মাথুর"-শ্রোতার করুণ স্বরে আঁটা হৃদয়তন্ত্রীতে বারবার ঘা দিতে লাগিল। বৈষ্ণবদের এই "মাথুরে"র পালা—মর্ম্মান্তিক পরিদেবনার সুর।

মাথুর গান।

এই মাথুরের মত করুণ গান এদেশে আর কিছু হয় নাই—ইহা জাতীয় গৌরব। কবির তীব্র ব্যাথার সুরে একদিকে কৃষ্ণ-ভক্তির বন্যা, অপরদিকে রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের বিলোপ-জনিত—মর্ম্মান্তিক বিলাপ।

কত বীর, কত বিক্রান্ত রাজাধিরাজের শ্মশান এই বঙ্গভূমি; এখানে লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম যখন "খাসা মখমলী" পাদুকা পায়, শিরে রণটোপ সুচেল গায়। ঘন গোঁফে চাড়া, ঘুরায় আঁখি" এই মূর্ত্তিতে সৈন্যগণের পুরোভাগে রণক্ষেত্রে অভিযান করিতেন,—তখন শ্যামরূপা দেবীর অভয়-দানে চির-নিশ্চিন্ত ইছাই ঘোষেরও বক্ষ কম্পিত হইত, এখানে "সেনার প্রধান চলে সীতারাম ভূঞা, যার ভরে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে মুঞা," প্রভৃতি দৃশ্য সচরাচর দেখা যাইত এবং যখন রায়বেঁশেগণ তাণ্ডব করিতে করিতে সৈন্যগণের অগ্রভাগে যাইতে থাকিত, তখন বঙ্গের পৌণ্ড্র বাসুদেবের বিক্রত অভিযান ও সমুদ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল প্রভৃতি সম্রাট্গণের দিগ্বিজয়-যাত্রার কথা মনে হইত। এখানে প্রতাপাদিত্যের নিকট যখন মানসিংহের দূত আসিয়া বেড়ী (শৃঙ্খল) ও তরবারি রাখিয়া জানাইল, "এক হয় বেড়ী (অধীনত্বসূচক) রাখুন, তরবারি ফিরাইয়া দিন, নতুবা যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা থাকে—তবে শুধু তরবারিটি রাখুন।" প্রতাপাদিত্য বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, এই বেড়ী লইয়া যাও, "বেড়ী দিও আপনার মনিবের পায়ে।" আর "আমি শুধু মানসিংহকে জয় করিয়া ক্ষান্ত হইব না, আগ্রায় দিল্লীশ্বরকে পরাস্ত ও নিধন

করিয়া শত্রুরক্ত-রঞ্জিত অসি যমুনার জলে ধৌত করিব।" "যমুনার জলে ধোব এই তরবারে।" কোথায় গেল সেই সীতারাম রায়, যিনি মগ ও মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন? কোথায় গেল "মেনাহাতী," ছলনাপূর্ব্বক যাহার মস্তক কর্ত্তন করিয়া শত্রুরা নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব বিস্ময়-সহকারে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মানুষের এতবড় মাথা আমি দেখি নাই, এই বীরকে ধরিয়া আনিতে পারিলে না? কি দুর্ভাগ্য যে এমন লোকটাকে ছলপূর্ব্বক বধ করিয়া মাথাটী লইয়া আসিয়াছ।" (৮৪৯ পৃঃ) ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশে এই যে বীরত্ব ও জয়পরাজয়ের লীলাখেলা হইয়াছে, তাহা সেই যুগের বাঙ্গলাসাহিত্যে স্বীয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। শুধু 'মাথুরে' নহে, বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও সেই জাতীয় দুঃখের সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছিল।

কত বীর, কত রাজা যে এই দেশে যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তাহার অবধি নাই। কত স্বর্ণচূড়, উজ্জ্বলদীপ-শোভিত রাজ-প্রাসাদ, কত নগর-শোভা বিপণী ও প্রমোদ-উদ্যান নৈশ স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। এদেশের যে ধূলিকণায় পা দেওয়া যায়, তাহাই ভক্তির অশ্রু-মাখা বিগত গৌরবের শেষ রেণু। কৃত্তিবাস যখন লিখিলেন, "লঙ্কায় আসিয়া দেখে ছিন্নভিন্ন সব। নাহিক সে নৃত্যগীত নাহিক উৎসব"—তখন শ্রোতার মনে কত শত ক্ষুদ্র বিলুপ্ত লঙ্কার স্মৃতি উদিত হওয়ায় তাঁহার অশ্রুমাখা দীর্ঘশ্বাস কবির লেখা সার্থক ও বাস্তবিক করুণাপূর্ণ করিত। কাশীদাস যখন লিখিলেন, "অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়। হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লুটায়" তখন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্য্যোধনের স্মৃতিমথিত করুণ কথা পাঠকের মনে হইত। বঙ্গীয় কবিগণ সংস্কৃতেরই অনুবাদ করুন, কি কোন নূতন বিষয়েরই অবতারণা করুন, তাঁহারা তাহাদের কাহিনী ঘরে আনিয়া বাঙ্গলার ছাঁচে পুনরায় ঢালাই করিয়া লইয়াছেন, এইজন্য বঙ্গের প্রাচীন কাব্যগুলি বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী। মুকুন্দরাম-সম্বন্ধে Cowell সাহেব যাহা বলিয়াছেন, বঙ্গীয় সমস্ত কবি সম্বন্ধেই অল্প বেশী পরিমাণে তাহা খাটে—"কবি স্বর্গের কথাই বলুন বা মর্ত্ত্যের কথাই বলুন, তিনি সর্ব্বত্রই নিজ গ্রাম ও সমাজের দৃশ্য আঁকিয়াছেন।" এই ঘরে আনিয়া নিজের প্রাণের রসের ভিয়ান দিয়া কথাগুলি সরস ও জীবন্ত করার রীতিটা বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদের বৈশিষ্ট্য। এইজন্য মুকুন্দরাম পশু-জগৎ ও উদ্ভিদ্-জগৎ বর্ণনা করিবার সময়েও চমৎকার কৌশলের সঙ্গে বাঙ্গালীগৃহের সুখ-দুঃখের চিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন—"বনে থাকি বনে খাই, জাতিতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক।" হস্তী বলিতেছে, "বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥" এই সকল কথার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট।

কত বিয়োগান্ত নাটকের সার নিংড়াইয়া যে 'মাথুর' গান রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কুমারস্বামী লিখিয়াছেন,—"যে বাণী শতসহস্র লোকের মর্ম্মের সংবাদ দেয়, তাহাই প্রকৃত কাব্য" - এই সকল গানে বাঙ্গালীর হৃদয় সর্ব্বত্র সাড়া দিয়াছে, এজন্য মাথুরের করুণা, রামায়ণ-মহাভারতের বঙ্গীয় অনুবাদের সুর, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের যুদ্ধ-দৃশ্যগুলি দেশময় ভাবের

বন্যা আনয়ন করিয়াছিল। "গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর, দিও মোর যেখানে জননী। নিশান অঙ্গুরী লয়ে, ময়ূরার হাতে দিয়ে, ক'য়ো তুমি হ'লে অনাথিনী, গুকার সুবর্ণ ছড়া, বাপেরও ঢাল খাড়া, সব দিয়া সমাচার ব'লো। রণে অকাতর হ'য়ে, শত্রুশির সংহারিয়ে, সম্মুখসমরে শাকা মলো" (ধর্ম্মমঙ্গল) মৃত্যুকালে মহাবীর শাঁকার এই উক্তির সঙ্গে মাথুরের "ললিতা লহ কঙ্কণ, বিশাখা লহ অঙ্গুরী, চিত্রা লহ নীলমণি চুড়ি" ইত্যাদি পদ মিলাইয়া পড়ুন; বাঙ্গালীর রণক্ষেত্র ও কামকুঞ্জ একযুগে একই বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল—এই জন্য বঙ্গ-সাহিত্যময় সর্ব্বত্র একই সুরের সাড়া পাইতেছি। জয়দেবের কবিতা ঘরে ঘরে আনন্দময়ের যে আনন্দ-লীলার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল, সেই বার্ত্তার উপসংহার পরবর্ত্তী মাথুর গীতে। বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রমোদ-উদ্যানে অভিসারিকাগণ মুখর নূপুর ত্যাগ করিয়া নীলাম্বরী ও মেঘডম্বুর শাড়ী আঁধার রাত্রির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া "বাঁধি তাম্বুল আঁচলে"—যে লীলা করিয়াছিলেন, জয়দেবের চক্ষে ছিল সেই দৃশ্য, কিন্তু পরবর্ত্তী কবিগণের শ্রেষ্ঠ নায়িকার নিরাভরণা যোগিনীর বেশ—তিনি উপবাস-ক্লিষ্টা, গেরুয়া-পরিহিতা—"বিরতি আহারে—রাঙ্গা বাস পরে—যেমন যোগিনী পারা।" কৃষ্ণবিরহে তিনি সর্ব্বস্বত্যাগিনী—"শঙ্খ করহ চুর, ভূষণ করহ দূর, তোড়হি গজমোতি হাররে"—"সীথাক সিন্দুর—মুছিয়া করহ দূর।" এই সর্ব্বত্যাগিনীর নিরাভরণ রূপ তখন বঙ্গের আকাশে বাতাসে খেলিতেছিল। তখন উৎকৃষ্ট কষ্টিপ্রস্তর-নির্ম্মিত চন্দন-চর্চ্চিত নীলকলেবর অতুলনীয় শ্যামরূপ, বিধর্ম্মীদের হাতের নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ;—তখন ভক্ত সাশ্রুচক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া নব-মেঘে, স্বীয় বিপুল কুন্তলরাশিতে এবং ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠে সেই কালো রূপ আবিষ্কার পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইলেন—তখন "আকুল নয়নে চাহে মেঘ পানে কি কহে দুহাত তুলে, এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথুনী দেখয়ে খসায় চুলে।" এবং "এক দিঠি করি, ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরক্ষণে।"

শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহধ্বংসের পর বৈষ্ণব কবি—মাথুরলীলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলার সম্পূর্ণ পার্থক্য ধারণা করিতে পারিলেন। ভারতের অন্য কোন জাতি জড় ও অধ্যাত্মরাজ্যের পার্থক্য এতটা বুঝিতে পারে নাই। হীরামণির ভাণ্ডার ও মথুরার অতুল ঐশ্বর্য্যকে দূরে ফেলিয়া কাঙ্গাল ভক্ত ব্রজের একটু ধূলিকণার প্রার্থী হইলেন; মথুরার সমস্ত শক্তি অপেক্ষা যে প্রেমের শক্তি সহস্রগুণে বড়—মাথুরে তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এইভাবে বাঙ্গালী জড়-সম্পদের বিয়োগে অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রজা হইলেন ও ভক্তির সূক্ষ্ম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায়

বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে বাঙ্গলার শব্দ-সম্পদ্ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই সম্পদ্ বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু মুসলমান কবি আলোয়াল সংস্কৃতে যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, পরবর্ত্তী কবি ভারতচন্দ্র ভিন্ন এতটা পাণ্ডিত্য আর কেহ দেখান

নাই। ইনি ফতেয়াবাদ (আধুনিক ফরিদপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থান লইয়া ফতেয়াবাদ পরগনা গঠিত হইয়াছিল) মুলুকের অধিবাসী। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইহার জন্ম হয়। ইনি আরাকানে যাইবার পথে জাহাজে জলদস্যুগণ দ্বারা আক্রান্ত হন - কোনও ক্রমে ইহার জীবন রক্ষা হয়—কিন্তু ইহার পিতা সমসের কুতুব যুদ্ধ করিতে করিতে দস্যুদের দ্বারা নিহত হন। আরাকানে ইনি মাগন ঠাকুর নামক এক রাজপুরুষের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পদ্মাবৎ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। সুজা বাদসাহের সঙ্গে এই সময়ে আরাকান-রাজের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং আলোয়াল সুজার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন,—মৃজা নামক এক ব্যক্তির মিথ্যা সাক্ষ্যে এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়াতে কবি সাতবৎসর কারাভোগ করেন। এই ঘটনা ১৬৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। কারাগার হইতে বাহির হইয়া বৃদ্ধ বয়সে ইনি ছয়ফুল বদিউজ্জমাল প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু পদ্মাবৎই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে শুধু তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রদর্শিত হয় নাই, প্রত্যেকটি হিন্দু পূজা-পার্ব্বণ, আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া পদ্মাবৎ কাব্যের কোন কোন অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহার অনেক কবিতায় গীত-গোবিন্দের ছন্দ ও শব্দ-ঝঙ্কার বাঙ্গলা ভাষায় অনুকৃত হইয়াছে। এই কাব্যের বিষয় চিতোরের ইতিহাস-বিশ্রুত রাজ্ঞীর উপাখ্যানটি। ১৫১৯ খৃঃ অব্দে মীর মালিক মহম্মদ যোশী পদ্মাবৎ হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন—আলোয়ালের কাব্য তাহারই পদ্যানুবাদ। কিন্তু বাঙ্গলার কবি এই পুস্তকে এত মৌলিক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন যে আসলটি ভাল হইয়াছে কিংবা নকলটি ভাল হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়া অসম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে মুসলমান কবিগণের সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বক্তব্য আছে। মুসলমান নৃপতিগণের অনুগ্রহে রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষার অনুকূলে সর্ব্বপ্রথম সুবাতাস বহিয়াছিল। বাঙ্গলায় অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানী বাঙ্গলা পুস্তকের সীমা-সংখ্যা নাই; তাহারা এত বেশী যে তৎসম্বন্ধে একখানি বড় ইতিহাস লেখা চলে। এই সকল পুস্তকের কতকগুলিতে উর্দ্দুর প্রভাব এত অধিক যে তাহা বাঙ্গলা-সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলে না, অপরগুলি খাঁটি বাঙ্গলা। নগর ও সহরের সংস্রব-বর্জ্জিত বহু দূর পল্লীতে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করার পরেও রূপকথা, গীতিকথা ও পল্লীগাথার প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এক সুবিস্তৃত সাহিত্য বাঙ্গলার পল্লীতে পড়িয়া আছে—তাহাতে দৃষ্ট হইবে বাঙ্গলা দেশের রূপকথাগুলির অধিকাংশ মুসলমানেরাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নব-ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে হিন্দুসমাজে তাহা অধিকাংশস্থলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল গীতিকথা ও রূপকথা প্রভৃতিতে এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। "মল্লিকার পুথি" নামক একখানি কাব্যে মুসলমানগণ কিরূপে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেন, অতি সুন্দর বাঙ্গলায় তাহা বর্ণিত আছে, উহার আখ্যান-বস্তুর মধ্যে অনেক কথাই ঐতিহাসিকেরা অগ্রাহ্য করিবেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু তথাপি হিন্দু-

-মুসলমান-সংঘর্ষের যে কৌতুকাবহ চিত্র এই কাব্যে প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে এই দুই সমাজের কতকটা খাঁটি কথা আমরা জানিতে পারি। এইরূপ অনেক কাব্য আমরা দেখিয়াছি। আমার Folk Literature of Bengal নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে কতকটা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সহজিয়াদের পুঁথির সংখ্যা নাই—তাহা এক সমুদ্র-বিশেষ। এই সহজিয়া পুঁথিগুলির কতক কতক সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত এবং অনেকগুলির মধ্যেই উক্ত সম্প্রদায়ের সাঙ্কেতিক শব্দ আছে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্থলে আমার বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৪-৫০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত লালশশীর গানের উল্লেখ করিতে পারি, এই সকল গানের ভাষা অতি সহজ বাঙ্গলা, কিন্তু ইহাদের ভাব এত জটিল যে আমরা মাথা খুঁড়িয়া অনেকগুলির কোন অর্থ করিতে পারি নাই। সহজিয়া-সাহিত্য বাঙ্গলার জনসাধারণের নিজস্ব। এই সাহিত্যে হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের মত ও তাহাদের আনুষ্ঠানিক সাধনা—সহজ ভাষায় কিন্তু অতি জটিল ভাবের সঙ্কেতের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। এই সুপ্রসার সাহিত্যের বিস্তৃতি ও সংখ্যা-বাহুল্যদৃষ্টে মনে হয়—বৌদ্ধগণ প্রস্থানের পথে এই প্রাচীন ধর্ম্ম ও সংস্কারের অবশেষ এতদ্দেশে রাখিয়া গিয়াছিলেন; আউল, বাউল, ফকির প্রভৃতি বিভিন্ন নামধারী সম্প্রদায়-গুলির অনেকেই বৈষ্ণব-মোড়কে আঁটিয়া সেই বৌদ্ধ-যুগের কথাগুলি এখনও এদেশে চালাইতেছেন। এই অক্ষয় বটের বংশ ধ্বংস হইবার নহে, যুগ-যুগ ধরিয়া ইহা এদেশের ভূমিতে শিকড় গাড়িয়াছে, বৈষ্ণবেরা ইহা তুলিয়া ফেলিয়া নিজেদের ভগবদ্-ভক্তির উন্মাদনার ফুল গাছ রোপণ করিতে পারেন নাই, বরং ইহাদের সাধনপ্রণালী গুরুবাদ, পরকীয়া, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় এই অরণ্যের আশে পাশে আজ ১১।১২ বৎসর যাবৎ ঘুরিয়াও থেই পাইতেছেন না। চারুদর্শন নামক পুস্তকে লেখক স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর মহাশয় খানিকটা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতি অতি বিরূপ, সুতরাং তাঁহার আলেখ্য কতকটা বিবর্ণ হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ৭৬৯-৮২ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি।

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় মুসলমান সমাজের নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে গৃহীত, সুতরাং ইহাদের কতক শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধসাধনার প্রভাব খুব বেশী। বৌদ্ধভাবাপন্নসুফী সম্প্রদায়ের মত ধীরে ধীরে বাঙ্গলার পল্লীভবনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুসলমান ফকিরেরা পল্লীবাসীদিগের মধ্যে সুফীদিগের মত চালাইতেছেন। হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া সেই ফকিরদের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে—সুতরাং আমরা যে ক্ষুদ্র একদল শিক্ষাভিমানী হইয়া বাঙ্গলা ভাষাটার উপর কর্ত্তৃত্ব ও মুরব্বীয়ানার চাল চালাইতেছি, তাহা শুধু ভাষার উপরকার স্তরটি স্পর্শ করিয়াছে। বিদেশী প্রভাবের দরুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্য, ঠিক দেশজ উপকরণে নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু অবজ্ঞাত কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে যে শিক্ষা এখনও প্রচারিত হইতেছে—পাগলা কানাই প্রভৃতি খাঁটি জন-নেতারা যাহা দেশময় চালাইয়াছেন—আমাদের অগোচরে যে সাহিত্য বাঙ্গলার

কুটিরে গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার বিবরণ আমরা কিছুই রাখি না। কিন্তু এই মুসলমান ফকিরদের মুরসেদী এবং দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গান যাহা বঙ্গের পল্লীগুলির হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে,—তাহা তুর্কিস্থান, আরব, আফ্‌গানীস্থান ও পারস্ত হইতে আসে নাই। তাহা খাঁটি দেশজ সামগ্রী ও বৌদ্ধ-বাঙ্গলার নিজস্ব। উহা বৌদ্ধ-জগতের কথা,—দেহতত্ত্বের কথা। পরকীয়া প্রভৃতি মত খাঁটি মুসলমান ধর্ম্মের শিক্ষা নহে। বৌদ্ধগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-সংস্কার ছাড়িতে পারেন নাই, শত শত বাউল ও ফকিরের দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহাদের সংখ্যা নাই। বাঙ্গলার দু'চার জন বাদসাহ ও আমীরের নাম করিলেই হইবে না, সৈয়দ মর্ত্তুজা, আলোয়াল প্রভৃতি কয়েকজন কবির নামই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, এমন কি কয়েকজন সুবিখ্যাত পল্লীগাথা-রচকদিগের কাহিনী শুনাইলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। শত শত বাউল-ফকিরের গান, শত শত কেচ্ছা, যাহা মুসলমান ও হিন্দুর ঘরে ঘরে এখনও দূর পল্লীতে কথিত হইয়া থাকে, সহজিয়া-সাহিত্যের এক বিপুল অংশ ও মুসলমান যন্ত্রালয়ের দ্বারা প্রকাশিত বহু বাঙ্গলা পুঁথি, জারি-গান, তরজা-গান প্রভৃতির সন্ধান লইতে হইবে; এমন কি বাউলদের নৃত্য কি পরিমাণে পাঠান-নৃত্যের নিকট ঋণী তাহারও খোঁজ লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস এই অনুসন্ধান সুনির্ব্বাহিত হইলে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইবে যে বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য্যগঠনে মুসলমানের হাত তিলমাত্রও কম নহে, বরঞ্চ দূর পূর্ব্বাঞ্চলের পল্লীতে সে প্রভাব আরও বেশী। মাত্র কয়েকজন মুসলমান 'উর্দ্দু' 'উর্দ্দু' বলিয়া বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষার দাবী ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিবেন না। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যাহা শিখিয়াছেন, যাহা যুগ-যুগ ধরিয়া তাঁহাদের সমাজে বদ্ধমূল, তাহার প্রভাব তাঁহারা এড়াইবেন কিরূপে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের কর্ত্তা ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া-সমাজ সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও রুচি পরিচালনা করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে প্রথিতযশা রাজবল্লভ সর্ব্ববিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। রাজবল্লভ ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা (Deputy governor) ছিলেন, এবং মুর্সিদাবাদেও ঘেসেটি বেগমের অনুগ্রহে আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে তাঁহার প্রভাব খুব বেশী ছিল। ন্যায়পূর্ব্বক হউক কিংবা অন্যায় করিয়া হউক, রাজবল্লভ স্বীয় প্রতিষ্ঠিত রাজধানী রাজনগরে কুবেরের ঐশ্বর্য্য

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে কতকটা ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, প্রথমতঃ নবাব দরবারে রাজবল্লভের প্রতিপত্তির দরুন তাঁহাকে রাজাদের খাতির করিতেই হইত, বিশেষ দেউলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের হাতে 'রাখি' বাঁধিয়া দক্ষিণাস্বরূপ পূর্ব্বকৃত ঋণ কয়েক লক্ষ টাকা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। প্রকাশ্যভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইতেন না। 'ক্ষিতীশবংশাবলী'তে দৃষ্ট হয়, রাজা রাজবল্লভ কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় হইতে পণ্ডিতগণ আনাইয়া বৈদ্যদিগের উপবীত-গ্রহণের বিষয়ে চেষ্টা করিলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভিতরে ভিতরে এই কার্য্য পণ্ড করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কোন বৈদ্যকে তিনি উপবীত গলায় দিয়া তাঁহার রাজসভায় যাইতে দিতেন না। রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীতি-চতুর কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়। মহারাজ রাজবল্লভ তৎস্থাপিত রাজনগরের রাজধানী যে অপূর্ব্ব গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহার কারুকার্য্য দেখিবার জন্য বহু ভূপর্য্যটক রাজনগরে আসিয়া ছবি আঁকিয়া লইয়া যাইতেন। তাহার দেখাদেখি নবদ্বীপরাজ 'শিবনিবাস' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজবল্লভের বৈভব তাঁহার ছিল না, সুতরাং সেই সমকক্ষতার চেষ্টা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল নির্ম্মাণ করিয়া তাজমহলের যশোলোপ করিবার চেষ্টার মত বিফল হইল। কিন্তু এক বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সমকক্ষতা রাজবল্লভ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র বহু পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাঁহার দরবারে পাইয়াছিলেন, রাজবল্লভ যদিও পণ্ডিতগণকে অকুণ্ঠিত হস্তে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তথাপি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন এবং শিবরাম বাচস্পতি প্রভৃতির ন্যায় সার্ব্বভৌম পণ্ডিত তাঁহার সভায় ছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। এদিকে কৃষ্ণনগরের রাজকবি ভারতচন্দ্র ও রাজানুগ্রহ-প্রাপ্ত রামপ্রসাদ বঙ্গদেশের প্রাণ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজনগরের রাজকবি জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ী প্রতিভাপন্ন হইলেও অবশ্য পূর্ব্বোক্ত দুই কবির সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র রায়ের আদিনিবাস ছিল পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রাম।

ভারতচন্দ্র।

বর্দ্ধমানের রাজার অত্যাচারে এই পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হন। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ ভুরসুট পরগনার রাজা ছিলেন। এদিকে তিনি কেশরকুনী বংশের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে তাঁহাকে স্বগৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইয়াছিল। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া তাঁহাকে উন্নতির দুরূহ পথে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলায় তাঁহার তুল্যাধিকার ছিল, একথা তিনি অন্নদামঙ্গলে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্বান্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০৲ টাকা বেতনে তাঁহার রাজসভার কবির পদে নিযুক্ত করেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের বিচার উপলক্ষে "আত্ম-তত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ সুন্দর করিল" ইত্যাদি কবিতায় তিনি তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রমাণ করিয়াছেন। তোটক, মন্দাক্রান্তা, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ছন্দ তিনি বাঙ্গলায় যে ভাবে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর সফলতার

পরিচায়ক। বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণে লঘুগুরু ভেদ নাই, তথাপি তৎপ্রবর্ত্তিত ছন্দগুলি অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুগত হইয়াছে, কোথাও তিলপ্রমাণ ভুল হয় নাই। এই কবিত্ব অসাধারণ, কিন্তু ইহা ছাড়া তাঁহার আরও বাহাদুরী আছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যে নিয়ম করেন নাই, তাহা—অর্থাৎ, পদ্যের চরণে মিল দেওয়ার রীতি—ভারতচন্দ্র বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলিকে মিল দান করিয়াছেন। আর একটি প্রধান প্রশংসার বিষয় এই যে, এই সংস্কৃত ছন্দগুলির প্রবর্ত্তন করিবার মধ্যে কবির কোনরূপ পরিশ্রমের চিহ্ন দেখা যায় না। সুগায়কের কণ্ঠের গানের ন্যায় এই ছন্দোবদ্ধ পদগুলি শ্রুতিমধুর ও একান্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বহু কবি ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বাঙ্গলা কাব্যের শোভাবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের চেষ্টায়ই কবিরা যে গলদঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলার অতি সহজ মিলন হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দগুলি যে ভিন্ন ভাষার, তাহা এই বাঙ্গলা কাব্য পড়িয়া মোটেই মনে হয় না। ইনি ভাষাসম্বন্ধে সংস্কৃত যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, কেহ ইঁহার কাব্যগুলিকে 'ভাষার তাজমহল' সংজ্ঞা দিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ছন্দের অনুরোধে প্রাকৃত শব্দগুলিকে অনেক সময়ে সংস্কৃতাত্মক করিয়াছেন—যথা "ছলচ্ছল কলক্কল টলট্টল তরঙ্গা।" প্রবাহ, নিক্বণ ও নির্ম্মলতা—এই ত্রিগুণবোধক শব্দদ্বারা কবি একটি ছত্রে গঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থানে সংস্কৃতাত্মক করিবার জন্য তিনি বাঙ্গলা 'ছলছল', 'কলকল', 'টলটল' এই তিনটি শব্দকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের রচনা কখনও কখনও এইভাবে বাঙ্গলা পদগুলিতে সংস্কৃতের মোহর অঙ্কিত করিয়া নবশ্রী প্রদান করিয়াছে। বিদ্যার রূপবর্ণনা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে সংস্কৃতের ভূত তাঁহার মাথায় চাপিয়া গিয়াছিল, অলঙ্কারের দৌরাত্ম্যে রচনা উদ্ভট হইয়াছে। অতিশয় ভাল করার চেষ্টা এইভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র কোন গৌরবান্বিত চরিত্র, কোন করুণ মর্ম্মন্তুদ ঘটনা, কোন মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করিতে পারেন নাই—কিন্তু ভাষা-সম্পদে, সাধারণ কোন আখ্যায়িকা-বর্ণনে, পরিহাস-রসিকতায় তিনি প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অনেক কবিতা সহজ কথার এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক যে তাহা বাঙ্গলায় প্রবাদ-বচনের ন্যায় হইয়া আছে।

ভারতচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী রামপ্রসাদ। বিদ্যাসুন্দর-রচনায় রামপ্রসাদ ভারতের গুরু। ভারতের এমন কোন উচ্চভাব নাই, এমন কোন অলঙ্কার নাই, যাহা রামপ্রসাদ পূর্ব্বে লিখেন নাই; কিন্তু ভাষার লালিত্যের দ্বারা ভারতের কাব্য রামপ্রসাদের মৌলিকত্বকে একেবারে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রামপ্রসাদ বৈষ্ণবদের ভাব চুরি করিয়া কঠোর শাক্তধর্ম্মকে যে কোমলশ্রী প্রদান করিয়াছেন, বাঙ্গলার শাক্তধর্ম্মের এখন তাহাই বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী দশভূজা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পাশ, অঙ্কুশ, খেটক, খড়্গ, অসি, চক্র, শূল প্রভৃতি আয়ুধ-ধারিণী হইয়াও বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছেন। যাঁহার পদতলে সিংহ ও অসুর, জটাজুটে নাগিনী—সেই

রামপ্রসাদ।

ভীষণ-দর্শন শক্তিমূর্ত্তি বাঙ্গলার 'মা' হইয়া আছেন। এক সময়ে কবিচন্দ্র বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ডটাকে সংকীর্ত্তনের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত কবিগণ সেইরূপ শেলশূলধারিণী মহাশক্তিকে যশোদার মত জননী করিয়া তুলিয়াছেন। এই শক্তি এখানে উমা। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীদের মাতা শরৎকালের শেফালিকার ন্যায় যে অশ্রুবর্ষণ করিতেন, বাঙ্গলার শারদীয় উৎসবে সেই স্নেহাতুরা জননীর মনের আকুলী ব্যাকুলী শত শত আগমনী গানে ব্যক্ত হইয়াছে। রামপ্রসাদের সুরে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ বিপন্ন সন্তানের 'মা'-ডাক মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—সমস্ত বাঙ্গলা দেশ তাঁহার গানে সাড়া দিয়াছে। রাজনৈতিক বিপ্লব ও দুর্ভিক্ষাদি নানা বিপদে পড়িয়া বাঙ্গলা তখন নয়নজল দিয়া মাতাকে পূজা করিতে চাহিয়াছিল—রামপ্রসাদের গান সেই শত সহস্র বঙ্গসন্তানের নয়নজল—আকুল-কণ্ঠের 'মা'-ডাক।

রামপ্রসাদ হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন, কথিত আছে তিনি কলিকাতা সোনাগাছির দেওয়ান-বাড়ীতে মুহুরীগিরী করিতেন, কিন্তু হিসাবের খাতায় "দে মা আমায় তবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী" প্রভৃতি গান টুকিয়া যাইতেন, দেওয়ান মহাশয় তাঁহার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া তাঁহার মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে চাকুরীর দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন। তৎপরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কতকটা জমি নিষ্কর দান করিয়া তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। ইহাও প্রবাদ যে সিরাজউদ্দৌলা রামপ্রসাদকে স্বীয় নৌকায় ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার মুখে মাতৃসংগীত শুনিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কালীবিসর্জ্জনের সময়ে ভাবের পাগল রামপ্রসাদ দেবীমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেহত্যাগ করেন।

রাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি জয়নারায়ণ সেনের হরিলীলা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বা অন্নদামঙ্গলের সমকক্ষ কাব্য না হইলেও তাহাতে সেই যুগের উপযোগী গুণ অনেক আছে। সামাজিক চিত্রগুলি হরিলীলায় খুব ফুটিয়াছে। কবি স্বয়ং রাজবংশোদ্ভূত ও বিশিষ্ট অবস্থাপন্ন। তিনি যে খুব বৈভবশালী ছিলেন, তাহা "হরিলীলা"র রাজার হারের মূল্যনির্ণয়-বর্ণনায় যথেষ্ট প্রসাধিত হইয়াছে। সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম :—

"রাণীর গলার মণিময়ানন্দ হার। তিন হারে ছয় লহরে মুক্তা বিশ হাজার। বিশ বিশ রতি প্রতি মুক্তার ওজন। তাথে মাণিকের বন্ধ অরুণ কিরণ। পঞ্চবিশ পঞ্চবিশ বন্ধ প্রতি হারে। দেড়শত হৈল বন্ধ লিখিতে সুমারে। মধ্য হারে ধুক্‌ধুকি সেহ মণিময়। নযুতরা বিশ রতি লট্‌করের মুক্তি। অন্ধকারে দীপ প্রায় প্রকাশিল জ্যোতি। মধ্যেতে ঝলিছে অতি শ্বেত হীরা খান। বিশ মাষা আভাপূর্ণ চন্দ্রের সমান। মাষা যার বিশ হাজার আর জবা যার। মালার মেরুতে তিন খুটিহ মুক্তার। সেই তিন বিশ রতি হইল ওজনে। চন্দ্রভান দেখি তাহা আঁকে হর্ষ মনে। আঁকিলেন মূল্য সেই হার মনোহরে। চন্দ্রভান তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজারে।"

আনন্দময়ী জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী, তাঁহার রচিত অনেকগুলি অংশ হরিলীলায় স্থান পাইয়াছে—তাহা সংস্কৃতাত্মক শব্দপূর্ণ এবং মহিলা-কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সংস্করণ), ৫১২-১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু ধর্ম্ম-সংগীত রচিত হয়। এখানে তাহার উল্লেখের অবকাশ নাই। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস ও রাই-উন্মাদিনী (দিব্যোন্মাদ) এই দুইটি অমর কীর্ত্তি। কৃষ্ণকমলের জন্মস্থান নদীয়া জেলার ভাজন ঘাট গ্রামে এবং কর্ম্মস্থল ঢাকায়। তিনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করেন। সমস্ত চৈতন্যচরিতামৃতখানি এবং পদাবলী-সাহিত্যের রস নিঙড়াইয়া কবি তাঁহার এই দুই গ্রন্থ রচনা করেন, বিশেষ রাই-উন্মাদিনী। এই পুস্তকে রাধার নামে চৈতন্যের প্রেমমূর্ত্তি দেখান হইয়াছে। যিনি চৈতন্যের সম্বন্ধে অবিদিত—তাঁহার এই অপূর্ব্ব কাব্যের স্বাদগ্রহণের সুবিধা হইবে না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কৃষ্ণকমল-রচিত বিচিত্র বিলাসের ২০,০০০ পুস্তক বিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার উপর দিয়া বড় বড় বন্যা ও টর্ণেডোর প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাই-উন্মাদিনী যে অশ্রুর বন্যার সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহার তুলনা নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ব্ববঙ্গ এই অপূর্ব্ব উন্মাদনার বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল! চৈতন্য যে কত সত্য, তাঁহার প্রেমের কথা যে কত মর্ম্মান্তিক এবং তিনি যে বাঙ্গালী হৃদয়ের কত আপনার জন, তাহা এই দিব্যোন্মাদ যাত্রা শুনিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রোতা বুঝিয়াছিল এবং এই লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত গীতিনাট্যের প্রত্যেকটি গান জপমালা করিয়া রাখিয়াছিল।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কবিওয়ালাদের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবসু বঙ্গের বহুজন-সমাদৃত কবি। প্রাচীন কালে যে কৃষ্ণ-ধামালী নামক কবিতা বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত—সেই ধামালীর সমস্ত আবর্জ্জনা ঘুচিয়া গিয়াছিল এবং উহা চৈতন্য-প্রেমের পূত-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক শুদ্ধস্নাত অবস্থায় নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রায় ৪০০ বৎসর যাবৎ নির্ম্মল ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে কবি-ওয়ালাদের গানগুলি শুধু শ্রুতিমধুর নহে, সহজ সুন্দর শব্দ-সম্পদ্-সম্পন্ন এবং নির্ম্মলভাব-দ্যোতক হইয়াছিল। শিবসংগীত ও কৃষ্ণ-ধামালীর দুই ধারা কবির গানে নবজীবন ধারণ করিয়াছিল। ঐ দুই শ্রেণীর গানও খুব নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গীত হইত। কবিওয়ালারাও প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোক—ইহাদের মধ্যে মুচি, ডোম প্রভৃতি জাতীয় কবিও ছিল। রামবসুর এই গানটি অতি-পরিচিত, "মনে রহিল সই মনের বেদনা, তারে বলি বলি বলি বলা হ'ল না, সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না। যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, তবে নির্লজ্জা রমণী ব'লে হাসিত লোকে। সখি বল্‌ব সে বিধাতাকে, নারীজনম যেন আর হয় না। যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে। তার মুখ দেখি মুখ ঢাকি কাঁদিলাম সজনি। অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমনি।" শেষের কয়েকটি ছত্রের করুণ সুর দরদীর প্রাণে দাগা দিয়া যায়। বিদায়কালেও তার হাসি। কি নিষ্ঠুর, সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, যাইবার সময়ও তাহার চোখে মুখে একটু দুঃখের ছায়া পড়িল না, বরং হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। শেষ ছত্রের

কবিওয়ালা।

"অনায়াসে" শব্দটি বড় করুণ। সে "অনায়াসে" চলিয়া গেল, একটুও কষ্ট হইল না। সলজ্জা বধূ তাঁর হাসিমুখ দেখিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না—আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়া সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন পাছে নিষ্ঠুর সে, তাঁহার সেই অশ্রু দেখে।

এই গানটি "বঙ্গের সেই বুকভরা মধু" পল্লীবধূর সলজ্জ মধুর মূর্ত্তির একখানি দুষ্প্রাপ্য ছবি, এই ছবি কি আর দেখিতে পাইব? সেই যে "বলি বলি বলি বলা হ'ল না। সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না"—ফুটিবার মুখে কুঁড়িটির মত নূতন অনুরাগে ভরা হৃদয়টি—এখনও যাহার সুগন্ধ বাতাস বিলাইতে পারে নাই, কোমল দলগুলি তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, এখনও ছাড়িয়া দেয় নাই। সেই স্বর্গীয় রূপ কি আর দেখিতে পাইব? নারী-স্বাধীনতার এই যুগে কি পল্লীবাসিনীর লাজময়ী মূর্ত্তির গৌরব আর থাকিবে?

বাঙ্গলার কবিগণের শ্রেষ্ঠ দান—আগমনী গান। তখন কৌলীন্যের মর্য্যাদা অত্যধিক হইয়াছিল। পুত্রকন্যার বিবাহে লোকে শুধু কুল খুঁজিত। এখন যেরূপ বি. এ., এম. এ. পাসকরা ছেলের চাহিদা খুব বেশী, সেকালে কুলীনের ছেলেমেয়ের মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক ছিল; কুলীনের ঘরে জন্ম হইলে কাণা, খোঁড়া—কন্দর্পের দরে বিকাইত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত নিজে খুব সুশ্রী ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত কুৎসিত ও অঙ্গহীন-দোষযুক্ত একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কুলকার্য্য করিয়া এইরূপ এক শয্যাসঙ্গিনীকে পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছিলেন। আমার কোন আত্মীয় অতিশয় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তোত্‌লা এবং কুরূপা মহিলার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, কুলের গৌরব তখনকার দিনে সর্ব্বগৌরবের উপর ছিল। এই সকল বিবাহের ফলে অনেক সময়ে বিসদৃশ ঘটনা ঘটিত। অনেকেই জানেন ঈশ্বর গুপ্ত এই পরিণয়ের ফলে স্ত্রীজাতি-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। আমার সেই আত্মীয়ের পুত্র তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, বিবাহের অল্প পরেই তিনি পাগল হইয়া গেলেন। কুলীনেরা অর্থের গৌরব চাহিতেন না, তাঁহারা সাধারণতঃ চিরদরিদ্র থাকিতেন, কেবল কুলের বড়াই করিয়া অনেক সময়ে বিদ্যাচর্চ্চায়ও বিরত হইতেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেকের শতাধিক বিবাহ তো নিত্যকার কথা ছিল। এদিকে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজাইবার চেষ্টায় ধনী ব্যক্তিরা মূর্খ, একান্ত দরিদ্র ও নেশাখোর বৃদ্ধের হস্তে তাঁহাদের অপোগণ্ড বালিকাদিগকে সমর্পণ করিয়া সামাজিক প্রশংসা অর্জ্জন করিতেন। সমাজের যখন এই অবস্থা—তখন এই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের যাহা কিছু অশুভ ও কষ্ট তাহা ভোগ করিতে হইত—সেই বালিকা কন্যাকে ও তাহার মাতাকে। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে বাঙ্গলার লোকে হিন্দুধর্ম্মকে ব্যাবহারিক জীবন হইতে পৃথক্ করিয়া দেখেন নাই—পোষাকী ধর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালী কখনই তৃপ্ত হন নাই। ঘরের কথার মধ্যে তাঁহারা স্বর্গের কথা আবিষ্কার করিতেন, মন্দিরের ঠাকুর যতদিন তাঁহাদের অন্তরের ঠাকুর না হইতে পারিতেন, ততদিন তাঁহারা ঠাকুরের উপাসনা করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না।

ঈশ্বর গুপ্ত।

বাঙ্গলার আগমনী গানে বাঙ্গলার জননী ও কন্যার হৃদয়ের নিভৃত বাৎসল্যের প্রবাহ

বহিয়া তাহা চিরপবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর কাছে গৌরীর দুঃখের কথা শুনিয়া মেনকা রাণীর বুকে প্রতি নিয়ত শেল বিঁধিত। তিনি রাজ্ঞী, তাঁহার অন্ন বাড়ীর পোষা জীবজন্তু পর্য্যন্ত প্রচুররূপে ভোগ করে, অথচ কন্যার পেটে ভাত নাই, কন্যার ছেলেরা ক্ষুধার তাড়নায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়—এ কষ্ট মায়ের অসহনীয়। তিনি গিরিরাজকে বলিতেছেন, "তুমি যে কয়েচ গিরিরাজ, আমায় কতদিন কত কথা, সেকথা আমার মনে শেলসম রয়েছে গাথা। আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াত, হ'য়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোনার কার্ত্তিক ধূলায় প'ড়ে লুটাত।" গণপতিতো চিরকালই লম্বোদর—কিন্তু এই পদে লম্বোদরের ক্ষুধা-নিপীড়িত উদরের কুঞ্চন মনে পড়ে, এবং কত আদরের সোনার কার্ত্তিকদের এই মর্ম্মান্তিক দুঃখকাহিনী ধনিগৃহের কন্যাবিরহবিধুরা সীমন্তিনীদের মনে অপূর্ব্ব কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এসকল গান মায়ের মর্ম্মবেদনায় লিখিত। কবিরা এরূপ সরল হৃদয়স্পর্শী কথা কহিতেন, যাহাতে বাঙ্গলার অধ্যাত্মরাজ্যের রাজা মহেশ্বরের গৃহবর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহাদের বাঙ্গলার মায়ের চক্ষে দরদর অশ্রুপ্রবাহ বহাইয়া দিতেন।

আগমনী গান।

এরূপ গান শুধু একটি নহে, শরৎ শেফালীর ন্যায় ইহারা অজস্র; কোনটিতে মেনকা বলিতেছেন—"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল"—সে আসা ক্ষণিকের জন্য। স্বপ্নে দর্শন দিয়া গৌরী চলিয়া গেলেন, মায়ের দুঃখের কথা শুনিতে একটি দণ্ড প্রতীক্ষা করিলেন না। মেনকা কন্যার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, তাঁহারই বা কি দোষ? "পাষাণের মেয়ে পাষাণী হ'ল" গিরিরাজতো পাষাণই বটেন, কিন্তু এখানে গিরিরাজের হৃদয়ও যে পাষাণেরই মত তাহারই ইঙ্গিত দিয়া স্বামীর উপেক্ষার প্রতি রাণী কটাক্ষ করিতেছেন। অন্য একদিন নারদের মুখে রাণী শুনিলেন, "মা -মা- ব'লে উমা কেঁদেছে" আর কি অভিমান করিয়া থাকা যায়? স্বামীর পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, "যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা কেমনে রয়েছে"—তিনি তো কত কথাই শুনিয়াছেন, পাগলা জামাই নাকি ভাঙ্গ খাইয়া দিগম্বর সাজিয়াছেন এবং প্রাণের গৌরীকে কত গালাগালি করিতেছেন—"উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ,—তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে," এসকল কথা তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক মায়েরই প্রাণের কথা ছিল—ইহাদের সেই চাপা কান্নার ভাষা দিয়াছিলেন—কবিরা, এবং এই করুণায় দুর্গোৎসব ভাসিয়া যাইয়া বিসর্জ্জনের বিদায়-বাজনার সুর বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে একটা মর্ম্মন্তুদ স্রোত বহাইয়া দিত।

মেনকা কখনও আর সহিতে পারিতেন না। সেই বৎসর ভরিয়া বিরহের দুঃখে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত। তিনি একটি গানে বলিতেছেন, "গিরি আমার মনের এই বাসনা, আমি জামাতা সহিতে, আনিব দুহিতে, গিরি-পুরে করব শিব স্থাপনা। ঘরজামাই করি রাখবো কৃত্তিবাস, গিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস—হরগৌরী রূপ হেরব বারমাস—বৎসরান্তে আন্তে যেতে হবে না।" গিরিরাজ অচল,—একটি গানে কবি তাঁহাকে যেতোরোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে নড়ান খুব সহজ ব্যাপার নহে, সুতরাং শিবকে যদি হিমালয়ে স্থাপন করা

যায়, তবে প্রতি বৎসর অনড় স্বামীকে নড়াইবার চেষ্টা করার দায় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়—এই যে মেনকারাণীর আর্ত-বাৎসল্য এবং স্নেহ, যাহা কবিরা মর্ম্মান্তিক করুণার সুরে বর্ণনা করিয়াছেন—আগমনীর অতুলনীয় পদ সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা বাঙ্গলার তদানীন্তন শরৎ কালের নিজের সুর। দুর্গোৎসবের সর্ব্বাপেক্ষা করুণ রসের উৎস—মিলনোৎসবের মধ্যে কন্যা-বিরহের জন্ম ব্যাকুলা জননীর প্রাণের নিভৃত বিলাপ। এই কবিতাগুলি নাকি উৎকট, কবিওয়ালারা নাকি অতি বীভৎস—অনুপ্রাস দোষ-দুষ্ট পদের বিকৃত রুচির পথ-প্রদর্শক—কবি-সম্রাটের এই মন্তব্যের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণ কখনই সাড়া দিবে না।

কবিওয়ালারা যে এই পবিত্র উৎস বহাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার শুধু পারিবারিক মর্ম্মকথার সন্ধান দেয় না—শুধু তাহা হইলে ইহার মূল্য ততটা বেশী হইত না, করুণ রসের উদাহরণস্বরূপ বাঙ্গলার আগমনী গান একটা দর পাইত এই পর্য্যন্ত। কিন্তু উপসংহারে কবিরা যে সকল ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মহেশ্বরের মহিমান্বিত মূর্ত্তি বাঙ্গালী-হৃদয় কতটা উপলব্ধি করিয়াছিল—তাহার আভাস পাওয়া যায়। কবি শেষ গানটির সমাপ্তি-বাক্যে বলিতেছেন, "রাণী তুমি বাতুল হইয়াছ, কুবেরের ভাণ্ডার দিয়া যাঁহাকে বিষ্ণু ভুলাইতে পারেন নাই, যিনি এক মুহূর্ত্তে পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর মুহূর্ত্তে যোগীশ্বরের মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ উর্দ্ধলোকে বিহার করেন, যাঁহার তপস্যায় যুগ যুগ চলিয়া যায়—দেবতারা যাঁহার যোগ-নিমগ্ন সমাধিস্থ রূপের কাছে আসিতে ভীত হন, শ্মশানের চিতা হাড়মালা যাঁহার কাছে কৌষেয় বস্ত্র ও পারিজাত হইতে গ্রাহ্য—সেই চিতাভস্মামোদী, অমৃতহলাহলের বৈষম্য-বিস্মৃত, যোগীশ্বর মহেশ্বরকে তুমি "ঘরজামাই" করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাও—যিনি লীলাবশতঃ ক্ষণেকের জন্য ভক্তের কাছে ধরা দেন, তাঁহাকে তুমি চিরবন্দী করিতে চাহ, তুমি বাতুল।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার অন্তঃপুরের মর্ম্মোক্তি ও বাঙ্গালী জীবনের নিগূঢ়-ভাবের প্রস্রবণ হইতে এই আগমনী গানের ধারা বহিয়া আসিয়া শিব-সমাধির স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছে। যাঁহারা আগমনী গান বুঝেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে বাঙ্গলাদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস বুঝিতে বিলম্ব হইবে।

আমরা এইখানেই সাহিত্যের ইতিহাস শেষ করিলাম। এই যুগে শব্দ-মন্ত্রের গুরু কয়েক জন কবি জন্মিয়াছিলেন এবং ভাব-মন্ত্রের গুরু কয়েকজন কবি জন্মিয়াছিলেন।

গোপাল উড়ে।

তাঁহাদের সম্বন্ধে, সংক্ষেপে দুইটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। শব্দ-মন্ত্রে গোপাল উড়ে কত উৎসবের রাত্রিকে যে উজ্জ্বল করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই তরল হাস্য, সে নৃত্য, সেই সকল মিষ্ট কথা, যে দেখিয়াছে শুনিয়াছে—সে জীবনে ভুলিবে না। সেই "ফুল জোগাই কেমন করে। যামিনীতে কামিনীফুল নিত্য নে যায় চোরে।" কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের তাল ও নূপুরের ধ্বনি মনে পড়ে। "কোথাকার হাবা ছেলে হাসি পায় শুনে, সদায় বলে কই মাসী তুই বিদ্যা দিলিনে—কথায় যেন কচি খোকা, রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা, মনে একটু হয়না ধোঁকা, হয়না ভাবনা—আরে, আঁচলে

কি বাঁধা আছে দিব যে এনে"—কালেংড়া রাগিণীর এই গানের সঙ্গে ঠুংরি তালে মালিনী মাসী নাচিয়া গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া দিত—সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে কি তাহা কখনও ভুলিতে পারে? শরৎ কালের শিউলি একটি দুইটি পড়ে না—তাহা অজস্র, এই গানগুলিও তাহাই। "কে শিখাল তোরে এই সিঁধ-কাটা বিদ্যে—থাক্ থাক্ থাক্, হয়ে দাঁড়কাক—ঠোকর দিলি শিব নৈবেদ্যে—গোবরা পোকা হয়ে বসিলি পদ্মে।" জীবনে সর্ব্বদাই বিকার-রহিত নিবাতনিষ্কম্প হ'য়ে তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া থাকা যায় না—একটু তরল আমোদ-প্রমোদের জন্য মনের মাঝে মাঝে একটা ইচ্ছা হওয়া যে গর্হিত, তাহা আমরা মনে করি না। যদি সত্য সত্যই কেহ স্থাণু কিংবা অচলায়তন তেমন ধারা থাকেন, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যাত্রার হীরামালিনী যদি নাচিয়া গাহিয়া তাঁহার প্রতি ঐ সকল গানের ফুল-শর হানেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য ভূমিসাৎ হইবে।

এই সকল কবিত্বের কৃতিত্ব, গোপাল উড়ের বাঁধনদার ভৈরব হালদারের কিন্তু এই গানগুলি গোপাল উড়ের নামেই চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমরাও তাঁহারই নামের উল্লেখ করিলাম। বর্দ্ধমান বাঁদিমোড়া-নিবাসী পাঁচালীকার দাশরথির শব্দের উপর অতি আশ্চর্য্য অধিকার ছিল, ইনি যমক-অলঙ্কারের এরূপ অপূর্ব্ব খেলা বাঙ্গলা শব্দের উপর দেখাইয়াছেন যে, স্বীকার করিতে হইবে, ইনি একজন প্রকৃত খেলোয়াড় বটেন। সে সকল খেলা দেখিয়া প্রীত হই এবং বোধ হয় বিস্মিতও হই; কিন্তু যখন এই চটুল লোকটি তাঁহার ক্ষিপ্র ও উজ্জ্বল প্রতিভা দ্বারা আসর জমাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া স্বগৃহে আসিয়া গৃহদেবতার কাছে "দোষ কারও নয়গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা" বলিয়া কাঁদিতে থাকেন, কিংবা সেই দেবতার রূপে মাধুর্য্য ও ভীষণতার সংমিশ্রণের আভাস পাইয়া "নীলবরণী, নবীনা রমণী" বলিয়া স্তোত্র পড়িতে থাকেন—কখনও "নীল-নয়ন-জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী" আবার পর মুহূর্ত্তে "লোলরসনা করালবদনী" বলিয়া ভয়ে চক্ষু নিমীলিত করেন, তখন তাঁহার সেই মর্ম্মস্পর্শী অনুতাপ—তাঁহার দেবতার পরিপূর্ণ দয়ার মূর্ত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে সংহার-মূর্ত্তির ধ্যান আমাদিগকে তাঁহার আঙ্গিনায় পদরজের প্রার্থী করিয়া তোলে।

দাশরথি।

এই শব্দ-মন্ত্রের গুরুদ্বয়কে ছাড়িয়া আমরা কলিকাতার এক সময়ের বড় লোকদের সংগীত-কলার অবলম্বনস্বরূপ রামনিধি গুপ্ত সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শেষ করিব—

রামনিধিবাবু (নিধুবাবু) ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বাগবাজার অঞ্চলে এখনও তাঁহার অর্দ্ধভগ্ন গৃহখানি আছে। যাঁহার ভক্তের এককালে সীমাসংখ্যা ছিল না, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বড়লোক ছিলেন, এখনও সংগীতবিজ্ঞানানুশীলন-কারীদের মধ্যে তাঁহার ভক্তের অভাব নাই, এতাদৃশ ব্যক্তির গৃহখানি সংস্কার করিয়া স্মৃতিরক্ষার কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না—বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! রামনিধি গুপ্তের গানগুলি অধিকাংশই সারি মিঞার টপ্পার অনুকরণে রচিত; রাধাকৃষ্ণের কথা বাদ দিয়াও যে প্রেম-সংগীত বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইতে পারে—তাহা নিধুবাবু দেখাইয়াছেন। "কানু ছাড়া

গীত নাই" একথারও অলীকত্ব তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি প্রায়ই অতি সংক্ষিপ্ত, সেই স্বল্পাক্ষরা গীতিকার প্রত্যেকটিই একটি সমগ্র ভাব প্রকাশ করে। সেই ক্ষুদ্র গীতিগুলি বিয়োগান্ত করুণা ও স্বতঃসিদ্ধ কবিতায় সার্থক হইয়াছে। "ভালবাসবে বলি ভাল বাসিনে, আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥ বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি, তাই দেখে যেতে আসি—দেখা দিতে আসিনে" * গানটি সর্ব্বজন-বিদিত। [ইহাতে প্রেমের "স্বভাব" বর্ণিত হইয়াছে—সে স্বভাব এই যে তাহা দিতে চায়—নিতে চায় না।] "যার মন তারই কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে,॥দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে। দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন। না হ'তে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে।" [ইহার অর্থ, সে আমাকে ভালবাসে নাই, বরং আমিই তাহাকে ভালবাসিয়াছি, সে আমাকে কিছুই দেয় নাই, বরং সেই নিয়াছে; তথাপি লোকে রটাইতেছে যে আমি তাহার মন নিয়াছি—একথা সত্য নহে, তাহার মন তাহারই॥আছে।] আর একটি গান "প্রেমে কি সুখ হ'ত। আমি যারে ভাল বাসি, সে যদি ভালবাসিত। কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে, ফুল হ'ত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত।" কবির এই সিদ্ধান্ত কি ঠিক? সত্যই কি জগতে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যায় না, তাহা কি পলাশের সুগন্ধের মত, কাঁটাহীন কেয়ার মত, চন্দন তরুর ফুল ও ইক্ষুর ফলের মত দুর্লভ ও অসম্ভব? সত্যই কি যাহাকে যে ভালবাসে—সমস্ত প্রাণমন দিয়া ভালবাসে,—সে সেই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখিয়াই সরিয়া পড়ে—একজনের অতিরিক্ত আগ্রহে কি অপরের আগ্রহ জুড়াইয়া যায়? হয়ত কবি যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, জীবনে সত্যই তাহাই ঘটে। প্রেমিক বাড়াবাড়ি করিয়া বঞ্চিত হন। যে নৈবেদ্য একমাত্র ভগবান্‌কে দেয়, তাহা যাহাকে তাহাকে দিলে এবংবিধ বিড়ম্বনাই ঘটে। নিধুবাবু আর একটি গানে বলিয়াছেন—"সে এত নিষ্ঠুর, তোমার প্রতি করুণার বিন্দু তাহার নাই—তবু তুমি তাহাকে এত ভালবাস কেন?" একটি ছত্রে প্রেমিক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন,—"তবু যে কেন ভালবাসি, তাহা নিজেই জানি না।" কিন্তু কবি এই প্রশ্নের উত্তর অন্য এক গানে স্বয়ং দিয়াছেন, "আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।" ইহাই প্রেমের স্বভাব। নিধুবাবুর প্রধান ভক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble); তিনি বলিতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর তুল্য কবি আর নাই।

বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যতদূর দেখা যায়—পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা ও আসামের রাজারা প্রাচীনকাল হইতে রাজদরবারে বাঙ্গলা ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজাদের তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কোন কোন তাম্রশাসন আমরা বাঙ্গলায় লিখিত দেখিয়াছি। তদ্রূপ একখানি তাম্রশাসন আমার নিকটই ছিল, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাহা আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া আর ফিরাইয়া দেন নাই। বঙ্গভাষা

* এই গানটি কেহ কেহ শ্রীধর পাঠকের রচিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ভুল।

ও সাহিত্যে তাহার কতকাংশের নকল দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজাদের বাঙ্গলায় লিখিত অনেক তাম্রশাসন রাজমালায় দৃষ্ট হয়। সহজিয়ারা বহুপূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মব্যাখ্যা-সম্বলিত পুস্তিকা বাঙ্গলা গদ্যে লিখিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ বাঙ্গলা গদ্যে রচিত হইত। রাধাবল্লভ শর্ম্মা প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সে বাঙ্গলা সহজ, ছত্রগুলি একেবারেই জটিল নহে— অল্পসংখ্যক শব্দে পরিসমাপ্ত। তাহা ছাড়া দলিল ও চিঠিপত্র আমরা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের অনেক পাইয়াছি। গদ্য সাংসারিক প্রয়োজন ও ধর্ম্মব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হইলেও উহা দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও সাহিত্যের আসরে বিশেষ কোন স্থান লাভ করে নাই। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি চণ্ডীদাসেরও সহজতত্ত্বজ্ঞাপক বাঙ্গলা গদ্যে লিখিত পাতড়া পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে দেশে গণিতের সূত্র পর্য্যন্ত কবিতায় রচিত হইত, সে দেশে গদ্য বিশেষ আদৃত হয় নাই, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজদের আগমনে— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংস্থাপনের পর হইতে বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্য বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। এই সময়ের (১৮০০ খৃঃ) কিছু পূর্ব্ব হইতেই কেরি প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণ বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা-গদ্যরূপ ইংরেজী বাগানের ফলই আমরা খাইতেছি।

ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস—ত্রিপুরারাজ্য

"গৌড় সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল।
রাণীবাক্য শুনি সবে বীরদর্পে বলে। প্রতিজ্ঞাকরিল যুদ্ধে যাইব সকলে।"—রাজমালা।

"রাণী সঙ্গে সৈন্য-গণ যুদ্ধে প্রবেশিল। ত্রিপুরাসুন্দরী রাণী হস্তী সোয়ার হৈল।
ছয় শত পঞ্চাশ দন ত্রিপুরা যখন। ত্রিপুরাসুন্দরী রাণী করে এই রণ।
গৌড়দেশী ভয়-পাইক দেশেতে যাইয়া। বলিলেক যুদ্ধ-বার্ত্তা মহাদুঃখী হৈয়া।
দূত বলে মহারাজ করি নিবেদন। ত্রিপুরাসুন্দরী নাম রাজ-রাণী হন।
এত বড় যুদ্ধা রাণী কভু নাহি শুনি।—মহাযুদ্ধ করিলেন রাণী।"—ত্রিপুর-বংশাবলী।

দিল্লীশ্বরদের দরবারে এবং অপরাপর রাজসভায় সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকিত। আরঙ্গেব যখন বুঝিলেন, তাঁহার অত্যাচারে দেশশুদ্ধ লোক ক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং তাঁহার বিবেচনাহীন বুদ্ধির দোষে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি যুদ্ধে তিনি হারিয়া গেলেন, তখন তিনি দরবারের ইতিহাস-লেখকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহার রাজত্বের দশম বর্ষে তিনি ইতিহাস লিখিবার পথ এইভাবে বন্ধ করিলেন; এজন্য তাঁহার সুদীর্ঘ শেষ সময়কার ঘটনার বিবরণ এত অসম্পূর্ণ (And hence the reason why after those ten years we find no detail of many parts of his long reign. Mutaqherin, Vol IV, p. 159.) হিন্দুরাজাদের কেহ কেহ শকাব্দ, বিক্রমাব্দ প্রভৃতি কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনকালের বড় বড় রাজারা প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজত্বের আরম্ভকাল হইতে রাজ্যাঙ্ক চালাইতেন।

প্রাদেশিক ইতিহাস।

এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত। সেইসকল প্রাদেশিক রাজ্যগুলি দেশে অরাজকতার সময়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া প্রবল হইত এবং সময়ে সময়ে কোন সার্ব্বভৌম নৃপতির আনুগত্য স্বীকার করিত। ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লব এবং এক বংশের উচ্ছেদ করিয়া অপর বংশের প্রতিষ্ঠার ব্যপদেশে পূর্ব্বতন রাজত্বের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া যাইত। যাঁহারা শত্রুকে জয় করিতেন, তাঁহারা শত্রুবংশের গৌরব-কাহিনী রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন না। এইভাবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক রাজ্যের ইতিহাসই লুপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজমালাতে এইরূপ কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ আছে, লামা তারানাথ সেনবংশীয় ও পালবংশের রাজাদের কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ

করিয়াছেন (এই পুস্তকের ২৮৮-৮৯ পৃঃ)। এই সকল ইতিহাস এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, সেক শুভোদয়া, গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট-রচিত বল্লালচরিত প্রভৃতি সামান্য কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া এদেশে বিশাল হিন্দুরাজত্বের ইতিহাসের কিছুই নাই। আর্য্যাবর্ত্তে যেরূপ আর্য্যগণের অসামান্য স্থাপত্য ও শিল্পকীর্ত্তি ধ্বংস পাইয়াছে, তথায় তাহাদের ইতিহাসও সেইরূপ ধ্বংস পাইয়াছে। কিন্তু এখনও চেষ্টা করিলে কিছু উপকরণের উদ্ধার হইতে পারে। রাষ্ট্রবিপ্লবই এই ইতিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ। রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রগৌরব—এদেশে কোনকালেই জাতীয় গৌরবের বিষয় হয় নাই—উহা বংশগৌরবের কারণ হইত, সুতরাং একবংশের ধ্বংসের পর অপর বংশের অভ্যুদয়ে সেই গৌরব ধ্বংস পাইত। ধর্ম্ম-গৌরবই এই দেশের জাতীয় গৌরবের হেতু ছিল; এই জন্য সমস্ত জাতি তাহা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু দুই প্রবল ধর্ম্মের সংঘর্ষ হইলে, বিজিত ধর্ম্মের গৌরব জয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের গৌরবজনক ইতিহাসের বিলোপ-সাধন করিয়াছেন। জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র **ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া** কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিয়াছে। পুরাণগুলিতে এই ভাবে প্রাচীন রাজগণের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা এদেশে এত বেশী ছিল যে, এদেশের রাজগণ তালপত্র, তেরুটপত্র এবং কাগজের উপরও সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপনা না করিয়া শিলাখণ্ডে ও তাম্রপত্রে—তাঁহাদের কীর্ত্তিকথা উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন। অশোকের ৮৪০০০ অনুশাসনের মধ্যে মাত্র ৪০।৪১টি পাওয়া গিয়াছে। সেদিনও (১৬০৫ খৃঃ অব্দে) অশোকের এলাহাবাদ অনুশাসনের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাহার উপর স্বীয় দৌরাত্ম্যের চিহ্ন রাখিয়াছেন। মুসলমানেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন, হিন্দুরা তাহা জানিতেন না—একথা আমি বিশ্বাস করি না। হিন্দুরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী অনুরাগী ছিলেন বলিয়া পার্থিব কোন ব্যাপারেই তাঁহাদের অনুরাগের ত্রুটি দেখা যায় না। শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহারা জগজ্জয়ী হইয়াছিলেন। এখনও জগতে হিন্দু ও বৌদ্ধের যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন সহস্র বৎসরের অত্যাচার সহিয়া জগতে টিকিয়া আছে, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের তাহা নাই। মুসলমানগণের ইতিহাস লেখার প্রবৃত্তি তাঁহারা বৌদ্ধগণের নিকট পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এশিয়াতে প্রাধান্য অল্পকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন্য তাঁহাদের খাতাপত্রগুলি লুপ্ত হয় নাই; এবং প্রাচ্য সভ্যতায় সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাসের জন্য জায়গা করা হইয়াছে, এজন্য হয়ত সেগুলি ভবিষ্যতে লুপ্ত নাও হইতে পারে। কিন্তু আজ যদি মারহাট্টারা বিজয়ী হইয়া ভারত অধিকার করিতেন, তবে বালাজি বিশ্বনাথ, নানা ফার্নাবিশ কিংবা ভাস্কর পণ্ডিতের হাতে মুসলমানদের ইতিহাস রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। বর্গীরা হিন্দু, কিন্তু হিন্দুমন্দিরও তাঁহাদের অত্যাচার হইতে বাদ পড়ে নাই। বাঙ্গলার প্রান্তভাগে যে কয়েকটি হিন্দুবংশ শত শত বৎসর টিকিয়া আছে তাহাদের ইতিহাস দুই একখানি পাওয়া গিয়াছে। বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের দুই একটি অট্টালিকার লুপ্তাবশেষ যেরূপ তথাকার অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া থাকে, এই দুই একখানি পুস্তকও আমাদের ঐতিহ্যের

সেইরূপ সাক্ষী; ইহারা প্লাবনের বাহিরে ছিল বলিয়াই রক্ষা পাইয়াছে, ইহাদের একখানি 'রাজমালা'—ত্রিপুরার ইতিহাস। আর একখানি কোচবিহারের ইতিহাস। আসামের অহম্ রাজাদের বুরুঞ্জি অতি মূল্যবান্ ইতিহাস। গেটসাহেব লিখিয়াছেন—"অহম্ রাজাদের বুরুঞ্জির মত এরূপ খাঁটি ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস দুর্লভ। বুরুঞ্জি-লেখকগণ মুসলমান ইতিবৃত্তকারগণ হইতেও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও লিপিদক্ষ।"

ধর্ম্মের সংস্রব রাখার জন্য পুরাণগুলিতে রাজাদের কাহিনী কিছু কিছু বজায় আছে, এবং ভগবান্ রামচন্দ্রের সংস্রবহেতু সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপাল-চরিত টি কিয়া আছে।

রাষ্ট্রবিপ্লব আমাদের দেশের ইতিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে, তাহা এদেশে নব-ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব। এই নব-ব্রাহ্মণ্য জগতের সমস্ত বিষয় হইতে হিন্দুর মুখ ফিরাইয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহারা রাজন্যবর্গের কীর্ত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করেন নাই। পার্থিব সমস্ত কীর্ত্তির প্রতি ইহারা ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। এই ইতিহাস-বিলোপের চেষ্টা ইহাদের এত বেশী হইয়াছিল যে, প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে যত পল্লীগীতিকা ছিল—তাহা তাঁহারা হিন্দু সমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, নর-নারীর প্রেমসম্বন্ধে সত্যঘটনা-মূলক যত কবিত্বপূর্ণ কাহিনী দেশময় প্রচলিত ছিল—তাহা তাঁহাদের ভ্রুকুটীতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মহুয়া, শ্যামরায় ও আন্ধা বন্ধুর ন্যায় অমর গীতি ময়মনসিংহে এখন আর হিন্দুর বাড়ীতে গাইতে দেওয়া হয় না। বৃন্দাবন দাস (ব্রাহ্মণ) রোষ-কষায়িত চক্ষে এই সকল গীতির প্রতি দৃষ্টি হানিয়া বলিয়াছেন, "এই ভাবে জগতের মিথ্যা কাল যায়।" বৈষ্ণব সমাজ ইহা হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে ধর্ম্মগুরুই প্রকৃত গুরু, মাতাপিতা কেহই নহেন। শরীরটা উপেক্ষণীয়—ইহা কাহার নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা জানিবার কোন দরকার নাই,—কাহার দ্বারা আত্মার পুষ্টিসাধন হইয়াছে তাহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য গৌরবের বিষয়; কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত প্রসিদ্ধ লেখক, যিনি বৈষ্ণবগুরুদের কথা প্রতি পত্রে পত্রে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের বিবরণ সংবলিত এত বড় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি একটিবার তাঁহার মাতাপিতার নাম বলেন নাই।

পার্থিব ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা।

আমরা এখন রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাসসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে যত রাজা বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম। আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম এই বংশে আমরা পাইতেছি। রাজমালার প্রথমাংশের অনেক কথাই খাঁটি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না—কিন্তু পরবর্ত্তী অংশ অধিক পরিমাণেই খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য। কল্হণের রাজতরঙ্গিনী হইতেও আমরা এই পুস্তকখানিকে মোটের মাথায় বেশী প্রামাণিক মনে করি। প্রথমাংশ প্রাচীন প্রবাদ ও গল্পমূলক। যযাতি-পুত্র দ্রুহ্যু, ত্রিপুর রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত। দ্রুহ্যু কপিলা নদীর তীরে ত্রিবেগ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজমালা।

তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমানায় মেখলী, পশ্চিমে কোচরং, উত্তরে তৈবঙ্গ নদী এবং দক্ষিণে আচরং ছিল এবং লৌকিক বিশ্বাসে এই বংশ কিরাত বলিয়া আখ্যাত হইতেন। ত্রিপুরা-রাজের অনাচার ও অনার্য্য শ্রেণীতে বিবাহাদির জন্য এই বংশে কিরাতত্ব ঢুকিয়াছিল। এই কপিল-আশ্রম 'সাগর' নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সাগর-সন্নিহিত বিস্তৃত ভূখণ্ড পাঁচটি সমৃদ্ধ নগরী ও দুই লক্ষ লোকসহ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জল-প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছে।

রাজ-মালার প্রথমভাগ—দৈত্যখণ্ড, ত্রিপুরখণ্ড, ত্রিলোচনখণ্ড, দক্ষিণখণ্ড, তৈদক্ষিণখণ্ড, প্রতীতখণ্ড, বুঝারখণ্ড, ছেংথোম্পাখণ্ড, ডাঙ্গরফাখণ্ড, রত্নমাণিক্যখণ্ড—এই দশ খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথমভাগের ইতিহাসভাগ সংস্কৃতে ছিল—সে বৃত্তান্ত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রাজপণ্ডিতদ্বয় ভাষায় অনুবাদ করিতে স্বীকার করিলেন না। অগত্যা ধর্ম্ম-মাণিক্য চন্তাই দুর্লভেন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি ত্রিপুরভাষায় রচিত ইতিহাস হইতে বাঙ্গলা করিয়া যে কাহিনী শুনাইলেন, তাহাই **শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর** বাঙ্গলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া লইলেন। (আদিকাল হইতে ১৪৫৮ খৃঃ)।

দ্বিতীয়ভাগ—অমরমাণিক্যখণ্ড, রত্নমাণিক্যখণ্ড, ধন্যমাণিক্যখণ্ড, বিজয়মাণিক্যখণ্ড, অনন্ত-মাণিক্যখণ্ড, উদয়মাণিক্যখণ্ড, জয়মাণিক্যখণ্ড, অমরমাণিক্য(২য়)খণ্ড, রাজ্যধরমাণিক্যখণ্ড, যশোধরমাণিক্যখণ্ড ও কল্যাণমাণিক্যখণ্ডেবিভক্ত—এবং একাদশ জন রাজার বিবরণ-সংবলিত। এইভাগে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা-রাজ্যের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত আছে। এই ভাগের সঙ্কলয়িতা **সিদ্ধান্তবাগীশ**, ইনি এই খণ্ড-সঙ্কলনে সেনাপতি রণ- চতুর নারায়ণের নিকট উপকরণ পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে প্রাচীন রাজমালার সংশোধন হয়—"পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত। প্রসঙ্গতে অলথিক ভাষা যে কুৎসিত।" 'অলথিক' অর্থ অসংলগ্ন এবং কুৎসিত ভাষা অর্থ খাঁটি প্রাকৃত। মনসামঙ্গল-রচক বিজয়গুপ্ত যেরূপ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি কাণা হরিদত্তের ভাষার দোষ গাহিয়াছেন, এই অভিযোগ তদনুরূপ। তথাপি আমরা সেই প্রাচীন রাজমালাখানি পাইলে বেশী সুখী হইতাম।

তৃতীয়ভাগ—গোবিন্দমাণিক্য, ছত্রমাণিক্য, রামমাণিক্য, রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য, ধর্ম্ম-মাণিক্য(২য়), মুকুন্দমাণিক্য, ইন্দ্রমাণিক্য, জয়মাণিক্য, উদয়মাণিক্য এই দশজন নৃপতির ইতিহাস-সংবলিত। ইহাতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। এই ভাগ **দুর্গামণি উজির**-বিরচিত। এই ভাগের উপক্রমণিকায় দুর্গামণি উজির লিখিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বভাগের শুধু ভাষা পরিবর্ত্তন করেন নাই, তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে অনেক তত্ত্ব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের (১৪৫৮ খৃঃ) রাজত্বকালে রাজমালা ত্রিপুর-ভাষায় লিখিত ছিল, আমরা এরূপ উল্লেখ পাইয়াছি, "পূর্ব্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুর-ভাষাতে"—কিন্তু এই রাজার আদেশে রাজমালা "সুভাষাতে" বিরচিত হইল। 'সুভাষা' অর্থ বাঙ্গলাভাষা এবং রাজা ধর্ম্মমাণিক্যের কালের এই "সুভাষাকে" দুর্গামণি উজির

আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা "অলম্বিক কুৎসিত।" এইখানে আর একটি কথা বলার দরকার—কোন কোন ত্রিপুর-রাজের নাম মঙ্গোলিয়ান ভাষার চিহ্ন স্পষ্টই বহন করে, যথা, "ছেং থোম্পা" "ডাঙ্গর ফা" "খিতুঙ্গ" প্রভৃতি। এক সময়ে চীনরাজাদের প্রভাব যে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমানায়, বিশেষতঃ বঙ্গের উত্তরভাগে, খুব বেশী হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ আছে। উত্তরের প্রভাব এদেশের শিল্পকলায়ও পরিদৃষ্ট হয়। যদিও ধীমান্, বীতপাল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পাচার্য্যগণের প্রভাব সুদূর উত্তর ও পূর্ব্ব এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যদিও ভারতীয় বৌদ্ধগণের প্রভাব চীন-জাপানের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি চীন সম্রাটের অধিকার মাঝে মাঝে বঙ্গদেশের উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; তন্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয় বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশে যাইয়া তান্ত্রিক সাধনা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজগণ বিশেষ মগধাধিপতিরা এমন কি গৌড়রাজগণের কেহ কেহ চীনরাজের নিকট দূত পাঠাইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বঙ্গদেশেরই অনেক দেবমূর্ত্তির চক্ষু চীনদেশীয় লোকের চক্ষুর ন্যায়। হয়ত প্রাচীন কোন যুগে উত্তর দেশের ভাস্করগণ কখনও কখনও এদেশে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন, তাঁহাদের তান্ত্রিক শিল্পপরম্পরার প্রচেষ্টায় "দেবচক্ষুর" উক্ত সংস্কার চলিয়া আসিয়াছে। স্থানবংশীয়দের উপাধি ত্রিপুরা ও নিকটবর্ত্তী জনপদের রাজারা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানদিগের প্রাধান্যের সময়ে মজুমদার, জুমলাদার, খাসনবিস, মহালানবিস প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রাহ্মণগণও পরিচিত হইতেন। ত্রিপুর-রাজগণের ঐরূপ চৈনিক বা স্থানদিগের উপাধি গ্রহন করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি পুরাকাল হইতে এই রাজবংশের ১৮৪ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। দ্রুহ্যু ইহাদের মধ্যে সপ্তমস্থানীয়—সুতরাং দ্রুহ্যু হইতে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য পর্য্যন্ত ১৭৭ জন ত্রিপুরার রাজার নাম রাজবংশাবলীতে আছে। দ্রুহ্য নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা এবং যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুই এই ত্রিপুর-রাজদের আদিপুরুষ কিনা, এই সকল দুরূহ প্রশ্ন-সমাধানের স্থান এখানে নহে। যখন চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজগণের গোড়ায়ই ঐতিহাসিক গলদ দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কোন জ্যোতিষ্ক হইতে মানুষের আবির্ভাব-ব্যাপার ঐতিহাসিকগণের ধারণার অতীত), তখন শুধু ত্রিপুর-রাজগণের কথা নহে, সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশের অভিমানী সমস্ত রাজগণের বংশাবলীরই আদিকথা ঘোর অন্ধকারাবৃত। এই-সকল জল্পনা-কল্পনা লইয়া কালক্ষয় করা বিফল।

যে মুষ্টিমেয় আর্য্যবীর ত্রিপুর-রাজ্যে প্রথম আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে বিস্তৃত কিরাত ও অপরাপর অনার্য্যসমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দৈত্যের পুত্র ত্রিপুর

ত্রিপুর।

"জন্মাবধি না দেখিল দ্বিজ সাধু ধর্ম্ম। সেই হেতু নৃপতি হইল ক্রূরকর্ম্ম। দানধর্ম্ম না দেখিল আগম পুরাণ। বেদশাস্ত্র না পঠিল নাহি কোন জ্ঞান। দীক্ষিত না হৈল, দেবদ্বিজ না চিনিল। সল্লোকের ব্যবস্থার কিছু না দেখিল। কিরাত-প্রকৃতি হৈল কিরাত-আচার।" শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে, ত্রিপুর নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

"আপনাকে আপনে দেবতা করে জ্ঞান।
মানা করে অন্যে যদি করে যজ্ঞ দান॥"—রাজমালা, ত্রিপুরখণ্ড।

কিন্তু তাঁহার অত্যাচার ও অনীশ্বর-বাদ বসুন্ধরা বেশী দিন সহ করিতে পারিলেন না। তিনি নিহত হইলেন এবং তৎপত্নী হীরার গর্ভে শিবাংশে ত্রিলোচন রাজার জন্ম হইল। এই শিব হইতে উদ্ভবের প্রবাদ কুচবিহারের রাজাদেরও আছে। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের বাণ রাজা শিবের পুত্রবৎ ছিলেন, পুরাণে লিখিত আছে শিব কার্ত্তিক হইতেও তাঁহাকে বেশী ভাল-বাসিতেন। কোচ, কিরাত প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা শিবের অনুচর বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

ধ্বজ, চন্দ্র ও ত্রিশূলচিহ্ন

হীরার গর্ভে শিবের ঔরসে উৎপন্ন বলিয়া ত্রিলোচন রাজা পরম শৈব হইলেন। ইঁহার পার্ব্বত্য নাম ছিল "সুবড়াই।" ইনি ত্রিপুর-রাজের ক্ষেত্রজ-পুত্র, সুতরাং চন্দ্রবংশীয় চিহ্ন—নিশান ও চন্দ্রধ্বজের উত্তরাধিকারী, এদিকে শিবসম্ভূত—এজন্য ত্রিশূলচিহ্নযুক্ত ধ্বজও ব্যবহার করিতেন। তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের ধ্বজে চন্দ্র ও ত্রিশূল উভয়বিধ চিহ্নই দৃষ্ট হয়।

ত্রিলোচন রাজার সময়ে রাজ্যে কয়েকটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কপিলমুনির আশ্রম—ত্রিবেগে প্রথমতঃ এই বংশের রাজধানী ছিল। ত্রিপুর খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং

ত্রিলোচন।

বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে নানা পার্ব্বত্য-জাতির বাস হেতু—দেশময় অনার্য্য-প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ত্রিলোচন সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুর-সমাজে আর্য্য-আচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমুদ্রকুল হইতে চতুর্দ্দশ দেবতা আনিয়া রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল 'দেওড়াই' পুরোহিত আসিলেন, তাঁহারা লোকদিগকে আর্য্য আচার শিখাইলেন। ত্রিলোচন রাজার রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুতর ঘটনা,—কাছাড়ের রাজার (হেরম্বাধিপতির) কন্যার সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের বিবাহ। অপুত্রক হেরম্বাধিপতি তাঁহার এক দৌহিত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন। এই দুই রাজ্যের সঙ্গে এবংবিধ সম্বন্ধ হওয়ায় ত্রিলোচনের পুত্রদের রাজ্যের সীমা ও

হেরম্বাধিপতির কন্যার সঙ্গে বিবাহ।

শক্তি খুব বাড়িয়া যায়। কথিত আছে, ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমকালিক এবং নিমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ত্রিলোচনের বারটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে একটি হেরম্বরাজ্যের অধিকার লাভ করেন। তিনিই ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আর একাদশ জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'দক্ষিণ' সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অপর দশজনের প্রত্যেককে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি করিয়া 'মণ্ডলাধিপতি' নিযুক্ত করেন। আদি-উপনিবেশের সময়ে যে আর্য্যসৈন্য আসিয়াছিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড়ের অধিকার পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে সমস্ত রাজ্যের অধিকারী—এই দাবী ফাঁদিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ করেন।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত ও মহাক্ষতিগ্রস্ত হইয়া একাদশ ভ্রাতা ত্রিবেগের রাজধানী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেরম্বাধিপতিকে দিয়া তাঁহারা আরও সরিয়া আসিয়া বরবক্র নদীর তীরবর্ত্তী

থলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। বরবক্র-তীরে দক্ষিণ রাজার সৈন্যেরা আত্মকলহ করিয়া এবং মারামারি কাটাকাটি করিয়া অনেকে (৫০,০০০) ধ্বংস পাইল। দক্ষিণের মৃত্যুর পর তৈদক্ষিণ রাজা হইয়া মেথলী রাজার (মণিপুরেশ্বরের) কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সুতরাং ত্রিপুর-রাজগণ কাছাড় ও মণিপুরের রাজাদের সঙ্গে আদান-প্রদান দ্বারা তাঁহাদের সামাজিক প্রশ্নটি আরও একটু জটিল করিয়া তুলিলেন। তৈদক্ষিণ হইতে একচল্লিশ স্থানীয় ভূপতি শিক্ষারাজ নরমাংস খাইতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই সময়ে ছাম্বুল নগর (কৈলাসহরের অন্তর্বর্ত্তী) শিবমন্দিরাদি শোভিত হইয়া সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। দ্রুহ্যু হইতে ৯৫ স্থানীয় 'কুমার রাজা' অনেক সময়ে এই নগরীতে বাস করিতেন। কাছাড়ের সঙ্গে ত্রিপুর-রাজগণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইল। দ্রুহ্যু হইতে ১০৭ স্থানীয় প্রতীত নামক ত্রিপুর-রাজের সহিত হেরম্বরাজের একসময়ে খুব বেশী ভাব হইয়াছিল। উভয় কুলই উত্তরকালে একব্যক্তি হইতে সম্ভূত, এজন্য দুই রাজা একত্র হইয়া উভয়রাজ্য শাসন করিবেন, এই মনস্থ করিয়াছিলেন। এদিকে কামাখ্যা, জয়ন্তী পাহাড় প্রভৃতি দেশের রাজারা দেখিলেন, এই দুই পরাক্রান্ত রাজা সম্মিলিত হইলে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলি ইঁহাদের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না। সুতরাং তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া এক সুন্দরী রমণীকে ইঁহাদের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নানারূপ শিক্ষা দিয়া ভেটস্বরূপ রাজদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। সুন্দ-উপসুন্দের মত, দুই রাজা এই রমণীকে উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে হেরম্বরাজ অনুতপ্ত হইয়া ত্রিপুর-রাজের বিরুদ্ধে সংকল্পিত অভিযান পরিত্যাগ করিলেন। রাজা হিমতি (প্রতীত হইতে ৫ম স্থানীয়) রাঙ্গামাটি দখল করেন। রাঙ্গামাটিতে 'লিকা' নামক এক জাতি বাস করিত, তাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইল। এই রাজ্য অধিকার করিয়া ত্রিপুর-রাজ নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া বঙ্গদেশের বিশাল-গড় প্রভৃতি পর্ব্বত-সন্নিহিত পল্লীগুলি দখল করিয়া লইলেন। রাঙ্গামাটিতেই হিমতি রাজার অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু ঘটে—যে স্থানে তাঁহার ভৌতিক দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ করা হয়, সেই স্থানের নাম 'বৈকুণ্ঠপুর' দিয়া ত্রিপুরবাসীরা এক মঠ নির্ম্মাণ করেন।

হিমতি রাজা।

বিশাল-গড়, বৈকুণ্ঠপুর

দ্রুহ্যু হইতে ১৩৩ স্থানীয় ছেংথোম্পা রাজার সময়ে গৌড়ের রাজার এক প্রবল-পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুর-রাজ্যের দক্ষিণাংশে লুণ্ঠনাদি করাতে উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁ গৌড়েশ্বরের দুই তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া ছেংথোম্পার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ত্রিপুর-রাজ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ্ঞী ত্রিপুরাসুন্দরী স্বীয় কাপুরুষ স্বামীকে বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া স্বীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব করিতে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার উৎসাহবাক্যে ত্রিপুর-সৈন্যেরা জীবন পণ করিয়া

কীর্তিধর বা ছেংথোম্পা।

মহারাজ্ঞী ত্রিপুরাসুন্দরী

যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিল। তিনি ত্রিপুর-সৈন্যদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গৌড়সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল। যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে। যেই জন বীর হও চল আমা সনে।" (রাজমালা, ছেংথোম্পাখণ্ড)। তাঁহাদের অনুকূল প্রতিশ্রুতি পাইয়া মহাদেবী স্বয়ং রন্ধন-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়িকা হইয়া মহিষ, গবয়, মেষ, হংস, হরিণ, নানারূপ পক্ষী, অসংখ্য শূকর প্রভৃতির মাংস রন্ধন করাইলেন, "সহস্র সহস্র মদ্যের কলস ও দধি-দুগ্ধাদির ভাণ্ড" আনীত হইল এবং ত্রিপুরার কুকি ও রাজ-সৈন্য একত্র হইয়া মহারাজ্ঞীর এই খাদ্য-সম্ভার উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইল। মহারাজ্ঞীর রণবেশ ও উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া অগত্যা রাজাকেও রণক্ষেত্রে যাইতে হইল। * হীরাবন্ত খাঁর খড়্গের কোষ স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছিল এবং মাথায় সোনার পাগড়ী এবং অঙ্গে সোনার 'জিরা' (বর্ম্ম) ঝলমল করিতেছিল। ত্রিপুর-সৈন্য মহারাজ্ঞীর নেতৃত্বে দুর্জ্জয়বেগে গৌড়সৈন্যকে আক্রমণ করিল এবং হীরাবন্ত খাঁয়ের রাজবেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকেই জোরে আক্রমণ চালাইল। গৌড়সৈন্য পরিণামে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। কথিত আছে এই মহাহবে একলক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। এই সময়ে রাজা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, একটি মুণ্ডহীন কবন্ধ আকাশে নাচিতেছে, একদণ্ড নৃত্য করিয়া কবন্ধ ধরাশায়ী হইল। এক লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে নাকি রণক্ষেত্রে—একটি কবন্ধ দেখা দেয়। † রাজা বুঝিলেন, এই যুদ্ধে একলক্ষ লোক মরিয়াছে। ভীরু রাজা চোখে সরিষা ফুল দেখিয়াছিলেন, কিংবা কবন্ধ দেখিয়াছিলেন বলা যায় না। যুদ্ধ জয় করিয়া ছেংথোম্পা সেই হতাহত সৈন্য-সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে এক তিল স্থান বসিবার উপযোগী পাইলেন না; তখন তাঁহার জামাতা রণে পতিত এক অতিকায় হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয় খড়্গাঘাতে কাটিয়া রাজাকে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। রাজা জামাতার বিক্রম দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং জামাতাকে সম্মানিত করিলেন। তদবধি রাজপুত্রদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ-জামাতারা একসঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার পাইলেন এবং জামাতারা সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য রাজ-সরকারের দৈনিক একসের মাত্র চাউল বরাদ্দ ছিল। ত্রিপুরা-সুন্দরী জোয়ান ডি আর্কের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে এই যুদ্ধ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল, তখন

* "রাণী সঙ্গে সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবেশিল।
ত্রিপুরা-সুন্দরী রাণী হস্তী সোয়ার হৈল।
* * *
ছয় শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুরা যখন (১২৪০ খৃঃ)
ত্রিপুরা-সুন্দরী রাণী করে এই রণ।"—ত্রিপুর বংশাবলী।

† কোন কোন পুরাণে এবং তুলসীদাসের রামায়ণে এক লক্ষ লোক রণক্ষেত্রে নিহত হইলে ঐরূপ কবন্ধ দেখা যায়, এই প্রবাদ পাওয়া যায়। রাজমালা-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন তাহা তাঁহার উক্ত রাজ্যসম্বন্ধীয় "মধ্যমণি"তে উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুবর্ণগ্রামের কোন রাজা।* পূর্ব্ববঙ্গে তখনও হিন্দু শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। কেশবসেন অথবা দনৌজ মাধব হয়ত এই সময়ে স্বর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন।

ছেংথোম্পার পুত্র আচোঙ্গ ফার সময়ে আর একটি প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। রাজার নাম অনুসারে শুধু "মা রাণী" যোগ দিয়া মহারাজ্ঞীর নাম রচিত হইত, যথা আচোঙ্গের মহিষীর উপাধি হইল "আচোঙ্গ মা-রাণী", তৎপুত্র "খিচোঙ্গের" রাজ্ঞী "খিচোঙ্গ মা-রাণী" এই নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু এই প্রথা খুব দীর্ঘকাল ছিল না। আচোঙ্গরাজ জয়ন্তের (জৈন্তাপাহাড়) রাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং ত্রিপুর-রাজের সঙ্গে কাছাড়, মণিপুর ও জৈন্তাপাহাড়-রাজের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হইয়াছিল। আচোঙ্গ রাজার পুত্র ডাঙ্গর ফার ১৮টি পুত্র জন্মে; ইঁহাদের কাহাকে রাজ্যদান করিবেন, এই সমস্যায় তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন; অবশেষে স্থির করিলেন, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ তিনিই রাজ্যের অধিকারী হইবেন। বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিবার জন্য তিনি ১৮টি পুত্রকেই একস্থানে খাওয়াইতে বসাইয়া কুক্কুর-রক্ষককে ত্রিশটি অভুক্ত কুক্কুর ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরগুলি ছুটিয়া আসিয়া কুমারগণের পাত্রে মুখ দিল, সুতরাং তাঁহারা খাদ্যত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন; সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রত্ন ফা কিন্তু আসন ত্যাগ করিলেন না, কুক্কুর তদীয় অন্নপাত্রের সন্নিহিত দেখিয়া তিনি দূর হইতে ভাত ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, তাহাতে কুক্কুরগুলি দূরেই রহিয়া গেল, ইতিমধ্যে তিনি আহার সমাধা করিয়া ফেলিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রত্ন ফাকে গৌড়েশ্বরের সভায় পাঠাইয়া দিলেন এবং বাকী ১৭ জনের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া তাঁহাদিগকে "রাজাফা" নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধীনে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। রাজাফা যৌবরাজ্য পাইয়া "রাজনগরে" স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত স্থানগুলির শাসনভার অপরাপর কুমারদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন—(১) কাইচরঙ্গ (২) আচরঙ্গ (৩) তারক (৪) বিশালগড় (৫) ঘুটিমুড়া (৬) নাকি বাড়ী (৭) আগরতলা ("আগরফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল"—ডাঙ্গফাখণ্ড, রাজমালা) (৮) মধুগ্রাম (৯) ধর্ম্মনগর (১০) থানাংচি (১১) ধোপাপাথর (১২) লাউগঙ্গা (১৩) মোহিরীগঙ্গা (১৪) বরাক নদীতীর অবধি (১৫) তেলাইরঙ্গ (১৬) মণিপুর। রাজাফা—সকলের উপরে; তিনি রাজনগরে বাস স্থাপন করিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই প্রদেশগুলি এক বহু বিস্তৃত রাজ্যের সীমা প্রদর্শন করে। এক দিকে পদ্মানদী—অপর দিকে নাগা-পাহাড়। উত্তরে খাসিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণে সমুদ্র—মোটামুটি এই ভাবে সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

রত্নফা বহুসৈন্য ও ধনরত্ন লইয়া গৌড়ে গমন করেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ডাঙ্গরফার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ও মৈত্রী ছিল এবং রত্নফা তথায় থাকিয়া রাজনীতি শিখিতে পারিবেন,—

* "যে সময়ে এই বৃদ্ধ ত্রিপুরায় হইল।
গৌড়দেশে সেনবংশী রাজগণ ছিল।"—ত্রিপুর-বংশাবলী।

পিতা মহারাজের এই অভিপ্রায় ছিল। রত্নফার মাতা পুত্র-বিরহে যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া অনেক পল্লীগাথা রচিত হইয়াছিল ("তান মাতা মনঃ দুঃখে কাঁদিল বিস্তর। সে কথা গীতেতে গায় লোকে তত:পর। ত্রিপুরার কত বস্ত্র ছাগ অন্ত্রে বাজে। সেই যন্ত্রে গীত গায় ত্রিপুর সমাজে।"—রাজমালা, ডাঙ্গরফা খণ্ড)। গৌড়েশ্বর রত্নফাকে আশ্রয় দিলেন; তাঁহার সৈন্যেরা ঘুঘুরা-কীট মাটী হইতে ধরিয়া খাইত, এইজন্য গৌড়ীয়েরা তাহাদিগকে উপহাস করিত। গৌড়েশ্বর তাহা শুনিয়া রাজকুমারকে এজন্য একটু ঠাট্টা করেন। রত্নফা বলিলেন, "ত্রিপুরার ভদ্রসমাজে—রাজবংশে এরূপ আচার নাই। আমাদের রাজ্যের কুকী প্রজারা এইরূপ খাদ্য খাইয়া থাকে।" গৌড়েশ্বর এই উত্তরে প্রীত হইলেন, এবং কুকী, কিরাত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজার বাস-বিশিষ্ট ত্রিপুর-সাম্রাজ্যের বিশালতা অনুমান করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ হইলেন।

রত্নফার মাতার পুত্র-বিরহ, পল্লীগাথা।

গৌড়েশ্বর এবং রত্নফা।

একদা শুভ সোমবারে যথারীতি গৌড়ের বেশ্যারা রাজদর্শনার্থ রাজপ্রাসাদে সমাগত হইল। ইহারা সমারোহ করিয়া আসিতেছিল, কাহারও নফর চাকরেরা স্বর্ণখচিত নিশান লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে; কোন রমণী রত্নভূষিত বস্ত্র ও মণিমাণিক্যের গহনা পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে, কেহ শকটে চলিয়াছে; তাহাদের "প্রধানিকা" বহুমূল্যবস্ত্রাবৃত চৌদোলায় যাইতেছে, উৎসুক দর্শকগণ চৌদোলার নিকট ভিড় করিলে ছড়িদারেরা বেত্রাঘাত করিয়া জনতা ঠেকাইয়া রাখিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া কুমার রত্নফা প্রধানিকাকে গৌড়ের রাজ্ঞী মনে করিয়া সম্ভ্রমে যাইয়া অগ্রে দাঁড়াইলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। চতুর্দ্দিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। সেই প্রধানা গণিকার চক্ষেও হাসি খেলিয়া গেল; কুমারের সুশ্রী মূর্ত্তি ও বুদ্ধিহীনতা দেখিয়া তাঁহার কৃপা হইল। এই ঘটনা গৌড়েশ্বরের কাণে গেল। তিনি কুমারকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। লজ্জায় রত্নফার মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল; তিনি আড়ষ্ট ভাবে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, তিনি উঁহাকে মহারাজ্ঞী বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। বাদসাহ কুমারের এই নিষ্পাপ হৃদয়ের সারল্যে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ ম্লান দেখিতেছি, তোমার পিতা কি তোমাকে রীতিমত বৃত্তি পাঠান না।" রত্নফা বলিলেন, "আমি কনিষ্ঠপুত্র, পিতা আমাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠাইয়াছেন এবং অপরাপর ভ্রাতাদিগের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।"

গণিকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

গৌড়েশ্বর এই কথায় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে পিতৃরাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য বহু সৈন্যসমেত ত্রিপুরায় পাঠাইয়া দিলেন। "জমির খাঁর গড়ে" যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে ডাঙ্গরফা পরাস্ত হইয়া পর্ব্বতে পলাইলেন, তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই যুদ্ধ জয় করিয়া রত্নফা রাঙ্গামাটির অধিকার লাভ করিলেন; তৎপরে ক্রমে ক্রমে অপর সমস্ত ভ্রাতাকে জয় করিয়া সমস্ত ত্রিপুর-রাজ্য দখল করিয়া ফেলিলেন। এই সকল যুদ্ধ-সংক্রান্ত স্থানগুলি রাজমালায়

'জমির খাঁর গড়ে' যুদ্ধ।

উল্লিখিত আছে—যথা, থানাংচি, তৈতানব, ছাম্বের নদী (এইখানে ভ্রাতৃগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার মন্ত্রণা করেন), তৈলাইঙ্গ, কাবতৈ (এই স্থানে ভ্রাতারা বন্দী হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন), সমার (এই স্থানে এক রাজকুমারের শির কর্ত্তিত হইয়াছিল) (আমরা এখানে কালীপ্রসন্নবাবুর সহিত একমত হইয়া—মুড়া অর্থে পর্ব্বতের শৃঙ্গ মনে করিতে পারি না), তৈলাইকঙ্গ (এই স্থানে ভ্রাতারা খাদ্যাভাবে কদলীর খোসা খাইয়াছিলেন)।

যুদ্ধ জয় করিয়া রত্নফা গৌড়েশ্বরকে বহু হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন প্রদান করেন। রত্নফা গৌড়েশ্বর হইতে "মাণিক্য" উপাধি প্রাপ্ত হন। রত্নফার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ ১৩৬৩ খৃঃ অব্দ। স্থলতান সামস্থদ্দিন ১৩৪৭ খৃঃ হইতে ১৩৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার জাজনগর (ত্রিপুরা) আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ ও হস্তী পাওয়ার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। স্থতরাং খুব সম্ভব স্থলতান সামস্থদ্দিন হইতেই ত্রিপুরার রাজাদের 'মাণিক্য' উপাধি চলিয়া আসিয়াছে। মহারাজ রত্নমাণিক্যের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের এই সৌহার্দ্দ্যের হেতুতে তিনি বাঙ্গলা হইতে ১০,০০০ ঘর বাঙ্গালী লইয়া গিয়া তথায় তাঁহাদিগকে উপনিবিষ্ট করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি বঙ্গে স্বর্ণগ্রাম হইতে ৪,০০০ সেনা ও বহু ভদ্রলোক লইয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। রাঙ্গামাটিতে তুই হাজার ঘর, রত্নপুরে এক হাজার, যশপুরে ৫০০ এবং হীরাপুরে ৫০০ ঘর বাঙ্গালী উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে সৈন্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। রত্নমাণিক্যের সময় হইতে বাঙ্গালীর সঙ্গে এই ভাবে ত্রিপুরার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় তথায় এদেশের শিক্ষাদীক্ষা প্রবেশের পথ স্থগম করিয়া দিয়াছিল।

স্থলতান সামস্থদ্দিন।

মাণিক্য উপাধি।

বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমাণিক্য

দ্রুহ্যু হইতে ১৪১ স্থানীয় মহামাণিক্যের পুত্র মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য প্রথম-যৌবনে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। কাশীতে কৌতুক নামক এক ব্রাহ্মণ, ইনি রাজা হইবেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য অতঃপর দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজা হইলেন। তিনিই ত্রিপুর-ভাষা হইতে রাজমালা বাঙ্গলা পয়ারে অনূদিত করাইয়াছেন। "পূর্ব্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে। পয়ারে গাথিল সব সকলে বুঝিতে। স্থভাষাতে

ধর্ম্মমাণিক্য—১৪৩১ খৃঃ-১৪৬২ খৃঃ।

ধর্ম্মরাজ রাজমালা কৈল। রাজমালা বলিয়া লোকেতে নাম হৈল।" এতদ্দ্বারা বোঝা যায় ত্রিপুরার বৃহৎ সাম্রাজ্যে তখন বাঙ্গলা ভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। ধর্ম্মমাণিক্যের সময়ে বহু দীঘি খনন করা হইয়াছিল। কুমিল্লার বৃহৎ "ধর্ম্মসাগর" এই রাজার প্রধান কীর্ত্তি। ইনি বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। একখানি তাম্রপত্রের কতকাংশ রাজমালায় উদ্ধৃত হইয়াছে—উহা ১৩৮০ (১৪৫৮ খৃঃ) শকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ত্রিলোচন রাজার সময় হইতে ১০জন সেনাপতির উপর সৈন্যবিভাগের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র প্রতাপমাণিক্য অত্যাচারী হওয়ায় সেনাপতিগণ তাঁহাকে হত্যা করে; ধাত্রী তৎকনিষ্ঠ ধন্যকে লুকাইয়া রাখেন—বালক তখন একাদশবর্ষীয় ছিলেন। পুরোহিত ইহাকে লইয়া আসেন এবং সেনাপতিরা ইহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। প্রধান সেনাপতি ইহাকে স্বীয় কন্যা দান করেন। ইনিই ত্রিপুরার ইতিহাস-বিশ্রুত রাজ্ঞী কমলা দেবী। ধন্যমাণিক্য সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অল্প বয়সেই প্রবীণের ন্যায় অভিজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন। ইনিই ত্রিপুর-রাজ্যের অবিসংবাদিতভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। ইহার পুরোহিতই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, রাজমালায় ইহাকে বলি রাজার পুরোহিত ভার্গবের সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে। প্রথমে রাজার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইল, সেনাপতিদিগকে খর্ব্ব করা।

প্রতাপমাণিক্য (কয়েক মাস)।

ধন্যমাণিক্য—১৪৯০ খৃঃ-১৫১৫ খৃঃ।

প্রত্যেক সেনাপতির অধীন ৫,০০০ সৈন্য ছিল, সুতরাং ১০ জন সেনাপতি ৫০ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এই দশ জন সেনাপতির ভ্রূভঙ্গীতে রাজাকে উঠিতে বসিতে হইত। পুরোহিত রাজাকে উপদেশ দিলেন, "কোলাহল কি কারণে বাড়াইতে চাহ। নখে ছেদি বৃক্ষে, কেন কুঠার লাগাহ। মহা ব্যাধি জন্মে যদি অধিকাঙ্গ হয়। বিকৃতি আকার দেখি লজ্জা যে জন্মায়। অস্ত্র দিয়া ছেদ করি তারে যদি ফেলে। তবে তাকে উপহাস না করে সকলে। অতি শিষ্ট না হইবে নাতিক্রোধমতি। এই মতে বুঝায়েছে শুক্র বৃহস্পতি। রাজসিক ভাব যদি রাজার না হয়। অতি শিষ্ট হৈলে তাঁর জীবন সংশয়॥" (রাজমালা, ধন্যমাণিক্যখণ্ড)। পুরোহিতের উপদেশে রাজা তিন মাস কাল অন্তঃপুরে থাকিয়া মল্লবিদ্যা শিখিতে লাগিলেন, তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ ও বিশাল হইল। পীড়ার ভান করিয়া ইনি কাহারও সহিত দেখা করিতেন না, এমন কি মহারাজ্ঞী কমলা দেবীও তথায় ঢুকিতে পারিতেন না। অতঃপর একরাত্রে সেনাপতিদিগকে রাজদর্শনের অনুমতি দেওয়া হইল; রাজগৃহে ৩০।৪০ জন গুপ্তঘাতক প্রস্তুত ছিল। সেনাপতিরা যখন রাজাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া যাইবেন, তখন গুপ্তঘাতক-দল রাজার ইঙ্গিতে তাঁহাদের প্রত্যেককে বধ করিল। এই সেনাপতিগণের বল-দৃপ্ত মণ্ডলী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রাজা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অলস্ত ভাস্করের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সেনাপতিদিগকে হত্যা।

সেনাপতিগণের গৃহ লুণ্ঠিত হইল, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণকে পর্য্যন্ত বধ করা হইল এবং তৎস্থলে স্বীয় আয়ত্ত ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাধীন সেনাপতি নিযুক্ত হইল। কথিত আছে,

ধন্যমাণিক্যের বার কোটি পদাতিক সৈন্য ছিল। এই বর্ণনা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত। সেনাপতিগণের উপাধি হইল "বড়ুয়া"; এই দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবল লইয়া ত্রিপুরেশ্বর মেহেরকুল, পাটীকারা, গঙ্গামণ্ডল, বাগসারি প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশঃ বঙ্গদেশের নিম্নভূমির প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বেজুরা, ভানুগাছ প্রভৃতি দেশের জঙ্গল কাটিয়া তিনি আবাদ করাইলেন। অবশেষে গৌড়েশ্বরের রাজ্যান্তর্গত বরদাখাত পরগনা বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। বরদাখাতের রাজা প্রতাপ গৌড়েশ্বরকে অগ্রাহ্য করিয়া ধন্যমাণিক্যের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। কেবল বিদ্রোহী রহিল খণ্ডল; এই রাজ্যও গৌড়েশ্বরের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দ্বাদশ 'বসিক' বা মণ্ডলেশ্বরের দ্বারা শাসিত হইত। ধন্যমাণিক্য তথায় এক সেনাপতি পাঠাইয়া তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। বসিকেরা ইহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গৌড়েশ্বরের দরবারে হাজির করাইলেন। হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার হুকুম হইল। কিন্তু এই দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি খড়্গদ্বারা বিশজন সেনাকে হত্যা করিয়া হস্তীর শুণ্ডের উপর ক্রমাগত খড়্গাঘাত করিতে লাগিলেন। হস্তী ছুটিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু সেনাপতির খড়্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—এই অবস্থায় তাঁহাকে অন্য হস্তীর পদতলে ফেলিয়া বধ করা হইল। রাজমালায় লিখিত আছে, এই অদ্ভুত কর্ম্মী সেনাপতির বীরত্বের কথা শুনিয়া কেন ইহাকে হত্যা করা হইল বলিয়া গৌড়েশ্বর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ধন্যমাণিক্যের ক্রোধ কালানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মনের ভাব সংবরণ করিতে পারিতেন। স্বীয় ক্রোধ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি খণ্ডলের বসিকদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজধানীতে ডাকাইয়া আনিয়া কৌশলে প্রত্যেকটিকে হত্যা করিয়া খণ্ডল নির্ব্বিবাদে অধিকার করিলেন। ধন্যমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন "চয়চাগ"; ইনি খণ্ডলবাসীদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থকে বৃক্ষপত্র পরাইয়া ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বরদাখাত দখল।

সেনাপতি চয়চাগ।

ধন্যমাণিক্য তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে জাতিভেদের বৈষম্য ভালবাসেন নাই। সমস্ত সৈন্যকে একত্র করিয়া একদা এক মহোৎসব করিয়াছিলেন। পঙ্‌ক্তি অনুসারে যখন তাহারা খাইতে বসিয়াছিল, তখন কতকটা খাওয়ার পর এক হীনকুল-জাত কুকী-সরদার তাহাদিগের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার ছলে একটা কাঠি দিয়া সকলের মস্তক স্পর্শ করিল। স্বয়ং মহারাণী কমলাদেবী এই ভোজন-ব্যাপারের পরিদর্শিকা ছিলেন। রাজভয়ে কুকীদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না এবং ভোজন-ব্যাপারও ক্ষান্ত করিতে পারিল না। এই সকল সৈন্য "কাঠি ছোঁয়া" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সময়ে একটি শ্বেত হস্তীর অধিকার লইয়া আসামের (হেরম্ব দেশ) রাজার সহিত ধন্যমাণিক্যের বিরোধ উপস্থিত হইল। ধন্যমাণিক্য কাছাড়ের প্রসিদ্ধ থানাংছি দুর্গ অবরোধ করিলেন, এই গড় উচ্চ পাষাণ-নির্ম্মিত এবং দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। আট মাস কাল সেনাপতি চয়চাগ দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিলেন, তথাপি আসাম-সৈন্য

সৈন্যগণের মধ্যে জাতি-ভেদ বিলোপ, কাঠি ছোঁয়া।

পরাভব স্বীকার করিল না। একদা ত্রিপুর-সৈন্য একটা গোসাপ ধরিল, পার্ব্বত্য-প্রদেশের গোধিকা—মহাকায় ও প্রবল শক্তিশালী। কথিত আছে, এই অদ্ভুত জীব দৈর্ঘ্যে আট হাত ও প্রস্থে তিন হাত পরিমিত ছিল। চয়চাগ ইহাকে ধরিয়া ইহার পুচ্ছের সহিত বেত্রের রজ্জু বাঁধিয়া দুর্গ-প্রাচীরের উপরে উঠিতে সৈন্যদের তাড়না করিলেন, সেই বেত্র ধরিয়া একটি করিয়া সৈন্যেরা ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। তখন গভীর রাত্রি, আসামসৈন্য এই কার্য্যের কিছুই জানিত না। ত্রিপুর-সৈন্য দুর্গ-প্রাকারের সর্ব্বোচ্চস্থানে রজ্জু আটকাইয়া ফেলিয়া বন্যার মত থানাংছি গড়ে ঢুকিয়া পড়িল। দুর্গ অধিকৃত হইয়া গেল। থানাংছির সৈন্যেরা এত কাল দুর্গের প্রাচীরের ঊর্দ্ধদেশে বসিয়া নিম্নস্থিত ত্রিপুর-সৈন্যের দিকে পা ঝুলাইয়া দিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিত, এইবার তাহারা শাস্তি পাইল। থানাংছি গড় ত্রিপুরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে ইহার নাম হইল "ত্রিপুরা-পুরী।" এই দুর্গবিজয় সম্বন্ধে নানা কথা রাজমালায় আছে। আট মাস ধরিয়াও যখন সেনারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন চয়চাগ রাগিয়া সৈন্যদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা পুরুষ নও—মেয়ে মানুষ, চরকা হাতে লইয়া অন্তঃপুরে যাও।" তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া শিবিরে ঘুমাইত দেখিয়া তিনি চালে ফুটো করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সারা রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া ত্রিপুর-সৈন্য ঘুমাইতে পারিত না। যাহা হউক অবশেষে দুর্গ জয় করিয়া চয়চাগ থানাংছি গড় নররক্ত রঞ্জিত করিলেন,—ত্রিপুর-সৈন্য নারীগণকে লুণ্ঠন করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিল। চয়চাগ ইহার পরে পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পাহাড়-বাসী লোকদিগকে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন করিলেন। সাম্বুল নামক স্থানে স্বীয় শিবির স্থাপন করিয়া 'ছাইমার', 'ছাইবেম', 'ছাকাচেঙ্গ', 'থামাচেব', 'বাঙ্গ', 'রঙ্গ', 'ছাকা', 'রাঙ্খল', 'থামা', 'গুণৈছা', 'থচুং', 'মাছিল', 'রাঙ্গারব' প্রভৃতি জাতীয় টিপ্রাগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, তাহারা সকলে আসিয়া রাজধানীতে স্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিসহ ভেট পাঠাইল। ত্রিপুরার রাজধানীতে "সহস্র সহস্র কুকী আসিল দিগম্বরা"—ইহারা 'গজদন্ত', 'গবয়'; 'ছাগ', 'কাংস্য', 'বাঙ্গ', 'যোঙ্গ', 'রক্ত-কৃষ্ণ-শ্বেত-বস্ত্র', 'কাংস্য থালি', 'পিকদানী', 'তামার কঙ্কণ,' 'উবাফেক জলপাত্র', 'কিরাতিয়া খড়্গ', 'পিত্তল ও কাঁসার ঝারি' প্রভৃতি ভেট লইয়া আসিয়াছিল। ধন্যমাণিক্য অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যখন কোন কোন সভাসদ্ সেনাপতি চয়চাগের দুই বৎসরের অনুপস্থিতি এবং আসামের বড়ুয়া কন্যাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় কালাতিপাত সম্বন্ধে দুই একটি ইঙ্গিত করিল, তখন রাজা একটু হাসিলেন মাত্র। বস্তুতঃ চয়চাগকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

থানাংছি দুর্গ অধিকার।

দিগম্বর কুকীদের বশ্যতা স্বীকার।

ইহার পর চট্টগ্রাম বিজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধন্যমাণিক্য সৈন্য পাঠাইলেন। হুসেন সাহের একদল সৈন্য সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ধন্যমাণিক্যের সৈন্যেরা তাহাদিগকে জয় করিয়া ১৪৩৪ (১৫১৩ খৃঃ) অব্দে চট্টগ্রাম ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্গত করিল। হুসেন সাহ এই সংবাদ পাইয়া গৌড়মল্লিকের অধীন বহু সৈন্য দিয়া ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। এই সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে 'বার

হুসেন সাহের সঙ্গে বিরোধ।

ভূঞা'দের সৈন্যেরাও ছিল "(বার-বাঙ্গলা সৈন্য গৌড়মল্লিক সঙ্গে)"—গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের অবধি ছিল না। মেহেরকুলে প্রথম যুদ্ধ হইল। ত্রিপুরার সৈন্যেরা এই যুদ্ধে পরাস্ত হইল, মেহেরকুল পাঠানেরা দখল করিল। হটিয়া গিয়া ত্রিপুর-সৈন্য চণ্ডীগড়ে আশ্রয় লইল, গৌড়মল্লিক কিছুতেই দুর্গ জয় করিতে পারিলেন না। ধন্যমাণিক্য গোমতীর একটা দিক্ সোনা মুরার মাটি কাটিয়া ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন। এই নদী স্বল্পায়তন এবং অগভীর—কিন্তু খুব বেগশীলা। পাঠানেরা নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিল—এদিকে এক রাত্রে ধন্যমাণিক্য সেই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পাঠান সৈন্য বহু সংখ্যক ডুবিয়া মরিল। তখন ত্রিপুরেশ্বর শত্রুজয় কামনা করিয়া অভিচারের অনুষ্ঠান করিলেন। একটা চণ্ডালের মুণ্ড কাটিয়া অর্দ্ধরাত্রে এই অনুষ্ঠান করা হইল, ত্রিপুর-সৈন্য সেই অভিচার-দর্শন করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। পাঠানেরা ভাবিল বহু সৈন্য লইয়া বিজয়োল্লাসে ত্রিপুরগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল এবং গৌড়মল্লিক পরাস্ত হইয়া হুসেন সাহের দরবারে অবমানিত হইলেন। এই যুদ্ধ জয় করিয়া ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় সেই দেশ অধিকার করেন,—সেইখানে সেনাপতি "রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ"কে শাসন-কর্ত্তা নিয়োগ করিয়া ধন্যমাণিক্য রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এই রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ—আরাকান (রসাঙ্গ) স্বয়ং অধিকার করিতে অসমর্থ হন। রাজা রায়চাগ ও রায় কছুম এই দুই সেনাপতিকে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এইবার চট্টগ্রাম ও সমস্ত আরাকান প্রদেশ (১৪৩৭ শক, ১৫২৫ খৃঃ) অধিকৃত হইল।

গৌড়-মল্লিকের অপমান।

চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয়।

হুসেন সাহ একশত হস্তি-আরোহী, পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ তাঁহার প্রিয় সেনাপতিদ্বয় হৈতেন খাঁ ও করা খাঁকে ত্রিপুরা বিজয় করিতে পাঠাইলেন। "দ্বাদশ বাঙ্গলা (বার ভূঞার সৈন্য সামন্ত) চলে হৈতেন খাঁ সহিতে।" সরাইলের পথে ত্রিপুর-সৈন্য হটিয়া গেল। পাঠানেরা অগ্রসর হইয়া জামির খাঁর গড়ে উপস্থিত হইল। ত্রিপুর-সেনাপতি খড়্গরায় বহু যুদ্ধ করিয়াও সেই দুর্গ রাখিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বে পাঠানেরা কৈলাগড় ও বিশালগড় দখল করিয়াছিলেন, সুতরাং বিজয়ী পাঠান সৈন্য আরো উত্তরে অগ্রসর হইয়া ছয়রিয়াগড়ে যাইয়া রাজ-সেনাপতি গগন খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিল। তিন প্রহরব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের পর গগন খাঁ পরাস্ত হইলেন। ধন্যমাণিক্য যশপুর ছাড়িয়া রাঙ্গামাটীর দিকে হটিয়া চলিলেন। গঙ্গানগর পাড়ি দিয়া রাজা ডোমঘাটিতে শিবির স্থাপন করিলেন। হৈতেন খাঁ স্থপতি ডাকিয়া সেই স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড় নির্ম্মাণ করাইলেন। এদিকে গোমতীর জল ত্রিপুরার লোকেরা বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়া হৈতেন খাঁ দুই প্রহরের মধ্যে সেই স্থানে এক দীঘি খনন করাইলেন। ডোমঘাটিতে ডোম-মেয়েরা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান জানিত—কথিত আছে, তাহারা মানুষ খাইত, লোকেরা তাহাদিগকে ডাইনি বলিত। প্রধানা ডাইনি "বসাগমা-যুবতী" রাজার আজ্ঞায় সাত দিন

ত্রিপুর-সৈন্যের উপর্য্যুপরি পরাজয়।

গোমতীর জল বাঁধিয়া রাখিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল ও দুইটি কুলা বাহুমূলে বাঁধিয়া স্বত্র-যোগে উহা উড়াইয়া দিল। সেই কুলা ২০০ হাত উচ্চে উঠিয়া নদীতে পড়িয়া গেল। যেরূপেই হউক, এই ডাইনীরা নদীর জলের নানা সন্ধান জানিত। হয়ত যেখানে জল খুব কম, সেখানে কৃত্রিম কোন উপায় করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে জল অন্যদিকে অগোচরে সরিয়া যাইত।* হঠাৎ গোমতীর একটা জায়গায় চড়া পড়িল। হৈতেন খাঁ উহা ভগবানের দান মনে করিয়া সেই চড়ার উপর শিবির স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে লাগিলেন। এদিকে ত্রিপুর-সৈন্যেরা বহু কদলী তরু কাটিয়া শত শত ভেলা তৈরি করিল। প্রত্যেকটি ভেলার উপর তিন তিনটি কৃত্রিম মনুষ্যমূর্ত্তি, এক একটির হাতে দুইটি করিয়া বুন্দা (মশাল)। হঠাৎ গোমতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া সুখ-শয়ান পাঠানগণের শিবিরে ইহারা জল প্রবেশ করাইয়া দিল। চড়া ভাসিয়া গেল, হস্তী অশ্ব সৈন্য সকলে জলে ডুবিল। এদিকে মশাল-হস্তে মনুষ্যমূর্ত্তি ভেলার উপরে; শত সহস্র মশালের আলোতে পাঠানেরা দেখিল যেন শত্রুরা আসিতেছে, পশ্চাতে সহস্র সহস্র সত্যকার সৈন্য—এদিকে বাঁধ ভাঙ্গার দরুন পার্ব্বত্য গোমতী নদীর প্রবল বেগ। সম্মুখের দিকে ভীষণ অরণ্যে ত্রিপুর-সৈন্যেরা আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। দাবদাহে বৃহৎ বৃক্ষাদি পুড়িয়া যাইবার ভীষণ শব্দ, জলের উৎকট কল্লোল, ও ত্রিপুর-সৈন্যের গর্জ্জন! হৈতেন খাঁ ও করা খাঁ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেলেন, এবং হুসেন খাঁর দরবারে অবমানিত হইলেন। যে স্থানে পাঠানেরা ত্রিপুর-সৈন্যের বুদ্ধি-কৌশলে এরূপ অভূতপূর্ব্বভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন, সে স্থানের নাম বলগমা। মহারাজ ধন্যমাণিক্য যুদ্ধ জয় করিয়া সে স্থানে চতুর্দ্দশ দেবতার ঘটা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় সহস্র সহস্র বাঙ্গালীকে বলি দেওয়া হইত, ধন্যমাণিক্য এই বলি বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজার আদেশে বলির এইরূপ ব্যবস্থা হইল:—১৪ দেবতার তিন বৎসর পরে একটি নরবলি, কালীমন্দিরে এক নরবলি, "দৌচা পাথর" নামক দেবতার স্থানে দুইটি নরবলি কিন্তু তাহাও শত্রুপক্ষীয় লোক পাইলে হইবে। "ইহার অধিক বলি মানা করে রাজা।" ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রামে দুই মন সোনা দিয়া ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কুকীদের এক জাগ্রৎ শিবলিঙ্গ আছে জানিয়া তিনি তাঁহার জামাতা হেপাকলাউকে তাহা আনিতে পাঠান। কুকীরা ইহাকে হত্যা করাতে এই দুষ্কার্য্যের নেতৃবর্গ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

অদ্ভুত উপায়ে গোমতীর জল বাঁধা।

হৈতেন খাঁ ও করা খাঁর পরাজয়।

মনুষ্য-বলি নিষেধ।

দুই মন সোনার ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি।

* বঙ্গদেশের কোন একখানি ইতিহাসে আমি পড়িয়াছিলাম একটা নদীর নীচে কৌশলপূর্ব্বক লৌহ-দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা বন্ধ করিলে নদীর গতি থামিয়া যাইত; এতৎসংক্রান্ত নোটটি আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। গোমতী নদীর বাঁধ সেইরূপ কোন উপায়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

ধন্যমাণিক্য যেমন বীর ছিলেন, তেমনই রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন; তিনি সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। "শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা—কমলার পতি। উৎকল-খণ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি॥ জ্যোতিষে যাত্রা-রত্নাকর-নিধি আর। পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার॥ ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি। রাজ্যেতে শিখায় গীত নিত্য নৃপমণি॥ ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়। ছাগ শৃঙ্গে তার যন্ত্র ত্রিপুরে বাজায়॥" (ধন্যমাণিক্য খণ্ড।) রাম নামক এক কবির দ্বারা তিনি 'প্রেত-চতুর্দ্দশী' নামক পুস্তক রচনা করাইয়াছিলেন, এই কাব্যখানি তাঁহার প্রিয় ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইনি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলারই বেশী প্রচলন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, এইজন্য তিনি 'স্বভাষা'—বাঙ্গলা ভাষাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী কমলা তাঁহার যোগ্যা ছিলেন, "মহারাণী কমলা নাম পৃথিবীতে ধন্যা"—ইহার সম্বন্ধে অনেক পল্লীগীতি ত্রিপুরার সর্ব্বত্র গীত হইত। ধন্যমাণিক্য অনেক দীঘি, দেব-মন্দির ও মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে রাজারা মঠ-মন্দির ও বিগ্রহ-নির্ম্মাণে যে কিরূপ মুক্তহস্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যের জন্য চেষ্টিত ছিলেন, তাহা ধন্য-মাণিক্যের একটি কার্য্যে প্রতীয়মান হইবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধন্যমাণিক্য কয়েকটি মঠ নির্ম্মাণ করান। তিনি স্থপতিকে বলিয়াছিলেন, তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যেন সেই মঠগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে। কার্য্য সমাধা হইলে রাজা কারিগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে যাহা করিয়াছে তাহা হইতে আরও ভাল করিতে পারে কি না। স্থপতি একটি বক্র হাসিরেখা অধর-প্রান্তে টানিয়া বলিল, "অবশ্য পারি।" রাজা বলিলেন, "তোমাকে যথাসাধ্য করিতে বলিয়াছি, যত অর্থ হয়, দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তথাপি তোমার বিদ্যার কতকটা পেটে রাখিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়াছ।" রাজা তরবারি দ্বারা তখনই তাহার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলায় পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ধন্যমাণিক্যের মত এত বড় রাজা এদেশে হয় নাই। তাঁহাকে এই যুগের "সমুদ্রগুপ্ত" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উৎকলখণ্ড পাঁচালী।

প্রেত-চতুর্দ্দশী।

পল্লী গাথা।

স্থপতির মুণ্ডচ্ছেদ।

ধন্যমাণিক্যের পর ধ্বজমাণিক্য ৬ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎকনিষ্ঠ দেবমাণিক্য তুলুয়া দখল করেন। দেবমাণিক্য তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। মিথিলাবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক দুষ্ট তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, সে তান্ত্রিককার্য্যে শ্মশানে মহারাজের সহযোগিতা করিত। দেবমাণিক্য ইহার হস্তে নিহত হন। প্রধানা রাজ্ঞী সহমৃতা হন এবং তৎপুত্র যুবরাজ বিজয়কুমারকে বন্দী করিয়া হীরাপুরে রাখা হয়,—দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর পুত্র নামে মাত্র রাজা হন—সেই ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণই রাজত্ব করিতে থাকে। এক বৎসর কাল এই দুরাচার ব্রাহ্মণ রাজ্য করিতেছিল। প্রজারা ক্ষেপিয়া যায় এবং

দেবমাণিক্য—১৫২২-১৫২৭ খৃঃ।

প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ কৌশল-ক্রমে ব্রাহ্মণকে বধ করেন। বিদ্রোহী প্রজারা শিশু রাজা ইন্দ্রমাণিক্যকে আছাড় দিয়া হত্যা করে, এবং সমস্ত প্রজারা রাজ-অন্তঃপুর ঘের দিয়া পাপিষ্ঠা রাজমাতাকে সংহারপূর্ব্বক হীরাপুর বন্দীশালা হইতে বিজয়মাণিক্যকে আনিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করে।

দুরাচার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়মাণিক্য সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দেখিলেন, সমস্ত ক্ষমতাই দৈত্যনারায়ণের হাতে, এমন কি বাদ্যভাণ্ড বাজাইবার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতাও রাজার নাই। দৈত্য-নারায়ণের ভ্রাতা দুর্লভ নারায়ণের অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত হইল। শাক-বেচা এক রমণীকে সুন্দরী দেখিয়া দুর্লভ বলপূর্ব্বক লইয়া আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিল। সেই রমণীর স্বামী রাজার কাছে নালিশ করিল। রাজা চেষ্টা করিয়াও দুর্লভের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। রাজা দৈত্যনারায়ণের কন্যা পুণ্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার ইঙ্গিতে তাঁহার জামাতা মাধব দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করিয়া সেই গৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন—এবং প্রচার করিলেন অগ্নিদাহে দৈত্যের মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজ্ঞী পিতৃহন্তা মাধবকে ছলনাপূর্ব্বক ডাকাইয়া হত্যা করিলেন। রাজা পুণ্যবতীকে এই অপরাধে নির্ব্বাসন করিয়া দ্বিতীয় মহাদেবী গ্রহণ করিলেন। বিজয়মাণিক্যকে সার্ব্বভৌম রাজা স্বীকার করিয়া খাসিয়া পাহাড়ের রাজা, শ্রীহট্টের রাজা, জয়ন্তীর রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে আবার পাঠানদের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল। সোলেমান কররানী তাঁহার শ্যালক মমারক খাঁকে বহু সৈন্য দিয়া চট্টগ্রামে পাঠান। প্রথম কয়েকবার পাঠানদিগের জয় হইয়াছিল। রাজার সেনাপতি কালা নাজির যুদ্ধে নিহত হইলে, ত্রিপুরেশ্বর সেনাপতিদিগকে চরকা পাঠাইয়া দিলেন (অর্থাৎ তোমরা চরকা কাট গিয়া, যুদ্ধের যোগ্য নও)। যাহা হউক প্রধান সেনাপতি গজভীম শেষে জয় লাভ করিয়া ঘোর অহংকৃত বাদসাহের শ্যালক মমারককে বন্দী করিয়া আনিলেন। ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে খুব আদর যত্ন দেখাইলেন, কিন্তু মমারক নৃপতিকে অভিবাদন বা নমস্কারাদি করিলেন না। রাজার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চন্তাই (পুরোহিত) মমারককে চতুর্দ্দশ

বিজয়মাণিক্য—১৫২৯-১৫৭০ খৃঃ।

খাসিয়া, শ্রীহট্ট ও জয়ন্তীর আনুগত্য স্বীকার।

সেনাপতি গজভীম কর্ত্তৃক সোলেমান কররানীর শ্যালক মমারক খাঁকে বন্দী করা ও কালীমন্দিরে বলি দেওয়া।
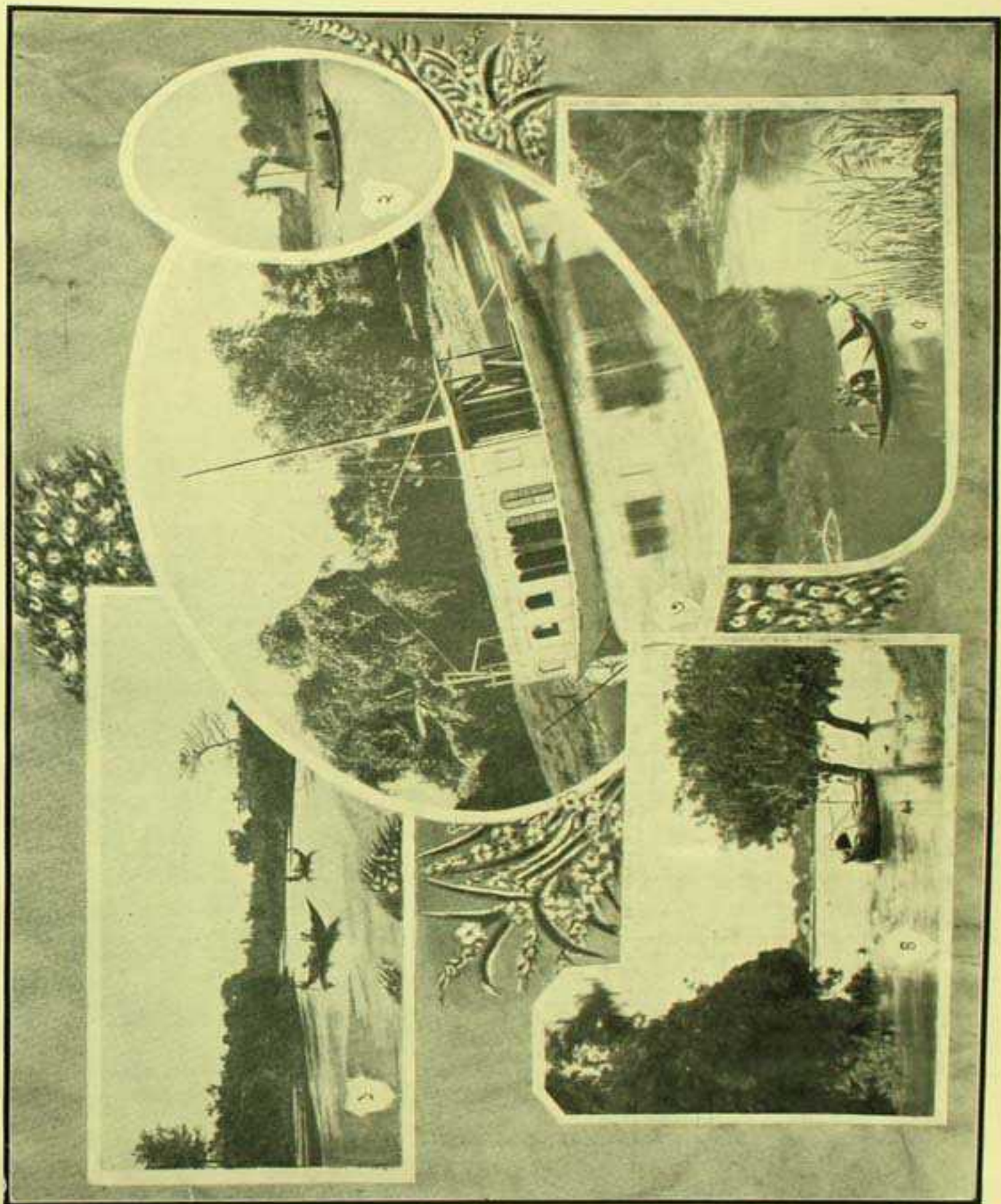
বিজয়-মাণিক্যের নৌ-বাতানের আদর্শ (১)।
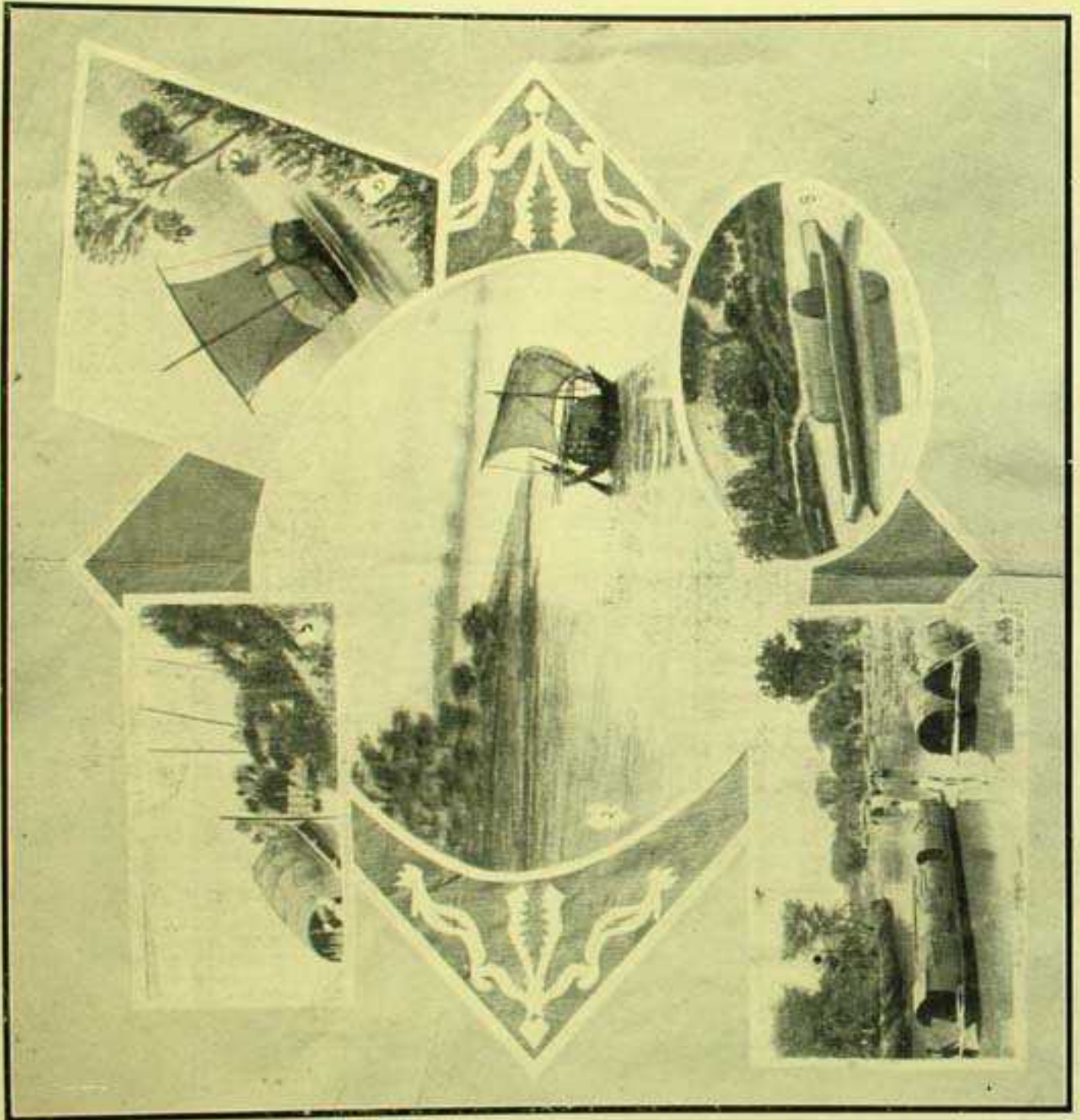
বিজয়-মাণিক্যের নৌ-বাতায়নের আদর্শ (২)।

দেবতার নিকট বলি দিলেন। বলির সময় পাঠান অধিনায়ক পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজার লোকেরা তাহা দেয় নাই। তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহাকে বলিল, "খাঁ সাহেব পূর্ব্বই বা কি পশ্চিমই বা কি, ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন"; তখন পূর্ব্বদিকেই তিনি মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার কর্ত্তিত মুণ্ড দেখিয়া রাজা অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যে বাদসাহের চিঠি আসিল—মমারককে ছাড়িয়া দিলে তিনি পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ত্রিপুরেশ্বরকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু যখন মমারকের হত্যা-সংবাদ পৌছিল, তখন রণদুন্দভি আবার বাজিয়া উঠিল। কিন্তু এই সময় দাউদ খাঁ বাদসাহ হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে জীবনপণ যুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্য এই সকল অন্তর্বিরোধ স্থগিত হইল। চট্টগ্রাম বিজয়ের পর বিজয়মাণিক্য দিগ্‌বিজয়ার্থ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হইলেন। কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইল না। সুবর্ণ-গ্রামে আসিয়া তিনি দেখিলেন, বিক্রমপুরের লোকেরা ত্রিপুর-সৈন্যদিগকে বিদ্রূপ করে। রাজা এক সহস্র টাকা ও এক এক খানি চতুর্দ্দোলা পাঠাইয়া কুলীন চৌধুরীদিগের সুন্দরী কন্যাদিগকে শয্যাসঙ্গিনী করিতে লাগিলেন। এই অভিযানের সময় বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রের উপরে এক সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কৈলাগড়ে তিনি একটি সুবৃহৎ খাল কাটাইলেন। উহা নদীর মতই হইল, এই নদীর নাম হইল "বিজয়-নন্দিনী"। তারপর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করাইলেন—ইহা "ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে পরিচিত হইল। জিনারপুরে তিনি আর একটি খাল কাটাইলেন, তাহার নাম হইল "ত্রিপুরার খাল"। বালিশিরা নামক এক স্থানে যাইয়া রাজা সেই স্থানের নাম 'বিজয়পুর' রাখিলেন।

বিজয়মাণিক্যের দিগ্বিজয়, ত্রিপুরার খাল, ত্রিপুরার জাঙ্গাল, 'বিজয়-নন্দিনী' ও 'বিজয়পুর'।

বিজয়ের দুই পুত্র—ভাঙ্গরফা ও অনন্ত। গণকগণ গণিয়া বলিল ভাঙ্গরফার 'ছেদ যোগ' আছে। রাজা তাঁহার বন্ধু উড়িষ্যার অধিপতি মুকুন্দদেবের নিকট জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহাকে বহু ধনরত্ন দিয়া বুঝাইলেন, জগন্নাথতীর্থে থাকিলে তাঁহার ইহকাল ও পরকালের সদ্গতি হইবে। মুকুন্দদেব রাজপুত্রকে আটখানি গ্রাম দিলেন। বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত সিংহাসনে আসীন হইলেন। বিজয়মাণিক্য মৃত্যুকালে ভিষক-শ্রেষ্ঠ বাছুরায়কে মিনতি করিতে লাগিলেন,"আমাকে বাঁচাইয়া দিন, আমি আপনার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণ দ্বারা জড়িত করিয়া দিব।" এই ভাবে রাজা ৪৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি দেখিতে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও অতি সুদর্শন ছিলেন। রাজমালায় বিজয়মাণিক্যের দিগ্বিজয় কৌতূহলপ্রদ ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহার বিখ্যাত অভিযানে ৫০,০০০ নৌকার এক বহর ছিল। প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া তথায় জয়ধ্বজ প্রোথিত করিয়া "পঞ্চদ্রোণা" নামক ব্রাহ্মণাধ্যুষিত গ্রাম স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি লক্ষ্যা পার হইয়া ইচ্ছামতি অতিক্রমপূর্ব্বক পদ্মাতীরে উপস্থিত হন। তিনি পথে পথে ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে তাম্রশাসনাদি দ্বারা বহু ভূমি ও স্বর্ণ দান করিয়া নির্দ্দয়ভাবে শত্রু দলনপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং মনে হয় তিনি সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। আবুল ফজল বিজয়মাণিক্যের নাম আইন

আকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন,—এই রাজার সমসাময়িক কাছড়ের রাজা নির্ভরনারায়ণ এবং জয়ন্তিয়ার রাজা বিজয়মাণিক।

অনন্তমাণিক্যকে তাঁহার শ্বশুর গোপীনাথ কৌশলক্রমে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন; তদুপলক্ষে গোপীনাথ-কন্যা মহারাজ্ঞী জয়া দেবীর যে তেজোগর্ভ উক্তি ও ব্যবহার রাজমালায় উক্ত আছে, তাহাতে এই মহীয়সী রমণীর পাতিব্রত্য, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গোপীনাথ ইঁহাকে জোর করিয়া সহমৃতা হইতে দেন নাই। গোপীনাথ পূর্ব্বে বিজয়মাণিক্যের সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। একদা তিনি এক ব্রাহ্মণের কুলগাছে উঠিয়া কুল পাড়াতে সেই ব্রাহ্মণের হাতে বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়াছিলেন। বিজয়-মাণিক্য ইঁহাকে 'বড়ুয়া'র পদ দিয়াছিলেন। শেষকালে ইনি মহারাজের রন্ধনশালার প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। অন্ন-পরিবেষণ-কালে রাজা ইঁহার হাতে রাজচিহ্ন দেখিয়া ইঁহাকে 'গোপীপ্রসাদ নারায়ণ' উপাধি দিয়া প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন, শুধু তাহাই নহে ইঁহার নিরুপমসুন্দরী কন্যা জয়াদেবীর সঙ্গে স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। এখন এই বিশ্বাস-হন্তা সেনাপতি স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিয়া "উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীন রাজধানী জয়াদেবীর ভর্ৎসনায় অতিষ্ঠ হওয়াতে, ইনি চন্দ্রপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অতীব অত্যাচারী রাজা ছিলেন। অরিভীম সেনাপতির পুত্র গরুড়ধ্বজ বহু রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। রাজার কাছে অভিযোগ আসিলে তিনি অভিযোগকারীর কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। ইঁহার স্বীয় মহলে ২৪০ জন রমণী ছিল। ইহাদিগকে ইচ্ছামত স্বীয় অন্তঃপুরে রাখিয়া তিনি শেষে যাকে তাকে বিলাইয়া দিতেন। ইঁহার পুত্রের অত্যাচার ততোধিক হইয়াছিল। রাজ্যের শাসন-গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে শুনিয়া মোগলেরা চট্টগ্রাম দখল করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। রাজা স্বীয় ভগিনীপতি রণাগণকে প্রধান সেনাপতি করিয়া তৎসঙ্গে চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, আওয়ান নারায়ণ, গজভীম নারায়ণ প্রভৃতি বীরদিগকে ৫২,০০০ সৈন্যসহ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কথিত আছে ইহাদের পরিচালক ৩,০০০ সেনাপতি ছিল। পিরোজখাঁ আরি এবং জামালখাঁ পনি এই দুই সেনাপতির হস্তে ত্রিপুর-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে ৪০,০০০ ত্রিপুর-সৈন্য এবং ৫,০০০ মুসলমান সৈন্য নিহত হয়; এইভাবে চট্টগ্রাম ত্রিপুর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে এই যুদ্ধ ঘটিয়া ছিল।

অনন্তমাণিক্য ও উদয়-মাণিক্য—১৫৭০-১৫৮৩ খৃঃ।

চট্টগ্রাম হইতে বেদখল।

উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্য রাজা হইয়া দেখিলেন—সমস্ত ক্ষমতাই সেনাপতি রণাগণের হস্তে। ইঁহাকে রণচতুর-নারায়ণের পুত্র বধ করেন। জয়মাণিক্য সেনাপতির দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল।

উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ১২ বৎসরের কিছু উর্দ্ধকাল। ইঁহারা ত্রিপুর-

রাজবংশের বাহিরের লোক, কিন্তু দেবমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য এইবার সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক পূর্ব্ব রাজবংশের যোগসূত্র পুনরায় স্থাপন করেন। ইনি এক "হাজরা"র স্ত্রীর গর্ভে মহারাজ দেবমাণিক্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া হাজরার সম্মতিক্রমে তাঁহারই গৃহে পালিত হন। এইবার সৈন্যসকল তাঁহাকে লইয়া আসিয়া রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। অমরমাণিক্যের প্রধান কীর্ত্তি "অমরসাগর।" এই দীঘি-খনন উপলক্ষে ত্রিপুর-রাজার পদমর্য্যাদা ও মহিমা কতকটা অনুভব করা যায়। দীঘি-খননের জন্য স্বনামধন্য ত্রিপুরপতি চাঁদরায় ৭০০, বাকলার বসু ৭০০, সলে গোয়ালপাড়ার গাজি ৭০০, ভাওয়ালের রাজা ১০০০, অষ্টগ্রামের জমিদার ৫০০, বানিয়াচঙ্গের জমিদার ৫০০, রণভাওয়ালের জমিদার ১০০০, সরাইলের ইসা খাঁ ১০০০ এবং ভুলুয়ার রাজা ১০০০ জন লোক দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্টের (তরাবের) পাঠান রাজা কোন সাহায্য করেন নাই। এজন্য অমরমাণিক্য এক বিপুল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, এই সেনার অধিনায়কগণের নাম রাজমালায় আছে—রণগিরি নারায়ণ, রণভীম নারায়ণ, রণজুঝার নারায়ণ, বীরঝম্প নারায়ণ, গজঝম্প নারায়ণ, অর্জ্জুন নারায়ণ, গজসিংহ নারায়ণ, ত্রিবিক্রম নারায়ণ, শত্রুমর্দ্দন নারায়ণ, সুপ্রতাপ নারায়ণ, হিঙ্গুল নারায়ণ, রণসিংহ নারায়ণ, সমরবীর নারায়ণ। ইহাদের সঙ্গে প্রথিতযশা ইতিহাস-বিশ্রুত ইসা খাঁও ছিলেন। এই দর্পিত অভিযানের উপলক্ষে ধর্ম্মমঙ্গলের বীরদিগের কথা মনে পড়ে—"সেনার প্রধান চলে সিতারাম ভূইঞা, যার ভরে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে মুইঞা।" অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর এই সৈন্যগণ পরিচালনা করিয়াছিলেন। সুর্ম্মা পার হইয়া ত্রিপুর-সৈন্য গোধারাণী গ্রামে যুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীহট্টের রাজা ফতে খাঁ বন্দী হইয়া ত্রিপুরায় আনীত হইয়াছিলেন, রাজা তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইসা খাঁকে বহু সৈন্যদ্বারা সাহায্য করাতে এই সেনাপতি মোগলদের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহার 'মছলন্দী' উপাধি আকবর দেন নাই, উহা ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্য দিয়াছিলেন।* ইসা খাঁ অমরমাণিক্যের রাজ্ঞীকে মাতৃসম্বোধন করাতে রাজা তাঁহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন, ইহার সবিস্তার বর্ণনা রাজমালায় আছে। সরাইল পরগনায় অনেক শিকারযোগ্য পশুপক্ষী আছে, এইজন্য যুবরাজ

উদয়মাণিক্য—১৫৮৫-১৫৯৬ খৃঃ, জয়মাণিক্য—১৫৯৬-১৫৯৭ খৃঃ।

অমরমাণিক্য—১৫৯৭-১৬১১ খৃঃ।

অমর দীঘি।

ভুলুয়া জয়—১৫৭৭ খৃঃ।

শ্রীহট্টের রাজা ফতে খাঁ বন্দী—১৫৮২ খৃঃ, ইছা খাঁ মছলন্দী, বাকলা বিজয়।

* নানা প্রমাণে প্রতিপন্ন হইতেছে ইসা (ইছা) খাঁ ত্রিপুর-রাজার প্রসাদেই উন্নতির পথে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা জঙ্গলবাড়ীর যে ইতিহাস প্রণয়নের সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থা সমস্ত চাপা দিয়া তাঁহাকে দাউদের ভ্রাতা দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে—তিনি নবাবপুত্র ছিলেন এবং আকবরের প্রদত্ত "মসনদআলি" উপাধি পাইয়া ছিলেন, সেই পুস্তকে এই সকল দাবী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় আমরা এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করিয়াছি।

রাজধর উঁহার প্রতি লুব্ধ হওয়াতে ইসা খাঁকে ঐস্থান ত্যাগ করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। অমরমাণিক্য ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জয় করেন, তৎপূর্ব্বে ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে ভুলুয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ভুলুয়ার অধিপতি দুর্লভরায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যশ্রেণীতে ৩০০ শত পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বয়ং সিংহরব নারায়ণ নামক সেনাপতির সঙ্গে ভুলুয়ায় ৩৬,০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া আসেন, তৎপরে বাকলার অধিপতি কন্দর্প রায়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করেন। সুপ্রসিদ্ধ অমর দীঘির কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এই দীঘি খনন করিতে তিনটি বৎসর লাগিয়াছিল; ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার খনন কার্য্য শেষ হয়। সেইখানে জগন্নাথ মঠ নির্ম্মিত হয় এবং মহারাজ ১৪খানি গ্রাম এই মঠে উৎসর্গ করেন "তদবধি চৌদ্দগ্রাম নাম তার হৈল।" অমরমাণিক্য স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার সভায় দুইশত ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করিতেন। অমরমাণিক্য 'ফুলকোয়াড়ি ছড়া'র নিকট দুইটি বটবৃক্ষে ভূতে আড্ডা করিয়াছে শুনিয়া সেই দুইটি বৃক্ষ কাটিতে আদেশ করেন; এসম্বন্ধে বহুলোকের ভয়প্রদর্শন ও নিষেধ তিনি শুনেন নাই। বৃক্ষ দুইটি কাটা গেলে সকলে দেখিল, ভূতের উৎপাত থামিয়াছে,—ভূতবল হইতে যে রাজবল বেশী তাহা লোকে বুঝিল। রাজার একবার উৎকট ব্যাধি হইয়াছিল,—এক দুষ্ট লোক প্রচার করিল, রাজা তাঁহার আরোগ্য কামনায় দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ১২৫টি শিশু 'ফুলকোয়াড়ির ছড়া'য় ডুবাইয়া পূজা দিবেন। ভয়ে সহস্র সহস্র লোক নিজ শিশুদিগকে লইয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল। রাজা সেই দুষ্ট লোককে দণ্ড দিবার জন্য ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন এবং প্রজাগণকে ধনরত্ন বিতরণপূর্ব্বক সেই মিথ্যা কথার অসারতা প্রমাণ করিলেন।

ভূতই বড় না রাজাই বড়।

আরোগ্যলাভ করিয়া অমরমাণিক্য আরাকান-বিজয়ে বহির্গত হইলেন। আরাকানরাজ ফিরিঙ্গিদের সহিত যোগ দিয়া প্রথমতঃ ত্রিপুর-সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অমরমাণিক্যেরই জয় হইল। এই যুদ্ধে অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর ও তাঁহার ভ্রাতারা অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয় হইল বটে, কিন্তু কনিষ্ঠ রাজপুত্র অমর-দুর্লভকে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল—রণক্ষেত্র খুঁজিয়া তাঁহার মৃতদেহ বা কর্ত্তিত-মুণ্ড না পাইয়া ত্রিপুর-সৈন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে দুই অশ্বারোহীর সহিত রাজপুত্র ঘোড়ায় বিদ্যুদ্-বেগে আসিয়া নিজ শিবিরে দেখা দিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতার্দ্র, হস্তে অসি এরূপ ভাবে মুষ্টিবদ্ধ ছিল যে শিরগুলি টানিয়া ধরায় সেই অসি হস্তে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সহজে খোলা গেল না—"অশ্ব হ'তে রাজপুত্র যখন নামিল। রক্তসমে হাতে খড়্গ তাতে না খসিল। উষ্ণজল দিয়া তারা হস্ত পাখালিল। তিন সোয়ারের হস্তের খড়্গ তখন খুলিল।" এই মহাযুদ্ধে কর্ণফুলির তীরে বহু মগ ও ফিরিঙ্গি সৈন্য নিহত হইয়াছিল। মগ-বিজয়ের পর অমরমাণিক্য উড়িষ্যার রাজাকে আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। উড়িষ্যারাজ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, উদ্যোগের জন্য কিন্তু সময় চাহিয়া লইলেন।

মগ-বিজয়।

ইতিমধ্যে সেকেন্দর সাহ নামক মগরাজ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ত্রিপুরসৈন্য মগদিগকে কাটিতে কাটিতে তাহাদের দুর্গ পর্য্যন্ত ধাবমান হইল, কিন্তু দুর্গাভ্যন্তর হইতে মগদিগের গোলাগুলি অজস্র ত্রিপুর-সৈন্যের উপর পতিত হইতে লাগিল। পঁচিশ বৎসর বয়স্ক মহাবীর রাজকুমার যুঝার সিংহের জয়মঙ্গল নামক হস্তী এক প্রচণ্ড গোলার আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া রাজপুত্রকে পদতলে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল, এবং স্বয়ং যুবরাজ রাজধর সিংহও উরু এবং উদরে গুলির আঘাত সহ্য করিলেন। ত্রিপুর-সৈন্যের সম্পূর্ণ পরাভব হইল। এদিকে মহারাজ সেকেন্দর সাহ রাজপুত্রকে তাঁহার সৈন্যেরা নিহত করিবে, ইহা কখনও ভাবেন নাই। দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া তিনি অনুকূল সন্ধির প্রস্তাব করিয়া অমরমাণিক্যের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অমরমাণিক্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি সেকেন্দরের সহিত পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মগেরা উদয়পুর পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া আসিল। হঠাৎ তাহারা উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিল। অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া রাজা বস্তা বোঝাই করিয়া কড়ি রাখিয়া ধনজন সহিত উদয়পুরের পার্ব্বত্য-জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেকেন্দর দুইজন "দেওড়াই"কে খুঁজিয়া পাইয়া তাহাদিগকে রাজা উপাধি দেওয়ার লোভ দেখাইয়া অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের সন্ধান পাইলেন এবং তাহা লুণ্ঠন করিলেন। ত্রিপুরা-রাজ্যের এই বিপদ্ ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয়। কুড়ামখী নামক এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তৃত্ব প্রদানপূর্ব্বক সেকেন্দর উদয়পুর ত্যাগ করিয়া যান। আরাকান-রাজ ইহার পর অমরমাণিক্যের নিকট দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করেন যে, যদি ত্রিপুররাজ আরাকানের বিদ্রোহী সেনাপতি আদম সাহকে প্রত্যর্পণ করেন, তবে তিনি উদয়পুরে আর কোন উৎপাত করিবেন না। রাজা অমরমাণিক্য উত্তরে লিখিলেন, "শরণাগত আদম সাহ না দিব কথনি। ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার। তুমি মঘ কি জানিবে আমা ব্যবহার। দৈব যোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে। আর দুইপুত্র আমা প্রধান যে আছে। তাহা দুই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত। তথাপি আদমে আমি না দিব নিশ্চিত।" পুত্র-বিয়োগ-দুঃখ-কাতর রাজা বিদ্রোহী শ্যালককে হত্যা করিয়া অনুতপ্ত হইয়া মনুনদীর তীরে আফিঙ্গ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহারাজ্ঞী স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন। পুত্র রাজধরমাণিক্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি সার্ব্বভৌম ও বিরিঞ্চি নারায়ণ নামক পরম বৈষ্ণব পুরোহিত ও ২০০ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সর্ব্বদা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। আটজন কীর্ত্তনীয়া দিনরাত্র কীর্ত্তন গান করিত; তিনি অনেক দানধ্যান করেন ও মঠমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৌড়ের বাদসাহ "দ্বাদশ বাঙ্গলা" (বারভূঞা) সমভিব্যাহারে এক দল সৈন্য ত্রিপুরা বিজয় করিতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কৈলাগড় পর্য্যন্ত আসিয়া রাজার বিপুল সৈন্য-বল দেখিয়া যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না, ফিরিয়া গেল। রাজধরমাণিক্য ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মগাধিপতি সেকেন্দরের বিজয়।

অমরমাণিক্যের অদ্ভুত সাহস ও আত্মহত্যা—১৬১১ খৃঃ।

রাজধরমাণিক্য ১৬১১-১৬২৩ খৃঃ।

তৎপুত্র যশোধরমাণিক্য ১৬২৩ খৃঃ অব্দে রাজা হইলেন—ইঁহার সময়ে ভুলুয়ার রাজা গন্ধর্ব্ব-নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ত্রিপুর-সৈন্যের জয়লাভ হইয়াছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর ইঁহার রাজ্যের সমস্ত হস্তী ও ঘোড়া চাহিয়া পাঠাইলে, ত্রিপুর রাজ উত্তর দিলেন, "হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কথন।" ইস্পিন্দার ও মুকল্যা নামক সেনাপতিদ্বয় ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইস্পিন্দার উদয়পুর রাজধানী অধিকার করিলেন, পলাতক যশোধরমাণিক্যকে মোগলেরা ধরিয়া আনিয়া ঢাকায় বন্দী করিয়া রাখিল। তথা হইতে ফতেজঙ্গ নবাব তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যশোধরমাণিক্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন এই বলিয়া মুক্তি পাইলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যশোধরমাণিক্য বাহাত্তর বর্ষ বয়সে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন।

* যশোধরমাণিক্য—১৬২৩

আড়াই বৎসর কাল বিজয়ী মোগলেরা উদয়পুর দখল করিয়া রাখিয়াছিল। "পাপিষ্ঠ মগল জাতি দুষ্ট দুরাচার। ধর্ম্মকর্ম্ম নিষেধিল নগর বাজার। যত কিছু বহে প্রজা উদয়পুরেতে। মোগলের সৈন্যে লুটে না পারে থাকিতে। চতুর্দ্দশ দেব পূজা নিষেধে যবন। কালিকা দেবীর পূজা করিল বারণ। অমরসাগর আদি যত সরোবর। খাল কাটিয়া শুকায় মগল বর্ব্বর। যত ধন আছিলেক উদয়পুর দেশ। সরোবরে লুকাইছে জানিয়া বিশেষ।" (যশোধরমাণিক্য খণ্ড।) কিন্তু মোগল সেনার মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কিছুতে তাহারা তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া মেহেরকুলে আসিয়া আস্তানা স্থাপন করিল। তখন সেনাপতি ও প্রজারা কল্যাণমাণিক্যকে রাজা করিয়া উদয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

যশোধরমাণিক্যের পূর্ব্বে যেরূপ ত্রিপুরারাজ্যে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও বীরের গর্জ্জন শোনা যাইত—তার পর হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের বেদপাঠ, খোলবাদ্য ও সংকীর্ত্তনের রোলই বেশী শোনা যাইতে লাগিল। কল্যাণমাণিক্য ত্রিপুর-রাজবংশীয় লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধাদি করিয়া বিরাগ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি গুরুর চরণে ধনুর্ব্বাণ সমর্পণ করিয়া "আজি হৈতে অস্ত্র ত্যাগ করিলাম আমি" এই শপথ করিলেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দকে যৌবরাজ্য প্রদান করার উৎসবে তিনি তুলাদান করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন, মথুরা, সেতুবন্ধ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ হইতে ৫০,০০০ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। "চন্দ্র গোপীনাথ" মূর্ত্তি মগেরা লইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা আনাইয়া পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মমঠ নামে এক মন্দির ও তৎ সংলগ্ন "জগমোহন" নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎকৃত কৈলাগড়ের দেবীমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। কল্যাণ-সাগর তাঁহার অপর এক কীর্ত্তি। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বর্গগত হন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দমাণিক্যের সময়ের বিশেষ কোন ঘটনা নাই, ইঁহার সঙ্গে আরাকান-রাজ সন্দসুধর্ম্মের খুব সৌহার্দ্দ্য ছিল, ইনি আরাকানরাজ-সভায় সাহসুজার সঙ্গে

কল্যাণমাণিক্য—১৬২৫ খৃঃ।

গোবিন্দমাণিক্য—১৬৫৮-১৬৬০ খৃঃ।

মধ্যে ছত্রমাণিক্য—১৬৬০-১৬৬৬ খৃঃ।

* রাজমালার তারিখের সহিত এইস্থলে কৈলাসচন্দ্র সিংহের ইতিহাসের তারিখের মিল নাই। নানা কারণে আমরা কৈলাসবাবুর তারিখই গ্রহণ করিয়াছি।

বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হন। উক্ত হতভাগ্য সম্রাট্-কুমার ত্রিপুরেশ্বরকে যে হীরক-অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, তৎ-বিক্রয়-লব্ধ টাকা দিয়া গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লায় "সুজা বাদসাহের মসজিদ" ও "সুজাগঞ্জ" নগর স্থাপন করিয়া তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের সনদের বলে গোবিন্দ-মাণিক্যের রাজত্ব কতক দিনের জন্য তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র সিংহ দখল করিয়া নিজেকে "ছত্রমাণিক্য" বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজা হইয়াছিলেন। ইহার পরে ত্রিপুরা-রাজমালায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সার্ব্বভৌম নৃপতিদের বংশধরগণের লাঞ্ছনার কথাই বেশী।

পুনরায় গোবিন্দমাণিক্য—১৬৬০-১৬৭০ খৃঃ।

মোগল সাম্রাজ্য তখনও দুর্দ্দান্ত, মুর্শিদাবাদের শাসন কর্ত্তারা মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি—তাঁহারাই সর্ব্বে-সর্ব্বা। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য অতিপুণ্যবান্ ও দয়াল ছিলেন। সরাইল পরগনার জমিদার নছর-আলির পুত্র শিকার করিতে যাইয়া দৈবদুর্ঘটনায় ত্রিপুরেশ্বর-কুমার চন্দ্র-সিংহের প্রতি গুলি করিয়াছিল, কুমারের তখনই মৃত্যু হইল। নছর আলি মিঞা পুত্রকে ধরাইয়া মহারাজ রামমাণিক্যের নিকট বিচারার্থ পাঠাইলেন। রাম-মাণিক্য তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এখন হইতে কিছু হইলেই জ্ঞাতিরা যাইয়া মুর্শিদাবাদে নবাবের কাণে লাগাইত। দ্বারিকা নামক এক ব্যক্তি নবাবকে জানাইল, "রামমাণিক্য চক্ষেও দেখেন না কাণেও শোনেন না, বুড়া ও অথর্ব হইয়াছেন, আমাকে রাজা করুন।" কিন্তু এই অভিযোগ তদণ্ডে টিঁকিল না।

রামমাণিক্য—১৬৭০-১৬৮২ খৃঃ।

বিচারে দয়া।

রামমাণিক্যের পুত্র রত্নমাণিক্যকে পুনরায় সেই দ্বারিকা নানা ছলে মুর্শিদাবাদ-নবাবের ফারমানের বলে অধিকার চ্যুত করিয়া স্বয়ং 'নরেন্দ্র-মাণিক্য' নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু নবাবদের "ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট" স্বভাব; এই নরেন্দ্রমাণিক্য অল্পকাল পরেই নবাবের ক্রোধে পড়িয়া রাজ্য-চ্যুত হইলেন। পুনরায় রত্নমাণিক্য রাজা হইলেন। ইহার রাজত্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ '১৭ রতন' মন্দির নির্ম্মিত হয়। অল্প পরেই রাজার ভ্রাতা ঘনশ্যাম ঠাকুর মুর্শিদাবাদ হইতে ফৌজ আনিয়া রত্নমাণিক্যের সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিলেন। ঘনশ্যাম ঠাকুরের উপাধি হইল "মহেন্দ্রমাণিক্য।" ভ্রাতৃহত্যার অনুতাপে তাঁহার শরীর শুকাইতে লাগিল এবং তিনিও কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইলেন। তৎপরে যুবরাজ দুর্য্যোধন (কাহার কাহারো মতে দুর্জ্জয়দেব) ধর্ম্মমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত ছিল। তাঁহার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে ৫৩টি হস্তী মুর্শিদাবাদে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি এই রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদ সত্ত্বেও চুপ করিয়া রহিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, ছত্রমাণিক্য মহারাজের জগৎরাম নামে এক প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি যথেষ্ট অর্থ ও

রত্নমাণিক্য (২য়)—১৬৮২ খৃঃ, নরেন্দ্রমাণিক্য—১৭১১ খৃঃ, পরে আবার রত্নমাণিক্য —১৭১২ খৃঃ।

মহেন্দ্রমাণিক্য—১৭১২-১৭১৪ খৃঃ।

হস্তী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া নবাব সুজাউদ্দিনের নিকট হইতে ফৌজ ও সনদ লইয়া আসিয়া ধর্ম্মমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। মীর হবিবের অধীনে যুদ্ধ চলিল, রাজা পলাইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। জগৎরাম 'জগৎমাণিক্য' নামে সিংহাসনারূঢ় হইলেন এবং নবাব সৈন্য পরাস্ত হইল। ইতিমধ্যে ধর্ম্মমাণিক্য মুর্শিদাবাদে যাইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট তরবারিকে অত্যন্ত খারাপ কোষে রাখিয়া, খারাপ তরবারিগুলি উৎকৃষ্ট কোষে রাখিলেন; কতকগুলি অল্পমূল্যের পাথর রং করিয়া ভাল বাক্সে এবং বহুমূল্য পাথর ধুলিমাটিমাখা খারাপ বাক্সে রাখিলেন। উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলিকে খারাপ সাজে সজ্জিত করিয়া অল্প মূল্যের ঘোড়াগুলির গায়ে মূল্যবান্ সাজ পরাইয়া দিলেন। এদিকে নবাবের কাছে যাইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "নবাব সাহেব! আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই আপনাকে দিতে আনিয়াছি।" নবাব দেখিলেন, ধর্ম্মমাণিক্য নেহাত ভালমানুষ। এদিকে জগৎ শেঠকে ঘুস খাওয়াইয়া ধর্ম্মমাণিক্য হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন নবাবের নির্দ্দেশ অনুসারে জিনিষের মধ্যে মূল্যবান্‌গুলি বাছিয়া নবাব নিজ ভাণ্ডারে রাখিতে বলিলেন, তখন জগৎ শেঠ প্রতারণা করিয়া সেই খারাপ জিনিষগুলিই খুব ভাল বলিয়া নবাবের জন্য গ্রহণ করিলেন এবং রাজা স্বচ্ছন্দ মনে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া ছিলেন।* ধর্ম্মমাণিক্যের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমণি 'মুকুন্দমাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজতক্তে অধিষ্ঠিত হন। এই রাজা বিনা অপরাধে ত্রিপুর-রাজবংশীয় রুদ্রমণি নামক এক প্রধান কর্ম্মচারীর হট-কারিতা-নিবন্ধন নবাবের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পড়িলেন; যে পাপিষ্ঠ ফৌজদার হাজি মুনসমের তিনি প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নবাব সৈন্য লইয়া আসিয়া রাজাকে বন্দী করিলেন। নিরীহ রাজা অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া কারাগারে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। মহারাণী প্রভাবতী সহমৃতা হইলেন। মহারাজের মৃত্যুকালের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতিরা রুদ্রমণিকেই 'জয়মাণিক্য' উপাধি দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন (১৭৩৮ খৃঃ)। কিন্তু অল্পকাল পরেই মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র পাঁচকড়ি নবাব হইতে ফৌজ ও সনদ প্রাপ্ত হইয়া জয়মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া "ইন্দ্রমাণিক্য" নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু জয়মাণিক্য পরাস্ত হইবার পরও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, তিনি রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া পুনঃ

ধর্ম্মমাণিক্য (২য়)— ১৭১৪-১৭৩২ খৃঃ।

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ।

মুকুন্দমাণিক্য—১৭৩২- ১৭৩৯ খৃঃ।

জয়মাণিক্য—কয়েক মাস। ইন্দ্রমাণিক্য—১৭৩৯ খৃঃ। পরে আবার জয়মাণিক্য অল্পকাল।

* মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রায় "শিব উপাস্য দেবতারূপে" দৃষ্ট হন। তৎপিতা ছত্রমাণিক্যের মুদ্রাঙ্কিত "হরগৌরী-পাদপদ্ম-মধুপ শ্রীশ্রীছত্রমাণিক্য" দৃষ্ট হয়। মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মোহরে "কালীভক্ত", কাশিচন্দ্র মাণিক্যের মোহরে "শিবাজ্ঞা" কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে "রাধাকৃষ্ণ" নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পুনঃ বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন। অগত্যা ইন্দ্রমাণিক্য পুনরায় নবাবের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে আলিবর্দী খাঁর প্রিয়পাত্র হাজি হুসেনকে হাত করিয়া জয়মাণিক্য ত্রিপুরার সনদ পাইবার চেষ্টায় ছিলেন,—ইন্দ্রমাণিক্য মুর্শিদাবাদে তদ্বির করিতে যাইয়া আর ফিরিলেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুনর্ব্বার জয়মাণিক্য রাজা হইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। জয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর "বিজয়মাণিক্য" উপাধি লইয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, ইনিও অতি অল্পকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ইন্দ্রমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কৃষ্ণমণি সিংহাসনের দাবী করিলেন। কিন্তু এই সময়ে এক সামান্য প্রজা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরা শাসন করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা এখানে একটু বিস্তারিত ভাবে প্রদান করিয়া উপসংহার করিব, যেহেতু আমার এই ইতিহাস ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই আপাততঃ লিখিত হইল। এখন হইতে ত্রিপুর-রাজ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা ও দুর্দ্দান্ত প্রতাপ লুপ্ত হইয়াছিল। যে বংশের এক রাজ্ঞী গৌড়েশ্বরের সমবেত সৈন্যের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ ভ্রূভঙ্গীর সহিত স্বয়ং রণ-অভিযানের নেতৃত্ব করিয়া স্বীয় রাজ-স্বামীকে শৃগালবৎ গণ্য করিয়াছিলেন—রণস্থলে হস্তীর উপর তাঁহার মহীয়সী রণচণ্ডীমূর্ত্তি দেখিয়া—এক লক্ষ সৈন্য বিনাশের পর—গৌড়েশ্বরের বিরাট বাহিনী ভঙ্গ দিয়াছিল, যে বংশের ধন্যমাণিক্য তাঁহার মহাবীর সেনাপতি চয়চাগের সাহায্যে হুসেন সাহের ন্যায় পরাক্রান্ত বাদসাহকে পরাজয়পূর্ব্বক চট্টগ্রাম ও আরাকান কাড়িয়া লইয়াছিলেন, যে উজ্জ্বল মহিমান্বিত বংশের এক রাজা সোলেমান সাহের শ্যালক মমারককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরে বলি দিতে সাহসী হইয়াছিলেন,—অন্য এক রাজা হেরম্বাধিপতির অজেয় থানাংছি দুর্গ আট মাসের চেষ্টায় বিধ্বস্ত করিয়া তদুপরি ত্রিপুরার বিজয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং যে মহাবংশের উজ্জ্বল রত্ন বিজয়-মাণিক্য দিগ্বিজয়ে অভিযান করিয়া একদিকে নানারাজ্য জয়, অপরদিকে নানা দীঘি, সরোবর, মন্দির ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় নামে এক নদীর ন্যায় সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত খাল খনন করিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রবংশীয় সেই প্রথিতযশা নৃপতিদের বংশধরদিগকে এইবার নবাবের সামান্য তালুকদারের মত নথি-পত্র লইয়া জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিরোধ ও অভিযোগ করিতে ঘন ঘন মুর্শিদাবাদে যাইতে দেখিলে মনে হয়—ত্রিপুরলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এত নিষ্প্রভ ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল যে তাহার চিহ্নও ঐতিহাসিকগণের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হইত।

বিজয়মাণিক্য ও লক্ষ্মণমাণিক্য—১৭৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত।

লক্ষ্মণমাণিক্য—কৃষ্ণমাণিক্য

যে সামান্য প্রজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহার নাম সমসের গাজি। ইহার পিতা পীর মহম্মদ দুরবস্থার চরমসীমায় উপনীত হইয়া একটা কুমড়া চুরির অপরাধে দক্ষিণ-শিকের জমিদার নাসির মহাম্মদের নিকট আনীত হন। জমিদার ইহার প্রতি সদয় হইয়া আট কানী জমি দান করিয়া ইহার পরিবার প্রতিপালনের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন; এই পীর মহাম্মদের এক লক্ষণাক্রান্ত পুত্র হয়; শ্রীধর আচার্য্য নামক এক গণৎকার ইহার ঠিকুজি দেখিয়া কুম্ভ রাশিতে জন্ম নির্ণয়পূর্ব্বক সমসের গাজি নাম রাখেন। ছেলেটিকে অপূর্ব্ব মেধাবী দেখিয়া জমিদার ইহাকে নিজ পুত্রদের সঙ্গে অপত্যস্নেহে পালন করেন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সমসের আরবী, পারশী, উর্দ্দু ও বাঙ্গলায় পারদর্শী এবং প্রভূত দৈহিক বলসম্পন্ন হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে ইহার সতীর্থ ছাদ ঠাকুর (মুসলমান) ছায়ার ন্যায় ইহার অনুগামী হন। ছাদের দৈহিক বল অতুলনীয় ছিল। কথিত আছে ইনি একক দুইটি বাঘ, একটি বুনো হাতী এবং একটি বিশালকায় কুমীর স্বহস্তে মারিয়াছিলেন। দক্ষিণ-শিকে এই সময়ে খুব ডাকাতি হইত। ছাদের সাহায্যে সমসের গাজি ডাকাতদিগকে নিরস্ত করেন, পরন্তু তাহারা প্রতিশ্রুত হয় যে তাহারা দক্ষিণ-শিকে আর ডাকাতি করিবে না, এবং অন্যত্র যেখানে যেখানে ডাকাতি করিবে সেখানে সেখানে লব্ধ অর্থের একটা ভাগ সমসেরকে দিবে, ডাকাতদের সংখ্যা পাঁচ শতের উপরে ছিল। এই সময়ে গদা হোসেন খন্দকার নামক এক মস্তবড় সাধু ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সমসের ত্রিপুরার রাজা হইবেন। তিনি তাঁহাকে একটি মন্ত্রপুত বিজয়ী ঘোড়া ও তরবারি প্রদান করেন। ডাকাতির অর্থে সমসের ধনবান্ হইয়া উঠিলেন, এবং জমিদার নাসির মহাম্মদের রূপসী কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। নাসির এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হন; এই ঘটনায় সমসের গাজি বাসস্থান কুঞ্জরা হইতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি কৌশলক্রমে জমিদার ও তাঁহার দুই পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং জমিদার বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন। যে রূপসী কন্যার জন্য এই যুদ্ধবিগ্রহ—হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, সেই দৈয়া-বিবি পিতা ও ভ্রাতাদের শোকে আগুনে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। একটা ডাকাত জমিদারকে হত্যা করিয়া নিজে সেই স্থান লইয়াছে শুনিয়া, ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন; উজির হইলেন সেনাপতি। কিন্তু সমসের ছাদের সাহায্যে অতি অতর্কিত ভাবে উজিরকে বন্দী করিলেন, কিন্তু অনেক টাকা নজরানা দিয়া বশ্যতা স্বীকার করায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; সমসের বিস্তর অর্থ ও উপঢৌকন পাঠাইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বশীভূত করিলেন। ইহার পরে খাজানা বন্ধ করা সত্ত্বেও কৌশলক্রমে রাজক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাইয়া দক্ষিণ-শিক মেহেরকুলের জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিন বৎসর

সমসের গাজি।

কাল গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবল ক্রমশঃ বাড়াইয়া তিনি হঠাৎ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমণি যতবার যুদ্ধ করিলেন, ততবারই হারিতে লাগিলেন। সমসের উদয়পুরে যাইয়া হানা দিলেন। রাজা একবার জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে হারিয়া গিয়া মণিপুরে পলাইয়া গেলেন। সমসের রাজ্য-বিজয় করিয়া বহু অর্থ দ্বারা নবাবের কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া ত্রিপুরা-সিংহাসনের সনদ আনাইলেন। ইনি ছাদের ভগিনীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ক্রমশঃ মনোমালিন্য বাড়িয়া চলিল। ছাদের অভিযোগ "আমি করি যুদ্ধ-জঙ্গ নাম হয় তার। আমি মারি ব্যাঘ্র-ভালুক দোহাই তাহার। রাজ্য লইলাম কাড়ি—রাজা ভাগে ডরে। আদেল ইনছাফ করে, না জিজ্ঞাসে মোরে।"

"আমি যুদ্ধ-জঙ্গ করি, তুমি অধিকারী।"

একদিন প্রকাশ্যভাবে সে সমসের গাজিকে বলিল, "তোর লাগি জমিদার নাসিরেরে মারি। রাজবংশ তাড়াইনু রাজদণ্ড কাড়ি। হুকুম-জারি কর তুমি মোরে পরিহরি। আমি যুদ্ধ-জঙ্গ করি—তুমি অধিকারী।" এইভাবে মনোমালিন্য বাড়িয়া চলিল; শেষে সমসের গাজি গোপনে ও কৌশলক্রমে ছাদকে নিহত করিলেন। ছাদের ভগিনী—সমসের গাজীর বেগম—ভ্রাতৃশোকে প্রাণ দিলেন; তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীকে কহিয়াছিলেন, "তাহার কল্যাণে তোমার এসব সম্পদ্। কে আর ধরিবে ঢাল আসিলে বিপদ্।"

এই সমসের গাজির জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও ভক্ত সেক্ মনুহর। তিনি লিখিয়াছেন, রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ত্রিপুরেশ্বরী কালী সমসেরকে স্বপ্ন দেখাইয়া তাঁহার পূজা দিতে আদেশ দেন। গাজি ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা দিয়াছিলেন। রাজ্য বিজয় হইল বটে, কিন্তু পাহাড়ের কুকীরা ত্রিপুর-রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহারও আনুগত্য করিবে না—এইকথা জানাইলে, সমসের গাজি উদয়মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালীকে "লক্ষ্মণমাণিক্য" উপাধি দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করান। মহারাজ কৃষ্ণমণি সিংহাসন লইয়া গিয়াছিলেন, এজন্য একটা বাঁশের সিংহাসন তৈরী করিয়া রাজাকে অভিষেক করা হইয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্মণমাণিক্য সাক্ষীগোপাল হইয়া ছিলেন; সমসের গাজিই প্রকৃত রাজা। অতঃপর গাজি ভুলুয়া জয় করেন। নবাব সরকারে তিনি প্রতিবৎসর একলক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন, এবং তাঁহার রাজ্য—দক্ষিণে শ্রীহট্ট—কর্ণফুলির উত্তর পর্য্যন্ত এবং মেঘনা নদীর পূর্ব্বে—যাবদি পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজা হইয়া সমসের প্রজাদিগকে সুশাসনে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন; বাজারে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না (১৭৪৯-৫১ খৃঃ)। মূল্য-তালিকা এইরূপ :—চাউল—/১ সের=৻৫। লঙ্কামরিচ—/১ সের=৻৫। গুড়—/১ সের=৻১০। লবণ—/১ সের=৻১০। রসুনপিয়াজ—/১ সের=৻১০। কার্পাশ—/১ সের=/৫। কলাই /১ সের=৻৫। মুশুরি /১ সের=৻১০। মটর /১ সের=৻১০। অড়হর /১ সের=/০। মুগ /১ সের=/০। তৈল /১ সের ৵০। ঘৃত /১ সের=।০ আনা।

লক্ষ্মণমাণিক্য—১৭৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত।

এসকলই বিরাশির ওজন ছিল। পলাশীর যুদ্ধের প্রাকালে বাজার দর কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। "সমসের গাজির গানে" অনেক কৌতুকাবহ কথা আছে। চন্দ্র ও উৎসব নামে দুই নাপিত তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় খেউরি করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিল। ক্ষৌর-কার্য্যের সময়ে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। তিনি স্বীয় প্রাসাদে স্কুল খুলিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে সন্দীপ হইতে এক অন্ধ হাফেজ আনাইয়া তিনি কোরান পড়াইতেন, হিন্দুস্থান হইতে মৌলভি আনাইয়া আরবি পড়াইবার ও জুগদিয়া হইতে গুরু মহাশয় আনাইয়া বাঙ্গলা এবং ঢাকা হইতে মুনসী আনাইয়া পারশী পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাতে ৬টা হইতে ১০টা এবং মধ্যাহ্নে ১২টা হইতে ৪টা,—পড়িবার এই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। গাজি শাসন-সংক্রান্ত এরূপ কড়াকড়ি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, চোর-দস্যুর উৎপাত ত্রিপুরা রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সমসের গাজির এক কন্যাকে ঢাকার নবাব বিবাহ করেন। ইহার পরে পুনঃ পুনঃ মুর্শিদাবাদে যাইয়া গাজিকে আলিবর্দ্দি খাঁ নবাবের সঙ্গে দেখা করিবার হুকুম আসিতে লাগিল। ঢাকার নবাবের নিষেধে গাজি প্রথমতঃ তথায় যাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে এক সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় গাজি ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ গেলেন। এদিকে আবু বখর নবাবকে বুঝাইয়াছিলেন "ভাটীর বাঘ বন্দী করি ছাড়ি দিবা কেনে। আসিয়া মারিবে দেশ সম্মুখে সে রণে। কাড়ি নিল দক্ষিণ-শিক জমিদারে মারি। রাজবংশ খেদাইল রোসনাবাদ (ত্রিপুরা) কাড়ি। অদ্যাপি ভাল আছে বন্দী করি আনি। নতুবা পশ্চাতে তব হবে পেরেশোনি।" ভীত হইয়া নবাব নিমরাজি হইলেন, বিনা অপরাধে গাজিকে তোপের মুখে ফেলিয়া হত্যা করা হইল। "দুঃখীরাম চণ্ডাল বলবান্ অতি। গাজীর সহিত তার আছিল পীরিতি। পাঁচ শত লোক জন তার সঙ্গে ছিল। গাজির পরিবার সেই দেশে আনি দিল।"

কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৬০ খৃঃ অব্দে রাজা হন। রামগঙ্গা বিশারদ নামক এক পণ্ডিত 'কৃষ্ণমালা' নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি এই পুস্তকের বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, সুতরাং এই স্থানে ত্রিপুরার ইতিহাস শেষ করিলাম।

কৃষ্ণমাণিক্য, ১৭৬০ খৃঃ—"কৃষ্ণমালা"।

আমরা ত্রিপুর-রাজ্যের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতীর গৌরব করিবার অনেক বিষয় পাইয়াছি। এই বংশ শুধু ভারতের প্রাচীনতম রাজ বংশ নহে, ইহার কীর্ত্তিকথা চিরস্মরণীয় এবং বঙ্গের ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিতেছে। ইহার কয়েকটি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইলে তাহা বাঙ্গালী জাতির দর্শনীয় পুণ্যস্থানে পরিণত হইবে।

ত্রিপুরার গৌরব-কথা।

(১) যেখানে প্রতীত হইতে ৫ম স্থানীয় মহারাজ হিমতির (হামতরফার) শ্মশান লোক-স্মৃতিতে অক্ষয় করিবার জন্য "বৈকুণ্ঠপুর" স্থাপিত হইয়াছিল, (২) মহারাজ

কীর্তিধরের (ছেং পোম্ফার) বৈজয়ন্তী-স্বরূপা মহারাণী ত্রিপুরা-সুন্দরী যেখানে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া গৌড়েশ্বরের সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁর সোণার পাগড়ীর উপর স্বীয় বিজয়-চিহ্ন লাঞ্ছিত করিয়া দিয়াছিলেন, (৩) যেখানে এই বীর-রমণীর দুর্দ্ধর্ষ সমরে লক্ষ সৈন্য হত হইয়াছিল—এবং উর্দ্ধে কবন্ধ-দর্শনের পরিকল্পনা করিয়া রাজা বিস্মিত হইয়াছিলেন, রাজ-জামাতা সেই শোণিতার্দ্র শব-সঙ্কুল রণ-ক্ষেত্রে বসিবার জন্য তিলমাত্র স্থান না দেখিয়া বিশালকায় হস্তীর দন্ত খড়্গাঘাতে কাটিয়া রাজার জন্য সাময়িক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন—ত্রিপুরার রাজ্ঞী কর্ত্তৃক গৌড়ের এই পরাজয়-কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সকল স্থানে কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করা কি উচিত নহে? যেখানে যেখানে ত্রিপুর-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজধানী ছিল, যথা ত্রিবেগ, খলংমা ছাম্বুলনগর, কাইচারঙ্গ, আচরঙ্গ, তারক, বিশাল গড়, খুটিমুড়া, নাকিবাড়ী, ধানাংচি, ধোপা-পাথর, লাউগঙ্গা, মোহরী গঙ্গা, তেলাইরঙ্গ, মণিপুর, উদয়পুর—সেই সকল স্থান এখন নিশ্চিহ্ন,—ইহাদের স্মৃতিচিহ্ন রাখার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে।

(৪) যেখানে হুসেন শাহের সৈন্যদিগকে উপর্য্যুপরি মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ জয় করিয়াছিলেন, যেখানে ত্রিপুর-সেনারা আট মাস ব্যাপী চেষ্টার পর অষ্ট হস্ত দীর্ঘ ও তিন হস্ত প্রশস্ত গোধিকার সাহায্যে অজেয় ধানাংচি দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, তথায়ও একটি স্মৃতিস্তম্ভ উত্থিত হইতে পারে। (৫) মহারাজ অমর মাণিক্যের অমর কীর্ত্তি 'অমর-দীঘি' এখনও বিদ্যমান, এই দীঘির খনন-কার্য্য ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়,—এই খনন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সামন্ত-রাজারা লোক পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীপুরের চাঁদ রায় ৭০০, বাকলার বসু ৭০০, গোয়াল পাড়ার গাজি ৭০০, ভাওয়ালের রাজা ১০০০, সরাইলের রাজা ইসা খাঁ ১০০০, ভুলুয়ার রাজা ১০০০, একথা পূর্ব্বে অমরমাণিক্যের রাজত্বপ্রসঙ্গে একবার লিখিয়াছি; সেই অমর-দীঘির তীরে এক স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করিয়া তন্মধ্যে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ করিলে ত্রিপুর-রাজবংশের গৌরবের বিষয় হইতে পারে। (৬) যেখানে যুবরাজ রাজধর—ইসা খাঁ প্রভৃতি সামন্ত-রাজগণ সহ তোরাপের (শ্রীহট্টের) রাজা ফতে সিংহকে ভীষণ যুদ্ধের পর পরাজয়পূর্ব্বক বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন—সেই স্থানে স্বর্ম্মা নদীর তীরে গোধারাণী-পল্লীতে বিজয়স্তম্ভ উত্থিত করিয়া সেই জয়বার্ত্তা চিরস্মরণীয় করিবার যোগ্য। (৭) এরূপ আরো অনেক স্থান আছে, বাহুল্য-ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। যেখানে যেখানে মহারাণীরা সহমৃতা হইয়াছিলেন,—তাহার উল্লেখ রাজমালায় আছে—সেখানে সেখানে সমস্ত বাঙ্গালী-জাতির তপ্ত অশ্রুর অর্ঘ্য দ্বারা—সেই পুণ্যশীলাদের স্মৃতি অভিনন্দিত হইতে পারে। (৮) এই কার্য্যে ব্যয় খুব বেশী হইবার নহে। শুধু প্রস্তরলেখ প্রস্তুত করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ রচনার খরচ কতই বা পড়িবে? আমার মনে হয় এক একটি স্তম্ভে ১৫০৲ টাকার বেশী খরচ হয় না।

ত্রিপুরার রাজারা অনেকেই বাঙ্গলাভাষার উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন—তাঁহারা যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গলায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন,—সেগুলি কোথায় গেল? তাহা কি

পাওয়া যায় না? মহারাজ ধন্যমাণিক্য উৎকল-খণ্ড পাঁচালী এবং জ্যোতিষের যাত্রা-রত্নাকরের বঙ্গানুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন, অমর-মাণিক্য ও রাণী কমলা সম্বন্ধে অনেক পল্লী-গীতিকা ছিল, ত্রিহুত হইতে গায়ক ও নর্ত্তক আনাইয়া ধন্যমাণিক্য তাঁহার লোকদিগকে সেই সকল গীত বিশুদ্ধ ভাবে গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ত্রিপুরেশ্বরগণের উৎসাহ ও চেষ্টায় হইয়াছিল। এই সকল পুস্তক ও গান কোথায় গেল? আমার বিশ্বাস, সন্ধান করিলে উহা আংশিক ভাবেও উদ্ধার করা যাইতে পারিবে—সেই সন্ধান করিবে কে? আমরা বর্ত্তমান বিদ্যোৎসাহী নরেশ শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের দৃষ্টি এইদিকে সশ্রদ্ধভাবে আকর্ষণ করিতেছি। ত্রিপুরার অনেক তাম্রপট ও প্রাচীন দলিল আমরা বঙ্গভাষায় লিখিত পাইয়াছি।

বঙ্গভাষার উৎসাহ-দান।

ত্রিপুর-রাজদের অনেকেরই দান ও বদান্যতার উদাহরণ রাজমালায় পাওয়া যায়—কিছু-দিন পূর্ব্বেও ত্রিপুরেশ্বরগণ খুব বিলম্বে আহার (মধ্যাহ্ন গত হইলে) করিতেন, এবং আহারের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমার রাজ্যে কোন প্রজা অভুক্ত আছে কি?" তাঁহাদের দানপত্রে লেখা থাকিত—"যদি কেহ আমার বংশের লোপ করিয়া এই সিংহাসন অধিকার করেন, তবে আমি তাঁহার দাসানুদাস হইয়া শ্লাঘা বোধ করিব, যদি তিনি আমার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরে হস্তক্ষেপ না করেন।" যদিও এই সকল রীতি পূর্ব্বযুগের সংস্কার—ভারতীয় অনেক রাজন্যের তাম্রশাসনে এরূপ কথা পাওয়া যায়—তথাপি যতবার ইহা পাঠ করি, ততবারই সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত দানশীলতার উৎস—যাহা হইতে ইহার প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া সেই মহানুভব রাজাদের আদর্শের উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। এখন রাজপ্রাসাদ হইতে এই মহৎ সংস্কারগুলি লুপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা দুঃখের বিষয় হইবে। পূর্ব্বে রাজারা মেথলী রমণীদের কোমল হস্তের নিত্য নবনির্ম্মিত কারুকার্য্যশোভিত ফুলের মশারি ও ফুলের শয্যায় শয়ন করিতেন; আমি মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শয়ন-গৃহে সেইরূপ শয্যা হইত, তাহা জানি।—সেই শয্যার রূপ ও সুরভিতে মন মুগ্ধ হইয়া যাইবার কথা। এখন সে সকল রীতি আছে কি না জানি না। মহারাজ কৃষ্ণমণিমাণিক্য তাঁহার চির-শত্রু মুসলমান সমসের গাজির প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও অন্যান্য দানের উপরও হস্তক্ষেপ করেন নাই।

উদারতা ও দানশীলতা।

ত্রিপুর-রাজ্যে প্রজা ও সেনাপতিদের যে কতটা ক্ষমতা ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ রাজমালায় দৃষ্ট হয়। ১৩১ সংখ্যক মহারাজার অভিষেক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"সাধু-রায় নামে তার ছোট ভাই ছিল। সর্ব্বলোকে রাজি হৈয়া তারে রাজা কৈল।" (যুঝার খণ্ড।) মহারাজ সাধুরায় ১২০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র মহারাজ প্রতাপমাণিক্যকে প্রজারা হত্যা করিয়াছিল। ("প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে রাজা করে। অধার্ম্মিক দেখি তাকে লোকে মারে পরে।"—রত্নমাণিক্য খণ্ড।) লিখিত

গণতন্ত্র, প্রজাদের ক্ষমতা।

মহারাজা দুর্গামাণিক্য ১৮০৮-২০ খৃঃ।

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য ১৮৩০-৪৯ খৃঃ।

মহারাজা ঈশানমাণিক্য ১৮৫০-৬২ খৃঃ।

মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্য ১৮০০-১৮০৮, পুনঃ ১৮২১-২৬ খৃঃ।
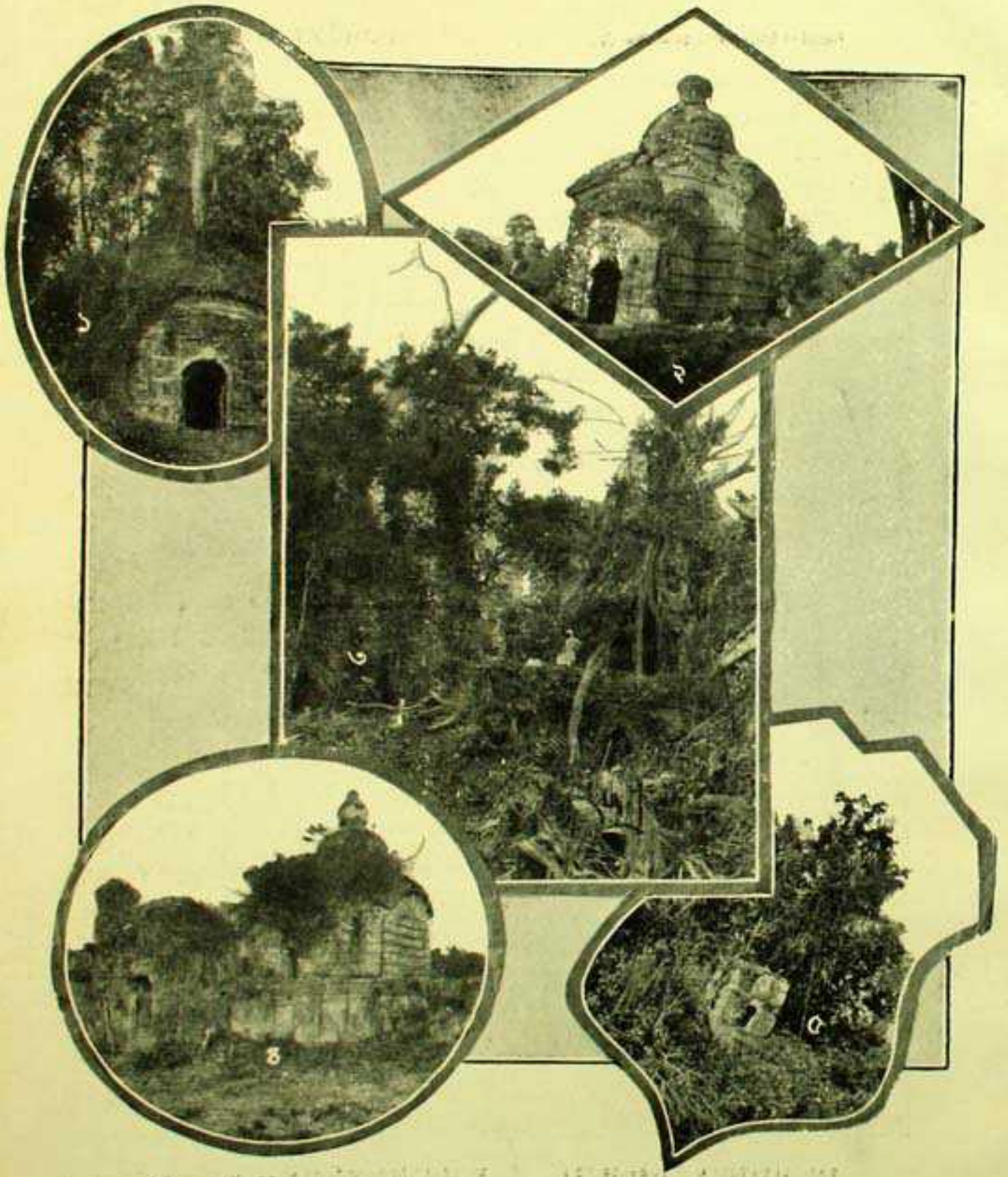
ধন্য মাণিক্যের মন্দির সমূহ।

আছে, রাজা ইন্দ্রমাণিক্যের মাতার প্রিয় এক ব্রাহ্মণ আড়াই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দুরাত্মাকে প্রজারা হত্যা করিয়াছিল (১৫২৮ খৃঃ)। ত্রিপুরেশ্বর জয়মাণিক্যকে উত্তেজিত সৈন্যেরা বধ করিয়া অমরমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিল (১৫৯৭ খৃঃ); অরাজকতা দেখিয়া যেরূপ প্রজারা পালবংশের প্রদীপ গোপালকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার প্রজারা সেইরূপ কল্যাণমাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। "রাজপুত্র-পৌত্র নাই, নাহি রাজ-ভ্রাতা। কাহাকে করিব রাজা জানিয়া সর্ব্বথা। সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিত তখন। কাহাকে করিব রাজা না দেখি লক্ষণ। মহামাণিক্যবংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি। যশোধর-কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি। করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান্। রাজযোগ্য হয় সেই দেখি বিদ্যমান। এসব চিন্তিয়া সেনা পাত্র মিত্রগণ। কল্যাণ নাম সেনাপতি বৈসে সিংহাসন।" (কল্যাণমাণিক্য খণ্ড)। ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণ আরও আছে। আমরা এক গোপালকে লইয়া এদেশে গণতান্ত্রিকতার প্রমাণ খাড়া করিয়াছিলাম। কিন্তু ত্রিপুর-রাজবংশে এইরূপ কত গোপাল দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য একথা বলা উচিত, যে সকল রাজাকে প্রজারা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাঁহাদের ধমনীতে রাজরক্ত কম-বেশী প্রবাহিত থাকিত। ত্রিপুর-রাজ্যের একটা ইতিহাস আছে—এইজন্য এই সকল কথা জানিতে পারিলাম। অন্যান্য দেশের ইতিহাস লুপ্ত হওয়াতে তাহার প্রমাণ নাই; কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দুস্থানের প্রাদেশিক রাজ্যগুলির সকলেরই এক আদর্শ ছিল।

সীমানা।

ত্রিপুরার পূর্ণ-গৌরবের সময়ে এই রাজ্যের সীমানা নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—উত্তরে ভূটান—ব্রহ্মপুত্র বা তৈরঙ্গ নদ, পশ্চিমে গাড়ো পাহাড়—কোচবিহারের সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং ময়মনসিংহের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ সমেত ঢাকানগরীর পূর্ব্বে মেঘনা নদী পর্য্যন্ত, পশ্চিম-দক্ষিণে মেহেরকুল, চট্টগ্রাম ও ধোপার পাথরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে ভুলুয়াও অধিকৃত হইত। দক্ষিণে রাঙ্গামাটী, লিকাপাহাড় প্রভৃতি এবং পূর্ব্ব সীমান্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর লইয়া থলংমা, থানাংচি প্রভৃতি। প্রাচীন ত্রিবেগ হইতে ত্রিপুররাজ্য আরো পূর্ব্বে সরিয়া আসিয়া উত্তর-দক্ষিণে অনেকটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বংশাবলী।

ত্রিপুর-রাজবংশ—রাজমালার নবসংস্করণের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় যেরূপ বংশলতা দিয়াছেন, তদনুসারে :—১ চন্দ্র, ২ বুধ, ৩ পুরুরবা, ৪ আয়ু, ৫ নহুষ, ৬ যযাতি, ৭ দ্রুহ্য, ৮ বভ্রু, ৯ সেতু, ১০ অনর্ত্ত, ১১ গান্ধার, ১২ ধর্ম্ম, ১৩ ধৃত, ১৪ দুর্ম্মদ, ১৫ প্রচেতা, ১৬ পরাচি (শতধর্ম্ম), ১৭ পরাবসু, ১৮ পারিষদ, ১৯ অরিজিত, ২০ সুজিৎ, ২১ পুরুরবা (২য়), ২২ বিবর্ণ, ২৩ পুরু সেন, ২৪ মেঘবর্ণ, ২৫ বিকর্ণ, ২৬ বসুমান, ২৭ কীর্ত্তি, ২৮ কনীয়ান, ২৯ প্রতিশ্রবা, ৩০ প্রতিষ্ঠ, ৩১ শত্রুজিৎ, ৩২ প্রতর্দ্দন, ৩৩ প্রমথ, ৩৪ কলিন্দ, ৩৫ ক্রম, ৩৬ মিত্রারি, ৩৭ বারিবর্হ, ৩৮ কার্ম্মুক, ৩৯ কলিঙ্গ, ৪০ ভীষণ, ৪১ ভানুমিত্র, ৪২ চিত্রসেন, ৪৩ চিত্ররথ, ৪৪ চিত্রায়ুধ, ৪৫ দৈত্য, ৪৬ ত্রিপুর, ৪৭ ত্রিলোচন, ৪৮ বীরসেন, ৪৯ তরদক্ষিণ,

৫০ সুদক্ষিণ, ৫১ তরদক্ষিণ, ৫২ ধর্ম্মতরু, ৫৩ ধর্ম্মপাল, ৫৪ সধর্ম্মা, ৫৫ তরবঙ্গ, ৫৬ দেবাহু, ৫৭ নরাঙ্গিত, ৫৮ ধর্ম্মাঙ্গদ, ৫৯ রুক্মাঙ্গদ, ৬০ সোমাঙ্গদ, ৬১ নৌযুগরায়, ৬২ তরজুঙ্গ, ৬৩ রাজধর্ম্ম (তররাজ), ৬৪ হামরাজ, ৬৫ বীররাজ, ৬৬ শ্রীরাজ, ৬৭ শ্রীমান, ৬৮ লক্ষীতরু, ৬৯ রূপবাণ, ৭০ লক্ষীবাণ (মাইলক্ষী), ৭১ নাগেশ্বর, ৭২ যোগেশ্বর, ৭৩ নীলধ্বজ (ঈশ্বরফা), ৭৪ বঙ্গুরাজ (রঙ্গখাই), ৭৫ ধনরাজফা, ৭৬ হরিহর (মুচংফা), ৭৭ চন্দ্রশেখর (মাইচন্দ্রফা), ৭৮ চন্দ্ররাজ (তরুরাজ), ৭৯ ত্রিপলি (তরফলাই), ৮০ সুমন্ত, ৮১ রূপবন্ত, ৮২ তরহোম, ৮৩ হরিরাজ, ৮৪ কাশীরাজ (কচরফা), ৮৫ মাধব (কোলাতরফা), ৮৬ চন্দ্রফা, ৮৭ গজেশ্বর, ৮৮ বীররাজ, ৮৯ নাগেশ্বর, ৯০ শিখিরাজ, ৯১ দেবরাজ, ৯২ ধুসরাজ, ৯৩ বারকীর্ত্তি, ৯৪ সাগরফা, ৯৫ মলয়চন্দ্র, ৯৬ সূর্য্য রায়, ৯৭ ইন্দ্রকীর্ত্তি, (আচঙ্গ ফণাই), ৯৮ বীরসিংহ, ৯৯ সুরেন্দ্র (হাচুংফা), ১০০ বিমান, ১০১ কুমার, ১০২ সুকুমার, ১০৩ বীরচন্দ্র (তৈছরাও), ১০৪ রাজ্যেশ্বর, ১০৫ নাগেশ্বর, ১০৬ তৈছংফা (তেজংফা), ১০৭ নরেন্দ্র, ১০৮ ইন্দ্রকীর্ত্তি (২য়), ১০৯ বিমান (পাইমরাজ), ১১০ যশোরাজ, ১১১ বঙ্গ, ১১২ গঙ্গারায়, ১১৩ চিত্রসেন (ছাক্রুরায়), ১১৪ প্রতীত, ১১৫ মারিচি, ১১৬ গগন (কাকুথ), ১১৭ কীর্ত্তি (নওরাজ), ১১৮ হিমাতি (যুঝারফা বা হামতরফা), ১১৯ রাজেন্দ্র (জর্ম্মীফা), ১২০ পার্থ, ১২১ সেবরায়, ১২২ কিরীট (ধর্ম্মপা বা ডুঙ্গুরফা), ১২৩ রামচন্দ্র (থাকংফা), ১২৪ নৃসিংহ (ছেংফনাই), ১২৫ ললিতরায়, ১২৬ মুকুন্দফা, ১২৭ কমলরায়, ১২৮ কৃষ্ণদাস, ১২৯ যশোরাজ, ১৩০ উদ্ধব (মোচংফা), ১৩১ সাধুরায়, ১৩২ প্রতাপরায়, ১৩৩ বিষ্ণুপ্রসাদ, ১৩৪ বাণেশ্বর, ১৩৫ বীরবাহু, ১৩৬ সম্রাট, ১৩৭ চম্পকেশ্বর, ১৩৮ মেঘ, ১৩৯ ধর্ম্মধর (ছেংকাছাগ), ১৪০ কীর্ত্তিধর (ছেংযুমফা), ১৪১ রাজসূর্য্য (আচংফা), ১৪২ মোহন (খিচুংফা), ১৪৩ হরিরায় (ডাঙ্গরফা), ১৪৪ রাজাফা, ১৪৫ রত্নফা (রত্নমাণিক্য), ১৪৬ প্রতাপমাণিক্য, ১৪৭ মুকুটমাণিক্য (মুকুন্দ), ১৪৮ মহামাণিক্য, ১৪৯ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়), ১৫০ প্রতাপমাণিক্য, ১৫১ ধন্যমাণিক্য, ১৫২ ধ্বজমাণিক্য, ১৫৩ দেবমাণিক্য, ১৫৪ ইন্দ্রমাণিক্য, ১৫৫ বিজয়মাণিক্য, ১৫৬ অনন্তমাণিক্য, ১৫৭ উদয়মাণিক্য, ১৫৮ জয়মাণিক্য, ১৫৯ অমরমাণিক্য, ১৬০ রাজধরমাণিক্য, ১৬১ যশোধরমাণিক্য, ১৬২ কল্যাণমাণিক্য, ১৬৩ গোবিন্দমাণিক্য, ১৬৪ ছত্রমাণিক্য, ১৬৫ রামদেবমাণিক্য, ১৬৬ রত্নমাণিক্য (২য়), ১৬৭ নরেন্দ্রমাণিক্য, ১৬৮ মহেন্দ্রমাণিক্য, ১৬৯ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়), ১৭০ মুকুন্দমাণিক্য, ১৭১ জয়মাণিক্য, ১৭২ ইন্দ্রমাণিক্য, ১৭৩ বিজয়মাণিক্য, ১৭৪ কৃষ্ণমাণিক্য।

পরবর্ত্তী রাজগণ—১৭৫ রাজধরমাণিক্য, ১৭৬ রামগঙ্গামাণিক্য, ১৭৭ দুর্গামাণিক্য, ১৭৮ কাশীচন্দ্রমাণিক্য, ১৭৯ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, ১৮০ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য, ১৮১ বীরচন্দ্রমাণিক্য, ১৮২ রাধাকিশোর মাণিক্য, ১৮৩ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, **১৮৪ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য।**

শুধু ভারতবর্ষে কেন চীনদেশ ছাড়া জগতে এরূপ সুদীর্ঘকাল এক রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত নাই। প্রথমে এই বংশের রাজধানী ছিল সগর দ্বীপের কপিলাশ্রমের

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য—রাজত্বকাল ১৮৭০-১৮৯৬ খৃঃ।

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য—রাজত্বকাল ১৮৯৭-১৯০৯ খৃঃ।

মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য—রাজত্বকাল ১৯০৯-১৯২৩ খৃঃ।

১

২

"রিহা" প্রস্তুতকারিণী রমণীগণ।

বয়ননিরতা রমণী।
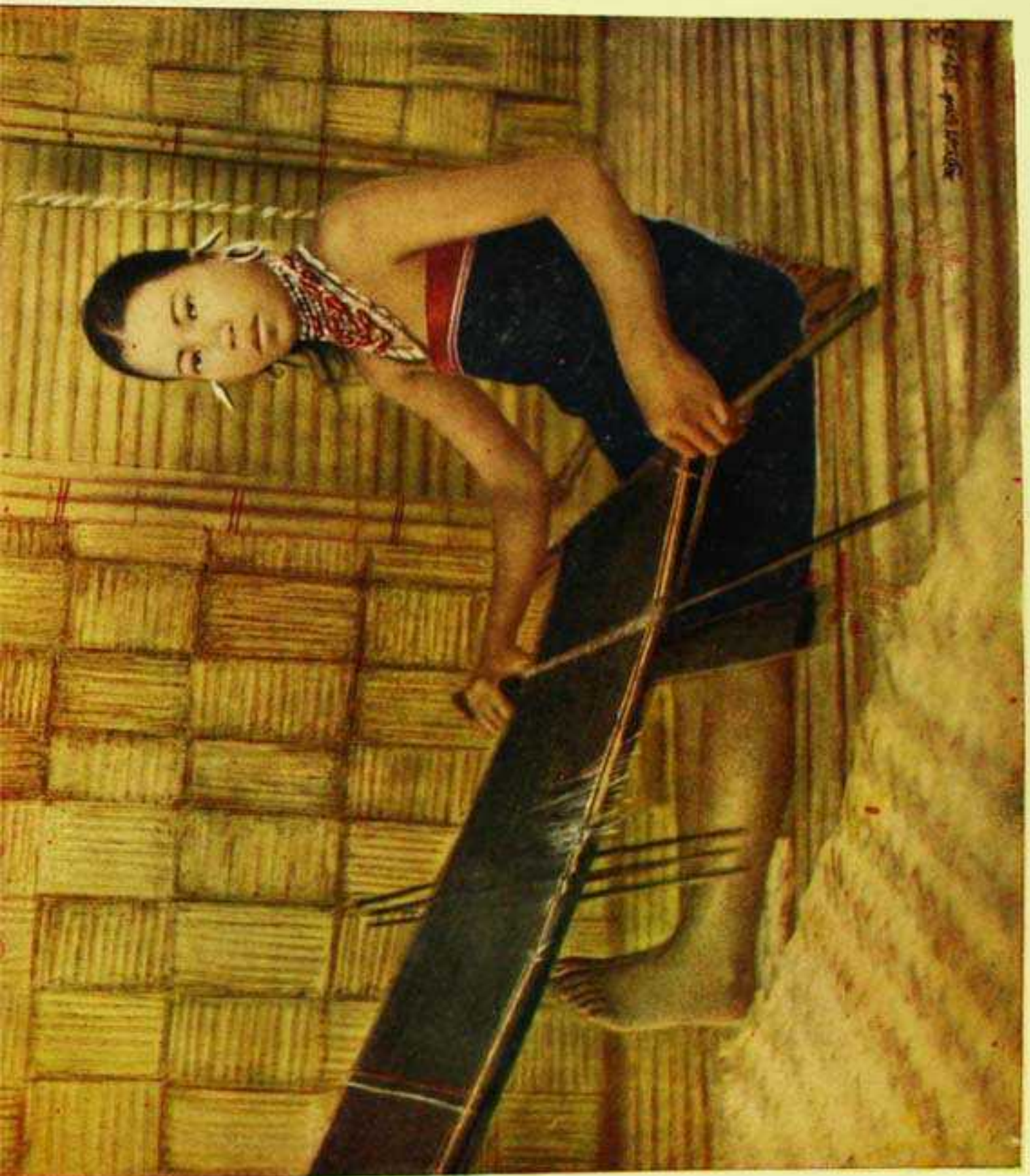
নিকট। ৩২ সংখ্যক নৃপতি প্রতর্দ্দন সগরদ্বীপের রাজধানী ছাড়িয়া কিরাতদিগকে পরাজয়-পূর্ব্বক কাছাড়ে যাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বর্ত্তমান ত্রিপুররাজ্য সংস্থাপিত করেন। এই কিরাত-জাতি-বেষ্টিত হইয়া ইহারা অনার্য্য আচার ও উপাধি অবলম্বন করেন। ৭৩ সংখ্যক রাজার সময় হইতে ত্রিপুর-রাজগণ অনেকে "ফা" (পিতা বা প্রভু) উপাধি ধারণ করিয়াছেন। চীনদেশের প্রভাবান্বিত 'হালাম' নামক পার্ব্বত্য জাতির এক সময়ে ত্রিপুরাঞ্চলে বিশেষ প্রভুত্ব ছিল, সেই জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ত্রিপুরায় পুনরায় আর্য্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিপত্তি আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে ত্রিপুর-রাজগণ উক্ত চীন-প্রভাবান্বিত হালাম জাতির ভাষা হইতে অনেক সময়ে উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে শক ও হূণ রাজারা তাঁহাদের নিজেদের নামের সঙ্গে হিন্দু উপাধি গ্রহণ করিতেন (১২০ পৃঃ)। এই 'হালাম' ভাষার প্রচলন এত বেশী হইয়াছিল যে ধন্যমাণিক্য (১৪৬৩ খৃঃ-১৫১৩ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাজত্বের প্রথম সময়ে বাঙ্গলা ভাষা বুঝিতে পারিতেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানে, বৌদ্ধ প্রভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ লোপ পাইবার পর, সংস্কৃত ও "সুভাষার" (বাঙ্গলা ভাষার) প্রচলন এতদ্দেশে বেশী হইয়াছিল।

হালামদের উপাধি।

স্মরণাতীত কাল হইতে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে বয়ন-শিল্পের প্রচলন আছে। পাছুড়ি, ছুবেড়া, পরী (আসন) প্রভৃতি বস্ত্র প্রায় সমস্ত পাহাড়িয়া রমণীরাই প্রস্তুত করিতে পারেন। যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক বলিয়া কথিত সুলোচন রাজা শিল্পের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনিই তদ্দেশে কার্পাস-বস্ত্রের বেশী প্রচলন করিয়াছিলেন। ১৪১ স্থানীয় রাজা রাজ-সূর্য্যের (আচঙ্গ ফা) মহিষী জয়ন্ত-রাজ-কুমারীই রাজ-পরিবারে বস্ত্র-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার পুত্রবধূও পরে এবিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জয়ন্ত-রাজ-কুমারী আচঙ্গ ফার মহিষীই ত্রিপুরার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র "রিয়া"র উদ্ভাবন করেন। এই "রিয়া" প্রাচীন কালের সুপ্রসিদ্ধ "কাঁচুলী", ইহাতে নানারূপ ফুল-লতা, পশুপক্ষী, মনুষ্য ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি সূত্রদ্বারা প্রস্তুত হইত। এই "রিয়া" শুধু রাজপরিবার ও ঠাকুর সাহেবদের গৃহ-ললনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন; ইহার ব্যবহারও তাঁহাদের মধ্যেই আবদ্ধ। মসলিনের ন্যায় রিয়ার আদরও বঙ্গে সর্ব্বজন-বিদিত। ত্রিপুরেশ্বরগণের অনেকেরই শিল্পের দিকে এতটা ঝোঁক ছিল যে শিল্পের পটুত্ব দেখিয়া তাঁহারা রমণীকুল হইতে মহিষী নির্ব্বাচন করিতেন। কথিত আছে, উদয়মাণিক্য শিল্পকুশলী ২৪৩টি রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রশিল্পে কৃতী ছিলেন (১৫৭২-৭৬ খৃঃ)। ত্রিপুর-রমণীগণ এখনও হাতের চরকা ছাড়েন নাই, ১৯২০ সনের সেন্সাসে দৃষ্ট হয়, পার্ব্বত্য-ত্রিপুরায় মোট ৩৪,৮৫৬ ঘর গৃহস্থ, তন্মধ্যে ৩১,৪৮৫ খানি তাঁত চলিয়াছে। বয়ন-শিল্পের সঙ্গে স্বর্ণ-খচিত গজদন্তের পাটীর জন্যও ত্রিপুর-বাসীরা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য (১৫২৫-৭২ খৃঃ) ধ্বজঘাট হইতে অনেক কাংস্য-বণিক্ আনিয়া ত্রিপুরায় কাঁসা-পিতলের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা

ত্রিপুরার শিল্প।

ভাস্কর্য।

রাজ্যের পার্ব্বত্য-প্রদেশে ও সমতল ক্ষেত্রের যেখানে সেখানে ধাতব ও প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরার কোন কোন স্থানের প্রস্তরে ক্ষোদিত এবং পাহাড়ের গায় উৎকীর্ণ মূর্ত্তি খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয়। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য ঊনকোটী তীর্থের ঊনকোটীশ্বর শিব। যে যুগে মনুষ্য-কল্পনা অতিকায় মূর্ত্তি ধারণা করিতে ভালবাসিত, এই মূর্ত্তি সেই যুগের। শত শত ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন ক্ষোদিত অজ্ঞাত দেব-মূর্ত্তি-সঙ্কুল ধূসর পর্ব্বতে ঊনকোটীশ্বর এখনও সমাধি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের সীমা পর্য্যন্ত—ঊনকোটী তীর্থ—এই দেবতার অধিকার-ভুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। এই মহা-মূর্ত্তি পর্ব্বত খুঁড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহার নিম্নভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির এক কান হইতে অপর কান পর্য্যন্ত ২১ ফুট এবং সমগ্র মূর্ত্তিটি ১৮০ ফুট। গোঁফের একটা দিক্ ভগ্ন, অপর দিক্ দুই ফুট তিন ইঞ্চি। ত্রিপুরার একটি পল্লীতে আর একটি মহাকায় দেবমূর্ত্তি আছেন, ইনি মৃন্ময় এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পরে ইহাকে সংস্কার করা হয়—এই মূর্ত্তিও স্মরণাতীত কাল হইতে পূজিত হইতেছেন।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা অনেক সময়েই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। রাজা বীর হাম্বীর (বিষ্ণুপুরে), রাজা চাঁদরায় (গৌড়দ্বারে), ত্রিপুর, কোচবিহার ও আসামের রাজারা মুসলমানাধিকারের অনেক কাল পর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া মধ্যে মধ্যে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। সোলেমান খাঁর শ্যালক সেনাপতি মমারক খাঁকে পূজক চন্তাই চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দিয়াছিলেন, একথা মুসলমান লেখকেরা গোপন করিয়া গিয়াছেন, অথচ রাজমালার লেখকেরা তাঁহাদের পরাজয় গোপন করেন নাই। ধন্যমাণিক্য বহু যুদ্ধে হুসেন সাহের সৈন্য পরাভূত করিয়াছেন, কিন্তু পাঠানদের আশ্রিত কবি শ্রীকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, "ত্রিপুর-নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ। পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।" এদিকে উদয়মাণিক্যের সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধে ত্রিপুরসৈন্য গুরুতর ক্ষতি সহ্য-পূর্ব্বক হারিয়া গিয়াছিল, রাজমালায় লিখিত হইয়াছে—"পঞ্চ সহস্র পাঠান পড়িল এই রণে। চল্লিশ সহস্র পড়ে ত্রিপুরার গণে।"—আমরা কোচবেহারের ইতিহাসেও মুসলমান লেখকদের এই পক্ষ-পাতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। হিন্দুদের প্রাদেশিক ইতিহাসগুলি লুপ্ত হইয়াছে, এজন্য এইরূপ ক্ষেত্রে সত্যনির্ণয় দুরূহ হইয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাস-লেখক।

এক সময়ে ত্রিপুররাজ্য উত্তর সীমানার পার্ব্বত্য-প্রভাবে পড়িয়া—অনার্য্য রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু রাজারা ক্রমাগত নিম্ন ভূমে অভিযান করিয়া, কেহ কেহ দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। ধন্যমাণিক্যের পূর্ব্বে ত্রিপুর-দেশ বাঙ্গালীদিগকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিত; ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বাঙ্গালীদিগকে বলি দেওয়া হইত। ধন্যমাণিক্য এই

বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

দুর্নীতি ও শত্রুতার স্থলে সৌহার্দ্য ও শান্তি স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার পৌত্র বিজয়-মাণিক্যের সময়েও নির্ব্বাপিত বহ্নির]কিছু কিছু স্ফুলিঙ্গ দেখা দিত। উক্ত রাজা খণ্ডল-বাসী বাঙ্গালীদের এরূপ দুর্গতি করিয়াছিলেন যে বস্ত্রাভাবে তাহারা বৃক্ষপত্র পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বিক্রমপুরের ভদ্র-সমাজে ইহার অকথ্য অত্যাচার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। এদিকে ইনিই আবার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে স্বর্ণ ও ভূমি দান করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব-বঙ্গে দিগ্বিজয়ের ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণের অকথ্য কষ্ট হইয়াছিল, অপর দিকে ক্রমশঃ বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে পার্ব্বত্য-ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, যদিও রাজ্যের সীমান্তে টিপ্রা ভাষা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে—তথাপি সমগ্র ত্রিপুরা দেশ এখন বাঙ্গলা সমাজের অঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গলাভাষা গ্রহণ করিয়াছে। ধন্যমাণিক্য পাঠানদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মেহেরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত, বিষণ উড়ি, প্রভৃতি পরগনা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। উত্তরে থানাংচি রাজ্য এবং কুকী অধ্যুষিত সমস্ত পাহাড়িয়া দেশ তিনি ভীষণ যুদ্ধের পর দখল করিয়াছিলেন, চট্টগ্রাম তিনি এবং পরে বিজয়মাণিক্য দখল করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য শ্রীহট্ট জয় করিয়া সুবর্ণ-গ্রামের পাঠান-দিগকে দলন-পূর্ব্বক পদ্মাতীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর হইতে পশ্চিমে জাহ্নবী (বুড়ী গঙ্গা) এবং সরস্বতীর তীর পর্য্যন্ত বিশাল জনপদ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। এই ভাবে ত্রিপুরেশ্বর বঙ্গের এক প্রকাণ্ড বিভাগ স্বাধিকারে আনিয়া বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্প পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন। এক কালে এই সমস্ত স্থান মহাভারতের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিল; রাজারা মহাভারত ও অপরাপর শাস্ত্র-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন, উত্তর কালে মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গের বংশধরেরা খোল করতাল লইয়া এই রাজ্যকে প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কুমিল্লায় পাহাড়িয়া কুকীরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে যখন নিম্ন-ভূমে অবতরণ করে, তখন তাহাদের কেহ কেহ বটতলার প্রকাশিত চৈতন্য-চরিতামৃত ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বৈষ্ণব-শাস্ত্র-প্রকাশের জন্য বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে এক লক্ষ টাকা দিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

এই রাজাদের কাহিনী পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক রাজাই বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সে দেশে কি বাঙ্গলা টীকা লওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল না? ত্রিপুরারাজ্যে যে এই ব্যাধি খুব সংক্রামক ভাবে কোন কালে দেখা দিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মহারাজ মহামাণিক্য, ধন্যমাণিক্য, ধর্ম্মমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, ছত্রমাণিক্য ইহারা সকলেই বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া রাজমালায় লিখিত হইয়াছে; মহামাণিক্য ১৪৩১ খৃঃ অব্দে, ধর্ম্মমাণিক্য ১৪৬২ খৃঃ অব্দে, ধন্যমাণিক্য ১৫১৫ খৃঃ অব্দে, বিজয়মাণিক্য

বসন্ত রোগ।

১৫৭০ খৃঃ অব্দে, ছত্রমাণিক্য ১৬৬০ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬০ খৃঃ অব্দ—এই ২২৯ বৎসরের মধ্যে ৫ জন নৃপতি পর পর বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন, রাজমালার এই উক্তির মধ্যে কিছু ভুল আছে বলিয়াই মনে হয়।

আর একটি কথা, বহু পূর্ব্ব হইতে এই রাজকাহিনীতে বাঙ্গলার দ্বাদশ মণ্ডলাধিপের কথা পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাইতেছে—ইহারাই বাঙ্গলার "বারভূঞা"। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও ইহাদের কথা আছে। গৌড়েশ্বরগণ কর্ত্তৃক দ্বাদশ সামন্ত-রাজ নিযুক্ত করার প্রথা বহু প্রাচীন। "প্রাচীনকালে ত্রিপুররাজ্য ৭,৫০০ বর্গ মাইল ব্যাপক ছিল।"

দ্বাদশমণ্ডল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাগ্জ্যোতিষপুর

প্রাগ্জ্যোতিষ পুরপ্রাচীনকালে অতি বিস্তৃত স্বাধীনরাজ্য ছিল; এক এক সময়ে এই রাজ্য সিলেটের অনেকাংশ গ্রাস করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থান নিজ কুক্ষিগত করিয়াছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত কোচবিহার এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গের ভাটিদেশ মৈমনসিংহের পূর্ব্বাংশ এমন কি ঢাকা পর্য্যন্ত এই রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। ঢাকা জেলার উত্তরাংশে বিশেষ ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের বহু মুদ্রা আমরা দেখিয়াছি। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অন্য নাম কামরূপ। এখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে কামাখ্যা দেবী প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। তান্ত্রিক-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ এই তীর্থেই বিশেষ রূপে হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নরক, ভগদত্ত, মুর প্রভৃতি রাজারা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন; মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি বহু পুরাণে ইহাদের বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। বাণ রাজাও সেই যুগের এক কীর্ত্তিমান্ পুরুষ—ইহারা সকলেই কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। রামায়ণে যে নরক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়—কৃষ্ণের সমকালিক নরক কখনও তিনি হইতে পারেন না। এই নরক কর্ত্তৃক দেবমাতা অদিতির কর্ণের কুণ্ডল হরণ করার অপরাধে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়, কৃষ্ণ ইহাকে ও ইহার প্রধান সেনাপতি মুরকে বধ করিয়া কুণ্ডল গ্রহণ করেন। জয়দেব এই নরক ও মুরের কথা তাঁহার অমর-গীতিকার স্তোত্রে উল্লেখ করিয়াছেন: "মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন হে—শ্রীমুখচন্দ্রচকোর জয় জগদীশ হরে।" বাণের কন্যা ঊষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গন্ধর্ব্ব-রীতিতে বিবাহ করেন, বাণ তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন,—এইসূত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে বাণের যুদ্ধ হয়। ইহার রাজধানী শ্রীহট্টের লাউর-নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন। বাণ শিবের ভক্ত ছিলেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

কথিত আছে, শিব ইহাকে স্বীয় পুত্র কার্ত্তিকেয় হইতেও বেশী ভালবাসিতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বীরগণের সম্বন্ধে এইরূপ নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিকগণ সেগুলির মধ্যে অবশ্য অনেক কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া রাজাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই।

হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিলে জানা যায় প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজারা অতি পরাক্রান্ত ছিলেন এবং ইহারা যুধিষ্ঠিরের সময়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের পুরোভাগে অবস্থিত ছিলেন। ইহাদের অনেকেই প্রাচ্য-সম্রাট্ জরাসন্ধের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, রামায়ণের বর্ণনায় যে লোহিত-সাগর পাওয়া যায়, তাহা আরবের পশ্চিমে অবস্থিত "রেড সি" নহে, তাহা লৌহিত্য নদ। এই নদ এককালে হয়ত সাগরোপম ছিল, বনমালের তাম্রশাসনে এই নদকে "লৌহিত্যসিন্ধু" বলা হইয়াছে। বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে ইহাকে "বারিধি" ও রত্নপালের শাসনে 'সিন্ধু' এবং ইন্দ্রপালের শাসনে "সরিৎপতি" নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম করতোয়া। সম্ভবতঃ এই সাগরোপম বাধা অতিক্রম করিতে না পারিয়া ভারত-বিজয়ী জাতিরা গৌড় দেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এইখানে ঠেকিয়া পড়িতেন। নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিয়াছেন, এই স্থানে বেদোক্ত পণিজাতি ও আর্য্যগণের নানা শাখা বেদের সময় হইতে বসবাস করিতেছেন, এখান হইতে পণি (বণিক্ জাতি) পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাণিজ্য-জাহাজ লইয়া যাতায়াত করিত, এখনও এখানে চর্ম্মোপবীতধারী ঋষির বংশধরগণ ঠিক বেদমন্ত্রের ন্যায় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমকার্য্য করিয়া থাকেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন—খাস বঙ্গদেশে যেরূপ সমস্ত জাতি মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, আসামে তাহা হয় নাই। আসামে বহু-পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার লইয়া এক এক জাতি স্বীয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আছে। এই দেশকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার একখানি সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিকগণের তীক্ষ্ণ সন্ধানী উৎসুক দৃষ্টির আলো-রেখা এখনও এই পার্ব্বত্য প্রদেশের নিগূঢ় নিকেতনে প্রবেশ করে নাই। এই খনি আবিষ্কৃত হইলে অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য এখান হইতে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এককালে বশিষ্ঠের মত মহর্ষি নাকি কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। লৌহিত্য নদের তীরে যুগে যুগে যে রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম বিপ্লবের অভিনয় হইয়াছে, তাহার সন্ধান করার স্থান এখানে নহে, সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয় লইয়া আমরা বিলম্ব করিব না। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আর্য্যাবর্ত্তে—বিশেষ গৌড়দেশে ইহাদের কি দান, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

বাণলিঙ্গ।

১। বাণলিঙ্গ (মহারাজ বাণের দ্বারা পূজিত একরূপ শিবলিঙ্গ) আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র শৈবগণ কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত। কথিত আছে অন্য প্রকার শত শত শিবলিঙ্গ পূজার যে ফল, একটিমাত্র বাণলিঙ্গ-পূজার ততোধিক ফল।

২। কামাখ্যাতীর্থ, সমস্ত হিন্দুর একটি প্রধান ধর্ম্মস্থান,—এই স্থানে তান্ত্রিক যাদুবিদ্যার এতটা প্রচলন হইয়াছিল যে, এককালে অন্ততঃ গৌড়দেশবাসী সকল তান্ত্রিকই সর্ব্ববিষয়ে কামাখ্যার দোহাই দিতেন। বাঙ্গলা শত শত পল্লীগাথায় যাদুবিদ্যার কথা হইলেই কামাখ্যা তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এমন কি বহু উর্দ্দ-শব্দ-কণ্টকিত "মুসলমানী বাঙ্গলায়" লিখিত পুঁথিতেও আমরা যাদুবিদ্যা-প্রসঙ্গে কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি। পুরুষকে ভেড়া করিয়া রাখিবার যে সকল টোনা আছে, বাঙ্গলা দেশ এক বাক্যে কামরূপ-বাসিনীদিগকেই সেই টোনার একমাত্র অধিকারিণী বলিয়া জানে। কালীঘাটের পটুয়ারা সেদিন পর্য্যন্তও কামরূপ বা কাম্‌তাবাসিনীদিগের এইরূপ ভেড়া বানাইবার ছবি আঁকিয়া বিক্রয় করিত।

কামাখ্যাতীর্থ।

৩। কামরূপের চিত্রভাস্করদের নাম ইতিহাস-বিশ্রুত। চিত্রকর ও চিত্রকরীর বহু উল্লেখ আমরা ভারতীয় সাহিত্যে পাইয়াছি। অজন্তা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের চিত্র-নিদর্শনের অভাব নাই। কিন্তু চিত্রাঙ্গদাই ভারতীয় সাহিত্যে চিত্রকরী বলিয়া সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনি বাণ-রাজকন্যা উষার সঙ্গিনী ছিলেন এবং মনুষ্যের প্রতিকৃতি এরূপ সুন্দরভাবে আঁকিতে পারিতেন যে তদঙ্কিত ছবিগুলি মুকুরে বিম্বিত মূর্ত্তির ন্যায় অবিকল হইত। বহু চেষ্টার পর এই চিত্রকরীর চিত্র দেখিয়া উষা অনিরুদ্ধের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশ-পুরাণে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে চিত্রবিদ্যার উল্লেখ আছে—উত্তর-চরিতে রামের বাল্যজীবনের চিত্রলেখমালা দর্শনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল; শকুন্তলা নাটকে রাজা দুষ্মন্ত যে ছবি আঁকিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা চিত্র-শিল্পের অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচায়ক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দূরত্ব-বোধক রেখা এবং আলো ও ছায়া ভারতীয় শিল্পী আঁকিতে পারিতেন না। অজন্তার চিত্রাবলীতে জিনিষ ও আসবাব-পত্রের আকৃতি ও সংস্থান এরূপ যথাযথ-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহা দেখিয়া কোন্ দ্রব্য কতটা দূরে—তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়,—উহা এদেশে বিদেশী সভ্যতার দান নহে। বিদূষক বলিতেছেন— "সাহু বঅস্‌স। মহুরাবথাণ-দংসণিজ্জো ভাবাণুপ্পবেসো। খলদি বিঅ মে দিট্‌ঠী ণিণ্ণুণ্ণদপ্পদেসেসু।" (বয়স্য, সাধু!—অবস্থানের নৈপুণ্যে ভাবের সমাবেশ সুন্দর হইয়াছে, নিম্ন ও উন্নত অংশগুলিতে যেন দৃষ্টি স্খলিত হইতেছে)। এই নিম্নোন্নত স্থান-প্রদর্শন আলো ও ছায়ার সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। দুষ্মন্ত তাঁহার ছবির অঙ্কনের যে পূর্ব্ব-কল্পনা দিয়াছেন, তাহাতে শিল্প-কুশলতা ও অন্তর্দৃষ্টি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—"শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ। শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানং মৃগীম্" (শাখা হইতে বল্কল ঝুলিত, এইরূপ একটি বৃক্ষের নীচে মৃগী কৃষ্ণ মৃগের শৃঙ্গে আপনার বাম নয়ন ঘষিতেছে ইহাই আঁকিতে ইচ্ছা করি)।" কবির দৃষ্টি ও চিত্রকরের দৃষ্টি এখানে "মিশিয়া স্বর্ণ জড়িত যেন হীরা" হইয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম আদি স্থান প্রাগ্জ্যোতিষপুর।

চিত্রবিদ্যা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক যুগের আদিকাল

আদি যুগের উপকথার কোয়াসা-বিজড়িত অস্ফুট তরুণালোকের রাজ্য ছাড়িয়া আমরা ঐতিহাসিক যুগে অবতরণ করিব। এ পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্যের দশখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১। ভাস্কর বর্ম্মার নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন। ২। হর্জ্জর বর্ম্মার হায়ুংথলে প্রাপ্ত তাম্রফলক। ৩। তেজপুরে প্রাপ্ত মহারাজ বনমালার তাম্রলিপি। ৪। নৌগাঁয় প্রাপ্ত বলবর্ম্মার তাম্রশাসন। ৫। বড় গাঁয়ে প্রাপ্ত রত্নপালের ১ম তাম্রশাসন। ৬। সোয়ালকুচিতে প্রাপ্ত ঐ রাজার তাম্রশাসন। ৭। গৌহাটিতে প্রাপ্ত ইন্দ্রপালের প্রথম তাম্রশাসন। ৮। গুয়াকুচিতে প্রাপ্ত ঐ রাজার ২য় তাম্রশাসন। ৯। ধর্ম্মপালের শুভঙ্কর পাটক লিপি। ১০। ঐ রাজার পুষ্পভদ্রা লিপি। ইহা ছাড়া হর্জ্জর বর্ম্মার প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিও এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

তাম্রশাসন।

১। ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রলিপি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ। এই ভাস্কর বর্ম্মার সময়ে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে হিউনসাং তাঁহার সভায় অতিথি হইয়াছিলেন। কনোজাধিপ হর্ষের সঙ্গে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের যুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি কনোজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তাম্র-শাসনখানি কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। হয়ত সাময়িক ভাবে তখন উক্ত রাজধানী ভাস্কর বর্ম্মার অধিকৃত ছিল। ভাস্কর বর্ম্মার পরিচয়স্থলে তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, ইনি কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত নরক রাজের বংশোদ্ভব। নরকের পুত্র ভগদত্ত,—তৎপুত্র বজ্রদত্ত। নরকবংশীয় রাজারা তিন হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর সেই বংশে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পুষ্যবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। ১ পুষ্য বর্ম্মা, ২ সমুদ্র বর্ম্মা, ৩ বল বর্ম্মা (দত্তা দেবীর গর্ভজাত), ৪ কল্যাণ বর্ম্মা (রত্নাবতীর গর্ভজ), ৫ মহেন্দ্র বর্ম্মা (যজ্ঞবতীর গর্ভজাত), ৬ নারায়ণ বর্ম্মা (রাজ্ঞী সুব্রতার গর্ভজাত), ৭ মহাভূত বর্ম্মা (দেববতীর গর্ভজাত), ৮ চন্দ্রমুখ বর্ম্মা (দেববতীর গর্ভজাত), ৯ স্থিত বর্ম্মা, ১০ সুস্থিত বর্ম্মা (নয়ন দেবীর গর্ভজাত শ্রীমৃগাঙ্ক উপাধি), ১১ সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা (শ্যামা দেবীর গর্ভজাত)। ভাস্কর বর্ম্মা এই সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্যামা দেবীর গর্ভজাত। কথিত আছে ইনি "স্বীয় বাহুবল দ্বারা সমস্ত সামন্তচক্রের বল খর্ব্ব করিয়া" সার্ব্বভৌম নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কানোজের সহিত মৈত্রী নিবন্ধন ইনি পশ্চিম হইতে বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার রাজ্যে আনয়ন করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন।

ভাস্কর বর্ম্মা—৭৪৩ পৃঃ।

২। হর্জ্জর বর্ম্মা—এই অনুশাসনে গুপ্তাব্দ ৫১০ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং ৮২৯ খৃষ্টাব্দ। ইহা হারূপেশ্বর স্কন্ধাবার হইতে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ এই স্থানটি তেজপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল।

হর্জর বর্ম্মার পিতার নাম প্রালম্ভ ও মাতার নাম জীবদা, ইনি সালস্তম্ভ-বংশসম্ভূত। ইহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা বনমালা। "শ্রীমান্ হর্জর দেব সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের ন্যায়, প্রণত রাজগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া সর্ব্ব-তীর্থবারি-পরিপূর্ণ মাঙ্গল্য রৌপ্য-কলসের জলের দ্বারা বণিগ্জন-পুরঃসর সদ্বংশ-জাত রাজ-পুত্রগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।"

হর্জর বর্ম্মা।

৩। বনমাল,—অনুমান নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি মহারাজ হর্জর বর্ম্মার পুত্র। এই অনুশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা নরক ও ভগদত্তের বংশীয় বলিয়া দাবী স্থাপন করিয়াছেন। শাসনখানির সংস্কৃত নির্দ্দোষ ও অতিশয় কবিত্বপূর্ণ—বিশেষ লৌহিত্য নদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি।

বনমাল।

৪। বল বর্ম্মা, ইনি বনমাল বর্ম্মার পৌত্র, দশম শতাব্দীর প্রথম-ভাগ ইঁহার রাজত্ব কাল। এই অনুশাসনে ভক্তিমান্ মহারাজ বনমাল-দেবের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "ক্রোধ বা হাস্যে তাঁহার মুখ-বিকৃতি কেহ দেখেন নাই, কোন নীচ বা অভদ্র কথা তিনি উচ্চারণ করেন নাই, সর্ব্বদা হিতবাক্য তাঁহার মুখে শোনা যাইত। তাঁহার বিশাল ও অতুল্য প্রাসাদশ্রেণী নানা চিত্র-সমন্বিত এবং বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ছিল।" বোধ হয় সেই প্রাচীন আদর্শে এখনও আসামের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। গেট সাহেবের পুস্তকে প্রদত্ত রাজপ্রাসাদের ছবি দ্রষ্টব্য।

বল বর্ম্মা।

এই অনুশাসন হইতে জানা যায়, বনমাল দেবের পুত্রের নাম জয়মাল,—ইঁহার উপাধি বীরবাহু, বল বর্ম্মা তাঁহার পুত্র।

৫। রত্নপাল—সময় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগ। যদিও সালস্তম্ভবংশীয় নৃপতিগণ আপনাদিগকে নরক-ভগদত্তবংশীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তথাপি বোধ হয় তাঁহারা সেই প্রাচীন রাজবংশের কেহ ছিলেন না। রত্নপালের অনুশাসনে ইঁহাদিগকে ম্লেচ্ছবংশসম্ভূত বলিয়া নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। রত্নপালের অনুশাসনে আছে—"বংশানুক্রমে নরকবংশীয় রাজারা পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ ম্লেচ্ছাধিপতি সালস্তম্ভ সেই শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ...... তাঁহাদের একবিংশতিতম রাজা ত্যাগসিংহ নির্ব্বংশ অবস্থায় স্বর্গারূঢ় হওয়াতে 'পুনশ্চ আমাদের নরকবংশীয় রাজারই প্রয়োজন' এই স্থির করিয়া প্রজাগণ......... শ্রীব্রহ্ম পালকে রাজা মনোনীত করিয়াছিলেন।" রত্নপাল—ব্রহ্ম-পালের পুত্র। ইঁহার পরাক্রমের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, ইঁহার রাজধানী, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের দুর্জ্জয়ানামক নগরী—(১) শকরাজরূপ ক্রীড়া-পক্ষীর দৃঢ় পঞ্জর, (২) গুর্জ্জরাধিপতির জ্বর-স্বরূপ, (৩) দুর্দ্দান্ত গৌরাধিপতিরূপ হস্তীর কূট পাকল (একরূপ হস্তিরোগ) সদৃশ, (৪) কেরলেশ্বররূপ পর্ব্বতের বর্ম্মস্বরূপ, (৫) বাহিক ও তায়িক (কাশ্মীর রাজ্যের সন্নিহিত প্রদেশ) রাজ্যের আতঙ্কজনক ছিল। এই সকল রাজাদের সঙ্গে রত্নপালের কোথায় কিভাবে সংঘর্ষ হইয়া ইঁহার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

রত্নপাল।

ইন্দ্রপাল।

৬৩৭। রত্নপালের পুত্র পুরন্দর-পালের অকালমৃত্যুতে তৎপুত্র (রত্নপালের পৌত্র) ইন্দ্রপাল রাজা হইয়াছিলেন, সময়—একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইহার তাম্রশাসনের শিববন্দনাটি বড় সুন্দর। আমরা বৈষ্ণবপদে পুনঃ পুনঃ পাইয়াছি, রাধা-কৃষ্ণ বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন—"হারিলে তোমারে দিব বেশর কাঁচুলি। জিনিলে লইব তোমার মোহন মুরলী।" অনুশাসনের বন্দনায় পাওয়া যাইতেছে, হরগৌরী বাজী রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন ও শিব পরাস্ত। গৌরী বলিতেছেন, "তোমার সর্ব্বস্ব—খট্টাঙ্গ, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রভৃতি আমি জিতিয়াছি, কিন্তু সমস্তই আমি ফিরাইয়া দিলাম, কেবল গঙ্গা আমার জলবহনার্থ কিঙ্করী হইয়া থাকুক।"

ধর্ম্মপাল।

৮। ধর্ম্মপাল—এই বংশের আদি পুরুষ ব্রহ্মপাল, ২য় রত্নপাল, ৩য় ইন্দ্রপাল, ৪র্থ গোপাল, ৫ম হর্ষপাল, ৬ষ্ঠ ধর্ম্মপাল। ধর্ম্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

সীমা।

ভাস্কর বর্ম্মার সময়ে প্রাগ্জ্যোতিষপুর রাজ্য চতুর্দ্দিক্ বেড়িয়া ১৬৬৭ মাইল ব্যাপক ছিল। কানিংহামের মতে সমস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা ভূমি, কোচবিহার এবং ভূটান এই সুবিস্তৃত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে 'সু' জনপদ এবং শ্রীহট্টের কতকাংশও প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধীন ছিল। গেট সাহেব বলেন, এই বংশের ইন্দ্রপাল রাজাকে বল্লালের পিতা বিজয় সেন পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই যুগের কোন সময়ে তিষ্যদেব নামক প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা পাল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করাতে বৈদ্যদেব নামক তাঁহার (কুমারপালের) ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী কর্ত্তৃক পরাস্ত ও নিহত হন। বৈদ্যদেব তথাকার রাজা হইয়াছিলেন (২৭০ পৃঃ)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাঠান-আক্রমণ ও ক্রমশঃ অধিকার-সঙ্কোচ

এই বিপ্লবের পরে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে মহম্মদ ইবন্ বক্তিয়ার খিলিজির আসামের বিরুদ্ধে অভিযান করার সংবাদ পাইতেছি। বক্তিয়ার বহু বিড়ম্বিত হইয়া এই রাজার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি পাইয়া মৃত্যুর জন্য বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ১২৫৭ খৃঃ অব্দে যুজবক তোগ্রেল খাঁ কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কিয়ৎকালের জন্য বিজয়ী হইয়াছিলেন, একটি মসজিদ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল,—কিন্তু বর্ষাগমে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি কামরূপেশ্বরের হাতে নিহত হইলেন। ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে

মহম্মদ সাহার ১,০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য কামরূপ-রাজের যাদু-বিদ্যার প্রভাবে সমস্তই বিনষ্ট হইল। (আলমগির নামা, ৭৩১ পৃঃ)। কিন্তু এই সময় হইতে প্রাগ্জ্যোতিষপুর বহু খণ্ড-রাজ্যে পরিণত হইয়া প্রত্যেকটি কোন কোন পার্ব্বত্য রাজবংশীয় নেতার অধিকারে আসিল। চুটিয়া রাজারা সুবর্ণশ্রী ও দিশাং নদীর পূর্ব্বভাগে, পশ্চিমে কাছাড় রাজগণ, এবং পরবর্ত্তী সময়ে অহম্ রাজগণ, স্বীয় স্বীয় অধিকার লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছেন। চুটিয়াদের উত্তরে এবং কাছাড়ীদের পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞা রাজারা (দ্বাদশ ভৌমিক) আধিপত্য করিতেন। দক্ষিণে, পূর্ব্ব মৈমনসিংহে দুর্গাপুর, জঙ্গলবাড়ী, দশ কাহনিয়া, বোকাইনগর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজবংশীয় নেতারা এই সময়ে স্বাধীন হইয়াছিলেন। এদিকে কোচবিহার প্রবল হইয়া এক সময়ে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছিল। চুটিয়াদের আদি রাজা বীর পাল,—তৎপুত্র গৌরীনারায়ণ (সোনা গিরিপাল) ভদ্রসেন নামক এক রাজাকে হত্যা করিয়া রত্নপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশে গৌরীনারায়ণের (রাজ-উপাধি রত্নধ্বজ পাল) পর নয়টি রাজা হইয়াছিলেন। অষ্টম রাজা ধীরনারায়ণের নাবালক পুত্রের অভিভাবক এবং জামাতা সাধক অহম্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বারভূঞাদের আদিপুরুষ সমুদ্র, তৎপুত্র মনোহর,—মনোহরের কন্যা লক্ষ্মীর গর্ভে শান্তনু এবং সামন্ত জন্মগ্রহণ করেন। সামন্তের বংশধর রাজধর নোয়াগাঁয়ে বরদোয়াতে উপনিবিষ্ট হন, রাজধরের পুত্র কুসুমবরের দেশবিশ্রুতকীর্ত্তি মহাপুরুষ শঙ্কর দেবের কথা আমরা পরে লিখিব। বার ভূঞাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অহম্গণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। চুটিয়া রাজগণের সময়ে কামাখ্যাদেবীর মন্দির নিত্য নরবলির রক্তে প্লাবিত হইত। কামতার রাজগণের শেষ বংশধর নীলাম্বর ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে হুসেন সাহ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। খেন রাজগণের আদি পুরুষ গরুড় রাখাল ছিলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলধ্বজ উপাধিতে পরিচিত হইলেন। হ্যামিল্টন কামতাপুরের রাজ্য ১৯ মাইল ব্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ এবং তৎপুত্র নীলাম্বর। এই নীলাম্বরের রাজ্ঞী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পুত্রের প্রেমে আবদ্ধ হন। রাজা উহা জানিতে পারিয়া সেই মন্ত্রিপুত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস রাঁধাইয়া অজ্ঞাতসারে মন্ত্রীকে খাওয়ান। শেষে স্বয়ং ঘটনাটি মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী প্রতিশোধ লইবার জন্য অভিসন্ধি করিয়া হুসেন সাহার শরণ গ্রহণ করেন। হুসেন সাহ ১২৯৮ খৃঃ অব্দে কামতাপুর অবরোধ করিয়া বহু কালের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারেন নাই। অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্ঞীর সঙ্গে হুসেন সাহের বেগম দেখা করিতে অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে ছদ্মবেশী কতকগুলি যোদ্ধাকে প্রেরণ করেন। এই ভাবে কামতা মুসলমানের অধিকৃত হয়। রাজা পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৫৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কামতা মুসলমান শাসনাধীন থাকে। ইহার পরে মুসলমানেরা অহম্ রাজাদের রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করার ফলে, সমস্ত মুসলমান সৈন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বাধিকৃত কামতা রাজ্যও তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। ইহার পরে চন্দন এবং মদন নামক দুই ক্ষুদ্র রাজার নাম পাওয়া

কামতা দখল।

যায়, ইহারা বিশ্বসিংহের ভ্রাতা ছিলেন। এই বিশ্বসিংহ ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু প্রতাপে—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বড় নদী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করেন।

অহম্‌রাজদের যে বুরুঞ্জী আছে, গেট সাহেবের মতে তাহার পূর্ব্বভাগ—যেখানে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বংশের উৎপত্তির কথা আছে—তাহা ছাড়া বাকী সবই বিশ্বাস-যোগ্য। অনেকগুলি বুরুঞ্জী পাওয়া গিয়াছে,—গেট সাহেব বলেন, এই জাতির মত ইতিহাস-লেখক পাশ্চাত্ত্য জাতিদের মধ্যে বিরল,—এমন কি মুসলমানেরাও তাহাদের সমকক্ষ নহেন। সৃষ্টিতত্ত্ব তাঁহারা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, গেট সাহেব বলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক, হিন্দুদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সেই সৃষ্টি-তত্ত্বের সার সঙ্কলন তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয়—শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ইহার মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। ইহাদের মধ্যেও আদি-কালে যে প্রবল বন্যা জগৎকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে উপগল্প আছে।

অহম্‌রাজগণ।

অহম্‌রাজ টায়া ও থুনজানের বংশ ৩৩০ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে রাজা খুকুব পৌত্র সুকাফা আসামে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা সান-বংশীয় এবং মৌলং (সুয়েলী নদীর তীরস্থ) নগর হইতে আসামে আগমন করেন। ১২১৫ খৃঃ অব্দে সুকাফা আসামে অবতরণ করেন, তাঁহার সঙ্গে দুইটি শ্বেত হস্তী, ৩০০ হাতী ও ৯,০০০ লোক ছিল। তিনি নাগাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মোরান, বোরাহী প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি ১২২৮ খৃঃ হইতে ১২৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুকাফার পুত্র সুতিফা ১২৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন। নর নামক এক জাতি (সানবংশসম্ভূত) অপেক্ষাকৃত সুসভ্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; ইহাদের রাজা সুতিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, মগেরা তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সুতিফা নররাজ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে চান,—তাহাতে সম্মতি পাইলে সাহায্য করিবেন, বলিয়া পাঠান। কিন্তু নররাজ তাহাতে সম্মত হন না। ইহার পরে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাহাতে সুতিফা বিজয়ী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজা সুবিনফা ১২৮১-১২৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি রাজ্য বৃদ্ধি করেন নাই, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন এই দুই সেনাপতির মধ্যে তুল্যরূপে প্রজা ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সুবিনফার পুত্র সুখাংফা চুটিয়া, কাছাড়ি, ও কামতার রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন, শেষোক্ত রাজার কন্যা 'রাজনী'কে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার ৩৯ বৎসর-ব্যাপক রাজত্ব-কালে অহম্‌রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

সুকাফা—১২২৮-১২৬৮ খৃঃ।

সুতিফা—১২৬৮-১২৮১ খৃঃ।

সুবিনফা—১২৮১-১২৯৩ খৃঃ।

সুখাংফা—১২৯৩-১৩৩২ খৃঃ।

তৎপর সুখাংফার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুখ্রাংফা রাজা হন। তৎকনিষ্ঠ চাওপুলাইএর ষড়যন্ত্রে ইহাকে বহুকাল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার ৩৩ বৎসর-ব্যাপক দীর্ঘ

রাজত্ব-কাল একটা কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় রাত্রিযাপনের মত অতি কষ্টে উদ্‌যাপিত হয়। এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সুতুফা রাজা হন। চুটিয়ার রাজার সঙ্গে কিছুকাল ইহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু এই রাজা সন্ধির ছলে নদীতে লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক সুতুফাকে হত্যা করেন।

সুখাংফা—১৩৩২-১৩৬৪ খৃঃ।
সুতুফা—১৩৬৪-১৩৭৬ খৃঃ।

চার বৎসর কাল সিংহাসন রাজশূন্য থাকে এবং বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন রাজ্য শাসন করেন। এই অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়াতে সুখাংফার তৃতীয় পুত্র টায়াওখাম্‌টি রাজপদে অভিষিক্ত হন। চুটিয়া রাজার প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য ইনি অভিযান করেন, এবং ইহার অনুপস্থিতি-কালে বড়রাণী ছোটরাণীকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়া গর্ভাবস্থায় ব্রহ্মপুত্র-নদের মধ্যে নিঃসহায় ভাবে ভাসাইয়া দেন। চুটিয়ারাজ্য বিজয় করিয়া রাজা ছোটরাণীর এই নিষ্ঠুর অপমৃত্যুর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। কিন্তু বড়রাণীর ভয়ে কিছু করিতে সাহসী হন নাই। রাণী শেষে এরূপ অত্যাচারিণী হইয়া উঠেন যে, প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া নিরীহ রাজাকে হত্যা করে।

টায়াওখাম্‌টি—১৩৮০-১৩৮৯ খৃঃ।

আবার কতক সময়ের জন্য রাজতক্ত শূন্য পড়িয়া থাকে। আমরা টায়াওখাম্‌টির ছোটরাণীকে জলে ভাসাইয়া দিবার কথা লিখিয়াছি; হাবাং গ্রামবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি সন্তান প্রসব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অনাথ বালক ব্রাহ্মণের যত্নে পালিত হন, এবং, তাঁহার পরিচয় বিদিত হইলে, ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে 'সুদাংফা' উপাধি লইয়া রাজা হন। পুনঃপুনঃ সামন্তবিগ্রহে ইনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ ইহার দুশ্চরিত্রা রাণী নানা স্থানে যাইয়া টিপম্, খামজাং এবং এইটন্ প্রভৃতি দলের নেতৃবৃন্দের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। ইহার সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব অহম্-জাতির মধ্যে বৃদ্ধি পায়। রাজার পূর্ব্বতন আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি এই রাজা খুব বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, রাজা খুব বীর ছিলেন—যুদ্ধে সর্ব্বদা পুরোভাগে থাকিতেন। পঞ্চদশ বর্ষে রাজা হইয়া সুদাংফা দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুদাংফা—১৩৯৭-১৪০৭ খৃঃ।

ইহার পরে সুজাংফা—১৪০৭-১৪২২, সুফাকফা—১৪২২-১৪৩৯, এবং সুহেনফা—১৪৩৯-১৪৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইহাদের রাজত্বকালে বিশেষ কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় নাই এবং অহম্‌রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজা সুহেনফা নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু কাছাড়-রাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া একটি রাজকন্যা, ১২টি দাসী এবং ২টি হস্তী যৌতুক দিয়া সন্ধি করেন। সুহেনফাকে একদল আততায়ী ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করে। তৎপুত্র সুপিংফার রাজ্ঞী স্বামীর সাক্ষাতে এক নাগা রাজার রূপের প্রশংসা করাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক

সুজাংফা হইতে সুহেনফা—১৪০৭-১৪৮৮ খৃঃ, সুপিংফা—১৪৮৮-১৪৯৭ খৃঃ, সুহেংমং—১৪৯৭-১৫৩৯ খৃঃ, পাঠানদের পরাজয়।

নাগাপল্লীতে নির্ব্বাসিত করেন। পরবর্ত্তী রাজা স্থহংমংয়ের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল; অহম্‌-রাজেরা এই সময় হইতে 'স্বর্গনারায়ণ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে রাজা স্বীয় রাজ্যে আদমসুমারি করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে চুটিয়া রাজা ধীরনারায়ণের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া বিদ্রোহ করাতে চুটিয়া-রাজ্যটি অহম্‌-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই সময়ে হুসেন সাহ অহম্‌রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। হুসেন সাহার সৈন্যমধ্যে ২৪,০০০ পদাতিক, বহু অশ্বারোহী ও অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ছিল। প্রথমবার হটিয়া যাইয়া রাজা বর্ষাকালে হুসেন সাহার পুত্রসহ সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেন (রিয়াজুস্সালতিন)। এই পরাজয়ের পর মুসলমানেরা আবার দুইবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুরবক এবং হুসেন খাঁ বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারেন নাই, শেষে পরাজিত হইয়াছিলেন; শেষোক্ত সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন এবং অহম্‌রাজ শত্রুশিবিরের ২৮টি হাতী, ৮৫০টি ঘোড়া, অনেক কামান, বন্দুক ও সোনা-রূপা পাইয়াছিলেন। স্থহংমংকে কাছাড়ী, থামজাং, টাবলং এবং নামসাংএর নাগাদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই ইনি বিজয়ী হইয়াছিলেন, এবং কোচ-রাজ বিশ্বসিংহ এবং মণিপুররাজের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি বিশেষ পরাক্রম ও দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পুত্র সুক্লেনফা ইহাকে এক ভৃত্য দ্বারা হত্যা করেন। ইহার পূর্ব্বে এই সুক্লেনফা স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। সুক্লেনফা রাজা হইয়া পিতৃহত্যার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য হত্যাকারীর ভ্রাতাদিগকে বধ করেন। ইহার রাজত্বকালে কোচ-রাজ নরনারায়ণের সঙ্গে বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রায় (শুক্লধ্বজ) অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ ও মহাবীর ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে অহম্‌রাজ কতককালের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন। নরনারায়ণ ১৫৪৬ খৃঃ অব্দ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিক্‌রাের নদী পর্য্যন্ত দখল করিয়া খারাঙ্গী, কলিযাবার প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন।

সুক্লেনফা—১৫৩৯-১৫৫২ খৃঃ।

সুক্লেনফার পুত্র সুখাম্ফা। ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ায় ইহার একটি পা খোঁড়া হইয়া যায়, এবং ইনি 'খোঁড়া রাজা' নামেই পরিচিত হন। নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রায় পুনরায় অহম্‌রাজকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন-পূর্ব্বক নামরূপের চরাইখোরং পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। অহম্‌-রাজ সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া কোচরাজের অধীনত্ব স্বীকারপূর্ব্বক জামীনস্বরূপ তাঁহার প্রধান সামন্তগণের পুত্রগুলিকে প্রদান করেন এবং অনেক অর্থাদি দিয়া সন্ধি করেন, কিন্তু কোচ-সেনাপতি চলিয়া গেলে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে কোচরাজ মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে জামীন প্রত্যর্পণ করিয়া অহম্‌-রাজের প্রস্তাবিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সুখাম্ফা নর এবং চুটিয়াদের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্দরে বহু মহিষী ছিলেন এবং ইহাদের কেলেঙ্কারিতে রাজা

সুখাম্ফা—১৫৫২-১৬০৩ খৃঃ।

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি রাজ্ঞীর সঙ্গে অভিযুক্ত হওয়ার ফলে তিনটি লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

সুখাম্ফার পুত্র সুসেংফা বৃদ্ধ বয়সে রাজা হন, সুতরাং তাঁহাকে লোকে 'বুড়া রাজা' নাম দিয়াছিল। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম হইয়াছিল "বুদ্ধ স্বর্গনারায়ণ", ইঁহার রাজ-উপাধি ছিল প্রতাপসিংহ, এই নামেই ইনি সুপরিচিত। রাজ্যের প্রথম সময়ে কাছাড়ের রাজা ভীমদর্পের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ হয় এবং ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কোচরাজ পরীক্ষিতের কন্যা "মঙ্গলদাই"কে বিবাহ করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কোচরাজ বালীনারায়ণ মুসলমানদের উৎপাতে ইঁহার শরণাপন্ন হন। ইনি তাঁহাকে আশ্রয়দান করেন। এই সময়ে কোলাইবার নামক স্থানে এক মুসলমান বণিক্ নিহত হয়; বঙ্গের শাসনকর্তা শেক কোয়জিম এইসকল কারণে অহম্‌রাজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আবুবকর এবং ঢাকার জমিদার সত্রাজিৎ বহু সৈন্য লইয়া অহম্‌রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সৈয়দ আবুবকর এবং মুসলমান সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং বন্দীদের মধ্যে সত্রাজিতের এক পুত্র কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে বলিস্বরূপ অর্পিত হন। বালীনারায়ণকে সুসেংফা দাড়াংএর সামন্তরাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর মুসলমানগণ সৈয়দ জৈনুল আবদিনের অধীনে বহু রণতরী লইয়া অহম্‌রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন বঙ্গেশ্বর ছিলেন ইসলাম খাঁ। মহম্মদ সাহ, মজলিস বয়জিদ এবং সত্রাজিৎ অহম্‌গণ কর্তৃক পরাস্ত হন, প্রথমোক্ত সেনাপতিদ্বয় নিহত হন এবং মুসলমানদের বহু রণতরী অহম্‌রাজের করতলগত হয়। সত্রাজিতের ব্যবহার এই সকল যুদ্ধে অতিশয় সন্দেহাত্মক ছিল। তিনি কোন সময়ে মুসলমানপক্ষীয় হইয়া আবার কোন সময়ে অহম্‌রাজের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন করিতেন। মীর জৈনুদ্দিন কর্তৃক ধৃত হইয়া তিনি ঢাকায় প্রেরিত হন এবং পরে নিহত হন। জৈনুদ্দিন, কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের সাহায্যে এবার জয়ী হন এবং সুসেংফা রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে 'বড়নদী' এবং দক্ষিণে 'অসুরার আলি' মুসলমান ও অহম্‌রাজ্যের এই সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রতাপের রাজত্বকালে কাছাড়ীরাজ ইন্দ্রবল্লভ তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন।

প্রতাপসিংহ—১৬০৩-১৬৪১ খৃঃ।

তৎপরে ভগারাজা (সুরাম্ফা) অত্যন্ত বিলাসী, কামাচারী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাকে বিষ দিয়া হত্যা করেন। ইহার পরে নরিয়া রাজা (সুতয়িনফা) রাজা হন। ইনি চিররোগী এবং অসমর্থ ছিলেন, সুতরাং প্রজাদের ষড়যন্ত্রে ইনি সিংহাসনচ্যুত হন।

ভগারাজা—১৬৪১-১৬৪৪ খৃঃ।

নরিয়া রাজা—১৬৪৪-১৬৪৮ খৃঃ।

পরবর্ত্তী রাজা সুতাম্লা 'জয়ধ্বজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। মীরজুম্লার সঙ্গে ইঁহার দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। পরিণামে ফরহাদ খাঁ প্রভৃতি সেনাপতির কৌশলে মুসলমানেরা বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং অহম্‌রাজের সঙ্গে তাঁহাদের সন্ধি হইয়াছিল। এই সন্ধি অনুসারে জয়ধ্বজ তাঁহার

জয়ধ্বজ—১৬৪৮-১৬৬৩ খৃঃ।

এক কন্যাকে সম্রাট্-প্রাসাদে দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হন। ইহার সঙ্গে রাজকুমার মহম্মদ আজিমের বিবাহ হইয়াছিল। মাসিরি আলমগিরিতে উক্ত হইয়াছে এই বিবাহে অহম্‌রাজ কন্যাকে ১,৮০,০০০ টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন।

এই সর্ত্ত ছাড়া আরও কয়েকটি সর্ত্ত হইয়াছিল। ২০,০০০ তোলা সোনা এবং ইহার ছয়গুণ রূপা রাজাকে দিতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া তাঁহার প্রধান অমাত্যদের ছয়টি পুত্রকে জামীনস্বরূপ প্রেরণ করা স্থির হইয়াছিল। এই সন্ধি অনুসারে অহম্‌রাজ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ভারুলী নদী এবং দক্ষিণে কল্লাল পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গার অধিকার মোগল সম্রাট্‌কে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

জয়ধ্বজের পর চক্রধ্বজ রাজা হইয়াছিলেন। ইহার সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে। ফিরাজ খাঁ পরাজিত হন। যে অংশ মোগলদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল,

চক্রধ্বজ—১৬৬৩-১৬৬৯ খৃঃ।

তাহা দেওয়া হইবে না—অহম্‌রাজের এই উক্তির ফলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে আরাঙ্গীব রামসিং নামক সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু মোগলেরা পুনঃপুনঃ পরাভূত হইয়া অহম্‌রাজের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধবিগ্রহকালে অনেক আসাম-বাসী মোগলদিগের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তন্মধ্যে শঙ্কর দেবের বংশধর চক্রপাণি একজন ছিলেন।

ইহার পরে সাময়িক ভাবে কয়েক জন রাজা হইয়াছিলেন: উদয়াদিত্য ১৬৬৯-১৬৭৩ খৃঃ, রামধ্বজ ১৬৭৩-১৬৭৫ খৃঃ, সুহাং ১৬৭৫ খৃঃ, গোবর ১৬৭৫ খৃঃ, সুজিন্‌ফা ১৬৭৫-১৬৭৭ খৃঃ,

উদয়াদিত্য হইতে ৫ জন নৃপতি—১৬৬৯-১৬৭৭ খৃঃ।

শেষোক্ত রাজা সামন্তচক্রের ষড়যন্ত্রে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে তাঁহাদের এক জনের দ্বারা উৎপাটিতচক্ষু হইয়া বিনষ্ট হন। সুজিন্‌ফার পরে সুপাইকা রাজা হইলেন। বুড়াফুকন এবং বড় ফুকনের মধ্যে অসদ্ভাবের ফলে, বড় ফুকনের ষড়যন্ত্রে রাজকুমার মহম্মদ আজিম আসাম আক্রমণ করিয়া গৌহাটি দখল করেন। বড় ফুকন প্রবল হইয়া রাজাকে নিহত করেন এবং রাজবংশের একটি বালককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার নাম সুলিকফা কিন্তু সাধারণতঃ ইনি 'লরা' রাজা নামে খ্যাত, 'লরা' অর্থ শিশু। বড় ফুকনের অবিমৃষ্যকারিতা এবং রাজকীয়

লরা রাজ—১৬৭৭-১৬৮১ খৃঃ।

সর্ব্ববিধ গৌরব আত্মসাৎ করার চেষ্টাতে ইনি লোকের অত্যন্ত বিরাগভাজন হন, অবশেষে ধৃত হইয়া ইনি ইহার পুত্রদের সহিত নিহত হন। লরা রাজা এই সকল ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের ভয়ে অতিশয় নির্ম্মম হইয়া পড়েন। ইনি ভূতপূর্ব্ব রাজার জ্ঞাতিগোষ্ঠি শত শত লোককে হত্যা করেন। কিন্তু বহ্নির শেষের ন্যায় গদাপাণি নামক একটি রাজকুমার কৃষকের বেশে কৃষকের কার্য্য করিয়া আত্ম-গোপন করিয়াছিলেন। একটি গারো কৃষকের গৃহে তিনি গারো হইয়াছিলেন, অবশেষে প্রজারা রাজার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত এবং শেষে নিহত করে। অতঃপর গদাধর (গদাপাণি)সিং রাজা হইয়া মুসলমানদের হস্ত হইতে গৌহাটি উদ্ধার করেন। গৌহাটির ফৌজদার উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন এবং মুসলমানদিগের

বিশাল ধনরত্নের ভাণ্ডার রাজার হস্তগত হয়। ভাটধর ফুকন মুসলমানদিগকে আনিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পুত্র ধৃত হন, পুত্রকে হত্যা করিয়া তাঁহার মাংস পিতাকে খাওয়ান হয়,—তৎপরে পিতাও নিহত হন। মুসলমানদিগের এই শেষ চেষ্টা। মহম্ম খাঁ সেনাপতি পরাস্ত হইলে আসামের দিকে আর মুসলমানেরা অগ্রসর হন নাই। এই যুদ্ধে যে সকল কামান আসাম-রাজ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাহার দুই তিনটি এখনও আছে, একটি ব্রিটিস মিউজিয়মে, এবং একটি, লক্ষ্মীপুরের ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীর কাছে রক্ষিত আছে। ইহাতে এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ আছে "গদাধরসিং গৌহাটিতে মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া এই অস্ত্র অধিকার করেন শকাব্দ ১৬০৪ (১৬৮২ খৃঃ)।" রাজা মিরি এবং নাগাদের বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু ইহার পরে ইনি শঙ্করদেবের শিষ্য বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। অপরাধ ১ম, তিনি যখন ছদ্মবেশে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন শঙ্কর-শিষ্যগণ তাঁহাকে কোন সাহায্য করে নাই। ২য়,—শঙ্কর-শিষ্যগণ আসাম ছাইয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে তাহারা মৎস্য-মাংস বারণ করাতে প্রজাদের দেহ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছিল। গদাধর সিংহ নিজে অতিশয় দৈহিক বল-সম্পন্ন ছিলেন, প্রজাদের দৈহিক অবনতির তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন নাই। এদিকে শঙ্করের শিষ্যগণ প্রজাদের অশ্বাদিতে ধাবন ও যুদ্ধাদিতে যোগদান নিষেধ করিয়াছিলেন; এজন্য রাজার বলক্ষয় ঘটিয়াছিল। রাজা দক্ষিণপাটের গোঁসাইয়ের চক্ষু উৎপাটিত এবং নাসিকা কর্ত্তন এবং তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করিলেন, সোনা-রূপার শত শত বিগ্রহ গলাইয়া ফেলিলেন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী শত শত কেওট, কোচ, ডোম এবং হাড়িকে ধরিয়া তাহাদিগকে গরু, হাঁস এবং মুর্গীর মাংস খাওয়াইয়া তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। গদাধর সিংহ সাড়ে চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দেহ-ত্যাগ করেন। এই রাজা আরাঙ্গেবের সম-সাময়িক ও তাঁহারই মত নিষ্ঠুর ও প্রতাপশালী ছিলেন, ইনি একজন গোঁড়া শাক্ত ছিলেন।

গদাধর সিংহ—১৬৮১-১৬৯৬ খৃঃ।

গদাধর সিংহের পুত্র রুদ্রসিংহ রাজা হইয়া বৈষ্ণবদের প্রতি অবিচার ক্ষান্ত করেন। নির্ব্বাসিত বৈষ্ণব গোস্বামীরা পুনরায় মন্দির অধিকার করিলেন, এমন কি রাজা স্বয়ং আউনিয়াটি গোঁসাইয়ের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণার্থ ইনি সুবিখ্যাত বাঙ্গালী স্থপতি ঘনশ্যামকে কোচবিহার হইতে আনাইয়া অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করার পরে দেখা গেল—ইনি আসামের প্রত্যেক দুর্গ ও নগরীসম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনাযুক্ত কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া যাইতেছেন। মুসলমানদিগের সহিত কোন ষড়যন্ত্র আশঙ্কা করিয়া গুপ্তচর বলিয়া ইহাকে হত্যা করা হয়। ইনি জয়ন্তী-রাজ রাম সিংহ ও কাছাড়-রাজ তাম্রধ্বজকে বহু যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। কিছু কালের জন্য জয়ন্তী পাহাড় ও কাছাড়রাজ্য খাস করিয়া আসামের অধিকারভুক্ত করা হয়—পরে ইনি

রুদ্রসিংহ—১৬৯৬-১৭১৪ খৃঃ।

রাজাদিগকে মুক্তি দিয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেন। এই দুই রাজ্য লুঠ করিয়া ইনি অগণিত অর্থ পাইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহ গোঁড়া হিন্দু হইয়াছিলেন, তিনি গঙ্গার কতকটা অংশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে উপরিওয়ালার ডাক পড়াতে তিনি এই সংসার ত্যাগ করিলেন। অহম্‌গণের প্রচলিত নিয়মানুসারে ইঁহার দেহ সমাধিস্থ না করিয়া হিন্দুমতে শ্মশানে ভস্মীভূত করা হয়।

রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ গোঁড়া শাক্ত ছিলেন। গণকেরা তাঁহার অকালমৃত্যু ভবিষ্যদ্বাণী করাতে ইনি রাজ্ঞী পরমেশ্বরীকে রাজ্য প্রদান করিয়া "বড়রাজা" উপাধি দেন।

শিবসিংহ—১৭১৪-১৭৪৪ খৃঃ।

এই রাজ্ঞীর ১৭৩১ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়, তখন ইনি মৃত রাজ্ঞীর ভগিনী 'অম্বিকা'কে বিবাহান্তে সেইরূপ রাজ-পদ প্রদান করেন, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে এই রাজ্ঞীরও মৃত্যু হয়, তখন ইনি 'সর্ব্বেশ্বরী'কে বিবাহ করেন। রাণীরা গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, রাজা ইঁহাদের প্রভাবে আসামের সর্ব্ববৈষ্ণবের গুরু মোয়ামারিয়া এবং অপরাপর গুরুকে দুর্গাপূজা করিতে বাধ্য করেন, তাঁহারা অস্বীকৃত হইলে তিনি ইঁহাদিগকে দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইয়া বলির রক্তের তিলক তাঁহাদের কপালে অঙ্কিত করিয়া দেন। বৈষ্ণবেরা গুরু-কুলের এই অপমান ভুলিতে পারেন নাই। শিবসিংহের রাজত্বকালে চারজন ইংরেজ—বিল, গডউইন, লিষ্টার এবং মিল—রাজার সঙ্গে দেখা করেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন, ইঁহারা রাজার পদতলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন ("It is said, they did him homage by falling prostrate at his feet." Gait's History, p. 185).

শিবসিংহের মৃত্যুর পর প্রমথসিংহ ১৭৪৪-১৭৫১ এবং রাজেশ্বরসিংহ ১৭৫১-১৭৬৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজেশ্বরের দুই পুত্র নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মীসিংহ-

লক্ষ্মীসিংহ—১৭৬৯-১৭৮০ খৃঃ।

বৈষ্ণব-বিদ্রোহ।

সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ ছিল যে ইনি রাজার ঔরসজাত পুত্র নহেন—আকৃতি-প্রকৃতিতে কোন সাদৃশ্যই ছিল না, এমন কি রাজা স্বয়ং বলিতেন—এই ছেলে আমার নহে। অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর ইনিই রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন ইঁহার বয়স ৫৩। লক্ষ্মীসিংহের সময় বিখ্যাত বৈষ্ণব-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সেই মোয়ামারিয়ার ও বৈষ্ণব-গুরুর অপমানের স্মৃতি আসামের বৈষ্ণব-সমাজের বুকে দাগা দিয়া গিয়াছিল, এবার শিখ সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহারাও রাজদ্রোহ ঘোষণা করিল। নাহার নামক মোরাণদিগের দলপতির উপর রাজার কোন প্রধান সেনাপতি অত্যাচার করে, সে ব্যক্তি তাঁহার গুরু মোয়ামারিয়ার গোঁসাইয়ের শরণ লয়; ইঁহারা একটা ছল খুঁজিতে-ছিলেন। সুতরাং অবিলম্বে গুরুর রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, মোরাণ ও কাছাড়ী দলের লোকেরা দলে দলে যোগ দিল। লক্ষ্মীসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্দ্ধনা গোহাইন রাজা হইবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া এই দলে ভিড়িলেন। মোয়ামারিয়ার গোঁসাইয়ের পুত্র রাঘগান নিজেকে রামরূপের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লক্ষ্মীসিংহ ও তাঁহার প্রধান অমাত্য ও কর্ম্মচারীরা বন্দী

হইলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিরশ্ছেদ করিল। এমন কি বৃথা প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ বৰ্দ্ধিনা গোহাইনও বিদ্রোহিগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। বানগান রাজসিংহাসন অধিকার করিতে গেলে—তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া মোয়াণ-দলনেতা নাহারের পুত্র রাঘ এবং তাঁহার দুই ভ্রাতাকে সমস্ত আসামের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। রাঘ সর্ব্বোপরি রাজা হইলেন, কিন্তু বানগানেরই সমস্ত প্রভুত্ব রহিল, তিনি "বড় বড়ুয়া" পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বানগান লক্ষ্মীসিংহের মহিষী-মণ্ডলীকে স্বীয় অন্তঃপুরভুক্ত করিয়া লইলেন, তন্মধ্যে মণিপুরের এক রাজকুমারীও ছিলেন। এদিকে লক্ষ্মীসিংহ কারাগার হইতে কৌশলক্রমে মুক্ত হইয়া অতর্কিতভাবে রাঘকে আক্রমণ করিয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং সেইখানেই তাঁহাকে হত্যা করা হইল। কথিত আছে, অন্তঃপুর হইতে মণিপুরের রাজকন্যা বাহির হইয়া রাঘের শরীরে শেষ খড়্গাঘাত করেন। ইহার পরে লক্ষ্মীসিংহ স্বীয় রাজ্য ফিরিয়া পান। গোঁসাইয়ের দল কিছুকাল ধরিয়া নির্ব্বাপিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত এদিক্ সেদিক্ স্বীয় প্রভাব দেখাইতেছিলেন, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা বিধ্বস্ত হইলেন। লক্ষ্মীসিংহের অভিষেক এই সকল বিপ্লবের জন্য স্থগিত ছিল, এবার তাহা ধুমধামের সহিত সম্পাদিত হইল। লক্ষ্মীসিংহ ঘোর শাক্ত ছিলেন এবং দেবী-মন্দিরে অনেক দান ও পূজাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আমরা ইহার পরের অধ্যায় আর লিখিব না—কারণ বাঙ্গলার ইতিহাসও আমরা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর আর লিখি নাই। এইখানে আমরা পরবর্ত্তী রাজগণের বংশতালিকা দিয়া শেষ করিব।

গৌরীনাথ সিংহ ১৭৮০-১৭৯৫ খৃঃ, কমলেশ্বর সিংহ ১৭৯৫-১৮১০ খৃঃ, চন্দ্রকান্ত সিংহ ১৮১০-১৮১৮ খৃঃ, পুরন্দর সিংহ ১৮১৮-১৮১৯ খৃঃ।

আসামের রাজাদের কথা বলা হইল, কিন্তু তথাকার রাজচক্রবর্ত্তীর কথা বলা হয় নাই। যিনি প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ প্রকৃতই আসাম-বাসীর হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেছেন—এখন পর্য্যন্ত যাঁহার রাজত্ব অমোঘ প্রতাপে চলিতেছে, যিনি কায়স্থকুলে সম্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্ববর্ণের পূজ্য, যিনি ঘোর তান্ত্রিকতা এবং নর-পশু-পক্ষি-রক্ত-কলঙ্কিত রাজ-রাজন্যগণের সহায়তাপুষ্ট দেবীমন্দিরের প্রবলপ্রতাপান্বিত শাক্ত উপাসকদিগের অত্যাচারের মূলে তুলসীপত্র-ভূষিত, ক্ষমাসুন্দর, দিব্য প্রীতির যাদু-কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, যিনি আমাদেরই চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী এবং তাঁহারই মত সর্ব্ববর্ণের সাম্য-প্রচারক, সেই বৈষ্ণব-চূড়ামণি আসামবাসীর হৃদয়ের অমূল্য-কণ্ঠহার—শঙ্করদেবের জীবনের পবিত্র প্রসঙ্গ দ্বারা আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

শঙ্করদেবের পিতা কুসুমবর পরম শৈব ছিলেন, ইঁহাদের আদিবাস বটদ্রুবি (নোয়াগাঁয়)। অল্পবয়সে শঙ্করের মাতার মৃত্যু হয়। শৈশবকালে তিনি অতি দুর্দান্ত ছিলেন, কিন্তু পিতার ভর্ৎসনায় তাঁহার চৈতন্য হইল এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলেন, তাঁহার উপাধি হইল "দেবগিরি।" তিনি এতটা যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কথিত আছে,

তিন চার দিন শ্বাসরোধ করিয়া থাকিতে পারিতেন, দীর্ঘকাল তিনি একটিমাত্র পাদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন। আসামে এইরূপ যোগাভ্যাসের রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল, শাক্তগণ তান্ত্রিক-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যোগাভ্যাস করিয়া নানারূপ বিভূতি দেখাইতেন। এইখানে চৈতন্য-দেবের সঙ্গে শঙ্করের বৈষ্ণব-ভক্তিবাদের মূল প্রভেদ; বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা এইসকল বিভূতি কিছু কিছু না দেখাইতেন, এমন নহে। বীরভদ্র ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে নানারূপ বিভূতি-প্রদর্শনের কথা প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়—কিন্তু চৈতন্যদেব ঐসকল পন্থার বিরোধী ছিলেন। শঙ্করদেবকে তাঁহার পিতামহী গোঁসাই খেরাসতি লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি অল্পবয়সে তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গৃহী করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর গৃহে আবদ্ধ থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। নব-যৌবনে স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন; শঙ্কর তাঁহার তিন শত দুগ্ধবতী গাভী, স্বীয় ভৃত্য রাখালগণের মধ্যে বিতরণ করেন, এইভাবে তাঁহার ষাট জোড়া বলদও বিতরিত হইল। অবশিষ্ট সম্পত্তি তাঁহার দুই জ্ঞাতি ভ্রাতা জয়ন্ত ও মাধবকে দিয়া তিনি একদিন গেরুয়া পরিয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন। বারবৎসর তিনি নানাতীর্থে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং দার-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার ভ্রাতা বনগায়া গিরি তাঁহার গৃহ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক যে সকল গাভী তিনি রাখাল বালকদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটিকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন; তাহারা অস্বীকার করাতে বনগায়া এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি একটি রাখালকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ঘটনায় শঙ্কর অত্যন্ত মর্ম্ম-পীড়া পাইয়াছিলেন। শঙ্করের জ্ঞাতিভ্রাতা জগদানন্দ তাঁহার বাসস্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতা সুপণ্ডিত ছিলেন; শঙ্কর ইঁহার সঙ্গে মন্দিরে সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনায় সময় কাটাইতেন। জীবনের এই অধ্যায়ে মাধবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। মাধবই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য এবং তিনিই মহাপুরুষিয়া-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মাধব সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ঘোর শাক্ত ছিলেন,—ইঁহার বাড়ী তেম্বুনিয়াবন্ধে ছিল। ইঁহার মাতার গুরুতর পীড়া হওয়াতে ইনি তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া কামাখ্যাদেবীর নিকট দুইটি ছাগবলি মানত করিয়াছিলেন। শঙ্কর-শিষ্য গয়াপাণির সঙ্গে এই উপলক্ষে মাধবের তর্ক হয়, এবং মাধব তর্কে পরাজয় করিবার জন্য শঙ্করের নিকট উপনীত হন। মাধব সংস্কৃতশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে শঙ্কর ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন: "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।" (যেরূপ তরুমূলে জল নিষেক করিলে তাহার কাণ্ড-শাখা-উপশাখা সমস্ত পুষ্ট হয়, যেরূপ প্রাণের তৃপ্তি হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ অচ্যুতের অর্চ্চনায় সর্ব্বদেবতা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।)

মাধবের মত এত বড় শাক্তের পরাজয়ে সমস্ত শাক্ত-নেতাদের টিকি নড়িয়া উঠিল।

শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ মিশ্র, বামনাচার্য্য এবং রত্নাকর কন্দলী প্রভৃতি শাক্ত নেতারা কি উপায়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরে নষ্ট করিবেন, তজ্জন্য চেষ্টিত হইলেন। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য স্বয়ং নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি বলিলেন "তর্ক-যুদ্ধে শঙ্করকে পরাস্ত করা যাক।" ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তর্কে কোন প্রয়োজন নাই, উহাতে শঙ্করকে অনাহূতভাবে গৌরব দান করা হইবে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কামাখ্যাদেবীর দেশে আপনিই নিবিয়া যাইবে, অপেক্ষা করা যাক।" রত্নাকর কন্দলী শঙ্করকে চিনিতেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম এই ভাবে বিলুপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখিলেন না। তিনি বলিলেন, "সকলে মিলিয়া এই ধর্ম্মের নিন্দা ও বিদ্রূপ করা যাক, তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে ইহার বিস্তার নিরুদ্ধ হইবে।" শাক্তেরা তাহাই করিতে লাগিলেন, যেখানে সেখানে বৈষ্ণব-নিন্দা ও তাঁহাদিগকে লইয়া উপহাস চলিতে লাগিল। একদিন বুদ্ধখাঁ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান শাক্ত পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন; ব্রাহ্মণেরা হয়ত তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে স্বীকার করিবেন না, এই জন্য শঙ্কর অতি বিনীত শিষ্যের ন্যায় কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে এমন সমস্যায় ফেলিলেন যে, তাঁহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। রত্নাকর কন্দলী নিজের জালে নিজে জড়িত হইয়া পড়িলেন। শাক্তেরা বিধ্বস্ত হইয়া অহম্‌রাজ শুক্লেন-ফার (১৫৩৯-১৫৫২ খৃঃ) নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। অভিযোগ টিকিল না। এদিকে শঙ্কর প্রকাশ্য শত্রুতার ভাব ত্যাগ করিয়া শাক্ত ব্রাহ্মণদিগের মন যোগাইতে চেষ্টিত হইলেন,—তিনি তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা অনেক টাকা উঠাইয়া তাঁহার আশ্রমে ব্রাহ্মণদের দ্বারা গীতা পাঠ করাইয়া প্রচুররূপে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন; ইহাতে ব্রাহ্মণ দলের ভাব অনেকটা অনুকূল হইল এবং হরিকথাও দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি স্বয়ং ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র অতি সরল সুন্দর আসামী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অহম্‌রাজেরা শাক্ত পণ্ডিতদের প্ররোচনায় বৈষ্ণবদিগের উপর পুনরায় অত্যাচার করিতে লাগিলেন; এমন কি একদা শঙ্কর কোনরূপে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয় শিষ্য হরি নিহত হইলেন। অহম্‌রাজগণের অত্যাচারে শঙ্করদেব বুঝিলেন, কামাখ্যাদেবীর প্রতাপ আসামে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। তিনি বরপেটায় আসিয়া কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের শান্তিময় রাজত্বে ধর্ম্মপ্রচারের খুব সুবিধা পাইলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার এক প্রধান শিষ্য জুটিল—নারায়ণ দাশ। এখানেও প্রথম শঙ্কর বড়ই কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন, কারণ ব্রাহ্মণেরা রাজা নরনারায়ণকে জানাইলেন, শঙ্কর-শিষ্যেরা ভগবতীর নিকট মাথা নত করে না, কামাখ্যাদেবীকে মানে না ইত্যাদি। রাজা শঙ্করকে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন; শঙ্কর বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া পলাইয়া গেলেন। তাঁহার দুই শিষ্য নারায়ণ দাশ ও গোকুল দাশ ধৃত হইয়া রাজার নিকট আনীত হইলেন। ইঁহারা কিছুতেই দুর্গা-প্রতিমার নিকট মাথা নোয়াইবেন না—এজন্য রাজা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি কঠোর দণ্ড দিয়া শেষে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন,

ভীষণ আঘাতে নারায়ণ নামক শিষ্যের একখানি হাত ভাঙ্গিয়া গেল, শেষে অসহ্য পীড়ন সহ্য করিয়া ইঁহারা দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিলেন; কিন্তু শঙ্করদেব-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। রাত্রে ইঁহাদের দেহ হইতে লৌহশৃঙ্খল খসিয়া পড়িল, তখন ইঁহারা রক্ষীদিগকে পুনরায় তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই আশ্চর্য্য সত্যতা দেখিয়া প্রহরীরা স্তম্ভিত হইয়া ক্ষমা চাহিল। শঙ্কর লুকাইয়া কতদিন থাকিবেন? তিনি নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। চিলা রায়ের চেষ্টায় শঙ্কর নরনারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। শঙ্করের সৌম্য মূর্ত্তি, সরস্বতীর বীণার মত সুস্বর, এবং চরিত্রের মর্য্যাদা-পূর্ণ গাম্ভীর্য্য রাজাকে মোহিত করিল। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সভায় ডাকাইয়া আনিয়া বিচার করিতে আদেশ করিলেন। শঙ্করের নিকট ব্রাহ্মণেরা পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার এমনই বিনয় ছিল যে, ব্রাহ্মণেরা ক্রোধপ্রকাশের কোন সুবিধা পাইলেন না। গেট সাহেব দুইটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। একটিতে কথিত আছে, রাজা নরনারায়ণ শঙ্করের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় দ্বিতীয়টিই সত্য, রাজা নরনারায়ণ নহেন, চিলা রায় তাঁহার ভগিনীপতি হইয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং শঙ্করের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাহা হইতে পারে নাই। রাজা শঙ্করকে পাড়াবাউসী এবং তৎসন্নিহিত স্থানগুলির শাসনকর্ত্তৃত্ব দিয়াছিলেন, কিছুকাল এই কাজ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে, তিনি বৈষয়িক হইয়া পড়িতেছেন; তখন সেই কাজে ইস্তফা দিয়া তিনি কোচবিহারে আসিয়া বাস করেন, এই সময়ে তাঁহার বহু শিষ্য হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মথুরাদাস আতা (বরপেটা-নিবাসী), মধুপুরের বিষ্ণু আতা, কমলবাড়ীর বড়ুয়া আতা, কেশব আতা (ভাটোকুচি-নিবাসী), চামারিয়ার বিষ্ণু আতা, জৈনিয়ার নারায়ণ দেব ঠাকুর, দালগোমার রামচরণ ঠাকুর, বড়হেরামদার পরিয়া মাধব এবং হাজোর-বাসী লক্ষ্মীকান্ত আতা—এই কয়েকজনকে তিনি সত্রেশ্বর করিয়াছিলেন। মাধব পুরুষোত্তম-সম্প্রদায়ের এবং দামোদর আর এক সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছিলেন। দামোদর ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইজন্ত বহু ব্রাহ্মণ এই দলে ভিড়িয়াছিলেন। আসামী লেখকগণের মধ্যে কথাভূষণ দৈত্যারী এবং রামরায়ই শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ইঁহারা এবং অপরাপর কয়েকজন তদ্দেশীয় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। একখানি প্রাচীন আসামী হাতের লেখা পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্রে চৈতন্য ও শঙ্কর উভয়কেই উপবিষ্ট দৃষ্ট হয়, চৈতন্যদেব উপদেশ দিতেছেন এবং শঙ্কর তাহা সম্ভ্রমের সহিত শুনিতেছেন। শঙ্কর চৈতন্য হইতে বয়সে বড় ছিলেন এবং উভয়েই সমসাময়িক ও অতি নিকটবর্ত্তী দেশবাসী—উভয়েই বৈষ্ণব ধর্ম্মের নেতা। এরূপ অবস্থায় উভয়ের এই মিলন-কথা যখন এতগুলি আসামীয় পুঁথিতে বর্ণিত আছে, তখন দুইজনের দেখাসাক্ষাতের কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু শঙ্কর বৈধী ভক্তি এবং জ্ঞানমার্গের দিকে বেশী জোর দিয়াছিলেন, চৈতন্যদেবের প্রেমের গতি 'রাগানুগা'—উভয়ের দুই স্বতন্ত্র পন্থা। শঙ্কর নৈতিক উপদেশের মুক্তাবলী ছড়াইয়া গিয়াছেন,

চৈতন্যদেব স্বীয় প্রেম-রূপ দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইয়াছেন—সেই ভাববিহ্বলতার বন্যার মধ্যে উপদেশ দেওয়ার অবকাশ খুব কমই ছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের কোন প্রভাব যে শঙ্করদেবের উপর পড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় না।

কথিত আছে শঙ্করদেব একদিনের মধ্যে ভাগবতের একখানি মর্ম্মানুবাদ আসামী ভাষায় রচনা করিয়া রাজা নরনারায়ণকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা এত অল্প সময়ের মধ্যে করিতে পারেন নাই। শঙ্করের এই ভাগবতের অনুবাদখানির নাম 'গুণমালা'। মৃত্যুকালে শঙ্করের পাদমূলে বসিয়া পুত্র রামানন্দ ঠাকুর বলিলেন, "বাবা, আমাকে কি দিয়া যাইতেছেন ?" শঙ্কর বলিলেন, "তোমার মাতার স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের বৈভব আছে, তাহা ছাড়া রাজা শুক্লধ্বজ এবং রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী যে অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন তাহা তোমারই রহিল।" রামানন্দ চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "আমি এ সকল পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতেছি না, বাবা, আমার পরকালের সহায় হয়, এমন ধন আমি আপনার নিকট চাই।" মুমূর্ষুর মুখমণ্ডল আনন্দ-গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তুমি আমার যোগ্য পুত্র—আমার ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বস্ব আমি আমার শিষ্য মাধবকে দিয়াছি, তাহার সহিত আমার কোন প্রভেদ নাই। তুমি যাহা চাও, তাহার নিকট পাইবে।"

কিরূপে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ক্রমশঃ বড় হইয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল এবং পরিশেষে অহমরাজদের অকথ্য অত্যাচারে তাহারা হস্তের জপমালা ফেলিয়া অসি ধারণপূর্ব্বক এক রাজাকে নিধন করিয়া কিছুকালের জন্য সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল,—তাহার বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে দিয়াছি।

আসাম নানারূপ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। আসামের রেশমী বস্ত্র মেয়েরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন; তাহাদের কারুকার্য্য, বিশেষ শাড়ীর অঞ্চলের ফুললতার চারুশিল্প—অদ্ভুত। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসামে যে প্রাসাদ ছিল, তৎসম্বন্ধে একজন সাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে কাঠের যে অপূর্ব্ব কার্য্য দেখা যায়, এবং অপরাপর শিল্পের যে নিদর্শন আছে—তাহা সুদুর্লভ, তাহা আমার লেখনীর বর্ণনার অতীত। বোধ হয় জগতের আর কোন স্থানে কাঠের ঘরে এরূপ অদ্ভুত সৌন্দর্য্য এবং শিল্পকলা অন্য কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। প্রতি প্রকোষ্ঠে গবাক্ষগুলির পিত্তলনির্ম্মিত আরশী নানারূপ মনোজ্ঞ আকৃতিতে গঠিত হইয়া এরূপ মসৃণতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে যখন সূর্য্যের আলো তাহাদের উপর পড়ে, তখন প্রকোষ্ঠগুলি ঝলমল করিয়া চোখ ধাঁধিয়া দেয়। রাজার শয়ন-গৃহ ছাড়াও অন্যান্য কাষ্ঠের অট্টালিকা এত সুন্দর, তাহাদের সুগঠিত অবয়বে চারুশিল্পের এরূপ মনোহারী খেলা যে, তাহা দেখিবার সামগ্রী, ভাষা দিয়া এই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য বোঝান যায় না।" (গেট সাহেবের ইতিহাস, ১৫১ পৃঃ)। এইরূপ কাষ্ঠ ও বেত বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত ঘরের প্রাচুর্য্য এক সময়ে খাস বাঙ্গলা দেশেও ছিল। আমরা ৫৫৮-৬৪ পৃষ্ঠায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

শিল্প ও স্থাপত্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কোচবিহার

কোচবিহার বহুকাল যাবৎ নরক-বংশীয় রাজাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং আদি যুগে প্রাগজ্যোতিষপুরের ইতিহাস হইতে বর্ত্তমান কোচ-রাজ্যের ইতিবৃত্ত এক সময়ে অভিন্ন ছিল। পালবংশের কয়েকজন রাজার নামও আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। ইহারা সেনবংশের সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন ; রঙ্গপুর হইতে তেজপুর পর্য্যন্ত এক বৃহৎ-জনপদ ইহাদের শাসনাধীন ছিল। পালদের রাজধানী ছিল, ডিমলা। ব্রহ্মপাল হইতে হর্ষপাল পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ। হর্ষপালের পুত্র ধর্ম্মপাল ; কথিত আছে পল্লীগীতিকার মাণিকচন্দ্র রাজার সঙ্গে ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল ; মাণিকচন্দ্র রাজার উপকথা-সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী ময়নামতীর সঙ্গে ধর্ম্মপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের পরে গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) রাজা হন। ইহার সন্ন্যাসসম্বন্ধে অনেক কথা সমস্ত ভারতবর্ষে গীতির আকারে প্রচলিত আছে। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র অন্যভাবে দেশময় খ্যাতি (অখ্যাতি ?) অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতাসম্বন্ধে বহু উপকথা আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি। গল্পবাজগণ এই রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীর বেকুবীর ইতিহাস যথাশক্তি কল্পনার সাহায্যে বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, সে সকল কথা শুধুই ভিত্তিহীন গল্প। ভবচন্দ্র ও গবচন্দ্র মন্ত্রী নাকি কর্ণ ও নাসিকা-রন্ধ্র তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাজসভায় বসিতেন—পাছে সেই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি রন্ধ্র-পথে পলাইয়া যায়—ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে ইহারা প্রজাদের আবেদন-নিবেদনে কাণ দিতেন না। আর একটি গল্প এই যে একদা একটা কাক ঠোঁটে করিয়া চিতুই পিঠা আনিয়া সেই রাজ্যে ফেলিয়াছিল। সে দেশে চিতুই পিঠা অজ্ঞাত ছিল, রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ জিনিষটা কি ? মন্ত্রী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "ঘুণে পূর্ণিমার চাঁদটাকে খাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে।" ভবচন্দ্রের রাজধানী রঙ্গপুর জেলার বাগদুয়ার পরগনায় ছিল। এখানে তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শাখার পালদের শেষ রাজার নাম "পালা রাজা"—ইহারও রাজবাড়ীর চিহ্ন এখনও বাগদুয়ারে দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় "পালাগড়" দুর্গের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

ব্রহ্মপাল হইতে ভবচন্দ্র।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এই দেশে অরাজকতা চলিয়াছিল, ইহার পরে কোচবিহার-রাজ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ অহমরাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। খেন রাজাদের সঙ্গে মুসলমানদের এবং অহমরাজগণের যুদ্ধ-বিগ্রহ পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। খেন রাজাদের পতনের পর কতকগুলি কোচ (রাজবংশী) নেতারা স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রাধান্য স্থাপন-পূর্ব্বক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। এই খণ্ডরাজ্যের একজন দলপতির নাম ছিল হাজো। জীরা ও হীরা নামে ইহার দুই সুন্দরী কন্যা ছিল। ইহারা উভয়েই চিকনা পাহাড়-নিবাসী

মেচ্ বংশীয় হাড়িয়া মেচ্ (নামান্তর বেহরি বা হরিদাস) নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিণীতা হন। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন নামক দুই পুত্র জন্মে। কিন্তু হীরা যেমনই রূপবতী, তেমনই শিবে সমর্পিত-কায়-মন ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। কথিত আছে স্বয়ং শিবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তিনি বর প্রাপ্ত হন। সেই বরের ফলে তাঁহার বিশু নামক এক অদ্ভুত প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র লাভ হয়।

শিবের বর-লব্ধ, এই জন্য বিশুর সন্ততিরা "শিব-বংশ" বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বিশুর জন্মকাল ১৪২২ শক (১৫০০ খৃঃ অব্দ)—মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন। হীরার গর্ভে শিশু নামক আর একটি পুত্র হইয়াছিল। চিক্‌না পাহাড়ে তুড়কা কোটাল নামক এক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু আটটি পল্লী-সংবলিত একটি খণ্ড-প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। দৈবক্রমে বিশু একদিন একটি বালককে হত্যা করাতে তুড়কা কোটালের লোকজন বিশু ও তাঁহার সহচরগণকে ধৃত করিবার জন্য আদিষ্ট হইল। বিশু এই সময়ে তাঁহার অমিত দৈহিক বল ও বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা বহু লোককে করায়ত্ত করিয়াছিলেন। তুড়কা কোটালের সহিত এই শিশু নায়কের সংঘর্ষে বিশুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জীরার গর্ভজাত পুত্র মদন নিহত হন, কিন্তু বিশু তুড়কা কোটালকে হত্যা করিয়া তাঁহার বাড়ীঘর ও পরিবারবর্গ দখল করিয়া লইলেন। তুড়কার পরিবারবর্গ হিন্দুই ছিল—সে নিজে মুসলমান হইয়াছিল। তাঁহার তিনটি সুন্দরী কন্যাকে জীরার পুত্র চন্দন বিবাহ করিলেন। চন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তিনিই রাজা হইলেন। এই ভ্রাতাদের প্রতাপে শঙ্কিত হইয়া, দশ গ্রামের নেতা, আট গ্রামের নেতা ও পাঁচ গ্রামের নেতারা চতুষ্পার্শ্ব হইতে আসিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের অধীনত্ব স্বীকার করিল। চন্দন ১৫১০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন।

শিব-বংশ।

চন্দনসিংহ—১৫১০-১৫২২ খৃঃ।

বিশু 'বিশ্বসিংহ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ২২ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫২২ খৃঃ অব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে ভুটিয়ারা সন্ধি করিয়া ইঁহার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিল। ভোট-রাজ বাৎসরিক কর দিবেন, যুদ্ধ-সময়ে সাহায্য করিবেন, এবং রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর বিষয়ে কোচবিহার রাজা কর্তৃক পরিচালিত হইবেন, সন্ধির এই সর্ত্ত। হীরার আদেশে মহারাজ চিক্‌না পর্ব্বত হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে পাট স্থাপন করেন। ইনি ইঁহার বাল্য সহচরদিগকে খণ্ডরাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বার ভূঞার অনুরূপ "বার-ঘরিয়া"র সৃষ্টি করেন। বিশ্বসিংহ ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি যোগ-সাধনার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া চিক্‌না পর্ব্বতে যাইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়েন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ বিশ্বসিংহের দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহার রাজত্ব শিববংশীয় ভূপতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ (চিলা রায়) চিরজয়ী মহাবীর ছিলেন, ইঁহার পরাক্রমে বহু রাজা কোচবিহারের প্রাধান্য স্বীকার করেন। নরনারায়ণ রাজা হইয়াই

বিশ্বসিংহ—১৫২২-১৫৫৫ খৃঃ।

গৌড়দেশ আক্রমণ করেন,—নিম্নভূমির কোন মুসলমান ফৌজদারকে নিহত করিয়া চিলা রায় গৌড়েশ্বরের রাজ্যের কতকাংশ স্বাধিকার-ভুক্ত করেন। এই সময়টা পাঠান নৃপতিদের রাজত্বের শেষকাল। সোলেমান কররানীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র দাউদ পুনঃ পুনঃ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকেন। যখন বহিঃশত্রু লইয়া পাঠান নৃপতি ব্যস্ত, সেই বিপত্তিকালে নরনারায়ণ গৌড়েশ্বরের কোন সেনাপতিকে হত্যা করিয়া উত্তরবঙ্গের খানিকটা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। চিলা রায় অহমরাজ 'সুখাম্ফা (খোঁড়া) রাজাকে পরাস্ত করেন। সুখাম্ফা নরনারায়ণের অধীনত্ব স্বীকার করিয়া রাজকুমার সুন্দর গোহাইন এবং আরো কয়েকটি সম্ভ্রান্ত বংশের যুবককে জামীনস্বরূপ বহু উপঢৌকনসহ পাঠাইয়া সন্ধি করেন। অতঃপর চিলা রায় কাছাড়ের রাজা হরমেশ্বরকে পরাজয় করিয়া উক্ত রাজাকে নরনারায়ণের সামন্ত-রাজে পরিণত করেন। কথিত আছে কোন যুদ্ধে সোলেমান কররানী চিলা রায়কে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং চিলা রায়ের উপর শেষে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সহিত স্বীয় এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, একদা চিলা রায় মনে মনে চিন্তা করিলেন—সমস্ত রাজ-কার্য্য তো আমি করি। আমি রাজার জন্য যুদ্ধ জয় করি, অপরাপর রাজাদিগকে এই রাজ্যের অধীন করি, অথচ দাদা নরনারায়ণ রাজ্যভোগ করেন। ইহা অসহ্য, আমি আর এইভাবে থাকিব না। এই মনে করিয়া তিনি খড়্গহস্তে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরনারায়ণের মুখে প্রশান্ত ঔদার্য্য, সন্দেহ বা দ্বিধার লেশ নাই, ভ্রাতাকে দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল স্নেহে উজ্জ্বল হইয়াছে। পরন্ত যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখিলেন, স্বয়ং ভগবতী তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। তখন হাতের খড়্গ ফেলিয়া দিয়া তিনি রাজার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া "আমি রাজদ্রোহী আমাকে হত্যা করুন—আমার পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়ের কথা জানাইলেন যে তিনি রাজাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া নিজে কাঁদিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি পুণ্যবান্, তুমি জগন্মাতাকে দেখিলে, আমাকে তিনি কোলে করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম না।"

চিলা রায়।

নরনারায়ণ—১৫৫৫-১৫৮৭ খৃঃ।

গণকেরা রাজার রিষ্টি গণনা করিয়া বলিয়াছিল, যদি এক বৎসর রাজা সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন, তবে রিষ্টি কাটিতে পারে, তদনুসারে মহারাজ নরনারায়ণ একবৎসর সন্ন্যাস লইয়া গৃহাশ্রম ছাড়িয়াছিলেন। এই সময়ের জন্য শুক্লধ্বজ (চিলা রায়) রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে পর্য্যটক রাল্‌ফ ফিচ্ (Ralph Fitch) কোচবিহারে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায়, তখনও কোচবিহারে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব খুব বেশী ছিল। রাজধানীতে বড় বড় পশু-চিকিৎসালয় ছিল এবং প্রজারা পিঁপড়াকে চিনি খাওয়াইত। কালাপাহাড় কামাখ্যা-মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল—নরনারায়ণ তাহা সংস্কার করেন। মন্দির-গাত্রে নরনারায়ণ ও চিলা রায়ের প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। নরনারায়ণ যে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারায়ণী মুদ্রা—বহুকাল উহা কোচবেহার রাজ্যে প্রচলিত ছিল।

নরনারায়ণ স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিদ্যার আদর করিতেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃতে ব্যাকরণ রচনা করেন এবং অনন্ত কন্দলী ভাগবত ও রামায়ণের পদ্যানুবাদ সঙ্কলন করেন। ইঁহার রাজত্বকালে শঙ্কর ও মাধবের সুললিত পদ রচিত হয়।

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি ইন্দ্রিয়াসক্ত, সুদর্শন ও বহুস্ত্রীবল্লভ ছিলেন। কথিত আছে মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামক এক পণ্ডিতকে তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য রাজা অবমানিত করেন। এই ব্রাহ্মণ দিল্লী যাইয়া জাহাঙ্গীরকে উত্তেজিত করেন। মোগলদিগের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ পরাজিত হইয়া দিল্লী যাইয়া সন্ধি করিয়া আসেন। তাঁহার এক কন্যাকে তিনি মানসিংহের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবরনামায় কথিত আছে যে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ২,০০,০০০ পদাতিক, ৭০০ হস্তী এবং ১,০০০ জাহাজ ছিল—তাঁহার রাজ্যের আয়তন দৈর্ঘ্যে ২০০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ১০০ হইতে ৪০ ক্রোশ ছিল—উহা পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলদিগের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পরে নারায়ণী মুদ্রার অর্দ্ধেক মোগলানুগত্যের চিহ্ন থাকিবে, উভয় রাজত্বের সীমা বহাল থাকিবে এবং কেহ কাহারও রাজ্যে উপদ্রব করিতে পারিবেন না, এই স্থির হইয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বাংশ চিলা রায়ের সন্ততিদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন। এই অংশের রাজার সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের অসদ্ভাব হইয়াছিল। ফলে মোগল সাহায্যে পূর্ব্ব-কোচরাজ্যের রাজা পরীক্ষিৎকে লক্ষ্মীনারায়ণ পরাস্ত করেন এবং পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর সেই অংশ মোগল সরকারের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু কোচেরা বেশীদিন মোগল-বশ্যতা স্বীকার করিল না। আকবরের সৈন্য সমস্তই তাহারা ধ্বংস করিল। পুনঃ পুনঃ জয়পরাজয়ের পরে ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া রাজা বলিনারায়ণকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। পূর্ব্বাংশের রাজারা অহম্ রাজাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা অবশেষে বড় নদীর পশ্চিমের প্রদেশ অধিকার করিল। পরীক্ষিতের রাজ্য অহম্‌রাজদের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে অহম্‌রাজ এবং ভুটিয়া-রাজ কোচবিহার-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তিনি মোট ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ—১৫৮৭-১৬২১ খৃঃ।

তৎপর লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বীরনারায়ণ রাজা হইলেন, তখন কোচবিহারের সীমা অনেক সঙ্কুচিত হইয়াছিল। রায়াকত নেতারা স্বাধীন এবং মহারাজের অভিষেকোৎসবে ছত্রধরের কাজ করিতে অসম্মত, ভুটিয়ারা রাজার আনুগত্য স্বীকার করিল না। মহারাজ বীরনারায়ণ আঠার-কোঠায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার রাজ-প্রাসাদের নাম দিলেন "মণ্ডপ আবাস"। তাঁহার রাজত্বকালে নারায়ণ ত্রৈলোক্যদর্শী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোচবিহারে

বীরনারায়ণ—১৬২১-১৬২৫ খৃঃ।

আসিলেন, রাজদ্বারীরা তাঁহার দীনহীন বেশ দেখিয়া অপমান করিয়াছিল। রাজা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিলেন এবং শিক্ষার মর্য্যাদা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র ও স্বগণবর্গের জন্য উচ্চশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজারা বহুপত্নীক ছিলেন। এই রাজার কোন মহিষীর গর্ভে এক পরমসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; বড় হওয়ার পরে ইঁহাকে রাজা আর দেখেন নাই। হঠাৎ অন্তঃপুরের উদ্যানে পরমসুন্দরী ষোড়শী মূর্ত্তি দেখিয়া ইনি কামাতুর হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যান, রাজকুমারী বিশেষ লজ্জায় আর্ত্ত হইয়া রাজার হাত ছাড়াইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। রাজ-উপাখ্যানে জয়নাথ মুন্সী এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"রাজকুমারী, তাঁহার বিবাহের যে স্বর্ণ চালুনি ও পাঁচটি স্বর্ণ দিয়ড় অর্থাৎ দীপদান ছিল, তাহা এবং স্বর্ণথাল ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমেত নদীর তটে গমন করিয়া দিয়ড় প্রজ্বলিত করিয়া স্তনদ্বয় অস্ত্রদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক স্বর্ণ থালাতে রাখিয়া সহচরীকে দিয়া কহিলেন, 'পিতাকে দিও, তিনি তাঁহার যাহা বাঞ্ছিত তাহা নেন। আমি গমন করিলাম।' ইহা বলিয়া চালুনিবাতি মস্তকে করিয়া নদীতে মগ্না হইলেন। ঐ নদীর নাম হইল কুমারী নদী—ইহা অদ্যাপি আছে। সহচরী থাল সমেত রাজার নিকট আসিয়া বলামাত্র মহারাজ হাহাকার শব্দ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। শোকে ও লজ্জাতে মৃত্যুতুল্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে মহাদেব, ব্রহ্মা সন্ধ্যাতে উপগত হওয়ার চেষ্টা করাতে তুমি ঊর্দ্ধশির ছেদন করিয়াছিলে, আমাকে কেন শূলে আঘাত কর না।' মন্ত্রিবর্গ নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিল, ফলে মহারাজ পুনরায় রাজসভাতে তাদৃক বসিলেন না; লজ্জিত ভাবেই অল্পকাল ছিলেন। পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১৭ শকে (কোচরাজ-শক) যাহাতে ১০৩৩ সন বাঙ্গলা, ১৫৪৮ শকাব্দা হয়, রাজা বীরনারায়ন দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসগামী হইলেন।"

রাজার অদ্ভুত কার্য্য ও তৎফলে মৃত্যু।

বীরনারায়ণের পুত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাণনারায়ণের সময় মুসলমানেরা পুনরায় কোচবিহার রাজ্যে হানা দিয়াছিল। রাজা কিছুকাল পলাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতক জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ তাঁহার লুকাইবার স্থানের সন্ধান দিয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি ধৃত হইলেন, কিন্তু কোনক্রমে মুক্তি পাইয়া প্রবল সৈন্য লইয়া আসিয়া মুসলমানদিগকে স্বরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মীরজুম্লা বহু সৈন্য লইয়া কোচবিহার রাজ্য দখল করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু পথে তাঁহার মৃত্যু ঘটাতে মুসলমানেরা ফিরিয়া গেল। তদবধি মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজ্যে আর কোন উৎপাত হয় নাই। জয়নাথ মুন্সী লিখিয়াছেন:—"রাজা প্রাণনারায়ণ ব্যাকরণ ও স্মৃতি সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, দ্রুতকবি, শ্রুতিধর। মহারাজ বীরনারায়ণ যত বালককে পড়িতে দিয়াছিলেন, সকলেই পণ্ডিত হইল। রাজসভাতে অনেক পণ্ডিত;—তন্মধ্যে বিশেষ পাঁচজন, তাঁহাদের দ্বারা পঞ্চরত্ন সভা হইল। রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমত পণ্ডিতের সভা আর

প্রাণনারায়ন—১৬২৫-১৬৬৫ খৃঃ।

হয় নাই। কবিরত্ন ও কবিভূষণ দুই মন্ত্রী। সভাস্থ যাবতীয় লোকই পণ্ডিত। ভৃত্যবর্গ সমুদায় ও দ্বারী প্রহরী সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ। সংস্কৃত-বহির্ভূত অন্য ভাষাতে কথা ছিল না। অন্য দেশের রাজাদিগের দূত ও প্রেরিত মন্ত্রী রাজসভাতে আসিতে ইতস্ততঃ করিত। সর্ব্বদা সর্ব্বশাস্ত্রালাপ হইত।" মহারাজ প্রাণনারায়ণ জল্পেশ্বরের ইষ্টকময় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে জয়নাথ মুন্সী লিখিয়াছেন: "আমার দৃষ্টমানে এমত তাৎপর্য্য ও অতবড় মন্দির কুত্রাপি দেখি নাই। বরং যাঁহারা বহু দেশ দেখিয়াছেন—তাঁহারাও বলেন এমত মন্দির কেহ দেখেন নাই, ফলে অমানুষী ক্রিয়া জ্ঞান হয়।" প্রাণনারায়ণ একজন আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। জল্পেশ্বরের মন্দির ছাড়া ইনি গোসানি মন্দির, বাণেশ্বর ও সন্তেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন (১৬৬৫ খৃঃ)। রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বেই দুষ্ট লোকেরা তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল, এই অপরাধে অভিযুক্ত কবিরত্ন ও কবিভূষণের শিরশ্ছেদ হইল। "মহারাজ প্রাণনারায়ণ ষড় ঋতুর মধ্যে পাঁচ ঋতুতে রাজকার্য্য করিতেন। বসন্ত ঋতুর পূর্ব্বে সকল কার্য্য হইতে অবসর হইয়া অতি রম্যস্থানে পরমসুন্দরী রমণী সকল সমভিব্যাহারে নানা রস ও ক্রীড়া করিতেন। পুষ্পচয়ন, পুষ্পমালা-গ্রন্থন, পুষ্প-আভরণ ও পুষ্প-শয্যা নির্ম্মাণ করিতেন এবং নানা খেলা হইত—সেস্থানে পুরুষের গম্য ছিল না। বসন্ত ঋতু অতীত হইলে পুনরায় রাজকার্য্য করিতেন। রাজা নিজে গান বাদ্য ও সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। স্বকৃত এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, অতি আশ্চর্য্য, তাহা আমি শুনিয়াছি। এমত গ্রন্থ ছিল তাহা পড়িলে রাগ-রাগিণী সকল ব্যুৎপত্তি জন্মিত এবং এমত পুঁথি অন্য কাহারো কৃত সাধ্য নাই। অনেকে গান শুনিলে প্রতিষ্ঠা করিত। পুঁথিখানি অগ্নিতে লোপ হইয়াছে, তাহার নকল যে কোন খানে আছে, এমত শুনি না।" (রাজ-উপাখ্যান।)

মোদনারায়ণ—১৬৬৫-১৬৮০ খৃঃ।

প্রাণনারায়ণের পুত্র মোদনারায়ণের সময় জ্ঞাতি-বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে; এই সকল উৎপাতে রাজা স্থির ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি মহীনারায়ণ ও তৎপুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহই মোদনারায়ণের রাজত্বের প্রধান ঘটনা।

বাসুদেবনারায়ণ—১৬৮০-১৬৮২ খৃঃ।

মহেন্দ্রনারায়ণ—১৬৮২-১৬৮৩ খৃঃ।

ইহার পরে কতক দিনের জন্য বাসুদেবনারায়ণ 'রায়কত'দিগের চেষ্টায় রাজা হইয়াছিলেন। ইনি মহারাজ প্রাণনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি দুইবৎসর মাত্র রাজত্ব করার পর মহীনারায়ণের পুত্রদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। রায়কত-নেতা জগদেব এবং ভুজদেব মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র মনোনারায়ণের পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইহার সময়ে মোগলেরা ইবাজত খাঁর নেতৃত্বে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ফতেপুর, কাজির হাট এবং কাকিনা চাকলা দখল করে, অপরাপর প্রদেশের কোন কোনটি গোপনে বঙ্গেশ্বরকে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া কোচরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মহেন্দ্রনারায়ণ ৫ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন,

১৬ বৎসর বয়সে এই নামে-মাত্র-রাজা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং তিনি কোন সন্তানাদি রাখিয়া যান নাই।

মূল রাজবংশের ধারা এইখানে শেষ হয়, উজির মহীনারায়ণের বংশধর রূপনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা আসিয়া পুনরায় চাকলা বোড়া, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করে। ১৭ বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ চলে, পরে সন্ধি হয়। এই সময় হইতে কোচবিহার রাজ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত চাকলাগুলি নামে মাত্র কোচবিহার কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকে, কারণ রাজা সেগুলি পত্তনি মহল স্বরূপ বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে গ্রহণের পাট্টা প্রাপ্ত হন। ছত্রপতি রাজার পক্ষে ঐরূপ ভাবে প্রজাস্বত্ব গ্রহণ করা অপমানকর, এজন্য রাজার পক্ষ হইতে তাঁহার জ্ঞাতি শান্তনারায়ণ ইজারা গ্রহণ করেন। এই সন্ধি ১৭১১ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হয়।

রূপনারায়ণ—১৬৯৩-১৭১৪ খৃঃ।

মহারাজ রূপনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সুদীর্ঘকাল-ব্যাপক ছিল। ইহার সময় মহম্মদ আলি খাঁ নামক রঙ্গপুরের ফৌজদার রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু ভুটিয়াদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মহারাজ রণজয়ী হইলেন। ৪৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ পরলোকে গমণ করেন। তাঁহার প্রাধানা রাজ্ঞী সহমৃতা হইলেন।

উপেন্দ্রনারায়ণ—১৭১৪-১৭৬৩ খৃঃ।

ইহার পরে রাজপুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চ বৎসর মাত্র। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে এক অচিন্তনীয় করুণ ঘটনায় রাজপুরী শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ নাজির রুদ্রনারায়ণের ষড়যন্ত্র-ফলে গোঁসাই রামানন্দ একটা কুৎসিত কসাইএর কাজ করিলেন। "অনেক কসাই ভাল গোঁসাইএর চেয়ে"—ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাটি এখানে প্রমাণিত হইল। আমি জয়নাথ মুন্সীর বর্ণনা হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—"রামানন্দ গোসাঞীর সমভিব্যাহারে এক ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার নাম রতি শর্ম্মা। সে প্রায় সম্বৎসর বলরামপুরে থাকিত। মহারাজের তখন ষষ্ঠ বৎসর বয়স। একদিন অপরাহ্ণ বেলাতে কয়েকজন সমবয়স্কের সহকারে রাজবাটীর অগ্নিকোণে, পদ্মপুষ্করিণীর বায়ব্য কোণে—যেখানে অশোকের একটা বৃক্ষ আছে—কুমারলোক কূপ খনন করিতেছে—ঐ স্থানে রাজা ক্রীড়া করিতেছেন, হাস্যকৌতুকে পরম আনন্দে আছেন, এই সময় রতি শর্ম্মা অকস্মাৎ কোন্ দিক্ হইতে কি প্রকারে তীক্ষ্ণ এক তরবারি হস্তে ধারণ করিয়া অসিয়া একাঘাতে মহারাজের শিরশ্ছেদ করিয়া বাম হস্তে কেশ ধরিয়া মুণ্ড লইয়া দ্রুতগতি ঐ পদ্মপুষ্করিণীর অগ্নিকোণে চণ্ডীর একটা ইষ্টকময় মন্দির ছিল, তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজের স্বর্ণ পুত্তলীর ন্যায় শরীর ধূলাতে পতন হইয়া কবন্ধপ্রায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। খাঁড়া-ধরা প্রভৃতি রাজার রক্ষক ও ভৃত্য সকল হাহাকার শব্দ করিয়া রতি শর্ম্মার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ঐ মন্দির মধ্যেই কেহ শূল, কেহ তরবারি, কেহ বর্শাঘাতে অতি ত্বরায় রাজ-বধী ব্রহ্মণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নষ্ট করিল। ইহা প্রকাশ

দেবেন্দ্রনারায়ণ—১৭৬৩-১৭৬৫ খৃঃ।

হইতে পারিল না, রতি শর্ম্মা কি কারণে—কাহার কথামত এই দুরূহ কর্ম্ম করিল। রাজবাড়ী হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনিতে পূর্ণিত হইল। কোন ভৃত্য রাজার মুণ্ড আনিয়া শরীরের নিকট রাখিল। 'দেবাই' অর্থাৎ রাজমাতা নির্মুণ্ডদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 'হা পুত্র হা পুত্র' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজের কাটা যাওয়ার সংবাদ গৌরীনন্দন মুস্তফি ও গৌরপ্রসাদ খাসনবিস শুনিয়া হতবুদ্ধি পাগলের ন্যায় হইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া আর আর মন্ত্রিবর্গ সহিত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।" ষষ্ঠ বৎসর বয়স্ক বালক রাজার এবংবিধ শোচনীয় মৃত্যুর কথা বলিয়া আমরা এইখানে কোচবিহারের ইতিহাস শেষ করিলাম। কারণ এখন হইতে রাজত্ব সাহ আলম সম্রাটের নির্দ্দেশ-অনুসারে মুসলমানের হস্ত হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে পড়িল (১৭৬৫)। ইংরেজাধিকারের কথা আমাদের বিষয়বহির্ভূত। সংক্ষেপে নিম্নে পরবর্ত্তী রাজগণের একটা তালিকা দিতেছি মাত্র :—

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ১৭৬৫-১৭৮৩ খৃঃ। (ইহার মধ্যে কতক সময়ের জন্য রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রাজা হইয়াছিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ।) মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ১৭৮৩-১৮৩৯ খৃঃ। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৯-১৮৪৭ খৃঃ। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৯-১৮৬৩ খৃঃ। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৬৩ খৃঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

কাছাড় (হেরম্ব)

আমরা ত্রিপুরা, আসাম ও কোচবিহারের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া কাছাড় রাজ্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি; এই বংশের রাজারা একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইলেও এক সময়ে প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন।

বর্ত্তমান কাছাড় রাজ্য ইংরেজ গভর্নমেণ্ট খাস করিয়া লইয়াছেন; ইহার আধুনিক আয়তন ৪,২০০ বর্গ মাইল। বর্ত্তমান নাগাপর্ব্বতে কাছাড় রাজ-বংশের দুইটি প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়: দিমাপুর ও মাইবাং। দিমাপুর রাজধানীর বিশাল অট্টালিকার স্তূপ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; ইহার রাজারা যে কিরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন,—তাহা ঐ সকল কীর্ত্তি দেখিলে সহজেই অনুমিত হয়। এক সময়ে কাছাড় রাজ-বংশের পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। কাছাড়ের বৃদ্ধ নৃপতি যখন ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচনের (যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক) সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন ত্রিপুরেশ্বর নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন। এই বিবাহের

প্রস্তাবের কথা শুনিয়া "সর্ব্ব লোক পুলকিত কহে জনে জন। ত্রিপুরকুলের বৃদ্ধি হবে হেন দেখি" (রাজমালা, ত্রিলোচন-খণ্ড)। এদিকে ত্রিপুরার লোকেরা এই বিবাহ 'কুলক্রিয়া' বলিয়া মনে করিয়াছিল। কাছাড়ের রাজা এই সম্বন্ধ দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে চাহিয়াছিলেন,—ম্লেচ্ছ ও কোচদিগের আক্রমণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া-পড়িয়াছিলেন, বৃদ্ধ ও অপুত্রক রাজা ত্রিপুরেশ্বরের সহায়তায় স্বীয় রাজ্যের বিলয়োন্মুখ ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন; সুতরাং একদিকে ছিল 'কুলক্রিয়া' ও অপরদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় কাছাড় রাজবংশের আভিজাত্যের গৌরব সেই সময়ে খুবই ছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই বিবাহাদির কথা না বলিয়া লিখিয়াছেন—"রাজ্যভ্রষ্ট নরপতির জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড় রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা, সেই নরপতির কনিষ্ঠপুত্র ত্রিপুরা রাজবংশের আদি-পিতা।" অর্থাৎ ত্রিলোচনাদির অস্তিত্বই তিনি অস্বীকার করেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক রাজার দুই পুত্র, একজন ত্রিপুরা ও অপরটি কাছাড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই অনুমানের ভিত্তি কোথায় তাহা জানি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৃদ্ধ কাছাড়-রাজ আভিজাত্য-গর্ব্বিত, কিন্তু বর্ব্বর জাতিদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ত্রিলোচনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার দ্বাদশ দৌহিত্র হইয়াছিল,—এই দ্বাদশ দৌহিত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দৃক্‌পতিকে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। এই জ্যেষ্ঠপুত্রকে গ্রহণ করাতেও দৃষ্ট হয় যে তিনি মানসম্ভ্রমে ন্যূন ছিলেন না, তাহা না হইলে ত্রিপুর-রাজ কখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে শ্বশুরালয়ে চিরদিন থাকিতে দিতে সম্মত হইতেন না।

ত্রিপুর-রাজবংশ যেরূপ যযাতি-পুত্র দ্রুহ্য হইতে তাঁহাদের বংশলতিকা টানিয়া দেখান,—কাছাড়-রাজারা সেইরূপ ভীম-পুত্র ঘটোৎকচকেই তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। মণিপুরের রাজারা অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজারা কৃষ্ণদ্বেষী নরকাসুরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

মহাভারতের বীরগণের সহিত সম্বন্ধ।

সুতরাং পূর্ব্বাঞ্চলের রাজারা মহাভারতের রাজন্যগণের শাখা-উপশাখার সঙ্গে সংস্রবের দাবী করিয়া আপনাদিগকে গৌরান্বিত মনে করিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গের কোন কোন স্থানে বিরাটের গোগৃহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমরা দেখাইয়াছি, ঢাকা জেলার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গলে চেদিরাজ শিশুপালের গৃহাবশেষ এখনও পল্লবিশগণ দেখাইয়া থাকেন। মহাভারত এদেশের কল্পনাকে এরূপ প্রবুদ্ধ করিয়াছিল যে সেই মহাপুরাণের উল্লিখিত বীরগণের সঙ্গে রক্তসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে এদেশের রাজারা কৃতার্থ হইতেন। এ শুধু পূর্ব্বভারতের কথা নয়, কোন কালে আবু পাহাড়ে যজ্ঞ করিয়া শক-জাতীয় কয়েকজন বীরকে ব্রাহ্মণেরা "অগ্নিকুল" নাম দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা এখন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। এই দুইটি জ্যোতিষ্ক একটি উজ্জ্বল, অপরটি শীতল—আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরুষদের পূর্ব্ব-পুরুষ,—এখনও পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উদয়াস্তের লীলা করিতেছেন ও মানুষের দাবীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া হয়ত

হাসিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়া অন্যান্য জাতিকে নগণ্য মনে করিতেছেন। আভিজাত্যের মূলে এই সকল গল্প ও রূপ-কথা। কোন কালে কেহ কি এগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? তথাপি একথা নিশ্চিত যে রাজপুত ও আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমে অবস্থিত অপরাপর দেশের রাজাদের অপেক্ষা ত্রিপুরা ও প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরের রাজাদের বংশাবলী সুপ্রাচীন। প্রাগ্জ্যোতিষপুর বিনষ্ট হইয়াছে—অহম্ রাজারা নরকবংশীয়দের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ত্রিপুরার গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ। কাছাড়ের রাজাদের (১) ঘটোৎকচ হইতে, (২) মেঘবর্ণ, (৩) মেঘবল, (৪) তাম্রধ্বজ, তৎপরে (৫) কেতুধ্বজ হইতে অর্কধ্বজ পর্য্যন্ত ৪৫ জন "ধ্বজ"-উপাধিক এবং ৫০ সংখ্যক প্রতাপনারায়ণ হইতে মদননারায়ণ পর্য্যন্ত ৭ জন "নারায়ণান্ত" উপাধিক, তৎপরে (৫৯) চিত্রধ্বজ হইতে হেমধ্বজ পর্য্যন্ত পুনরায় ৭ জন ধ্বজ-উপাধিক,—(৬৪) শিখণ্ডীচন্দ্র হইতে বীরচন্দ্র পর্য্যন্ত ১৫ জন "চন্দ্র" উপাধি-বিশিষ্ট এবং (৭৯) পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে ১১০ গোবিন্দনারায়ণ পর্য্যন্ত 'ধ্বজ' ও 'নারায়ণ' এই দুই উপাধিরই রাজাদের নাম এই দীর্ঘ বংশাবলীতে পাইতেছি। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার "রাজমালায়" এই সকল নামের তালিকা দিয়াছেন (২৫৬-২৬১ পৃঃ)। শুধু কতকগুলি নামের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, বিশেষ যখন সেই রাজবংশ এখন লুপ্ত। এই জন্য আমরা বিরত হইলাম। হাণ্টারের Statistical Account of Assam নামক পুস্তকে আর একটি বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে (২য় খণ্ড, ৪০৩ পৃঃ)। এই সকল বংশাবলীর কতকগুলি প্রবাদ ও পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বংশাবলী।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, 'কাছাড়'—নেপালী শব্দ। কেহ কেহ বলেন, উহা সংস্কৃত একটি শব্দ হইতে উদ্ভূত, তাহার অর্থ "প্রান্তদেশ।" পুরাকালে এই দেশ সম্ভবতঃ 'মেচ' বা ম্লেচ্ছ জাতির নিবাস ছিল। একটি সুবিস্তৃত দেশে বড়ো এবং তৎসংমিশ্রিত ভাষা প্রচলিত, তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে এককালে হয়ত সমগ্র আসাম এবং বঙ্গ দেশের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল সমস্তই 'বড়ো' সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাছাড়ীদের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না,—তাহাদের সহিত অহম্ রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের কথা আসাম দেশীয় বুরুঞ্জীতে প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল, অর্থাৎ দিখু হইতে কল্লাং পর্য্যন্ত এবং ধানশ্রী উপত্যকা এবং বর্ত্তমান উত্তর-কাছাড় বিভাগ অধিকার করিয়াছিল। ১৪৯০ খৃঃ অব্দে ইহারা অহম্দিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৫২৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অহম্দিগের সহিত অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল—উভয়-পক্ষের জয়পরাজয় ঘটিয়াছিল কিন্তু পরিশেষে অহমদের জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধে কাছাড়-রাজ খুনখার বন্দী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মীয় দেৎসংকে রাজপদ দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু দেৎসং পুনরায় বিদ্রোহী হওয়াতে অহম্গণ তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করিয়া ফেলে,—এইবার ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ীরা দিমাপুর ছাড়িয়া মাইবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করে।

কাছাড়ীদের পূর্ব্ব-যুগের ইতিহাসের কিছুই পাওয়া যায় না, প্রবাদ এই যে আদি কালে কাছাড় ত্রিপুরেশ্বরের অধিকৃত ছিল,—কিন্তু কাছাড়ী রাজার সহিত ত্রিপুর-রাজ স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া ঐ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার তিনি জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন।

১৬০৩ খৃঃ অব্দে জয়ন্তীরাজ ধনমাণিককে পরাস্ত করিয়া কাছাড়-রাজ শত্রুদমন "অরি-মর্দ্দন" উপাধি গ্রহণ করেন, ধনমাণিকের মৃত্যুর পর কাছাড়-রাজ যুবরাজ যশোমাণিককে জয়ন্তীর অধিকার দান করেন। শত্রুদমনকে নায়ক করিয়া বাঙ্গলা "রণচণ্ডী" নামক উপন্যাস বহু পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। ইহার পরে মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়; প্রথম বার মুসলমানেরা পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গেশ্বরের (কাসিম খাঁ) সময় কাছাড়ীদের দুই প্রধান দুর্গ অসুরাতিকিরি ও প্রতাপগড় মুসলমানেরা দখল করে এবং রাজা প্রতাপসিংহকে এক লক্ষ টাকা, সম্রাট্‌কে ২০,০০০ টাকা, বঙ্গেশ্বরকে এবং থানাদার মুরাজ খাঁকে ২০,০০০ টাকা দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ছাড়া তিনি ৬০টি হাতী সম্রাট্‌কে এবং ৫টি হাতী সুবেদারকে (বঙ্গেশ্বর) দিয়াছিলেন। প্রতাপনারায়ণ মাইবঙ্গ ছাড়িয়া কীর্ত্তিপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৬৪৪ খৃঃ অব্দে বীরদর্পনারায়ণের সঙ্গে অহম্-রাজ চক্রধ্বজের মনোমালিন্য ঘটে, কিন্তু চক্রধ্বজ মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়াছেন শুনিয়া বীরদর্প তাড়াতাড়ি অহম্‌দিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়া ফেলেন। একটি শঙ্খ পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে কৃষ্ণের দশ অবতার চিত্রিত হইয়াছে এবং উহা ১৬৭১ খৃঃ অব্দে বীরদর্পনারায়ণের রাজত্ব কালে ক্ষোদিত হইয়াছিল—ইহা লিখিত আছে। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে তাম্রধ্বজ রাজা অহম্-রাজ রুদ্রসিংহের সার্ব্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অহম্-রাজ-দরবারে নীত হন; তথায় আনুগত্য স্বীকার করাতে রুদ্রসিংহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু গৃহে ফিরিবার পথে খাসপুরে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মহারাজ রুদ্রসিংহ তাঁহার সুচিকিৎসার জন্য স্বীয় ভিষককে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল (১৭০৮ খৃঃ)। তাম্রধ্বজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুরদর্পনারায়ণ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে বাণেশ্বর বাচস্পতি নামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক 'নারদীয় পুরাণ' বিরচিত হয়। রাজমাতা চন্দ্রপ্রভার আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে কীর্ত্তিচন্দ্রনারায়ণ অহম্-রাজ রাজেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার না করাতে পুনরায় যুদ্ধ হয়, কিন্তু পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হইল। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে হরিশ্চন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অহম্-রাজের আনুকূল্য প্রাপ্ত হন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র স্বর্ণ গাভী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তৎগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রাত্য দোষ দূর করিয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রূপে গণ্য হন। গাভীর অংশগুলি ব্রাহ্মণেরা অবশ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন—গোবিন্দচন্দ্র রাজা হন। এই রাজাকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কোহিদান নামক রাজার এক গোলাম দল পাকাইয়া রাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করে। রাজা তাহাকে নিহত করেন, কিন্তু তৎপুত্র তুলারাম রাজ্যের উত্তরাংশ দখল করিয়া বসে। মণিপুরের রাজা মারজিৎ সিংহ এই সময়ে কাছাড় আক্রমণ করেন।

বিপদে পড়িয়া গোবিন্দচন্দ্র মণিপুরের নির্ব্বাসিত রাজা সুরজিৎ সিংহের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সাহায্যে মণিপুর আক্রমণ করিলেন সত্য, কিন্তু যুধজিৎ সিংহের পুত্র মারজিৎ এবং গম্ভীর সিংহ তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট সাহায্য চাহিয়া সাহায্য পাইলেন না, সুতরাং ব্রহ্ম-রাজার দ্বারে উপনীত হইলেন। ব্রহ্ম-রাজের সৈন্য কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ইহাই ইংরেজ রাজের সঙ্গে তাঁহাদের শত্রুতার সূত্রপাত, কিন্তু ইহার পরের কথা এই পুস্তকের বিষয়-বহির্ভূত।

এই বৃত্তান্ত উপসংহার করিবার পূর্ব্বে দিমাপুরের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিব। রাজধানীর দক্ষিণ দিক্‌টা দুই মাইল পর্য্যন্ত ধনশ্রী নদীর উপকূল ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রচীর দ্বারা বেষ্টিত। অহম্-রাজাদের অপেক্ষা কাছাড়ের রাজগণের বৈভব ও শিল্পজ্ঞান অনেক বেশী ছিল, কারণ অহমেরা ইটের কাজ একবারে জানিতেন না। কাছাড়ীরা বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও ভাস্কর্য্য আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। ইটের উপর নানারূপ হরিণ, কুকুর ও হাতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত, এবং অট্টালিকাগুলির ইটের গাঁথুনি এরূপ শক্ত যে উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হওয়ার পর এতকাল যাবৎ তাহারা একরূপ অটুট অবস্থায় আছে। কতকগুলি বেলে-পাথরের ১২ ফুট-উচ্চ নানা কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভ দৃষ্ট হয়—তাহারা প্রায় দশ মাইল জায়গা জুড়িয়া আছে। সেই দেশের কারিগর যে এই সকল কারুকার্য্য বাঙ্গালীদের নিকট শিখিয়াছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভগুলি দূর হইতে অটুট অবস্থায় আনা সম্ভবপর নহে। দিমাপুরে কতকগুলি দীঘি দেখা যায়, উহারা বড়ই সুন্দর। ৬০০ হস্ত পরিমিত বেড়যুক্ত দুইটি দীঘি আছে—অপরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই সকল স্থানের কোনই সন্ধান হয় নাই, হয়ত অনেক নূতন তত্ত্ব জঙ্গলের অভ্যন্তরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঐতিহাসিকদিগকে কিছু বলিবার সুবিধা তাহারা আজও পায় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীহট্ট

বাঙ্গলার লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণব। পতিত জাতিদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব গোস্বামীদের শিষ্য। পূর্ব্বে মণিপুর হইতে পশ্চিমে মেদিনীপুর এবং উত্তরে রঙ্গপুর হইতে দক্ষিণে সুন্দরবন—এই বিশাল জনপদ বাসীরা অধিকাংশই গোস্বামিগণের অধিকারভুক্ত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাহাড়িয়া টিপ্রা এবং সাঁওতাল-গণের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে, এবং যে সকল পার্ব্বত্য জাতি ভাল

করিয়া বাঙ্গলা বলিতে বা লিখিতে পারে না, তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিম্ন-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়; বাঙ্গলার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম—এই সমগ্র সীমানার মধ্যে মহাপ্রভুর খোল-করতাল বাজে না, এমন স্থান বিরল। মহাপ্রভুর পিতা-মাতা, পিতামহ-মাতামহ, ও প্রমাতামহ, মাতুল এবং বাল্যসখাগণের অনেকেই শ্রীহট্ট-নিবাসী। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও আদি-পুরুষ মধুকর মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ,—তাঁহার গুরু এবং অনুরাগী অদ্বৈতাচার্য্য যাঁহার তপোবলে তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া চিরাগত প্রবাদ, তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত শ্রীবাস—যাঁহার অঙ্গিনার ধূলি তাঁহার সোণার অঙ্গ হইতে শচীদেবী নিত্য মুছিয়া ফেলিতেন, তাঁহার চির অন্তরঙ্গ পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব, রত্নগর্ভ আচার্য্য এবং পদকর্ত্তা যদুনাথ দাস—প্রভৃতি বৈষ্ণববন্দিত আচার্য্যগণ, বিশেষ ঢাকা দক্ষিণ-গ্রামবাসীরা এবং সুহৃদমণ্ডলীর অনেকেই—শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্য এবং তাঁহার পরিকর-বর্গের মধ্যে বিশিষ্ট অনেক লোককে শ্রীহট্ট দাবী করিতেছে। এই হিসাবে সমস্ত বঙ্গদেশ এমন কি উৎকলেরও কতকাংশ, অর্থাৎ যে যে দেশবাসীরা চৈতন্যের দোহাই দিয়া থাকেন,—তাঁহারা সমস্তই শ্রীহট্ট-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত। এই সাম্রাজ্যের রাজ-চক্রবর্ত্তী চৈতন্যদেব এবং অন্যতম নেতা অদ্বৈতাচার্য্য। আমরা সকলে ইঁহাদেরই রাজ্যে বাস করিতেছি। শুধু বৈষ্ণবগণ নহেন, শাক্তগণ—শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, খড়কাটা চাষারাও আজ তাঁহারই করতাল বাজাইতেছে। বঙ্গদেশ আজ শ্রীহট্টের শাসন মানিয়া লইয়াছে, শ্রীহট্টের এক ব্রাহ্মণ-কুমার অনুরাগের রাজদণ্ড লইয়া এই বিশাল ভূভাগ শাসন করিতেছেন।

শ্রীহট্টের শাসন।

নবদ্বীপই এ যুগে হিন্দুর রাজধানী,—হিন্দুরাজত্ব সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হয় নাই; যাঁহারা রাজস্ব আদায় করেন—প্রজাদিগকে অনুগ্রহ-নিগ্রহ করেন, তাঁহারা সাময়িক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা আমাদের উপর কর্ত্তৃত্বের দাবী করিলেও সমস্ত জাতি যাঁহাদের নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাথা নোয়ায়, যাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রভাব দূর হয় না, বংশানুক্রমে লোকবৃন্দ যাঁহাদের প্রজা; সেই সকল বিধিদত্ত রাজদণ্ডধারীরাই প্রকৃত রাজা। এই হিসাবে নবদ্বীপের রাজা 'নবদ্বীপচন্দ্র' উপাধিতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ দখল করিয়াছেন এবং অপর এক রাজা রঘুনাথ শিরোমণি—তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র মিথিলা বিজয় করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে নবদ্বীপের প্রাধান্য—বঙ্গদেশের প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই রঘুনাথ শিরোমণিরও বাড়ী শ্রীহট্টে।* বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে শ্রীহট্টের উল্লেখ করা উচিত।

* কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বাড়ী নবদ্বীপে। কিন্তু নবদ্বীপে তাঁহার টোল ছাড়া তাঁহার বসত বাড়ী, বংশলতা প্রভৃতির কোন প্রবাদ নাই। শ্রীহট্টে তৎসম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে এবং এই সমস্ত প্রবাদ 'বৈদিক সংবাদিনী' নামক সংস্কৃত কুল-গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে (৬৬-৬৫ পৃঃ) এবং তাহাতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত

শ্রীহট্টে লাউড়ের পাহাড়ে একটা স্থান দেখাইয়া এখনও লোকে তথায় ভগদত্তের বাড়ী ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এককালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-রাজ্য যে বহু বিস্তৃত ছিল, এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, লাউড় হইতে ত্রিপুরার সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ ঐ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ভগদত্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার বংশধর বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাঁহারা আসামের ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন,—তাঁহাদের কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীহট্টের অর্দ্ধাংশ শুধু আসামের অন্তর্গত ছিল এমন নহে, উহার কোন কোন স্থান বহুকাল ত্রিপুরারও অধীন ছিল। তাহা ছাড়াও পুরাকালে এই ভূভাগ অন্য অন্য বংশের স্বাধীন রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছে; সুতরাং আর্য্যনিবাসের প্রথম যুগে পূর্ব্ব-ভারতের এই পূর্ব্বাংশ তাঁহাদের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই রাজ্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। ভিন্ন ভিন্ন বংশ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের ইতিহাসও লুপ্ত হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য—ত্রিপুরা, জয়ন্তী পাহাড় বা নাগা দেশ, মণিপুর, আসাম প্রভৃতির ইতিহাস-প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের ইতিহাসের দুইএকটা কথা আমরা পাইতেছি। কিন্তু এই দেশ যে অতি প্রাচীন, ইহা যে শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল এবং নানা তীর্থ অধ্যুষিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুমাত্রেরই যাতায়াতের স্থান ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে।

প্রথমতঃ শ্রীহট্টের প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির বিষয় লিখিব, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব,—"উত্তরে পণা তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাদেব রূপনাথ, সিদ্ধেশ্বর, উনকোটি, তুঙ্গেশ্বর ও ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত জেলার তিন দিকেই বৃহদাকার দেবস্থান রহিয়াছে" (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ৯৯ পৃঃ)।

শ্রীহট্টের প্রাচীন তীর্থ।

১। বামজঙ্ঘা মহাপীঠ—জয়ন্তীয়া পাহাড়ের বাউরভাগ পরগনায়। দেবীর নাম জয়ন্তী ও শিবের নাম ক্রমদীশ্বর। এই দুই দেবতাই ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর চতুষ্কোণ কূপে অবস্থিত প্রস্তর-রূপী। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে অসংখ্য নরবলি হইত।

২। রূপনাথ গুহা—নৈসর্গিক প্রস্তরময় গুহার মধ্যে বিচিত্র দৃশ্য। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, "কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই 'নক্ষত্রপুঞ্জ'। এমন মনোজ্ঞ দৃশ্যে কাহার না বিস্ময় উৎপন্ন হয়? মস্তক উত্তোলন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সহস্র সহস্র নক্ষত্র ঊর্দ্ধে জ্বলিতেছে। উপরে কৃষ্ণ চন্দ্রাতপের ন্যায় প্রস্তরের অঙ্গে সমুজ্জ্বল বিন্দুগুলি ভ্রম উৎপাদন করে; ঐ তারকাবলী জলবিন্দু মাত্র। বিন্দু বিন্দু জল চুয়াইয়া প্রস্তরের ছাদে ঝুলিতে থাকে। যাত্রিগণের দীপালোকে উহাই নীলাকাশে বিচিত্র প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রতিভাত

আছে। চৈতন্যদেবকেও আমরা 'ন'দের চাঁদ', 'নবদ্বীপচন্দ্র' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা নবদ্বীপের করিয়া লইয়াছি, কিন্তু তাঁহার পিতৃকুল-মাতৃকুল সকলের নিবাস-স্থান শ্রীহট্টে—রঘুনাথের কর্ম্মক্ষেত্র নবদ্বীপে থাকায় সেই ভাবেই তাঁহাকে নবদ্বীপবাসী বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উপর শ্রীহট্টের দাবী আমরা কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

হয়" (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, ১০৫ পৃঃ)। এইরূপ কোন দৃশ্য দেখিয়াই হয়ত নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে আসামের রাজা বনমালের তাম্রশাসনের কবি শিব-বন্দনায় উক্ত দেবতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"যাঁহার শিরঃস্থিত গঙ্গাবারি রেচক বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া তারা প্রকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয়।" এই স্থানের অনতি দূরে "এক অপূর্ব্ব শিবলিঙ্গ, তাহাতে অগণ্য স্বর্ণরেণু ঝিকি-মিকি করিতেছে।" পার্শ্বে স্তম্ভাকার পাঁচটি পাথর। লোকে উহাদিগকে "পঞ্চপাণ্ডব" নাম দিয়াছে। স্থানান্তরে বটগাছের খোয়ার মত চারিটি সুবৃহৎ প্রস্তর নামিয়াছে, ইহাকে "চারি যুগের খাম্বা" বলে ; তৎপরে "স্বর্গদ্বার"। অন্য একটি গুহাতে কয়েকটি পাথরের ত্রিশূল—কোন প্রস্তর-যুগের সংস্কার বহন করিয়া আনিয়াছে ; ঐ স্থানের নাম "যোগনিদ্রা", গুহার দ্বারে বঙ্গাক্ষরে রাজা রাম-সিংহের নাম উৎকীর্ণ ; ইনি কোন জয়ন্তী-রাজ হইবেন, হয়ত তাঁহারই দ্বারা দুইটি প্রকাণ্ড প্রস্তরের হস্তী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু অপরাপর চিহ্ন অতি প্রাচীন, সুতরাং তীর্থটি বহু-পূর্ব্ব যুগের।

৩। গ্রীবা পীঠ—"ইহা মনুষ্য স্থাপিত নহে, দেবতা এখানে চিরকাল বর্ত্তমান আছেন" (ইতিবৃত্ত, ১১৫ পৃঃ)। শিব ৮ হাত দীর্ঘ। পার্শ্ববর্ত্তী দেবতা সমস্তই ভগ্ন ও কর্ত্তিত। পাণ্ডারা ইহাকে লুকাইয়া রাখিয়া পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া কালাপাহাড়ী দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইহা গোটাটিকর নামক স্থানে অবস্থিত।

৪। বালিশিরা পরগনায় বাণেশ্বর শিব। কথিত আছে নির্ম্মাই ও হর্ম্মাই নামক ত্রিপুরার দুই রাজকুমারী এই স্থানে ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে 'নির্ম্মাই শিব' স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থান সম্ভবতঃ বহু পূর্ব্ব হইতেই তীর্থস্বরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

৫। ঊনকোটি তীর্থ—কৈলাসহরের প্রান্ত হইতে কাছাড়ের পশ্চিমদিকের পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই ঊনকোটি তীর্থের সীমানা। ঊনকোটি পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। "শিরোভাগের মূর্ত্তিগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত, পার্শ্বের গুলি পর্ব্বত-গাত্রে ক্ষোদিত।" উপরকার মূর্ত্তিগুলি বহু প্রাচীন, এমন কি চিনিতে পারা যায় না। প্রত্যেক মূর্ত্তির কাণে "পান-পাশা"র ন্যায় বৃহৎ কুণ্ডল আছে। বহুসংখ্যক মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল, তাহা কালক্রমে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঊনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিমে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, মূর্ত্তি বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু একটি মহাদেব-মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য, দুইটি কর্ণ দুইটি কবাটের ন্যায়, দুইটি কুণ্ডল দুইখানি ঢালের ন্যায়। গোঁপের একদিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অপর দিক্ এক হাত কি দেড় হাত হইবে। হাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ। ত্রিপুররাজ বিজয়মাণিক্য (ষোড়শ শতাব্দীতে) ঊনকোটি তীর্থ দেখিতে গিয়াছিলেন। তখনও কালাপাহাড় এগুলি ভাঙ্গে নাই। এইরূপ বিশাল দেবমূর্ত্তি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে নির্ম্মিত হইত। আমরা ত্রিপুরা-প্রসঙ্গে একবার এই মূর্ত্তিসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছি।

এইসকল দেবতা ছাড়া চালাঘাট পরগনায় গৌরীপল্লীর নিকটে "সিদ্ধেশ্বর শিব", শ্রীহট্টের "হাটকেশ্বর", সায়েস্তাগঞ্জের নিকট খোয়াই নদীর তীরে "তুঙ্গেশ্বর" নামক বৃহদাকৃতি

শিবলিঙ্গ, পঞ্চখণ্ডের "বাসুদেব" প্রভৃতি প্রাচীন দেবতা শ্রীহট্ট জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের কোন কোন দেবতার অদ্ভুত অজানিত মূর্ত্তি; শুধুই শিলাখণ্ড রূপী শিব-দর্শনে মনে হয়, শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণের অধ্যুষিত ও পূর্ব্বভারতের অতি বিশিষ্ট স্থান ছিল, কারণ যেখানে শিব লিঙ্গও নহেন, বিগ্রহও নহেন,—শুধু দীর্ঘাকৃতি শৈল-খণ্ড,—তাহা অতি পুরাতন যুগের। পূর্ব্বভারতের বৈশিষ্ট্য, শৈবধর্ম্মের প্রাধান্ত—তাহা যেমন তাম্রপটে, তেমনই এদেশের তীর্থগুলিতেও পরিদৃষ্ট হয়। শৈব ও শাক্ত তীর্থ ই এখানকার প্রাচীনতম।

ত্রিপুরা ও কামরূপের রাজারাই অনেক সময় এই দেশ শাসন করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন কালের আর একটি রাজবংশের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। দুইখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে; এই দুইখানিই শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী ভাটেরা গ্রামের "হোমের টিলা" নামক এক ক্ষুদ্র শৈল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহার কতকটা কালক্রমে বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া যাওয়াতে—ঐ দানপত্র-দ্বয়ের সময় সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করিয়াছিলেন, প্রথমখানির তারিখ ১২৪৫ খৃঃ অব্দ। এদিকে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী ইহার সময় বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন। এমন কি অচ্যুতবাবু ঐ তাম্রফলকখানি খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমার মনে হয় উভয় পক্ষের মতেই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অনবধানতা আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র "কেশব দেব গোবিন্দের ন্যায়" এই লেখাটা দেখিয়া উক্ত রাজাকে সাহজালাল কর্ত্তৃক পরাজিত রাজা গৌড়গোবিন্দের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন,—"গোবিন্দের ন্যায়" বলিলেই গোবিন্দ হয় না। বিশেষ সাহজালাল জয়ী হওয়ার পর হিন্দুরাজ্য বিনষ্ট হয়, দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাহা হইলে কেশব দেবের পর ঈশান-দেব আবার সার্ব্বভৌম রাজা হইবেন কিরূপে? এইরূপ বহু বিসদৃশ কথা মিত্র মহাশয়ের মন্তব্য হইতে বাহির করা যায়। কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ এই যে তাম্রপটের লিপি কখনই ত্রয়োদশ শতাব্দীর নহে, স্পষ্টই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী। অপর দিকে অচ্যুতবাবু যে ঐ লিপি খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন, তাহা একবারে অগ্রাহ্য। মৌর্য্য, গুপ্ত, পাল প্রভৃতি যুগের বহুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কামরূপের ভাস্করবর্ম্মা হইতে বনমাল ও তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্মপালের লিপিও পণ্ডিতগণের সম্যক্ অধিগম্য। এই সকল লিপির সঙ্গে তুলনা করিলে কেশব-তাম্রপটের লিপি নবম কি দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। এই লিপি অনেকটা হর্জ্জরবর্ম্মা এবং বনমালের লিপির ন্যায় (মূল লিপি ১৮৮০ আগষ্ট মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে দ্রষ্টব্য)। কেশব দেবের সুদৃঢ় প্রস্তরনির্ম্মিত বিষ্ণুমন্দির কোথায় গেল? সুতরাং তাহা বহু বহু প্রাচীন এবং কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অচ্যুতবাবুর এই যুক্তির উত্তর অতি সহজ। আর্য্যাবর্ত্তের যত কিছু পাষাণ ও লৌহ নির্ম্মিত কীর্ত্তিস্তম্ভ ও মন্দির, তাহার প্রায় সমস্তই গত সহস্র বৎসরের রাষ্ট্র-বিপ্লবে অধিকাংশ স্থলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার উপর কালের হাত অবশ্য কিছু আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের

প্রাচীন ইতিহাস।

অনুমানের আর একটি বিরুদ্ধ যুক্তি এই যে একাদশ, দ্বাদশ, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্রপট-গুলির শিববন্দনার বৈশিষ্ট্য, তাহারা যত প্রাচীন, ততই যৌন-লীলার কথা তাহাতে কম; নবম শতাব্দীর পর হইতে ঐ সকল বন্দনায় গৌরীর সঙ্গে লীলাখেলার বর্ণনা বেশী। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অর্থাৎ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনে এই লীলা চরমে উঠিয়াছে। সন্নিকটবর্ত্তী কামরূপ-শাসনাবলীতে দেখা যায়,—৭ম শতাব্দীর ভাস্করবর্ম্মার লিপিতে গৌরী কিংবা অন্য দেবীর রূপের কথার লেশ নাই, নবম শতাব্দীতে হর্জ্জরদেবের তাম্রশাসনও উক্তরূপ বর্ণনা-বিরহিত, কিন্তু পরবর্ত্তী বনমালের তাম্রশাসনে রমণীরা আসিয়া পড়িয়াছেন—লৌহিত্য নদের বন্দনায় বলা হইয়াছে, ঐ নদের জল—ক্রীড়ানিরত সুরাঙ্গনাদের কেশ ও হস্ত হইতে ভ্রষ্ট সুরতরুর কুসুমে আরক্ত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীর ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়—গৌরী পাশায় জিতিয়াছেন এবং শিবকে বলিতেছেন—'তুমি হারিয়াছ, কিন্তু পণের সকল দাবী আমি ছাড়িয়া দিতেছি, কেবল গঙ্গাকে আমার কিঙ্করী করিয়া দাও।' দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মপালের তাম্রপটে অর্দ্ধনারীশ্বরের বন্দনায় বলা হইয়াছে শিবের একদিকে ভস্ম ও অপর দিকে গৌরীর উত্তুঙ্গ স্তনমণ্ডলের কুঙ্কুম। যদি এই তাম্রপট ত্রয়োদশ শতাব্দীর হইত, তবে অনেকটা লক্ষ্মণসেনের শাসনের ন্যায় তাহাতে "কলিঙ্গাঙ্গনানাং"এর মত কোমল যৌনলীলা-সূচক পদ থাকিত।

কেশবের তাম্রশাসন।

কেশবের তাম্রপটের সঙ্গে বরং ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, ইহাতে অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করার কথা আছে, ইহাতেও এইরূপ দানের প্রশংসা ও ভূমি-অপহারকদের উপর অভিসম্পাত আছে। কামরূপের পরবর্ত্তী সময়ের তাম্রপটগুলিতে তাহা নাই। কেশবদেব ও তৎপুত্র ঈশানদেবের বংশাবলী এইরূপ:—১। নবগীর্ব্বাণ, ২। গোকুলদেব, ৩। নারায়ণদেব, ৪। কেশবদেব, ৫। ঐর পুত্র, ঈশানদেব। ইহারা শৈব হইলেও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তৎপ্রীত্যর্থে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাদের নামেও বিষ্ণুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন,—ইহাদের অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ও রথ ছিল। ঈশানদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন "বৈদ্যকুল-প্রদীপ বনমালী কর" এবং সেনাপতি ছিলেন সমর-প্রবীর বীরদত্ত। কেশবের তাম্রপটে যে হট্টপাটকে ঘটেশ্বরের উল্লেখ আছে—তাহা বোধ হয় করিমগঞ্জের সুর্ম্মানদীর বামতীরে জয়ন্তীপুরের হাটকেশ্বর হইতে অভিন্ন (আসাম জেলা গেজেটিয়ার, ৩ অধ্যায়, ৮৭ পৃঃ)। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, "গৌড়গোবিন্দ এই হাটকেশ্বর শিবপূজা করিতেন। মিনারের টিলা বা নিকটের অন্য কোন টিলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিলেন। হজরত সাহজালালের সময় যখন গ্রীবা-পীঠ সংগোপন করা হয়, তখন রাজপূজিত হাটকেশ্বর জঙ্গলে নীত হন। বহুকাল ঐ লিঙ্গ সেইখানে ছিলেন, তথা হইতে চুড়াখাইড় পরগনার সেনগ্রামে নীত হন।" (ইতিবৃত্ত, ১ম ভাগ, ৯ম অধ্যায়, ১২৯ পৃষ্ঠা।) তাম্রপটে এই রাজাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিত আছে, ইহারা যে গৌড়গোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষ নহেন, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? আমরা তাম্রপটের জাতি সম্বন্ধে কোন কথার উপর বেশী আস্থা

স্থাপন করিতে পারি না। পরাক্রান্ত হইয়া যাঁহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন, হীন অবস্থাতে পড়িয়া তাঁহাদের বংশধরগণ যে-কোন জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা সাভারের শিলালিপি হইতে জানিতে পারিয়াছি।

কথিত আছে, ত্রিপুরেশ্বর ছেং ফাহাগ (স্বধর্ম্মপা বা সুধর্ম্মপা) কৈলাগড়ে রাজধানীতে একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাহা নিধিপতি নামক এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে নির্ব্বাহিত হয়। এই যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীহট্ট-জেলায় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন হয়। নিধিপতি দক্ষিণাস্বরূপ রাজার নিকট অনেক ভূমি দানপ্রাপ্ত হন (৬০৪ ত্রি= ১১৯৪ খৃঃ)। কিন্তু ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্ব-ভারতে বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন, ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি।

মুসলমান অধিকারের প্রাক্কালে শ্রীহট্ট রাজ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।

১। গৌড়—বর্ত্তমান শ্রীহট্টের উত্তরাংশ এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণের কতকাংশ।

২। লাউড়—গৌড়ের পশ্চিমাংশ,—বর্ত্তমান হবিগঞ্জের কতকাংশ ও প্রায় সমুদয় সুনামগঞ্জ।

৩। জয়ন্তীয়া—শ্রীহট্টের উত্তর-পূর্ব্বাংশ,—সুরমা নদীর সীমা পর্য্যন্ত, ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে ত্রিপুরা। ইহা ছাড়া সমগ্র জয়ন্তীয়া পাহাড় ইহার অন্তর্গত।

এই তিনটি বৃহৎ ভাগ ছাড়া তরপ, ইটা ও প্রতাপগড় মুসলমান বিজয়ের পর গৌড়ের অন্তর্গত হয়।

মুসলমানেরা গৌড়গোবিন্দের হস্ত হইতে শ্রীহট্টের অধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। এই গৌড়গোবিন্দ কে তাহা জানা যায় নাই। নানা গল্পে জড়িত হইয়া এই রাজার ইতিহাস অতীত শ্রীহট্টের একটা প্রহেলিকা হইয়া আছে। কথিত আছে, তিনি নির্ব্বাসিত কোন

গৌড়গোবিন্দ কে ?

ত্রিপুর-রাজ-কন্যার গর্ভে এবং সমুদ্রের ঔরসে জাত। প্রাচীন উপাখ্যানে সমুদ্র একাধিক রাজার জনয়িতা রূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই আখ্যানের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে রাজকুমারীকে কোন অভিযোগে অভিযুক্তা, কলঙ্কিতা ও গর্ভবতী ত্রিপুর রাজকন্যা বলিয়া ধরা যায়। দ্বিতীয় প্রবাদ এই তিনি গৌড় হইতে আসিয়া শ্রীহট্ট দখল করিয়াছিলেন বলিয়া গৌড়গোবিন্দ নামে পরিচিত; সুহেল-ই-এমন নামক পারস্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই প্রবাদটি পাওয়া যায়। তৃতীয় অনুমান, তিনি হয়ত বা সেই নরকবংশীয়দেরই কেহ হইবেন। যে বংশে কেশব ও ঈশান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি হাটকেশ্বরের মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীহট্টের আগন্তুক এই অনুমান যেন একটু প্রবল দৃষ্ট হয়, যেহেতু সে দেশের লোকেরা তাঁহার পূর্ব্ব-ইতিহাসের কোন সন্ধানই রাখেন না। সে দেশের লোক হইলে অন্ততঃ কোন একটা প্রবাদ থাকিত। এদিকে শ্রীহট্টের ৬।৭ মাইল দূরে "পাতার" নামক এক জাতি আছে—তাহারা সহরে কয়লা, কাঠ, পাতা ইত্যাদি বিক্রয় করে, তাহারা আপনাদিগকে "গুরুগোবিন্দী" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। মুসলমানেরা

রাজার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া কি তাঁহার পরিবার ও স্বগণবর্গের এই দুর্গতি করিয়াছিলেন? যাহা হউক, আঁধারে আর বেশী ঢিল ছুড়িলেও লক্ষ্য ভেদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বল্লাল সেনের কৌলিন্যের যাঁহারা প্রতিবাদী ছিলেন এবং 'পদ্মিনী' সংক্রান্ত ব্যাপারে যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন বহু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোক বঙ্গদেশ হইতে পলাইয়া সীমান্ত-প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শ্রীহট্টে বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দুরাজাদের আধিপত্য ছিল, এজন্য এই নিরাপদ আশ্রয়ে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার শ্রীহট্ট-বাসী হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহট্ট মুসলমানদের অধিকৃত হয়—তখন বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ;—এজন্য আমরা দেখিতে পাই, দেশের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীহট্টের অধিবাসী। তখনও শ্রীহট্ট বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে সুরক্ষিত। ইহার পরে শ্রীহট্টে রাষ্ট্রবিপ্লব ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখিতে পাই।* এদিকে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের টোল তখন খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ দেশত্যাগী হইয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা হিন্দু-নৃপতিগণের উৎসাহে সংস্কৃত শাস্ত্রে ইতিপূর্ব্বেই বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সহজেই নবদ্বীপের টোলে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে রঘুনাথ শিরোমণি ও অদ্বৈত আচার্য্যের নাম নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর পুরোভাগে। শ্রীহট্ট প্রভৃতি হিন্দুরাজগণ-শাসিত দেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা এত বেশী হইয়াছিল যে দলিলপত্রের ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও বহু সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ ছিল। আরাঙ্গেবের শাসনকালে, বঙ্গের সুবেদার সায়েস্তা খাঁর সময় এবং শ্রীহট্টের ফৌজদার আবদুল রহেম খাঁর সরকারে নিম্নলিখিত দলিলখানি সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহা ২৪৭ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, সুতরাং সে সময়েও যে আদালতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধন্য ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। দলিল—"শ্রীনকল পাট্টা আজকরার মাহে ২৫ আষাঢ় সন ১০৯২ সাল স্বস্তি দ্বিনবত্যুত্তরসহস্রতমাব্দে আষাঢ়স্য পঞ্চবিংশতিদিবসে শ্রীশ্রীমতাং সুলতান আরঙ্গ সাহ পাদপদ্মানামভ্যদায়িনি রাজ্যে বঙ্গানামধীশ্বরেষু শ্রীযুক্ত সাইস্ত খাঁন মহোগ্রপ্রতাপেষু শ্রীহট্টাধিকারিণী শ্রীযুত আবদুল রহেম খান মহাশয় শ্রীযুক্ত হাজি সাহারাজকস্য পঞ্চখণ্ডাধিকারস্থে বিলসিত সাহস্রিয় পঞ্চখণ্ড চত্তরকান্তর্গত খাসাপাটকস্থ শ্রীসুদাম দাস শ্রীগোবিন্দ দাস শকাসাৎ সপ্ত মুদ্রাং গৃহীত্বা শ্রীমধুসূদন পাল শ্রীকৃষ্ণবল্লভ পালাভ্যাং দক্ষিণে শ্রীবংসিকায়ার্ব্বাটিকা পশ্চিমে পূর্ব্বে-রাজমার্গ চ উত্তরে পুষ্করণ্যান্তরপারং পূর্ব্বে ঈশান কোণাবধিক প্রমাণেন গোলক আর ফলাইর বাড়ীর গোলে চ জুরিমার ত্রিসীমা ইথং চতুঃ সীমাবচ্ছিন্না শ্রীমনিপত্তন বাটিকা মৌজে খেসরা সম্বন্ধিনী বিক্রীতেতি তন্মূল্যং ৭ শত তঙ্কা দ্রব্য একবাড়ী চতুঃ সীমান সন—তারিখ—সদর।" (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ৪র্থ অঃ, পৃঃ ৯২) আমরা কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি

* শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল। ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক পড়িল। উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া। নানা দেশে সর্ব্ব লোক গেল পলাইয়া।" চৈতন্য-মঙ্গল, জয়ানন্দ।

('কোচবিহার'), যে উক্ত রাজার নফর চাকরেরা পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। হিন্দুরাজত্বে সংস্কৃতের চর্চ্চা যে অত্যধিক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজাধিকারে মাদ্রাজি আয়া ও চাকরেরাও ইংরেজীতে কথা কহিয়া থাকে।

মহারাজ গৌড়গোবিন্দ যাদু-বিদ্যায় কৃতী ছিলেন, বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাজা বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি "শব্দভেদী" বাণ সন্ধান করিতে জানিতেন। এই শব্দভেদী বাণ যে কিরূপ এবং তাহাতে হিন্দুরা যে কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত ১৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই রাজার সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবে আর একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহা দত্ত-বংশের বংশাবলী হইতে গৃহীত হইল। একদা রাজার উদরে সাংঘাতিক বেদনা অনুভূত হয়,—দেশীয় ভিষকেরা তাঁহার কোন উপকার করিতে পারেন নাই। তখন বঙ্গদেশের ভিষক-কুল-চূড়ামণি চক্রদত্ত জীবিত ছিলেন, তাঁহার যশ ভারতবিশ্রুত। রাজা তাঁহার জন্ত দূত পাঠাইয়া দেন, কিন্তু চক্রদত্ত তখন অতিবৃদ্ধ—তিনি গঙ্গাতীর ছাড়িয়া শ্রীহট্টে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সংবাদে রাজ্ঞী অত্যন্ত কাতরা হইয়া তাঁহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া সেই বহুমূল্য পেটিকাটি সহ পুনরায় দূতকে ভিষকবরের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, "আমি আপনার কন্তা-স্বরূপা, আমার স্বামি-বিয়োগ হইলে এ সকল গহনা দিয়া কি করিব? আপনিই এগুলি রাখিবেন, নতুবা জলে বিসর্জ্জন দিবেন—আর বিধবা হইলে আমি সহমৃতা হইব, সুতরাং আপনি নারী-বধের জন্ত দায়ী হইবেন, কারণ হয়ত আপনার দ্বারা রাজার ও আপনার দুঃখিনী কন্তার জীবন রক্ষা হইতে পারে।" ধর্ম্মভীরু চক্রপাণি এই সকাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহার সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেন। রাজা তাঁহাকে বিশাল ভূমিখণ্ড প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি গঙ্গাতীর ছাড়িয়া কিছুতেই এদেশে থাকিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার ভ্রাতা ভানুদত্তকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহারাজ গৌড়গোবিন্দ নিরাময় হইয়াও জীবনে আর সুখী হইতে পারিলেন না। গো-হত্যার অপরাধে তিনি শ্রীহট্টে টুলটিকর-বাসী বুরহান উদ্দীন এবং কাজি নুরুদ্দীনকে ভীষণ ভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন; এই দণ্ডের সঙ্গে অপরাপর স্থানের হিন্দু রাজাদের গোহত্যাপরাধে মুসলমান-নিগ্রহের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া এখন পর্য্যন্তও গোহত্যা লইয়া চলিতেছে, সুরতাং একইরূপ ব্যাপার যে একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা প্রমাণাভাবে ঠিক করিয়া বলা যায় না। এইরূপে দণ্ডিত ব্যক্তিদ্বয় বঙ্গেশ্বরের শরণাপন্ন হন। আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ স্বীয় ভাগিনেয় সেকেন্দারকে গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যাদুবিদ্যা-প্রভাবে সেকেন্দর দুইবারই হিন্দু-রাজার নিকট পরাভূত হন। তোয়ারিখে জালালি নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম যুদ্ধে হারিয়া গিয়া সেকেন্দর দ্বিতীয়বার খুব সমারোহ করিয়া বিশাল সৈন্ত সঙ্গে গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে

মুসলমান-বিজয়।

অভিযান করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকে সেই অভিযান সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; শেষ পঙ্‌ক্তি এইরূপ "হইল সাবেকী দশা সিকন্দর সাহার।" ইহার পরে তিনি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে বঙ্গেশ্বর শ্রীহট্টের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ গৌড়-গোবিন্দের সঙ্গে তাঁহার সন্ধি হইয়াছিল, অদিনা মসজিদ এই সন্ধির ফলেই হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এই সময়ে আর একজন মুসলমান নেতা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন, ইনি বিখ্যাত সাধু সাহ জালাল। ইনি হজরত মোহাম্মদের জ্ঞাতির বংশধর এবং ইহার মাতাও সৈয়দবংশীয়া ছিলেন এবং পিতা মাহমুদ কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সাহ জালালের জন্মস্থান আরবের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ হেজাজ। সাহ জালাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইনি অল্প বয়সেই সাধনার পথে এতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, একটা ব্যাঘ্রকে তদীয় আশ্রম-পালিত হরিণ আক্রমণ করিতে দেখিয়া সেই ব্যাঘ্রের গণ্ডে এরূপ ভীষণ চপেটাঘাত করিয়াছিলেন যে, ব্যাঘ্র দন্তরাজি বিকশিত করিয়া তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সাহ জালাল ভারতবর্ষে আসিবার পর তাঁহার তপঃপ্রভাবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, তিনি বিষ খাইয়া বিষ হজম করিয়াছিলেন এবং চর্ম্ম-পাদুকা পায়ে নদ-নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া জন-শ্রুতি আছে। তোয়ারিখে জালালিতে এইরূপ অনেক উপাখ্যান বর্ণিত আছে। দিল্লীতে আসার পর হতভাগ্য হিন্দু রাজার দ্বারা দণ্ডিত বুরহান উদ্দিন (যাহার এক হস্ত গৌড়-গোবিন্দ কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়াছিল) এবং কাজি নুরুদ্দিন তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। সাহ জালাল ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রচারার্থ শ্রীহট্টের অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক তাঁহার দলে ভিড়িয়া গেল। তিনি বার জন সঙ্গী সহ রওনা হইয়াছিলেন, কিছু দূর যাইতে যাইতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬০ জন হইল। এ দিকে কাজি নুরুদ্দিনের অধীনেও বিস্তর সৈন্য ছিল। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অলৌকিক সাধনা-বলের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় অনুচরেরা সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করিল। শ্রীহট্টের সীমায় অবস্থিত চৌকি (দিনারপুর পরগনায়) নামক স্থানে আসিলে গৌড়-গোবিন্দ এই অভিযানের সংবাদ পাইলেন। সাহ জালাল ব্রহ্মপুত্র উত্তীর্ণ না হইতে পারেন, এজন্য হিন্দু-রাজা সেই নদে সমস্ত তরীর যাতায়াত নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমান সৈন্য কৌশলক্রমে সেই নদ অতিক্রম করিল; তারপর তাহারা বরাক নদীর তীরবর্ত্তী বাহাদুরপুরে পৌছিলে—সেখানেও গৌড়-গোবিন্দ সমস্ত নৌকার যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায়ও তিনি ব্যর্থ হইলেন। সাধুর কেরামতের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজার মুসলমানের প্রতি অত্যাচারে এক শ্রেণীর লোক তাঁহার প্রতি বিমুখ ছিল, অপরদিকে হজরতের বংশোদ্ভব সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার উপর চারিদিকে এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গৌড়-গোবিন্দ নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করিয়া পেঁচাগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে, রাজার যে গগনস্পর্শী প্রস্তর-মন্দির ছিল, তাহা সাহ জালাল

ও তাঁহার অনুচর-বর্গের আজানের শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেশব দেবের যে বিখ্যাত মন্দিরের কথা আমরা তাম্রপটে উল্লিখিত দেখিতে পাই, এই মন্দির কি তাহাই? যদি তাহাই হয়, তবে তাহা কোথায় গেল বলিয়া কাহারো আঁধারে হাতড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। গৌড়-গোবিন্দ স্বয়ং অনেক কেরামৎ জানিতেন, কিন্তু সাহ জালালের নিকট কোনটিই টি'কিল না। এইভাবে বিনা যুদ্ধে যেরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ অধিকৃত হইয়াছিল, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সেইরূপ বিনা রক্ত-পাতে শ্রীহট্ট অধিকৃত হইল। হাণ্টার সাহেব বলেন, ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট সাহ জালাল কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল; সাহ জালালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ পীর নেজামুদ্দিনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নেজামুদ্দিন তাঁহাকে দুইটি পায়রা উপহার দেন। সাহ জালাল তাহাদিগকে শ্রীহট্টে লইয়া আসেন, সেই পায়রার বংশধরেরা 'জালালী পায়রা' নামে পরিচিত, ইহারা অবধ্য।

শ্রীহট্টের স্বাধীনতা-লোপ, ১৩৮৪ খৃঃ।

সাহ জালালের প্রভাবে মুসলমান ধর্ম্ম শ্রীহট্টে খুব বিস্তার পাইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল, তিনি স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না, চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া পথে চলিতেন। তাঁহার দরগায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সিন্নি দিয়া থাকেন। ঐ দরগায় কয়েকটি শিলা-লেখ আছে; একটিতে লিখিত আছে, সামসুদ্দীন ইউসফের সময়ে (১৪৭৪-১৪৮১) উহা নির্ম্মিত, পরবর্ত্তী বাদসাহেরা উহার সংস্কার ও উন্নতি করিয়াছিলেন। একটিতে ৯১১ হিজরী (১৫০১ খৃঃ), আর একটিতে ১০৮৮ হিজরীর (১৬৭১ খৃঃ) অঙ্ক আছে। ঐ দরগাতে সাহ জালাল আনীত একটি উট পাখীর ডিম, তাঁহার "জুল ফুকার" নামক তরবারি, মৃগচর্ম্মের আসন (মোসল্লা) এবং কাষ্ঠ পাদুকা আছে। তদীয় দুইটী তামার পেয়ালাও তথায় রক্ষিত আছে, উহাদের উপরে আরবী শ্লোক উৎকীর্ণ। ঐ দরগায় আরাঙ্গেব একটি ডেগ উপহার দিয়াছিলেন,—উহা তাম্রনির্ম্মিত, উহাতে ১০।১২ মণ চাউলের ভাত রান্না হইতে পারে। তাহার উপর যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা ১১১৫ হিজরীর (১৭০৭ খৃঃ) অঙ্ক বহন করে। সাহ জালালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসীরা কখনও কখনও তাঁহাদের দেশকে "তিনশ ষাটে আউলিয়ার মুলুক" বলিয়া থাকেন। "শ্রীহট্টে সাহ জালাল", "আনোয়ার আলিয়া" এবং "শ্রীহট্ট নূর" প্রভৃতি পুস্তকে এই আউলিয়াদের নাম ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অচ্যুতবাবু তাঁহার ইতিবৃত্তে অনেকেরই নাম-ধাম দিয়াছেন।

সাহ জালালের দরগা।

সাহ জালালের মৃত্যুর পর (অনুমান ১৪১৪ খৃঃ) নবাব ইস্পেন্দিয়ার শ্রীহট্ট শাসন করেন; তৎপরে রুকন খাঁ, গহর খাঁ, মোহম্মদ খাঁ, সরওয়ার খাঁ, মীর খাঁ, ইউসুফ খাঁ, খোয়াজ ওসমান, লোদী খাঁ, জাহান খাঁ ক্রমান্বয়ে শ্রীহট্ট শাসন করেন। ইহাদের উপাধি ছিল 'কানুনগো', কিন্তু সমস্ত রাজস্ব ও শাসনভার ইহাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। ইহাদের প্রত্যেকেরই শাসনকাল অত্যল্প ছিল। বাদসাহেরা কিছুকালের জন্য এক একজনকে কানুনগোর পদ দিয়া তাঁহাদের নব-প্রীতির পাত্রদিগকে সেই পদের

শ্রীহট্টের নবাবগণ।

উত্তরাধিকারী করিয়া মনস্তুষ্টি জ্ঞাপন করিতেন। ১৪৯৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৫৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে শ্রীহট্টের শাসনকার্য্য চলিয়াছিল। সর্ব্বানন্দ নামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহন করিয়া সরওয়ার খাঁ নাম গ্রহণ করেন, পূর্ব্বোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে তিনিও এই কানুনগোদের একজন। সরওয়ার খাঁর পুত্র মীর খাঁ, তৎপুত্র ইউসফ খাঁ (১৫২৬ খৃঃ)—এক বংশের এই তিনজন কানুনগো-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইউসুফ খাঁর সময়ে আনন্দনারায়ণ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের দেওয়ান ছিলেন। এই আনন্দ-নারায়ণের সাহায্যে পরবর্ত্তী কানুনগো খোয়াজ ওসমান্ ইটার রাজা সুবিদনারায়ণকে পরাজিত করিয়া তরপ ও ইটা অধিকার করেন। জাহান খাঁ কানুনগো অল্প-বয়স্ক থাকাতে রাজেন্দ্র, বসুদাস, রুদ্রদাস ও তরপের জমিদার সুবিদারাম প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করিতেন।

কিন্তু আকবর শাসন-বিভাগ ও রাজস্ব-বিভাগ পৃথক্ করিলেন; তদনুসারে কানুনগোগণ তাঁহাদের ক্ষমতা হারাইলেন। তাঁহারা দেওয়ান হইয়া রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তা হইলেন, এবং

আমিল।

শাসন-কর্ত্তা হইলেন "আমিল" নামে ফৌজদারগণ। আকবরের সময়ে শ্রীহট্টের রাজস্ব ১,৬৭,০৪০৲ টাকা অবধারিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের 'আমিল'গণের শিলমোহর হইতে ৪০ জনের নাম সংগৃহীত হইয়াছে। মোট আমিল বোধ হয় ৬০ জন ছিলেন, তন্মধ্যে অচ্যুতবাবুর পুস্তকে ৪৩ জনের নাম-ধামের তালিকা আছে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ তাঁহার ভ্রাতা চিলা রায়ের সাহায্যে একজন আমিলকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধস্থলেই আমিল নিহত ও তাঁহার ভ্রাতা বন্দী হন। নরনারায়ণ শ্রীহট্টের ২০০ ঘোটক, ১০০ হস্তী, তিন লক্ষ টাকা, দশ হাজার মোহর কর-স্বরূপ পাইবেন—এই সর্ত্তে উক্ত ভ্রাতা মুক্তি লাভ করেন।

ইহার পরবর্ত্তী শ্রীহট্ট-শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁর সহিত ত্রিপুর-রাজ অমরমাণিক্যের যুদ্ধের কথা 'ত্রিপুর-রাজ্য' অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ফতে খাঁ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ফতে খাঁর পরে মোহাম্মদ জামন তুয়লদার, সৈয়দ ইব্রাহিম (১৬৫৭ খৃঃ), নবাব লুৎফউল্লা খাঁ বাহাদুর (১৬৬৩ খৃঃ), নবাব জান মোহাম্মদ (১৬৬৭ খৃঃ), নবাব ফরহাদ খাঁ (১৬৭০ খৃঃ), নবাব মহাফতা খাঁ, নবাব নুরউল্লা খাঁ (১৬৭৮ খৃঃ) নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলি খাঁ, কাইমজঙ্গ (১৬৮০ খৃঃ), নবাব আব্দ্ রহেম খাঁ (১৬৮০ খৃঃ), নবাব সাদক বাহাদুর (১৬৮৬ খৃঃ), নবাব কর্ত্তলব খাঁ (১৬৯৮ খৃঃ), নবাব আহমদ মজিদ (১৬৯৯ খৃঃ), নবাব কারগুজার খাঁ (১৭০৩ খৃঃ)—এই কয়েকজন আমিলের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকলেরই ভূমি-দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ইঁহারা নির্ব্বিচারে যোগ্যতা-অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। আরাঙ্গেবের পরে নবাব

নবাব হরেকৃষ্ণ—১৭০৯-১৭১১ খৃঃ।

তানিব আলি খাঁ ও নবাব শুকুরউল্লা খাঁ আমিল হইয়াছিলেন; শুকুরউল্লা খাঁর পরে একজন হিন্দুকে এই উচ্চপদ দেওয়া হয়, ইঁহার নাম নবাব হরেকৃষ্ণ, উপাধি মনহর-উল-মুলুক বাহাদুর। যে বংশে সর্ব্বানন্দ জন্মগ্রহন করিয়া মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণের পর সরেওয়ার খাঁ নামে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন, সেই বংশে

কবিবল্লভ রায় নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। কবিবল্লভের পুত্র শ্যামদাসের দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে হরেকৃষ্ণই নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুরসিদাবাদের নবাব শুকুরুল্লার উপর বিরক্ত হইয়া হরেকৃষ্ণকে এই পদ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বৎসর না যাইতে যাইতেই শুকুরুল্লা চক্রান্ত করিয়া গুপ্তঘাতক দ্বারা পূজায় সমাসীন হরেকৃষ্ণকে দেবমন্দিরের মধ্যেই হত্যা করান। তাঁহার সেনাপতি রাধানাথ এই শোক অসহ্য হওয়াতে আত্মঘাতী হন। শুকুরুল্লা হরেকৃষ্ণের ছিন্নমুণ্ড একটা উচ্চ বংশদণ্ডের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে এক পাগল ফকির চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "আরে বাঃ জী লালা হরকীষণ! জীতে সবকো সেরা, মরণে ভি সবকো উপরিওয়ালা!" হরেকৃষ্ণ দুইটি বৎসরের মধ্যে বহু দান করিয়া গিয়াছেন। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, "শ্রীহট্ট কালেক্টরীতে নবাবী আমলের যে সকল দানপত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকই "নবাব হরকিষণ্ প্রদত্ত।" সম্রাট্ মোহাম্মদ সাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত হরেকৃষ্ণ শ্রীহট্ট শাসন করিয়াছিলেন। নবাব হরেকৃষ্ণের পর শুকুরুল্লা পুনরায় শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা হন, তৎপরে নবাব সমসের খাঁ বাহাদুর (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে চাক্‌লে সিলটে ১৪টি পরগনা ছিল, এবং ইহার রাজস্ব ছিল—৫,৩১,৪৫৫৲ টাকা। সমসের খাঁ যুদ্ধে নিহত হন, তৎপর নবাব বহরম খাঁ (১৭৪৪ খৃঃ), নবাব আলাকুলি বেগ (১৭৪৮ খৃঃ), নবাব তালিব আলি, নবাব নজীব আলি (১৭৫১ খৃঃ), নবাব সাহ মতজঙ্গ নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ (১৭৫৭ খৃঃ), নবাব মোহাম্মদ আলি খাঁ (২য়), নবাব এক্রাম আলি খাঁ (১৭৬৪ খৃঃ) ও নবাব আজাদ খাঁ ক্রমান্বয়ে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। মোগল সম্রাট্‌গণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে স্থির হইয়া গদীতে বসিতে দেন নাই, পাছে তাঁহারা প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়া বিদ্রোহ করেন এই ভয়ে। পাঠানদের—এক মুহূর্ত্তে কোরাণ স্পর্শ করিয়া সন্ধি করা, তৎপরমুহূর্ত্তে সেই সন্ধি ভাঙ্গিয়া বিদ্রোহ করা—এই বিভ্রাটে মোগলেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ ঘন ঘন শাসনকর্ত্তার নিয়োগ ও পরিবর্ত্তনের অন্য এক কারণও ছিল। যাঁহারা সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহারাই প্রিয় হইতেন এবং তাঁহাদের উপর সম্রাট্‌দের সন্তোষ-জ্ঞাপনের একমাত্র উপায় ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃত্ব-দান। গুপ্ত অভিসন্ধিতে লিপ্ত প্রবল অমাত্যকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মতলবেও তাঁহারা তাঁহাদিগকে দূরে শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইতেন।

ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়।

ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়,—বর্ত্তমান শ্রীহট্টের এই তিন অংশ একসময়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের * সঙ্গে ওসমান খাঁর যুদ্ধের কথা ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীরের সময়ে খোয়াজ ওসমান তাঁহাদের আদেশে অবাধ্য ব্রাহ্মণ রাজা

* আমরা পল্লীগীতিকায় পুনঃ পুনঃ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া মোগল সম্রাট্‌দিগকে বিদ্রোহি-দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইবার কাহিনী পাঠ করিয়াছি। সুবিদনারায়ণের পুত্র মুসলমানী নামে

সুবিদনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন শের সাহের সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সুবিদনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা ভানুমতী অতিশয় রূপসী ছিলেন। খোয়াজ ওসমানের উপর তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম ছিল। সুবিদনারায়ণ সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী কমলা সহমৃতা হন এবং ভানুমতী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন। সুবিদনারায়ণের চার পুত্র—জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, ইজি খাঁ ও ঈশা খাঁ নাম গ্রহণপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি এই ব্রাহ্মণ রাজার সম্পত্তি মুসলমান-অধিকৃত হইয়াছিল। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, "রাজা সুবিদনারায়ণের বংশীয়গণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু রীতিনীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলেন।"

নবাব রাধারাম।

প্রতাপগড় এক সময়ে ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সুতরাং ইহার ইতিহাস সেই দেশের ইতিবৃত্তের অন্তর্গত। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীহট্টের দত্তবংশোদ্ভূত রাধারমণ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের বংশীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তার হস্ত হইতে কৌশলক্রমে অনেক সম্পত্তি অধিকার করিয়া 'নবাব' উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে, একটা মাদুরে তাঁহার দুই একজন কর্ম্মচারী শুইয়া ছিল, তাহাদের পা মাদুর হইতে বাহির হইয়াছিল, এই জন্য তিনি সেই মাদুর-নির্ম্মাতাকে ছোট মাদুর প্রস্তুত করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহার পা কাটিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একদিন নৌকাযোগে যাইতেছিলেন, নৌকার মাঝি একটা বড় মৎস্য বঁড়্শি দিয়া ধরিয়াছিল,—তাঁহার বিনা-অনুমতিতে সে ঐরূপ করিল, এজন্য তিনি সেই মাঝিকে জলে ডুবাইয়া মৎস্যের মত গলায় বঁড়্শি বিধাইয়া হত্যা করেন। কিন্তু এসকল নিতান্তই উপগল্পের মত শোনায়।

রাধারাম তাঁহার সরল-প্রাণ বন্ধু জমিদার কানুরামকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মিথ্যা সন্দেহে কালীর নিকট বলি দিতে চাহিয়াছিলেন। কানুরামের ভৃত্য এই অভিসন্ধি টের পাইয়া তাঁহার প্রভুকে যুগীর প্রস্তুত একটা গিলাপের মধ্যে ঢুকাইয়া গভীর রাত্রে কাঁধে করিয়া ভীষণ বন্যজন্তুসঙ্কুল ছুখালিয়া পাহাড়ের জঙ্গল দিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার যোগ্য। নবাব রাধারাম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া ছদ্মবেশে পলায়নপর হইলেন। তিনি পথে আত্মহত্যা করেন এবং তৎপুত্র কুমার জয়মঙ্গল ডোমের ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ধৃত হইয়া বন্দী হন। এখনও কৃষকগণ লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে গাহিয়া থাকে—"কান্দেরে চরগোলার লোক দেশে দেশান্তর। জয়মঙ্গল আসিবে যবে চরগোলার নগর। ডোম চাঁড়াল মিলিয়ারে বানাইয়া দিমু ঘর।"

পরিচিত কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ সম্বন্ধে পল্লীগীতি পাইয়াছি। সুবিদনারায়ণের কন্যার আত্মহত্যা-সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ পল্লীগীতি লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়িয়াছে—'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা' দ্রষ্টব্য।

লাউড় অতি প্রাচীন রাজ্য— কথিত আছে লাউড়-পর্ব্বতে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়-মাণিক্য নামে এক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একটি রৌপ্যমুদ্রায় "রাজা বিজয়মাণিক্য শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেব্যা—শক ১১১৩" লেখা পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা ১১৯১ খৃষ্টাব্দের, এই রাজা সম্ভবতঃ ত্রিপুর-রাজাদের বংশীয় হইবেন। কিন্তু বিজয় রাজার শাখা কোথায় কি ভাবে বিলুপ্ত হইল জানা যায় নাই। তারপরে আমরা একেবারে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া পড়ি। তখন দিব্যসিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজা লাউড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইঁহারই মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত বিখ্যাত "দত্তক-চন্দ্রিকা"-গ্রন্থপ্রণেতা কুবের পঞ্চানন— অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা। দিব্যসিংহ উত্তরকালে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া "কৃষ্ণদাস" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং "বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রিকা" নামক ভাগবতের সারোদ্ধার-সংবলিত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন ("লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের ভক্তিলীলা সূত্র, যে গ্রন্থ শুনিলে হয় ভুবন পবিত্র।") ইহার পরে জগন্নাথপুরে গোবিন্দসিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজার উল্লেখ পাইতেছি, ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, এবং তৎসময়েই বানিয়াচঙ্গের কেশব মিশ্র নামক আর এক রাজার কথা জানিতে পারি। এই দুই শাখাই এক মূল ব্রাহ্মণ-বংশের বলিয়া অনুমিত হয়। গোবিন্দ-সিংহের সঙ্গে কেশব মিশ্রের বংশধর জয়সিংহের ঝগড়া হয়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর গোবিন্দ-সিংহের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া "হবির খাঁ" নাম দেন; তাঁহার ভ্রাতা বিজয়ের সহিত সম্পত্তির সীমা লইয়া বিবাদ করেন। ইতিমধ্যে হবির খাঁ তাঁহার পুত্রের সহিত বিজয়ের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইহাতে বিজয় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু মৌখিক আত্মীয়তার ভান করিয়া হবির খাঁর পুত্র আলম খাঁকে স্বীয় বাড়ীতে আনিয়া বন্দী করেন। আলম অতি রূপবান্ ছিলেন। বিজয়ের কন্যা কৌশল-ক্রমে তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। উভয় ভ্রাতার দ্বন্দ্বের ফলে বিজয়সিংহ নিহত হন এবং হবির খাঁর বংশ প্রবল হইয়া উঠে। পূর্ব্বে এই লাউড়-রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ইহার সঙ্কুচিত পরিমাণ ২৮টি পরগনা এবং অনেক পতিত জমি লইয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইহার মালিক ছিলেন আনোয়ার খাঁ, তিনিই সর্ব্বপ্রথম "দেওয়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন, তদবধি বানিয়াচঙ্গের "দেওয়ান"গণ ঐ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এখানে আর একটি কথা বক্তব্য। আলম খাঁ ও বিজয়-কন্যার ঘটনাটিকে রূপান্তরিত করিয়াই বোধ হয় একটি গীতিকা বিরচিত হইয়াছিল (মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড)।

এই সকল ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও শ্রীহট্ট জেলার অনেক নবাবই মুসলমান, তথাপি ইহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ-রাজকুল-জাত। যে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ মুসলমানদের অধিকৃত হইয়াছিল,—সে সময়েও শ্রীহট্ট বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাধিকারে ছিল, এজন্যই এই প্রদেশে বহু পণ্ডিত ও গুণী জন্মিয়া স্মরণীয় হইয়া আছেন।

শ্রীহট্ট এক সময়ে নানারূপ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। লস্করপুরের 'উনি চাদর,'

হবিগঞ্জের উত্তরে শাহলিয়া গ্রামের 'এণ্ডি' (নমঃশূদ্রেরা ইহা প্রস্তুত করে), গায়ে দিবার মুগীদের "গেলাপ", ৭০ হাত দীর্ঘ ৬ হাত প্রস্থ মৎস্য ধরিবার জাল, 'ঝাকিজাল', 'ছরাজাল', 'খেতজাল', 'হৈফাজাল', 'উথাল জাল', 'সঙ্গাজাল', 'কার্ত্তিজাল', 'হাটজাল', 'পেলুইনজাল', 'বাথেরজাল', 'পাখীরজাল' প্রভৃতি কত প্রকার জালই প্রস্তুত হইত। তাহাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজন কমে নাই। আমরা দুর্ব্বিপাকবশতঃ এই শিল্পটি হারাইতেছি, পূর্ব্ববঙ্গ বড় বড় নদ-নদীর লীলাভূমি—সেই নদনদীর তরঙ্গের সঙ্গে তাল রাখিয়া এই বিচিত্র শিল্প শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল নদনদী এখনও আছে, মৎস্যাহারের প্রবৃত্তি কিছুমাত্র কমে নাই। ভদ্রলোকেরা এখন বহুমূল্য বিলাতী বঁড়্‌শি লইয়া পুকুরের তীরে বকের মত বসিয়া থাকেন, কচিৎ দুই একটি মৎস্য দৈবযোগে তাঁহারা পাইয়া কৃতার্থ হন। এখন প্রয়োজনের কথা কেহ বলে না। উহা সখে দাঁড়াইয়াছে।

শিল্প।

শ্রীহট্টের রণতরী ও জাহাজ এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। মোগলাধিকারের সময়ে লাউড়াধিপতিকে সমর-তরীই রাজস্বস্বরূপ দিতে হইত। ভাটেরার তাম্রফলকে ঈশান দেবের 'সমরতরী'র উল্লেখ আছে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লিণ্ডসে সাহেব একাদশ সহস্র মণ-বাহী এক জাহাজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি বিশখানি জাহাজের একটি বহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখনও হবিগঞ্জ অঞ্চলে দীর্ঘ 'পলওয়ার নৌকা' প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুনামগঞ্জের সুরঞ্জিত কাঠের খেলানা এবং কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তরপের কচুয়াদি গ্রামে উৎকৃষ্ট বেহালা প্রস্তুত হয়। নবিগঞ্জ ও আখাইলকুড়ার রথে কাষ্ঠ-শিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

শ্রীহট্টের "পাটিয়ারা দাস" নামক এক শ্রেণীর লোক বেতের পাটী প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা উৎকৃষ্ট নৈপুণ্যের পরিচায়ক। জলসুখা, জগন্নাথপুর, জফরগড়, প্রতাপগড়, চাপঘাট প্রভৃতি স্থানে ঐ শিল্প বিশেষ শ্রীসম্পন্ন ছিল। এক একখানি পাটীর মূল্য ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইত। ধুলিজুরার (ইটার অন্তর্গত) শিল্পী যত্নরাম দাস ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কৃষি-প্রদর্শনীতে ৯০৲ টাকা মূল্যের একখানি পাটি দেখাইয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন।

ইহাছাড়া মেয়েদের কাঁথা-শেলাই অতি উৎকৃষ্ট শিল্প ছিল। ঢাকা-দক্ষিণের মেয়েদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। শ্রীহট্টের হাতীর দাঁতের কাজ, শাঁখা-শিল্প, 'চাঁচ' বা বাঁশের দরমাতে অতি সূক্ষ্ম নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত। জগন্নাথপুর ও জলসুখা হইতে ১৯০২ খৃঃ অব্দে ১৪,০০০ মণ দরমা বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের শিল্পীর হাতের বাঁশের টুকরি, ধামা, পাখীর পিঞ্জর, পেটারা, বাক্স, মোড়া, চেয়ার উল্লেখযোগ্য। শ্রীহট্টের পাতার ছাতি প্রশংসনীয়। সেখঘাটস্থ কারিগরের হাতের বাঁশ ও বেত-নির্ম্মিত একটি ছোট গৃহ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা ও পারিতোষিক পাইয়াছিল।

শ্রীহট্টের ঢাল একসময়ে ভারত-প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীহট্ট এক সময়ে কামান-নির্ম্মাণের জন্য

খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইটার পাঁচগাঁয়ের কর্ম্মকারগণের পূর্ব্বপুরুষ জনার্দ্দন কর্ম্মকার ১০৪৭ হিজরী সনে হরবল্লভ নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রসিদ্ধ 'জাহান-কোষ' কামান তৈরী করিয়াছিল, ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, পরিধি তিন হাত, মুখের বেড় ১½ হাত ও অগ্নি-সংযোগের ছিদ্র দেড় ইঞ্চি।

কামান।

আমাদের প্রত্যেক দেশের কর্ত্তব্য, তথায় কোন্ কোন্ স্থানে এখনও এই মহিমান্বিত ভারতীয় শিল্পের শ্মশানে দুই একটি স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায় তাহার একটা বাৎসরিক বিবরণ প্রস্তুত করা; সমস্ত শিল্পই তো ধ্বংস পাইয়াছে, যদি কিছু কোথায়ও থাকে—তবে তাহার অঙ্কুরোদ্গমের চেষ্টা করা এবং তাহার মূলে উৎসাহের বারি সেচন করিয়া সেগুলির জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মণিপুর

'মণিপুর' মহাভারতোক্ত মণিপুর কিনা, তৎসম্বন্ধে আমরা ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। ত্রিপুরার উত্তর ও কাছাড়ের পূর্ব্বে এই রাজ্যের সীমানা। লগতাক্ হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রকৃতির সুরম্য নিকেতন। ইম্ফালতুরেল-আদি নানা নদী এই হ্রদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, মনে হয় যেন নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া রাজরাজেশ্বরী-বেশে বীণাপাণি সেই সকল নদীর নিক্কণ-মধুর-রবে বীণা বাজাইতেছেন। প্রকৃতির এরূপ মনোরম ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। রাজারা বভ্রুবাহন হইতে তাঁহাদের বংশাবলী টানিয়া আনিয়াছেন। মিতাই রাজবংশাবলীতে ৬২টি রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। বভ্রুবাহন যদি সত্যই এই রাজগণের আদিপুরুষ হইয়া থাকেন, তবে বংশাবলীর পূর্ব্ববর্ত্তী বহু নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাঁচ রাজাতে এক শতাব্দী ধরিলে ৬২টি রাজা ১২ শত বৎসরের কিছু ঊর্দ্ধ সময় যাবৎ রাজত্ব করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত হয়। উহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব্ধ হইয়াছে এরূপ পরিকল্পনা করা যায়। এই রাজগণের প্রথমে পাখংবার নাম পাইতেছি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন, এই রাজ্যের প্রকৃত নাম "মিতাই লেইপাক," কিন্তু তিনি "মণিপুর" নামটি যত আধুনিক মনে করেন, আমাদের নিকট উহা সেরূপ আধুনিক বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কোন কোন পুস্তকে ঐ স্থানের নাম 'মণিপুর' বলিয়াই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। যাহা হউক এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন, কয়েকটি সাহেবের মতের উপর শিশুর ন্যায় নির্ভর করিয়া কোন প্রাচীন প্রবাদকে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। পূর্ব্বাঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্র, যেখানে যেখানে সমুদ্র মানুষের বসতির জন্য একটু স্থান দিয়া

মিতাই রাজবংশ।

সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বত্রই আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল। ভগদত্ত, নরক প্রভৃতি রাজাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন মণিপুরে যে আর্য্যগণ পদার্পণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? অবশ্য একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে প্রাগজ্যোতিষপুর ও ত্রিপুরার মত এই মণিপুরেও কয়েক বিন্দু আর্য্য-রক্ত বিপুলায়তন কিরাত-রক্ত-সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছিল।

পৌরাণিত জগতের স্বপ্ন-মহিমার ঘোর কাটাইয়া আমরা ঐতিহাসিক যুগের সংবাদ পাওয়ার জন্যই চেষ্টিত হইব। মণিপুর লকতক্ হ্রদে প্রবাহিত নদী সমূহের কর্দ্দমে সৃষ্ট—মৈয়াং, খোমান, অঙম, এবং লোয়াং এই চারিটি উপদ্বীপের সমষ্টি। মিতাই-(মিশ্র জাতি) গণের উপাস্ত "গুরু সিদবা," "লাইরেন সেদরি," "সেনামহি" প্রভৃতি রাজা এবং রাজ্ঞী দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, ইঁহারা নাগাদিগের এক শাখা বলিয়াই মনে হয়। ইতিহাসের পূর্ব্ব যুগে পাহাড়িয়া কত অনার্য্য জাতির দেব-দেবী যে আর্য্য-দেবতাগণের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই বঙ্গদেশেও বহু অনার্য্য দেবদেবী সংস্কৃত মন্ত্র দ্বারা শোধিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন, ভারতের যত পূর্ব্বদিকে যাওয়া যায় ততই এই প্রভাব বেশী দৃষ্ট হয়। বিশেষ বৌদ্ধগণ জগতে তাঁহাদের "সদ্ধর্ম্ম" প্রচার করিবার জন্য আর্য্য-অনার্য্য-নির্ব্বিচারে সকলকে লইয়া পঙ্‌ক্তি করিয়াছিলেন, কাহাকেও বাদ দেন নাই। সেই মুক্ত পরিবেষ্টনে মণিপুর কেন, ভারতের সমস্ত জাতিই মিশ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। পাখংবা হইতে ৪৯ খাখি লাল থৌবা পর্য্যন্ত মিতাই রাজবংশের সকলগুলি নামই পাহাড়ী ভাষায়। ৫০ নং নিংথৌখম্বার—উপাধি 'ভরত'। এই সময় হইতেই বোধ হয় সংস্কৃত-মূলক সংশোধন আরব্ধ হয়। ৫১ নং রাজার নাম মরম্বা, কিন্তু উপাধি 'গৌরী-শ্যাম'। ৫২ চিংখং খম্বার উপাধি 'জয়সিংহ'। ৫৩ নং খাস সংস্কৃত—'মধুচন্দ্র'। ৫৪ চৌরাজিৎ, ৫৫ মারজিৎ, ৫৬ গম্ভীরসিংহ, ৫৭ নরসিংহ, ৫৮ দেবেন্দ্রসিংহ, ৫৯ চন্দ্রকীর্ত্তি, ৬০ সুরচন্দ্র, ৬১ কুলচন্দ্র, ৬২ চূড়াচাঁদ। কৈলাস সিংহ অনুমান করিয়াছেন, বৈষ্ণবেরাই ইঁহাদিগকে আর্য্যপথাবলম্বী করিয়া এই সকল উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু রাজাদের নাম দৃষ্টে তাহা বোধ হয় না, যেহেতু ভরত, গৌরী-শ্যাম, মারজিৎ প্রভৃতি নাম বৈষ্ণব লক্ষণাক্রান্ত নহে। ১৬২৪ শকে (১৭০২ খৃঃ) ৪৭ নং রাজা চেরাইরংবা সামজুক-পতি মণিপুর আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন। মণিপুরীরা এই প্রসঙ্গে "সামজুকঙবা" (সামজুক-বিজয়) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৩৬ শকে (১৭১৪ খৃঃ) ৪৮ নং রাজা পামহেইবা (উপাধি 'করিকর মনওয়াজ') ত্রিপুরেশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের সীমান্তরক্ষক সৈন্যদিগকে জয় করিয়া "তখলেংবা" (ত্রিপুর-বিজয়ী) উপাধি ধারণ করেন। মণিপুরীরা "তখলেংবা" নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পামহেইবার সময় বৈষ্ণব অধিকারীরা মণিপুরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে বৈষ্ণব দীক্ষা প্রদান করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই মণিপুরে সংস্কৃতের আদর হইয়াছিল, এইবার রাজপরিবার বৈষ্ণব ধর্ম্মে

দীক্ষা পাইয়া বিষ্ণুভাগবত (চৈতন্ত-ভাগবত), ও চৈতন্ত-চরিতামৃতাদি গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত ও অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। ১৭৪১ শকের (১৮১৯ খৃঃ) পূর্ব্বে মণিপুররাজ মারজিৎ কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া উক্তদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এখন মারজিৎ স্বীয় ভ্রাতা চৌরজিৎ, গম্ভীরসিংহ ও বিশ্বনাথসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া সুবিস্তৃত কাছাড় ও মণিপুর রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মণিপুরের রাজা ব্রহ্ম-নৃপতির সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মের রাজা কাছাড় জয় করিলেন। গম্ভীরসিংহ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরেজ সরকার ইঁহাদিগকে আশ্রয় দানপূর্ব্বক "গম্ভীর সিং লেভি" নামক একদল সৈন্তের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যান্দবোন নগরে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হয়, তাহাতে ব্রহ্ম-রাজ গম্ভীরসিংহকে মণিপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। গম্ভীরসিংহ পুরুষ-সিংহ ছিলেন। ইংরেজেরা মুক্তকণ্ঠে ইঁহার বীরত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন (Wilson's, Burmese War, p. 207)। ব্রহ্মযুদ্ধের পর ব্রহ্মদেশের পশ্চিমে কাইবো পরগনা গম্ভীরসিংহের রাজ্যের অন্তর্গত হয়, যদিও ব্রহ্ম-রাজার দাবী অস্বীকার করিতে না পারিয়া ঐ পরগনা গভর্নমেন্টকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তথাপি গম্ভীরসিংহ ক্ষতিপূরণার্থ ইংরেজ সরকার হইতে বাৎসরিক ৬,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে মণিপুর রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া ৭,০০০ বর্গ মাইলে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সালে রাজা গম্ভীরসিংহ পরলোক-গমন করেন। তাঁহার এক বৎসর বয়স্ক পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তিকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সেনাপতি নরসিংহ রাজত্ব করিতে থাকেন।

নরসিংহকে হত্যা করিতে নবীন সিংহের চেষ্টা —১৮৪২ খৃঃ।

চন্দ্রকীর্ত্তির জননী নবীনসিংহ নামক এক দুষ্ট ব্যক্তির প্রবর্ত্তনায় নরসিংহের প্রভুত্ব বিলোপ করিবার জন্য তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করেন। নরসিংহ যখন দেবমন্দিরে পূজায় নিরত ছিলেন, তখন নবীনসিংহ তাঁহার উপর অতর্কিতভাবে খড়্গাঘাত করে (১৮৪২ খৃঃ)। নরসিংহ হস্তে আঘাত পান, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। নরসিংহ রাণীর কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন এবং নবীনসিংহকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ৬ বৎসর কাল রাজা থাকিয়া নরসিংহ ১৭৭২ শকে (১৮৫০ খৃঃ) পরলোক-গমন করেন। নরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ রাজা হইয়া মাত্র তিন মাস রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সপ্তদশ বর্ষীয় বালক চন্দ্রকীর্ত্তি একদল সৈন্য লইয়া বীর-বিক্রমে স্বীয় পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন, তৎপুত্র সুরচন্দ্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এই মণিপুর রাজ্য এখন সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী; মহাপ্রভুর রাজত্বে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে মণিপুরীদের মত ভক্তিমান্ আর কেহ আছেন কিনা জানি না। চৈতন্তের জন্মোৎসবে শত শত নরনারী পথের সর্ব্ববিধ কষ্ট সহ্য করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া সোৎসাহে যোগদান করে, তাহা স্মরণীয়। নবদ্বীপ পল্লী দূর হইতে দেখিয়া ইঁহারা চৈতন্তের নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন, কেহ কেহ বহুদূর হইতে বুকে

হাঁটিয়া মন্দির-পথবর্ত্তী হয়। মণিপুরী মেয়েদের রাস-নৃত্য—নৃত্যকলার সম্পদ, তাঁহাদের হাতের নানারূপ শিল্প অতীব প্রশংসনীয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর

মাদ্‌লাপঞ্জী অনুসারে পুরাকালে উড়িষ্যা রাজ্য ৩১টি "দণ্ডপাঠ" বা খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে বর্ত্তমান মেদিনীপুর ৬টি 'দণ্ডপাঠ' লইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিগণিত হয়: (১) টানিয়া, (২) নারায়ণপুর, (৩) ভঞ্জভূমি বারিপদা, (৪) নইগাঁ, (৫) জৌলতি, (৬) মালঝিটা।

(১) টানিয়া=বর্ত্তমান কালে বালেশ্বরের কিয়দংশ ও দাঁতন থানা। (২) নারায়ণপুর=নারায়ণ গড়। (৩) ভঞ্জভূমি বারিপদা=মেদিনীপুর, কেশপুর, শালবনী, খড়্গপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর থানা, এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অধিকাংশ। (৪।৫) নইগাঁ ও জৌলতি=এগরা নগুয়াঁ, পটাশপুর ও সবঙ্গ। (৬) মালঝিটা= রামনগর, কাঁথি, খাজুরি ও ভগবানপুর থানা।

যখন মাদ্‌লাপঞ্জীর এই বিভাগ উল্লিখিত হয়, তখন তমলুক (তাম্রলিপ্ত) উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল না, এজন্য উহার নাম এই তালিকায় নাই।

আকবর মেদিনীপুর জেলার যে নূতন বিভাগ করেন, তাহাতে এই জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রাজা তোদড় মল্ল-কৃত বিভাগে জলেশ্বরের অন্তর্গত কুড়িটি মহাল মেদিনীপুরের মধ্যে পড়িয়াছে :—(১) ঘগড়ী, (২) ব্রাহ্মণভূম, (৩) খরকপুর, (৪) কুতুবপুর (মহাকাল ঘাট), (৫) মেদিনীপুর, (৬) কেদারকুণ্ড, (৭) সবঙ্গ, (৮) কাশীজোড়, (৯) তমলুক, (১০) নারায়ণপুর, (১১) তরকোল, (১২) মালঝিটা, (১৩) বালি সাহী, (১৪) ভোগরাই, (১৫) দ্বাদশভূম, (১৬) জলেশ্বর, (১৭) গগনপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই, (২০) বাজার।

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রাচীন বন্দর বিশ্ববিশ্রুত; এখানকার বর্গভীমার মন্দির একটি মহাতীর্থ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত জগমোহন পণ্ডিতের "দেশাবলী বিবৃতি" নামক পুস্তকে লিখিত আছে তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমের অনেকগুলি পল্লীকে লোকে 'তমলুক' বলিত। তদনুসারে বেহালা, বঁড়িশা, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি সমস্ত দেশই তমলুকের অন্তর্গত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই "দেশাবলী বিবৃতি" উদ্ধার করিয়াছেন। পাটনার সুবেদার বিজ্জলদেব নামক এক চৌহান রাজার আদেশে জগমোহন পণ্ডিত ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে

ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বিবরণ সংস্কৃতে প্রণয়ন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে মেদিনীপুর জেলার কতকটা 'ভান দেশ' নামে পরিচিত ছিল।

মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা মত উল্লেখ-যোগ্য। পূর্ব্বে এই তাম্রলিপ্তের আর একটি নাম ছিল "দামলিপ্ত"। দামল জাতীয় লোকের নিবাসবশতঃ ঐ নাম হইয়াছে এবং এই "দামল" জাতিই ক্রমে দক্ষিণ-দেশে যাইয়া "তামিল" নামে পরিচিত হইয়াছে। তাহা হইলে মেদিনীপুর জেলার আদিম লোকেরাই তামিল দেশের প্রতিষ্ঠাতা। তমলুকের আরও অনেক গৌরবের কথা আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে, সভাপর্ব্বে, দ্রোণপর্ব্বে এবং ভীষ্মপর্ব্বে তাম্রলিপ্তের যেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান করা যায় যে এককালে তাম্রলিপ্ত একটি স্বতন্ত্র এবং বৃহৎ রাজ্য ছিল। জৈমিনীয় ভারতে তাম্রধ্বজের (ময়ূরধ্বজের পুত্র) সঙ্গে অর্জ্জুনের যে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, অনেকে মনে করেন উক্ত রাজাদের তাম্রলিপ্তই রাজধানী ছিল।

মহাভারতের পরবর্ত্তী সময়ে আমরা জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের বহু উল্লেখ দেখিতে পাই। জৈন গুরু ভদ্রবাহুর (চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু) প্রধান শিষ্য গোদাস জৈনদিগের চারটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, তন্মধ্যে "তাম্রলিপ্তিকা" অন্যতম। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক লেখক রচিত "Periplus of the Erythraean" (ইংরেজী নাম) পুস্তকে তাম্রলিপ্ত যে ভারতীয় প্রধান বন্দরগুলির একটি, তাহা উল্লিখিত আছে। উত্তর-ভারত হইতে ভারত-সাগরের দ্বীপগুলিতে যাতায়াত তাম্রলিপ্ত বন্দর দ্বারা সম্পাদিত হইত। এই বন্দরের চারিদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এমন কি প্রমাণিত হইয়াছে যে বর্গভীমার মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের উপর নির্ম্মিত। মেগেস্থেনিস সম্ভবতঃ এই তাম্রলিপ্তবাসীদিগকেই "তালুক্ত" নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রীক লেখক প্লিনিও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। "তালুক্ত" জাতি অতি পরাক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্ত কিংবা তৎপুত্র বিন্দুসার কেহই তাম্রলিপ্ত রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। অশোক যে যুদ্ধে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করিয়া কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন—সেই কলিঙ্গের সৈন্যগণ বোধ হয় তাম্রলিপ্তবাসীরাই ছিলেন, ইঁহারাই তখন অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন। হিউনসাঙ্গ তাম্রলিপ্ত নগরে অশোকের অনুশাসন-স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অশোকের অনুশোচনা দুর্দ্দান্ত কলিঙ্গবাসীদিগকে কতকটা নিরস্ত করিয়াছিল। এই তাম্রলিপ্তের জাহাজে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র ও সহোদরা সঙ্ঘমিত্রা (মতান্তরে পুত্র ও কন্যা) সিংহলে গিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক ফাহায়েন (৪১১-৪১২ খৃঃ) দুই বৎসর তাম্রলিপ্তে বাস করিয়া তথা হইতে অর্ণবযানে সিংহলে যাত্রা করেন। তিনি এই স্থানে ২৪টি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ্গ তাম্রলিপ্তে ১০টি বৌদ্ধমঠ ও সহস্রাধিক শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্ত একবার সমুদ্র-ধৌত হইয়াছিল। হিউনসাঙ্গের পর ৬৭৩ খৃঃ অব্দে ইচিং নামক চৈনিক পরিব্রাজক কাংচাউ নগর হইতে সমুদ্রযানে তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করিয়াছিলেন।

ইহারা ছাড়া তাও-লিন, তাং চেং তেং, হইলুন, উহিং চেংকন্, চাংমিন প্রভৃতি বহু সংখ্যক চীন-পর্য্যটক তাম্রলিপ্তের বন্দরে আসিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পর্য্যটক তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এই দেশের তত্তৎকালের বাণিজ্যের প্রসার এবং সমস্ত বিষয়ে গৌরবের কথা উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

যদিও অশোকের পরে কলিঙ্গ ও তদন্তর্গত তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা হারাইয়া সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়, তথাপি এই প্রদেশ তখনও প্রবলপরাক্রান্ত ছিল। ১০২৫ খৃঃ অব্দে রাজেন্দ্র-চোল তাম্রলিপ্ত ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির অধিপতি ধর্ম্মপালকে (দণ্ডভুক্তির অধীশ্বর) জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিরুমলয়ের শিলা-লিপিতে ঘোষণা করিয়াছেন। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে যে সমান্ত-চক্র রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ ও অপারমন্দারের অধিপতির উল্লেখ আছে; ইহাদের তিন জনই যে উড়িষ্যার রাজা তাহাতে সন্দেহ নাই। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি, অপারমন্দারের বর্ত্তমান নাম মান্দারণ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কর্ণগড়ের রাজা কর্ণসেন—ধর্ম্মপাল রাজার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর স্বামী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি লাউসেন বা লবসেন ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যের নায়ক। লাউসেন, কাঁউর-(কামরূপের) অধিপতি এবং হরিপাল প্রভৃতি রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া "অজেয় ঢেকুরের" অধিপতি সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষকে নিহত করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর আদি-সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ শত বৎসর কাল গঙ্গাবংশীয় রাজারা উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন, ইহারা বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাদের আদি পুরুষ অনন্তবর্ম্মা গাঙ্গারাঢ়ী (গঙ্গা সন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুরের) রাজা ছিলেন। তিনি সমস্ত উড়িষ্যা বিজয় করিয়াছিলেন।

খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাম্রলিপ্ত হইতে পেগুতে যাতায়াত করিতেন। পেগুর কল্যাণ-গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে ইহা জানা যাইতেছে, এবং ১০০১ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্তের জনৈক রাজা তাম্রলিপ্ত হইতে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা উল্লিখিত আছে (Hamilton's East India Gazetteer, Vol. II, p. 682)।

সুতরাং এই মেদিনীপুর ও তদন্তর্গত তমলুক সর্ব্ব-ভারত-প্রসিদ্ধ এবং বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের রাজ্য। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে রূপনারায়ণের খাদে উইলসন সাহেব (মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হন। উহা সচ্ছিদ্র এবং কোন রাজার নাম বা অঙ্ক তাহাতে নাই, কোন কোনটিতে পশুপাখীদের মূর্ত্তি অঙ্কিত। তমলুকের আদিম পরাক্রান্ত রাজাদের সময় খৃঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে ঐ মুদ্রাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই রাজাদের কাহারও সঙ্গে অশোকের ইতিহাস-বিশ্রুত সংঘর্ষ হইয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে কতকগুলি "পুরাণ" নামক মুদ্রা তমলুকে পাইয়াছিলেন। এই পুরাণ মুদ্রা বহু প্রাচীন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তমলুকে কণিষ্কের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ইহা ছাড়া কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গুপ্ত-রাজন্যের মুদ্রা তমলুক ও মেদিনীপুরের অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা দেখিলে তমলুকের

প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের আদি ঐতিহাসিক যুগ হইতে পরবর্ত্তী সভ্যতার ইহারা পর পর সাক্ষী। এখনও এই সকল স্থানের বিশেষরূপ সন্ধান হয় নাই, ভূগর্ভে যে অনেক প্রমাণ অজ্ঞাত অবস্থায় বর্ত্তমান—তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এই দেশের অনেক স্থলেই আছে।

এই দেশ কয়েকটি কারণে বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়। অশোক কলিঙ্গ-দেশে কোন্ রাজার সঙ্গে তদ্রূপ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তখন তাম্রলিপ্তই সে দেশের মুখ-পাত ছিল এবং সেই স্থানের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা মহাভারতের সময় হইতে নানা সূত্রে আমরা জানিতে পারি। তাহা হইলে খুব সম্ভব কলিঙ্গ-যুদ্ধের নেতা ছিলেন, তমলুকের অধিপতি; সেই সময়ে উড়িষ্যার আর কোন রাজা এত প্রবল ছিলেন না। খারবেল সেই সময়ের পরবর্ত্তী। যদি তমলুকের লোকেরা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও সাহস দেখাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান হইতেই অশোকের মনের উপর যে বিপ্লব চলিয়া গিয়াছিল সমস্ত জগৎবাসী সেই মানসিক পরিবর্ত্তনের ফলভাগী হইয়াছিলেন। হিউনসাঙ্গ তাম্রলিপ্তে অশোকের যে ২০০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিজয়-স্তম্ভ কিনা বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশের এই তমলুক বন্দর বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু কত শত সাধুর পদরজঃপূত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বিশ্ববিশ্রুত হিউনসাঙ্গ, ইচিং, ফাহায়েন প্রভৃতি বিদেশী পর্য্যটকগণ এই স্থানে অর্ণবযানে আসিয়াছিলেন, এবং এদেশ দেখিবার জন্য নানাকৃচ্ছ্র স্বীকার করিয়াছিলেন। যে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল যুগে যুগে এই দেশ হইতে যাবা, বালী, সুমিত্রা, শ্যাম, পেগু, কাম্বোডিয়া, সিংহল এবং বহু উপদ্বীপে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমনাগমন করিয়াছেন, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা হইতে—আচার্য্য বোধিধর্ম্ম (৫২৬ খৃঃ অব্দে) তাওলীন এবং তাং চেং তং পর্য্যন্ত শত শত সাধু ভারতসাগর অতিক্রম করিয়া দূরদূরান্তরে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এই পথের পথিক হইতে হইয়াছিল। ফাহায়েন দুইটি বৎসর তাম্রলিপ্তে বসিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন এবং ছবি অঙ্কন করিতে শিখিয়াছিলেন,—সুতরাং এই দেশটি যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং এখানে যে বিস্তৃত পাঠাগার ও বহু সঙ্ঘারাম ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা অনুমান করিতে পারি, বঙ্গীয় গল্পসাহিত্যে যাঁহারা বিখ্যাত, সেই ধনপতি ও শ্রীপতি সদাগর মঙ্গলকোট হইতে এই তমলুকের বন্দর দিয়া সিংহলে গিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শত শত অর্ণবপোত এই বন্দরে বাঁধা থাকিত, এবং বাণিজ্য-সম্ভার, শিল্পদ্রব্য এবং বাঙ্গলার ধর্ম্ম লইয়া সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিত। তাম্রলিপ্ত জৈনদিগের চতুর্ধাম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান কার্য্য-কেন্দ্র ছিল।

তৃতীয়তঃ এই তমলুকের রাজা অনন্তবর্ম্মা (১০৭৮-১১৪২ খৃঃ) সমস্ত উড়িষ্যাদেশ জয় করিয়া প্রসিদ্ধ গঙ্গাবংশ তদ্দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী গঙ্গাবংশ উড়িষ্যার অধিকারী ছিলেন, ইহা মেদিনীপুরবাসী তথা সমস্ত বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নহে। এই মেদিনীপুর এক সময়ে জঙ্গলাবৃত ছিল, এখান হইতে ঝাড়খণ্ডের বিশাল অরণ্য দূরবর্ত্তী ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫১০ খৃঃ)

চৈতন্যদেব পদব্রজে দশ ক্রোশ ব্যাপক এক সুবৃহৎ জঙ্গল অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং প্রায় এক শতাব্দী পরেও শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ এই জঙ্গল পাড়ি দিয়া বন-বিষ্ণুপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এককালে এই জনপদ দস্যু-তস্করের আবাসভূমি ছিল এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ দুর্গ আশ্রয় করিয়া অনেক রাজবংশই এই প্রদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এস্থানে সংক্ষেপে তাঁহাদের কয়েকটির উল্লেখ করিয়া যাইব।

কেহ কেহ অনুমান করেন, তাম্রলিপ্তের বরাহ-মন্দিরটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাড্‌গি জেলায় চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর বংশীয় কোন রাজা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুলকেশী ষষ্ঠ শতাব্দীতে কলিঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কতক কালের জন্য তাঁহার বংশধরেরা মেদিনীপুর ও তমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে তমলুকের রাজা দেব-রক্ষিতের নাম পাওয়া যায়। যদি ঐ পুরাণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকে, তবে দেবরক্ষিত ঐ সময়ে রাজা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগৃহীত রামচন্দ্র নামক জনৈক কবি-রচিত একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুঁথিতে (ত্রয়োদশ শতাব্দী) দেখা যায়, তখন তাম্রলিপ্তের রাজা গোপীচন্দ্র ছিলেন; ইনি ছত্রেশ্বরী মন্দিরে এক ব্রাহ্মণের শিরচ্ছেদ করেন এবং শেষে অনুতপ্ত হইয়া গঙ্গাসাগরে আত্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করেন।

রাজার মৃত্যুর পর কৈবর্ত্ত জাতীয় কাকর দেশের রাজা (সম্ভবতঃ কালুভূঞা) রাজধানী তিন দিবস নির্ব্বিচারে লুণ্ঠন করিয়া শেষে রাজা হন।

এই রাজার বংশের তালিকায় তাম্রধ্বজের বংশের সঙ্গে অপিচ গোপীচন্দ্র ও দেবরক্ষিতের সঙ্গে বংশলতা জড়িত করার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখক যোগেশ-চন্দ্র বসু মহাশয় নানা কারণে ঐরূপ বংশাবলী বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন (১০২-১০৩ পৃঃ)।

ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ (জৈমিনীয় ভারতোক্ত), হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, বিম্বাধর রায় প্রভৃতি ৩৬ জন নৃপতির নাম এই তালিকায় আছে, তারপর কালুভূঞার নাম। কিন্তু সময়ের অসামঞ্জস্যের দরুন উক্ত হইয়াছে যে দেবরক্ষিত, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি অনেক রাজার নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের নাম দেখিলেই আমাদের একটু দ্বিধার ভাব হওয়া স্বাভাবিক। বাঙ্গলা এমন কি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেরও বহু সংখ্যক রাজবংশের আদিপুরুষ চন্দ্র-সূর্য্য বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতিও অনেক বংশাবলীতে বিবৃত হইয়াছে, রাজ-বংশাবলী লেখকদের এই স্বভাব কিছু নূতন নহে। গোপীচন্দ্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কালুভূঞা কৈবর্ত্ত। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ হইতে নিঃশঙ্ক-নারায়ণ রায়—বংশলতায় উক্ত ৩৬টি রাজার প্রত্যেকের নাম বিশুদ্ধ-সংস্কৃতাত্মক, তাহাতে বেশ একটা পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে—কিন্তু তারপরই নামের নমুনা এইরূপ— কালুভূঞা, ধাঙ্গড়ভূঞা, মুরারিভূঞা, হরবারভূঞা ও ভাঙ্গড়ভূঞা। ভাঙ্গড়ভূঞার মৃত্যু হয় ১৪০৩ খৃঃ অব্দে। সুতরাং কালুভূঞার সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধরা যাইতে পারে।

যখন রামপাল গৌড়রাজ্যে ভীম-কৈবর্ত্ত ও তাঁহার দলবলের উচ্ছেদ সাধন করেন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকে উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া পরবর্ত্তী ২।১ শতাব্দীর মধ্যে বলসঞ্চয়পূর্ব্বক তমলুক অধিকার করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ 'মেদিনীকোষ' রচয়িতা মেদিনীকর 'মেদিনীপুর' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পিতা প্রাণকর নামক জনৈক রাজা এই অঞ্চল ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বভাগে শাসন করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মেদিনীকর ১২০০ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার কোষ-গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা গণেশের সভাসদ্ বৃহস্পতি মতিলাল ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে অমর-কোষের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে মেদিনীকোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যোগেশ বসু মহাশয় অনুমান করেন ১২৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মেদিনীকরের সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। কর বংশের একখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা ভুবনেশ্বর অঞ্চল পর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অনঙ্গভীমদেবের দ্বারাই এই কর বংশের ধ্বংস সাধিত হয়। "পণ্ডিত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, করেরা বৈশ্য।" (যোগেশ-বাবুর ইতিহাস, ১২৮ পৃঃ)। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং যোগেশবাবু ইহাদিগকে তাম্বুলী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, যেহেতু সেই অঞ্চলে 'কর' উপাধিধারী অনেক তাম্বুলী দৃষ্ট হয়। আমার অনুমান, এই তিন মতই সত্য। করেরা প্রথমতঃ বৈশ্য ছিলেন, তৎপরে বৌদ্ধ হইয়া জাতিচ্যুত হওয়ার দরুন শেষে তাম্বুলীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজারও ঠিক এই গতি হইয়াছিল (২৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মেদিনীপুরের অন্যতম ইতিহাস-লেখক ত্রৈলোক্যনাথ পাল নারায়ণগড়ের রাজাদের বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন। এই রাজবংশ ১২৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ২৬ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন।

ইহাদের প্রথম রাজা গন্ধর্ব্ব ১২৭৩ খৃঃ অব্দে এতদ্দেশের শাসনকর্ত্তৃ-স্বরূপ জগন্নাথ দেবের নাভিকুণ্ডস্থিত চন্দন দ্বারা খুরদার রাজা কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ইনি এবং ইহার বংশধরগণ "শ্রীচন্দন" উপাধি-লাঞ্ছিত।

রাজা গন্ধর্ব্ব-শ্রীচন্দন পালের পুত্র নারায়ণবল্লভ-শ্রীচন্দন পালের নামানুসারে এই স্থান নারায়ণগড় নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজা গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মাণী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাজা গন্ধর্ব্ব-শ্রীচন্দন পাল—১২৭৩-১২৯৬ খৃঃ।

ত্রৈলোক্যবাবু লিখিয়াছেন, "যে দিন ভগবতী ব্রহ্মাণী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন, সেদিন মন্দিরাভ্যন্তরে যে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিয়াছিল ৬২০ বৎসর সেই দীপ সমভাবে জ্বলিয়া আলো দান করিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও নির্ব্বাপিত হয় নাই।" এই বংশের শেষ রাজা পৃথ্বী-বল্লভের জীবনদীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১২৯০ সালে (১৮৮৩ খৃঃ) সেই সুচির-প্রজ্বলিত দীপ-শিখা অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। রাজা গন্ধর্ব্ব ১২৯৬ খৃঃ অব্দে পরলোক-গমন করেন, তদীয় মহারাজ্ঞী পুণ্যশীলা মধুমঞ্জরী স্বামীর চিতানলে সহগামিনী হন।

রাজা নারায়ণবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল ১২৯৬ খৃঃ অব্দে রাজা হন। তাঁহার সময়ে এবং তৎপূর্ব্বে হইতে দস্যুদের ভয়ে পুরীর যাত্রীরা পথে যাতায়াত করিতে পারিত না। রাজার অনুচরদিগকে হত্যা করিয়া তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেও ইহারা দ্বিধা বোধ করিত না। একদা এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র ও সহচরগণ পরিবৃত হইয়া পুরীর পথে যাইতেছিলেন, দস্যুরা সেই সম্ভ্রান্ত লোকটিকে হত্যা করিয়া তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। তাঁহার সাধ্বী পত্নী স্বামীর চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এই দুঃসংবাদ পাইয়া নারায়ণবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় তিনি দস্যুদল দমিত করিবেন, নতুবা রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। তিনি ৩০০ বিঘা জমি ব্যাপিয়া এক বৃহৎ পরিখা খনন করিয়া গড়খাই প্রস্তুত করিলেন এবং স্বীয় প্রাসাদ অত্যন্ত সুদৃঢ় করিলেন। তিনি দৃঢ়-হস্তে দস্যুদল দমনে নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে এরূপ ভাবে নিরস্ত করিলেন যে, দস্যুদলপতি স্বয়ং যাচিয়া আসিয়া আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যদল-ভুক্ত হইল।

রাজা নারায়ণবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল—১২৯৬-১৩১২ খৃঃ।

নারায়ণবল্লভের পুত্র দেবীবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তৎপরে অন্য কয়েক জন নৃপতির পরে শ্যামবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল ৬৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দীর্ঘ জীবনে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহার গুরু বিদ্যাধরের নামে খ্যাত বিদ্যাধর দীঘি ও শরশঙ্কা দীঘি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শরশঙ্কা দীঘি দৈর্ঘ্যে এক মাইলের অধিক, প্রস্থেও তদনুরূপ; কথিত আছে দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মহীপাল দীঘি অপেক্ষাও এই দীঘি বৃহত্তর। সাজাহান বাদসাহ একদা (সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে) নারায়ণগড়ের পথে যাইতেছিলেন। শ্যামবল্লভ রাজপুরীর দ্বার বন্ধ করিয়া কৌশলে নদীর জলের পয়ঃপ্রণালী খুলিয়া দিয়া সাজাহানের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাজাহান বিশালকায় হস্তীদের দ্বারাও নারায়ণগড়ের সুরক্ষিত লৌহকবাট ভাঙ্গিতে পারেন নাই। অবশেষে শ্যামবল্লভ জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া করযোড়ে সম্রাট্-কুমারের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন: "মহারাট্টারা আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে এবং দস্যুরা পথে উৎপাত করিতে না পারে—আমি তাহার কিরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছি তাহা হুজুরকে দেখাইবার জন্য এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি, আপনি আমায় মার্জ্জনা করিবেন।" সাজাহান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা, সৌজন্য, বল, বিক্রম ও রণকৌশলের দৃষ্টান্ত পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে "মাড়ি সুলতান" উপাধি দিলেন। এই উপাধির অর্থ "পথের প্রভু।" শ্যামবল্লভের বংশধর মধুসূদনবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সুলতান বর্গীদের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্ব কাল ১৫ বৎসর। পরবর্ত্তী রাজা পরীক্ষিতের রাজত্বকালও নানা বিড়ম্বনাযুক্ত; একদিকে বর্গীদের অত্যাচার,

রাজা দেবীবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল—১৩১২-১৩২৯ খৃঃ। রাজা শ্যামবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সুলতান—১৬১২-১৬৭৯ খৃঃ।

রাজা মধুসূদনবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সুলতান—১৭২৮-১৭৪৪ খৃঃ। রাজা পরীক্ষিৎ-শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সুলতান—১৭৬০-১৭৮২ খৃঃ।

নবাব ও ইংরেজ সৈন্যদের রসদ-সংগ্রহ, দস্যুদিগের ক্রমাগত নিরীহ গৃহস্থদিগকে উৎপীড়ন, অন্যদিকে ৭৬এর মন্বন্তর—প্রভৃতি উপদ্রবে দেশবাসীরা নারায়ণগড় ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ ২১টি বৎসর রাজ্যভোগ অথবা দুর্ভোগ ভুগিয়া রাজা পরীক্ষিৎ পরলোক-গমন করেন।

এই দেশে মুসলমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা-কাল ১৫৬৮ ধরা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে হিজলীতে তাজ খাঁ একটি ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে প্রতাপাদিত্য হিজলীর অধিকার মুসলমানদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আমরা গ্রন্থভাগে দেখাইয়াছি, উড়িষ্যা এক সময়ে মোগলদের বিরুদ্ধে পাঠানদের ষড়যন্ত্রের অন্যতম কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দাউদ খাঁ মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া উড়িষ্যার অব্যাহত অধিকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট তাঁহাকে কোন দিনই সিংহাসনে স্থায়িভাবে বসিতে দেয় নাই। প্রতাপাদিত্যের পর বলভদ্র দাস নামক এক ব্যক্তি হিজলীর মণ্ডলাধিকারী হইয়াছিলেন। গোপীজনবল্লভ দাস কৃত রসিকানন্দের জীবনেতে উল্লিখিত আছে, বলভদ্র রাজরাজেশ্বরের মত জাঁকজমকে থাকিতেন—"হিজলী মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান্"—ইহার কন্যা ইচ্ছা-দেবীকে রোহিণী নামক স্থানের রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দ মুরারি বিবাহ করেন। রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য হইয়া সমস্ত উড়িষ্যা-মণ্ডলে চৈতন্যধর্ম্ম প্রচার করেন। রসিকানন্দ ১৫৯০ খৃঃ হইতে ১৬৫২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। এই সময়ে হিজলীর শাসনকর্ত্তা এবং প্রধান ব্যক্তিস্বরূপ এই কয়েক জনের নাম আমরা পাইয়াছি :—বিভীষণ দাস (পদ্মনাভ দাসের পুত্র) ১৫৮৪ খৃঃ, বিভীষণের পুত্র ভীমসেন মহাপাত্র, বলভদ্র দাস ও সদাশিব দাস, সলিম খাঁ (১৬০৯ খৃঃ)। পাঠানদিগের সময়ে নানারূপ রাজনৈতিক বিপ্লবে হিজলী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

তোদড় মল্ল কর্ত্তৃক রাষ্ট্র বিভাগের পর সাজাহান পুনরায় এই অঞ্চলের বিভাগ করিয়াছিলেন। তদনুসারে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার মুজকুরি, সরকার মালঝিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত করা হইয়াছিল। ঐ সময় হিজলী সুবা উড়িষ্যা হইতে স্বতন্ত্র করা হয় এবং উহা বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সুলতান সুজা সুবা-বাঙ্গলাকে নূতনরূপ বিভাগ করেন; তিনি তোদর মল্লের কৃত বাঙ্গলার ১৯টি সরকারের সহিত হিজলী ও বালেশ্বরের ছয়টি এবং নবসৃষ্ট নয়টি সরকার মিলাইয়া সুবা-বাঙ্গলাকে ৩৪ সরকারে—১৩৫০ মহালে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর পুনঃ পুনঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ হয়, তাহার তালিকা দেওয়া নিপ্রয়োজন। কিছু দিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান মেদিনীপুর ৪টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল :—বর্দ্ধমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও হিজলী। "১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জলেশ্বর জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়......... উত্তরকালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বগড়ি পরগনা ও হিজলীর অন্তর্গত কতকগুলি পরগনা ও সমগ্র হিজলী জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।" (যোগেশ-বাবুর ইতিহাস, ২৫ পৃঃ)। মেদিনীপুরের প্রস্তর-বিগ্রহ ও মন্দিরাদি সম্বন্ধে যোগেশবাবু যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। দুঃখের বিষয় সেই দুর্লভ

প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির কোন ছায়া-চিত্র দেওয়া হয় নাই, আমরা মূলতঃ তাঁহার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কয়েকটি কথার উল্লেখ করিব।

(১) বর্গভীমার মন্দির—কথিত আছে এই মন্দির ও বিগ্রহ জৈমিনীয় ভারতোক্ত ময়ূরধ্বজের বংশীয় গরুড়ধ্বজ স্থাপিত করেন, কিন্তু উহা একটি গল্প মাত্র। মনে হয় মন্দিরটি পূর্ব্বকালে কোন বৌদ্ধ মঠ ছিল, পরবর্ত্তী কোন হিন্দু রাজা উহা হিন্দুভাবাপন্ন করিয়াছেন। বর্গভীমার মূর্ত্তি উগ্রতারার মত। মন্দিরটি ৬০ ফুট উচ্চ এবং অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। এই উচ্চতা ছাড়া ইহার বনিয়াদ ত্রিশ ফুট উচ্চ। (২) ময়নাগড়—ভিতর গড়ের পরিমাণ ৫,৬২,৫০০ বর্গ ফুট, ইহার চতুঃপার্শ্বের প্রত্যেক দিকে ৭০০ ফুট দীর্ঘ পরিখা। বাহির গড়ের পরিখা প্রত্যেক দিকে ১৪০০ শত ফুট। (৩) মহিষাদলের রাণী জানকী-দেবীর নবরত্ন মন্দির (১৭৮৮ খৃঃ), রামজিউর মন্দির, রাণী ইন্দ্রাণীদেবীর রাসমণ্ডপ, সিংহবাহিনী দেবী প্রভৃতি। (৪) দোরো পরগনায় মাধব, সাগরমাধব ও নীলমাধব—নীল প্রস্তরের অতি প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের মূর্ত্তি—চমৎকার শিল্প-নিদর্শন। (৫) খাকড়ার দীঘি—বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীঘিটি আছে—এই ছোট দীঘির এক পারে দাঁড়াইলে অপর পারের মানুষ লিলিপুটদের মত ছোট দেখায়। ছোট দীঘি যদি এই হয়, বড়টি কিরূপ ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগে এই দীঘিগুলি খাত হইয়াছিল। (৬) গোপ-গিরিতে যে সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন আছে, তাহা মহাভারতের বিরাট রাজার সঙ্গে জড়িত করিয়া অনেক উপকথা তদ্দেশে প্রচলিত করা হইয়াছে। রামপালের সামন্ত-চক্রের অন্যতম বিরাট্ গুহ (একাদশ শতাব্দী) কর্ত্তৃক ঐ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। (৭) কর্ণগড়—গড়টি একক্রোশ ব্যাপক ছিল। ইহা ছাড়া বৌদ্ধযুগের বহু ভগ্ন মূর্ত্তি ও মন্দিরাদির কথা মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখকেরা উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অনেক কথাই আমি যোগেশচন্দ্র বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয়দ্বয়ের ইতিহাস হইতে সঙ্কলন করিয়াছি। মেদিনীপুর কাশীরাম দাস ও তাঁহার ভ্রাতাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী লিখিবার স্থান, মহাপ্রভুর পদাঙ্ক-পূত, অশোকের স্মৃতি-বিজড়িত, চীনপর্য্যটক বোধিধর্ম্ম, প্রসিদ্ধ গ্রীকদূত প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্মৃতি-সংশ্লিষ্ট, ইদানীংকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতাগ্রগণ্য মৃত্যুঞ্জয় ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি—সুতরাং এই স্থান বাঙ্গালীর হৃদয়কে সহজেই আকর্ষণ করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বন-বিষ্ণুপুর *

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা সমাজে বন-বিষ্ণুপুর রাজবংশ একটা নূতন জীবন ও প্রেরণা আনিয়াছিল—এই নাট্যশালার প্রধান নায়ক রাজা বীর হাম্বির নূতন জীবন পাইয়া বঙ্গের সামাজিক জীবনে একটা নূতন জীবনের প্রেরণা দিয়াছিলেন। বন-বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করিয়া দুই শতাব্দী কাল বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং এদেশের শিক্ষা-দীক্ষার যে দিয়ের সলতেটি নিবু নিবু হইয়া জলিতেছিল, তাহা কিয়ৎকালের জন্য বিষ্ণুপুরের রাজবংশ একটু উস্কাইয়া দিয়া প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা এজন্য বন-বিষ্ণুপুরের ইতিহাসটি এই পরিশিষ্টে সংক্ষেপে জুড়িয়া দিলাম।

মহাভারতের সময়ে মল্লভূমি বা মল্লবনি সমুদ্রের উপান্তে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। ফরিদপুর, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল এবং ২৪-পরগনা যখন সমুদ্রগর্ভে ছিল, তখনও বোধ হয় মল্লভূমি মাথা জাগাইয়া ছিল। এই দেশের প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে পাথরে ও ইটের উপরে বহু রণতরীর ছবি উৎকীর্ণ দেখা যায়, তাহাতেও মনে হয় সমুদ্র এক সময়ে এদেশের অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। জনশ্রুতিও এই সংস্কারের অনুকূল।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন—সম্ভবতঃ কলিঙ্গের একাংশ তখন মল্লভূমি ছিল। মালব দেশের রাজা চন্দ্রবর্ম্মা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মল্লভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন, শুশুনিয়া লিপি হইতে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক রাঢ় দেশের আধিপত্য লাভ করেন (৭ম শতাব্দী), তখন সম্ভবতঃ মল্লভূমি রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

মল্লরাজবংশের আদিপুরুষের নাম আদিমল্ল। আদিমল্ল আদিশূরের মত নাম। হয়ত যখন বংশাবলী রচিত হয়,—তখন বংশের আদিপুরুষের নাম হারাইয়া গিয়াছিল, শেষে ঐরূপ একটা উপাধি দিয়া কুলজি শাস্ত্রে গোঁজামিল দেওয়া হইয়া থাকিবে। আদিমল্ল বাগ্দিদের দ্বারা শৈশবে পালিত হন—কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন,—রাজপরিবারে এইরূপ কিংবদন্তী; এই আদিমল্লের নাম 'রঘুনাথ' বলিয়া রাজবংশের কুলজিতে উল্লিখিত আছে এবং তিনি ক্ষত্রিয়-বংশের চন্দ্রকুমারী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন, কুলজি-লেখক এ সংবাদ দিতেও ভুলেন নাই। কথিত আছে, আদিমল্ল ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ্য স্থাপন করেন। রাজ-পঞ্জীর লেখক এতটা ঠাট বজায় রাখিয়াছেন যে, উহাতে কোন তত্ত্বই বাদ পড়ে নাই। ইহাতে সপ্তম শতাব্দী হইতে রাজাদের প্রত্যেকের নাম ও তারিখ ঠিক মত দেওয়া আছে। এত দীর্ঘ কালের এরূপ সন-তারিখ সংবলিত ইতিহাস বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন রাজবংশের

* বন-বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে এই সন্দর্ভটি আমরা অভয়পদ মল্লিক মহাশয়ের বিষ্ণুপুরের উৎকৃষ্ট ইংরেজী ইতিহাস, বিশ্বকোষের ঐ শব্দ এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর মূলতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিলাম।

নাই। তালিকাটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; রাজাদের নাম ও অভিষেকের সময় ইহাতে দেওয়া হইল।

আদি মল্ল (রঘুনাথ) ৬৯৪ খৃঃ, মল্লাব্দ ১। জয় মল্ল ৭০৯ খৃঃ অঃ। বেণু মল্ল ৭২০। কিনু মল্ল ৭৩৩। ইন্দ্র মল্ল ৭৪২। কানু মল্ল ৭৫৭। ধ্রব মল্ল ৭৬৪। শূর মল্ল ৭৭৫। কনক মল্ল ৭৯৫। কন্দর্প মল্ল ৮০৭। সনাতন মল্ল ৮২৮। খড়্গ মল্ল ৮৪১। দুর্জ্জন মল্ল ৮৬২। যাদব মল্ল ৯০৬। জগন্নাথ মল্ল ৯১৯। বিরাট মল্ল ৯৩১। মাধব মল্ল ৯৪৬। দুর্গাদাস মল্ল ৯৭৭। জগৎ মল্ল ৯৯৪। অনন্ত মল্ল ১০০৭। রূপ মল্ল ১০১৫। সুন্দর মল্ল ১০২৯। কুমুদ মল্ল ১০৫৩। কৃষ্ণ মল্ল ১০৭৪। রূপ মল্ল (২য়) ১০৮৪। প্রকাশ মল্ল ১০৯৭। প্রতাপ মল্ল ১১০২। সিন্দুর মল্ল ১১১৩। সুখময় মল্ল ১১২৯। বনমালী মল্ল ১১৪২। যদু মল্ল ১১৫৬। জীবন মল্ল ১১৬৭। রাম মল্ল ১১৮৫। গোবিন্দ মল্ল ১২০৯। ভীম মল্ল ১২৪০। কত্তার মল্ল ১২৬৩। পৃথ্বী মল্ল ১২৯৫। তপ মল্ল ১৩১৯। দীনবন্ধু মল্ল ১৩৩৪। কানু মল্ল (২য়) ১৩৪৫। শূর মল্ল (২য়) ১৩৫৮। শিবসিংহ মল্ল ১৩৭০। মদন মল্ল ১৪০৭। দুর্জ্জন মল্ল (২য়) ১৪২০। উদয় মল্ল ১৪৩৭। চন্দ্র মল্ল ১৪৬০। বীর মল্ল ১৫০১। ধাড়ি মল্ল ১৫৩৯। বীরহাম্বির ১৫৮৭। ধাড়ি হাম্বির ১৬২০। রঘুনাথ সিংহ ১৬২৬। বীর সিংহ ১৬৫৬। দুর্জ্জন সিংহ (৩য়) ১৬৮২। রঘুনাথ সিংহ (২য়) ১৭০২। গোপাল সিংহ ১৭১২। চৈতন্য সিংহ ১৭৪৮-১৮০২।

চৈতন্য সিংহ পর্য্যন্ত মল্ল-রাজারা ১১০৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। চৈতন্য সিংহ এই তালিকার ৫৬ সংখ্যক নৃপতি। এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহাদের কুলপঞ্জী অবশ্যই রাজগৃহে সুরক্ষিত ছিল, সুতরাং নাম সম্বন্ধে গোল হইবার সম্ভাবনা অল্প—তারিখও প্রত্যয়-যোগ্য বলিয়াই মনে হয়,—কারণ আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই বংশের লোকেরাই শাসন করিয়াছিলেন। অধিকার যদি অপর কোন বংশের হাতে যাইয়া পড়িত, তবে ধারা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং গোঁজামিল দিয়া বংশাবলী প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইত। এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। কিন্তু তথাপি দৃষ্ট হইবে যে, বীর হাম্বিরের পর হইতে রাজারা মল্ল উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ধাড়ি হাম্বিরের ভ্রাতা রঘুনাথের সময় হইতে সমস্ত রাজাই 'সিংহ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এত দীর্ঘকাল যে 'মল্ল'-উপাধি বংশগত ছিল, তাহা সহসা তাঁহারা ছাড়িলেন কেন? নবাবেরা এই উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যয়যোগ্য নহে। ইসা খাঁ যেভাবে দিল্লীশ্বর হইতে মসনদআলি উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া স্বীয় গৌরব বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, মল্ল-রাজারাও হয়ত সেইভাবে নবাবের দত্ত উপাধি বলিয়া শ্লাঘা করিয়াছেন। এইরূপ অনুমান করার কারণ আছে। প্রকৃত পক্ষে উপাধিটি রাজাদের স্বকৃত। উহা জাতে উঠিবার উপায় মাত্র, এবং স্বকৃত-উপাধি; বস্তুতঃ 'সিংহ' শব্দ এত বহুল যে উহা নবাব-দত্ত উপাধির মত শোনায় না। "মাণিক্য" উপাধিটার বরং একটা গৌরব আছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই মল্লজাতীয় রাজাদিগকে প্রকৃত শিক্ষিত ও সুসভ্য করিয়াছিল—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বৈষ্ণবদের প্রভাবেই রাজারা এই 'মল্ল' উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—কেন ছাড়িয়া ছিলেন তৎসম্বন্ধে প্রত্যেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "ক্ষত্রিয় সিংহ উপাধি-গ্রহণের পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজারা বহু শতাব্দী

বাবং আপনাদিগকে 'মল্ল' (অনার্য্য উপাধি) বলিয়া পরিচয় দিতেন, এবং এখন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ইহাদিগকে 'বাগদী রাজা' বলিয়া জানে—তাহা ছাড়া স্থানীয় নানারূপ প্রবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিষ্ণুপুরের রাজারা বহুকাল স্বাধীন এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী ছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহারা ক্ষত্রিয়—কিন্তু ইঁহারা বংশগত ক্ষত্রিয় ছিলেন না। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরের রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের যে দাবী, উত্তর-পশ্চিমে রাজপুত এবং তথা-কথিত মৌলিক ক্ষত্রিয়দেরও সেই দাবী – অর্থাৎ ইঁহারা বহু যুগ রাজ্যশাসন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী হইয়াছিলেন।"

এই রাজাদের প্রতাপ এত বেশী হইয়াছিল যে, বহিঃশত্রুরা ইঁহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। পাহাড়-বেষ্টিত বিষ্ণুপুর নিজেকে নিজে রক্ষা করিয়াছে। বিষ্ণুপুরে ৭টি বাঁধ (বন্ধ) ছিল। এই বন্ধের এক একটি সুগভীর জলপূর্ণ হ্রদ-বিশেষ। নৌকা লইয়া নানারূপ ক্রীড়ায় ইহাদের সুনির্ম্মল জলরাশি অহঃরহ আন্দোলিত হইয়া থাকে। বাঁধের জল নিয়ে ছাড়িয়া দেওয়ার উপযোগী ব্যবস্থা আছে—ঐ জলে কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু এই বাঁধের জল প্রবলবেগে ছাড়িয়া দিলে উপকূলবর্ত্তী স্থানগুলি বন্যাবিধৌত হইয়া যায়—বিপক্ষ সৈন্যদিগকে এই বহতা স্রোত তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহা বিষ্ণুপুরের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ; শত্রুসৈন্য এই বাঁধা অতিক্রম করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত এ রাজ্যের কিছুই করিতে পারে নাই। বিষ্ণুপুরের পূর্ব্বে তিনটি বাঁধ আছে—লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ এবং শ্যামবাঁধ। পশ্চিমে যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ এবং গণ্টনবাঁধ। নগরের মধ্যভাগে পোকাবাঁধ। পাহাড়িয়া জল নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার পথে খুব উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীরের আবেষ্টনী দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ইহাই বাঁধে পরিণত হইয়াছে। বাঁধগুলি খুব বৃহৎ—ইহাদের একটি এক বর্গ মাইলের অষ্টমাংশ ব্যাপক। পূর্ব্বে এই বাঁধ-গুলির পাড়ে রাজাদের মনোরম পুষ্পোদ্যান ছিল, রাজারা নানাদেশ হইতে পুষ্পতরু আনাইয়া ইহাদের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত কলিকাতার শাসনকর্ত্তা হলওয়েল সাহেবের বিবরণীতে লিখিত আছে : "কিন্তু এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধায় বিষ্ণুপুর ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন রাজ্য, কারণ যে কোন সময় রাজা ইচ্ছা করিলে বাঁধের মুখ খুলিয়া দিয়া বিপক্ষ পক্ষকে ধ্বংস করিতে পারেন। সুজা বাদসাহের রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি বহু অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন কিন্তু বিষ্ণুপুরাধিপতি একটি বাঁধের মুখ খুলিয়া দেওয়াতে মোগল সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল—তাহাদের একটিও জীবিত ছিল না। তদবধি বিষ্ণুপুর অধিকার করিতে আর কেহ চেষ্টিত বা সাহসী হয় নাই।.........সুতরাং এই রাজারা কখনই মোগলদিগের অধীন হন নাই।" মাঝে মাঝে "দিল্লীশ্বরও বা জগদীশ্বরো বা"—এই ভারতব্যাপী প্রবাদের প্রতি খাতির দেখাইয়া বিষ্ণুপুরের রাজারা সেলামী স্বরূপ কোন বৎসর ১৫,০০০, কোন বৎসর ২০,০০০ টাকা মোগল সরকারে সেলামী পাঠাইতেন আবার কোন কোন বৎসর একটি পয়সাও দিতেন না। সুতরাং ব্যাপারটা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন দাঁড়াইয়াছিল।

বিদেশী পর্য্যটকেরা বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার

অত্যুক্তির মত শোনায়। জগৎময় যেন একটা উত্তপ্ত মরুভূমি, বিষ্ণুপুর তন্মধ্যে ওয়েসিসের মত। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, "In this district are the only vestiges of the beauty, purity, regularity, equity and strictness of ancient Indoostan-Government. Here the property as well as the liberty of the people are inviolate, here no robberies are heard of either private or public" (Interesting Historical Events, by Holwell, published in 1765).

ইহার মর্ম্মার্থ—"এই জেলায় প্রাচীন হিন্দু শাসন-তন্ত্রের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং ন্যায়পরতার একখানি জীবন্ত চিত্র রহিয়া গিয়াছে; এই দেশের মত আর কোথাও তাহা নাই। প্রজাদের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি এখানে সুরক্ষিত, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য কাহারো নাই। এখানে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে দস্যুবৃত্তি কোথাও সংঘটিত হয় না।"

ফরাসী পর্য্যটক এ্যাবি রেনেল লিখিয়াছেন :—"এই দেশকে প্রকৃতি এমন ভাবে নিরাপদ্ করিয়া রাখিয়াছেন যে অধিবাসীদের চরিত্রের মাধুর্য্য এবং হৃদয়ের আনন্দ সেই আদিকাল হইতে একভাবে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের হস্ত কখনই নর-রক্তে রঞ্জিত হয় না। ইহারা চারিদিকে জলের দ্বারা এরূপ সুরক্ষিত যে, বাঁধ খুলিয়া দিলেই সমস্ত দেশ ডুবিয়া যায়। কতবার বাহিরের শত্রু এই ভাবে ধ্বংস পাইয়াছে। ফলে আর কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না।"

বাহিরের লোক এদেশে আসিলে যেরূপ আতিথ্য পাইত, য়ুরোপীয় লেখকেরা একবাক্যে তাহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, "কোন বিদেশী—বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অথবা শুধু দেশ-ভ্রমণার্থ—যে মুহূর্ত্তে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করেন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি রাজ-অতিথি বলিয়া গণ্য হন। সরকারী ব্যয়ে তাঁহার শরীর-রক্ষী নিযুক্ত হয়,—তাঁহার চলাফেরা প্রভৃতির যাহাতে সুবিধা হয়—প্রতি-পদে এই সকল লোক তাহা সম্পাদন করিতে আদিষ্ট হয়। প্রথম রক্ষীর দল কতক দিন পরে তাঁহাকে তদ্রূপ দ্বিতীয় একটি দলের নিকট সমর্পণ করে—এই ভাবে এক দলের কর্ত্তব্য শেষ করার সময় পর্য্যটক মহাশয়কে ইহাদের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করা হয় এবং ইহাদের ব্যবহারে কোন ত্রুটি হয় নাই, প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট তদ্রূপ একখানি লিখিত সার্টিফিকেট দিতে হয়। এই ভাবে ক্রমাগত এক দলের পর অপর দলের রক্ষকদিগের সঙ্গে তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করেন। যে দিন বিষ্ণুপুরে তিনি পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতে তাঁহার আহারাদি ও থাকিবার ব্যবস্থা সমস্তই রাজব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তাঁহার সঙ্গের দ্রব্যাদি বহন প্রভৃতি আনুসঙ্গিক সমস্ত খরচ রাজা দিয়া থাকেন। কোন পীড়া বা দৈব বাধা উপস্থিত না হইলে একস্থানে তিন দিনের বেশী থাকিলে অবশ্য পর্য্যটকের নিজেই ব্যবস্থা নিজেই করিতে হয়। রাজ্যের মধ্যে যদি কেহ কোন জিনিষ হারায়, তবে যে তাহা কুড়াইয়া পায়—সে তৎক্ষণাৎ

নিকটবর্ত্তী গাছের উপর তাহা ঝুলাইয়া রাখিয়া চৌকিদারকে খবর দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ সরকার হইতে সর্ব্বত্র ঢোল পিটাইয়া দিয়া ঐ সামগ্রীর স্বামীকে আমন্ত্রণ করা হয়।

য়ুরোপীয় পর্য্যটকেরা যে প্রশংসা করিয়াছেন,—তাহার অতি অল্প অংশ মাত্র উপরে উদ্ধৃত করিলাম। সে রাজ্যে চুরি, ডাকাতি ছিল না,—সেখানকার সকল লোকই মূর্ত্তিমান সৌজন্য এবং সরলতার বিগ্রহ। এই রাম-রাজ্য আবহমান কাল হইতে এই ভাবে চলিয়া আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বীর হাম্বির রাজা স্বয়ং দস্যুপতি ছিলেন এবং ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে জনসাধারণ রাজা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কষ্টে থাকিত, তাহা দেউলী-নিবাসী কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কথোপকথনে প্রতীয়মান হয় (প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবগণের প্রভাবেই এই দেশ হিন্দুর আদর্শ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই আদর্শ সনাতন কাল হইতে হিন্দু-শাসিত দেশে পালিত হইয়া আসিয়াছিল। ম্যাগেস্থেনিস, ফাহায়েন প্রভৃতি সমস্ত বিদেশী পর্য্যটক এই বিষয়ে একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মার্কো পোলো হিন্দু-শাসিত এক দেশ দেখিয়া (১২৯৮-৯৯) লিখিয়া গিয়াছেন,—"অধিবাসীদের অনেকে বণিক্ এবং সকলেই বিশ্বাসী ও রাজভক্ত, ইঁহারা কোন কারণেই কখনও মিথ্যা কহেন না, এবং জগতে ইঁহাদের মত সাধু দ্বিতীয় কোন জাতি নাই। ইঁহারা মাংস আহার করেন না, মদ্যপান করেন না এবং পরস্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হন না—ইঁহাদের জীবন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র।"

বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে ফরাসী এ্যাবে রেনল (Abbe Raynal) লিখিয়াছেন—"যে সকল সাম্রাজ্য পৃথিবীর পীড়ক, অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এই বিষ্ণুপুরের কত তফাৎ। এই রাজ্যের ভিত্তি সুশৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মনীতি, যাহা চিরকাল অক্ষয়। অত্যাচারীদের রাজ্য বুদ্বুদের মত উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয়—কিন্তু এইরূপ রাজ্যের ধ্বংস নাই।" *

বিষ্ণুপুরের এই যুগ বৈষ্ণবদের প্রবর্ত্তিত। হলওয়েলের সময় (১৭৬৫ খৃঃ) রাজধানী ও তৎসন্নিকটে ৩৬০টি মন্দির ছিল। ইহাদের অনেকগুলিই বীর হাম্বির ও তাঁহাদের বংশধরদিগের দ্বারা গত ৩৫০ বৎসরের মধ্যে রচিত। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম মাধুর্য্যের সেরা। এই প্রেম ও অনুরাগপূর্ণ ধর্ম্ম জনসাধারণকে শিল্পকলায় দীক্ষিত করিয়াছিল—সেই প্রেরণায় যে কি সুফল ফলিয়াছিল, তাহা মন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে।

হিন্দু রাজাদের আদর্শ শান্তি। বর্ত্তমান প্রতীচ্য জগতের উদ্দেশ্য অশান্তি ও অবিরত কলহ। কে কাহার মাথা ডিঙ্গাইয়া বড় হইতে পারে—ইহাই প্রতীচ্য জীবনের লক্ষ্য। যে অপরকে ডিঙ্গাইয়া উঠিবে, বাঁচিয়া থাকিবার তাঁহারই দাবী—অপরের মৃত্যু অনিবার্য্য। Survival of the fittest নীতির ইহাই মর্ম্মকথা। হিন্দু সকলকে লইয়া বিনা দ্বন্দ্বে,

* History of Bishnupur Raj by A. P. Mallik, B.A., B.T., p. 132 (1921).

বিনা হিংসায়, বিনা প্রতিযোগিতায় এক সূতায় গাঁথা ফুলগুলির মত সর্ব্বজাতির সমন্বয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকে তাঁহাদের সামাজিক পরম লক্ষ্য মনে করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বার্থ উগ্রমূর্ত্তিতে অপরকে ধ্বংস করিবার জন্ম স্পর্দ্ধার খড়্গ হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অদৃষ্টের রহস্য এই যে, আমরা বিশ্বের সংহারিণী-শক্তি কালী-মূর্ত্তির পূজক এবং প্রতীচ্য জগৎ ক্ষমার অবতার যিশুর উপাসক।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম জগতকে কিরূপ পুণ্যময় করিতে পারে, বন-বিষ্ণুপুর কয়েক শতাব্দীর জন্ম সর্ব্বসমক্ষে সেই চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছে।

এখানে বিষ্ণুপুর রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি।

আদিমল্ল সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। ইঁহার নাম 'রঘুনাথ' এবং ইনি বৃন্দাবন-সন্নিহিত জয়নগরের ক্ষত্রিয় রাজবংশে (বাগুল পরিবারে) জন্মগ্রহণ করেন। রত্ন ভ্রমরগড় নামক জয়নগরের এক স্থানে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। রাজা সিংহাসনচ্যুত হইয়া সস্ত্রীক পুরীধামে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে লোগ্রামে পূর্ণগর্ভা পত্নীর ভার মনোহর পঞ্চানন নামক এক ব্রাহ্মণকে দিয়া ও ভগীরথ গুহ নামক এক কায়স্থের হস্তে স্বীয় 'জয়শঙ্কর' খড়্গ অর্পণ করিয়া স্বয়ং তীর্থ-দর্শনে চলিয়া যান। রাজা তথায় বিসূচিকা রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। এদিকে একটি পুত্র জন্মিবার পরেই রাণী পরলোক-গমন করেন। নিরাশ্রয় পুত্রটিকে পঞ্চানন শিক্ষাদান করেন, এবং জনৈক বাগ্দিজাতীয় মল্লবীর ইঁহাকে মল্লক্রীড়ায় সুদক্ষ করে। বাঙ্গলার নানাস্থানে প্রচলিত গল্পের কথা ইঁহার কাহিনীতেও বাদ পড়ে নাই। নিদ্রিত বালকের (রঘুনাথ) মস্তকে একটা বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ইঁহাকে রৌদ্রে ছায়া দান করিয়াছিল। সুতরাং ইনি যে রাজা হইবেন, তাহা সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিল। ইঁহার মূর্ত্তি সুদর্শন ছিল এবং সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে মল্লবিদ্যায় ইঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। প্রদ্যুম্ন-পুরের রাজা নৃসিংহদেব ইঁহার গুণপনার পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে লোগ্রাম ও তৎসন্নিহিত ছয়টি গ্রামের অধিকার প্রদান করেন। প্রদ্যুম্নপুরের রাজার অধীন জটবিহারের রাজা বিদ্রোহী হওয়াতে আদিমল্ল (রঘুনাথ) বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত হইয়া বিজয়ী হন—সুতরাং রাজা সন্তুষ্ট হওয়ায় সেই রাজ্যের অধিকারও আদিমল্লকে প্রদান করেন। পঞ্চানন আদিমল্লের সভাসদ্ ও মন্ত্রিরূপে রাজ্য শাসনে সহায়তা করিতেন।

আদিমল্লের অভিষেক—৬৯৫-৭০৯ খৃঃ।

আদিমল্লের পর তৎপুত্র জয়মল্ল ৭০৯ খৃঃ অব্দে রাজা হন। তাঁহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা প্রদ্যুম্নপুরের রাজার সঙ্গে বিবাদ। প্রদ্যুম্নপুরের রাজা সেই অঞ্চলের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন এবং আদিমল্ল ইঁহারই আশ্রিত ছিলেন। কিন্তু মল্লরাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা দর্শনে ভীত ও ঈর্ষাতুর হইয়া নরসিংহ দেব (প্রদ্যুম্নপুরের রাজা) তাঁহাকে দমাইয়া রাখিবার জন্ম বিবিধ ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। জয়মল্ল প্রদ্যুম্নপুর আক্রমণপূর্ব্বক দুর্গ অধিকার করেন। রাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গ কানাই সরোবরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পান। কানাই সরোবর এখনও বিদ্যমান। জয়মল্ল প্রদ্যুম্নপুরেই তাঁহার

রাজধানী করেন। ক্রমেই এই রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিনুমল্ল (৭৩৩-৭৪২ খৃঃ) ইন্দাস স্বরাজ্যভুক্ত করেন। কানুমল্ল (৭৫৭-৭৬৪ খৃঃ) ককৃতা অধিকার করেন, শুরমল্ল (৭৭৫-৭৯৫ খৃঃ) অধুনা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বগড়ী পরগনা স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া নানা যুদ্ধে বিজয়ী হন। খড়্গমল্ল (৮৪১-৮৬৪ খৃঃ) অধুনা খড়্গপুর নামধেয় অঞ্চলটা জয় করিয়া স্বীয় নামানুসারে নগর স্থাপন করেন।

জগৎমল্ল (৯৯৪-১০০৭ খৃঃ) রাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থাপিত করিয়া মন্দির ও প্রাসাদে তৎস্থান ছাইয়া ফেলেন এবং বিষ্ণুপুরকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। শূন্যপুরাণের লেখক রামাই পণ্ডিত তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

রামমল্ল (১১৮৫-১২০৮ খৃঃ) ও শিবসিংহমল্ল প্রভৃতি রাজাদের সময় বিষ্ণুপুরের শ্রী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জগৎমল্ল সৈন্যদের শৃঙ্খলা, দুর্গাদি নবপদ্ধতিতে নির্ম্মাণ এবং সময়োপযোগী অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়া রাজ্যের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং শিবমল্ল বিষ্ণুপুর-রাজসভা সংগীতবিদ্যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মল্লরাজারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। বাহিরের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অল্পই ছিল। বীর হাম্বিরের পিতা ধাড়িমল্ল (১৫৩৯-১৫৪৭ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম বঙ্গাধিপের অধীনত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এই অধীনত্ব নামে মাত্র ছিল। একটা রাজস্ব দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাজারা যখন যাহা ইচ্ছা দিতেন এবং কোন কোন সময় কিছুই দিতেন না। বীর হাম্বির রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি এক সময় বঙ্গ-বিজয় করিবার কল্পনাও তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল।

৪৯শ সংখ্যক নৃপতি এই বীর হাম্বির (১৫৮৭-১৬২০ খৃঃ) বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা রাজশ্রীর কুণ্ডলে নূতন মূল্যবান্ মণিমুক্তা সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। এই পুস্তকের ৭৫২-৫৬ পৃষ্ঠায় তৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে।

বীর হাম্বিরের সময় হইতে চৈতন্য-সিংহের (১৭৪৮-১৮০২ খৃঃ) রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজধানী বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। বাঙ্গলার শিল্প ও স্থাপত্য-লক্ষ্মী বিষ্ণুপুর রাজাদের বাহু আশ্রয় করিয়া সগৌরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। হলওয়েল সাহেব যে বিষ্ণুপুর ও তদুপান্তে ৩৬০টি মন্দিরের কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই ১৬০০-১৮০২ খৃঃ অব্দ মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র সর্ব্বপ্রথম ছিল—নবদ্বীপ। চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপের আলোক নিবিয়া যায়। চৈতন্য অষ্টাদশ বৎসর পুরীতে ছিলেন, তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত সেই আলোককেন্দ্র পুরীধামে প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরে কয়েক বৎসর—১৫৩৩ হইতে ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ অধিক অর্দ্ধ শতাব্দীকাল সেই আলোক বৃন্দাবনে জ্বলিতে থাকে, ষট্ গোস্বামীরা এই আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহাদের স্বর্গারোহণের পরে—বিশেষ জীবগোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের সহিত এই আলোক বৃন্দাবনে কতকটা নির্ব্বাপিত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্যের

প্রভাবে বিষ্ণুপুরে এই শিখা প্রজ্বলিত হয়। পূর্ণ দুই শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের রাজসভাই বৈষ্ণব শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বীর হাম্বির 'চৈতন্য দাস' নাম গ্রহণ করিয়া কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন; নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে তাহাদের কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবন তীর্থের এতটা অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, সেই তীর্থ সংক্রান্ত কতকগুলি নাম স্বীয় অধিকারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের কয়েকটি দীঘির সেইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন যথা,—কালিন্দী, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড এবং কয়েকটি গ্রামের দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যকে তাঁহার রাজ্যে চিরদিনের জন্য রাখিবার জন্য বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সংঘটন করিয়াছিলেন। তিনি কুরমান খাঁ নামক মুসলমান সাধুকে নিজ রাজ্যে বাস করিবার জন্য নিষ্কর জমি দিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব ভক্ত বাবা আউল মনোহর দাসের জন্য (দীনমণি চন্দ্রোদয়ের লেখক) বন্দনগ্রাম ও সোনামুখীতে দুইটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বীর হাম্বিরের পুত্র ধাড়ি হাম্বিরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ সিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন (১৬২৬ খৃঃ)।

বীরসিংহ দ্বিতীয় আরাঙ্গেবের মত স্বীয় বংশের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর ছিলেন (১৬৫৬-৮২ খৃঃ)। তিনি তাঁহার ভ্রাতা মাধব সিংহকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। অপর ভ্রাতা ফতে সিংহ পলাইয়া যাইয়া রায়পুরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত করেন। বীরসিংহ তাঁহার নিজ তিন পুত্রকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুই পুত্র হত্যার পর জল্লাদের দয়াগুণে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিষ্কৃতি পান। কিন্তু রাজাকে জানান হয় যে, তাঁহার তিন কুমারকেই হত্যা করা হইয়াছে। তিনি অনেক ব্রহ্মোত্তর জমি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রতিবাদ করাতেই মাধবসিংহ প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্দান্ত শাসনে কাহারও কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। প্রজাদিগকে তিনি প্রাচীরের মধ্যে গাঁথিয়া হত্যা করিতেন। মালিয়ারার জমিদার মনিরাম বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি তাঁহাকে পরাভূত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কথিত আছে বৃদ্ধ বয়সে যখন তিন রাজকুমারকে হত্যা করার দরুন তাঁহার মনে ঘোর অনুতাপ হইয়াছিল, তখন তাঁহার কর্ম্মচারীরা মুক্তিপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্জ্জন সিংহকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাজা আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আরাঙ্গেবের সঙ্গে বীরসিংহের এই স্থানে একটু তফাৎ। আরাঙ্গেব তাঁহার দুষ্কৃতির জন্য একদিনের জন্যও অনুতপ্ত হন নাই।

রঘুনাথ সিংহ (দ্বিতীয়) মোগলদের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্রোহী শোভা সিংহ ও রহিম খাঁকে পরাস্ত করেন। শোভা সিংহের কন্যাকে তিনি পাটরাণী করেন এবং মৃত রহিম খাঁর পত্নী লালবাইকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসেন। এই রমণী অনিন্দ্যসুন্দরী, সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ও মধুকণ্ঠী ছিলেন। রাজা ইহার অনুরাগে মজিয়া আত্মবিস্মৃত

হইয়া পড়িলেন। এক বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহার নামানুসারে লাল-বাঁধ নামে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইলেন। রাজা দিন-রাত লালবাইএর কাছে পড়িয়া থাকিতেন। মহাবৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি লালবাইএর সঙ্গে মুসলমানী খানা খাইতেন,—রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের কোনও খোঁজ খবর লইতেন না; মন্ত্রীরাই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইহার পরে এক সর্ব্বনাশের ব্যাপার ঘটিল। লালবাই রাজাকে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, রাজা শুদ্ধ একদিনে একসময়ে সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীদিগকে মুসলমান হইতে হইবে—এই আব্দার করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি সত্বেও এবংবিধ সর্ব্বনাশকর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন এবং বিনয়ের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। মুসলমানী রাজাকে হাতের মুঠোর ভিতর পাইয়াছিল, সে তাহার নিজ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া একটা অমোঘ অস্ত্র সন্ধান করিল। রাজা যদি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে সে বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। রাজা অকূল চিন্তাসাগরে পড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং অবশেষে মুসলমানীর আব্দার রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষ্ণুপুরের শ্মশানঘাটের নিকট নূতন মহলের পশ্চিমে এখনও ভোজনতলা বলিয়া যে স্থানটি বিদ্যমান, তথায়ই রাজ্যশুদ্ধ সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তির আহারের বিরাট্ আয়োজন হইতে লাগিল। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপুরের শতসহস্র নরনারী আতঙ্কিতভাবে তথায় উপস্থিত হইতে বাধ্য হইল—সেই নিমন্ত্রণ যিনি উপেক্ষা করিবেন, সপরিবারে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এদিকে রাজপরিবারে গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। গোপালসিংহ ও মহারাজ্ঞী স্বয়ং রাজার প্রধান মন্ত্রীদিগকে লইয়া পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। লালবাইএর তত্ত্বাবধানে মুসলমানী খানা পরিবেষণের আয়োজন হইতেছিল। হঠাৎ মহারাজ্ঞীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত এক বাণে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। লালবাইকে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া দীঘিতে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে সেই দীঘি হইতে কতকগুলি মুসলমানী ভোজনপাত্র ও একটা নরকঙ্কাল উত্তোলিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের নূরজাহান—লালবাইএর ইহাই কি পরিণাম ও শেষচিহ্ন?

মহারাজ্ঞী স্বামীকে হত্যা করিয়া তাঁহারই চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর লালবাইএর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা হইল। রাজা ও মহারাজ্ঞী যে স্থানে একত্র দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে। এই রাজ্ঞীকে লোকে "পতিঘাতিনী সতী" আখ্যা দিয়াছিল। প্রজার কল্যাণার্থ এবং ধর্ম্মের জন্য তিনি প্রাণপ্রিয় পতিকে হত্যা করিয়া তাঁহারই চিতায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তাই একাধারে সতী ও পতি-ঘাতিনী বটেন। পরবর্তী রাজা গোপালসিংহ সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ নৃপতি ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে তিনি একটু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়া কতকটা উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রজাকে তিনি প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দীনতম

প্রজাও এই নিয়ম পালন না করিলে দণ্ডিত হইত। এই নিয়ম পালন করা হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি অনেকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই জপের ব্যাপারটা বিষ্ণুপুরে "গোপালসিংহের বেগার" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যসিংহের দীর্ঘ রাজত্ব (১৭৪৮-১৮০২) কাল বর্গীর হাঙ্গামা ও তাঁহার পৌত্র দামোদরসিংহের বিদ্রোহ প্রভৃতিতে অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমরা ইহার রাজত্ব সম্বন্ধে আর কিছু লিখিব না, যেহেতু মোগল-রাজত্ব পর্য্যন্ত এই ইতিহাসের সীমা। চৈতন্যসিংহের সময়ই রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা পীড়িত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির করতলগত হয়।

রঘুনাথসিংহের সময় বিষ্ণুপুরের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। যে সাতটি বাঁধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাঁচটিই রাজা রঘুনাথ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি ৯২৮ মল্লাব্দে মল্লেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেন:—"বসুকরনবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন। অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু॥"

মল্লেশ্বর—১৬২২ খৃঃ।

এই শিলালিপিযুক্ত মন্দিরটি রাজা তাঁহার পিতা বীরসিংহের নামে উৎসর্গ করেন, বন-বিষ্ণুপুরের ইতিহাস-লেখক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ৯২৮ মল্লাব্দে রঘুনাথ রাজা হন নাই। বসু কর নব=৯২৮ (অঙ্কের বামাগতি ধরিয়া)। বীরমল্লের রাজত্ব ৮০৭ হইতে ৮৪৫ মল্লাব্দ। আমার মনে হয়—বীরমল্লই বীরসিংহ বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন এবং মল্লেশ্বরের মন্দির বীরমল্ল-প্রতিষ্ঠিত। অপর অপর যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের যেগুলিতে তারিখ দেওয়া আছে, তাহাদের সঙ্গে রাজপঞ্জীর তারিখ মিলাইয়া—কোন্ রাজা কোন্ মন্দির স্থাপন করিয়াছেন—তাহা জানা যাইতে পারে।

শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির—"শ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে শশাঙ্কবেদাঙ্কযুক্তে নবরত্নম্, শ্রীবীর-হাম্বীর নরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।" মল্লাব্দ ৯৪৮=১৬৪৩ খৃঃ।

শ্যামরায়।

জোড়-বাঙ্গলা মন্দির—"শ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে সুধাংশুরসাঙ্কমে সৌধগৃহং শকেঽঙ্কে। শ্রীবীরহাম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।" ৯৬১ মল্লাব্দ=১৬৫৫ খৃঃ।

কালাচাঁদের মন্দির "শ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে শকে দ্বিরসাঙ্কযুক্তে নবরত্ন-মেতৎ। শ্রীবীরহাম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।" ৯৬১ মল্লাব্দ=১৬৫৫ খৃঃ।

জোড় বাঙ্গলা—১৬৫৫ খৃঃ।

লালজীর মন্দির—"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-মুদে শকেঽব্ধিরসাঙ্কযুক্তে নবরত্নমেতৎ। মল্লাধিপঃ শ্রীরঘুনাথসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীযুতবীরসিংহঃ।" ৯৬৪ মল্লাব্দ=১৬৫৮ খৃঃ।

লালজী—১৬৫৮ খৃঃ।

মুরলীমোহন মন্দির—"শ্রীশ্রীচুর্জ্জনসিংহভূপজননী মল্লাবনীবল্লভঃ। শ্রীল-শ্রীযুক্তবীরসিংহ-মহিষী শ্রীলশ্রীচূড়ামণিঃ। মল্লাব্দে শশিসপ্তচন্দ্রবিমিতে শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ সৌধগৃহং হ্যবেদয়দিদং পূর্ণেন্দুতোঽপ্যুজ্জ্বলম্।" মল্লাব্দ ৯৭১=১৬৬৫ খৃঃ

মুরলীমোহন—১৬৬৫ খৃঃ।

মদনগোপাল মন্দির—"রাধাকৃষ্ণপদপ্রাপ্তে সোমসপ্তাঙ্কগে শকে। রঘুনাথমহীনাথ-তনয়স্তোত্তমাশ্রয়াঃ। বীরসিংহনরেশস্ত ভীরবমানসংশয়া। মহিষ্যাতি প্রমোদ নবরত্নং সমর্পিতং ॥" ৯৭১ মল্লাব্দ=১৬৬৫ খৃঃ।

মদনগোপাল—১৬৬৫ খৃঃ।

মদনমোহন মন্দির—"শ্রীরাধাব্রজরাজেস্ নন্দনপদাম্ভোজ তৎপ্রীতয়ে। মল্লাব্দে ফণিরাজশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্ম্মলে। সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্দ্ধং স্বচেতোহংলিনা। শ্রীমদ্দুর্জ্জনসিংহভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা।" ১০০০ মল্লাব্দ=১৬৯৪ খৃঃ।

মদনমোহন—১৬৯৪ খৃঃ।

রাধাশ্যাম মন্দির—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ

শ্রীরাধাশ্যামচন্দ্রাজ্ঘ্রী সরসিজতলে দিব্যমেতৎ সুশোভং মল্লাব্দে বেদকালাম্বরবিধু গণিতে বাহলে পৌষমাস্তাং গেহং নানাবিচিত্রবিমিতিদৃঢ়ং পূজিত-কাপি ভক্তৈঃ শ্রীচৈতন্যো নৃপেন্দ্রঃ শুভকৃতিনিপুনঃ সম্প্রযচ্ছেৎ সভায়াম্।" শকাব্দ ১৬৮০=১৭৫৮ খৃঃ।

রাধাশ্যাম—১৭৫৮ খৃঃ।

রাধামাধব মন্দির—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

মল্লাব্দে গুণবেদখেন্দুগণিতে শ্রীরাধিকামাধবপ্রীত্যৈ সৌধমিদং সুধাংশুবিমলং মাঘে দদৌ চিত্রিতং। শ্রীশ্রীমল্লমহীমহেন্দ্রগুণবিদ্গোপালসিংহাত্মজ-শ্রীলশ্রীযুক্তকৃষ্ণসিংহমহিষী শ্রীশ্রীল চূড়ামণিঃ। সন ১০৪৩ সাল।" ১০৪৩ মল্লাব্দ=১৭৩৭ খৃঃ।

রাধামাধব—১৭৩৭ খৃঃ।

সঙ্গেশ্বর মন্দির—বিষ্ণুপুরের ৪ মাইল উত্তরে—একটি গুম্বজাকৃতি চূড়াবিশিষ্ট—কোন শিলালিপি নাই। উহা রাজা পৃথ্বীমল্ল কর্তৃক ৬৪১ মল্লাব্দে=১৩৩৫ খৃঃ অব্দে গঠিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরে প্রাচীন অনেক দেখিবার জিনিষ আছে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য বিখ্যাত দলমাদল (দালমর্দ্দন) কামান। কেহ কেহ বলেন "ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কামান। ইহা লালবাঁধ হ্রদের ধারে অবস্থিত। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে এখনও মরিচা ধরে নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৫½ ইঞ্চি। ইহার মুখ ১১½ ইঞ্চি এবং ভিতরটা সর্ব্বত্র ১৪½ ইঞ্চি। এই কামানের উপর ফারসীতে এই কথাটি উৎকীর্ণ আছে—এক লক্ষ পচিশ টাকা (বোধ হয় উহা সেই সময়কার নির্ম্মাণ করিবার ব্যয়)। ভাস্কর পণ্ডিত যখন বর্গী সৈন্য লইয়া বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দলমাদলে অগ্নি-সংযোগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন—এই ভাবের কথা-সূচক অনেক পল্লী-গীতি আছে। পরদিন প্রত্যূষে নাকি মদনমোহনের হাতে বারুদের কালী ও অঙ্গে বারুদের গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

কুচিয়াকোল-নিবাসী মল্লরাজ বংশে জাত যোগেন্দ্রনাথ সিংহের বাড়ীতে রঘুনাথ-সিংহের (১ম) খড়্গ সংরক্ষিত আছে। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এখনও ইহা ঠিক নূতনের মত আছে। এই খড়্গ অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ এবং ইহার মুখ সূচির মত সূক্ষ্ম, তাহা দিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করা যায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভুলুয়া বা নোয়াখালী

পূর্ব্বে বিশাল ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্গত বহু খণ্ড দেশ ছিল; চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের অনেকাংশ ত্রিপুরার রাজারা শাসন করিতেন। এখন যে স্থানটি নোয়াখালী জেলা, তাহার সকল অংশই যে সমুদ্র-জলে সদ্যঃস্নাত হইয়া মাথা জাগাইয়াছে, তাহা মনে হয় না। বরাহীমূর্ত্তি এই জেলারই কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছিল; এখনও নানা স্থানে হরগৌরী ও বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে—সেই সকল মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় না যে বিশ্বম্ভরশূর হইতেই এ দেশ জনপদে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বম্ভর হইতে বর্ত্তমান বংশধর যতীন্দ্র চৌধুরী ১৭ পুরুষ,—মাত্র ৫০০ বৎসরের কিছু উর্দ্ধকালের কথা; পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই দেশ প্রথম লোক-বসতিযুক্ত হইয়াছিল—ইহা বিশ্বাস্য নহে। ঐ সকল মূর্ত্তি বহু প্রাচীন; এবং এই জেলায় কতকগুলি দীঘি-পুষ্করিণী আছে—যাহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় নাই। হয়ত কোন সময়ে সুন্দরবনের মত এই স্থানের কতক অংশ জলের নীচে গিয়াছিল,—এই ভাবে লৌকিক প্রবাদ সমর্থিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই জেলার প্রথম রাজা বিশ্বম্ভর-শূর বঙ্গাধিপ আদিশূরের বংশ। বর্ত্তমান কালে জাতীয় যে সকল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে এই কথাটির উদ্ভব হইয়াছে। কারণ, এই বংশোদ্ভব লোকেরাও কিছু দিন পূর্ব্বে প্রবাদটি অবগত ছিলেন না। তাঁহারা নোয়াখালী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সঙ্কলনের সময় নিজেদের যে বংশাবলী দিয়াছিলেন—তাহাতে লিখিত আছে যে মিথিলার রাজা আদিশূরের নবম পুত্র বিশ্বম্ভরশূর চট্টগ্রামে তীর্থ দর্শনে আসিয়া বরাহীমূর্ত্তি লাভ করিয়া স্বপ্নাদেশে নোয়াখালীতে রহিয়া গেলেন এবং তথায় রাজ্য স্থাপন করিলেন। সুতরাং ইঁহারা মৈথিল রাজবংশ। গৌড়াধিপ আদিশূরের সমকালিক লোকদের ৩৭ হইতে ৪০ পর্য্যায়ে বংশের ধারা চলিতেছে,—কিন্তু এই নোয়াখালীর শূর-বংশের শেষ বংশধর তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর হইতে মাত্র ১৮শ পুরুষ। ইঁহারা যে মিথিলাধিপের বংশ তাহা যেরূপ নোয়াখালী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের দ্বারাও লিখিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাসে এই বংশকে মৈথিল রাজবংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তাঁহার রাজমালায় এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন:— "আদিশূরের বংশধর বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন" ইত্যাদি (রাজমালা, ৩৯২ পৃঃ)। আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার 'বারভূঞা' নামক পুস্তকে (১৪৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "এই স্থলে যে আদিশূরের কথা লিখিত হইল, তিনি বঙ্গদেশের নৃপতি আদিশূর নহেন, ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত।"

মিথিলার রাজবংশের তালিকা এইরূপ:—

১। আদিশূর ২। বিশ্বম্ভরশূর ৩। গণপতি ৪। সুরানন্দ খাঁ ৫। বিত্তানন্দ খাঁ ৬। বিজয় ঠাকুরতা ৭। রামভদ্র কর্ণশূর ৮। হরিদাস ৯। কবিকীর্ত্তিরশূ

১০। কৃষ্ণরাম ১১। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১২। নরোত্তম ১৩। রামরতন ১৪। গোপাল-কৃষ্ণ ১৫। নন্দকুমার ১৬। যতীন্দ্র (বিদ্যমান)। নবম সংখ্যক কবিকীর্ত্তিশূরের অন্ত পুত্র রাজা প্রসাদনারায়ণ রায়ের প্রপৌত্র রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মুসলমান জমিদার ইছা চৌধুরীর যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতিকা রচিত হইয়াছিল। উক্ত গীতিকাখানি স্থলে স্থলে অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট প্রমাণিত হওয়াতে বিচারালয় হইতে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি বহু সন্ধানে আদি গীতিকাটি আমি সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ২৯৫-৩৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন রাজাদের অধঃপতনের সময় তাঁহাদের রাজত্ব কিরূপ নৈতিক নরককুণ্ডে পরিণত হয়—এই গীতিকা তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। তথাপি এই গীতিকায় তাৎকালিক নোয়াখালী-সমাজের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—তাহা পল্লীকবির কল্পনামিশ্রিত একখানি ঐতিহাসিক পট।

মিথিলাধিপতি শূররাজারা বঙ্গীয় রঘুনন্দনের ব্যবস্থা মান্য করেন নাই। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যবস্থা অনুসারেই দশক্রিয়া করিয়া থাকেন। আনন্দনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই বংশের গুরুপুরোহিতেরা সকলেই মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন" (বারভূঞা, ১৫ পৃঃ)। ভুলুয়ার শূরেরা কায়স্থকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে বঙ্গীয় কায়স্থ ছিলেন না। তেলিহাটী ও ভুলুয়া সম্পর্কে ঘটক কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

> "গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগে চ ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
> ইচ্ছামত্যা দক্ষিণেষু বিশাখাসু তদুত্তরে॥
> কায়স্থা অত্র বৈনস্তাঃ (?) ভিন্নদেশনিবাসিনাম্।
> ভুলুয়া-তেলিহাটীয়ৌ শূরাদিত্যৌ প্রশস্তকৌ॥"

আমরা শূর-বংশের যে তালিকা দিয়াছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। উত্তরকালে রাজাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভুলুয়া রাজ্য ১৪টি অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, সুতরাং ইঁহারা শেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক এক রাজার বহু ভ্রাতা হওয়াতে এই তালিকা একান্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যতীনবাবুর নিকট হইতে যে বংশলতা পাইয়াছি তাহা তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষদের শাখা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা "রাজমালায়" (ত্রিপুরার) প্রাচীন পুঁথি হইতে জানিতে পারিয়াছি যে নোয়াখালী বা ভুলুয়া রাজ্য এক সময়ে ত্রিপুরেশ্বরগণের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা-রাজ-বংশের এক রাজাকে হত্যা করিয়া যখন উদয়মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ভুলুয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। "দুর্লভনারায়ণ নামে শূর জমিদার। নৃপমান্তে বসে সে যে ভুলুয়া মাঝার॥ পূর্ব্বপুরুষ তাঁর ত্রিপুর সঙ্গে মিলে। নাহি মিলে উদয়মাণিক্য রাজ্য কালে॥" সুতরাং দেখা যাইতেছে—দুর্লভনারায়ণ নামে শূরবংশীয় এক ব্যক্তি

নৃপতির যোগ্য মর্য্যাদায় ভুলুয়াতে প্রস্তুত করিতেছিলেন। ভুলুয়ার পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বামীরা ত্রিপুরাধিপের অভিষেককালে সেই রাজদরবারে সামন্তরাজরূপে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু দুর্লভনারায়ণ উপস্থিত হন নাই। পরন্তু তিনি বলিয়া পাঠান "রাজবংশ মারিয়া তুমি উদয়-মাণিক্য। আমিও ভুলুয়া-রাজ তুমি সমকক্ষ॥" (রাজমালা, অমর খণ্ড।)

ত্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিক্য এই উত্তর পাইয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, কিন্তু নানা কারণে তিনি সামরিক অভিযান করিয়া ভুলুয়া আক্রমণ করিতে পারিয়া উঠিলেন না। অমরমাণিক্য রাজা হইয়াই ভুলয়ায় পুনরায় দূত পাঠান, কিন্তু দুর্লভনারায়ণের উত্তর এবার আরও প্রগল্ভ। "ত্রিপুরেশ্বরেরা আমার অধীন, আপনার সেই সিংহাসনে দাবী নাই।" এবার অমরমাণিক্য আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি এবার স্বয়ং তাঁহার চারি পুত্র সহ ৩৬,০০০ সৈন্য লইয়া ভুলুয়ায় রওনা হইলেন। সঙ্গে রাজার শ্যালক ছত্র-নাজির এবং উজির সিংহ-সরব নারায়ণ সেনাপতি হইয়া চলিলেন। পথে রাজা মহাসমারোহে কালীপূজা করিয়া ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সৈন্যেরা ভুলুয়া লুট-পাট করিতে লাগিল। এদিকে ভুলুয়াপতি দুর্লভনারায়ণ স্বয়ং মাত্র তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অধিকাংশ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পাঠান বংশীয়। ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে ইহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। এই যুদ্ধে অমরমাণিক্য দুর্লভনারায়ণ ভ্রমে এক ব্রাহ্মণ সেনাপতিকে গুলি দ্বারা হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। ভুলুয়া জয় করিয়া অমর-মাণিক্য বাকলা হইয়া ত্রিপুরায় ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ভুলুয়া ত্রিপুরেশ্বরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল—ভুলুয়ায় বলরাম শূর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই বৎসরই অমরমাণিক্য যে বিশাল অমরদীঘি খনন আরম্ভ করাইয়াছিলেন—সেই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত দেশ হইতেই রাজারা মজুর পাঠাইয়া ত্রিপুররাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভুলুয়াধিপ বলরাম শূর এই উপলক্ষে এক হাজার মজুর পাঠাইয়াছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসরে এই দীঘির খননকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। দুর্লভ-নারায়ণকে পরাস্ত করিয়া অমরমাণিক্য বাকলা দখল করেন—সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে বাকলা কন্দর্পরায় শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ভুলুয়ার যুদ্ধের পর এই রাজ্য হইতে জুগীদিয়া ও দাঁদড়া এই দুইটি পরগনা স্বতন্ত্র হইয়া যায়। তোদড় মল্ল এই তিন স্থানের রাজস্ব এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ভুলুয়ার রাজস্ব ১৩,৩১,৪৮০ দাম। জুগীদিয়া—৫,১২,০৮০ দাম। দাঁদড়া—৪,২১,৩৮০ দাম।

বিশ্বম্ভরশূর হইতে লক্ষ্মণমাণিক্য ৭ পুরুষ। কথিত আছে বিশ্বম্ভরশূর ১২০২ খৃষ্টাব্দে ভুলুয়ায় রাজপাট স্থাপন করেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের বংশাবলী কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় এইরূপ দিয়াছেন :—১। বিশ্বম্ভর ২। গণপতি ৩। সুরানন্দ ৪। দেবানন্দ ৫। কবিচন্দ্র ৬। রাজবল্লভ ৭। লক্ষ্মণমাণিক্য।

আমরা ত্রিপুরার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজমালা হইতে দেখাইয়াছি, ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে বাকলার রাজা কন্দর্পনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক বিজিত হন, এবং তিনি ভুলুয়ার রাজা দুর্লভনারায়ণের

সমসাময়িক। কন্দর্পনারায়ণ যখন যুবক, তখন দুর্লভনারায়ণ বৃদ্ধ—এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে, লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে কন্দর্প-পুত্র রামচন্দ্রেরই সংঘর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং লক্ষ্মণমাণিক্য ১৩০০ খৃষ্টাব্দ বা তৎসন্নিহিত কোন সময় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে বিশেষভাবে দমন করিয়াছিলেন এবং ইঁহার বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি শোনা যায়। কোন কারণে বাক্‌লাধিপতি কন্দর্পরায়ের পুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণমাণিক্যের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে লক্ষ্মণমাণিক্যকে রামচন্দ্র (প্রতাপাদিত্যের জামাতা) অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন।* রামচন্দ্র ভুলুয়ার রাজাকে অতিশয় আদর ও সম্মান দেখাইয়া প্রীতির অভিনয় করেন। সরল লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের রাজকীয় কোষ-নৌকায় উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক বাক্‌লা-(চন্দ্রদ্বীপ) নরেশ তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া তাঁহার সেনাপতি রামাই মাল (রামমোহন সিংহ—উজিরপুরনিবাসী কায়স্থ) ও অপরাপর লোক দ্বারা লোমহর্ষণ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নৃসংশভাবে হত্যা করেন। লক্ষ্মণ-মাণিক্য শুধু বীরাগ্রগণ্য ছিলেন না, তিনি সুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তদ্‌রচিত সংস্কৃত নাটক 'বিখ্যাত বিজয়' মধ্য-যুগের বঙ্গের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণ বধ—এই নাটকের বিষয়। কথিত আছে রামচন্দ্র শৃঙ্খলিত অবস্থায় নিরস্ত্রভাবে যে তালবৃক্ষের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা স্বীয় পৃষ্ঠের আঘাতে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন (ব্রজসুন্দর-বাবুর চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস দ্রষ্টব্য) এবং তিনি যুদ্ধ কালে যে বর্ম্ম পরিতেন—তাহার ওজন এক মন ছিল।

লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র বলরামশূরের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া অমর-দীঘির খনন কালে মজুর পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের পত্নী শশিমুখার শাসনকালে ভুলুয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়; ইহা ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তৎপরে এই প্রদেশ ১৪টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই ভাবে রাজ্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণের শাসনাধীন থাকিয়া ক্ষীয়মাণ হয়। এখন এই বংশের যাঁহারা আছেন, তাঁহারা মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ মাত্র। সেই বীর-প্রবর লক্ষ্মণমাণিক্য—যিনি মগদিগকে জয় করিয়া নানা যুদ্ধে স্বীয় বীরত্ব ও শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইয়াছিলেন,—যে শ্রুতকীর্ত্তি রাজা দুর্লভনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্যকে স্পর্দ্ধিত উত্তর দ্বারা অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন,—যে রাজা ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে গোলন্দাজদিগের টের-হিলিং নামক বৃহৎ জাহাজ জলমগ্ন হইলে তদারোহিগণকে অশেষ আদর-আপ্যায়ন করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন,—এবং যাঁহাকে ওলন্দাজ কাপ্তেন "বোলোয়ার" (ভুলুয়ার) প্রিন্স নামে অভিহিত করিয়াছিলেন—সেই সনামধন্য মহামান্য রাজাদের ভুলুয়া এখন আর নাই—

* আনন্দনাথ রায় মহাশয় এই হত্যা বিশ্বাস করেন না, কিন্ত এই ঘটনার প্রবাদ এত ব্যাপক এবং সাময়িক নানা গ্রন্থে উল্লিখিত যে রামচন্দ্রকে এই অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার চেষ্টা বিফল।

এখন উহা সন্দীপ, সিদ্ধি, হাতিয়া প্রভৃতি ৪৮টি দ্বীপের সমষ্টীকৃত নোয়াখালী জেলায় পরিণত হইয়াছে। বাবুপুরে এই বংশের রাজাদের বিশাল কামানটি পড়িয়া থাকিয়া ইহাদের পূর্ব্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে এবং "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতিকার বর্ণনা রাজবংশের অধঃপাতে যাওয়ার চিত্র গ্রাম্য-কল্পনায় সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়া বুঝাইতেছে—কি কি দোষে রাজলক্ষ্মী বিচলিত হইয়া চলিয়া যান।

'ভুল হওয়া' শব্দ হইতে ভুলুয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ গল্পগুজব পল্লীবৃদ্ধগণ শুনাইয়া থাকেন, এগুলি নিতান্তই বাজে বলিয়া বোধ হয়। কোন প্রমাণ না পাইয়া একটা শব্দ হাতে পাইলেই ইহারা উহা নিংড়াইয়া যথাসাধ্য ঐতিহাসিক রস দোহন করিতে থাকেন—এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুন্দরবন

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সুন্দরবন অঞ্চল সম্প্রতি সমুদ্র হইতে শির উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের এই "সম্প্রতির" অর্থ লক্ষ লক্ষ বৎসর,—সুতরাং ঐতিহাসিক আলোচনার সময় তাঁহাদের মতামত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

এ পর্য্যন্ত যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় সুন্দরবন অঞ্চলের পশ্চিম দিক্‌টাই খুব প্রাচীন। এই খানেই সুপ্রাচীন কপিল তীর্থ। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন ২৬ নং লাট কঙ্কণ-দীঘির পশ্চিমে রায়-দীঘির পশ্চিম তীরে ভাটার সময় প্রায় ১৮ ফুট মাটীর নীচে প্রাচীন গৃহাদির ভিত দৃষ্ট হয়—তাহার ইট খুব বড় বড়, মৌর্য্য-যুগের ইটের ন্যায়। সেখানে বহু সুবৃহৎ দেব-বিগ্রহও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে ঐ সকল স্থান ডুবিয়া যাওয়াতে তাহারা ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থান ছাড়া সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলেও ঐরূপ প্রাচীন ইটের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল স্থান খাত হইলে বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের নূতন আরও অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

রামায়ণের বালকাণ্ড ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে আমরা নিম্নবঙ্গের নাম "রসাতল" রূপে দেখিতে পাই। মহাভারতে (বনপর্ব্ব, ১১৪ অঃ) দৃষ্ট হয়, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে অবগাহন করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—এই সাগরসঙ্গম অঞ্চলে সুষেণ নামক এক রাজা প্রাচীন কালে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সভায় আগত প্লক্ষদ্বীপস্থ দীপান্তী নগরীর রাজা গুণাকরের কন্যা (তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পত্নী) সুলোচনা পুরুষ-বেশে "বীরবর" নাম ধারণ

পুরাতত্ত্ব।

পূর্ব্বক ভীমনাদ নামক এক প্রকাণ্ড গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ৫ম অধ্যায়)। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে নিম্নবঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ঐ সময় এ দেশেবাসিগণ নৌযুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন।

পাল রাজত্ব কালে, গোপাল দেবের রাজত্বের প্রথম ভাগেই এই নিম্নবঙ্গ তাঁহাদের দখলে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দেবপালের তাম্রলিপিতে দৃষ্ট হয় গোপাল-সাগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া 'তাহার পর আর কোন ভূভাগ নাই'—এই জন্যই তাঁহার রণকুঞ্জর-দিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এই সাগর পর্য্যন্ত ধরিত্রী অবশ্যই নিম্নবঙ্গের শেষ সীমাকে বুঝাইতেছে। গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল তাঁহার ভৃত্যদিগকে পর্য্যন্ত সাগরতীর্থে অবগাহনের সুবিধা প্রদান করিয়া তাহাদের পুণ্যার্জ্জনের সহায়ক হইয়াছিলেন (দেবপালের নালন্দা-তাম্র-লিপি)।

২৪-পরগনা জেলার ১১৬ নম্বর লাটে ১০০ ফুট উচ্চ একটি ভাঙ্গা দেউল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা সরকার বাহাদুর মেরামত করিয়াছেন। মেরামতের পূর্ব্বের ও পরের দুইখানি ছবি দেওয়া হইল। এই মন্দিরের নাম "জটার দেউল," ইহার নিকটে কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি তাম্রপট পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে, ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (৮৯৭ শকে) জয়চন্দ্র নামক কোন রাজা কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কেহ কেহ অনুমান করেন জয়চন্দ্র সেই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের স্বগণ। এই বংশের ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে এখনও অনেক আলোচনা চলিতেছে।

সুন্দরবন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে আরও কতকগুলি ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা (British Museum Catalogue of Indian Coins—Allan, p. xvii), খুলনা জেলার ভরতভায়নার স্তূপ (Annual Report, Archæological Survey of India for 1921-22, p. 76), ২৪-পরগনার অন্তর্গত জয়নগর থানার অধীন কাশীপুর ও সরিষাদহ গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্য ও নৃসিংহ-মূর্ত্তি এবং মথুরাপুর থানার অধীন ১১৪ নম্বর লাট গোবিন্দপুর গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ উল্লেখযোগ্য।

কতকগুলি পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন গুপ্তযুগের পূর্ব্বসময়ের প্রতিও ইঙ্গিত করে। ২৪-পরগনা জেলার উত্তরাংশে বেড়া চাঁপা ও জাক্রা গ্রামের খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীর কয়েকটি Steatite Seal এবং Punch-marked মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। উক্ত বেড়া চাঁপা গ্রামে চন্দ্রকেতুর গড় ও বরাহমিহিরের বাটী নামক দুইটি স্তূপ হইতে বহু প্রাচীন ইষ্টক ও পোড়া মাটীর দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব্ব-চক্রের অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া ঐ স্থানটিকে "নিম্নবঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Annual Report, Archæological Survey of India for 1922-23, p. 109)।

লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন ও দক্ষিণ-গোবিন্দপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, সুন্দরবন ও তৎসন্নিকট প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত খাড়িমণ্ডলের অধীন ছিল। তাম্রশাসনে উল্লিখিত "বেতড় চতুরকের" নাম হাওড়ার অন্তর্গত বেতড় গ্রামের নাম হইতে এবং খাড়িমণ্ডল ২৪-পরগনার খাড়ি গ্রামের নাম হইতে হইয়াছিল। (বাঙ্গলার ইতিহাস, রাখালবাবু প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৫)।

জয়নগর-মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় সুন্দরবনের ইতিহাস উদ্ধার-কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন এবং প্রাচীন শিল্পনিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং একটি দুর্লভ চিত্রশালা স্থাপন করিয়াছেন; এই সন্দর্ভটি মূলতঃ তাঁহারই সাহায্যে লিখিত হইল।

সম্প্রতি সুন্দরবনের "খাদি মণ্ডলে"র পূর্ব্বভাগে "পাথর প্রতিমা" নামক পল্লীর নিকটে একখানি তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে (১১১৮ শকে) বাসুদেব নামক কার্ণশাখার এক ব্রাহ্মণ-বটুকে ভূমি-দানপত্র। তাম্রপটে শকাব্দা উৎকীর্ণ হওয়াতে কালসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি যে, মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেন-রাজারা আর খাদিমণ্ডলের অখণ্ড অধিপতি ছিলেন না, যেহেতু এই শাসনে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে তৎসময়ের সার্ব্বভৌম সম্রাটের (সেন রাজার) বিদ্রোহী অযোধ্যাগত শ্রীশ্রী (অস্পষ্ট) মহামাণ্ডলিক পালোপাধিক কোন রাজা এই স্থান শাসন করিতেছিলেন। "পাথর প্রতিমা" পল্লীর অনতিদূরে এক বৃহৎ মন্দির ছিল, এবং তথাকার চতুঃপার্শ্বে এত পাথর ও প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, যদ্দারা সহজেই অনুমিত হয় যে এক সময়ে এ স্থানটি একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। উক্ত পালরাজার সামন্ত-রাজ মড়ম্মন পাল এই ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনখানির প্রতিলিপি, ইংরেজী অনুবাদ ও তৎসম্বন্ধীয় অপরাপর বিবরণ ইণ্ডিয়ান এসিয়াটিক কোয়াটার্লিতে (দশম সংখ্যা, ২ জুন, ১৯৩৪ খৃঃ) অধ্যাপক ডাক্তার বিনয়চন্দ্র সেন, এম. এ., পি এচ. ডি. (লণ্ডন) এবং শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৪৬৫ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত কোন সময়ে সুলতান রুকনুদ্দিন বরাকের রাজত্বকালে দক্ষিণ দেশটা মুসলমানদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে সেনরাজগণের বংশধরগণ বহু চেষ্টায় হিন্দু অধিকার তথায় কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির উল্লেখ বহু প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়। কথিত আছে মহাপ্রভু কুলীন গ্রামটিকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি ঐ গ্রামের কুকুরটিকে নিজের অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই কুলীন গ্রামেই ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু, গুণরাজ খাঁ, রামানন্দ বসু ও অপরাপর বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, এক সময়ে এই অঞ্চলে রামানন্দ খাঁ অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

আকবরের সময়ে সুন্দরবন অরণ্যবহুল হওয়াতে কর আদায়ের অযোগ্য ছিল (Ayeeni-

Akbari, Gladwin, p. 427)। এই সময়ে ফিরিঙ্গির অত্যাচারে এই অঞ্চলের অনেকস্থান জনশূন্য হইয়াছিল।

এই পুস্তকার্থ শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের লিখিত সন্দর্ভ

সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ

বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পঙ্কময় অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম-সমাচ্ছাদিত নদীবহুল বিস্তীর্ণ ভূভাগ সুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ এবং বর্ত্তমান সময়ে বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ২৪-পরগনা এই তিনটী জিলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে ইহা উত্তরে মুসলমান আমলের পরগনাগুলির শেষসীমা হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ও পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহানা হইতে পূর্ব্বদিকে মেঘনার মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে ইংরাজ গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় এই প্রদেশের হাসিলকার্য্য আরম্ভ হইয়া এখনও চলিয়াছে, এবং তাহার ফলে ইহা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত হইতে অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এই অংশ খুব প্রাচীন স্থান নহে, এবং অল্পকাল হইল সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যে লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন এবং তাঁহাদের নিকট যে দেশ খুব নূতন, ঐতিহাসিকের নিকট তাহা যে খুব পুরাতন সেকথা তাঁহারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে মনে রাখেন না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান হইতে ইহাও জানা যায় যে সুদূর অতীতকালে ভূমি নিমজ্জিত হওয়ায় এই প্রদেশের প্রাচীন ভূসংস্থানের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, (Revenue Survey Report on the districts of Jessore, Faridpur and Bakhergunge—Colonel Gastrell. Manual of Geology of India—R. D. Oldham)। উহা ব্যতীত এখানকার নানাস্থানে, অরণ্য হাসিলের পর, অরণ্যমধ্য হইতে ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে ভূগর্ভ হইতে, যে সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, ইষ্টকস্তূপ, গড়, মজা পুষ্করিণী তাম্রপট্টলিপি ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইগুলি হইতেও বুঝা যায় যে বঙ্গদেশে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে গুপ্ত, পাল ও সেন-রাজগণের রাজত্বকালে এখানে বহু সমৃদ্ধ জনপদ বিদ্যমান ছিল (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র)। The Antiquities of Khari, North-West Sundarbans, and the Sundarbans. By Kalidas Datta, Varendra Research Society's Monographs Nos. 3, 4 and 5 এবং পুরাতন গ্রন্থাদি ও ঐ সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন হইতে প্রতিপন্ন হয় যে সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান এবং তথায়ই সভ্যতালোক সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নদী সুদূর অতীত যুগ হইতে এখানে সাগরসলিলে আত্মবিসর্জ্জন করায় বহু প্রাচীনকাল হইতেই কপিল

মুনির আশ্রম ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থরূপে এই প্রদেশ প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ২৪-পরগনা জেলার অন্তর্গত। এখানে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্ভুক্ত মথুরাপুর থানার অধীন ২৬ নম্বর লাট, কঙ্কণ-দীঘির পশ্চিমে, রায়দীঘি নদীর পশ্চিমতীরে, ভাটার সময়ে প্রায় ১৮ ফুট মাটির নিম্নে মৌর্য্যযুগের ইষ্টকের ন্যায় খুব বড় বড় ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীন গৃহের ভিত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতে কঙ্কণ-দীঘির কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐরূপ ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সুন্দরবনের অন্যান্য অংশেও ভূগর্ভে এইরূপ প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমি-নিমজ্জনের জন্যই যে ঐ সকল প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ঐরূপে ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কখনও এতদঞ্চলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন আরম্ভ হইলে হয়তো ঐ সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়া সুন্দরবনের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত করিতে পারে।

পৌরাণিক গ্রন্থে সুন্দরবন

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণেই সর্ব্বপ্রথম গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু উহাতে "রসাতল" নামে নিম্নবঙ্গের উল্লেখ ব্যতীত অন্য কোনরূপ পরিচয় নাই (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ত্রিচত্বারিংশ সর্গ)। রামায়ণের পরে নিম্নবঙ্গের পরিচয় আমরা সর্ব্বপ্রথম মহাভারতে প্রাপ্ত হই। উহাতে দেখা যায় যে তৎকালে নিম্নবঙ্গে ভাগীরথী নদী বহুসংখ্যক শাখায় বিভক্ত ছিল। অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া ঐ সকল নদীর মধ্যে অবগাহন করত কলিঙ্গ দেশান্তর্গত বৈতরণী-তীর্থাভিমুখে গিয়াছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৪ অঃ)।

মহাভারত ব্যতীত অনেকগুলি পুরাণেও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে উক্ত তীর্থক্ষেত্রে এক বিস্তৃত জনপদ ছিল এবং সুষেণ নামক একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সভায় আগত প্লক্ষদ্বীপস্থ দীপান্তী নগরীর রাজা গুণাকরের কন্যা ও তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পত্নী সুলোচনা পুরুষবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া ভীমনাদ নামে এক গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন (পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ৫ অঃ)। ইহাতে বুঝা যায় যে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত গঙ্গাসাগর-সঙ্গম সুন্দরবনেই ছিল এবং তথায় উক্ত পুরাণ রচনাকালে অরণ্য ও জনপদ উভয়ই বর্ত্তমান ছিল।

ঐতিহাসিক যুগে সুন্দরবন

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক যুগের যে সমস্ত কীর্ত্তি-নিদর্শন সুন্দরবনে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্ত, পাল ও সেন-রাজত্বকালের। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী

সময়ের সভ্যতার কোন নিদর্শন এখনও এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইহার সন্নিকটে ২৪-পরগনা জিলার উত্তরাংশে কতকগুলি খুব প্রাচীন পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বেড়াচাঁপা ও জাক্রাগ্রামের খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীর কয়েকটী Steatite Seal ও punch-marked coins উল্লেখযোগ্য (Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad—R. D. Banerjee, p. 16)। উক্ত বেড়াচাঁপা গ্রামে চন্দ্রকেতুর গড় ও বরাহমিহিরের বাটী নামে দুইটী স্তূপ হইতেও বহু প্রাচীন ইষ্টক ও পোড়া মাটীর দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব্ব-চক্রের অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া এই স্থানটীকে "One of the earliest settlements in Lower Bengal" বলিয়া স্থির করিয়াছেন, (Annual Report, Archæological Survey of India for 1922-23, p. 109)।

ঐ সকল নিদর্শন ব্যতীত সুন্দরবন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সমস্ত বেশী পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্ত-মুদ্রা-সমূহ (British Museum Catalogue of Indian Coins—Allan, p. xvii), খুলনা জেলার ভরতভায়নার স্তূপ (Annual Report, Archæological Survey of India for 1921-22, p. 76), ও ২৪-পরগনার অন্তর্গত জয়নগর থানার অধীন কাশীপুর ও সরিবাদহ গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্য ও নৃসিংহমূর্ত্তি ও মথুরাপুর থানার অধীন ১১৪ নম্বর লাট গোবিন্দপুর গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ উল্লেখযোগ্য (The Antiquities of Khari and the Sundarbans, Kalidas Datta, V. R. Society's Monographs, Nos. 4 and 5)। এই সকল নিদর্শন হইতে বুঝা যায় যে গুপ্ত-রাজত্বকালেও বঙ্গোপসাগর-তীরবর্ত্তী নিম্নবঙ্গ সমৃদ্ধ ছিল। এই যুগেই সম্রাট্ ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব হয় (Early History of India, V. S. Smith)। তিনি রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে নিম্নবঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ সময়ে এদেশবাসিগণ নৌযুদ্ধে খুবই পারদর্শী ও পরাক্রমশালী ছিলেন।

পাল রাজত্বকাল

গুপ্তযুগের অবসানে বঙ্গদেশে মাৎস্যন্যায়ের ফলে পাল-রাজ্যের সৃষ্টি হয়। গোপালদেব এই রাজ্যের সংস্থাপক। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র—ধর্ম্মপাল ও দেবপালের—রাজত্বকালই বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। দেবপালের মুঙ্গের ও নালন্দা তাম্রপট্টলিপির তৃতীয় শ্লোক পাঠে প্রতীয়মান হয় যে সম্ভবতঃ গোপালদেবের রাজত্বকালের প্রথমভাগেই এতদ্দেশ পাল-রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে পাল-নরপতি গোপাল বঙ্গদেশের মাৎস্যন্যায় দূরীভূত করিয়া সমুদ্রপর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। সে কারণে আর যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন নাই বলিয়া তাঁহার মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন (গৌড়লেখমালা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃঃ ৪১, Nalanda Copper-plate of Devapala,

V. R. Society's Monograph, No. 1, p. 24)। ঐ শাসন দুইখানির সপ্তম শ্লোকে দেখা যায় যে গোপালদেবের পুত্র প্রসিদ্ধ নরপতি ধর্ম্মপালদেবের সমভিব্যাহারী ভৃত্যবর্গও নিম্নবঙ্গে আসিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

২৪-পরগনা জেলার অধীন সুন্দরবনান্তর্গত প্রদেশে ১১৬ নম্বর লাটে, প্রাচীন নাগর-রীতিতে নির্ম্মিত প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ একটি ভগ্ন মন্দির অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার বর্ত্তমান নাম জটার দেউল। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ মন্দিরের সন্নিকটে একখানি তাম্রপট্ট-লিপি আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে পাল-রাজত্বকালের শেষভাগে, ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তচন্দ্র নামক জনৈক নৃপতিকর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল (List of Ancient Monuments in Bengal, Presidency Division, No. 1)। এই জয়ন্তচন্দ্র কে তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীচন্দ্রদেবের যে কয়খানি তাম্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইগুলি হইতে বুঝা যায় যে ঐ সময়ে বঙ্গদেশে চন্দ্রবংশীয় রাজগণও কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন (Inscriptions of Bengal, Part III. By N. G. Mazumdar, published by the Varendra Research Society)। জটার দেউল-প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্তচন্দ্র এই বংশীয় কেহ হইলেও হইতে পারেন। পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর পুঁথিতেও উক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণের কথা আছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫০-৬৩)। পূর্ব্বোক্ত জটার দেউলের প্রায় ১ ক্রোশ পশ্চিমে ২৬ নম্বর লাট, কঙ্কণ-দীঘিতে এক বিস্তৃত জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে যে সকল ইষ্টকস্তূপ ও গৃহের ভিত্তি দেখা যায় সেগুলির ইষ্টকের সহিত জটার দেউলের ইষ্টকের গঠন-পদ্ধতির ও আকারের যেরূপ মিল আছে তাহা দেখিলে এই স্থানটি ঐ সময়ে সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়।"

সেন-রাজত্বকাল

"পাল-রাজত্বকালের অবসানে বঙ্গদেশে সেন-রাজত্বের উদ্ভব হয়। বিজয় সেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পৌত্র মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সুন্দরবন ও দক্ষিণগোবিন্দপুরের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে সেন-রাজত্বকালে বর্ত্তমান ২৪-পরগনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, যাহা ভাগীরথী-প্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত, (আলিপুর, খিদিরপুর, বেহালা, ফলতা, ডায়মণ্ড হারবার, কুলপী প্রভৃতি থানার অধীন ভূভাগ) বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড চতুরকের মধ্যবর্ত্তী এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ প্রদেশ, যাহা উক্ত ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনান্তর্গত খাড়ীমণ্ডলের অধীন ছিল (The Antiquities of Khari and North-West Sundarbans. By Kalidas Datta. Varendra Research Society's Monographs, Nos. 3 and 4)। উক্ত বেতড্ড চতুরকের মধ্যে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেতড় এবং খাড়ীমণ্ডল ২৪-পরগনা জিলার অধীন 'খাড়ী'—এই দুই গ্রাম তাম্রলিপির

উল্লিখিত পল্লী। (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৫। The Antiquities of Khari.)

ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশে আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি যে সকল পুরাকীর্ত্তি-নিদর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই উক্ত পাল ও সেন-রাজত্ব-সময়ের। ঐগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে ২৪-পরগনা জেলার মধ্যে সাগরতীরবর্ত্তী সুন্দরবন-প্রদেশই এই পাল ও সেন-রাজত্বকালে বহু গ্রামনগরাদিতে সমৃদ্ধ ছিল এবং সে সময়ে তথায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বাঙ্গলাদেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম এতৎ অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কোন্ সময়ে কি কারণে এই প্রদেশের ঐ সমস্ত লোকালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা আজিও ঠিক জানা যায় নাই। তবে এখানে এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র মুসলমান রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের সভ্যতার নিদর্শনসমূহের আবিষ্কার হওয়াতে বোধ হয় মুসলমান আমলের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ সেনরাজত্ব-কালের শেষ সময়ে, এতদ্দেশের প্রাচীন জনপদসমূহ, হয় কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবে অথবা বৈদেশিক আক্রমণে, নষ্ট হইয়া বর্ত্তমান সুন্দরবনে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমান অধিকারকাল

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ইতিহাস যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে মুসলমানগণ গৌড়-বিজয়ের বহুদিন পরে নিম্নবঙ্গ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেন বংশীয় নরপতিগণ বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশের অধিকার হারাইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই নদীবহুল দুর্গম প্রদেশে থাকিয়াই বহুদিন মুসলমানগণের সহিত সংঘর্ষ চালাইয়াছিলেন। বখতীয়ার খিলিজির মৃত্যুকালে বরেন্দ্রভূমির কিয়দংশ মাত্র তাঁহার পদানত হইয়াছিল (Tabkati Nasiri, pp. 484-486, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ সে সময়ে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অধিকারী ছিলেন (*Ibid.*, p. 538)। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ গিয়াসউদ্দীন বলবনের মধ্যম পৌত্র, বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান রুকুনুদ্দীন কৈকাসের রাজ্যের শেষভাগে, দেবকোটের শাসনকর্ত্তা বহরম ঈৎগীন জাফর খাঁ কর্ত্তৃক সপ্তগ্রাম বিজিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ-বঙ্গ মুসলমানগণের অধিকারে আসে নাই (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঐ সময়ের প্রায় ১৬৭ বৎসর পরে, ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুলতান রুকুনুদ্দীন বরাবকের রাজত্বকালে, সমগ্র দক্ষিণ-বঙ্গ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল (Epigraphia Indica, Moslemica, 1909-10, p. 112)। এই সময়ে বসিরহাটে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হয়। উহা এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে এবং সাহী মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ (বসিরহাটের সাহী মসজিদ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ)।

চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, এই পাঠান রাজত্বকালের শেষভাগে, হুসেন সাহের শাসনসময়ে বর্ত্তমান ২৪-পরগনা জেলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন ছত্রভোগ পর্য্যন্ত স্থানে মনুষ্যাবাস ছিল, এবং উহার দক্ষিণ প্রদেশ অরণ্যাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে ছত্রভোগ একটি প্রধান বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং রামচন্দ্র খাঁ নামক হুসেন সাহের একজন কর্ম্মচারী তৎকালে সমগ্র দক্ষিণদেশ শাসন করিতেন (চৈতন্যভাগবত, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৩-২৮৫)। এই রামচন্দ্র খাঁ কে ছিলেন, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। ঐ সময়ে ছত্রভোগের ১২।১৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মাহীনগর নামক স্থানে পুরন্দর খাঁ নামক হুসেন সাহের জনৈক হিন্দু অমাত্য বাস করিতেন। তাঁহার বংশে অনেকের খাঁ উপাধি ছিল। উক্ত রামচন্দ্র খাঁ এই বংশের কেহ হওয়াই সম্ভব। ভাগবতের অনুবাদক প্রসিদ্ধ মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁও এই বংশীয়। ইহাদের বংশধরগণই অধুনা বঙ্গদেশে মাহীনগরের বসু নামে প্রসিদ্ধ। এই মহী-(বা মাহী) নগর প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর উপর একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য ও বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান প্রভৃতি পুরাতন পুস্তকে এই স্থানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, উক্ত বসুবংশীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ মহীপতি বসুর নাম হইতে এই স্থানের নাম মহীনগর হইয়াছিল। এখানে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের তিনবার একজাই হওয়ায় ইহা প্রাচীনকালে সামাজিকগণের নিকটও খুব প্রসিদ্ধ ছিল (কায়স্থ-পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর সমাজ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু), এবং কুলীনগ্রাম নামেও অভিহিত হইত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কুলীনগ্রামের অবস্থানের যেরূপ পরিচয় লিখিত আছে, তাহা হইতেও এই স্থানটি ঐ নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া বুঝা যায়। ঐ পুস্তক অনুসারে চৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে অম্বুয়ায় গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে গঙ্গার বামতীর অবলম্বনে কাচমনি বেতড় (বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেঠর) দক্ষিণে রাখিয়া উক্ত কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন (চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৭, পৃষ্ঠা ৯৫)। মাহী-নগরের এই বসুবংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বসু রামানন্দের নামও বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে তাঁহাকে জগন্নাথের পট্টডুরীর যজমান করিয়াছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪ পরিচ্ছেদ)। গুণরাজ খাঁ-কৃত ভাগবতের বঙ্গানুবাদের জন্যও এই কুলীনগ্রামকে মহাপ্রভু খুবই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কুলীনগ্রাম-বাসিগণের জগন্নাথের পট্টডুরী লইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই :—

" কুলীনগ্রামেরে কহে সম্মান করিঞা।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রার পট্টডুরী লঞা॥
গুণরাজ খাঁ কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥

তোমার বা কথা কিবা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা)।

পাঠান রাজত্বের অবসানে বঙ্গদেশে মোগল রাজত্বের আরম্ভ হইলে ২৪-পরগনা জেলার উত্তরাংশে সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত মুড়াগাছা, খারার (খাড়ী), হাতীয়াগর, সেদনমল, ও বালাণ্ডা প্রভৃতি পরগনার অধীন হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশে সুন্দরবন প্রদেশ ঐ সকল পরগনার বহির্ভাগে অরণ্যাবৃত হইয়া কর আদায়ের অনুপযুক্ত অবস্থায় ছিল। Ayeeni Akbari—Gladwin, p. 427. Hunter's Statistical Account, Vol. I, p. 381)। এই সময়ে ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী ছত্রভোগ প্রভৃতি বহু জনপদ মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে সুন্দরবনের সীমা আরও বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভকালেও কলিকাতার সন্নিকটে অরণ্য দেখা যাইত।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য রাজা ও জমিদারগণ

মুরসিদাবাদের নবাবদের ইতিহাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে—তৎপরবর্ত্তী নবাবদের শুধু নামোল্লেখ করিয়া যাইব। মীর জাফর ইংরেজদিগকে কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বিভাগের জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই স্থানটিই বর্ত্তমান ২৪-পরগনা, (পরিমাণ ৮৮২ বর্গ মাইল), ইহার রাজস্ব দশ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে ই° ই° কোম্পানীকে বাৎসরিক ২,২২, ৯৮৫ টাকা নবাব-সরকারে খাজনা দিতে হইত। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে মীর জাফর এই ভূভাগের মালিকানা স্বত্ব কোম্পানীকে দিয়া খাজনার ২,২২, ৯৮৫ টাকা ক্লাইবকে প্রদান করেন। মীরনের মৃত্যু হওয়াতে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিম নবাব হন। ইনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মেজর মনরো কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া বক্সারের যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধবিগ্রহকালে মীর কাশিম জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ইংরেজের পক্ষীয় দেখিয়া জলে ডুবাইয়া নিহত করেন—দৈবক্রমে কৃষ্ণনগরের অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধার পান। মীর কাশিমের সঙ্গে সঙ্গে মুরসিদাবাদের নবাবদের প্রাসাদের শেষ দীপ নির্ব্বাপিত হয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মীর কাশিম রাজ্যচ্যুত হইলে মুরসিদাবাদের সিংহাসনে মীর জাফর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই (১৭৬৫ খৃঃ অব্দে) কুষ্ঠ রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার দৌহিত্র নিজামউদ্দৌলা ও সৈয়ফউদ্দৌলা নবাব হন। প্রথমোক্ত নবাব ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সৈয়ফউদ্দৌলা ১৭৭০ খৃঃ অব্দে সেই একই রোগে

মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপরে যথাক্রমে নবাব মুবারকউদ্দৌলা (১৭৭০-৯৩ খৃঃ), নবাব কবরজঙ্গ (১৭৯৩-১৮১০ খৃঃ), নবাব জমুনদ্দিন (১৮১০-২১ খৃঃ), নবাব ওয়ালাজা (১৮২১-২৪ খৃঃ), নবাব হুমায়ুন জা (১৮২৪-৩৮ খৃঃ), (ইঁহার সময়ে বর্ত্তমান হাজার-দুয়ারী প্রাসাদ ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়, ১৮২৯-৩৭ খৃঃ); হুমায়ুন জার পরে নবাব মনসুর আলি খাঁ (১৮৩৮-৯০ খৃঃ), হুসেন আলী মির্জ্জা খাঁ (১৮৯০-১৯০৮ খৃঃ), এবং বর্ত্তমান কালে সর্ব্বজনপ্রিয় ওয়াসিফ আলী মির্জ্জা খাঁ মুরসিদাবাদের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ—ইঁহারা এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজ-পতি এবং ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত। ভট্টনারায়ণের সপ্তম স্থানীয় কাশীনাথ ১৫৯৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জমিদারী পরিচালনা করিতেন। কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্রকে আন্দুলের জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার পোষ্য গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া, হরি হোড়ের বিশাল সম্পত্তি অধিকারপূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ভবানন্দের পুত্র রামগোপাল, তাঁহার পুত্র রাঘবচন্দ্র রায়—এবং তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ দিল্লীশ্বর হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ, রামজীবন এবং রঘুরাম রাজা হন। রঘুরামের মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) স্বনামধন্য কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন পণ্ডিত, তেমনই বুদ্ধিমান্ ছিলেন; রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং ধনুর্ব্বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন এবং অগ্নিহোত্র, বাজপেয় প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজস্ব দেওয়ার ত্রুটি হওয়াতে মুর্সিদকুলি কর্ত্তৃক তাঁহার "বৈকুণ্ঠবাসের" আজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্তু দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব তাঁহাকে ১২টি কামান উপহার দিয়াছিলেন। তিনি 'শিবনিবাস', 'গঙ্গাবাস' প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্লাইবের অনুগ্রহে তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে 'মহারাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৭৮২ খৃঃ ২২শে আষাঢ় তিনি ৭০ বৎসর বয়সে স্বর্গীয় হন। তাঁহার সভায় বহু পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পরে যথাক্রমে শিবচন্দ্র রায় (১৭৮২-৮৮ খৃঃ), ঈশ্বরচন্দ্র রায় (১৭৮৮-১৮০২ খৃঃ), গিরীশচন্দ্র রায় (১৮০২-৪১ খৃঃ), শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮৪১-৫৭ খৃঃ), সতীশচন্দ্র রায় (১৮৫৭-৭৫ খৃঃ), ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (১৮৭৫-১৯১০ খৃঃ) এবং ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

ভাওয়াল রাজবংশ—কথিত আছে মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে, ঢাকায় কোন কোন স্থান গাজিরা অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ জেলার সুয়াপুর গ্রামের প্রান্তবাহী "কানাই" নদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইঁহারা "গাজিখালী" নাম দিয়াছিলেন। পাল ও চাঁদ গাজির পুত্র ভাওয়াল গাজির নামানুসারে ঢাকার উত্তরবর্ত্তী ভূভাগের "ভাওয়াল" নাম হইয়াছে। গাজি-বংশীয় ফজল গাজির পুত্র দৌলত গাজির এক ব্রাহ্মণ

দেওয়ান ছিলেন। ইনি বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী-গ্রামবাসী এবং ইঁহার নাম ছিল কুশধ্বজ, দেওয়ানজী বর্ত্তমান জয়দেবপুরের পশ্চিমে চান্দনা গ্রামে গৃহ নির্ম্মাণ করান। কুশধ্বজের পুত্র বলরাম গাজিদের সম্পত্তির নয় আনা অংশ নিলামে ক্রয় করিয়া নবাব-সরকার হইতে 'রায় চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হন, তারপর রাজা উপাধি হয়। বলরামের পরে শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, জয়দেব রায় চৌধুরী, গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরী এবং কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী যথাক্রমে রাজা হন। কালীনারায়ণ গবর্নমেণ্ট হইতে 'রাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন। কালীনারায়ণের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, ইঁহারই দেওয়ান ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ। রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় হন। তাঁহার তিন পুত্র কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ—সকলেই স্বর্গীয় হইয়াছিলেন—এই কথাই প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু সম্প্রতি রমেন্দ্রনারায়ণ চিতা-শয্যা হইতে উঠিয়া স্বীয় অধিকারের দাবী করিতেছেন, খবরের কাগজে এই কথা পড়া যাইতেছে। সে বিচার এখনও শেষ হয় নাই।

ময়নাগড়—এই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজ্যের পূর্ব্বপ্রবাদ ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য-প্রসাদে সকলের নিকটই বিদিত। ইহা এককালে কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র মহাবীর লাউ সেনের (লব সেনের) অনেক কীর্ত্তিকথা প্রবাদবাক্যের ন্যায় হইয়া আছে ; লাউ সেনের পুত্র চিত্র সেন।

কিন্তু প্রাচীন রাজবংশের কি হইল জানা যায় নাই। বর্ত্তমানকালে ময়না রাজ্যের রাজাদের আদিপুরুষ—১। গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ২। পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ৩। মাধবেন্দ্র বাহুবলীন্দ্র, ৪। গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ৫। কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ৬। জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ৭। ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ৮। আনন্দানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ৯। রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র। রাধাশ্যামানন্দ ১৮২৮ খৃঃ অব্দে রাজাসন প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজা জ্ঞানানন্দ, তাঁহার ভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ ও ভ্রাতুষ্পুত্র সাধনানন্দ সাধারণ গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের রাজ-বিভূতি আর নাই।

পুঁটিয়া—বৎসরাচার্য্য এই বংশের আদিপুরুষ, তাঁহার পুত্র পীতাম্বর রায় জমিদারী অর্জ্জন করেন। তৎপরে নীলাম্বর রায় ও পরে আনন্দচন্দ্র রায় জমীদার হন, আনন্দচন্দ্র দিল্লীশ্বর হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। আনন্দচন্দ্রের পুত্র রতিকান্ত,—তারপর ক্রমান্বয়ে রামচন্দ্র রায়, নরনারায়ণ রায়, দর্পনারায়ণ রায়, জয়নারায়ণ রায়, রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। যোগেন্দ্রনারায়ণের বিধবা পত্নী শরৎসুন্দরী দেবী এদেশের গৃহলক্ষ্মীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারিণী, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া। রাণী শরৎসুন্দরী বৈধব্য-দশায় ভূতলে কম্বল-শয্যায় শুইতেন, উপবাস ও নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া তিনি তন্বঙ্গী হইয়াছিলেন। একদা কোন উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারী তাঁহার ষ্টেট দেখিতে আসিয়া বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন, "ইনি তো এখনও তরুণ-বয়স্কা, আর একবার বিবাহ করিতে পারেন।" এই পাপ-কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সারাদিন অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন

এবং আড়ম্বরহীন-ভাবে নিভৃতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৬ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সুশাসন করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রাণী' উপাধি প্রদত্ত হন এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ হেমন্তকুমারী এখন রাণী—তিনিও অনেক দান করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন।

নাটোর—বারেন্দ্র-কুলীন সুবেণ এই রাজবংশের আদি পুরুষ। ইহার এক সুদূর বংশধর কামদেব মৈত্র পুঁটিয়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের জমিদারীতে কাজ করিতেন। এই কামদেবের পুত্র রঘুনন্দন একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি মুর্সিদকুলি খাঁর প্রীতিভাজন হইয়া বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। কামদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পুত্র মহারাজ রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী ভবানী রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার পবিত্র জীবন ও দানশীলতা বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের ন্যায় হইয়া আছে। ইনি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ইনি অহল্যাবাই-এর মতই কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বহু মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জমীদারীর আয় এত প্রভূত ছিল যে তাঁহাকে লোকে "অর্দ্ধবঙ্গের অধিকারিণী" বলিত। ১৭৭০ খৃঃ অব্দের (ছিয়াত্তরের) মন্বন্তরে তিনি যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা গল্পের মত শুনায়। তাঁহার পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় অনর্থের মূল মনে করিয়া বাহ্য বৈভবের প্রতি যে ঔদাসিন্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সে বৈভব নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি উত্তরসাধক ভোলাকে লইয়া তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং ভারতীয় সাধুদের পঙ্ক্তিতে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলি ভক্তি ও প্রেমে ভরপূর। "আমার মন যদি রে ভুলে, তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দেখ কর্ণমূলে—আমায় এনে দে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গাজলে" প্রভৃতি গান শ্রুতির অমৃত, বিষয়-রোগ-নিরাময়ের ভেষজ। রামকৃষ্ণের পর মহারাজ বিশ্বনাথ রায়, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র রায়, মহারাজ গোবিন্দনাথ রায়, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় রাজপদ লাভ করেন। এখন জগদিন্দ্রনাথের পুত্র কৃতবিদ্য, মহাবৈষ্ণব মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় সিংহাসনে অভিষিক্ত আছেন। ছোটতরফে শিবনাথ রায়, আনন্দনাথ রায়, চন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ রায় ক্রমান্বয়ে রাজা হন। রাজা যোগেন্দ্রনাথ ১৯০১ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করেন।

কাশিমবাজার—কালীপদ নন্দীর পুত্র রাধাকৃষ্ণ নন্দী—তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত নন্দীই (কান্তবাবু) এই রাজবংশের গৌরব-ভিত্তি। হেষ্টিংসের প্রসাদে ইনি অতুল বৈভবের অধিকারী হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকে গমন করেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথ নন্দী 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে হরিনাথ নন্দী (১৭৯৮-১৮৩৬ খৃঃ), এবং শেষে তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ নন্দী রাজা হন। কোন ভৃত্যকে খুন করার অপরাধে ইঁহার উপর ওয়ারেণ্ট জারি হয়, সেই অপমানে ইনি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানের যশ বঙ্গের সর্ব্বত্র বিদিত। কথিত আছে, এই পুণ্যশীলা

রমণী ৬০ লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশিমবাজার গদির তৎপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের যশ যেন তাঁহাকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সর্ব্ববিষয়ে প্রার্থীরা যেন একমাত্র লক্ষ্যহারা হইয়াছে। তদীয় পুত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী তরুণ বয়সে রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য চেষ্টিত আছেন।

দীঘাপতিয়া—দয়ারাম রায় এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পুঁটিয়ার রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি রণনীতি-কুশল ছিলেন, ইঁহার বুদ্ধি-বলে মুর্সিদকুলী খাঁ বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় বিদ্রোহী সীতারাম রায় বন্দী হইয়া নিহত হন। দয়ারাম রায়ের পুত্র জগন্নাথ রায় এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে—প্রাণনাথ রায়, প্রসন্ননাথ রায় এবং প্রমথনাথ রায় রাজা হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের দিল্লীর দরবারে প্রমথনাথ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। এখন তৎপুত্র প্রমদানাথ রায় রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজা প্রমথনাথের ভ্রাতারা সকলেই কৃতী। বিদ্বান্ এবং গম্ভীর-প্রকৃতি বসন্তকুমার পরলোকগত হইয়াছেন, শরৎকুমারের মত দেশহিতৈষী ও অনাড়ম্বর দাতা বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হেমেন্দ্রকুমার সৌজন্যের একটি জীবন্ত বিগ্রহ-স্বরূপ।

দিনাজপুর—কথিত আছে দীনরাজ ঘোষ নামক এক কায়স্থ উত্তর-বাঙ্গলায় রাজা গণেশের উচ্চ কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন; এসম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা আমি এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি না; সুরেন্দ্রমোহন বসু প্রণীত 'ভারত-গৌরবে'র ৪৯০ পৃষ্ঠায় ও দুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে' তাহা লিখিত আছে। দীনরাজ ঘোষের পুত্র শুকদেব রায়ের সময় এই বংশের জমিদারী বৃদ্ধি পায়। ইনি ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে লোকান্তরিত হন। তারপরে ক্রমান্বয়ে জয়দেব রায়, প্রাণনাথ রায়, রমানাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায়, রাধানাথ রায়, গোবিন্দনাথ রায়, তারকনাথ রায় ও গিরিজানাথ রায়—ইনি ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি দিনাজপুরে একটা খাল কাটিতে ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করেন এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের জন্য ২৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

ঢাকার নবাব-বংশ—আব্দুল হাকীম নামক এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী এই বংশের আদিপুরুষ—তৎপরে যথাক্রমে হাফিজুল্লা, খোজা আলিমুল্লা এবং আব্দুল গনি এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হন। আব্দুল গনিই এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইনি সি. এস. আই. উপাধি এবং সেই বৎসরেই বংশানুক্রমে নবাব উপাধি পাইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর জীবনে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া ছোট-বড় অনেক রাজা-মহারাজা ও জমিদার খাস বাঙ্গলায় আছেন, তাঁহাদের উল্লেখের স্থান আমাদের নাই। ইঁহাদের মধ্যে চাচড়া, নলডাঙ্গা, মহিষাদল, হেতমপুর,

আন্দুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তাজহাট, চন্দ্রদ্বীপ, নশীপুর, নাড়াজোল, শিয়ারশোল, পাইকপাড়া, ভূকৈলাস, পাথুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোয়াইল, তেওতা প্রভৃতি কয়েকটির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে রাজা-মহারাজার অভাব নাই, কিন্তু জড় ঐশ্বর্য্য ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রতিভার বিশ্বোজ্জ্বল খ্যাতি।

এই হতভাগ্য দেশের হতশ্রী রাজ-বৈভবের ক্রম-বিলীয়মান শেষ দৃশ্য আর দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। স্বর্ণকিরীটিনী বঙ্গভূমির শ্রুতির কুণ্ডলে আর সে মণিদ্যুতি নাই। আমরা জড় ঐশ্বর্য্যের চিতা-শয্যার দৃশ্য আর উদ্ঘাটিত করিব না। সে দিন গিয়াছে, যখন কোন তরুণ রাজার শুদ্ধোদ্গম উপলক্ষে রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া রাজমাতা কোটী কোটী টাকা ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিয়াছিলেন। ভারতে সে সকল কথা স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতেও তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দুর্গোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গের একজন জমিদার ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন,—সে দিনও গিয়াছে।

কিন্তু আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যদেবের খোল, কর্ত্তাল ও মন্দিরা বাজিয়া উঠিতেছে—তাহা কোকিল-কূজনের ন্যায় সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়া দিতেছে; রবীন্দ্রনাথের গীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিস্মিতনেত্রে উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিতেছে। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের ললাম-বর্ণ-মাধুরীতে পৃথিবী আকৃষ্ট হইতেছে; পরমহংস দেবের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের তত্ত্ব জগৎবাসী কাণ পাতিয়া শুনিতেছে। আমার জয়ই জয়। সেই জয়-কিরীট যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার ছাউনি" লইয়াও আমরা গর্ব্ব করিতে পারিব; প্রাভাতিক নহবৎ বাদ্যের ভঁয়রো ও ললিত রাগিণীর স্বরে না হয় আমাদের ঘুম আর নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে সান্ধ্য-পূরবী রাগিণীর স্বর না হয় আমাদের শ্রম-সমাপ্তির কথা আর নাই জানাইল। আমাদের কুটীরপার্শ্বে আম্র-বাটিকায় কোকিল-কূজন থামিবে না, নীলাকাশে 'বউ-কথা-কও' ও 'চোখ-গেল-রে' আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেনের অভাবের দুঃখ ভুলাইয়া দিবে। আমাদের শস্য-শ্যামলা সুবিস্তৃত মাতৃ-লক্ষ্মীর অঞ্চল আমাদের খাদ্য লইয়া নিরবধি প্রসারিত থাকিবে, এবং এদেশের বিশালতোয়া নদনদী শত শত বাহু বিস্তার করিয়া সর্ব্বদাই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য উদ্যত আছে ও থাকিবে,—আমরা শ্রমবিমুখ না হইলে দারিদ্র্য আমাদিগকে মারিতে পারিবে না; আমাদের উপাস্য স্বয়ং দিগম্বর মহাদেব।

বঙ্গদেশে যে কত প্রাচীন মন্দির, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও দীঘির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের অনেকগুলিতেই বাঙ্গলা স্থাপত্যের নিজস্ব রূপটি আছে; এই ঐশ্বর্য্যের শ্মশানভূমি পরিক্রমা করিতে আমার সাধ্যে কুলাইল না। আশা করি, বঙ্গীয় নবীন যুগের যুবকেরা এই দেশের উপেক্ষিত পূর্ব্ব-কীর্ত্তিগুলির প্রতি মনোযোগী হইবেন,

তাহা দেখিবার ও তাহাদের ঐতিহ্য-গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে না, বাড়ীর চতুর্দ্দিকে চোখ মেলিয়া চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীঘি যে প্রাচীন কীর্ত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শত্রুর আক্রমণ-নিরোধে অশক্ত হইয়া বহু রাজা তাঁহাদের ধনসম্পত্তি-সহ দেব-বিগ্রহসমূহ সেই দীঘির কোন কোনটির জলে বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, রাজ-অন্তঃপুরের কত সুন্দরী বিপৎকালে সেই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ যশোধরমাণিক্য সেইরূপ এক দীঘিতে ধনসম্পত্তি লুকাইয়া গিয়াছেন সন্দেহ করিয়া, মোগলেরা একটা খাল কাটিয়া সেই দীঘির জল নিঃসরণপূর্ব্বক তাহা শুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন (১০৩৬ পৃঃ)। প্রদ্যুম্নপুরের রাজা যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের জয়মল্লের (৭০৯ পৃঃ) হস্তে পরাভূত হইয়া স্বীয় প্রাসাদ-সংলগ্ন 'কানাই' সরোবরে রাজ্ঞী ও অপরাপর মহিলাগণ সহ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও আছে। রাজা জানকীনাথের (সুসঙ্গ দুর্গাপুরের অধিপ) রাজ্ঞী কমলাদেবী কমলাসায়রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার ভুল হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য মহান্; এইজন্য সেই দীঘি একটি তীর্থস্বরূপ। সুপ্রসিদ্ধ অমর দীঘি খনন করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজগণের অধিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস জড়িত (১০৩৩ পৃঃ)। ভারত-বিশ্রুত মহীপাল দীঘি বিশালত্বে ও নির্ম্মল সলিলের খ্যাতিতে পাল-সম্রাট্গণেরই যোগ্য। এই দীঘির পরিমাণ ৩৮০০×১১০০ ফুট; ইহার তীরে যে মন্দির ছিল তাহা ধূলি-রেণু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উচ্চতায় ও কারুকার্য্যে তাহা যে এই দীঘিরই যোগ্য ছিল, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। এই দীঘি দিনাজপুরে অবস্থিত, এবং এই জেলারই দেবীকোটে তপন দীঘি ৪৭০০×১৭৫০ ফুট, দোহাল দীঘি ৪০০০×১০০০ ফুট, কালা দীঘি ৪০০০×৮০০ ফুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীঘি ও আলতা দীঘি কুটীবাড়ীতে এখনও বিদ্যমান। আমরা পালাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও রাজ্ঞীরা নিজ হাতে সূতা কাটিয়া রাজাকে আদেশ করিতেন, সাতদিনে যতটা সূতা কাটিবেন, সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে। কমলা সায়র (মৈমনসিংহ) এই ভাবের এক সর্ত্তে কাটা হইয়াছিল, মৈমনসিংহের সূতানরীর দীঘিও এইরূপ সর্ত্তে খাত হইয়াছিল (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বাদশ তীর্থের কথা)। পূর্ব্বোক্ত দীঘিগুলি ছাড়া এদেশে যে আরও কত অতিকায় দীঘি বিদ্যমান, তাহাদের খোঁজ কে করে? আমরা ততক্ষণ লক ক্যাট্রিন এবং লক লেমন্ দীঘির কথা মুখস্থ করিব। মেদিনীপুরে খাক্রার বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীঘিটি আছে, এই দীঘির এক পারে দাঁড়াইলে অপর পারের মানুষ অতি ক্ষুদ্রাকৃতি দেখা যায় -তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মেদিনীপুর গরবেটায় জলটুঙ্গী দীঘি, ইন্দ্র পুষ্করিণী, পাথুরিয়া দুয়া, মঙ্গলা, কবেশ দীঘি, অমরপুষ্করিণী এবং হাতুয়া প্রভৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট অনেক স্তূপ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। বগুড়ায় সিকোলার প্রাচীন দীঘির নীচে একটি দেব-মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ২৪-পরগনায় সরস্থনা গ্রামের কমলা-বিমলার দীঘি এখানে উল্লেখযোগ্য। এখন আমাদের পল্লীর ক্ষুদ্র পুকুরটি সংস্কার করিতে শক্তি নাই, এই সকল

দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবৃত্তিই বা কই? সহরে নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিও জল কিনিয়া খাইতেছে। মণিপুরের নিকট দিসাপুরে ৬০০ হস্ত বেড় যুক্ত দুইটি দীঘি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি দীঘির সংবাদ পাইয়াছি, তাহা নাকি মহীপাল দীঘি হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে মুসলমান-বিজয়ের কিছু পূর্ব্বে কোন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। সুলতান সামসুদ্দিনের পিতার নাম কতকগুলি মুদ্রায় তথায় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহা ১৩০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের। এই মাধবপুরে প্রাচীন অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩০টি বৃহৎ দীঘির চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে ২০টিতে এখনও গ্রীষ্মকালে জল থাকে। বাঙ্গলা দেশের রাজারা যে ধনরত্ন—এমন কি তামা-কাঁসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া রাখিয়া আপৎকালে চলিয়া যাইতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, বহু দীঘি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে-কোন উৎসব উপলক্ষে কেহ বাসনপত্র চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবান্তে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত। মাধবপুরের কোন কোন দীঘি সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে "গোবিন্দ-পুকুর" প্রসিদ্ধ;—দীঘির আয়তন ১৬ বিঘা। ইহা ছাড়া "ফুলবাড়ী পুকুর," "কালা পুকুর," "বর্ষা গাড়া," "মোচা পুকুর," "গোপাল গাড়া," "চিন্তা গাড়া," "গোয়াল গাড়া," "সোনা গাড়া" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা একটা সমস্যা। হয়ত কোন রাজা বা রাণী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দেবতার কাছে সঙ্কল্প করিয়া থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্থানে "জিয়স পুকুর" নামধেয় কতকগুলি দীঘি আছে। প্রবাদ, এক সময়ে উহার জলস্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবন পাইত, এইরূপ বহু দীঘি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানপূত ছিল। মাধবপুরের বিস্তৃত বিবরণ আমি ঢাকা জেলার বাঙ্গদি হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

জে. সি. ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিয়াছেন, মহাস্থান খুঁড়িলে বহুমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যাইবে, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উদাসীন ('৪০৮ পৃঃ)। এই স্থান হইতে মিঃ দীক্ষিত ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ তাম্রপট আবিষ্কার করিয়াছেন। ২৪-পরগনায় জটার দেউল ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়ন্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল (১১২৯ পৃঃ)। যশোরে মহম্মদপুরে রাজা সীতারামের মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রাজারই দুর্গ ছিল, এই দুর্গগুলিকে 'কোট বাড়ী' বলা হইত। দিনাজপুরে বিরাটগড় (বিরাট রাজার বলিয়া প্রবাদ), চান্দেবার দুর্গ, বাণগড়ে বাণ রাজার দুর্গ, বর্দ্ধমানে রাণীগঞ্জের অধীন চুরুলিয়া পল্লীতে রাজা নরোত্তমের দুর্গ, বাঁকুড়ায় নূতন গ্রামে (থানা ওণ্ডা) করাস গড়, কৃষ্ণ গড়, অসুর গড়, শ্যামসুন্দর গড় প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মেদিনীপুরে ময়নাগড়ের দুর্গ (লাউসেন নির্ম্মিত, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী), ২৪-পরগনার কাউগাছির দুর্গ (আয়তনে চার মাইল, চতুর্দ্দিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় জরিপা দিলীপ সিংহের গড় (১৪৮৫ খৃঃ অব্দে ইশা খাঁ কর্ত্তৃক অধিকৃত), হুগলী জেলায় ভান্তাড়ার গড়, দিনাজপুরে সাতপাড়া গড় ও যোগীঘোপা গড়,—এই সকল প্রাচীন দুর্গের

অন্ত নাই। যশোরে প্রতাপাদিত্য বহু দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যশোর-খুলনার ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। মৈমনসিংহ গচারি পাড়ার দুর্গ ৫০৩ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতু, বিজয়স্তম্ভ যে কত ছিল, তাহার গণনা কে করিবে? ঢাকাতে ধামরাই, ভাওয়াল, সাভার, দাসোরা প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম ও সাভার প্রভৃতি স্থানে বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। সাভারে হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ী, ভাওয়ালে শিশুপালের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। সুয়াপুর ও নান্নারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিরাট্ বৌদ্ধস্তূপের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান; ঐস্থান রাজাসন নামে পরিচিত। বিক্রমপুরে বল্লালবাড়ী, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি সুপ্রাচীন স্থান হইতে অনেক প্রাচীন বিগ্রহাদি পাওয়া গিয়াছে। বজ্রযোগিনী (চলিত নাম বঁদর যোগিনী) দীপঙ্করের জন্মস্থান। রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্প্রতি পদ্মাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। মীরকাদিম ও তালতলায় বল্লাল সেন নির্ম্মিত সেতু এখনও বিদ্যমান। ফরিদপুরে নলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী মথুরাপুরের মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অনেক মূর্ত্তির ছবি লইয়া আসিয়াছেন। বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির ১৪০১ শকে নির্ম্মিত, তথাকার হংসেশ্বরীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দিনাজপুর কান্তনগরের কান্ত-মন্দির গত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। ঐ জেলার জাগদল, ধীবর, বিয়াটপুর, কীচক প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তথায় জয়েশ নামে এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উহা ৯২ ফুট উচ্চ। প্রবাদ, জয়েশ্বর নামক কোন আসাম-রাজ কর্ত্তৃক এই শিব স্থাপিত। বাঁকুড়ার হাড়মাসরা গ্রামে ধর্ম্মদাস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মন্দিরটিও মুসলমান আগমনের পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট বহু গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা সংগৃহীত আছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সুন্দরবন, ২৪-পরগনা প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখ্যা নাই, কিন্তু আমার স্থানাভাব। কালীঘাট, খড়দহ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির ৩।৪ শত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কীর্ত্তি সমস্ত বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া আছে। তাঁহারা মন্দির ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু মসজিদ গড়িয়াছেন, যথা—ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ; প্রাচীন হিন্দু-মন্দির ভাঙ্গিয়া অনুমান ১৩০০ খৃঃ অব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক মসজিদের আস্তর খুঁড়িলেই হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রস্তর দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন এই কীর্ত্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ—বিশেষ গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মহাস্থানের বিরাট্ ধ্বংসস্তূপগুলির মধ্যে দাঁড়াইলে বাঙ্গলাদেশকে মহাশ্মশানভূমি বলিয়াই মনে হয়। দেশ ভক্ত ঐতিহাসিককে মহাদেবের মতই এই মহাশ্মশানের চিতাভস্ম লইয়া কঠোরতম সাধনা করিতে হইবে।

ভূমিকার পরিশিষ্ট

আমরা ২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজ-বংশের আদিপুরুষ ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছি, এই নাম সাভারের কোন মঠের শিলা-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে।

বল্লাল-চরিতে "রাজবল্লভ" বলিয়া যে ভীম সেনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও সম্ভবতঃ এই ভীম সেনকেই নির্দেশ করিতেছে। বল্লাল এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং বল্লাল চরিতোক্ত বল্লাল সেনের প্রিয় ভীম সেন শিলা-লিপির ভীম সেন হওয়ার বিপক্ষে কাল হিসাবে কোনও গুরুতর প্রমাণ বা যুক্তি নাই। "বল্লাল-চরিতে" দৃষ্ট হয়, পিতৃ-পিণ্ড যজ্ঞের তত্ত্বাবধানের ভার যুবরাজ লক্ষণ সেন ও এই ভীম সেনের উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ভীম সেনকে রাজা বল্লালের একান্ত অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই, (৪৮৬ পৃঃ) বৈদ্য কুলজীকার জয়সেন বিশ্বাস বল্লাল-প্রপৌত্র ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছেন, (২৮১ পৃঃ)। তাঁহার মতে 'নৃপেন্দ্র' ভীম সেন বিশ্বরূপ সেনের পুত্র এবং পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গভাগে রাজত্ব করেন। জয়-সেন বিশ্বাস ভীম সেনের পুত্র কার্ত্তিক সেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন (২৭৭-৭৮ পৃঃ)।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রাজাবলী নামক একখানি ইতিহাস প্রকাশিত করেন, এই বহিখানির অল্পসময়ের মধ্যে বহু সংস্করণ হইয়াছিল; ইহাতে সেন-বংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপ :—১। বল্লাল সেন, ২। লক্ষণ সেন, ৩। মাধব সেন, ৪। শূর সেন, ৫। ভীম সেন, ৬। কার্ত্তিক সেন, ৭। হরি সেন, ৮। শত্রুঘ্ন সেন, ৯। নারায়ণ সেন, ১০। লক্ষণ সেন, ১১। দামোদর সেন। নানা কারণে এই বংশাবলী সমগ্রভাবে বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না, সম্ভবতঃ হরি সেন নামটি বাদ পড়িবে।

সাভারের শিলালিপি ছাড়া অন্য কোন প্রস্তর-লিপি বা তাম্র-শাসনে ভীম সেনের নাম পাওয়া যায় নাই। কুলজী গ্রন্থের প্রমাণও অনেক সময় সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে,—তাহাতে নাম বাদ পড়া কিংবা উলট পালট হওয়া সচরাচর দৃষ্ট হয়।

কিন্তু তথাপি যখন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত নানারূপ প্রমাণে একটি বিষয় সম্বন্ধে ঐক্য দৃষ্ট হয়, তখন তাহা উপেক্ষিত হইবার কারণ নাই। এই সকল প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় যে বল্লালের অনতিদূরবর্ত্তী কালে ভীম সেন রাজা এইদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি বল্লালেরই বংশধর।

বল্লাল সেন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারীদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু তখনও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। সাভারের শিলা-লিপিতে দৃষ্ট হয়, ভীম সেনের পুত্র ধীমন্ত সেন বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতারা (সম্ভবতঃ কার্ত্তিক সেন ও অপরাপর স্বগণেরা) তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন (২৭৭ পৃঃ)।

বল্লাল-চরিত, সাভারের শিলালিপি, জয়সেন বিশ্বাসের কুলজী এবং রাজাবলী—এই পৃথক্ পৃথক্ চারিটি স্থানের উল্লিখিত ভীম সেন এক সময়ের এবং বল্লালের বংশধর।

আমাদের সুচিন্তিত ধারণা এই যে ইহারা অভিন্ন এবং এই রাজা ও তাঁহার বংশধরেরা পরবর্ত্তী কালে কিছু কালের জন্য সেন-রাজ-প্রাসাদের শেষ প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া ছিলেন।

১১৩৬ পৃষ্ঠায় দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামকে পুঁটিয়ার রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি নাটোরের রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন।

ভূমিকার ৩/০ পৃষ্ঠায় শ্রীহট্ট গবর্নমেন্ট হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার নিকট হইতে আমি আমার শিল্পসংগ্রহের কতক কতক উপকরণ পাইয়াছি, তাঁহার নাম প্রসন্নচন্দ্র কাব্যতীর্থ, নামটি ভুলিয়া যাওয়াতে যথা স্থানে তাহা উল্লেখ করিতে পারি নাই।

এরূপ বৃহৎ পুস্তকে নানারূপ ত্রুটি ও ভুল থাকা বিচিত্র নহে, বিশেষ আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত, ইতিহাস রচনায় ইহাই আমার হাতে-খড়ি। সহৃদয় ব্যক্তিদের সহানুভূতিই আমার পুরস্কার। এই পুস্তক দ্বারা আমার অর্থাগমের কোন সম্ভাবনা নাই; অথচ ইহার জন্য শুধু প্রাণান্ত পরিশ্রম নহে, আমাকে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, ছবি সংগ্রহ ও ব্লক করার ব্যয় বাবদ আমি ত্রিপুরেশ্বরের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা ছাড়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও বিদ্বৎ-সমাজে বরেণ্য ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা মহাশয় আমাকে আর্থিক আনুকূল্য করিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু দীঘাপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহাশয় আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া ব্লকের দরুন ঋণভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘু করিয়া দিয়াছেন।

আমি একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সালার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার প্রতিভাশালী পরিবারবর্গ আমাকে অফুরন্ত স্নেহ ও উৎসাহ-দ্বারা এই দুরূহ কার্য্যক্ষেত্রের পথ দীর্ঘকাল সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধনীয়। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ এম. এ, মহাশয় এই বহির শেষাংশ-প্রকাশে প্রেসের কাজ শীঘ্র সমাধা করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা লিখিয়া উপসংহার করিতেছি।

নানারূপ বিঘ্ন ও ঝঞ্জাট উপস্থিত হওয়াতে কোন কোন স্থলে ছবিগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত হয় নাই। অনেক স্থলেই ছবির নীচে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা ছবির বৃত্তান্ত পুস্তকের কোন্ পৃষ্ঠায় আছে তাহা ধরা পড়িবে। যেখানে তাহাও স্পষ্টরূপে সূচিত হয় নাই, সেখানে পাঠক ছবির সূচীপত্র দেখিবেন—তদ্দারা ছবির বৃত্তান্ত কোন্ স্থানে তাহা নির্ণীত হইবে। ৬১৯ পৃষ্ঠার ১৮ ছত্রে ১১২৮ স্থলে ১৪২৮ এবং ৬৪৯ পৃষ্ঠার ৮ ও ১০ ছত্রে ১৩০৮ ও ১৩১০ স্থলে ১২০৮ ও ১২১০ হইবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শব্দ-সূচী

অ

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

খ

গ

ঘ

চ

ড

ঢ

ত

থ

দ

ধ

ভ

র

শ

ষ

হ

চিত্র-স্থচি

আমরা কতকগুলি ধাতব বুদ্ধমূর্ত্তি চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে পাইয়াছি। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেও সেইরূপ অনেকগুলি রক্ষিত আছে। গ্রন্থভাগে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে যাভা-বরোবদোরের কতকগুলি মূর্ত্তির এরূপ আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য, যে মনে হয় যেন তাহারা একই কারিগরের হাতের নির্ম্মিত। বাঙ্গলা হইতে যে এই চিত্র-ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্প সুদূর ভারতীয় উপদ্বীপগুলিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ক্রমশঃ বহু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা এই পুস্তকের ভূমিকার ২৷৴০ পৃষ্ঠার লিখিত বিবরণের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সম্প্রতি গাইকোওয়ার ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ডাঃ সিলভ্যান্ লেভি কৃত বলি-দ্বীপে প্রাপ্ত সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথির তালিকার ভূমিকায় ঐ দ্বীপের একখানি শিল্প-সম্বন্ধে প্রাচীন পুস্তকের উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখক বলিতেছেন যে তিনি "গৌড়-গুরুদের" চিরানুক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শিল্পের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৪৩৬ (খ) সংখ্যক পৃষ্ঠায় বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নে বাঙ্গালার চিত্রশিল্প সম্বন্ধে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ গুলির উচ্চ ধারণার প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাজমহলের মত কোন মন্দির ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যেরূপ বহু স্থান ব্যাপিয়া পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলার সেই অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন সেইরূপ এখনও দেশময় পড়িয়া আছে; এখনও তাহার প্রচুর অনুসন্ধান হয় নাই।

(**) চিহ্নিত চিত্রগুলি সমস্তই আমার চিত্রশালার, উহাদের অধিকাংশই এখন ত্রিপুরেশ্বরের আগড়তলার রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। কেবল মাত্র যে সকল মূর্ত্তি ও চিত্র আমার রূপেশ্বর দেবমন্দিরে পূজার ঘরে ছিল, তাহা সেইখানেই আছে।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা